তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি

উৎপল রায়
সুধীর রায়

কলিকাতা, বর্ধমান, বিদ্যাসাগর, উত্তরবঙ্গ এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত

তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি

[দ্বিতীয় পত্র]

কলিকাতা, বর্ধমান, বিদ্যাসাগর, উত্তরবঙ্গ এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ

[ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন গণসাধারণতন্ত্র এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ]

অধ্যাপক উৎপল রায়, এম. এ., এল-এল. বি.
বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কাটোয়া কলেজ
(রাষ্ট্রতত্ত্বের রূপরেখা, ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জনপ্রশাসন, An Introduction to Political Science প্রভৃতি গ্রন্থের অন্যতম লেখক)

এবং

অধ্যাপক সুধীর রায়, এম. এ. পি-এইচ. ডি.
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান রাজ কলেজ
(রাষ্ট্রতত্ত্বের রূপরেখা এবং উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থের অন্যতম লেখক)

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
ক্যালকাটা বুক হাউস
1/1, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা—700073

বাঁধাই ঃ নিউ বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

মুদ্রাকর ঃ—শ্রীপবিত্রলাল দত্ত, প্রিণ্টোগ্রাফ, ১০১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯ এবং
শ্রীসুনীল কুমার বক্সী, প্রিণ্ট হাউস, ৬৩এ/৩, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমের নতুন পাঠ্যসূচীর ভিত্তিতে নতুন ভঙ্গীতে তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি নিয়ে বইখানা লেখা হয়েছে। পুস্তকটি মূলত পাশ কোর্সের জন্য লেখা হলেও, সাম্মানিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরাও পুস্তকটির দ্বারা যাতে উপকৃত হন—সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

শাসনব্যবস্থা পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ও আবেদনের (Approach) ক্রমশ পরিবর্তন ঘটছে। শাসনব্যবস্থার আলোচনা ক্রমশ তুলনামূলক হয়ে উঠছে এবং আলোচনায় রাজনৈতিক আচরণ ও ঘটনাবলী ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। কোন দেশের রাজনীতিকে এড়িয়ে নিছক শাসনব্যবস্থা আলোচনা করা সম্ভব নয়—এই চরম সত্য আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। রাজনীতি প্রভাবিত শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা উপস্থিত করা খুবই কঠিন কাজ। চেষ্টা করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী যথাযথ ভাবে যথাস্থানে প্রতিফলিত হয়। পাঠ্যসূচীর সকল বিষয় সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করতে গিয়ে পুস্তকটির কলেবর অনিচ্ছাকৃতভাবে বড় হয়েছে।

পুস্তকখানি রচনায় অনেক বন্ধু ও সহকর্মী আমাদের উৎসাহিত এবং নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন—তাদের সকলকে এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাই। প্রকাশক শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ভাওয়াল মহাশয় ও তাঁর সুযোগ্য পুত্ররা নানা প্রতিকুলতার মধ্যে এই পুস্তক প্রকাশ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ক্যালকাটা বুক হাউস ও প্রেসের কর্মীদের সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সংস্করণটি দ্রুত প্রকাশনার জন্য কিছু ভুলত্রুটি থেকে গেল। সহৃদয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কাছে আবেদন, ভুলত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূর করতে তাঁরা যেন পরামর্শ এবং মতামত দিয়ে সাহায্য করেন। আমাদের লেখা অন্যান্য পুস্তকের মত এই পুস্তকটিও শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা সমাদৃত হলে পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

উৎপল রায়
সুধীর রায়

B. The University of Burdwan

Foreign Governments and the United Nations.

I. Great Britain—Characteristics of the British Constitution—The Rule of Law ; Convention,—Position and Powers of the British Crown.

Characteristics of the British Cabinet—its functions—the position and powers of the Prime Minister—Relation between the Cabinet and Parliament. Constitution and functions of the House of Lords and the House of Commons—Relationship between the two Houses.

II. U.S A.—Chief features of the Constitution of the U.S.A. Position and Powers of the President—The Cabinet—Powers and functions of the two Houses of Congress—The Federal Judiciary and its functions—Process of Amendment of the Constitution.

III. U.S.S.R.—Chief features of the Constitution—Constitution and functions of the Council of Ministers—Functions of the Supreme Soviet—the Presidium—The One-Party Rule - Role of the Communist Party—The Judiciary.

IV. United Nations—its main organs—their compositions and functions.

C. Vidyasagar University

1. The United Kingdom

Characteristics of the Constitution—Rule of Law and Conventions—Position and Powers of the Crown—Characteristics of the Cabinet--its functions—Position and Powers of the Prime Minister—Relation between the Parliament and the Cabinet.

Parliament—Composition and functions of the House of Commons—Role of the Opposition—Position of the House of Lords—Relation between the two Houses—the Party system.

2. The United States of America.

Chief features of the Constitution—Nature of U. S. Federalism —Bill of Rights—Position and Powers of the President—The Cabinet—Powers and functions of the two Houses of Congress.

The Federal Judiciary and its functions—Powers of Constitutional Amendment—the U. S. Party System.

3. The People's Republic of China.

(The 1982 Constitution should be followed)

Significance of People's Revolution—Constitutional Development—a brief outline—Comparison between the 1978 Constitution and 1982 Constitution.

The 1982 Constitution

The Preamble to the Constitution.

The General Principles.

The Fundamental Rights and Duties of the Citizens.

The State Structure in the National People's Congress

The President of the Republic : The State Council.

The Central Military Commission.

The Local People's Congress and the Local People's Governments at different levels.

The organs of self Government of National Autonomous Areas.

The People's Courts and the People's Procurators.

4. The U. S. S R.

Formation of the U. S. S. R.—An historical overview—Chief features of the Constitution. The Federal structure—Citizenship—Equality of Citizens Rights—the basic rights, freedoms and duties of citizens.

The role of the C.P.S.U.—The Electoral System.

The Supreme Soviet of the U.S.S.R—Presidium of the Supreme Soviet--the Council of Ministers of the USSR – Justice, Arbitration and Procurator's supervision—Courts, Arbitration—the Procurator's Office.

Procedure of Amending the Constitution.

— —

D. North Bengal University

Group A : Modern Governments (The Governments of the U. K., the U. S. A. and the U. S. S. R.)

Group B : United Nations (Purposes and General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Secretary General)

তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি

বিষয় সূচী

তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা পাঠের ভূমিকা

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি

মার্কিন শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি

সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি

চীনের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা
ও রাজনীতি

তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা পাঠের ভূমিকা

ক. সংবিধান কি এবং কেন ?

মানুষের জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন, চাহিদা এবং প্রবৃত্তি মেটাবার জন্য সমাজ-জীবনে বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়, ক্লাব, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিটি মানুষের জীবনের কোন-না-কোন প্রয়োজন মেটায়। এ সব প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য ও সাহচর্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব হিসেবে ব্যক্তি তার জীবনের আদর্শ ও অর্থ খুঁজে পায়।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র আদর্শ ও উদ্দেশ্য থাকে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান যাতে নিজ নিজ আদর্শ ও উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে তার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেই কিছু কিছু নিয়মকানুন প্রবর্তন করতে হয় এবং প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা ঐ সব নিয়মকানুন মেনে চলতে বাধ্য থাকে। কোন প্রতিষ্ঠান যদি নিয়ম-কানুনের অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত না হয় তবে সেখানে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা এবং যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তাই আমরা দেখি, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই কতকগুলি নিয়মাবলীর দ্বারা পরিচালিত হয়। যেমন, প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কার বা কাদের হাতে থাকবে, তাদের কারা মনোনীত করবে এবং কী পদ্ধতিতে মনোনীত করা হবে, কর্তৃত্বে যাঁরা আছেন তাঁরা কি কি ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী, সাধারণ সদস্যদের কি কি অধিকার ও কর্তব্য থাকবে, আইনভঙ্গ করলে তার প্রতিকার কি—ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রণয়ন করে এবং এ সব নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে একই নিয়মাবলী প্রবর্তন করতে হবে এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী নিয়মাবলী প্রবর্তন করে।

অর্থাৎ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই যাতে নিজ নিজ আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করতে পারে তার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে কিছু কিছু নিয়ম-কানুন বিধিবদ্ধ, অনুসরণ ও মান্য করতে হয়। একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে সব নিয়মাবলী মেনে চলা হয় সে সব নিয়মাবলীকে ঐ প্রতিষ্ঠানের সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলে। অর্থাৎ যে কোন সংস্থার প্রাতিষ্ঠানগত রূপ যা থেকে জানা যায় তাই সে সংস্থার সংবিধান বা শাসনতন্ত্র।

রাষ্ট্রও একটি প্রতিষ্ঠান। অন্য পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মত রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যও বিভিন্ন নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করা হয়। সরকার পরিচালনায় ঐ সব নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা হয় এবং নাগরিকেরা ঐ সব নিয়ম-কানুন দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করেন। সরকার পরিচালনার ঐ সব নিয়ম-কানুনকে রাষ্ট্রের সংবিধান বা শাসনব্যবস্থা বলা হয় এবং ঐ সংবিধানের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানগত রূপটি ধরা দেয়। যেহেতু অন্যান্য প্রাতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্র অনেক বড়, তাই এর কার্যাবলী বহুমুখী ও জটিল ; রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অনেক ব্যাপক, তাই অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাভাবিক কারণেই রাষ্ট্রের সংবিধান অনেক ব্যাপক ও জটিল হতে বাধ্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা একটিমাত্র দলিলে বিধিবদ্ধ থাকে। আবার কোথাও (যেমন ব্রিটেনে) একাধিক দলিল ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে সাংবিধানিক আইন-কানুনগুলি ছড়িয়ে থাকে।

প্রতিটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সংবিধানের মধ্যে কিছু কিছু উপাদানগত সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকলেও সব প্রতিষ্ঠানের সংবিধান বা শাসনব্যবস্থা এক নয়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই

নিজ নিজ উদ্দেশ্য, প্রয়োজন, চাহিদা ইত্যাদির ভিত্তিতে নিজের উপযোগী সংবিধান রচনা করে। ঠিক তেমনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানের মধ্যে সাধারণভাবে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগত কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সংবিধানই কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল থাকে। প্রতিটি রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা, ভৌগোলিক অবস্থান, জনগণের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সেজন্য বলা হয়, সংবিধান তৈরী করা যায় না, গড়ে ওঠে (Constitutions grow and not made)। এমনকি যে সব সংবিধান লিখিত ও বিধিবদ্ধ সেখানেও দেখা যায় নানা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি এসে শাসনব্যবস্থার আঙ্গিনায় জড়ো হয়ে শাসনব্যবস্থাকে ক্রমবিকশিত করতে সাহায্য করে। প্রেসিডেন্ট উইলসন তাই মনে করেন যে, জীবন্ত হতে হলে কাঠামো ও প্রয়োগের দিক থেকে সংবিধানকে বিবর্তনধর্মী হতে হবে।

রাষ্ট্র যাতে নিজ লক্ষ্য সাধন করতে পারে এবং যে সব দায়িত্ব এর ওপর ন্যস্ত করা হয় তা যাতে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে সেজন্য সংবিধান রাষ্ট্রের পরিচালক সংস্থাকে (সরকার) প্রভূত ক্ষমতা দিয়ে সজ্জিত করে। কিন্তু এ সব ক্ষমতায় সজ্জিত হয়ে রাষ্ট্র যাতে 'লেভিয়াথেন'-এ পরিণত না হয় বা 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'-এর আবরণ ধারণ করে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে না পারে তার জন্য অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সীমিত রাখার ব্যবস্থাও সংবিধানকে করতে হয়। তাই উইলিয়াম জি. এ্যানড্রুজ (William G. Andrews) একটি চমৎকার উক্তি করেছেন, সংবিধান হল একদিকে গতিসঞ্চালক যন্ত্র, অন্যদিকে গতিরোধক যন্ত্র (The constitution is both a motor and a break)।

এবার সংবিধান বা শাসনব্যবস্থা কাকে বলে তা আলোচনা করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগত রূপকে আমরা সংবিধান আখ্যা দিয়েছি। ডাইসী (Dicey), লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce), এস. ই. ফাইনার (S. E. Finer) কে. সি. হুইয়ার (K. C. Wheare) প্রভৃতি সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ মোটামুটিভাবে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সংবিধানের সংজ্ঞা দিয়েছেন। ডাইসীর মতে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যে সব নিয়ম-কানুন রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার ও বণ্টন রীতিকে প্রভাবিত করে তাই রাষ্ট্রের সংবিধান। লর্ড ব্রাইস মনে করেন, যে আইন ও প্রথার ছত্র-ছায়ায় রাষ্ট্রের জীবন-ধারা প্রবাহিত হয় তাকে সংবিধান বলে।[১] এস. ই. ফাইনার বলেছেন, সংবিধান হল কতকগুলো বিধিবদ্ধ আইন যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারে আসীন ব্যক্তিদের ভেতর কার্যাবলী, ক্ষমতা ও দায়িত্বের বণ্টনকে নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা পোষণ করে এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এদের সাথে জনগণের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে।[২] হুইয়ারের মতে, যে উদ্দেশ্যে এবং যে সব

সংবিধানের কয়েকটি সংজ্ঞা

১. 'The constitution is the aggregate of laws and customs under which the life of the state goes on' —Lord Bryce

২. 'Constitutions are codes of rules which aspire to regulate the allocation of functions, powers and duties among the various agencies and officers of Government and define the relationships between these and the public.'
—*Five Constitutions*, S. E. Finer, P 15,

সংস্থার মাধ্যমে সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় তাদের নিয়ন্ত্রণ করার নিয়মাবলীকে সংবিধান বলে।'[৩]

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোতে সংবিধানকে একটি আইনগত ধারণা বলে মনে করা হয় এবং এর আইনগত তাৎপর্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, সংবিধানকে রাষ্ট্রের মৌলিক আইন হিসেবে গণ্য করা হয় বলে সংবিধানের অলংঘনীয়তা এবং পবিত্রতার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। অলংঘনীয় বলতে বোঝান হয় না যে সংবিধান স্থায়ী এবং লয়, ক্ষয় ও পরিবর্তনের ঊর্ধে। বস্তুত প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রাখার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের সংবিধানকে পরিবর্তন ও সংশোধন করতে হয়। আর স্থায়িত্ব তো একটি আপেক্ষিক শব্দ। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পরে পুরাতন সংবিধানকে বাতিল করে নতুন সংবিধান রচনার ঘটনা পৃথিবীতে বিরল নয়।

সংবিধানের উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো মোটামুটিভাবে সনাতন এবং ঐতিহ্যগত ধারা অনুসরণে উপস্থিত করা হয়েছে—এ কথা বলা যায়। হারম্যান ফাইনার (Herman Finer) একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে সংবিধানের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে,

কয়েকটি আধুনিক সংজ্ঞা

সংবিধান হল ক্ষমতা সংক্রান্ত সম্পর্কের আত্মজীবনী (A constitution is the autobiography of a power relationship)। অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার অবস্থান-কেন্দ্রগুলো এবং এদের ভেতরকার ক্ষমতা সংক্রান্ত বিন্যাসকেই সংবিধান বলে। যোশেফ লা পালোমবারা (Joseph La Palombara) মনে করেন, ক্ষমতা প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর বিন্যাসের সামগ্রিকতাকে সংবিধান বলে। ডেভিড্ ইস্টনের পরিভাষা ব্যবহার করে অস্টিন র‍্যানী (Austin Ranney) বলেছেন যে, সংবিধান হল গ্রহণযোগ্য রূপান্তরসাধনের একটি পদ্ধতি যার দ্বারা কর্তৃপক্ষ চাহিদা ও সমর্থনকে নীতি নির্ধারণে পরিণত করে (accepted conversion process by which its authorities turn demands and supports into policy outputs)।

সংবিধান কি আর্থিক দলিল ?

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিন্যাস ও শ্রেণীগত অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে সংবিধানকে আরও ব্যাপকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। কোন দেশের সংবিধানকে সে দেশের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিন্যাসের একটা পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা চলে। সংবিধানকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাস ও পরিচালনার মাধ্যমরূপে মনে করলে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হবে। সামাজিক জীবনের ভিত্তি (base) এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত উপরি-কাঠামোর (super-structure) সম্পর্কের ভিত্তিতে সংবিধানের চরিত্র ও প্রকৃতির সঠিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। আর্থিক শক্তি সামাজিক জীবনের ভিত্তি রচনা করে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা ঐ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপরি-কাঠামো।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, আর্থিক শক্তিই সামাজিক পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এর অর্থ এই নয় যে, সামাজিক পরিবর্তনে দেশের ঐতিহ্য, ধর্ম, সামাজিক রীতি-নীতি, চিন্তাধারার কোন ভূমিকা নেই। সামাজিক

৩. The constitution 'is the body of rules which regulate the ends for which and through which governmental power is exercised.' —K. C. Wheare.

পরিবর্তনে এ সব উপাদানের ভূমিকা থাকলেও শেষ পর্যন্ত আর্থিক শক্তিই নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা পালন করে। অন্যান্য প্রভাব ও উপাদান আর্থিক শক্তির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে। সুতরাং বলা যায়, আর্থিক শক্তিই মূল নিয়ামক এবং সমাজের ভিত্তি। অন্যান্য শক্তি ও উপাদান এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ আর্থিক শক্তির বিন্যাসের ওপর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিন্যাস নির্ভরশীল। সংবিধান আর্থিক শক্তির ঐ নিয়ামক ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারে না—বরং ঐ আর্থিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করাই সংবিধানের উদ্দেশ্য ও কার্য। সুতরাং কোন দেশের সংবিধানের উৎস, চরিত্র, প্রকৃতি এবং গতিশীলতাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে সমসাময়িককালের আর্থিক শক্তির বিন্যাস ও এর পরিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। তাই বলা হয় যে, আর্থিক কাঠামো (base) এবং উপরি-কাঠামোর (super structure) পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সংবিধান গড়ে ওঠে।

আর্থিক শক্তিই মূল নিয়ামক

উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সংবিধানকে শ্রেণীশাসনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কোন সমাজে আর্থিক ক্ষমতা, অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদান, উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন এবং মুনাফা সমাজের কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকলে ঐ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করার জন্য রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ক্ষমতারও কেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। তাই রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক ক্ষমতা ও কাঠামো সমাজের আর্থিক দিক থেকে প্রাধান্যকারী শ্রেণীর স্বার্থেই বিন্যস্ত ও প্রয়োগ করা হয়। আর্থিক ক্ষমতার অসম বণ্টনের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতাও অসমভাবে বণ্টিত হতে বাধ্য। যে কোন শ্রেণী-বিভক্ত সমাজেই আর্থিক ক্ষমতা অসমভাবে বণ্টিত হবার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতাও অসমভাবে বণ্টিত হয়। যে কোন সমাজের সংবিধানও সেখানকার আর্থিক দিক থেকে প্রাধান্যকারী শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রাধান্যকেই সুনিশ্চিত করে। তাই মনে করা হয় যে, প্রতিটি দেশের সংবিধানের মধ্য দিয়ে সে দেশের শাসক শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ প্রতিফলিত হয়। শাসনতন্ত্র কোন সমাজ ব্যবস্থার একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তরের শ্রেণী-সম্পর্কের প্রতিফলন—একটা নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কের রক্ষক হিসেবে শাসনতন্ত্রকে গড়ে তোলা হয়।

সংবিধান ঃ শ্রেণী-শাসনের হাতিয়ার

খ. তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা পাঠের ভূমিকা

বিভিন্ন শাস্ত্র পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। বর্তমান যুগে মানুষের জ্ঞানের অগ্রগতি এবং সমাজবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের ফলে তুলনামূলক পদ্ধতির দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও আলোচনার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। গ্যাব্রিয়েল এ. অ্যালমণ্ড (Gabriel A. Almond) তাই মনে করেন যে, সমসাময়িককালে শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা একটা আন্দোলনে পরিণত হয়েছে—এটি বর্তমানে আর নিছক পদ্ধতিমাত্র নয়। বলা যায়, বর্তমান যুগে অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণা (empirical research) এবং আচরণবাদী বিপ্লব (behavioural revolution) রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনার এক নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। ফলে, তুলনামূলক আলোচনার নতুন ধারা সনাতন (traditional) ধারা থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র এবং গুণগত দিক থেকে 'উন্নতির প্রতিশ্রুতি' নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

তুলনামূলক পদ্ধতির গুরুত্ব

এখন প্রশ্ন হল, তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি বলতে আমরা কী বুঝি? এম. জি. স্মিথের (M. G. Smith) ভাষায় বলা যায়, বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের রূপ, তাদের ধর্ম, পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিবর্তন ও রূপান্তরের ধরন সম্পর্কে অনুশীলন করাকে তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি বলে। একটু ব্যাখ্যা করে বলা যেতে পারে যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আদর্শগত, কাঠামোগত এবং আচরণগত রূপের বৈসাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য থাকে। ঐ সব সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্য ও উপাদান আলোচনার মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনা-ধারা, বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার ভাল-মন্দ বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, কাঠামোর কার্যগত পার্থক্য ইত্যাদি তুলে ধরে। এই আলোচনার দ্বারা তুলনামূলক বিশ্লেষণধারার ব্যাপ্তি সহজেই অনুমান করা যায়।

তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা কাকে বলে?

সাম্প্রতিককালে মনে করা হয় যে, 'ক্ষমতা'র (Power) দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনামূলক আলোচনা এবং শাসনব্যবস্থার মূল্যায়ন করা শাসনব্যবস্থা পাঠের সঠিক পদ্ধতি। 'ক্ষমতা'-র দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শাসকশ্রেণী, প্রভাবশালী গোষ্ঠী (Elite), স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (Interest Group) ইত্যাদিকে বিশ্লেষণ করা এবং এদের পারস্পরিক ভূমিকার আলোচনা দ্বারাই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে যথার্থভাবে তুলে ধরা যায়। মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ব্যক্তি, স্বার্থ, চাহিদা ইত্যাদি নিয়ে বিরোধ ও ক্ষমতা-দ্বন্দ্বই তুলনামূলক আলোচনার নির্যাস। সুতরাং একদিকে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার উৎস, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার আলোচনা করা এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পশ্চাৎপট ব্যাখ্যা করা এবং কী ভাবে বিভিন্ন প্রভাবের টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা অনুধাবন করা, কোন্ কোন্ উপাদান সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে তার আলোচনা ইত্যাদির দ্বারা তুলনামূলক শাসনব্যবস্থাকে অর্থবহ করে তোলা যায়। অনেকে মনে করেন, তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি আলোচনার পরিধি খুবই ব্যাপক। রাজনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম ও রাষ্ট্রনৈতিক পদ্ধতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কিছুই তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির অন্তর্গত। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে 'ক্ষমতা' কোন শাসনব্যবস্থার প্রধান অথবা মৌল আলোচ্যসূচী হতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষমতার বণ্টন ও প্রয়োগ যে কোন সমাজেই আর্থিক ক্ষমতার বণ্টনের উপর নির্ভর করে। এ পটভূমিকা ব্যতীত ক্ষমতার আলোচনা নিরর্থক।

'ক্ষমতা'-র দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, তুলনামূলক পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ ধারা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা কী। তুলনামূলক পদ্ধতির দুটি লক্ষ্য—দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থারই উদ্দেশ্যে হল নিজস্ব মূল্যবোধ অনুযায়ী গুণগত দিক দিয়ে নাগরিকদের জীবনের উন্নতি সাধন। তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা দেখা যেতে পারে কোন্ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বা শাসনব্যবস্থায় এর দার্শনিক উদ্দেশ্য কতটা পরিমাণে সাধিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করা, এদের শ্রেণী বিভক্ত করা এবং এদের পারস্পরিক

তুলনামূলক আলোচনার লক্ষ্য

সম্পর্ক বিশ্লেষণের দ্বারা যে তথ্য সংগৃহীত হয় তাকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক জ্ঞান হিসাবে প্রয়োগ করা। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, আরিস্টটল ১৫৮টি নগর রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণের দ্বারা ঐ সকল শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্বহীনতার কারণ নির্দেশ করেছিলেন। এ ছাড়াও বলা যায়, একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনেক কিছু শিক্ষণীয় ও গ্রহণীয় থাকে। বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার প্রসার ঘটিয়ে পারস্পরিক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে তুলে ধরা যেতে পারে।

তুলনামূলক শাসন ব্যবস্থা আলোচনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হ'ল বিভিন্ন শাসন-ব্যবস্থার পারস্পরিক দোষগুণ আলোচনার মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থিত করা। উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ বিচার করা সহজ হয়ে ওঠে। তবে একথা মনে করলে ভুল হবে যে, কোন গবেষক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রদত্ত তথ্যকে নির্ভুল বলে গণ্য করা যেতে পারে। এর কারণ স্পষ্ট। গবেষক নিজস্ব রাজনৈতিক প্রবণতা অনুযায়ী কোন শাসনব্যবস্থার দোষ-গুণ বিচার করেন বলে তাঁর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সর্বদা সঠিক নাও হতে পারে।

তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা আলোচনার উৎপত্তি ও বিকাশ

তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থার আলোচনার ধারা বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। হেরোডোটাস, অ্যারিস্টটল, বোঁদা, মন্তেস্কু ইত্যাদির নাম তুলনামূলক বিশ্লেষণ ধারার সাথে বিশেষভাবে জড়িত। প্রাচীন গ্রীসের বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা আরিস্টটল কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। ঐ সব পণ্ডিতেরা যে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল সে যুগের বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এমন কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করা যাদের বাছাই, তুলনা ও অপ্রয়োজনীয় তথ্য বাদ দিয়ে (elimination) শাসনব্যবস্থার আদর্শ ও গতিশীল বিষয়বস্তুকে আবিষ্কার করা।

উৎপত্তি

তুলনামূলক বিশ্লেষণ ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে লর্ড ব্রাইসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তিনি শাসনব্যবস্থা আলোচনার ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন এবং এ পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর মতে কার্য ও কারণের মধ্যে সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় বলে তুলনামূলক পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত।

ব্রাইস

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আরিস্টটল থেকে শুরু করে লর্ড ব্রাইস পর্যন্ত সকলেই তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসংবদ্ধ (unsystematic) কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এরজন্য তুলনামূলক পদ্ধতি আশানুরূপভাবে কার্যকর হতে পারেনি, ফলে এ পদ্ধতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে গিয়েছে। সাম্প্রতিককালে অ্যালমণ্ড, পাওয়েল, কোলম্যান, হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল, এডওয়ার্ড শিলস্, ডেভিড আপটার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তুলনা-মূলক আলোচনার ক্ষেত্রে নতুন কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন।

সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা

অ্যালমণ্ড সরকারকে বা এর কোন অংশকে তুলনার একক (unit) হিসাবে গ্রহণ না করে গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই (political system) তুলনার একক হিসাবে গণ্য

করেছেন। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যকে আলোচনার মাপকাঠি হিসেবে ধরে অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ঐ বৈশিষ্ট্যগুলোর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির অনুসন্ধান চালিয়ে তিনি তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন।

অ্যালমণ্ড

অ্যালমণ্ড রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলোকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হল ঃ এ্যাংলো-আমেরিকান (Anglo-American), কণ্টিনেণ্টাল ইউরোপিয়ান (Continental-European), প্রি-ইনড্রাসট্রিয়াল (Pre-Industrial) এবং টোটালিটারিয়ান (Totalitarian)। রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যগত শ্রেণীবিভাজনের মাধ্যমে তিনি উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। তিনি যে কার্যগত-শ্রেণীবিভাজন করেছেন এর উপাদান হল ঃ ব্যবস্থার সক্ষমতা (system's capabilities), রূপান্তর পদ্ধতি (conversion process) এবং কোন ব্যবস্থাকে রক্ষা ও সঙ্গতি বজায় রাখা সংক্রান্ত কাজ (system maintenance and adaptation)।

অ্যালমণ্ডের শ্রেণীবিভাজন

উপাদান

অ্যালমণ্ড ও তাঁর সহযোগীরা তুলনামূলক আলোচনার ধারাকে পাশ্চাত্যের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। অ্যালমণ্ড তত্ত্বগঠন (theory building) এবং কৌশলের দিকে বেশী গুরুত্ব আরোপ করার ফলে তাঁর আলোচনায় রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা উপেক্ষিত হয়েছে।

মূল্যায়ন

ডেভিড আপটারের *The Politics of Modernization*, *Ghana in Transition* এবং *The Political Kingdom in Uganda* বই তিনটির মধ্যেও তুলনামূলক আলোচনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ই. এ. শিলস (E. A. Shils) তাঁর *Political Development in New States* বইটিতে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন বা অগ্রগতির যে আলোচনা করেছেন তুলনামূলক শাসনব্যবস্থার আলোচনার প্রসারে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বার্ডারের আফ্রিকা সংক্রান্ত এবং লার্নারের ম[illegible]াচ্য সংক্রান্ত র[illegible]াও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

অন্যান্য লেখকের অবদান

তুলনামূলক আলোচনার কয়েকটি দিক

তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, কেবলমাত্র বিধিবদ্ধ সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখলে কোন সংবিধানের প্রকৃত ও কার্যকর চরিত্র অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এমন অনেক প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় যাদের কোন ক্রমেই সংবিধানের আইনানুমোদিত অংশ বলা যায় না। অথচ শাসনব্যবস্থা পরিচালনা ও সরকারী নীতি নির্ধারণে এদের ভূমিকা অবহেলা করার মত নয়। উদাহরণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ভূমিকার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

দ্বিতীয়ত, তুলনামূলক শাসনব্যবস্থার আলোচনাকে কেবল আইনের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত রাখা ঠিক নয়। সাংবিধানিক বিধি ও পদ্ধতি বাস্তবে কি ভাবে কার্যকর করা হয়, তাও আলোচনা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, সংবিধানের বিধিবদ্ধ কাঠামো এবং

এর কার্যকর চরিত্রের মূল্যায়নের মাধ্যমেই কোন সংবিধান সম্পর্কে প্রকৃত ও বাস্তব মনোভাব গড়ে তোলা সম্ভব।

তৃতীয়ত, কোন সংবিধানের চারিত্রিক উপাদান বিচার এবং মূল্যায়নের জন্য দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার যে, প্রতিটি সংবিধানই একটা সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কাজ করে। বিভিন্ন সামাজিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে সংবিধানের চরিত্রও আন্দোলিত হয়। তাই কোন সংবিধানকে বিমূর্ত (abstract) বিধি ও নিয়মের সমষ্টিবন্ধরূপ হিসাবে বিবেচনা না করে সামাজিক শক্তির প্রতিফলন হিসাবে গণ্য করা উচিত। তুলনামূলক শাসনব্যবস্থার আলোচনায় এ দিকটা এখন পর্যন্ত উপেক্ষিত।

চতুর্থত, তুলনামূলক শাসনব্যবস্থার আলোচনায় যেমন সমাজের ভেতরকার শক্তির (intra-social forces) প্রভাব আলোচনা প্রয়োজন, তেমনি সমাজের বাইরের শক্তি (extra-social forces) সম্পর্কেও সমানভাবে মনোযোগ নিবন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ, কেবলমাত্র জাতীয় রাজনীতি নয়—আন্তর্জাতিক রাজনীতিও একটি দেশের সাংবিধানিক জীবনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করে। তুলনামূলক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত সকলেরই জানা আছে যে, যুদ্ধ, রাজনৈতিক ও আর্থিক সংকট, আর্থিক ও রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াস কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাগুলিতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে সহায়তা করেছে এবং করছে।

তুলনামূলক শাসনব্যবস্থার কয়েকটি পদ্ধতি

তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও সরকার আলোচনার পদ্ধতিগত, কলাকৌশলগত এবং বিশ্লেষণভঙ্গীর (approach) যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তা আগেই বলা হয়েছে। আচরণবাদীরা শাসনব্যবস্থা আলোচনার ক্ষেত্রে গতানুগতিক ও সাবেকী পদ্ধতি অনুসরণের পরিবর্তে আলোচনার নতুন ধারা গ্রহণ এবং আলোচনার বিষয়বস্তুকে প্রসারিত করার চেষ্টা করেছেন। আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আইনসভার সদস্য, রাজনীতিবিদ্ রাজনৈতিক ও অ-রাজনৈতিক প্রশাসক, বিচারপতি, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, ভোটদাতা ইত্যাদিদের আচার-আচরণগত তথ্য উপস্থিত করে ফলিত রাজনীতির (applied political science) ভিত্তি স্থাপনে চেষ্টা করেছেন। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাঁদের তথ্য ও সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই অনুমান-নির্ভর।

ব্যবস্থাপক পদ্ধতি, গোষ্ঠীগত পদ্ধতি, কাঠামো-কার্যগত পদ্ধতি, ক্ষমতা-তত্ত্ব, যোগাযোগতত্ত্ব প্রভৃতি তুলনামূলক শাসনব্যবস্থার আলোচনায় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে। তবে এরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সমাজিকীকরণ সংক্রান্ত আলোচনা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও জনসাধারণের পারস্পরিক মূল্যায়ন সম্পর্কে সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের মনোভাব নির্ধারণে ঐ সব পদ্ধতি ও বিশ্লেষণভঙ্গীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আচরণবাদীরা যে সব 'বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য ও পদ্ধতি' ব্যবহার করে তুলনামূলক রাজনীতির বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন, তা রাজনীতির মৌল ও বাস্তব অবস্থাকে প্রতিফলিত করেনি। তুলনামূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে যে সব নতুন কলাকৌশল ও বিশ্লেষণ ভঙ্গীর প্রয়োগ গত দু-তিন দশক ধরে ব্যাপক আকারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করেছে, ঐগুলি মূলত পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের মূল্যবোধে সমৃদ্ধ। বৃহৎ সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন ঐ সব কৌশলের অসারতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

॥ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ॥

১'১ দেশ ও দেশবাসী
Land and the People

যে কোন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা একদিকে সেখানকার ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান এবং অন্যদিকে সেখানকার জনগণের আর্থিক ও সামাজিক জীবন, আচার-ব্যবহার, রুচি, মানসিক গঠন এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এক কথায় বলা যায়, দেশ ও দেশবাসীর বৈশিষ্ট্য সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে এবং এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ব্রিটেনের শাসন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার বিবর্তন, রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব, পরিষদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন, দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দলীয় ব্যবস্থা প্রচলন—ইত্যাদি আকস্মিক ঘটনাবলী নয়—এ সব শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের উৎস হল সেখানকার দেশ, সমাজ ও জনগণ। সুতরাং ব্রিটেনের ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক শক্তির বিন্যাস এবং জনগণের মানসিক গঠন ও চরিত্র সম্পর্কে আলোকপাত না করে সেখানকার শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি আলোচনা করলে তা আংশিকতার দোষে দুষ্ট এবং বিভ্রান্তিকর হতে বাধ্য। ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে এ কথা আরও বেশি করে প্রযোজ্য এ কারণে যে, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা কোন ব্যক্তি বা সংস্থা দ্বারা রচিত বা সৃষ্ট নয় (not made) বা জনগণের উপর তা চাপিয়ে দেয়া (superimposed) হয়নি—দেশের ভৌগোলিক অবস্থা, সামাজিক কাঠামো ও মূল্যবোধ থেকে সেখানকার শাসনব্যবস্থা উৎসারিত হয়েছে।

দেশ ও জনগণের বৈশিষ্ট্য শাসনব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়

সাধারণভাবে 'ব্রিটেন' নামে আমরা যে রাষ্ট্রকে অভিহিত করি তার প্রকৃত নাম হল 'গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ড যুক্তরাজ্য' (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)। ইংল্যান্ড, ওয়েলস্ এবং স্কটল্যান্ডকে ১৭০৬ সাল থেকে সরকারীভাবে একসাথে 'গ্রেট ব্রিটেন' নামকরণ করা হয়। ১৯২২ সালের আগে পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেন ও গোটা আয়ারল্যান্ড নিয়ে 'গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড যুক্তরাজ্য' নামে একটি রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু ১৯২২ সালে দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড আলাদা হয়ে আয়ারল্যান্ড সাধারণতন্ত্র (Irish Republic) গঠন করে। সুতরাং বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেন, ওয়েলস্, স্কটল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং রাজশক্তির অধীনস্থ কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ (Isle of Man, Jersey, Associated Islands) নিয়ে গ্রেট ব্রিটেন এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড যুক্তরাজ্য গঠিত। আলোচনাকালে ঐ যুক্তরাজ্যকে আমরা 'ব্রিটেন' বলে অভিহিত করবো।

কাদের নিয়ে ব্রিটেন গঠিত

ইউরোপীয় উপমহাদেশ থেকে ইংলিশ চ্যানেল দ্বারা বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ড যুক্তরাজ্য বা 'ব্রিটেন' গঠিত। সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ঐ বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান ব্রিটেনের রাজনীতি ও জাতীয় চরিত্রের ওপর ব্যাপক

প্রভাব বিস্তার করেছে। **প্রথমত,** সমুদ্র পরিবেষ্টিত বলে নৌ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ব্রিটেনে শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ নৌ-শক্তির প্রবল পরাক্রমের জন্য ব্রিটেনকে 'সমুদ্রের সম্রাজ্ঞী' নামে অভিহিত করা হয়। **দ্বিতীয়ত,** সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার ফলে মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ডের ঘটনাবলী ব্রিটেনের ওপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ফরাসী বিপ্লবের মত যুগান্তকারী ঘটনা ব্রিটেনে কোন রাজনৈতিক উত্তাপ বা সংবিধান পরিবর্তনের প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে দেখা যায় যে, ইউরোপীয় মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ব্রিটেন দীর্ঘদিন ধরে নিজস্ব পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছে। **তৃতীয়ত,** ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দ্বীপ হবার ফলে গ্রেট ব্রিটেন, ওয়েলস্, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হতে সমর্থ হয়েছে। অর্থাৎ ভৌগোলিক অবস্থান এদের ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছে এবং ঐ বিচ্ছিন্নতাই এদের ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেরণা দিয়েছে। **চতুর্থত,** জলপথ ব্যতীত অন্য কোন দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা না থাকার জন্য ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের মত ব্রিটেনের শক্তিশালী স্থলবাহিনী রাখার প্রয়োজন হয়নি। ফলে ব্রিটেনের রাজনীতিতে কখনই সৈন্যবাহিনী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এজন্য ব্রিটেনের সাংবিধানিক ও শাসনব্যবস্থা চিরদিনই আইনানুগ (legalistic) ও অসামরিক (civilian) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে ইংরাজ জাতির স্বাধীনতার প্রসারণ ঘটেছে।

সমুদ্র পরিবেষ্টিত এবং এর ফল

আমরা পূর্বে বলেছি যে, ইউরোপীয় ভূখণ্ড থেকে ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবার জন্য সেখানকার সাংবিধানিক সংস্কার বা পরিবর্তনের প্রভাব ব্রিটেনে বিশেষ কোন রেখাপাত করতে পারেনি। চারদিকে সংস্কার ও পরিবর্তনের কর্মযজ্ঞ চলতে থাকলেও ব্রিটেন কিন্তু স্থিতাবস্থা বজায় রেখে নিজ পথেই অগ্রসর হয়েছে। অর্থাৎ সাংবিধানিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে বৃটিশ জাতি নতুন ধ্যান-ধারণাকে গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিল না। পুরাতন ও পরীক্ষিত সামাজিক ধারাকে রক্ষা করার প্রবণতাই তাদের মধ্যে শিকড় গেড়ে থাকে। স্থিতাবস্থা বজায় রাখা ও পুরাতন ধারাকে রক্ষা করার এ প্রবণতাকেই আমরা রক্ষণশীল (conservative) চরিত্র নামে অভিহিত করি। বস্তুত রক্ষণশীলতা বৃটিশ জাতির চরিত্রের মৌল বৈশিষ্ট্য এবং ব্রিটেনের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যেই এর উৎপত্তির উৎস নিহিত। সনাতন (traditional) ধারার প্রতি ব্রিটিশ জাতির এই অন্ধ মোহ ও আনুগত্যের প্রকাশ দেখা যায় মধ্যযুগীয় কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখার প্রয়াসের মধ্যে। সামাজিক ব্যবস্থা ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতাই ব্রিটিশ জাতির রাজনৈতিক সংস্কৃতির (political culture) নির্যাস।

রক্ষণশীল চরিত্র

ব্রিটেন কয়েকটি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রের মত ব্রিটেনেরও জাতীয়তা, ধর্ম ও ভাষার নিজস্ব সমস্যা ছিল। জাতীয়তার দিক থেকে বলা যায় যে, ব্রিটেন একটি বহুজাতীয় রাষ্ট্র। ইংরেজ, আইরিশ, স্কচ ও ওয়েলস্-এর জনগণ স্বতন্ত্র জাতীয়তার ধারক। ১৯২২ সালে জাতীয়তাবাদের প্রেরণার ফলেই আয়ারল্যাণ্ডের

জাতীয়তা ও এর সমস্যা

দক্ষিণাংশ যুক্তরাজ্য বা ব্রিটেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা রাষ্ট্র (Irish Republic) গঠন করে। উত্তর আয়ারল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সেখানকার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন স্বতন্ত্র আইনসভা গঠন করা হয় এবং স্বায়ত্ত শাসনের ব্যাপক ক্ষমতা উত্তর আয়ারল্যান্ডের হাতে অর্পণ করা হয়। স্কটল্যান্ডও স্বায়ত্তশাসনের কিছু কিছু অধিকার লাভ করে। ওয়েলসের জন্যও এ ব্যাপারে কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, জাতীয়তা, ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার এবং রাজনৈতিক-সংস্কৃতিগত ব্যাপারে উপরোক্ত অঞ্চলগুলির জনগণের মধ্যে গভীর পার্থক্য রয়েছে। ফলে আপোষপন্থা অবলম্বন করে কিছু কিছু ক্ষমতা হস্তান্তর করে এদের ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা চললেও অনৈক্যের বীজকে কখনও নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি উত্তর আয়ারল্যান্ডে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ এবং স্কটল্যান্ড ও ওয়েলসে যথাক্রমে স্কটিশ জাতীয়তাবাদী দল ও ওয়েলস দলের আলাদা রাষ্ট্রগঠনের দাবী ব্রিটেনে জাতীয়তাবাদের সমস্যাকেই তুলে ধরেছে। তবে আশার কথা হল যে, এদের ভৌগোলিক অবস্থান ব্রিটেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্ব-নির্ভর রাষ্ট্রগঠনের অনুকূল নয়। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ, স্কচ ও আইরিশদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিবাহ সংঘটিত হবার ফলে সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে তথাকথিত 'রক্তের বিশুদ্ধতা' বা স্বতন্ত্র জাতীয়তার দাবী কারো পক্ষে করা আর সম্ভব নয়। ফলে কেল্ট, এঙ্গলস, স্যাকসন, ডেন, নর্মান প্রভৃতির সংমিশ্রণে যে ব্রিটিশ জাতির উদ্ভব ঘটেছে, বিচ্ছিন্নতার দাবীতে এদের জাতিগত ঐক্য কখনই বিনষ্ট হয়নি।

ধর্মগত পার্থক্য

ব্রিটেনের পাঁচ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৬০ জন প্রোটেস্টান্ট এবং বাকী ৪০ জন ক্যাথলিক। প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন ইংলন্ডের চার্চের (Church of England) অনুগামী। অন্যেরা একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন মত ও পথের সমর্থক। ইংলন্ডের চার্চই রাষ্ট্র স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র সমর্থিত সংস্থা এবং ব্রিটেনের রাজা বা রানীই ঐ সংস্থার প্রধান। ধর্মগত বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকা · এরা প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেনি। বিভিন্ন ধর্মমতের প্রতি সহনশীলতার এক উজ্জ্বল ঐতিহ্য ব্রিটেনে লক্ষ্য করা যায়।

শিল্পোন্নত

ব্রিটেন মূলত একটি শিল্প প্রধান দেশ। জনসংখ্যার মাত্র শতকরা চারজন কৃষিকার্যে নিযুক্ত। শতকরা ৫৫ জন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। বস্তুত ব্রিটেন পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শিল্পোন্নত দেশ। ব্রিটেনে জনসংখ্যার বেশির ভাগ শহুরে (urbanized), দেশের শতকরা সত্তর ভাগ লোক শহরে বাস করে। শিল্পপ্রধান দেশ হবার জন্য ব্রিটেনের জনগণের জীবনযাত্রার মান খুবই উন্নত।

সাগরবেষ্টিত দ্বীপপুঞ্জ বলে ব্রিটেন সমুদ্র অভিযানের এক গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী। এর ফলে ব্রিটেন সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মূলকেন্দ্রে পরিণত হয়। কৃষিজাত উৎপাদনের স্বল্পতা, শিল্পজাত উপকরণের প্রাচুর্য, শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর অস্তিত্ব ইত্যাদি কারণে ব্রিটিশ জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপন করে

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বিগত তিনশ বছর ধরে ব্রিটেন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, ঔপনিবেশিক শোষণে এবং সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকাকে জর্জরিত করেছে। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বিশ্বরাজনীতির রঙ্গমঞ্চে ব্রিটেনের আর পূর্বেকার একচেটিয়া প্রাধান্য নেই—উপনিবেশগুলি একের পর এক স্বাধীন হয়ে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে।

উপনিবেশ স্থাপন ও সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তর

এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ব্রিটেনই ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অধিকারী এবং প্রধান রাষ্ট্রশক্তি। স্বভাবতই পৃথিবীর রাজনীতিতে ব্রিটেনের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এ ছাড়াও ব্রিটেন সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তক বলে সব দেশের সংবিধানের উপর ব্রিটিশ সংবিধানের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা এর জনসাধারণের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থায়িত্ব এবং সমজাতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ফসল। ইংরেজ সমাজের সমজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং রাজনৈতিক মতৈক্য ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব আনয়নে সাহায্য করেছে। পদ্ধতিগত এবং লক্ষ্যগত মতৈক্যের ফলে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা ও সমাজ বিগত একশ বছরের মধ্যে কোন চরমপন্থী পরিবর্তনের প্রভাব দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। ইংরেজ সমাজের সংস্কৃতির সমজাতীয়করণ (the homogenitization of culture) এর সদস্যদের রাজনৈতিক সংঘর্ষের পরিবর্তে আপোষের দিকে পরিচালিত করেছে।

১-২. ব্রিটিশ সংবিধানের উৎপত্তি ও বিকাশ
Origin and Growth of the British Constitution

ব্রিটিশ সংবিধান শত শত বছর ধরে বিরামহীন বিবর্তনের ফলশ্রুতি। হারম্যান ফাইনারের ভাষায় বলা যায় যে, ব্রিটিশ সংবিধান হল বিরতিহীন বিবর্তনমান সংবিধান (a constitution of never-ending evolution)। ব্রিটিশ সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সংবিধান। অনেকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে পরিষদীয় শাসনব্যবস্থার জননী (Mother of Parliaments) এবং ক্যাবিনেট প্রথার পথ প্রদর্শক বলে মনে করেন। সুতরাং ব্রিটিশ সংবিধানের বিকাশধারা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

পঞ্চম শতকে এ্যাংলো-স্যাক্সন উপজাতীয় লোকেরা মূল ইউরোপীয় ভূ-খণ্ড থেকে ইংলণ্ডে গিয়ে বসবাস শুরু করে এবং ঐ সময় থেকে সেখানে রাজতন্ত্র ও পরিষদীয় ব্যবস্থার বীজ অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ করে। পঞ্চম শতকের আগে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করার মত কিছু জানা যায় না। অধ্যাপক অগের (Ogg) ভাষায় বলা যায়, প্রথম যে সময় থেকে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক সংস্থার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় তা হল পঞ্চদশ শতকে নর্মান জাতির অনুপ্রবেশ ও প্রাধান্য বিস্তার। এ্যাংলো-স্যাক্সন উপজাতীয় লোকেরা ইংলণ্ডে বসবাস শুরু করে সাতটি রাজ্য (kingdom) প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুত ইংলণ্ডের সাংবিধানিক ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা 'রাজতন্ত্র'-এর সূত্রপাত ঐ এ্যাংলো-স্যাক্সন রাজত্বকালেই ঘটে। এ্যাংলো-স্যাক্সন রাজারা উত্তরাধিকার সূত্রেই রাজপদে

ইংলণ্ডে এ্যাংলো-স্যাক্সন বসবাস

অধিষ্ঠিত হতেন এবং এরা উইটান (witenagemot) নামক এক পরিষদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

উইটান

'উইটান'-কে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের পরিষদ (council of wise men) নামে অভিহিত করা যায়। এই পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হতেন না—রাজার দ্বারা মনোনীত হতেন। উত্তরাধিকার সূত্রেই রাজপদে অধিষ্ঠিত হবার ব্যবস্থা থাকলেও, আনুষ্ঠানিকভাবে উইটানই রাজাকে নির্বাচিত করতো। ঐ সময়ে কোন নির্দিষ্ট রাজধানী না থাকায় দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে ঐ পরিষদের অধিবেশন বসতো এবং রাজা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতেন। উইটানের কাজ বা দায়িত্ব নির্দিষ্ট ছিল না, তবে রাষ্ট্র এবং চার্চের সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরিচালনায় ঐ পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করা হত। উইটানকে পরবর্তীকালের 'গ্রেট কাউন্সিল' এবং বর্তমান ক্যাবিনেটের উৎস বলা যেতে পারে।

নর্মান বিজয়

বৃহত্তর পরিষদ

ক্ষুদ্র পরিষদ

একাদশ শতকে (১০৬৬) নর্মান্ডির উইলিয়াম ইংলণ্ড জয় করেন। নর্মান বিজয়ের পর থেকেই ইংলণ্ডে নর্মান রাজাদের ক্ষমতাবৃদ্ধি পেতে থাকে এবং রাজারা কর্তৃত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। এতদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডে সামন্ত-প্রথা বিকাশ লাভ করতে পারেনি। কিন্তু নর্মান আমলে রাজার স্বার্থে একটি সংগঠিত রাজনৈতিক রূপ হিসাবে সামন্তবাদ বিকশিত হয়। নর্মান শাসনে 'উইটান' 'বৃহত্তর পরিষদ' (Magnum Concilium) নামে পরিচিত হয় এবং তখন থেকেই ঐ সংস্থা রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত এবং আইন প্রণয়ন, কর ধার্য প্রভৃতির মন্ত্রণাসভায় পরিণত হয়। ঐ বৃহত্তর পরিষদের অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে দৈনন্দিন কাজকর্মে রাজাকে সহায়তা করার জন্য 'ক্ষুদ্র পরিষদ' (Curia Regis) নামে আর একটি পরিষদ ছিল। পরবর্তীকালে বৃহত্তর পরিষদ থেকে পার্লামেন্টের উৎপত্তি ঘটে। দ্বাদশ শতকে দ্বিতীয় হেনরীর রাজত্বকালে সর্বপ্রথম বিচার ও শাসনবিভাগকে পৃথক করা হয় এবং ক্ষুদ্রতর পরিষদ ভেঙ্গে প্রিভি কাউন্সিল ও উচ্চ আদালতের সৃষ্টি হয়।

স্থায়ী পরিষদ ও প্রিভি কাউন্সিল

পরবর্তীকালে ক্ষুদ্র পরিষদ 'স্থায়ী পরিষদ' (Permanent Council) নামে পরিচিত হয়। স্থায়ী পরিষদের সদস্য সংখ্যা বেড়ে বেড়ে বিশাল আকার ধারণ করে। পঞ্চদশ শতকে তাই স্থায়ী পরিষদের মধ্যেই প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council) নামে একটি ক্ষুদ্র ও কার্যকর সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে প্রিভি কাউন্সিলের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে ক্যাবিনেটের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

মহাসনদ

১২১৫ সালে রাজা জন অঙ্গীকার করতে বাধ্য হন যে, তিনি বৃহত্তর পরিষদের সম্মতি না নিয়ে কয়েকটি বিশেষ কর আদায় করতে পারবেন না। এটাই সংবিধানের ইতিহাসে 'মহাসনদ' বা *Magna Carta* নামে বিখ্যাত। যদিও ঐ মহাসনদে সমাজের নীচুতলার মানুষের অধিকারের কোন স্বীকৃতি ছিল না এবং যাজক, অভিজাত ও ভূস্বামী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের স্বার্থে প্রচলিত অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল ঐ সনদের মূল উদ্দেশ্য—কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে ঐ মহাসনদই ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার পথে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ

পদক্ষেপ। কারণ, মহাসনদের দ্বারা এ নীতি প্রতিষ্ঠিত হল যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার আগে রাজাকে পরিষদের সম্মতি অবশ্যই নিতে হবে।

তৃতীয় হেনরীর রাজত্বকালে বৃহত্তর পরিষদ 'পার্লামেন্ট' নামে পরিচিত হতে থাকে। ১২৫৪ সালে তৃতীয় হেনরী জরুরী আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রতি জেলা থেকে দুইজন করে নাইটদের সভা আহ্বান করেন। কিন্তু বিপুল সংখ্যক ব্যারন (Barons) নতুন কর ধার্যের বিরোধিতা করেন এবং রাজার সঙ্গে এ বিরোধে ব্যারনগণ ও তাদের নেতা সাইমন ডি. মণ্টফোর্ট (Simon de Montfort) জয়ী হন। ১২৬৫ সালে মণ্টফোর্ট পার্লামেন্টের অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও প্রতি কাউন্টি (County) থেকে দুজন করে নাইটস্ (Knights) এবং প্রতি বুরো (Borough) থেকে দুজন করে বার্জেস (Burgess) আহ্বান করেন। ১২৯৫ সালে রাজা প্রথম এডওয়ার্ডও আগেকার নীতি অনুসরণ করে যাজক, ভূস্বামী ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং নাইট-বার্জেসদের আহ্বান করে পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকেন। সংবিধানের ইতিহাসে এটাই মডেল পার্লামেন্ট (Model Parliament) নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঐ সময়ে পার্লামেন্ট আহ্বান করার মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের খরচা মেটাবার জন্য নতুন নতুন কর ধার্য করা।

পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান

বৃহত্তর পরিষদ পার্লামেন্টে রূপান্তরিত হবার পর দেখা গেল যে, অভিজাত সম্প্রদায়, যাজক সম্প্রদায় এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গ একই পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগ দিয়ে আলাদা আলাদা আসন গ্রহণ করতো এবং নিজ নিজ শ্রেণীস্বার্থ অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে ভোট দিত। এরূপ অবস্থার ফলে চতুর্দশ শতকের শেষ দিক থেকে পার্লামেন্টের দ্বিপরিষদীয় ব্যবস্থা স্থায়ীরূপ লাভ করে এবং ফলে কমন্সসভা ও লর্ডসভার উদ্ভব ঘটে। প্রথমদিকে কমন্সসভার আইন প্রণয়নের কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু ১৪৮৫ সালে গোলাপের যুদ্ধের সময় (War of Roses) যখন অভিজাত সম্প্রদায় পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত ছিল, সে সময় ঐ সুযোগে কমন্সসভা নিজের শক্তি সঞ্চয় করে কিছু পরিমাণ ক্ষমতা দখল করে নেয়।

লর্ডসভা ও কমন্সসভার উদ্ভব

প্রথমদিকে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন এবং অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ক্ষমতা ছিল না। পঞ্চদশ শতকে সরকারী অর্থের উপর পার্লামেন্টের কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্থির হয় যে পার্লামেন্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজা কোন আইন পাশ করবেন না। ঐ সময় পর্যন্ত পার্লামেন্টের অধিবেশন হত অনিয়মিতভাবে এবং পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা বা না-করা রাজার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। চরম রাজতন্ত্রের ধারক অথচ জনপ্রিয় রাজা সপ্তম হেনরী, অষ্টম হেনরী এবং প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে পার্লামেন্ট নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

নিষ্প্রভ পার্লামেন্ট

সপ্তদশ শতকে স্টুয়ার্টদের রাজত্বকাল ব্রিটিশ সংবিধানের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্টুয়ার্ট বংশের প্রথম রাজা প্রথম জেমস্ 'রাজার ঈশ্বরদত্ত অধিকারের তত্ত্ব'-এ (Theory of Divine Right of Kings) বিশ্বাসী ছিলেন। স্টুয়ার্ট রাজারা পার্লামেন্টের ক্ষমতা খর্ব করে রাজার অধিকার প্রসারিত করায় প্রয়াসী ছিলেন। প্রথম জেমস তাঁর

রাজত্বকালের বেশির ভাগ সময়ই পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেননি। ১৬২৮ সালে চার্লসের রাজত্বকালে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে স্টুয়ার্ট রাজাদের স্বেচ্ছাচারিতার নিন্দা করে অধিকারের আবেদন (Petition of Rights) উত্থাপন করে। প্রথম চার্লস ব্যক্তিগত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে সম্মতি দেন যে পার্লামেন্টের অনুমতি না নিয়ে তিনি কোন কর আদায় করবেন না। কিন্তু চার্লসকে সমর্থন করার প্রশ্নে ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং প্রথম চার্লসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

প্রথম জেমস্ ও প্রথম চার্লস

ঐ সময়ে এগার বছরের জন্য ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র ও লর্ডসভার অবলুপ্তি ঘটে এবং অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে রিপাবলিকান শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে। কিন্তু ক্রমওয়েলও আগেকার স্টুয়ার্ট রাজাদের মত পার্লামেন্টের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর সাথে সাথে রিপাবলিকের পরিবর্তে ইংলণ্ডে আবার রাজতন্ত্র ফিরে আসে এবং স্টুয়ার্ট বংশের দ্বিতীয় চার্লস ক্ষমতায় আসীন হন।

ক্রমওয়েল ও রিপাবলিক

পার্লামেন্টের সঙ্গে স্টুয়ার্ট রাজাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি ঘটে ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের (Glorious Revolution) মধ্য দিয়ে। ঐ সময় স্টুয়ার্ট রাজা দ্বিতীয় জেমস্ দেশ থেকে বিতাড়িত হন এবং ফলে স্টুয়ার্ট রাজবংশের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৬৮৯ সালে উইলিয়াম মেরী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বিনা রক্তপাতে ঐতিহাসিক গৌরবময় বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটে।

গৌরবময় বিপ্লব

রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে যাতে আর কোন দ্বন্দ্ব দেখা না দেয় তার জন্য পার্লামেন্ট 'অধিকারের বিল' (Bill of Rights) বিধিবদ্ধ করে। অধিকারের এ মহান্ সনদ গৃহীত হবার ফলে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পার্লামেন্টের প্রাধান্য স্বীকৃত হল এবং স্থির হল যে পার্লামেন্টের অনুমোদন বাদে রাজা কর আদায় করতে এবং নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। 'অধিকারের বিল' গৃহীত হবার ফলে রাজার ক্ষমতার অবসান ঘটে। এরপর ধীরে ধীরে ক্যাবিনেট প্রথার সূত্রপাত ঘটে এবং রাজার ক্ষমতা সীমিত হয়ে ধীরে ধীরে মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্টের ক্ষমতা বাড়তে থাকে।

অধিকারের বিল

ব্রিটিশ সংবিধানের পরবর্তী ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাবে যে, ব্রিটিশ সংবিধানের বিরামহীন বিবর্তনের এক-একটি স্তরে ক্যাবিনেট প্রথা, প্রধানমন্ত্রী, রাজনৈতিক দল, রাজার অনুগত বিরোধী দল ইত্যাদির উদ্ভব ঘটে। এছাড়াও ধীরে ধীরে অন্যদিকে রাজশক্তি ও লর্ডসভার ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পায়, দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার প্রবর্তন হয়, ভোটাধিকারের প্রসার ঘটে, প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং কমন্সসভার গণতন্ত্রীকরণ ঘটে।

১-৩. ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস
Sources of the British Constitution

ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস আলোচনা করার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন যে একটিমাত্র লিখিত ও বিধিবদ্ধ দলিলে ব্রিটিশ সংবিধানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র ইজরায়েল এবং ব্রিটেনেই একটিমাত্র দলিলে সাংবিধানিক

নিয়ম-কানুনকে বিধিবদ্ধ করা হয়নি। ব্রিটেনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা জানতে হলে সংবিধানের বিভিন্ন উৎস খুঁজে দেখতে হবে—ভারত বা অন্যান্য রাষ্ট্রের মত একটি দলিলে বিধিবদ্ধ অবস্থায় তা পাওয়া যাবে না।

ব্রিটিশ সংবিধান সামগ্রিকভাবে লিখিত ও বিধিবদ্ধ না হলেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক সনদ্, চুক্তি, পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ বিভিন্ন আইন, শাসনতান্ত্রিক রীতি নীতি, বিচারকদের রায় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সংবিধানের প্রকাশ ঘটেছে। যে সব উপাদান ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস হিসাবে কাজ করেছে তা নীচে আলোচনা করা হল।

১. **ঐতিহাসিক সনদসমূহ** (Historical Charters)

ব্রিটিশ সংবিধানের উৎসগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক সনদের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সনদগুলির মধ্যে **ম্যাগনা কার্টা** (Magna Carta) ব্রিটিশ সাংবিধানিক ইতিহাসে অনন্যস্থানের অধিকারী। আপাতদৃষ্টিতে ম্যাগনা কার্টাকে (১২২৫) প্রচলিত সামন্ত-প্রথা সংক্রান্ত নিয়মাবলীর বর্ণনা বলে মনে হলেও বাস্তবে এটা তৎকালীন সমাজ বিকাশের স্তর অনুযায়ী ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্যবান দলিল। ম্যাগনা কার্টার মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম এ নীতি ধ্বনিত হয় যে রাজা আইনের ঊর্ধ্বে নয় এবং দেশের আইন ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে আটক করা, জেলে আটক রাখা বা বিতাড়ন করা চলবে না। ব্রিটেনে যখনই রাজারা তাদের এক্তিয়ারের বাইরে ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন, তখনই ব্রিটিশ জাতি ম্যাগনা কার্টার ঐ নীতির দ্বারা তা বাধাদানের চেষ্টা করেছেন। মানুষের অধিকারের ইতিহাসে ম্যাগনা কার্টার স্থান স্মরণীয়। সমাজ বিকাশের স্তরের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে কিভাবে অধিকারের ধারণা ও দাবি সংক্রান্ত সনদ গড়ে ওঠে, ম্যাগনা কার্টা তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

ব্রিটেনের আর একটি ঐতিহাসিক সনদ হল ১৬২৮ সালের **অধিকারের আবেদনপত্র** (Petition of Rights)। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে ১৬২৮ সালে রাজা প্রথম চার্লসের নিকট রাজকীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে এবং পার্লামেণ্টের সদস্যদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত একটি আবেদনপত্র উপস্থিত করে। প্রথম চার্লস ঐ আবেদনপত্র মান্য করতে স্বীকৃত হন। রাজার স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করে পার্লামেণ্টের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে 'অধিকারের আবেদনপত্র' একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

ব্রিটেনে গৌরবজনক বিপ্লবের সফল পরিণতির পরে ১৬৮৯ সালে পার্লামেণ্ট একটি **অধিকারের বিল** (Bill of Rights) বিধিবদ্ধ করে। ভবিষ্যতে যাতে রাজার সাথে পার্লামেণ্টের বিরোধের আর কোন সুযোগ না থাকে সেজন্য 'অধিকারের বিল'-এ সুস্পষ্টভাবে পার্লামেণ্টের শ্রেষ্ঠত্ব (Supremacy of the Parliament) নিশ্চিত করা হয় এবং বলা হয় যে পার্লামেণ্টের সম্মতি না নিয়ে রাজা কোনরূপ কর ধার্য করতে পারবেন না এবং তাঁকে নিয়মিতভাবে পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করতে হবে। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় এ সব সনদের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. **বিধিবদ্ধ আইন** (Statutes)

পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইনগুলি ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অন্যতম উৎস। ব্রিটেনে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিচারব্যবস্থার পত্তন ঘটে ১৩৬১ সালে গৃহীত 'জাষ্টিজ্ অব দ্যা পীস অ্যাক্ট' (*Justice of the Peace Act, 1361*) দ্বারা। ১৭০১ সালে অ্যাক্ট

অব্ সেটেলমেণ্ট (*The Act of Settlement, 1701*) বিধিবদ্ধ হয়। ঐ আইনের দ্বারা সিংহাসনের উত্তরাধিকার নির্দিষ্ট করা হয়, পার্লামেণ্টের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা যাবে না স্থির করা হয় এবং বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। উপরোক্ত আইনগুলি ব্যতীত ১৬৭৯ সালের 'হেবিয়াস কর্পাস অ্যাকট' (*Habeas Corpus Acts*), ১৮৩২, ১৮৬৭ এবং ১৮৮৪ সালের সংস্কার আইনসমূহ (*The Reform Acts*), ১৯৩৮ সালের জন-প্রতিনিধিত্ব আইন (*The Representation of the People Act*) ইত্যাদির নাম সংবিধানের উৎস হিসাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১১ এবং ১৯৪৯ সালের পার্লামেণ্ট অ্যাকট (*The Parliamentary Acts of 1911 and 1949*) ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐ দুটি আইন কমন্সসভার ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড সভার ক্ষমতার পরিবর্তন এবং হ্রাস করে। উপরোক্ত আইনগুলি এবং আরও অনেক বিধিবদ্ধ আইনের মধ্যে ব্রিটিশ সাংবিধানিক ব্যবস্থা ছড়িয়ে আছে।

৩. **বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত** (Judicial Decisions)

ব্রিটেনে বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত বা বিচারকদের রায় ও ব্যাখ্যার (interpretation) দ্বারা বহু সাংবিধানিক আইনের উৎপত্তি ঘটেছে। বিভিন্ন সনদ, প্রথাগত আইন এবং বিধিবদ্ধ আইনের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বিচারকেরা বিভিন্ন সময়ে নতুন সাংবিধানিক আইনের সৃষ্টি করেছেন। আবার, বিভিন্ন মামলার (Case Law) বিচার করতে গিয়ে বিচারকেরা এমন অনেক রায় দিয়েছেন যা সাংবিধানিক আইনের উৎস হিসাবে দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৬০৬ সালে জন বেটসের অভিযোগ বিচার করে আদালত ঘোষণা করে যে, আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর কর আরোপের বিশেষাধিকার রাজার আছে। ১৬৭০ সালে বাসেলস্ মামলায় বিচারকদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। সমারসেট মামলার রায় দিয়ে আদালত ব্রিটেনে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ ঘোষণা করে। সম্প্রতি (১৯৬৮) কনওয়ে বনাম রিমার (Conway v. Rimmer) মামলায় রায়ে বলা হয় যে, জনস্বার্থ বিরোধী হবে মনে করে সরকার যদি কোন দলিল বা কাগজপত্র (documents) প্রকাশ্যে উপস্থিত করতে আপত্তি জানায় তবে আদালত নিজে ঐ কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখার অধিকারী।

৪. **সাংবিধানিক আইন সংক্রান্ত পুস্তক** (Text Books on Constitutional Law)

সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং আইনবিদ্ কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক আইন ও শাসনতন্ত্র সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন প্রামাণ্য পুস্তকাদি ব্রিটিশ সংবিধানের উল্লেখযোগ্য উপাদান। বস্তুত পৃথিবীতে সাংবিধানিক আইন এবং শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং পণ্ডিতদের অবদান অনস্বীকার্য। উইলিয়াম ব্লাকষ্টোনের *Commentaries on the Laws of England* পুস্তকের মধ্য দিয়েই 'রাজা কোন অন্যায় করতে পারেন না' (The king can do no wrong) এবং 'রাজার মৃত্যু নাই' (The king never dies) ইত্যাদি সাংবিধানিক নীতিগুলির প্রকাশ ঘটে। ডাইসীর *Law of the Constitution*-এ আইনের অনুশাসনের (Rule of Law) ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং ঐ পুস্তকে তিনি ব্রিটেনের রাজনৈতিক সংস্থাগুলির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেন। এ ছাড়াও ওয়াল্টার বেজহটের *The English Constitution*, স্যার আরস্কিন মে'র *Parliamentary Practice*, আইভর জেনিংসের *The British Constitution*,

হ্যারল্ড লাস্কির একাধিক বই ব্রিটিশ সাংবিধানিক আইনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ব্রিটিশ সংবিধান বিচার, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে ঐ সব মৌলিক ও প্রামাণ্য বই-এর মূল্য অপরিসীম। বস্তুত বলা যায় যে, ঐ সব পণ্ডিতদের চিন্তা ও বক্তব্য দ্বারা ব্রিটিশ সংবিধান বহুলাংশে রূপ লাভ (shaped) করেছে।

৫. **প্রথাগত আইন** (Common Law)

প্রথাগত আইন বলতে এমন কতকগুলি প্রচলিত ও প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক আচার-পদ্ধতি ও রীতিনীতিকে বুঝায় যা যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছে। এ সব সাংবিধানিক আচার-পদ্ধতি ও রীতিনীতিগুলি কখনই আইনসভার দ্বারা রচিত ও বিধিবদ্ধ হয়নি, কিন্তু পরবর্তীকালে বিচারবিভাগ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে এগুলি সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা লাভ করেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, রাজার বিশেষাধিকারগুলি, জুরির সাহায্যে বিচারের অধিকার, জনগণের বাক্ ও মতামত প্রকাশের অধিকার ইত্যাদির উৎস হল ব্রিটেনের প্রথাগত আইন। প্রথাগত আইনগুলি সাধারণভাবে অলিখিত। তবে বিভিন্ন প্রতিবেদন (Report), আদালতের রায় ইত্যাদির মধ্যে কোন কোন প্রথাগত আইনকে লিখিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।

৬. **শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি** (Conventions)

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল শাসনতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক রীতিনীতির। জন্ স্টুয়ার্ট মিল শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিকে 'শাসনতন্ত্রের অলিখিত বিধান' (unwritten maxims of the constitution) বলে অভিহিত করেছেন। হারম্যান ফাইনার শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন যে, এগুলি হল রাজনৈতিক ব্যবহারের এমন কতকগুলি বিধি যা বিধিবদ্ধ আইন, বিচারকের রায় বা সংসদীয় প্রথা হিসাবে স্বীকৃত নয়, কিন্তু এগুলির পরিপূরক হিসাবে গড়ে উঠেছে (Conventions are rules of political behaviour not established in statutes, judicial decisions, or parliamentary customs but created outside these, supplementing them in order to achieve objects they have not got embodied)। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি বলতে আমরা সেসব নিয়ম ও বিধিনিষেধগুলির কথা বলি শাসনব্যবস্থা কার্যকর করতে গিয়ে যাদের উদ্ভব ঘটে, অথচ যারা সে অর্থে সাংবিধানিক আইন নয় এবং আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও শাসন ও প্রশাসনকার্যে নিযুক্ত সকলেই শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মানতে বাধ্য।

ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস হিসেবে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, ব্রিটেনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন এসেছে সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্য দিয়ে। ব্রিটেনে সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যা অন্যান্য দেশে সাংবিধানিক আইনের মধ্যে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। ব্রিটেনে রাজশক্তির ক্ষমতা, ক্যাবিনেট ব্যবস্থা, সংসদের কার্য পদ্ধতি, কমনওয়েলথ সংক্রান্ত বিষয়বস্তু ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক বিধি সাংবিধানিক রীতিনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। বস্তুত শাসনতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক রীতিনীতিই ব্রিটেনের সংবিধানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস।[১]

১. এই অধ্যায়ে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১-৪. ব্রিটিশ সংবিধানের অস্তিত্ব আছে কি ?
Does the British Constitution exist ?

ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস আলোচনাকালে আমরা দেখেছি যে, কোন একটি লিখিত দলিলে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হয়নি—বিভিন্ন লিখিত দলিল এবং অলিখিত রীতিনীতি ও প্রথা ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস। বস্তুত সংবিধান বলতে যদি আমরা লিখিত এবং বিধিবদ্ধ (codified) একটি দলিলকে বুঝি তবে ঐ অর্থে ব্রিটেনে সংবিধানের অস্তিত্ব আছে কিনা সে বিষয়ে সংশয় জাগা স্বাভাবিক।

সংশয়

উপরোক্ত কারণে টক্‌ভিল (Tocqueville)-এর মত সংবিধান বিশেষজ্ঞ স্বীকার করেন না যে ব্রিটিশ সংবিধানের অস্তিত্ব আছে (In England the constitution does not exist)। ব্রিটিশ সাংবিধানিক ব্যবস্থার সমর্থনে এডমণ্ড বার্কের শক্তিশালী যুক্তির উত্তরে টমাস পেইন (Thomas Paine) বলেছিলেন : মিঃ বার্ক কী ব্রিটিশ সংবিধান নামক বস্তুটিকে আমায় দেখাতে পারেন ? তাঁর মতে, ব্রিটিশ সংবিধান নিয়ে অনেক বাক্যজাল রচনা করা হয়, যদিও বাস্তবে ব্রিটিশ সংবিধান বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।[১] বার্ণাড 'শ (Bernard Shaw) একই মত ব্যক্ত করে বলেছেন, আমাদের নাকি একটি সংবিধান আছে, অথচ কেউ জানে না যে কী সে সংবিধান এবং কোথাও তার লিখিত অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না।

টক্‌ভিল, পেইন এবং 'শ-এর মত

টক্‌ভিল, টমাস পেইন, বার্ণাড 'শ প্রমুখের ব্রিটিশ সংবিধানের অস্তিত্ব সম্পর্কে এরূপ সংশয়মূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার কারণগুলি হল : ১. ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থাকে একটি মাত্র দলিলে লিখিতভাবে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন আইনে বিধিবদ্ধ করা হয়নি ; ২ ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস অনেক—লিখিত বহু দলিল ও বিধিবদ্ধ আইনে এবং অলিখিত বহু প্রথা ও রীতিনীতির মধ্যে সাংবিধানিক নিয়ম-কানুন ছড়িয়ে আছে ; ৩ ব্রিটিশ সংবিধান পরিবর্তনের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় না, অন্যান্য সাধারণ আইনের মত ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট একে সহজে এবং যে কোন সময়ে পরিবর্তন করতে পারে।

সংশয়ের কারণ

কিন্তু জেনিংস (Jennings), মুনরো (Munro) প্রমুখ সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ উপরোক্ত বক্তব্য এবং সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নন। সাধারণভাবে ইংরেজ জাতিও ব্রিটিশ সংবিধানের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন রকম সংশয় প্রকাশ করে না, বরং গর্ব প্রকাশ করে বলেন যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম সংবিধানের ছত্র ছায়ায় তাঁরা বাস করেন। মুনরো মনে করেন যে, ব্রিটেনে সংবিধানের অস্তিত্ব আছে কিনা এ সম্পর্কে বিরোধের মূলে রয়েছে সংবিধান কাকে বলে তা নিয়ে মতবিরোধ (It is merely a question of what you mean by a constitution)। টক্‌ভিল, টমাস পেইন ইত্যাদি পণ্ডিতেরা সংবিধানকে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করেছেন বলে

অন্যদিকের বক্তব্য

---

১. "Can Mr. Burke produce the British Constitution ? If he cannot. we may fairly conclude that though it has been so much talked about, no such thing as a constitution exists or ever did exist."—Reflections on the French Revolution

লিখিত ও বিধিবদ্ধ আইনের বাইরেও যে সংবিধানের পদচারণা ঘটতে পারে এ কথা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। অর্থাৎ সংবিধানকে খুবই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার এবং সীমিত পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ রাখার জন্যই উপরোক্ত পণ্ডিতগণ ব্রিটিশ সংবিধানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

মুনরো যথার্থই বলেছেন যে, সংবিধান কাকে বলে এ ব্যাপারে মত পার্থক্যের জন্যই ব্রিটিশ সংবিধানের অস্তিত্ব সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিয়েছে। কোন সংসদ বা সম্মেলনে (convention) লিখিত, বিধিবদ্ধ ও গৃহীত দলিলকেই যদি কেবলমাত্র সংবিধানের মর্যাদা দেওয়া হয়, তবে ব্রিটিশ সংবিধানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ অবশ্যই থাকে। কিন্তু সংবিধানের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্পর্কে এরূপ ব্যাখ্যা খুবই সংকীর্ণ। তাই অনেকে সংবিধানকে এরূপ সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করার বিরোধী। তাঁরা মনে করেন, কোন দেশের শাসনব্যবস্থা লিখিত এবং অলিখিত উভয়ই হতে পারে—১. অলিখিত হলেই শাসনব্যবস্থার মর্যাদা ও গুরুত্ব হ্রাস পায় না। ২. শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যেসব রীতিনীতি ও সাংবিধানিক প্রথা গড়ে ওঠে সেগুলিও সংবিধানের অঙ্গ। এসব সাংবিধানিক রীতিনীতি ও প্রথাগুলি লিখিত ও বিধিবদ্ধ নয় বলে সংবিধানের অঙ্গ নয়—এ যুক্তি তাঁরা স্বীকার করেন না। ৩. কোন সংবিধান সহজ পরিবর্তনশীল হলে বা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে এর সংশোধন করা হলে সংবিধানের মর্যাদা হ্রাস হয় বলে তাঁরা মনে করেন না।

ব্রিটিশ সংবিধানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যুগ যুগ ধরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে বলে একটিমাত্র দলিলে একে বিধিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ঐকারণে ব্রিটিশ সংবিধানের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ব্রিটেনে ঐতিহাসিক প্রয়োজন ও পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সনদ (Charters) গৃহীত হয়েছে, উদ্ভব ঘটেছে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও সংসদীয় প্রথার। এগুলির সাথে বিচারকদের সিদ্ধান্ত, পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিবদ্ধ সাংবিধানিক আইন ইত্যাদি যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার আত্মপ্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছে এবং ইংরাজ জাতি ঐসব রীতিনীতি, প্রথা, আইন ও সনদকে মৌল সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা দেয়। মুনরো মনে করেন যে, কোন জনসমাজ যদি কোন আইন, বিধি-নিষেধ ও প্রথাকে শাসনব্যবস্থার ভিত্তি বলে মনে করে তবে তাই তাদের সংবিধান (If certain rules, provisions, and customs are accepted by the people as the basis of government, then they have a Constitution.)

ব্রিটিশ সংবিধানের চরিত্র

সুতরাং বলা যায়, যদিও ব্রিটিশ সংবিধান মূলত অলিখিত, যদিও এর লিখিত অংশগুলি একটিমাত্র দলিলে লিপিবদ্ধ অবস্থায় নেই এবং যদিও ব্রিটিশ সংবিধান সহজ পরিবর্তনশীল—তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সংবিধানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। জেনিংস যথার্থই বলেছেন যে, সংবিধান বলতে যদি প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ণনামূলক দলিলকে না বুঝিয়ে আসল প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়, তবে ব্রিটেনে সংবিধান আছে—যদিও কোন দলিল নেই।

এছাড়াও সংবিধানের ছাত্র হিসাবে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন সংবিধানই

পরিপূর্ণভাবে লিখিত এবং সম্পূর্ণভাবে অলিখিত হতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান যদিও লিখিত এবং সে অর্থে মর্যাদা-সম্পন্ন—কিন্তু সেখানেও অলিখিত অনেক বিষয়বস্তু শাসনব্যবস্থার অংশ হিসাবে স্বীকৃত। যেমন, দলীয় ব্যবস্থা, রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ও ক্ষমতা, ক্যাবিনেটের গঠন, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ক্ষমতা, কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধির কথা সংবিধানের কোথাও উল্লেখ করা হয় নি—এগুলির উৎপত্তি ঘটেছে ধারা, রীতি ও প্রথাকে (usages and customs) কেন্দ্র করে। এজন্য মার্কিন সংবিধানকে লিখিত না বলে 'বহুলাংশে লিখিত' এবং ব্রিটিশ সংবিধানকে অলিখিত না বলে 'বহুলাংশে অলিখিত' বলাই যুক্তিসঙ্গত।

কোন সংবিধানই সম্পূর্ণভাবে লিখিত নয়

অধ্যাপক অগ্ তাই মন্তব্য করেছেন যে, মার্কিন সংবিধানের লিখিত দশ পৃষ্ঠা পড়ে সেখানকার শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বোঝা যায় না, এর জন্য অলিখিত অনেক রীতি-নীতি ও প্রথার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। মুনরোও মনে করেন যে, একটিমাত্র লিখিত দলিলে মার্কিন সংবিধানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে একথা সত্য নয়। লিখিত ৮৯টি বাক্যের মধ্যে মার্কিন শাসনব্যবস্থার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা নয়, যে কোন শাসনব্যবস্থাই অলিখিত রীতি ও প্রথার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল থাকে। পার্থক্য হল এই যে, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত অলিখিত বিষয়বস্তু ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা বেশি।

মার্কিন সংবিধানও অনেকাংশে অলিখিত

সুতরাং মুল কথা, ... ল, টক্‌ভিল বা টমাস পেইন বা বার্নার্ড শ যাই বলুন না কেন, ব্রিটিশ সংবিধানের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। সংবিধান বা Constitution-এর উৎপত্তি যে ল্যাটিন শব্দ থেকে ঘটেছে তার অর্থ 'প্রতিষ্ঠা করা'। ঐ অর্থ অনুযায়ী সংবিধানের ভিত্তি হিসাবে যা প্রতিষ্ঠিত তাই সংবিধান—তা লিখিত হোক বা অলিখিত হোক, তা একটিমাত্র দলিলে লিপিবদ্ধ থাক বা বিভিন্ন দলিলে ছড়িয়ে থাক। উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, ব্রিটিশ সংবিধানের অস্তিত্ব একটি সন্দেহাতীত ঘটনা, যদিও তা লিখিত ও বিধিবদ্ধ (codified) নয়। প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের সংবিধানই সম্পূর্ণরূপে লিখিত ও বিধিবদ্ধ নয় এবং হওয়া সম্ভব নয়।

ব্রিটিশ সংবিধানের অস্তিত্ব আছে

১-৬. ব্রিটিশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of the British Constitution

প্রতিটি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাকে বা সংবিধানকে আমরা সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও সরকারী ক্ষমতাসীন ব্যক্তির কার্য, ক্ষমতা ও দায়িত্ব এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক সংক্রান্ত বিধি ও নিয়মাবলী বলে অভিহিত করেছি। কার্য ও কাঠামোর দিক থেকে প্রতিটি রাষ্ট্রের সংবিধানের মধ্যেই কিছু কিছু সাদৃশ্যমূলক উপাদান ও সাধারণ ধর্ম (common characteristics) লক্ষ্য করা যায় এবং এগুলিকে গতানুগতিক বৈশিষ্ট্য বলা যায়। যেমন, সংবিধানটি লিখিত না অলিখিত ; এটি এককেন্দ্রিক, না যুক্তরাষ্ট্রীয় ; এটি সহজ পরিবর্তনশীল, না দুষ্পরিবর্তনশীল। কিন্তু এ বৈশিষ্ট্যগুলি কোন শাসনব্যবস্থার

মৌল বৈশিষ্ট্যের পর্যায়ে পড়ে না। অন্যদিকে প্রতিটি সংবিধানেই এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যা মৌল সাংবিধানিক নীতি (basic constitutional principles) হিসাবে সে সংবিধানকে অনন্যতা দান করে। যেমন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা এবং আইনের অনুশাসনকে (Rule of Law) ব্রিটিশ সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্য বলা যায়। প্রতিটি সংবিধানই সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এ ধরনের কিছু কিছু একান্ত নিজস্ব ও মৌল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

কোন রাষ্ট্রের সংবিধান আলোচনার আগে এর সাধারণ ও মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝা বিশেষ প্রয়োজন। ব্রিটিশ সংবিধান পাঠের ক্ষেত্রে এ বক্তব্য আরও বেশি প্রয়োজ্য। কারণ ব্রিটিশ সংবিধানকে অন্যান্য সংবিধানের জননী বলে অভিহিত করা হয়।[১] পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রের সংবিধানের ধারা মূলত ব্রিটিশ সংবিধান থেকে প্রবাহিত হবার জন্য ব্রিটিশ সংবিধানের সাধারণ ও মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নীচে আমরা ব্রিটিশ সংবিধানের **সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি** আলোচনা করছি ঃ

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১. **অসংকলিত ও বহুলাংশে অলিখিত** (Uncodified and Mostly Unwritten)

কোন রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত, না অলিখিত—এটাকে সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে আলোচনা করা একটা রীতিতে দাঁড়িয়েছে। আমাদের মতে কোন রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত না অলিখিত এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ ব্রিটেন এবং ইজরায়েল ছাড়া পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সংবিধানই লিখিত। সুতরাং বলা যায়, সংবিধান লিখিত হওয়াই সাধারণ রীতি, অলিখিত হওয়া ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম বলেই ব্রিটিশ সংবিধানের এ বৈশিষ্ট্যটির আলোচনা প্রয়োজন।

সাধারণভাবে ব্রিটিশ সংবিধানকে অলিখিত সংবিধান হিসাবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু আমরা মনে করি একে অলিখিত না বলে অসংকলিত বা সংহতাকারে লিপিবদ্ধ নয় (uncodified)—এরূপ বলাই সংগত। সংবিধান বিধিবদ্ধ করার বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত কোন সভা বা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ও বিধিবদ্ধ একটি লিখিত দলিলে ব্রিটিশ সংবিধানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। কয়েক শতকের সাংবিধানিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সংবিধান গড়ে উঠেছে। একদিকে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা এবং অন্যদিকে শত শত লিখিত দলিলের মধ্যে ব্রিটেনের সাংবিধানিক নিয়মকানুন ছড়িয়ে আছে। সুতরাং বলা যায় যে, সংবিধান বলতে একটি দলিলে সংকলিত ও বিধিবদ্ধ যে নিয়ম-কানুনকে আমরা বুঝি ব্রিটিশ সংবিধান সেরূপ নয়। সাধারণ আইন থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন কোন একটি সাংবিধানিক দলিলে ব্রিটিশ সংবিধানকে সংকলিত ও বিধিবদ্ধ করা হয়নি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা ঠিক হবে না যে ব্রিটিশ সংবিধান সম্পূর্ণভাবে অলিখিত বা অসংকলিত। ব্রিটেনের বিভিন্ন সাংবিধানিক নীতি বিভিন্ন আইনের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তাই এটা বলাই সঙ্গত হবে যে, ব্রিটেনে লিখিত ও বিধিবদ্ধ সাংবিধানিক আইনের

১. "The British Constitution is the mother of all Constitutions"—The Government of Europe, W. B. Munro.

চেয়ে অলিখিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রথার সংখ্যা খুব বেশি এবং সাংবিধানিক ক্ষেত্রে এরা প্রভূত গুরুত্বের অধিকারী। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রের সংবিধানই 'সম্পূর্ণভাবে লিখিত' বা 'সম্পূর্ণভাবে অলিখিত' হতে পারে না। তাই ব্রিটিশ সংবিধানকে 'অলিখিত' না বলে অসংকলিত (uncodified) এবং বহুলাংশে অলিখিত ও বহুস্থানে বিক্ষিপ্ত বললেই হয়তো বাস্তবের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্য রক্ষা করা হবে। এস. ই. ফাইনারও মনে করেন যে, প্রাচীন রীতি অবলম্বন করে সংবিধানকে লিখিত, অলিখিত এরূপ বিশ্লেষণ না করে এটা সংকলিত, না অসংকলিত এভাবেই বিশ্লেষণ করা উচিত।

২. **সহজ পরিবর্তনশীল বা নমনীয়** (Flexible)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে ব্রিটিশ সংবিধানকে সবচেয়ে সুপরিবর্তনীয় বা সহজ পারবর্তনশীল বলে মনে করা হয়। যে সংবিধান পরিবর্তন করতে কোন জটিল ও কষ্টকর পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় না—যা সহজভাবে এবং সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে আইনসভার দ্বারা পরিবর্তন করা যায়, তাকে সহজ পরিবর্তনশীল সংবিধান বলে। সাধারণভাবে ব্রিটিশ সংবিধান সহজ পরিবর্তনশীল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আপাতদৃষ্টিতে এবং তত্ত্বগত দিক থেকে ব্রিটিশ সংবিধানকে যতটা নমনীয় বা সহজ পরিবর্তনশীল বলে মনে হয় বাস্তবে ততটা নমনীয় নয়। কারণ, ব্রিটিশ সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে সেখানকার জাগ্রত জনমত, আইনসভার আলাপ আলোচনা এবং বিভিন্ন মতের সংঘাত এরূপ প্রভাব বিস্তার এবং জটিলতা সৃষ্টি করে যে, যে-কোন সংশোধনী সহজে গৃহীত হতে পারে না। এজন্য মনে করা হয়, তত্ত্বগত দিক থেকে ব্রিটিশ সংবিধান যতটা নমনীয়, কার্যক্ষেত্রে ততটা নমনীয় নয়।

৩. **এককেন্দ্রিক** (Unitary)

ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর এককেন্দ্রিক চরিত্র ; ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলিতে দু প্রকারের সরকার গঠন করে এদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় উভয় পর্যায়ের সরকারই নিজ নিজ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে স্বাধীন ভাবে কার্য পরিচালনা করতে পারে। কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যে দু প্রকারের সরকারের অস্তিত্ব থাকে না এবং স্বভাবতই এদের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের প্রশ্নও থাকে না।

ব্রিটেনে আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা আছে, কিন্তু আঞ্চলিক সংস্থাগুলি সংবিধান থেকে ক্ষমতা লাভ করে না। ব্রিটেনের আঞ্চলিক সংস্থাগুলি পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করে এবং এরা কোনদিক থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সরকারের সমতুল্য নয়।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন কোন ব্যাপারে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলস বিশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করে। যেমন, উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের জন্য আলাদা আইনসভা ও শাসন-কর্তৃপক্ষ আছে ; স্কটল্যাণ্ডের আইন ও শিক্ষাব্যবস্থা আলাদা এবং ব্রিটিশ ক্যাবিনেটে স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসের জন্য একজন মন্ত্রী আছেন।

এসব ব্যতিক্রম সত্ত্বেও ব্রিটেনকে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা হয়।

৪. **বিবর্তনের ফল** (Product of Evolution)

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা বিবর্তনের ফসল। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে দীর্ঘকাল ধরে পরিবর্তন ও বিবর্তনের মাধ্যমে এর উদ্ভব ঘটেছে। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে একের পর এক নতুন বিধি, প্রথা ও রীতি-নীতি যুক্ত হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন সংবিধানের ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে. অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে। এজন্য গ্রেট বৃটেনের সংবিধান সম্পর্কে বলা হয় যে, এখানে ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তন পাশাপাশি কাজ করে। কখনও প্রথা, আবার কখনও বা আইনের মাধ্যমে পরিবর্তন ও গতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।

৫ **ক্যাবিনেট ব্যবস্থা** (Cabinet System)

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে পার্লামেণ্টীয় বা ক্যাবিনেট ব্যবস্থা বলা হয়। আইনের দৃষ্টিতে ব্রিটেনে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হল রাজা বা রানীসহ পার্লামেণ্ট (King or Queen-in-Parliament)। বাস্তবে রাজা নিয়মতান্ত্রিক প্রধানমাত্র এবং লর্ড সভা সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। তাই ব্রিটেনে কমন্সসভাই শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার উৎস। ধীরে ধীরে কমন্সসভার ক্ষমতা ক্যাবিনেটের হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় এবং ক্যাবিনেটই সর্বময় ক্ষমতার উৎস হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এর ফলে ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 'ক্যাবিনেট ব্যবস্থা'র উদ্ভব ঘটে।

ক্যাবিনেট প্রথা বা ব্যবস্থা কতকগুলি মূল সূত্রের উপর নির্ভরশীল ঃ ১. সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি—সাধারণ নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সে দল সরকার গঠন করে। ঐ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মনোনীত হন এবং তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং মন্ত্রিসভাকে নেতৃত্ব দেন। ২. মন্ত্রিসভার সদস্যদের পার্লামেণ্টের কোন একটি কক্ষের সদস্য হতে হয়; ৩ যৌথ দায়িত্বশীলতার নীতি অনুযায়ী মন্ত্রিগণ ক্যাবিনেটের সকল কাজ, কর্ম ও নীতির জন্য পার্লামেণ্টের কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকে; ৪. আইনসভা ও শাসনবিভাগের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ক্যাবিনেট ব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র ক্যাবিনেটের নেতা নন, তিনি আইনসভারও নেতা। দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে আইনসভা ও শাসন-বিভাগ আরও ঘনিষ্ঠ হয়।

সংসদীয় বা ক্যাবিনেট প্রথা প্রবর্তনের ব্যাপারে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অনুকরণে ক্যাবিনেট প্রথার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়।

৬. **ক্ষমতার পৃথকীকরণ নাই** (No Separation of Powers)

মন্তেস্কু মনে করেছিলেন যে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির কোন স্থান নেই, বরং সেখানে যা দেখতে পাওয়া যায় তাহল

ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, এখানে আইনসভা ও শাসন-বিভাগ (Parliament and Cabinet) পরস্পর থেকে আলাদা এবং পারস্পরিক প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। অনেকে পার্লামেণ্টকেই সর্বোচ্চ আদালত বলে অভিহিত করেন—কারণ পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত আইন আদালত বাতিল করতে পারে না। ব্রিটেনে রানী কেবল শাসনবিভাগের প্রধান নন, তিনি আইনসভারও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গবিশেষ। কারণ, রানী, লর্ডসভা এবং কমন্সসভা নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট গঠিত। রানীর অনুমোদন বাদে পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত বিল আইনে পরিণত হয় না। লর্ডসভা পার্লামেণ্টের উচ্চকক্ষ হলেও তা দেশের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। শাসনবিভাগের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক মন্ত্রিসভা যৌথভাবে কমন্সসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে। মন্ত্রিসভার প্রকৃত কার্যকাল কমন্সসভার আস্থার উপর নির্ভরশীল। অধ্যাপক রবসন, যথার্থই বলেছেন, ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির অস্তিত্বের কথা বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম ধারক হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটেনে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ নেই বললেই চলে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বাদে ব্রিটেনে **কতকগুলি মৌল সাংবিধানিক নীতি** (basic constitutional principles) দেখতে পাওয়া যায়। নিম্নে আমরা এগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করছি ঃ

মৌল সাংবিধানিক নীতি

৭. **সংসদীয় সার্বভৌমিকতা** (Parliamentary Sovereignty)

পার্লামেণ্টের বা সংসদীয় সার্বভৌমিকতা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান সাংবিধানিক নীতি ও বৈশিষ্ট্য। ব্রিটেনে 'পার্লামেণ্টের সার্বভৌমিকতা বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করে ডাইসী বলেছেন যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে-কোন আইন বিধিবদ্ধ করতে পারে ও তা বাতিল করতে পারে এবং ব্রিটেনে এমন কোন ব্যক্তি বা সংস্থা নেই যিনি বা যারা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইনকে বাতিল করতে পারে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সার্বভৌমিকতার তিনটি অর্থ লক্ষ্যণীয়: প্রথমত, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে-কোন আইন সংশোধন ও বাতিল করতে পারে; দ্বিতীয়ত, সাধারণ আইনের মত ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন করতে পারে; তৃতীয়ত, ব্রিটেনে আদালতের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা (Power of Judicial Review) না থাকার জন্য পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের বৈধতা আদালত বিচার করতে পারে না। সুতরাং আইনের দৃষ্টিতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং এটাই ব্রিটেনে পার্লামেণ্টের সার্বভৌমিকতার অর্থ।

৮. **আইনের অনুশাসন** (Rule of Law)

আইনের অনুশাসনের ধারণার উৎস হল স্বাভাবিক আইন (Natural Law) সংক্রান্ত ধারণা। ব্রিটিশ সংবিধানের একটি অন্যতম নীতি হল আইনের অনুশাসন। ডাইসী আইনের অনুশাসনের তিনটি সুস্পষ্ট অর্থ করেছেন ঃ প্রথমত, আইনের প্রাধান্য, দ্বিতীয়ত, আইনের চোখে সমতা এবং তৃতীয়ত, আইন দ্বারা জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করা।

উপরোক্ত তিনটি নীতি ছাড়াও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইন ব্যাখ্যার ব্যাপারে বিচারকদের চরম ক্ষমতা, জনগণের বাক্-স্বাধীনতা ইত্যাদি আইনের অনুশাসনের ধারণার অন্তর্গত। এ কথা অনস্বীকার্য যে শাসকের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রেখে জনগণের অধিকার ও ন্যায়ের আদর্শ প্রসারের ক্ষেত্রে 'আইনের অনুশাসন' নীতির বিশেষ অবদান রয়েছে।[১]

৯. **রাজকীয় প্রজাতন্ত্র** (Crowned Republic)

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে রাজকীয় প্রজাতন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। আপাত-দৃষ্টিতে 'রাজকীয়' এবং 'প্রজাতন্ত্র' শব্দ দুটি পরস্পর বিরোধী, কারণ, রাজতন্ত্র বংশানুক্রম শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী এবং প্রজাতন্ত্র বংশানুক্রম শাসনের বিরোধী। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, যে ব্রিটিশ জনগণ নিজেদের দেশকে গণতন্ত্রের জন্মভূমি বলে মনে করেন, তারা রাজতন্ত্রের মত বংশানুক্রম শাসনকে গ্রহণ করলেন কি ভাবে ?

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রানী শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করলেও তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী রাজা বা রানী ক্ষমতা পরিচালনা করেন। রানীর নামে ক্ষমতা পরিচালিত হলেও শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় তাঁর প্রকৃত ভূমিকা আনুষ্ঠানিক মাত্র। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই বাস্তবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। প্রত্যেক নির্বাচনের পর কমন্সসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতার অধিকারী দল সরকার গঠন করে। এই সরকার তার কাজের জন্য যৌথভাবে কমন্সসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। পাঁচ বছরের জন্য মন্ত্রিসভা গঠিত হলেও এর কার্যকাল কমন্সসভার আস্থার উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবার আগেই কমন্সসভা মন্ত্রিসভাকে অপসারিত করতে পারে। কমন্সসভা প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে বলে সরকার চুড়ান্তরূপে জনসাধারণের কাছে দায়িত্বশীল থাকে। জনসাধারণের হাতে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা ন্যস্ত। তারাই ঠিক করে কোন্ দলকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হবে। সুতরাং প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকাংশই ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়—অনুপস্থিত কেবলমাত্র বংশানুক্রমে ক্ষমতায় আসীন হবার পরিবর্তে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু বংশানুক্রমে রাজতন্ত্র ব্রিটিশ গণতন্ত্রের প্রসারে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি। তাই কেউ কেউ বলেন যে, গণতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে ব্রিটেনে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মিলন ঘটেছে।

১-৬. পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা
Parliamentary Sovereignty

আমরা আগেই বলেছি যে, পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান কার্যকর বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বলতে রাজা বা রানীসহ পার্লামেন্টকে (Queen-in-Parliament) বুঝায়। অর্থাৎ রানী, কমন্সসভা ও লর্ডসভাকে নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গঠিত। এদের মধ্যে রাজা বা রানীর ভূমিকা একান্তভাবেই আনুষ্ঠানিক এবং লর্ডসভার ক্ষমতাও ক্রমশ হ্রাস পেয়ে সীমিত হয়েছে। ফলে ব্রিটেনে সংসদীয়

এর অর্থ কমন্সসভার সার্বভৌমিকতা

---

১. পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা ও আইনের অনুশাসন সম্পর্কে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মূলত কমন্সসভার উপর ন্যস্ত রয়েছে। তাই ব্রিটেনে পার্লামেণ্টের সার্বভৌমিকতা বলতে কমন্সসভার সার্বভৌমিকতা বোঝায়।

পার্লামেণ্টের সার্বভৌমিকতা বলতে কি বোঝায় তার উল্লেখ করে স্যার উইলিয়াম ব্লাকষ্টোন বলেছেন, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ক্ষমতা ও এক্তিয়ার এত ব্যাপক ও চরম যে একে কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। পার্লামেণ্ট যা করে পৃথিবীর কোন শক্তি তা বাতিল করতে পারে না (What the Parliament doth, no authority upon eart 1 can undo)। ব্লাকষ্টোনের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে যে সূত্রগুলি প্রতিষ্ঠা করা যায় তা হল :

ব্ল্যাকষ্টোনের মত

১. আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতা

আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ক্ষমতা অবাধ, অসীম ও চরম। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট নিজের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইনে (*The Parliamentary Act of 1911*) পার্লামেণ্টের আয়ুসীমা পাঁচ বছর করা হয়। ঐ অনুযায়ী ১৯১১ সালে গঠিত পার্লামেণ্টের আয়ুষ্কাল ১৯১৬ সালে শেষ হবার কথা। অর্থাৎ ১৯১৬ সালে নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে আইন অনুযায়ী নতুন কমন্সসভা গঠিত হবার কথা। কিন্তু ঐ সময় প্রথম মহাযুদ্ধ চলছিল বলে অন্য একটি আইন পাশ করে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট নিজের আয়ু ১৯১৮ সাল পর্যন্ত বাড়ায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায়ও পার্লামেণ্ট ঐভাবে নিজের আয়ুষ্কাল অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়িয়েছিল। অর্থাৎ ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট নিজের ইচ্ছামত যে কোন সাংবিধানিক আইন বিধিবদ্ধ করতে পারে। অন্য কোন শক্তি বা কর্তৃত্ব দ্বারা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নয়।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে কোন সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং নিজের ইচ্ছানুযায়ী তা সংশোধন করতে পারে বলে ব্রিটেনে সাংবিধানিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন করতে হলে বিশেষ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন করতে পারে—এর জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় না। সুতরাং ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট একদিকে সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন সংস্থা (Constituent Body) এবং অন্যদিকে আইন প্রণয়ন সংস্থা (Legislative Body)। এ জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন সংবিধান-সম্মত কিনা তা বিচার বিবেচনার কোন সুযোগ নেই এবং তা বিচারের অধিকার সেখানকার আদালত ভোগ করে না।

তাই সাধারণ ও সাংবিধানিক আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই

২. আইন সংশোধন, স্থগিত ও বাতিলের ক্ষমতা

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করলে যে কোন আইন সংশোধন করতে পারে, সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে পারে এবং তা বাতিল করতে পারে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ঐ ক্ষমতা সব রকমের আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমনকি যে সব আইন জনগণের মৌলিক

ধরনের অধিকারকে নিশ্চিত করে সে আইনগুলির ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট উপরোক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। ১৯৪৬ সালে পার্লামেন্ট ট্রেডস ডিসপিউটস্ অ্যাক্ট (*Trades Disputes Act*) বাতিল করে, ১৯৪৯ সালে ১৯১১ সালের পার্লামেন্ট আইনকে সংশোধন করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে হেবিয়াস কর্পাস (*Habeas Corpus*) আইন স্থগিত রাখা হয়েছিল এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সীমিত করা হয়েছিল। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বার্মা অয়েল কোম্পানীর যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সে ব্যাপারে আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বার্মা অয়েল কোম্পানীকে যাতে কোন ক্ষতি-পূরণ দিতে না হয় সেজন্য ১৯৬৬ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'ওয়ার ড্যামেজ (বার্মা ওয়েল) আইন' পাশ করে। ঐ আইনের দ্বারা পার্লামেন্ট ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়।

এসব ঘটনা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে, যে কোন আইন স্থগিত রাখতে পারে, সর্বোপরি এরূপ আইন প্রণয়ন করতে পারে যাতে আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকর না হতে পারে। এমনকি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন পাশ করে অনেক সময় বে-আইনী কাজকে আইনসিদ্ধ করতে পারে (legalise illegality)।

৩. পার্লামেন্টের কাজে আদালতের কোন এক্তিয়ার নাই

পার্লামেন্টের কাজকর্মের ব্যাপারেও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট চূড়ান্ত ক্ষমতা ভোগ করে। পার্লামেন্টের কাজকর্ম এবং সেখানে বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যাপারে আদালতের কোনরূপ এক্তিয়ার নাই। কোন ব্যক্তিবিশেষের কার্যকলাপ পার্লামেন্টের কাজে বাধাস্বরূপ মনে করা হলে তাকে শমন জারী করে পার্লামেন্টে উপস্থিত করা যায় এবং শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

ব্ল্যাকষ্টোন মনে করেন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এ সব অবাধ ক্ষমতা ও এক্তিয়ার একে সার্বভৌম করে তুলেছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা একটি আইনগত তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং তা ব্রিটেনের বিচারালয় কর্তৃক স্বীকৃত।

ক্যাবিনেটের সার্বভৌমিকতার রূপান্তর

ব্রিটেনে দলীয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর। সেখানে নির্বাচনে যে দল কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সে দলই মন্ত্রিসভা গঠন করে। সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেটের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী আইনসভা পরিচালিত হয়। ফলে ব্রিটেনে পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা ক্যাবিনেটের সার্বভৌমিকতায় রূপান্তরিত হয়েছে।

এ তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

তত্ত্বগত ও বাস্তব উভয় দিক থেকেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সার্বভৌম হলেও অধ্যাপক ডাইসী মনে করেন যে, পার্লামেন্টের অবাধ ও চরম ক্ষমতা দুটি কারণে সীমাবদ্ধ। প্রথমত, জনমতের ভয়ে পার্লামেন্ট যা ইচ্ছা তা করতে পারে না। এবং দ্বিতীয়ত, পার্লামেন্টের গঠন ও চরিত্র এমনই যে পার্লামেন্ট ঐক্যমত হয়ে চরম কিছু করতে পারে না। নৈতিকতা, বিশেষাধিকার, পূর্বতন পার্লামেন্ট প্রণীত আইন ইত্যাদি পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে অনেকে মনে করেন। সাধারণভাবে স্বীকৃত নৈতিকতার বিরোধী কোন আইন পার্লামেন্ট

ডাইসীর সমালোচনা

প্রণয়ন না করলেও নৈতিকতা ও আইনের এক্তিয়ার আলাদা। নৈতিকতা কোন সীমাবদ্ধতা হতে পারে না। রানীর বিশেষাধিকার ও পূর্বতন পার্লামেন্টের আইনও আইনের মাধ্যমে অপসারণ করা হয়েছে এবং পরবর্তী পার্লামেন্ট অনেক ক্ষেত্রেই পূর্বতন পার্লামেন্টের প্রণীত আইন সংশোধন করেছে।

পার্লামেন্ট আইনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী কোন বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলেও বিধিবদ্ধ আইন ব্যাখ্যা করার সময়ে আদালত ধরে নেয় যে, পার্লামেন্ট আন্তর্জাতিক আইনের নীতিকে লঙ্ঘন করার চেষ্টা করেনি।

বিচার বিভাগের ব্যাখ্যা আইনগতভাবে পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর কোন সীমাবদ্ধতা না হলেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা অনেকটা অপসারিত হয়েছে। ১৯৩১ সালের 'ষ্ট্যাটিউট্ অব্ ওয়েস্টমিনষ্টার' পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতার ক্ষেত্রে আর একটি সীমাবদ্ধতা। উক্ত আইন অনুযায়ী কোন ডোমিনিয়মের অনুরোধ বাদে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইন সেখানে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

আবার আইনের এক্তিয়ারের বাইরে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কার্যকলাপ পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

প্রকৃতপক্ষে পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতা সামাজিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পার্লামেন্ট ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটা অঙ্গ। একটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষা-

মূল্যায়ন

কর্তারূপে ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থা দায়িত্ব পালন করে। পার্লামেন্টের ক্ষমতার প্রসার বা সংকোচন সামাজিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাতের উপর নির্ভরশীল। পার্লামেন্ট মূলত বিত্তবানদের স্বার্থের রক্ষক। পার্লামেন্টের কাজের বৈধতা বস্তুত নির্ভর করে পার্লামেন্ট কী পরিমাণে সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় সাহায্য করে তার উপর। ব্রিটিশ সমাজের শ্রেণীবৈষম্য ও আর্থিক অবিচার জনসাধারণের সার্বভৌমিকতাকে বিত্তবানদের শোষণের সার্বভৌম ক্ষমতায় পরিণত করেছে। সুতরাং বলা যায়, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতা বিত্তবানদের স্বার্থকেই চূড়ান্তরূপে রক্ষা করে।

১-৭. আইনের অনুশাসন
Rule of Law

ব্রিটিশ সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক নীতি হল আইনের অনুশাসন (Rule of Law)। ব্রিটেনে যেমন একদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য প্রশংসনীয় উদ্যম লক্ষ্য করা গিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে জনসাধারণ এবং সরকারী কর্তৃত্বের জন্য একই আইনের অনুশাসন নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাও দেখা গিয়েছে। অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, কোন স্বাধীন প্রজাকে বিনা বিচারে বা দেশের আইন ছাড়া আটক করা যাবে না বলে মহাসনদে ঘোষণা করা হয়। ১৮৬৯ সালে 'অধিকারের সনদ' (*Bill of Rights*) দ্বারা পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্টুয়ার্ট রাজাদের রাজত্বকালে বিচারকগণ কর্তৃক 'প্রচলিত আইন'-এর ব্যাখ্যার দ্বারা জনগণের বহু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হয়। এ সবের ফলে 'আইনের চোখে সমতা' নীতির প্রকাশ ঘটে, শাসকের ক্ষমতা সীমিত হয় এবং জনগণের বহু অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে।

এ সব মৌল চাহিদা মেটাবার তাগিদ থেকেই 'আইনের অনুশাসন'-এর ধারণা গড়ে ওঠে। এ ধারণা অনুযায়ী আইনের স্থান সর্বোচ্চ—আইন নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতার সংরক্ষক এবং আইন স্বৈরাচারী শাসকের হাত থেকে আত্মরক্ষার অস্ত্র। আইনের চোখে সবাই সমান এবং সবাই আইনের অধীন। আদালত আইন অনুযায়ী বিচার করবে এবং সরকার এমন কোন কাজ করবে না যার পেছনে আইনের সমর্থন নেই।

আইনের অনুশাসন কাহাকে বলে ?

ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে এ. ভি. ডাইসী তাঁর *Introduction to the Law of the Constitution* বই-এ 'আইনের অনুশাসন'-এর ব্যাখ্যা করেন। ডাইসী আইনের অনুশাসনকে ব্রিটিশ সংবিধানের মৌলনীতি বলে উল্লেখ করেছেন। আইনের অনুশাসনের ব্যাখ্যা করার সময়ে ডাইসী এর তিনটি সূত্রের উল্লেখ করেছেন ঃ

ডাইসীর সূত্র

১. সাধারণ আদালতে সাধারণ আইনগত পদ্ধতিতে যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত না হচ্ছে যে আইনভঙ্গ করা হয়েছে তার আগে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া বা দৈহিক ও আর্থিক ক্ষতিসাধন করা চলবে না।

প্রথম সূত্র

এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আইনের প্রাধান্য ধ্বনিত হয়েছে। আইনভঙ্গ না করে প্রতিটি ব্যক্তির তার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগের অধিকার আছে এবং আইন ভঙ্গ করলে, শাস্তিদানের আগে আইনসম্মত পদ্ধতিতে আদালতে তা প্রমাণ করতে হবে—এটাই ডাইসীর প্রথম সূত্রের মর্মকথা।

২. কোন ব্যক্তিই আইনের ঊর্ধ্বে নয়, ব্যক্তির পদমর্যাদা বা আর্থিক অবস্থা যাই হোক না কেন। জনগণ দেশের সাধারণ আইন ও সাধারণ আদালতের অধীন। অর্থাৎ আইন সকলকে সমান চোখে দেখে এবং মর্যাদা বা আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির কোন পার্থক্য করে না। তাই প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবাই একই আইনের অধীন ও আইনের চোখে সমান এবং একই আইন মান্য করতে বাধ্য। প্রতিটি ব্যক্তির অপরাধ বা আইন ভঙ্গের ঘটনা দেশের সাধারণ আদালতের বিচার্য বিষয়।

দ্বিতীয় সূত্র

৩. ব্রিটেনে সাংবিধানিক আইন জনগণের অধিকারের উৎস নয়, এর ফলশ্রুতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেমন 'অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা' আছে বা ভারতের সংবিধানে যেমন মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করা হয়েছে, ব্রিটেনের সংবিধানে বিধিবদ্ধ কোন আইনের দ্বারা সেরূপ ভাবে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা হয়নি। তাই সেখানে জনগণের অধিকার সাংবিধানিক আইন দ্বারা রক্ষিত হয়নি।

তৃতীয় সূত্র

উপরোক্ত তিনটি সূত্রের মধ্য দিয়ে আইনের অনুশাসনের ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। ডাইসী মনে করেন, যে দেশে সাংবিধানিক নীতি হিসাবে আইনের অনুশাসন কার্যকর, সে শাসনব্যবস্থার সঙ্গে স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থার পার্থক্য খুবই গভীর।

ডাইসীর 'আইনের অনুশাসন'-এর নীতিকে স্যার আইভর জেনিংস, হ্যারল্ড ল্যাস্কি প্রমুখ পণ্ডিতেরা তীব্র সমালোচনা করেছেন।

প্রথমত, ডাইসী ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এর মূলে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তা ও তাঁর উপর লেসেফেয়ার (Laissez faire) দর্শনের প্রভাব। তাই ডাইসী ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা, এদের সম্প্রসারণ করা এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে এদের মুক্ত রাখার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন।

জেনিংসের প্রথম সমালোচনা

শুধু জেনিংস নয়, অনেকেই মনে করে যে আইনের অনুশাসন সম্পর্কে ডাইসীর বিশ্লেষণ মূলত ঊনবিংশ শতকের ধনতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের প্রয়াস মাত্র। ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতাও যে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে সীমিত করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে এ সত্যটিকে ডাইসী উপলব্ধি করতে পারেননি। সমাজতন্ত্রে তো বটেই. এমনকি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে এবং পরিকল্পিত আর্থনীতিক ব্যবস্থায়ও (Planned Economy) বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে অনেক সময় ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং সরকারী প্রশাসনের হস্তে বিবেচনামূলক ক্ষমতা (discretionary powers) অর্পণ করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, ডাইসী মনে করতেন যে আইনের অনুশাসনের উপর ব্রিটেনে গণতন্ত্র নির্ভরশীল। কারণ, আইনের অনুশাসন অনুযায়ী ব্রিটেনে কেউ (সরকারী কর্তৃত্ব) যাতে আইন প্রদত্ত ক্ষমতার বেশি ক্ষমতা ব্যবহার করতে না পারে তা আদালত নিশ্চিত করে। কিন্তু ডাইসীর এ বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলা হয় যে, আদালত কেবলমাত্র 'প্রচলিত আইন'-এর অনুশাসন নিশ্চিত করে। 'প্রচলিত আইন' ভাল নাও হতে পারে বা ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার সহায়ক নাও হতে পারে। তাই প্রচলিত আইনের ছত্রচ্ছায়ায়ও চরম রাজতন্ত্র চলতে পারে। এ ছাড়াও বলা যায় যে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সার্বভৌম এবং তা যে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে। এমনকি জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে এবং সরকারের ক্ষমতা প্রসারিত করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন রচনা করতে পারে। বস্তুত বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময় এরূপ আইন প্রণয়ন করে (জরুরী ক্ষমতা সংক্রান্ত আইন, ১৯৩৯) ব্যক্তির অধিকার তথা গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানা হয়েছিল। 'আইনের অনুশাসন' ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে এরূপ আইন প্রণয়ন থেকে বিরত রাখতে পারে না।

জেনিংসের দ্বিতীয় সমালোচনা

এসব কারণে জেনিংস মনে করেন যে, ডাইসীর আইনের অনুশাসনের বিশ্লেষণ ব্যর্থ হয়েছে। আইনের অনুশাসনের নামে ডাইসী যা ব্যাখ্যা করেছেন তা হল 'হুইগদের জন্য নীতির আইন' (Rule of policy for Whigs) মাত্র।

উপরোক্ত সমালোচনা ছাড়াও বলা হয় যে 'আইনের অনুশাসন' স্বৈরাচারিতার পরিবর্তে আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবে এরূপ মনে করা ঠিক নয়। কারণ বর্তমান যুগে সময়াভাবে পার্লামেন্টের পক্ষে আইনের খুঁটিনাটি রচনা করা সম্ভব নয়, তাই অর্পিত আইন প্রণয়নের (delegated legislation) ক্ষমতা দ্বারা এ ক্ষমতা বিভিন্ন সরকারী বিভাগের উপর অর্পিত হয়েছে। এ ছাড়াও প্রশাসন কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক আইন (Administrative Law) রচনা করতে পারে, ফলে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়নের ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে এবং আইনের উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রে বানচাল হয়ে যায়। শাসনবিভাগ এবং প্রশাসন কর্তৃপক্ষের হাতে

অন্যান্য সমালোচনা

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হস্তান্তর করা বা প্রশাসনিক আইন প্রণয়নের অধিকার অর্পণ করা ডাইসীর 'আইনের অনুশাসন' নীতি বিরোধী।

দ্বিতীয়ত, ডাইসী 'আইনের চোখে সমতা'-কে আইনের অনুশাসনের একটি অন্যতম উপাদান বলে মনে করেন। সমালোচকদের মতে 'আইনের চোখে সমতা' কথাটি অনেকাংশে অর্থহীন। ধনী ও দরিদ্র আর্থিক কারণেই আইনের সাহায্য সমানভাবে পায় না। পার্লামেন্টের সদস্যদের বিশেষাধিকার, পুলিশের বিশেষ ক্ষমতা, বিদেশী দূতাবাসের কর্মীদের ব্রিটিশ আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে থাকার অধিকার ইত্যাদি প্রমাণ করে যে কেউ কেউ সাধারণ আইনের ঊর্ধ্বে (above the ordinary law of the land) এবং নিশ্চিতভাবে এটা ডাইসীর আইনের অনুশাসনের নীতির বিরোধী। আইনের চোখে সমতা একমাত্র নিশ্চিত করতে পারে অনুকূল আর্থিক পরিবেশ ও আর্থিক সমতা।

সর্বোপরি, সমালোচকদের মতে নিছক আইনের দ্বারা বা আদালতের ক্ষমতা দ্বারা ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত হয় না—এর জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং জাগ্রত ও সতর্ক জনমত।

ডাইসীর আইনের অনুশাসনের কোন কোন ব্যাখ্যা হয়তো বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং এদের কিছু কিছু পরিবর্তন (modifications) প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর আইনের অনুশাসনকে সামগ্রিকভাবে বাতিল করা যায় না। যেমন, সরকারী ক্ষমতার উৎস হল আইন এবং আইন বহির্ভূত ক্ষমতা থাকতে পারে না বা জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে সরকারি প্রশাসন কাম্য নয়—এ ধারণাগুলির (concepts) গুরুত্ব নিঃশেষ হয়ে যায় নি। সুতরাং আমরা বলিতে চাই যে, ডাইসী আইনের অনুশাসনের বিশ্লেষণকে যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তথা ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বলেও ধরা যায়, তবুও এর উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক আবেদন স্বীকার করতে হয়। ব্রিটেনে পুঁজিবাদের বিকাশে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ রেখে অবাধ ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রসারের জন্য এ তত্ত্বের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

সিদ্ধান্ত

১-৮. ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি: রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্রের সমন্বয়

Nature of British Constitutional System : Mixture of Monarchy, Aristocracy and Democracy

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্রের অপূর্ব সমন্বয় বলে অভিহিত করা হয়। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখান যেতে পারে যে এখানে যুগপৎ রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্রের প্রকাশ ঘটেছে। ব্রিটেনের রাজা ও রানী রাজতন্ত্রের প্রতীক, লর্ডসভা ও প্রিভি কাউন্সিল অভিজাততন্ত্রের প্রতীক এবং জনগণের নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত ক্ষমতাশালী ও প্রতিনিধিত্বমূলক কমন্সসভার অস্তিত্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে।

ব্রিটেনে রাজতন্ত্র একটি প্রাচীন সংস্থা এবং প্রায় ধারাবাহিকভাবে ঐ সংস্থা নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে আসছে। ক্রমওয়েলের সময়ে মাত্র এগার বছরের জন্য ব্রিটেনে

রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছিল। কিন্তু এর পরে আবার রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে। আজও তত্ত্বগত দিক থেকে ব্রিটেনের রানী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যদিও ক্রমবিবর্তনের ফলে তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধানে পরিণত হয়েছেন। ক্রমবিবর্তনের ফলে রাজতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠানে (Monarchy as an Institution) পরিণত হয়েছে। গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের ফলে রাজশক্তির বহু অধিকার ও ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছে, রাজতন্ত্রকে ব্যক্তিগত এক্তিয়ার থেকে প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি, অগ এবং জিঙ্কের (Ogg and Zink) ভাষায় বলা যায়, গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে রাজার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে (The powers of the crown have expanded as democracy has grown)। যা হোক, রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। পৃথিবীতে যখন একের পর এক দেশে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটেছে, তখনও ব্রিটেনের ঐ প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটি নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেখানে পরিবর্তন করা হয়েছে—কিন্তু রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করার কথা ভাবা হয়নি।

রাজতন্ত্র

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় অভিজাততন্ত্রের প্রতীক হল লর্ডসভা ও প্রিভি কাউন্সিল। লর্ডসভার গঠন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা লর্ডসভা গঠিত এবং লর্ডসভার সদস্যরা উত্তরাধিকার সূত্রে এর সদস্যপদ লাভ করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বা নতুনভাবে লর্ড উপাধিতে ভূষিত ইংলণ্ডের সকল লর্ড, স্কটল্যাণ্ডের লর্ডদের দ্বারা নির্বাচিত যোলজন লর্ড, আয়ারল্যাণ্ডের আঠাশজন আজীবন লর্ড, আঠাশজন ধর্মযাজক, কয়েকজন সাধারণ আপীল লর্ড এবং ব্রিটেনের রাজপরিবার থেকে মনোনীত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে লর্ডসভা গঠিত। এক কথায় বলা যায়, লর্ডসভা হল রক্ষণশীল, বিত্তশালী এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের একটি প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা। সমালোচকেরা একে বিত্তশালীদের দুর্গ (the common fortress of wealth) বলে অভিহিত করেন।

অভিজাততন্ত্র

প্রিভি কাউন্সিলের গঠন প্রণালী বিশ্লেষণ করলে অনুরূপভাবে দেখা যাবে যে, অতীতে রাজপরিবারের পদস্থ কর্মচারী, জমিদার এবং বিত্তশালী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে রাজার মনোনীত সদস্যদের নিয়ে ঐ সংস্থা গঠিত হত। বর্তমানেও ক্যাবিনেটের প্রাক্তন ও কিছু বর্তমান সদস্য, রাজপরিবারের সদস্য, দুজন বিশপ, ডোমিনিয়নগুলির প্রধানমন্ত্রিগণ এবং সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ব্যক্তিদের নিয়ে প্রিভি কাউন্সিল গঠিত হয়। সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, লর্ডসভা ও প্রিভি কাউন্সিলের অস্তিত্বের ভেতর ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় অভিজাততন্ত্রের স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত কমন্সসভা হল জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা বস্তুত কমন্সসভার উপর ন্যস্ত। এ সভা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মর্যাদার ভিত্তিতে বা মনোনীত সদস্যদের নিয়ে এ সভা গঠিত হয় না। এ সব কারণে ব্রিটিশ কমন্সসভাকে গণতন্ত্রের ধারক ও প্রতীক মনে করা

গণতন্ত্র

হয়। কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারা গঠিত ক্যাবিনেটই ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় চরম ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং বলা যায় যে, কমন্সসভার অস্তিত্ব এবং ক্যাবিনেট পরিচালিত শাসনব্যবস্থার প্রচলনের দ্বারা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিফলিত হয়েছে।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য কোন কোন সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্রের আশ্চর্য সংমিশ্রণ আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু এদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঠিক নয়। কারণ ব্রিটেনে রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব এবং অভিজাত-তান্ত্রিক কিছু কিছু উপাদান থাকলেও ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় এদের বিশেষ কোন ভূমিকা বা অবদান নেই। সেখানে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে রানীর গুরুত্ব থাকলেও বাস্তবে তাঁর ক্ষমতা কতটুকু? তিনি তো বাস্তবে "জাঁকজমকপূর্ণ সাক্ষীগোপাল"। সুতরাং ব্রিটেনে রাজা বা রানী থাকলেও রাজতন্ত্র বলতে যা বোঝায় তা নেই। দ্বিতীয়ত, অভিজাততন্ত্রের প্রতীক হিসাবে যে লর্ডসভা ও প্রিভি কাউন্সিলের অস্তিত্বের কথা বলা হয়, শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে এদের মূল্য কতটুকু? শাসনব্যবস্থার মূলধারা থেকে এরা বিচ্ছিন্ন—কোন রকমে ধুকে ধুকে করে বেঁচে থেকে এরা কোন রকমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছে।

সমালোচনা

অন্যদিকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতীক হিসাবে যে কমন্সসভা ও ক্যাবিনেট ব্যবস্থার কথা বলা হয় তারাই বস্তুতপক্ষে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। কমন্সসভা এবং ক্যাবিনেটই শাসনব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এজন্যই ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে মূলত গণতান্ত্রিক বলাই সঙ্গত, যদিও শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে কোন কোন ব্যাপারে রাজতন্ত্র এবং আংশিক পরিমাণে অভিজাততন্ত্রের প্রতিফলন দেখা যায়।

১-৯. শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি
Conventions of the Constitution

আমরা জানি কোন একটি দলিলে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার এক বিরাট অংশ রীতিনীতি ও প্রথাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে; যাদের ডাইসী শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি (conventions) নামে অভিহিত করেছেন। ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস হিসাবে ঐ সব শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির ভূমিকা খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ ও মূল্যবান। বস্তুত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্য দিয়ে ব্রিটেনের অনেক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে। জন স্টুয়ার্ট মিল রীতিনীতিগুলিকে সংবিধানের অলিখিত ধ্রুব-বাণী (the unwritten maxims of the constitution) বলে অভিহিত করেছেন।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি কাকে বলে সে সম্পর্কে একটু আলোচনা প্রয়োজন। ডাইসীর মতে, যে সব বোঝাপড়া, অভ্যাস বা ব্যবহার (understanding, habits or practices) আইনসম্মত নিয়মকানুনের প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি বলে। এ্যাডমণ্ড বার্কের মতে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিই হল সংবিধানের মূল শক্তি এবং এগুলিই স্থির করে আইনসংক্রান্ত নিয়মাবলী কিভাবে প্রযুক্ত হবে। জেনিংসের মতে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলি আইনের শুষ্ক অস্থিতে রক্ত-

মাংসের প্রলেপ লাগিয়ে শাসনতান্ত্রিক আইনকে কার্যকর করতে সাহায্য করে এবং পরিবর্তিত ধ্যান ধারণার সাথে সঙ্গতি বিধান করে (They provide the flesh which clothes the dry bones of law ; they make the legal constitution work ; they keep it in touch with the growth of ideas)। অর্থাৎ জেনিংস বলতে চান যে, শাসনতান্ত্রিক আইন অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট নয়, তাই শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিপূরক হিসাবে এদের উৎপত্তি এবং এদের সাহায্যে শাসনতান্ত্রিক আইন কার্যকর হয়। কে. সি. হুইয়ার মনে করেন, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলি হল কতকগুলি নিয়মকানুনের সংকলন, যা আইন পদবাচ্য নয় অথচ আইনের মতই বাধ্যতামূলক এবং যা দেশের রাজনৈতিক সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সংবিধানের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয় (a whole collection of rules which, though not part of the law, are accepted as binding and which regulate political Institutions in a country and clearly form a part of the system of government)। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সাংবিধানিক কোন দলিলে লিখিত নাই অথচ ব্রিটেনে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত যে বছরে একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করতে হবে। ঐ রীতিকে অগ্রাহ্য করে যদি বছরে একবারও পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা না হয়, তবে বাজেট পাশ হবে না এবং সরকার কোন খরচ করতে পারবে না। এককথায় সরকার অচল হয়ে পড়বে। সুতরাং ঐ শাসনতান্ত্রিক রীতিটি আইন না হওয়া সত্ত্বেও এর প্রয়োগ বাধ্যতামূলক না হয়ে উপায় নেই। তাই বলা যায় যে, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলি আইনের মতই বাধ্যতামূলক এবং এগুলিই আইনসংক্রান্ত নিয়মাবলী কিভাবে প্রযুক্ত হবে তা স্থির করে। শাসনতান্ত্রিক আইন না হওয়া সত্ত্বেও এরা স্বাভাবিক কারণেই শাসনতান্ত্রিক আইনের অংশে পরিণত হয়।

রীতিনীতি কাকে বলে ?

কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, শাসনতান্ত্রিক আইন ও রীতিনীতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আইনের সাথে রীতিনীতির মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ডাইসী মনে করেন যে, আদালতের মাধ্যমে যে সকল নিয়মকানুনকে বলবৎ করা যায় না তাই হল রীতিনীতি। আইনভঙ্গকারীকে আদালতে অভিযুক্ত ও শাস্তি দান করা যেতে পারে, কিন্তু শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি আদালত কর্তৃক গ্রাহ্য হয় না এবং এগুলি আদালতের বিচার্য বিষয়ের বহির্ভূত। অর্থাৎ এককথায় আইন আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য—কিন্তু শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। আইন ও রীতিনীতির মধ্যে এই পার্থক্য থাকার জন্য মনে করার কোন কারণ নেই যে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির চেয়ে আইন অধিকতর মর্যাদা ও সর্ববাদী স্বীকৃতির অধিকারী। বস্তুত ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে এমন অনেক রীতিনীতি আছে যাদের গুরুত্ব ও স্বীকৃতি আইনের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ডাইসী যথার্থই বলেছেন যে, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মানা না করলে এর পরিণতি হবে আইন ভঙ্গ করা (failure to observe them may eventually lead to a breach of the law)। কিন্তু আইন ও রীতিনীতির মধ্যে বিরোধ বাধলে আদালত আইনকেই গ্রাহ্য করে, রীতিনীতিকে নয়। উপরন্তু, আইন প্রণয়ন করা হয় ; কিন্তু

আইন ও রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য

রীতিনীতির ধীরে ধীরে উদ্ভব ঘটে, এরা বিবর্তনের ফসল। আইনের প্রাধান্যই সাধারণভাবে স্বীকৃত। শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞদের কাছে আইন ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যে তারতম্য থাকলেও সাধারণ মানুষ এ তারতম্যকে সহজে অনুভব করতে পারে না। আইন এবং রীতিনীতি তাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির শ্রেণীবিভাগ

ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ প্রথমত, রাজার বিশেষাধিকার (prerogatives) সম্পর্কিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি; দ্বিতীয়ত, ক্যাবিনেট বিষয়ক; তৃতীয়ত, পার্লামেণ্ট ও আইন প্রণয়ন বিষয়ক এবং চতুর্থত, ব্রিটেনের সাথে কমনওয়েলথ দেশগুলির সম্পর্ক বিষয়ক। নীচে আমরা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতিটি শ্রেণী সম্পর্কে আলাদা করে আলোচনা করছিঃ

চার ভাগে বিভক্ত

১. রাজার বিশেষাধিকার সম্পর্কে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

অতীতে ব্রিটেনে রাজা বা রানী ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। গৌরবজনক বিপ্লবের (১৬৮৮) পরে ১৬৮৯ সালে গৃহীত অধিকারের সনদ (*Bill of Rights*) দ্বারা রাজার ক্ষমতা অনেকাংশে সীমিত করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইচ্ছাধীন ও স্বৈরাচারী ক্ষমতার অবশিষ্টাংশ তাঁদের হাতে থেকে যায় (the residue of discretionary or arbitrary authority which at any given time is legally left in the hands of the Crown)[১]। ব্যক্তিত্বপূর্ণ রাজা ও রানী তাঁদের ঐ ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করার ফলে রাজার বিশেষাধিকার প্রয়োগ সম্পর্কে কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। এরূপ কয়েকটি রীতিনীতি হলঃ ক. কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী করা এবং তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানানো। এ শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির জন্যই রাজা চতুর্থ উইলিয়াম টোরী দলের সদস্য পীলকে প্রধানমন্ত্রীর পদে রাখতে ব্যর্থ হন, কারণ পার্লামেণ্টের নির্বাচনে হুইগ দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে; খ. প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজা অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করবেন এবং মন্ত্রীদের পার্লামেণ্টের যে কোন একটি কক্ষের সদস্য হতে হবে; গ. রাজা মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলবেন; ঘ. ক্যাবিনেটের পরামর্শক্রমে রাজা পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করবেন, ইত্যাদি।

২. ক্যাবিনেট ব্যবস্থা বিষয়ক শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থা একান্তভাবেই শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি হলঃ ক. প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ক্যাবিনেট কাজ করবে এবং প্রধানমন্ত্রীর অবিসংবাদিত প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে; খ. অধীনস্থ কর্মচারীদের সম্পর্কে মন্ত্রীর ব্যক্তিগত দায়িত্ব থাকবে; গ. মন্ত্রিসভার কাজ ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মন্ত্রিদের যৌথ দায়িত্ব (collective responsibility) থাকবে; ঘ. সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে।

১. Introduction to the Law of the Constitution—A. V. Dicey

৩. পার্লামেণ্ট ও আইন প্রণয়নমূলক শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের বিভিন্ন কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন আইন আছে, কিন্তু ঐগুলি যথেষ্ট নয়। তাই আইনের বাইরেও বহু রীতিনীতি গড়ে উঠেছে। এ সংক্রান্ত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যে কয়েকটি হল: ক. বৎসরে অন্তত একবার পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করতে হবে; খ. পার্লামেণ্টের কার্যসূচী (business) বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করে রচিত হবে; গ. পার্লামেণ্টের বিভিন্ন কমিটি সমানুপাতিক হারে সকল দলের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে ইত্যাদি।

৪ কমনওয়েলথ্ দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ক শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

কমনওয়েলথ্ দেশগুলির সাথে ব্রিটেনের সম্পর্ক মূলত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। যদিও এ সম্পর্কিত রীতিনীতিগুলির কয়েকটিকে 'ওয়েস্টমিনস্টার আইন' (*Statute of Westminster*)-এ আইনসম্মত রূপ দেয়া হয়েছে—তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে ঐ আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে 'প্রচলিত সাংবিধানিক ব্যবস্থা দ্বারা এ সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হবে' (It would be in accord with the established constitutional position)। সুতরাং কমনওয়েলথ্ দেশগুলির সাথে সম্পর্ক বিষয়ক রীতিনীতিগুলি এখনও কার্যকর। এ ধরনের কয়েকটি রীতিনীতি হল: ক. কোন ডোমিনিয়ন অনুরোধ না করলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করবে না; খ ডোমিনিয়নে নিযুক্ত গভর্ণর জেনারেল (Governor-General) রানীর প্রতিনিধি—ব্রিটিশ সরকারের নয়; গ কমনওয়েলথ্ভুক্ত দেশগুলির প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা

কোন দেশের শাসনতান্ত্রিক আইন সংবিধানের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়কে তুলে ধরতে পারে না। ব্রিটিশ সংবিধানের ক্ষেত্রে এ কথা আরও বেশী প্রযোজ্য, কারণ ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ব্রিটেনে সাংবিধানিক আইনকে সংকলিত করা হয়নি। সুতরাং ব্রিটেনের সাংবিধানিক আইন সমস্ত প্রয়োজনকে মেটাতে পারে না। প্রয়োজন ও সাংবিধানিক আইনের মধ্যে যে ফাঁকটুকু থাকে তা পূর্ণ করে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি। জেনিংসের ভাষায় বলা যায়, আইনের শুকনো হাড়ে মাংসের প্রলেপ লাগিয়ে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি সাংবিধানিক আইনকে সম্পূর্ণতা দান করে এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ও একে কার্যকর করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সাংবিধানিক আইন সব সময় পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। সে প্রয়োজন সিদ্ধ করে সাংবিধানিক রীতিনীতি। হার্ভে ও ব্যাথারের (Harvey and Bather) ভাষায় বলা যায় যে, এরা সরকারী যন্ত্রকে সহজভাবে পরিচালিত হতে সাহায্য করে (They help the machinery to run smoothly)।

দ্বিতীয়ত, সাংবিধানিক আইন অপেক্ষা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি অনেক বেশী নমনীয় (flexible) বলে তা শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে সহজ প্রয়োগে সক্ষম। একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে, সাধারণভাবে সাংবিধানিক আইন হল, মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ পদে কমন্সসভার সদস্যদের নিয়োগ করা হবে। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক

রীতিনীতি এই নিয়মকে অনেকাংশে নমনীয় করেছে। ফলে, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির সাহায্যে লর্ড সভার সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে নিয়োগে কোন বাধা নেই। তাই ১৯৬০ সালে প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান লর্ড সভার সদস্য লর্ড হোমকে বিদেশমন্ত্রী (Foreign Secretary) হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।

তৃতীয়ত, ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলি সংবিধানকে কার্যকর করার উপায় (means) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই দেখা যায়, প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্রিটেনের নমনীয় সাংবিধানিক রীতিনীতিকে পরিবর্তিত করা হয় বা নতুন রীতিনীতির বিকাশ ঘটে। সম্প্রতি কালে প্রয়োজনের তাগিদ থেকে এরূপ দু-একটি নতুন সাংবিধানিক রীতিনীতি উৎপত্তির উল্লেখ করা যায়। ১৯৪৮ সালে প্রিন্স চার্লস্-এর জন্ম অভিষেকে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (Home Secretary) অনুপস্থিত থাকেন। ফলে, এ ধরনের উৎসবে মন্ত্রীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয় এরূপ নতুন রীতিনীতি গড়ে ওঠে। সম্প্রতি আরও একটি রীতিনীতি গড়ে উঠেছে যে, কোন বিল প্রণয়নের সময় ঐ বিলের সাথে যে সকল মহলের স্বার্থ (interests) জড়িত তাদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করতে হবে।

চতুর্থত, বর্তমান যুগে কমন্সসভার প্রাধান্য দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—ফলে কমন্সসভার শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাংবিধানিক রীতিনীতির উৎপত্তি হয়েছে! কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করবে, মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী রাণী কাজ করবেন, কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে—এই শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। অর্থাৎ সরকারী কর্তৃত্ব যাতে গণইচ্ছার (অর্থাৎ কমন্সসভার ইচ্ছা) সাথে সাযুজ্য রক্ষা করতে পারে এবং গণইচ্ছার প্রাধান্য রক্ষিত হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখে এ সকল রীতিনীতির উদ্ভব হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, সাংবিধানিক প্রয়োজন সিদ্ধ করা, পরিবর্তিত সময় ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা, জনমতের ইচ্ছাকে রূপ দান করা এবং রাজনৈতিক বিকাশের ধারার সাথে সঙ্গতি বজায় রাখার প্রয়োজন শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি উৎপত্তির কারণ ও উৎস। তাই ব্রিটেনে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উদ্ভব একটি বিরামহীন ঘটনা। উইলিয়াম হোল্ডস্‌অরথ্ (William Holdsworth)-এর ভাষায় বলা যায় যে, যেখানে সরকারী কর্তৃত্ব বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির মধ্যে বণ্টিত সেখানে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উদ্ভব বিরামহীন ভাবে চলতে থাকে।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মান্য করা হয় কেন ?

প্রশ্ন উঠতে পারে, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও এদের কঠোরভাবে মান্য করা হয় কেন ? অর্থাৎ যদিও এগুলি আইন নয়, অথচ এদের আইনের মত মর্যাদা দেয়া হয় কেন ? অন্যভাবে বলা যায়, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুমোদনের (sanction) কারণ কি ?

একসময়ে মনে করা হত, শাস্তির ভয়ে (fear of impeachment) শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মান্য করা হয়। এই মতের সমর্থক ছিলেন এ. ভি. ডাইসী। ডাইসী

মনে করেন, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি অমান্য করলে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে সাংবিধানিক আইনকেও অমান্য করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, শাসনতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী বৎসরে অন্তত একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করার যে নিয়ম চলে আসছে তা ভঙ্গ করলে বাজেট পেশ হবে না, তার ফলে সরকার এক পয়সাও খরচ করতে পারবে না এবং করলে তা বে-আইনী কাজ হবে। অর্থাৎ শাসনতান্ত্রিক রীতি ভঙ্গ করা হ'লে পরিণামে সাংবিধানিক আইন ভঙ্গ করা হবে এবং সে ক্ষেত্রে আইনভঙ্গ করার জন্য শাস্তি পেতে হবে।

শাস্তির ভয়

কিন্তু সমালোচকেরা মনে করেন, যে-কোন শাসনতান্ত্রিক রীতি ভঙ্গ করলে পরিণামে আইনভঙ্গ করা হবে—ডাইসীর এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। সমালোচকেরা সঠিকভাবেই বলেছেন যে, ব্রিটেনে এমন অনেক শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি আছে যেগুলি অমান্য করলে শাসনতান্ত্রিক আইনভঙ্গ করা হয় না। যেমন, কমন্সসভার সদস্যদের মধ্য থেকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি। কিন্তু ঐ রীতিনীতি ভঙ্গ করে লর্ডসভার কোন সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী করলে এর জন্য শাসনতান্ত্রিক আইনের সাথে কোনও সংঘর্ষ ঘটবে না এবং এর দ্বারা শাসনতান্ত্রিক আইন ভঙ্গ করা হবে না। আরও একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, সরকার কর্তৃক 'বিরোধী দল'-কে স্বীকৃতি দেওয়া ব্রিটেনের একটি শাসনতান্ত্রিক রীতি। এ রীতি ভঙ্গ করলে জনমত ক্ষিপ্ত হতে পারে, কিন্তু এ কাজের দ্বারা শাসনতান্ত্রিক আইন ভঙ্গ করা হবে না।

ডাইসীর বক্তব্যের সমালোচনা

এমনকি লওয়েল দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, বৎসরে অন্তত একবার ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আহ্বান করার শাসনতান্ত্রিক রীতি অনুসরণ করা না হলেও এর দ্বারা পরিণামে আইন ভঙ্গ করা হয় না। যেমন, লাওয়েল মনে করেন যে, ১. সার্বভৌম ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রতি বছর 'আর্মি অ্যাক্ট' (*Annual Army Act*) পাশ না করে ঐ আইনকে স্থায়ীভাবে (permanent) পাশ করতে পারে—এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সৈন্যদের মাইনে এবং এ সংক্রান্ত ব্যয় প্রতি বছর পার্লামেন্টের দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নিতে হয় না। ২. প্রতি বছর পার্লামেন্ট দ্বারা কর আদায় অনুমোদন না করিয়ে প্রচলিত কর ব্যবস্থাকে কয়েক বছরের জন্য, পার্লামেন্ট অনুমোদন করতে পারে—এর ফলে সরকারী তহবিলে অর্থ আদায়ের জন্য বৎসরে অন্তত একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করার প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না। ৩. 'সঞ্চিত তহবিল' (Consolidated Fund) থেকে স্থায়িভাবে খরচ চালাবার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন পাশ করতে পারে—এর ফলে ব্যয়ের জন্য প্রতি বছর পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে না। সুতরাং ডাইসীকে অনুসরণ করে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হবে না যে, ব্রিটেনে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মানা করা হয় এ কারণে যে এগুলি মানা না করলে পরিণামে আইন ভঙ্গ করা হবে।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি কেন মানা করা হয়, এ প্রশ্নের উত্তর নিছক আইনের ব্যাখ্যা দ্বারা দেয়া সম্ভব নয়। জেনিংস যথার্থই মনে করেন, নিছক আইনের ভয়ে রীতিনীতি মানা করা হয় না—এর পেছনে অন্য কারণ রয়েছে। জনগণ যদি কোন রীতিনীতি মানা করা হবে না বলে স্থির সিদ্ধান্ত করে তবে কোন আইনের ভয় বা শাস্তির ভয়

রাজতন্ত্র
MONARCHY

২-১. রাজতন্ত্র
Monarchy

রাজতন্ত্র ব্রিটেনের প্রাচীনতম রাজনৈতিক সংস্থা (political institution)। ক্রমওয়েলের সময়ে রিপাবলিকের এগার বছর (১৬৪৯—১৬৬০) বাদে ৮২৯ সাল (King Egbert-এর সময়) থেকে ব্রিটেনে রাজতন্ত্র ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। ব্রিটেনে পার্লামেন্ট ও অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্থার আবির্ভাব ঘটে রাজতন্ত্রের অনেক পরে। ব্রিটেনের রাজা বা রানীর শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ও অবস্থান আলোচনা করার আগে সেখানে ব্যক্তি হিসাবে রাজা বা রানী (King or Queen as a person) এবং সংস্থা হিসাবে রাজপদের (Crown as an Institution) মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

রাজা ও রাজপদ

রানী (বা রাজা) ও রাজপদ বা রাজশক্তি শব্দ দুটি ব্রিটেনে একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। রাজা বা রানী হলেন একজন ব্যক্তিবিশেষ যিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত। রাজপদ হল দেশের সর্বময় কর্তৃত্বের প্রতীক। জে. এইচ. প্রাইসের (J. H. Price) মতে ব্রিটেনের সরকারী ক্ষমতার যোগফলকে 'রাজপদ' বা *Crown* শব্দটির দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অনেকের মতে, রানী, মন্ত্রীবর্গ এবং সংসদের সমন্বয়কে রাজপদ বলা হয়।[১]

রাজতন্ত্র ও রাজপদ

শুধু রানী ও রাজপদের মধ্যেই নয়, ব্রিটেনে রাজতন্ত্র (Monarchy) এবং রাজপদের (Crown) মধ্যেও পার্থক্য করা হয়। রাজপদ হল একটি নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) ও আইনগত ধারণা। রানীর বিশেষাধিকারসহ শাসনবিভাগ যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের যোগসমষ্টির প্রতীক হিসাবে রাজপদকে দেখা হয়। অন্যদিকে রাজা বা রানী হলেন একজন ব্যক্তি যাঁর নামে মন্ত্রিসভা ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং যিনি মন্ত্রিদের কাজের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন না।

ব্রিটেনে ব্যক্তি হিসাবে রানী এবং প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজতন্ত্র ও রাজপদের ভিতরকার পার্থক্য যাতে সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় তার জন্য নীচে আমরা এ সম্পর্কে প্রচলিত কয়েকটি প্রবচন (maxims) আলোচনা করছি।

ক. রাজার মৃত্যু হয়েছে, রাজা দীর্ঘজীবী হোক (The king is dead, long live the king)

এ প্রবচনের দ্বারা ব্যক্তি হিসাবে রাজা বা রানীর সাথে প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজপদের পার্থক্য সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ব্যক্তি হিসাবে রাজা বা রানীর মৃত্যু হতে পারে—কোন ব্যক্তিই অমর নয়। কিন্তু রাজপদের মৃত্যু নেই, রাজকীয় ক্ষমতার অবসান

১. The term "Crown is not synonymous with 'Monarch' but refers rather to the synthesis of Monarch, Ministers and Parliament"—Introduction to Political Science, Rodee, Anderson Christal and Greene. P 192.

ঘটে না—তা লয় ও ক্ষয়ের ঊর্ধ্বে। রাজপদ নামক সংস্থাটিই সকল প্রকার রাষ্ট্রক্ষমতার ধারক, বাহক ও নিয়ামক। রাজপদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুর দ্বারা রাজ-পদের অবলুপ্তি ঘোষিত হয় না—রাজপদ ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকে। রাজপদ এক মুহূর্তের জন্যও অচল থাকে না, ঐ পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুর সাথে সাথে পরবর্তী উত্তরাধিকারী ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন। অর্থাৎ রাজপদের ধারাবাহিকতা মুহূর্তের জন্যও ব্যাহত হয় না। তাই 'রাজার মৃত্যু হয়েছে, রাজা দীর্ঘজীবী হোক' বা 'রাজার মৃত্যু নাই' (The King never dies) প্রবচনগুলি দ্বারা প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজপদের ধারাবাহিকতার কথাই বলা হয়। মুনরোর ভাষায় বলা যায়, "The crown is an artificial or juristic person, it is not incarnate and it never dies."

খ. রাজা কোন অন্যায় করতে পারেন না (The King can do no wrong)

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার আর একটি প্রবচন হল 'রাজা কোন অন্যায় করতে পারেন না'। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজপদই সব ক্ষমতার উৎস, সেখানে তাই সব কিছু রাজা বা রানীর নামে করা হয়। রানীর নামে যে সব কাজ করা হয় এবং তাঁর নামে যে সব নির্দেশ দেয়া হয় সেগুলিতে স্বাক্ষর করেন দায়িত্বশীল কোন-না-কোন মন্ত্রী। রানীর নামে যে সব কাজকর্ম করা হয় বা নির্দেশ দেওয়া হয় সেগুলি যদি পরে অবৈধ বা অন্যায় বলে প্রতীয়মান হয় বা সেগুলির বিরুদ্ধে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তবে ঐ কাজ বা নির্দেশের জন্য রানী দায়ী থাকবেন না, এর জন্য দায়ী হবেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী। ১৯৪৭ সালের *The Crown Proceedings Act* অনুযায়ী রানীর নামে কোন অন্যায় বা অবৈধ কাজ ঘটলে তার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেই দায়ী করা হয়। অর্থাৎ রানীর নামে মন্ত্রীরা যে সব সাংবিধানিক কাজকর্ম করে ঐ সব কার্যের ভাল-মন্দ বা ন্যায়-অন্যায়ের জন্য রানী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন না, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিই ঐ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য থাকেন। ঐ সব কাজ রানীর নামে করা হয়েছে এ অজুহাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অব্যাহতি পেতে পারেন না। রানীর নামে সম্পাদিত ঐ সব কাজের জন্য রানীকে আদালতেও অভিযুক্ত করা যায় না। এ জন্যই বলা হয়, রানী কোন অন্যায় করতে পারেন না।

গ. রাজা রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না (The King reigns, but does not rule)

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রানী চরম ক্ষমতার অধিকারী। রানী শাসন-বিভাগীয় প্রধান, সংসদের তিনি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং বিচার বিভাগীয় প্রভূত ক্ষমতার তিনি অধিকারী। এ ছাড়াও তিনি কূটনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু ঐ সব ক্ষমতাকে রাজা বা রানীর ক্ষমতা বলে অভিহিত করা হলেও ঐগুলি ব্রিটেনের রানীর ব্যক্তিগত ক্ষমতা নয়—ঐ ক্ষমতাগুলি একান্তভাবেই রাজপদ (Crown) নামক প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা। ব্রিটেনের রাজপদ আনুষ্ঠানিক ভাবে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হলেও রানী ব্যক্তিগতভাবে ঐ সব ক্ষমতা ভোগ বা প্রয়োগ করতে পারেন না। জনগণের আস্থাভাজন দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভাই প্রকৃতপক্ষে ঐ সব ক্ষমতা প্রয়োগ করে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। শাসনকার্য পরিচালনায় রানীর ব্যক্তিগত কোন ভূমিকা না থাকলেও রানীর মর্যাদা এবং জাঁকজমকের কোন ত্রুটি নেই। বরং বলা যায় যে, ব্রিটেনের রানী

প্রভূত বিলাসিতা, জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যের ভিতর জীবন অতিবাহিত করেন। এজন্যই বলা হয়; ব্রিটেনের রাজা বা রানী রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না।

২-২. রাজশক্তির বিশেষাধিকার
Prerogatives of the Crown

নর্মান আমল থেকেই ব্রিটেনের রাজা বা রানীর তিনটি সত্তা বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে। এগুলি হলঃ ১. রানী আইন অনুমোদন করেন; ২. মন্ত্রীরা সকলে মহামান্য রানীর মন্ত্রী (Her Majesty's Ministers) এবং ৩. মহামান্য রানীর বিচারকেরা ন্যায় ও বিচারকে প্রয়োগ করেন। রানী যাতে তাঁর কাজ ও দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করতে পারেন তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ও নীতি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে রানীর অধিকতর ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। ফলে, ব্রিটেনের প্রথাগত আইনের (common law) অঙ্গ হিসাবে রাজা বা রানীরা কতকগুলি অধিকার ধারাবাহিকভাবে ভোগ করতে থাকেন এবং ঐ অধিকারগুলিই ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রানীর 'বিশেষাধিকার' নামে পরিচিত হয়। ব্ল্যাকষ্টোনের ভাষায় বলা যায় যে, রানীর রাজকীয় মর্যাদার প্রতীক হিসাবে এবং অন্যান্য ব্যক্তি থেকে রানীর প্রাধান্য সূচিত করে সাধারণ আইনের অংশ হিসাবে রানীর বিশেষাধিকারের প্রকাশ।

উৎস

রানীর বিশেষাধিকার সংক্রান্ত ধারণাটি খুবই অস্পষ্ট। শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত কোন দলিলে এর সংজ্ঞা দেয়া হয়নি এবং এর চরিত্র, প্রকৃতি ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করা হয়নি। ফলে অতীতে কোন কোন রাজা বিচারবিভাগের ব্যাখ্যার সাহায্যে বিশেষাধিকারের নামে যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার লাভ করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে রাজকীয় বিশেষাধিকারের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা শুরু হয়। এমনকি একসময়ে পার্লামেণ্ট দাবী করে যে, আইন (Statute) প্রণয়ন করে পার্লামেণ্ট রাজকীয় বিশেষাধিকার সীমিত ও খর্ব করার অধিকারী। এ দাবীর অর্থ হল রানীর বিশেষাধিকারের চরমতাকে অস্বীকার করা। স্টুয়ার্ট রাজারা কখনই এ দাবী মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা বিশেষাধিকারকে ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার (Divine Right) হিসাবে দাবী করেন। যাই হোক, গৌরবজনক বিপ্লব-এর ফলশ্রুতি হিসাবে ১৬৮৯ সালে অধিকারের সনদ (*Bill of Rights*) রাজকীয় বিশেষাধিকারের উপর কিছু কিছু বাধা-নিষেধ আরোপ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজকীয় বিশেষাধিকারের অনেকগুলিই অবশিষ্ট থেকে যায়।

ধারণাটি অস্পষ্ট

সীমাবদ্ধতা আরোপ

বিশেষাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে রানীকে দুটি শর্ত পালন করতে হয়। প্রথমত, মন্ত্রী নির্বাচন করা ও মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে রানীকে পক্ষপাতহীন হতে হয় এবং দলীয় ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। যেমন, সাধারণ নির্বাচনে যদি শ্রমিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তবে শ্রমিক দল যাকে নেতা নির্বাচন করবে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা রানীর পক্ষে বাধ্যতামূলক। মন্ত্রিসভা গঠন করার সময়ে তিনি শ্রমিক দলের বাইরে

বিশেষাধিকার প্রয়োগের শর্ত

অন্য কোন দলের সদস্যকে মন্ত্রিসভায় নেবার জন্য চাপ দিতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, সব বিষয়ে রানীকে দায়িত্বশীল মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে।

রানীর কয়েকটি বিশেষাধিকার ঃ

ব্রিটেনে রানী বর্তমানে যে সব বিশেষাধিকার প্রয়োগ করেন নীচে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আলোচনা করা হল ঃ

১. **প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ঃ** ব্রিটেনে সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন রানী। আগেই বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে প্রচলিত রীতি হল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংসদীয় নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা। কার্যরত অবস্থায় কোন প্রধানমন্ত্রী যদি মারা যান বা কোন প্রধানমন্ত্রী যদি পদত্যাগ করেন সে ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগে রানীর কিছুটা বিশেষাধিকার থাকে। যেমন, ১৮৯৪ সালে ভগ্নস্বাস্থের জন্য প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন পদত্যাগ করায় রানী ভিক্টোরিয়া গ্লাডস্টোনের সঙ্গে পরামর্শ না করে লর্ড রোসবেরীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। কিন্তু এর বিপরীত ঘটনাও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, ১৯৬৩ সালে একই কারণে প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান পদত্যাগ করায় রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ম্যাকমিলানের পরামর্শ মত লর্ড হোমকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। বর্তমানে অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নিয়োগে রানীর বিশেষাধিকার প্রয়োগের সুযোগ খুবই কম। কারণ সংসদীয় নেতার পদ শূন্য হলে বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলি সাথে সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন নেতা নির্বাচন করে। তবে সাধারণ নির্বাচনে কোন একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সমর্থ না হলে বা কোন জাতীয় সংকটের পটভূমিকায় কোন সরকার পদত্যাগ করলে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে রানী ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রয়োগের বিশেষাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

২. **মন্ত্রীদের নিয়োগ ঃ** এক সময়ে ব্রিটেনে রাজা বা রানীরা মন্ত্রীদের মনোনীত করতেন এবং মন্ত্রীরা তাঁর নিকট দায়িত্বশীল থাকতেন। কিন্তু দলীয় ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে মন্ত্রীদের মনোনীত করার দায়িত্ব ক্রমে প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু এখনও মন্ত্রীদের মনোনয়নে রাজা বা রানীর নিজস্ব মতামতকে অবজ্ঞা করা সম্ভব হয় না। যেমন, ১৯৪৫ সালে প্রধানমন্ত্রী এটলী বিদেশমন্ত্রী হিসাবে হিউগ ডালটনের নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু রাজা ষষ্ঠ জর্জ ডালটনের বদলে আরনেষ্ট বেভিনকে ঐপদে নিয়োগের পরামর্শ দেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ঐ পরামর্শ গ্রহণ করে বেভিনকে বিদেশমন্ত্রী করেন।

৩. **পার্লামেণ্ট বাতিল করা ঃ** প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রানী কমন্সসভা বাতিল ঘোষণা করতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করতে রানী বাধ্য কিনা? সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মত হল যে তিনটি বিশেষ অবস্থা ছাড়া সাধারণভাবে রানী কমন্সসভা বাতিলের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী তথা মন্ত্রিসভার পরামর্শ মেনে চলবেন। তবে যদি দেখা যায়, ক. পার্লামেণ্ট কর্মক্ষম এবং নিজ দায়িত্ব পালনে সমর্থ; খ. সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে তা ক্ষতিকর হবে; গ. সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের সুযোগ রয়েছে—তবে রানী কমন্সসভা বাতিল করার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ বা পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারেন।

৪ **বিলে স্বাক্ষর দান না করাঃ** বিলে স্বাক্ষরদান করা বা না-করা রানীর বিশেষাধিকারের মধ্যে পড়লেও বাস্তবে রানীর পক্ষে পার্লামেন্টে অনুমোদিত কোন বিলে স্বাক্ষর দান থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয়। বস্তুত অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে রানী অ্যানের রাজত্বকালে ঐ বিশেষাধিকার শেষবারের মত প্রয়োগ করা হয়েছিল।

৫. **অন্যান্য বিশেষাধিকারঃ** উপাধি দ্বারা অভিষিক্ত করা, বৈদেশিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা, যুদ্ধ ঘোষণা করা, চুক্তি সম্পাদন করা, ক্ষমা প্রদর্শন করা, সম্মান বিতরণ করা ইত্যাদি রানীর বিশেষাধিকার। তবে এ সকল বিশেষাধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে দায়িত্বশীল মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করা রানীর পক্ষে বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রানীর বিশেষাধিকারের গুরুত্ব

সাধারণ আইনকে ভিত্তি করে রাজা বা রানীর যে সব বিশেষাধিকার মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে তার কিছু কিছু আইন প্রণয়নের ফলে অবলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে অবশিষ্ট যা রয়েছে তাও রানী ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুযায়ী প্রয়োগ করেন না। এ অবস্থায় রাজকীয় বিশেষাধিকার টিকে থাকার কোন প্রয়োজন আছে কিনা এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিতে পারে। সুতরাং বর্তমান যুগে বিশেষাধিকারগুলি কেন টিকে আছে এবং শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব কী এ প্রশ্ন আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, বলা যায় যে ব্রিটিশ জাতি মূলত রক্ষণশীল বলে রাজকীয় বিশেষাধিকারগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত কোন শাসনতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি না করছে ততক্ষণ এদের পুরোপুরি বিলোপসাধন তারা চান না।

দ্বিতীয়ত, বিশেষাধিকারগুলি সাধারণত শাসনবিভাগের (executive) ইচ্ছা অনুযায়ী রানীর নামে প্রয়োগ করা হয় এবং এ ব্যাপারে পার্লামেন্টের অনুমোদন নিতে হয় না। শাসনবিভাগকে এমন অনেক কাজ করতে হয় (যেমন, পার্লামেন্টকে বাতিল করা) যা পার্লামেন্টের অনুমোদন নিয়ে করা সম্ভব নয়, ঐ সব ব্যাপারে রানীর বিশেষাধিকার প্রয়োগের দ্বারা পার্লামেন্টের অনুমোদন না নিয়ে ঐ সব কাজ সম্পন্ন হতে পারে। তা ছাড়াও যে সব ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন বা সব বিষয় দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে চিন্তা করা প্রয়োজন যে সব ক্ষেত্রে পার্লামেন্টে বিষয়টি তোলা অসুবিধাজনক হতে পারে। তাই ঐ সব ব্যাপারে রাজকীয় বিশেষাধিকার প্রয়োগ করার প্রয়োজনীতা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়।

তৃতীয়ত, বিশেষাধিকার শাসনব্যবস্থাকে নমনীয়তা দান করে এবং ফলে এর জন্য প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে চলার সুযোগ থাকে। কিন্তু কোন বিশেষাধিকারকে আইনে রূপান্তর করলে তার নমনীয়তা হ্রাস পায়।

চতুর্থত, কোন বিশেষাধিকার প্রয়োগ করা বা না করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যেমন, কোন অবস্থায় একাধিক দলের সম্মিলিত সরকার (Coalition Government) গঠন করা শ্রেয় মনে করলে বিশেষাধিকার প্রয়োগ করে তা করানো যেতে পারে; আবার কোন বিশেষ অবস্থায় সম্মিলিত সরকার গঠন করা জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচিত হলে সম্মিলিত সরকার গঠন করা থেকে বিরত করা যেতে পারে। কিন্তু বিশেষাধিকার বাতিল করে ঐ বিষয়ে নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করলে সব অবস্থায় উহার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক হয়ে দেখা দেয়।

পঞ্চমত, ব্রিটেনে রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষা এবং এর কার্যকর ভূমিকা পালনে রাজকীয় বিশেষাধিকারের বিশেষ গুরুত্ব আছে। ব্রিটেনের রানী আনুষ্ঠানিক প্রধান মাত্র, এ অবস্থায় তাঁর বিশেষাধিকারগুলি বাতিল করলে রাজতন্ত্র টিকে থাকার আর কোন স্বার্থকতা থাকে না।

২ ৬. রানীর ক্ষমতাসমূহ

Powers of the Queen

আমরা দেখেছি যে, কালের অগ্রগতি ও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজপদের বিশেষাধিকার হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ব্রিটেনে গণতন্ত্র প্রসারের সাথে সাথে রাজশক্তির ক্ষমতা প্রসারিত হয়েছে।[১] পার্লামেন্টে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন আইন গৃহীত হচ্ছে এবং প্রতিটি আইনই রাজশক্তির ক্ষমতা একটু একটু করে সম্প্রসারিত করছে। রাজশক্তির ক্ষমতার উৎস দুইটি ঃ পূর্বে আলোচিত রানীর বিশেষাধিকার এবং পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন (statute)। যাই হোক নীচে আমরা রানীর বিভিন্ন ক্ষমতা আলোচনা করছি।

ক. শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা (Executive Powers

ব্রিটেনের রানী সরকারের শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং শাসন-সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা ব্রিটেনে রানীর নামে প্রয়োগ করা হয়। ব্রিটেনে যাতে আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালিত হয় তা দেখা এবং তাকে নিশ্চিত করার দায়িত্ব রানীর উপর ন্যস্ত। শাসনবিভাগের প্রধান হিসাবে রানী প্রধানমন্ত্রীকে এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের, শাসনবিভাগে সব উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের এবং বিচারকদের নিয়োগ করেন। বিচারক ব্যতীত উপরোক্ত অন্যান্য কর্মচারীদের তিনি পদচ্যুত করতে পারেন। রানী ব্রিটেনের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়িকা এবং সৈন্যবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান-বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের তিনি নিয়োগ করেন। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় যে, রানী শাসনবিভাগীয় প্রধান এবং তাঁর নামেই সব প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়

এ ছাড়াও বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা ও তা নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে ন্যস্ত। ডোমিনিয়ান ও উপনিবেশের শাসন পরিচালনা করাও তাঁর দায়িত্ব। বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা, বিদেশের রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ করা এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে নির্দেশ দান করা তাঁর ক্ষমতার অন্তর্গত। যুদ্ধ ঘোষণা করা, শান্তি স্থাপন করা এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করাও তাঁর দায়িত্ব।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, রানীর এ সব ক্ষমতা কী বাস্তবে তিনি নিজে ভোগ করেন, অথবা ঐ সব ক্ষমতা একান্তভাবেই আনুষ্ঠানিক (formal)? মনে রাখতে হবে যে, রানীর যে সব শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার কথা আলোচনা করা হয়েছে তা রাজশক্তির ক্ষমতা, রানীর ব্যক্তিগত ক্ষমতা নয়। পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী রাজশক্তির ঐ সব ক্ষমতাকে রানী প্রয়োগ করেন। পরে রানীর ক্ষমতার মূল্যায়ন করার সময়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

রানীর ঐ সকল ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক

---

১. "The Powers of the Crown have expended as democracy has grown". Ogg and Zink

খ. আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Powers)

ব্রিটেনের রানী কমন্সসভা ও লর্ডসভাকে নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গঠিত। অর্থাৎ ব্রিটেনে রানী পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ অঙ্গ। রানীসহ পার্লামেন্ট (Queen-in-Parliament) আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতা ভোগ করে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে সব বিল পাশ করে রানীর স্বাক্ষর লাভ করার পর তা বিধিবদ্ধ আইনে (Act) পরিণত হয়। অর্থাৎ পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত প্রতি টি বিলই রানীর সম্মতি তথা স্বাক্ষরের জন্য উপস্থিত করা হয় এবং একমাত্র তাঁর স্বাক্ষর লাভ করে তা আইনে পরিণত এবং কার্যকর হয়।

আইন প্রণয়নে রানীর ভূমিকা

এখন প্রশ্ন হল, পার্লামেন্ট কর্তৃক যথারীতি গৃহীত কোন বিলে রানী সম্মতি দান করতে বাধ্য কিনা ? রানী মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য—এ নীতি অনুযায়ী পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত বিলে সম্মতি দান করা ছাড়া রানীর সামনে কোন বিকল্প নেই। ফলে ব্যক্তিগতভাবে রানী কোন বিলের বিরোধী হলেও তাঁকে বিলে সম্মতি দান করতে হয়। রানী অ্যান-এর রাজত্বকাল থেকে আজ পর্যন্ত কোন বিলে স্বাক্ষর দান করতে রাজা বা রানীরা অসম্মতি জানাননি। সুতরাং রাজকীয় সম্মতি দান বা স্বাক্ষর দান একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

সম্মতি দান আনুষ্ঠানিক

দ্বিতীয়ত, পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা, এর অধিবেশন মুলতুবী রাখা এবং পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেবার ক্ষমতা রানী ভোগ করেন। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা সম্পর্কে সাংবিধানিক রীতি হল যে, প্রতি বছর অন্তত একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করতে হবে। প্রতি বৎসর পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে রানী একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, ঐ অভিভাষণটি রানীর অভিভাষণ নামে পরিচিত হলেও তা রচনা করে ক্যাবিনেট এবং এর বিষয়বস্তু বা এর অংশবিশেষ সম্পর্কে রানীর আপত্তি থাকলেও তাঁর পক্ষে তা বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। যাই হোক, বৎসরে একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা সম্পর্কে আগে আমরা আলোচনা করেছি যে, এ রীতি ভঙ্গ করলে সরকার অচল হয়ে পড়বে। পার্লামেন্টের অধিবেশন মুলতুবী রাখা এবং পার্লামেন্ট বাতিল করা বা ভেঙ্গে দেবার ব্যাপারে রানী সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী চলেন। পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া রানীর বিশেষাধিকার। কোন কোন ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট ভাঙ্গার ব্যাপারে রানী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ না করে নিজের বিশেষাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন (রানীর 'বিশেষাধিকার' পর্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে)।

তৃতীয়ত, রানী 'স-পারিষদ রাজাদেশ' (Orders-in-Council) জারী করে তাঁর বিশেষাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন এবং ঐ সব রাজাদেশ আইনের মতই কার্যকর হয়। যে সব ক্ষেত্রে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে হয় (যেমন যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি-স্থাপন ইত্যাদি) সে সব ক্ষেত্রে রানী 'স-পারিষদ রাজাদেশ' জারী করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। এ ছাড়া উপনিবেশের শাসন ব্যাপারে এরূপ 'রাজাদেশ' দ্বারা আইন প্রণয়ন করা যায়।

স-পারিষদ রাজাদেশ

গ. অন্যান্য ক্ষমতা (Miscellaneous Powers)

উপরোক্ত ক্ষমতা ছাড়াও রানী বিচার সংক্রান্ত, সম্মান বিতরণ সংক্রান্ত, খ্রীষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কিছু কিছু ক্ষমতার অধিকারী।

১. রানী ন্যায়-বিচারের উৎস: ব্রিটেনে রানীকে সব ন্যায়-বিচারের উৎস (Fountain of Justice) বলে অভিহিত করা হয়। অতীতে রাজা বা রানীরা প্রত্যক্ষভাবে বিচারকার্যে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন এবং তাঁরা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত বা রায় বাতিল করে নিজেদের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতেন। আজও তত্ত্বগত দিক থেকে রানী প্রভূত পরিমাণ বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা ভোগ করেন। রানীর বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তিনি বিচারকদের নিয়োগ করেন, তিনি ক্ষমা প্রদর্শন করে বিচারালয় কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞা হ্রাস বা মকুব করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে বিচারক নিয়োগ এবং ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। বিচারালয়ের গঠন ও বিচারকদের চাকরির শর্ত পার্লামেন্ট আইন দ্বারা স্থির করে দেয়—এ ব্যাপারে রানীর কোন ভূমিকা নেই। পার্লামেন্টের অনুমোদন বাদে কোন বিচারককে অপসারণ করা যায় না। ব্রিটেনে সব ফৌজদারী মামলা রানীর নামে আনা হয়। ডোমিনিয়ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপীল হলে তা রানী প্রিভি-কাউন্সিলের বিচার সমিতির পরামর্শ অনুযায়ী বিচার করেন। সর্বোপরি রানী ন্যায় বিচারের উৎস, এ যুক্তিতে কোন অপরাধের জন্য রানীকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করা যায় না।

২. রানী সম্মানের উৎস: রানীকে সম্মানের উৎস হিসাবেও মনে করা হয়। অতীতে রাজা বা রানী নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সম্মান বিতরণের বিশেষাধিকার প্রয়োগ করতেন। কিন্তু বর্তমানে মন্ত্রিসভা এবং প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ ও সুপারিশ অনুযায়ী পীয়্যার, নাইট প্রভৃতি খেতাবে অভিষিক্ত করা হয় এবং অন্যান্য সম্মানসূচক উপাধি বিতরণ করা হয়।

৩. রানী খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানের প্রধান: রানী ব্রিটেনের খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং ঐ ক্ষমতাবলে তিনি প্রধান যাজক ও অন্যান্য যাজকদের নিয়োগ করেন। তবে এ ব্যাপারেও রানীকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হয়।

২-৪. রাজশক্তির ভূমিকা ও ক্ষমতার মূল্যায়ন

An Evolution of the Role and Powers of the Crown

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় রাজশক্তির ভূমিকা ও ক্ষমতার মূল্যায়ন করার সময়ে মনে রাখা প্রয়োজন যে, একসময়ে রাজা বা রানী ব্যাপক বিশেষাধিকারের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু বিগত কয়েক শতক ধরে ঐ বিশেষাধিকারগুলি একটু একটু করে হ্রাস পেয়েছে। এমনকি বর্তমানে বিশেষাধিকারের যে অবশিষ্টাংশ রয়েছে তাও পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা এবং বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে বা তত্ত্বগতভাবে যাই মনে হোক না কেন, বাস্তব ঘটনা হল এই

বিশেষাধিকার হ্রাস পাওয়ায় রাজশক্তির ক্ষমতা কমেছে

যে, রাজশক্তির নামে যে সব ক্ষমতার কথা বলা হয় তার অধিকাংশই মন্ত্রিসভার হাতে চলে গিয়েছে।

রানীর একটি বিশেষাধিকার হল প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করে সরকার গঠনে সাহায্য করা। আমরা রানীর বিশেষাধিকারের আলোচনায় দেখেছি যে এ ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কমন্সসভার নির্বাচনে যে দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে রানী সে দলের সংসদীয় নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করতে বাধ্য এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। তবে কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলে এবং কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হলে রানীর ব্যক্তিগত পছন্দ-প্রয়োগের সামান্য সুযোগ থাকে। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, বিচারক, প্রতিরক্ষা বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ করা রানীর বিশেষাধিকার। কিন্তু ঐ সব নিয়োগ রানীর নামে করা হলেও বাস্তবে ঐ সব নিয়োগও মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করা হয়।

মন্ত্রী নির্বাচনে রানীর ভূমিকা নগণ্য

অন্যান্য নিয়োগ

এ ছাড়াও যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন, চুক্তি সম্পাদন করা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি রানীর বিশেষাধিকার তথা ক্ষমতার অন্তর্গত হলেও মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী ঐ সব কাজ করা হয়। ব্রিটেনে এ সম্পর্কে যে প্রচলিত রীতি গড়ে উঠছে তা উপেক্ষা করে রানীর পক্ষে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

যুদ্ধ, শান্তি ও চুক্তি সংক্রান্ত ক্ষমতা

রানী আইনসভার অধিবেশন আহ্বান বা তা মুলতুবী রাখার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী গ্রহণ করেন। প্রতিবছর পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে রানী যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাও মন্ত্রিসভা রচনা করে। পার্লামেন্ট বাতিল করা রানীর বিশেষাধিকারের অন্তর্গত। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, তিনটি মাত্র ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে রানী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ বাদে পার্লামেন্ট বাতিল করতে পারেন না। একথা ঠিক যে পার্লামেন্টে গৃহীত কোন বিল রানীর স্বাক্ষর লাভ করতে না পারলে আইনে পরিণত হয় না, কিন্তু বিলে স্বাক্ষর দান একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। রানী অ্যানের পরে (১৭০৭) বিগত দুশো সত্তর বছর কোন রাজা বা রানী পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত বিলে স্বাক্ষর দান করতে অসম্মতি জানাননি।

আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রানীকে সকল প্রকার ন্যায় বিচারের উৎস বলে মনে করা হলেও বাস্তবে দেখা যাবে যে, পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইনের ভিত্তিতেই বিচারালয় গঠিত হয়, বিচারকদের চাকরির শর্ত নির্ধারিত হয় এবং বিচারকার্য সম্পাদিত হয়। অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারেও রানীকে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হয়। মন্ত্রিসভার পরামর্শ বাদে রানী কাকেও সম্মান বিতরণ করেন না। সুতরাং বলা যায়, অতীতে রাজশক্তি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী উপরোক্ত ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করলেও বর্তমানে ধীরে ধীরে এগুলি মন্ত্রিসভার ক্ষমতায় পরিণত হয়েছে।

বিচার ও সম্মান বিতরণ

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে ব্যাপক ক্ষমতাকে রানীর বিশেষাধিকার তথা ক্ষমতা বলা হয় এবং যা রানীর নামে প্রয়োগ করা হয়—ঐ সব ক্ষমতার অধিকাংশই রাজশক্তির ব্যক্তিগত ক্ষমতা নয়। ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক প্রধানের প্রয়োজনীয়তা মেটায় রাজশক্তি—সমালোচকদের ভাষায় সাংবিধানিক কাজের সুবিধার জন্য রাজশক্তি একটি কাল্পনিক প্রকাশ মাত্র (a convenient working hypothesis)। রাজা বা রানীর এ আনুষ্ঠানিক ভূমিকা লক্ষ্য করে কেউ কেউ তাঁদের জাঁকজমকপূর্ণ নির্বাক দ্রষ্টা (magnificent cipher) বলে অভিহিত করেছেন। বেজহট মনে করেন যে রাজশক্তির মাত্র তিনটি ক্ষমতা আছে। এগুলি হল : মন্ত্রিমণ্ডলীকে পরামর্শ দেওয়া, উৎসাহ দেওয়া এবং সতর্ক করা (The crown has three rights : the right to be consulted, the right to encourage, the right to warn)।

রাজশক্তি নির্বাক দ্রষ্টা

কিন্তু অনেক সমালোচক মনে করেন যে, রাজশক্তির ক্ষমতা ও ভূমিকার উপরোক্ত মূল্যায়ন সঠিক নয়। বার্কার মনে করেন যে রাজশক্তি এখনও শাসনব্যবস্থার ক্রিয়াশীল অংশ। হুইয়ারও মনে করেন যে, যদিও রানী ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে পুতুল মনে করা ঠিক নয়।[১] সুতরাং বলা যায়, রাজশক্তি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও এর গুরুত্ব হ্রাস পায়নি বা এর সাংবিধানিক ভূমিকার অবমূল্যায়ন ঘটেনি। বরং দেখা যায়, ব্রিটিশ জনমনে রানীর জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান এবং ব্রিটিশ জনগণ একান্তভাবেই বিশ্বাস করে যে কিছু কিছু সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য রাজতন্ত্র এখনও অপরিহার্য।

অন্যমত : গুরুত্বহ্রাস পায়নি

রানীর ভূমিকার গুরুত্ব

এবার আমরা সাংবিধানিক ক্ষেত্রে রানীর ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো।

১. বিগত দুশো বছর ধরে মন্ত্রিসভার পরামর্শ মত চলার যে রীতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তার ফলে রানীর ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছে সত্য, কিন্তু এর ফলে রানীকে দলীয় রাজনীতির আবর্ত থেকে মুক্ত করা হয়েছে, রানীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে এবং রাজতন্ত্রকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্টুয়ার্ট রাজাদের সময়ের মত বর্তমানে পার্লামেণ্ট ও জনগণের সাথে রানীর মতভেদ, সংঘর্ষ ও খুনাখুনির কথা কল্পনাও করা যায় না। বর্তমান ব্যবস্থায় রানীর ব্যক্তিগত মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্রিটেনের জাতীয় জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষার অপরিহার্য রক্ষা-কবচ হিসাবে রানীর ভূমিকা গুরুত্ব লাভ করেছে।

২. রানী ক্যাবিনেট সভায় উপস্থিত না থাকলেও মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের খোঁজখবর রাখেন এবং প্রয়োজনে তিনি প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের পরামর্শ দেন। মন্ত্রীরা পরিবর্তনশীল কিন্তু রানী মৃত্যু পর্যন্ত নিজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন বলে তাঁর অভিজ্ঞতা

১. "It would be incorrect to suppose that because the Queen occupies a strictly constitutional role, she is therefore a puppet monarch."—Wheare

সঞ্চয়ের সুযোগ অনেক বেশি এবং ঐ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে তিনি কোন পরামর্শ দিলে বা অভিমত প্রকাশ করলে মন্ত্রীদের পক্ষে তা উপেক্ষা করা খুবই কষ্টকর। বর্তমান রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইতিমধ্যে দশবার প্রধানমন্ত্রী তথা মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটেছে। মন্ত্রিসভার এরূপ স্বল্পস্থায়ী অবস্থানের পাশাপাশি রানীর রাজত্বের ধারাবাহিকতার গুরুত্ব মন্ত্রীদের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া মন্ত্রীরা সর্বদাই দলীয় রাজনীতির লাভ-লোকসানের দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু বিচার করেন, কিন্তু ধরে নেওয়া হয় যে রানীর পরামর্শ রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত নয়- জাতীয় স্বার্থই সেখানে প্রাধান্যলাভ করে। ফলে রানীর পরামর্শ ও অভিমতের গুরুত্ব খুব বেশি। রানীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করলে তা জনমনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

৩. সাংবিধানিক অচলাবস্থা ও জাতীয় সংকটে রানী ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করে সাংবিধানিক অচলাবস্থা দূরীকরণ ও জাতীয় ঐক্য রক্ষায় সাহায্য করেন। নির্বাচনে কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারলে ঐ অবস্থায় সম্মিলিত সরকার গঠনের ব্যাপারে বিভিন্ন দলের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে সংকট সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুত রাজা পঞ্চম জর্জের রাজত্বকালে এরূপ ঘটনা ঘটেছিল এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ১৯৩১ সালে বিভিন্ন দলের সম্মিলিত সরকার গঠিত হয়েছিল। ১৯১৪ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার সম্পর্কে গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছিল এবং ঐ সময়ও পঞ্চম জর্জ ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করে জাতিকে ঐ সংকট থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করেছিলেন। শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষায় রাজশক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৪. কমনওয়েলথের প্রধান হিসাবে রানী কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির ঐক্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হন।

৫. বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষার দ্বারা রানী বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে প্রভাব বিস্তার করেন। এরূপ দেখা গিয়েছে যে, মন্ত্রিসভার পক্ষে যা সম্ভব হয়নি, রাজা বা রানী ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করে তাকে সম্ভব করেছেন। রাজা চতুর্থ জর্জ তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের উপর প্রভাব বিস্তার করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ গ্রহণের আগেই ঐ যুদ্ধে প্রভূত অপ্রত্যক্ষ সাহায্য আদায় করেছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় রানীর ভূমিকা আনুষ্ঠানিক বা সাংবিধানিক হলেও জাতীয় ঐক্য ও শাসনব্যবস্থার ধারাবাহিকতা রক্ষার ব্যাপারে তাঁর কার্যকর (effective) ভূমিকা রয়েছে। এ ভূমিকা অবশ্যই রাজা বা রানীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

২-৫. রাজতন্ত্র টিকে থাকার কারণ
Reasons for the Survival of Monarchy

পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক চেতনার সম্প্রসারণের ফলে রাজতন্ত্র অনিবার্যভাবে অবলুপ্তির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। যে সব দেশে বহুদিন ধরে রাজতন্ত্র চলে এসছে সে সব দেশে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে—রাজতন্ত্রের

পরিবর্তে রিপাবলিক গঠন করা হচ্ছে। অথচ এর পাশাপাশি পৃথিবীর প্রাচীনতম সংসদীয় গণতন্ত্রে আজও রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্রিটেনের রানী তো নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র এবং নিছক নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের দায়িত্ব পালনের জন্য সেখানে রাজতন্ত্র বজায় রাখার কারণ কী? বিশেষ করে ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক আবহাওয়া রাজতন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of the Monarchy) বিরাট জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে।

ব্রিটেনে রাজতন্ত্র টিকে থাকিবার কারণ অনেক। এবার আমরা কারণগুলি আলোচনা করছি ঃ

১. **রাজতন্ত্রকে গণতন্ত্রীকরণ ঃ** গণতন্ত্রের প্রতিকূলতা সৃষ্টির বদলে ব্রিটেনে রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের সাথে অপূর্ব সামঞ্জস্যবিধানে সমর্থ হয়েছে। বার্কারকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, রাজতন্ত্র বেঁচে আছে কারণ তা পরিবর্তিত হয়েছে এবং যুগের অগ্রগতির সাথে সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলছে (The Monarchy has survived because it has changed, and because it has moved with the movement of time)। গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রসারের সাথে সাথে রাজতন্ত্রও তার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে পরিবর্তিত হয়েছে—কখনও গণতন্ত্রের প্রসারের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেনি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শাসনব্যবস্থা যতই গণতান্ত্রিক হয়েছে, ততই রাজশক্তির বিশেষাধিকার হ্রাস পেয়েছে। বিগত তিনশো বছর ধরে রাজশক্তি ঐ পরিবর্তনের সাথে সহযোগিতা করেছে- নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য ইতিহাসের চাকাকে পিছন দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করেনি। বরং দেখা গিয়েছে যে, এ সময়ে কোন রাজা বা রানী নিজেদের ইচ্ছা ও মতামতকে প্রাধান্য না দিয়ে সব সময়ই দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। সেজন্য গৌরবজনক বিপ্লবের পর থেকে ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে রাজতন্ত্রের বিশেষ কোন সংঘাত দেখা দেয়নি। রাজতন্ত্র নিজেকে নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতায় আবদ্ধ রেখে গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার প্রাধান্য ও শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। রাজতন্ত্রের এরূপ গণতন্ত্রীকরণের (democratisation of monarchy) জন্যই ব্রিটেনে আজও রাজতন্ত্র টিকে আছে।

২. **রানীর রাষ্ট্রনৈতিক অভিজ্ঞতা ঃ** মন্ত্রীরা রাজনৈতিক প্রশাসক, তাঁরা ক্ষমতায় আসেন এবং ক্ষমতা থেকে চলে যান। কিন্তু রানী তাঁর পদে আমৃত্যু স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। রানী ভিক্টোরিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে ৬৪ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন (১৮৩৭-১৯০১)। তাঁর রাজত্বকালে ১৯ বার প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হয়েছিল। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এখন পর্যন্ত ৩০ বছর ক্ষমতায় আসীন আছেন, কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে ইতিমধ্যেই দশবার মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটেছে। বহুদিন ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে একই পদে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য রাজা বা রানীরা রাষ্ট্র-পরিচালনায় প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পান।[১] তাঁরা অনেক মন্ত্রিসভার উত্থান পতন দেখতে পান, ঐ সব মন্ত্রিসভার কার্যাবলী সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিবহাল থাকেন, বিভিন্ন সমস্যা এবং সংকট মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রিসভার প্রকাশ্য ও পর্দার আড়ালে গৃহীত উপায় ও

১. The continuous tenure of a life-office makes a king···a central source of a long time experience.—Barker.

পন্থা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে পুষ্ট করে। এ জন্যই রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও সরকার পরিচালনার ব্যাপারে রাজশক্তি মন্ত্রিসভাকে যে পরামর্শ দান করে তার গুরুত্ব ও মূল্য অপরিসীম।

৩. **মনস্তাত্ত্বিক কারণ :** মনস্তাত্ত্বিক কারণেও ব্রিটেনে রাজতন্ত্র অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। ক্রমওয়েলের সময়ে মাত্র ১১ বছর বাদে ব্রিটেনে রাজতন্ত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। এরূপ প্রবাদ আছে যে, বাকিংহাম প্রাসাদে রাজা বা রানী আছেন জেনেই ব্রিটিশ জনগণ নিশ্চিতমনে ঘুমান (with the king in the Buckingham palace people sleep all the more quietly in their beds)। রানী শুধুমাত্র প্রধান শাসক নন, তিনি রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজেরও প্রধান। ব্রিটেনের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে মানসিক যোগসূত্র রক্ষার দায়িত্ব তিনি পালন করেন। ব্রিটিশ জনগণ রাজতন্ত্রের জন্য গর্ব পোষণ করেন এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণেই রাজতন্ত্র সেখানে এত জনপ্রিয়।

৪. **রক্ষণশীল চরিত্র :** ব্রিটিশ জাতি মূলত রক্ষণশীল। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি ইংরেজ জাতির গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগ সর্বজনবিদিত। তাই রাজতন্ত্রের মত প্রাচীন ও ঐতিহ্যসম্পন্ন সংস্থার প্রতি তাদের আবেগ ও শ্রদ্ধা এমনভাবে জড়িত যে এর পরিবর্তন বা অবলুপ্তির কথা তারা ভাবতে পারে না। রানী তথা রাজতন্ত্রের প্রতি তাদের ভালবাসার মূলে আছে ঐ রক্ষণশীল মনোভাব ও আবেগ।

৫. **সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য :** সংসদীয় গণতন্ত্রে (Parliamentary Democracy) একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকা প্রয়োজন। ব্রিটেনে সংসদীয় গণতন্ত্র থাকার জন্য 'নিয়মতান্ত্রিক' এবং 'প্রকৃত'—দু ধরনের প্রশাসক অপরিহার্য। সেখানে রানী নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের এবং মন্ত্রিসভা প্রকৃত শাসকের দায়িত্ব পালন করে। রাজতন্ত্রের পরিবর্তে সেখানে ভারতের মত নির্বাচিত নিয়মতান্ত্রিক প্রধান করা যেতে পারে, কিন্তু ব্রিটিশ জাতি নির্বাচিত কোন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান অপেক্ষা রাজতন্ত্রকে বিভিন্ন কারণে অধিকতর নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান রাজনীতি-নিরপেক্ষ না হলে সংসদীয় গণতন্ত্র চলতে পারে না। ব্রিটেনের রানীকে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার প্রতীক বলে মনে করা হয় এবং রাজশক্তির রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ব্রিটেনে রাজতন্ত্রকে অপরিহার্য করে তুলেছে।

৬. **কমনওয়েলথের যোগসূত্র :** ব্রিটেনের সাথে কমনওয়েলথ্ দেশগুলির যোগসূত্র রক্ষায় রানীর বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলি রানীর নামেই শাসন করা হয় এবং রানীকেই এদের মধ্যে ভাবগত ঐক্যের প্রতীক মনে করা হয়। যে সব দেশ স্বাধীন অথচ কমনওয়েলথভুক্ত সেখানে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার শাসন অচল, কিন্তু রানীকে সেখানেও প্রতীকী প্রধান (symbolic head) হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ফলে রানী কমনওয়েলথ্ দেশগুলির মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে ভূমিকা পালন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বর্ণ যুগ অস্ত গিয়েছে এবং এর ফলে সাম্রাজ্যের ঐক্য ও প্রতীক হিসাবে রানীর ভূমিকাতেও ভাঁটা পড়েছে।

৭. **অর্থনৈতিক যুক্তি :** ব্রিটেনের রাজতন্ত্র খুবই জাঁকজমকপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, রাজস্বের মাত্র এক-শতাংশ রাজতন্ত্রের জন্য ব্যয়

করতে হয়। ব্রিটিশ জাতি ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্থাটি রক্ষার জন্য রাজস্বের শতকরা এক ভাগ ব্যয়কে ব্যয়বহুল মনে করেন না। তাদের মতে রাজতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে অন্য কোন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান থাকলেও এর চেয়ে ব্যয় কম হত না। সুতরাং রাজতন্ত্র রক্ষার জন্য অর্থের অপচয় হয় এ কথা ব্রিটিশ জাতি স্বীকার করেন না।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, ব্রিটেনে রাজতন্ত্র টিকে থাকার পেছনে কতকগুলি সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আর্থনীতিক কারণ রয়েছে। ঐ কারণগুলি যথার্থ কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ব্রিটিশ জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক মানসিকতাই ঐ কারণগুলির উৎস। ফলে রাজতন্ত্র সেখানকার প্রায় সব শ্রেণীর জনগণের অনুমোদন লাভে সমর্থ হয়েছে। তাই রাজশক্তির বিশেষাধিকার হ্রাস করা বা রাজতন্ত্রের সংস্কারের কথা বলা হলেও ব্রিটেনে রাজতন্ত্র অবলুপ্তির কথা বলা হয় না। রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে ব্রিটেনে রাজতন্ত্র দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

৩

প্রকৃত শাসক ঃ ক্যাবিনেট
THE REAL EXECUTIVE : THE CABINET

৩-১. ব্রিটেনে 'শাসনবিভাগ' কাদের নিয়ে গঠিত ?
What Constitutes 'The Executive' in Britain ?

ব্রিটিশ সাংবিধানিক ব্যবস্থায় রানীসহ পার্লামেণ্টের হস্তে সরকার ন্যস্ত (In law the government of the United Kingdom is vested in a composite body styled the Crown-in-Parliament)[১]। রানীসহ পার্লামেণ্ট বলতে রানী এবং পার্লামেণ্টের দুটি কক্ষকে বুঝায়। রানী প্রধান শাসক এবং সব ক্ষমতাই তাঁর নামে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রানী আনুষ্ঠানিক প্রধানে পরিণত হয়েছেন এবং লর্ডসভা প্রান্তিক ক্ষমতার অধিকারী। কমন্সসভার ক্ষমতাও বাস্তবে আনুষ্ঠানিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। রানী এবং কমন্সসভার ক্ষমতা মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেটের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সুতরাং তত্ত্বগত দিক থেকে রানীসহ পার্লামেণ্ট, প্রিভি কাউন্সিল, স্থায়ী রাজকর্মচারী ও ক্যাবিনেটকে নিয়ে ব্রিটেনের শাসনবিভাগ গঠিত। তত্ত্বগত দিক থেকে একথা বলা গেলেও কেবলমাত্র ক্যাবিনেটকে শাসনবিভাগ বলে অভিহিত করলেই তা বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

কাদের নিয়ে গঠিত

বাস্তবে ক্যাবিনেটই শাসনবিভাগ

রানী ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় প্রধান। গ্ল্যাডস্টোনের ভাষায় বলা যায়, তিনি সমস্ত রাজস্ব আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন, মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করেন, আইন সভার অধিবেশন আহ্বান করেন, আইনসভা ভেঙ্গে দেন, বিদেশের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, শান্তি স্থাপন করেন, চুক্তি সম্পাদন করেন এবং অপরাধীদের শাস্তি মকুব করেন। অবাধ রাজতন্ত্রের যুগে বিশেষাধিকার প্রয়োগ করে রাজশক্তি ঐ সব কাজ করতেন। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে রাজশক্তির বিশেষাধিকার হ্রাস পেয়েছে। ঐ সব কাজ বর্তমানে রানীর নামে করা হয় বটে, কিন্তু এগুলি তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতা নয়। পার্লামেণ্টের কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুযায়ী ঐ সব ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়।

রানীর ভূমিকা

ব্রিটেনে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারের মূলকেন্দ্রে অবস্থান করে ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেটের উৎপত্তি হয়েছে প্রিভি কাউন্সিল থেকে। প্রিভি কাউন্সিলের বিবর্তনের গতিপথে ক্যাবিনেটের উদ্ভব ঘটে। বর্তমানে প্রিভি কাউন্সিল 'স-পরিষদ রাজাদেশ' জারীর একটি আনুষ্ঠানিক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে এবং এর ক্ষমতা ধীরে ধীরে ক্যাবিনেটের হাতে চলে গিয়েছে।

প্রিভি-কাউন্সিল

স্থায়ী রাজকর্মচারী শাসনবিভাগের একটি অঙ্গ। কিন্তু তারা কেবল ক্যাবিনেট কর্তৃক গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তকে প্রয়োগ করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব কেবলমাত্র ক্যাবিনেটের উপর ন্যস্ত থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, রানী ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন, পার্লামেণ্ট ক্যাবিনেটের ইচ্ছাকে প্রতিধ্বনিত করে, প্রিভি কাউন্সিল ক্যাবিনেটের ছায়া হিসাবে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং রাজকর্মচারীরা

---

১. Comparative Government—S. E. Finer, P. 149.

ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করে। ফলে ব্রিটেনে শাসন কর্তৃত্ব অনিবার্যরূপে ও চূড়ান্তভাবে ক্যাবিনেটের উপর ন্যস্ত। এজন্যই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থাকে 'ক্যাবিনেট ব্যবস্থা' নামে অভিহিত করা হয়। অনমনীয় দলীয় ব্যবস্থা যে ক্যাবিনেটকে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে সাহায্য করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৩-২. প্রিভি কাউন্সিল
The Privy Council

ব্রিটেনে নর্মান রাজাদের রাজত্বকালে (১০৬৬-১১৫৪) বৃহত্তর পরিষদের অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে রাজার কাজে সহায়তা করার জন্য 'ক্ষুদ্র পরিষদ' (Quria Regis) নামে আর একটি স্থায়ী পরিষদের উদ্ভব ঘটে। তখন রাজকর্মে

উৎপত্তি

নিযুক্ত পদস্থ ব্যক্তিগণ (Lord Chancellor, Lord Treasurer ইত্যাদি), সামন্তপ্রভু ও বিশিষ্ট বিচারকগণকে নিয়ে ক্ষুদ্র পরিষদ গঠিত হত। ঐ পরিষদ রাজাকে পরামর্শদান ও শাসনকার্য পরিচালনায় সাহায্য করত। পরবর্তীকালে 'বৃহত্তর পরিষদ' থেকে পার্লামেন্টের উৎপত্তি ঘটে। দ্বাদশ শতকে দ্বিতীয় হেনরীর রাজত্বকালে বিচার ও শাসনবিভাগকে পৃথক্ করা হয়। ফলে 'ক্ষুদ্রতর পরিষদ'-কে দুভাগে বিভক্ত করা হয়। বিচার কার্য সম্পন্ন করার দায়িত্ব একটি বিভাগের উপর অর্পণ করা হয় এবং তা থেকে উচ্চ আদালতের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে দৈনন্দিন শাসনকার্যের দায়িত্ব অর্পিত হয় আর একটি বিভাগের উপর পরবর্তীকালে যা 'প্রিভি কাউন্সিল' নামে পরিচিত হয়। অর্থাৎ 'ক্ষুদ্রতর পরিষদ' ভেঙ্গে পরবর্তীকালে উচ্চ আদালত ও প্রিভি কাউন্সিলের উৎপত্তি হয়।

ত্রয়োদশ শতকে প্রিভি কাউন্সিল একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। উনিশ-কুড়ি জন সদস্য নিয়ে প্রিভি কাউন্সিল গঠিত হত, সদস্যরা প্রত্যেকেই বেতনভোগী ছিলেন এবং তাঁরা রাজাকে ন্যায়সঙ্গত পরামর্শ দেবেন বলে শপথ গ্রহণ করতেন। রাজা

গঠন ও প্রকৃতি

নিজে প্রিভি কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত থাকতেন না, যদিও তিনি এর সাথে পরামর্শ করতেন। প্রিভি কাউন্সিলের প্রাধান্য ও ক্ষমতার ব্যাপ্তি রাজার ব্যক্তিগত শক্তি ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করত। যেমন, তিনজন নাবালক রাজা তৃতীয় হেনরী, দ্বিতীয় রিচার্ড এবং ষষ্ঠ হেনরীর রাজত্বকালে প্রিভি কাউন্সিলই প্রকৃত পক্ষে দেশ শাসন করতো। অন্যদিকে সপ্তম হেনরী নিজের সিদ্ধান্ত প্রকাশের বাহন হিসাবে প্রিভি কাউন্সিলকে ব্যবহার করতেন। যাইহোক টিউডর রাজাদের আমলে এ সংস্থাটি ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করে। আবার গৃহযুদ্ধ এবং কমনওয়েলথের সময়ে কার্যত এর অস্তিত্বের অবসান ঘটে। ১৬৬০ সালে যখন আবার এর পুনরাবির্ভাব ঘটে তখন এর ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

প্রিভি কাউন্সিল বর্তমানে আনুমানিক তিনশ সদস্য নিয়ে গঠিত। অতীত ও বর্তমানে সব ক্যাবিনেট সদস্য, ক্যান্টারবেরীর প্রধান যাজক আর্চবিশপ, কমন্সসভার

বর্তমান অবস্থা

স্পীকার, আপীল লর্ড, প্রধান বিচারপতি, হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণ, কিছু কিছু রাষ্ট্রদূত এবং জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের নিয়ে প্রিভি কাউন্সিল গঠিত হয়। তবে সাধারণত মাত্র পাঁচ-ছয় জন সদস্য এর সভায় উপস্থিত থাকেন এবং কার্য সম্পাদন করেন।

বর্তমানে প্রিভি কাউন্সিল যে সব কাজ সম্পাদন করে তা আলোচনা করা যেতে পারে। ক. রানীর নামে যাদের নিয়োগ করা হয় সে সব পদে নিয়োগ ও অপসারণের দায়িত্ব প্রিভি কাউন্সিল পালন করে। উচ্চপদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করানোর দায়িত্বও এ সংস্থা পালন করে। খ. প্রিভি কাউন্সিল স-পারিষদ রাজাদেশ জারী করে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত কার্যকর করে। গ. বিচারবিভাগীয় কমিটি (Judicial Committee) সহ বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের মনোনীত করে। নৌ-বাহিনী, রাজকীয় আদালত, উপনিবেশ ও ডোমিনিয়নের বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে সব আপীল করা হয় প্রিভি কাউন্সিলের বিচার কমিটি সে সব আপীল মামলার বিচার করে। ঘ. কোন বিশেষ সমস্যা দেখা দিলে তা মোকাবিলা করার জন্য প্রিভি কাউন্সিল তিন থেকে পাঁচজন সদস্য নিয়ে বিশেষ কমিটি (Special Committee) গঠন করে। যেমন, ১৯৫৭ সালে টেলিফোনে আড়িপাতার নালিশ তদন্তের জন্য এরূপ কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

কার্যাবলী

ক্যাবিনেটের আত্মপ্রকাশ এবং এর ক্ষমতা ও গুরুত্ব বাড়ার সাথে সাথে প্রিভি কাউন্সিলের ক্ষমতা ও গুরুত্ব হ্রাস পায়। বর্তমানে এর বিশেষ কোন কার্যকর ভূমিকা নেই। শুধুমাত্র ক্যাবিনেট প্রথার প্রচলনই এর জন্য একমাত্র দায়ী নয়—প্রিভি কাউন্সিলের বিপুল আকৃতিও এর জন্য আংশিক দায়ী। প্রিভি কাউন্সিলের যে সব কাজের কথা বলা হয়েছে তাও আনুষ্ঠানিক মাত্র। আগেই বলা হয়েছে যে, এ সব আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য এর চার-পাঁচ জনের বেশি সদস্য উপস্থিত থাকেন না। তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতেই সভার কোরাম হয়। রাজার অভিষেক বা ঐ ধরনের বিশেষ সমাবেশেই কেবল মাত্র প্রিভি কাউন্সিলের সব সদস্য মিলিত হন।

প্রিভি কাউন্সিলের গুরুত্ব হ্রাস

৩-৩. ক্যাবিনেটের উৎপত্তি, গঠন ও কার্যাবলী

Origin, Composition and Functions of the Cabinet

প্রিভি কাউন্সিলের আয়তন ছিল বিপুল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের দ্বারা তা গঠিত ছিল বলে নীতি নির্ধারণ ও দায়িত্ব পালনে ঐ সংস্থা কখনই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। তাই অতীতে রাজারা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সাথে পরামর্শক্রমে রাজকার্য সম্পন্ন করতেন। ঐ সব কর্মচারীরা রাজার ব্যক্তিগত কর্মচারী বলে পরিগণিত হত। রাজা দ্বিতীয় চার্লস পাঁচজন ব্যক্তির একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ করতেন। ঐ পাঁচজন হলেন ক্লিফোর্ড (Clifford), আরলিংটন (Arlington), বাকিংহ্যাম (Bankingham), এ্যাসলে (Asley) এবং লডারডেল (Lauderdale)। এদের আদ্যাক্ষর যুক্ত করে ঐ গোষ্ঠীকে CABAL বলা হত। ঐ পাঁচজন প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন—কিন্তু রাজা তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী এদের পরামর্শদাতারূপে মনোনীত করেছিলেন। ঐ 'ক্যাবাল' গোষ্ঠী পরে ক্যাবিনেট নামে পরিচিত হয়।

ক্যাবিনেটের উৎপত্তি

কিন্তু পারস্পরিক অবিশ্বাস, রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রয়াস প্রভৃতি কারণে পাঁচজনের গোষ্ঠী 'ক্যাবল' বা ক্যাবিনেট কখনই দানা বেঁধে উঠতে

পারেনি। তাছাড়া প্রিভি কাউন্সিলকে পর্দার আড়ালে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, অথচ রাজাকে পরামর্শ দানের দায়িত্ব, ব্যক্তিগতভাবে কারও উপর ন্যস্ত করা যাচ্ছে না—এ যুক্তিতে প্রিভি কাউন্সিলকে মর্যাদায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এ চেষ্টা সফল হয়নি।

হ্যানোভার (Hanover) বংশের প্রথম রাজা প্রথম জর্জ ইংরাজীতে কথা বলতে পারতেন না এবং শাসন পরিচালনায়ও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। তাই তিনি ক্যাবিনেটের সভায় উপস্থিত হতেন না। ফলে ঐ সময় থেকে ক্যাবিনেট গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিদের নিয়ে গঠিত হয় এবং রাজার অনুপস্থিতিতে ক্যাবিনেট স্বাধীনভাবে কার্য করতে আরম্ভ করে। স্যার রবার্ট ওয়ালপোলের সময় (১৭২১-৪২) থেকেই 'প্রধানমন্ত্রী' শব্দটি চালু হয় এবং তিনি একই মতাবলম্বী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে 'ক্যাবিনেট' গঠন করে ঐ সংস্থাকে রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতা দান করেন। তিনি লর্ড সভা থেকে কমন্সসভাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেন এবং মন্ত্রীদের কাছে পার্লামেন্টে তার নিজের কার্যাবলীর সমর্থন দাবী করেন। এভাবে তিনি সর্বপ্রথম ক্যাবিনেট ও কমন্সসভার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন এবং 'প্রধানমন্ত্রী' হিসাবে পরিচিত হন। ১৭৪২ সালে ওয়ালপোল পদত্যাগ করেন, কিন্তু তিনি ক্ষমতাসীন থাকাকালেই ব্রিটেনে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। রাজা তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে ক্যাবিনেট প্রথার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং উইলিয়াম পীট (the elder Pitt) প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অবিসম্বাদিত প্রাধান্য বিস্তার করেন। ১৮৩২ সালে সংস্কার আইন গৃহীত হয়, ঐ আইন রাজশক্তিকে চরম আঘাত হানে এবং ক্যাবিনেটের প্রাধান্য নিশ্চিত করে।

ওয়ালপোলের ভূমিকা

মন্ত্রিপরিষদ ও ক্যাবিনেটের মধ্যে পার্থক্য

ক্যাবিনেটের সাথে মন্ত্রিপরিষদের কোন অনমনীয় পার্থক্য প্রথমদিকে ব্রিটেনে লক্ষ্য করা যায়নি। তখন সব মন্ত্রীদেরই ক্যাবিনেটের অন্তর্ভুক্ত করা হত। কিন্তু এর ফলে ক্যাবিনেট অস্বাভাবিকভাবে সম্প্রসারিত হওয়ায় ক্রমশ ক্যাবিনেট ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। সব মন্ত্রিদের নিয়ে সমষ্টিগত সংস্থা হল মন্ত্রিপরিষদ (Ministry) এবং একে সরকার (Government) শব্দটির সমার্থক মনে করা হয়। অন্যদিকে মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে আবার একটি ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট সংস্থা থাকে, যা মন্ত্রিপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে গঠিত হয়, তাকে 'ক্যাবিনেট' বলে। ক্যাবিনেটের সকলেই মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের সকলে ক্যাবিনেটের সদস্য নন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যসংখ্যা নব্বুই-এর অধিক, কিন্তু এদের মধ্যে সাধারণত অনধিক বিশজন সদস্য নিয়ে ক্যাবিনেট গঠন করা হয়।

শুধুমাত্র আয়তনেই নয়, ভূমিকার দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে। ক্যাবিনেট নীতি নির্ধারণ করে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভিন্ন বিভাগের সাহায্যে তা প্রয়োগ ও কার্যকর করে। মন্ত্রিপরিষদের সকলেই পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন—কিন্তু নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা ভোগ করে কেবলমাত্র ক্যাবিনেট। মন্ত্রিপরিষদের যে সব সদস্য ক্যাবিনেটের সদস্য নন, তারাও ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতে বাধ্য এবং ক্যাবিনেটের উত্থান-পতনের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, যদিও তারা ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের অংশীদার নয়।

ক্যাবিনেটের গঠন

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে এ বিষয়ে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। প্রধানমন্ত্রীই ক্যাবিনেটের সদস্যদের মনোনীত করেন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ক্যাবিনেটের সদস্য সংখ্যা স্থির হয়। স্যার রবার্ট ওয়ালপোলের ক্যাবিনেটে সাত থেকে দশজন সদস্য থাকত। ১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য পাঁচ বা ছ জন সদস্যের যুদ্ধকালীন ক্যাবিনেটের (war cabinet) গঠন করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের যুদ্ধকালীন ক্যাবিনেটে পাঁচ থেকে ন' জন সদস্য ছিলেন। বর্তমানে সাধারণত অনধিক বিশজন সদস্য নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয়। এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। ১৯৭০ সালে উইলসন ২৩ জনের ক্যাবিনেট গঠন করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী ছাড়া সাধারণত ট্রেজারীর প্রথম লর্ড (First Lord of the Treasury), বিদেশমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, প্রিভি কাউন্সিলের সভাপতি, লর্ড প্রিভি সীল (Lord Privy Seal) এবং প্রধানমন্ত্রী যে সব মন্ত্রীদের প্রয়োজন মনে করেন তাঁদের নিয়ে ব্রিটেনে ক্যাবিনেট গঠিত হয়।

ক্যাবিনেটের কার্যাবলী

ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কার্যাবলী কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হল :

১. ক্যাবিনেট সাধারণভাবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে। পার্লামেন্টে যে সব নীতি নির্ধারক বিল বা বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয় তা আগেই ক্যাবিনেটে আলোচিত ও গৃহীত হয়।

২. ক্যাবিনেট বিভিন্ন দপ্তরের কার্যের সমন্বয় সাধন করে। সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্য প্রয়োজন। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও ঐক্য-রক্ষার দায়িত্ব ক্যাবিনেট গ্রহণ করে।

৩. অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বা বৈদেশিক ক্ষেত্রে এমন অনেক নতুন নতুন ও আকস্মিক ঘটনা ঘটে বা সমস্যার সৃষ্টি হয় যেগুলি সম্পর্কে আগে থেকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বা নীতি নির্ধারণ করে রাখা সম্ভব নয়। এরূপ ঘটনা সংঘটিত হবার সাথে সাথে ক্যাবিনেট এর আলোচনা করে এবং এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা ও নীতি স্থির করে।

৪. রাষ্ট্র একটি স্থায়ী সংগঠন এবং সরকার এর কর্ণধার, সুতরাং রাষ্ট্রের আগামী-দিনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রেখে আগে থেকেই সে অনুযায়ী পরিকল্পনা রচনা করা ক্যাবিনেটের প্রধান কাজ। যেমন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে কৃষিজাত দ্রব্য, বিদ্যুৎ, পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে আগামী দিনের পরিকল্পনা রচনা করা এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ক্যাবিনেটের অন্যতম কাজ।

৫. সরকারী কর্মচারীদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ক্যাবিনেটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সরকারী কৃত্যক কমিশন কর্মচারীদের নিয়োগ করে। কিন্তু কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকরির অন্যান্য শর্ত এবং এ বিষয়ে যাবতীয় নীতি নির্ধারণ করে ক্যাবিনেট।

ক্যাবিনেটের কর্মপদ্ধতি

সাধারণভাবে প্রতি বুধবার প্রধানমন্ত্রীর সরকারী আবাস ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটের ক্যাবিনেট কক্ষে ক্যাবিনেটের অধিবেশন বসে। অন্য কোথাও বা সপ্তাহে একাদিনের বেশী ক্যাবিনেটের সভা হতে কোন বাধা নেই। বস্তুত যুদ্ধকালীন সময়ে বা অন্যান্য ক্যাবিনেট সভার আলোচনার বিষয়বস্তু প্রধানমন্ত্রীই স্থির করেন। ক্যাবিনেট সদস্যরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অভিমত সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব লাভ করে। সাধারণভাবে ভোটে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না, প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করে প্রতিটি সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত করার চেষ্টা করেন।

ক্যাবিনেটের আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গোপন রাখা হয় এবং ক্যাবিনেট সদস্য হিসাবে কর্মভার গ্রহণের আগে প্রতিটি সদস্য ঐ মর্মে শপথ গ্রহণ করেন। ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের জন্য ক্যাবিনেট সদস্যরা যৌথভাবে দায়ী থাকেন।

ক্যাবিনেটের সভার দুদিন আগে সদস্যদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিলি করা হয় এবং আনুমানিক দু ঘণ্টার মধ্যে ক্যাবিনেট সভা সমাপ্ত হয়। যে সব ব্যাপারে কোন মন্ত্রী এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম সে বিষয়গুলি, গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয়াদি, ক্যাবিনেট কমিটি কর্তৃক বিবেচিত বিষয়, নীতি সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি ক্যাবিনেটে আলোচনা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী আগেই মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং ক্যাবিনেটের সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর অভিমত, নিয়ন্ত্রণ এবং নেতৃত্ব ক্যাবিনেটের সভায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

ক্যাবিনেট কমিটি

ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ক্যাবিনেটের কতকগুলি স্থায়ী কমিটি এবং কতকগুলি বিশেষ কমিটি (special) থাকে। এদের ক্যাবিনেট কমিটি বলা হয় (এগুলি পার্লামেন্টের কমিটি থেকে আলাদা)। উদাহরণ হিসাবে প্রতিরক্ষা, অর্থ, আণবিক শক্তি, স্বরাষ্ট্র, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি ক্যাবিনেট কমিটির নাম উল্লেখ করা যায়। ক্যাবিনেট কমিটিগুলি ক্যাবিনেটের কাজ অনেকটা সহজ করে। এরা সমস্যাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করে। ফলে ক্যাবিনেটের সভায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। সাধারণত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের অন্যান্য কয়েকজন সদস্য নিয়ে ক্যাবিনেট কমিটি গঠন করা হয়। আবার ১৯৪৫ সালে শ্রমিক দলের শাসনকালে ভবিষ্যৎ আইন প্রণয়ন কমিটিতে (Future Legislation Committee) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে রাখা হয়নি এ কারণে যাতে অগ্রাধিকার (priority) অনুযায়ী পর পর আইন প্রণয়নে কোন পক্ষপাতিত্ব না ঘটে। সম্প্রতি ক্যাবিনেট কমিটিতে বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী যে কোন ক্যাবিনেট কমিটির সভায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

৩-৪. ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার নীতিসমূহ
Principles of British Cabinet System

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থাকে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা হিসাবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ক্যাবিনেট ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করা প্রয়োজন। যে মূলসূত্রগুলি ক্যাবিনেট ব্যবস্থার ভিত্তি তার প্রকাশ আকস্মিকভাবে ঘটেনি। ক্যাবিনেট প্রথার

প্রচলন ও এর ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঐ সব সূত্রগুলির উদ্ভব ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ক্যাবিনেট প্রথার মূল উপাদানগুলি স্পষ্টরূপ গ্রহণ করতে পারেনি। উনিশ শতকের প্রথম দিকেই ক্যাবিনেট ব্যবস্থার মূলনীতিগুলি সুস্পষ্ট রূপে গ্রহণ করে। নীচে আমরা ক্যাবিনেট ব্যবস্থার প্রধান সূত্র বা নীতিগুলি আলোচনা করছি :

১. সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি : ব্রিটেনে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার প্রধান সূত্র হল সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি। কমন্সসভার নির্বাচনে যে দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সে দল মন্ত্রীপরিষদ ও ক্যাবিনেট গঠন করবে। এর ফলে পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন ও আস্থা পেয়ে ক্যাবিনেট শাসন পরিচালনা করতে সমর্থ হয় এবং ক্যাবিনেটকে পার্লামেন্টের কাছ থেকে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। কমন্সসভার নির্বাচনে কোন দল যদি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সমর্থ না হয়, তবে ঐরূপ ক্ষেত্রে একাধিক দলের মিলিত সদস্যসংখ্যা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারলে ঐ দলগুলি মিলিত হয়ে সম্মিলিত সরকার (Coalition Government) গঠন করে।

২. প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব : ক্যাবিনেট প্রথার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল প্রধানমন্ত্রীর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ও প্রাধান্য। যদিও প্রধানমন্ত্রীকে ক্যাবিনেট সদস্যদের মধ্যে সমপর্যায়ভুক্তদের মধ্যে প্রধান (primus inter pares) বলে মনে করা হয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি ক্যাবিনেটের নেতা ও প্রধান। ক্যাবিনেটে প্রধানমন্ত্রীর সর্বময় প্রাধান্য লক্ষ্য করে অনেকে ক্যাবিনেট ব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রীর সরকার (Prime Ministerial Government) নামে অভিহিত করেন। ক্যাবিনেট কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে এবং কাদের নিয়ে গঠিত হবে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন।

৩. ক্যাবিনেটের সদস্যরা পার্লামেন্টের সদস্য : ক্যাবিনেট ব্যবস্থার নীতি অনুযায়ী ক্যাবিনেটের সদস্যরা পার্লামেন্টের কোন না কোন কক্ষের সদস্য। ক্যাবিনেটের সদস্য হবার সময়ে যদি কেউ পার্লামেন্টের কোন কক্ষের সদস্য না হন তবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাকে পার্লামেন্টের যে কোন একটি কক্ষের সদস্য হতে হবে। ব্রিটেনে ঐ সময়সীমা ছয় মাস।

৪. আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে সম্পর্ক : সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি চালু থাকার জন্য এবং ক্যাবিনেট সদস্যরা পার্লামেন্টের সদস্য হবার জন্য ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় আইনসভা ও শাসনবিভাগের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক থাকে। ফলে ক্যাবিনেটের প্রতিটি কার্য এবং মন্ত্রীদের দ্বারা উত্থাপিত বিলের পিছনে পার্লামেন্টের সমর্থন থাকে এবং পার্লামেন্টের সমর্থন ও আস্থা পুষ্ট হয়ে ক্যাবিনেট নিজের ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়। অতীতে ব্রিটেনে ক্যাবিনেট প্রথা দানা বেঁধে ওঠার আগে আইনসভা ও শাসনবিভাগের মধ্যে এরূপ নিবিড় সম্পর্ক ছিল না। স্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে তাই আইনসভা ও শাসনবিভাগের মধ্যে মতের সংঘাতের ফলে সরকারের পতন ঘটতেও দেখা গিয়েছে।

৫. যৌথ দায়িত্বের নীতি : ক্যাবিনেটের প্রতিটি সিদ্ধান্তের জন্য সব মন্ত্রী যৌথভাবে দায়ী এবং এ ব্যাপারে তারা প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার কাছে যৌথভাবে

দায়িত্বশীল থাকেন। মন্ত্রীরা ক্যাবিনেটে আলোচনার সময় স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারেন এবং কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে পারেন, কিন্তু ক্যাবিনেটে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে পারেন না, বরং পার্লামেন্টের ভিতরে এবং বাইরে ঐ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে হয় এবং ঐ সিদ্ধান্তের জন্য পার্লামেন্টে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। যৌথ দায়িত্বের নীতির জন্য সব সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য ক্যাবিনেটকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় এবং এর ফলে ক্যাবিনেটের উত্থান ও পতনের সঙ্গে প্রতিটি মন্ত্রীর ভাগ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে।

৬ কমন্সসভায় পরাজিত হলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়ঃ মন্ত্রিসভা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠিত হলেও কার্যকাল কমন্সসভার আস্থার উপর নির্ভরশীল। যতদিন ঐ আস্থা ভোগ করা সম্ভব, ততদিন মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসীন থাকে। সরকারের কোন বিল, গুরুত্বপূর্ণ নীতি বা সিদ্ধান্ত যদি কমন্সসভায় গৃহীত না হয় এবং সভায় যদি সংখ্যাধিক্য ভোটে তা পরাজিত হয়, তবে পার্লামেন্টের আস্থা হারিয়েছে এ যুক্তিতে ক্যাবিনেট তথা সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। এ অবস্থায় ক্যাবিনেটের নেতা প্রধানমন্ত্রী কমন্সসভা বাতিল করে নতুন নির্বাচন ঘোষণার জন্য রাণীকে পরামর্শ দিতে পারেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার জন্য কমন্সসভায় ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত পরাজিত হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

অন্য একটি ক্ষেত্রেও মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করা ক্যাবিনেট ব্যবস্থার নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমন্সসভার নির্বাচনে যদি দেখা যায় যে ক্ষমতাসীন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে তবে সাথে সাথে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, যে কোন কারণে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় গোটা মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগকে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ হিসাবে ধরা হয়।

৭ বিরোধী দলের বিশেষ মর্যাদাঃ ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় বিরোধী দল কমন্সসভায় বিশেষ মর্যাদা ভোগ করে। যেমন, যদি বিরোধী দল সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করতে চায়, তবে সরকার পক্ষকে ঐ অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার ব্যবস্থা করতে হয়। পার্লামেন্টের আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদিতে বিরোধী পক্ষকে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়। ব্রিটেনে বিরোধী দলকে *Her Majesty's Opposition* নামে অভিহিত করা হয়। বাস্তবে বিরোধী দল হল রাণীর বিকল্প মন্ত্রিসভা (Her Majesty's Alternative Government)। ১৯৩৭ সালের রাজকীয় মন্ত্রী আইন অনুযায়ী (*The Ministers of the Crown Act, 1937*) বিরোধী দলের নেতার জন্য ৪,৫০০ পাউন্ড বেতন স্থির করা হয়েছে। ব্রিটেনের সঞ্চিত তহবিল থেকে ঐ অর্থ ব্যয় করা হয়। এমনকি বিরোধী দলের কোন সদস্যকে কমন্সসভার স্পীকার সরকারী হিসাব কমিটির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করেন।

৩-৫. মন্ত্রীদের দায়িত্বের তত্ত্ব
Theory of Ministerial Responsibility

ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় 'মন্ত্রীদের দায়িত্বের নীতি' একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচলিত রীতি। মন্ত্রীদের দায়িত্বের নীতির দুইটি দিক আছেঃ আইনগত দায়িত্ব এবং রাজনৈতিক দায়িত্ব। আমরা জানি রানী কোন অন্যায় করতে পারেন না. এটা রানীর বিশেষাধিকার। রানীর প্রতিটি কাজই একজন মন্ত্রী দ্বারা স্বাক্ষরিত থাকে এবং রানীর ঐ কাজ বে-আইনে বলে প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তা সম্পাদনের জন্য আদালতে দায়ী হন। ব্রিটেনে রানীর কাজের জন্য মন্ত্রীদের জন্য এ ধরনের দায়িত্বশীলতাকে আইনগত দায়িত্ব বলে।

দু প্রকারের দায়িত্ব

১. আইনগত দায়িত্ব

সরকারের প্রতিটি কাজের জন্য মন্ত্রিরা পার্লামেন্টের কাছে দায়ী এটাই রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতার মর্মার্থ। বিভাগীয় কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে এবং সরকারের কাজের জন্য ক্যাবিনেটের সদস্য হিসাবে প্রতিটি মন্ত্রী যৌথভাবে পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল থাকেন। মন্ত্রীরা পার্লামেন্টের সদস্য এবং কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে—এ দুটি সূত্রের উপর ভিত্তি করে মন্ত্রীদের রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতার তত্ত্ব গড়ে উঠেছে।

২. রাজনৈতিক দায়িত্ব

রাজনৈতিক দায়িত্বের আবার দুটি রূপ আছেঃ ক. ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং খ. যৌথ দায়িত্ব। স্যামুয়েল বী-এর (Samuel Bee) ভাষায় বলা যায়ঃ প্রতিটি মন্ত্রী দুটি টুপি পরিধান করেন—একটি হল নিজ বিভাগের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্বের টুপি এবং অন্যটি ক্যাবিনেট সদস্য হিসাবে যৌথ দায়িত্বের টুপি। ব্যক্তিগত এবং যৌথ উভয় দায়িত্বকে ভিত্তি করে মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতার তত্ত্ব গড়ে উঠেছে।

রাজনৈতিক দায়িত্ব দু প্রকারের

ক্যাবিনেটের প্রতিটি সদস্যই বিভাগীয় মন্ত্রী হিসাবে ঐ বিভাগের কাজ কর্ম ও সিদ্ধান্তের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকেন। কোন বিভাগের কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে তার জন্য যে দায়ী হোক না কেন বিভাগীয় মন্ত্রীকেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় এবং পার্লামেন্টে এর জন্য জবাবদিহি করতে হয়। বিভাগের কাজের ত্রুটির জন্য দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর পদ-ত্যাগের ঘটনা বিরল নহে। ১৯৬৩ সালে প্রফিউমো-কে (Profumo) ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য পদত্যাগ করতে হয়; আগেই বলা হয়েছে যে, সরকার কাজ-কর্ম ও সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রীরা যৌথভাবে পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল থাকেন। একে মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্বশীলতার নীতি বলে। কোন মন্ত্রী ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের অংশীদার না হতে পারেন – কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যদি ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তের সাথে মতপার্থক্যের জন্য আগেই পদত্যাগ না করেন তবে তাঁকে ঐ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে পার্লামেন্টে অন্যান্য মন্ত্রীদের সাথে যৌথভাবে দাঁড়াতে হবে এবং যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকতে হবে। পার্লামেন্টে বা আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায়, কমন্সসভায় সরকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা

ক. ব্যক্তিগত দায়িত্ব

খ. যৌথ দায়িত্বের নীতি

উদ্যোগ পরাজিত হলে মন্ত্রীদের যৌথভাবে (অর্থাৎ মন্ত্রিসভাকে) পদত্যাগ করতে হয় অথবা পার্লামেন্ট বাতিল করে নতুন নির্বাচন ঘোষণা করার জন্য রানীকে পরামর্শ দিতে হয়।

সরকারের কোন সিদ্ধান্তের সাথে কোন মন্ত্রীর গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দিলে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনের দায় থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কিন্তু পদত্যাগ না করে তিনি যদি মন্ত্রিসভায় থাকেন তবে যৌথ দায়িত্বের নীতি অনুযায়ী তাঁর দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না।[১] এস. ই. ফাইনার মনে করেন যে, ক্যাবিনেটের আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় বলে যৌথ দায়িত্বের নীতি পালন করা সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মন্ত্রিপরিষদের যে সব সদস্য ক্যাবিনেটের সদস্য নন, তারাও যৌথ দায়িত্বের নীতির অধীন।

৩.৬. ক্যাবিনেট একনায়কত্ব
Cabinet Dictatorship

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট স্যার রবার্ট ওয়ালপোলের প্রধানমন্ত্রীর সময় (১৭২১-৪২ থেকে একটি স্বাধীন ও সংঘবদ্ধ সংস্থা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এর পরের ইতিহাস হল ক্যাবিনেটের ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় এবং সর্বময় শাসন কর্তৃত্ব ও নীতি নির্ধারক সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ। ফলে ক্যাবিনেট ক্ষমতার একক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

ক্যাবিনেট ক্ষমতার একককেন্দ্রে পরিণত

কেউ কেউ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেটের ঐ ক্ষমতা ও অনন্য ভূমিকা লক্ষ্য করে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থাকে ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব বলে অভিহিত করেন। আরও সাম্প্রতিককালে অনেকে ক্যাবিনেট তথা সরকার পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর একক ভূমিকা লক্ষ্য করে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে **প্রধানমন্ত্রীয় সরকার** (Prime Ministerial Government) নামে অভিহিত করছেন। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। যাই হোক ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় কিভাবে ক্যাবিনেটের ক্ষমতা বেড়ে বেড়ে ক্যাবিনেট একনায়কে পরিণত হয়েছে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

ক্যাবিনেট নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ও প্রধান কারণ হল পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস (decline)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপীয় দেশগুলিতে আইনসভার

পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস

ক্ষমতা কমতে শুরু করে। এখন কেবল ইউরোপে নয়, পৃথিবীর যে সব দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা আছে সেখানেই আইনসভার ক্ষমতা কমছে। লর্ড ব্রাইস যথার্থই বলেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেন পার্লামেন্ট সম্পর্কে জনগণের মোহমুক্তি ঘটছে। পার্লামেন্টের অবনতির মূলে কতকগুলি কারণ আছে—যে সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো।[২]

---

১. "For all that passes in the cabinet each member of it who does not resign is absolutely responsible, and has no right afterwards to say that he agreed in one case to a compromise, while in another he was persuaded by his colleagues." —Lord Salisbury,

২. পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস (Decline of Parliament) দ্রষ্টব্য।

পার্লামেন্টের ক্ষমতা কমে ব্রিটেনে তা ক্যাবিনেটের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের উপরই পার্লামেন্টের কাজকর্ম নির্ভর করে। পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে ক্যাবিনেট, পার্লামেন্টকে ভেঙ্গে দেবার ভয় দেখাবার ক্ষমতা ক্যাবিনেটের হাতে ন্যস্ত, পার্লামেন্টে দলীয় সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার জন্য ক্যাবিনেট পার্লামেন্টকে দিয়া নিজের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করাতে পারে। এর ফলে বস্তুত পার্লামেন্ট সম্মতিদানের একটি নিষ্প্রাণ যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। ক্যাবিনেটই সিদ্ধান্ত নেয়—পার্লামেন্ট কেবলমাত্র তাতে সম্মতির ছাপ মারার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।[১]

পার্লামেন্ট ক্যাবিনেটের কাজে সম্মতিদানের যন্ত্র

এ সব ঘটনা ও কারণের ফলশ্রুতি হল ব্রিটেনে ক্যাবিনেট নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ব্রিটেনের সংবিধানের বিগত পঁচাত্তর বছরের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ক্যাবিনেট নায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। যে ঐতিহাসিক ও সাংবিধানিক পটভূমিকায় ক্যাবিনেটের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা আগে আলোচনা করা হয়েছে। যে সব উপাদান প্রত্যক্ষভাবে ক্যাবিনেট একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে এবারে তা আলোচনা করা হল ঃ

ক্যাবিনেট নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপাদান

১. অনমনীয় দলীয় শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের পথ প্রশস্ত করেছে। অনমনীয় দলীয় ব্যবস্থা দানা বেঁধে ওঠার ফলে বিরাট জনসমর্থনের উপর ভিত্তি করে একটি ঐক্যবদ্ধ টিম হিসাবে ক্ষমতায় আসীন দল শাসনকার্য পরিচালনার সুযোগ পায় এবং পার্লামেন্টে এদের কাজকর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা অনুমোদিত হবার নিশ্চয়তা থাকায় ক্যাবিনেট শক্তিশালী হয়ে উঠে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছে। পার্লামেন্টে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যগণ এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ ক্যাবিনেটের কার্যাবলীকে অন্ধভাবে সমর্থন করে, তা না হলে এদের রাজনৈতিক মৃত্যু অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। ফলে ক্যাবিনেট নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দলের দিক থেকে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না।

১ দলীয় শৃঙ্খলা

২. ক্যাবিনেটের ক্ষুদ্র আয়তন এর প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। ১৯১৬ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ মাত্র পাঁচজন সদস্য নিয়ে যুদ্ধকালীন ক্যাবিনেট (war cabinet) গঠন করেন। এর পর থেকে শান্তিকালীন অবস্থায়ও ক্ষুদ্র ক্যাবিনেট গঠনের প্রশ্ন বিবেচিত হতে থাকে। সম্প্রতিকালে প্রধানমন্ত্রী উইলসন ২৩ জন সদস্যের (১৯৭৩) এবং প্রধানমন্ত্রী হীথ ১৭ জন সদস্যের (১৯৭০) ক্যাবিনেট গঠন করেন। সাধারণত বর্তমানে অনধিক বিশজন সদস্য নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট,

২. ক্যাবিনেটের ক্ষুদ্র আয়তন

---

১. "The growth of Cabinet Dictatorship" has to remarkable extent, diminished the power and prestige of Parliament ; robbed its proceedings of significance : made it appear that Parliament exists mainly for the purpose of maintaining or of somewhat ineffectively criticising an all but omnipotent cabinet, and transferred the main discussion of political issues from Parliament to the Platform and the Press. —Ramsay Muir.

প্রিভি কাউন্সিল ও মন্ত্রিপরিষদের বিপুল কলেবরের পাশাপাশি ক্যাবিনেটের ক্ষুদ্র আয়তন ক্যাবিনেট নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে।

৩. সরকারের কাজকর্ম বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের অধীনে বিভিন্ন ক্যাবিনেট কমিটি গঠন করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল যুদ্ধকালীন প্রয়োজন মেটাবার জন্য ও ক্যাবিনেটের কাজের চাপ কমাবার জন্যে বিভিন্ন বিষয়ে ক্যাবিনেট কমিটি গঠন করেন এবং সে সময় থেকে ব্রিটেনে ক্যাবিনেট কমিটি গঠন ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। ক্যাবিনেট কমিটিগুলি কেবলমাত্র ক্যাবিনেটের দায়িত্বভারই লাঘব করে না—এগুলি ক্যাবিনেটের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনে সাহায্য করে ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৩. ক্যাবিনেট কমিটি

৪. যে সব বিষয়ে বিশেষ (specialised) জ্ঞানের প্রয়োজন সে সব বিষয়ে ক্যাবিনেটের পক্ষে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়—এ উপলব্ধি থেকে ব্রিটেনে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে অস্থায়ী বিশেষ ক্যাবিনেট কমিটি (Adhoc Special Committee) গঠন করা হয়। এ সব কমিটির কাছ থেকে বিশেষ জ্ঞান সংক্রান্ত পরামর্শ পাওয়া যায় বলে ক্যাবিনেটের চলার পথে কোন বাধা থাকে না। এ ছাড়াও ক্যাবিনেট ও প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দানের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। যেমন প্রধানমন্ত্রী উইলসন আর্থিক ব্যাপারে ক্যাবিনেটকে পরামর্শদানের জন্য স্যার সলি জাকারম্যানকে নিয়োগ করেন। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডঃ নিকোলাস ক্যালডরকেও এক সময়ে ব্রিটিশ সরকারের কর বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। ক্যাবিনেটের ক্ষমতাবৃদ্ধির ব্যাপারে ঐ সব বিশেষজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞপুষ্ট কমিটিগুলির বিশেষ অবদান আছে।

৪. ক্যাবিনেটের বিশেষজ্ঞ কমিটি

৫. ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের অধীনে একটি স্থায়ী ক্যাবিনেট সচিবালয় (Cabinet Secretariat) গঠন করা হয়। ক্যাবিনেটের সভার বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা, সভা আহ্বান করা, সভার সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করা, সভার সিদ্ধান্ত জ্ঞাত করা এবং সর্বোপরি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করা ক্যাবিনেট সচিবালয়ের দায়িত্ব। ক্যাবিনেটের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের বিশেষ ভূমিকা আছে। বর্তমানে ক্যাবিনেটের সচিবালয় অনেকাংশে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে পরিণত হয়েছে।

৫. ক্যাবিনেট সচিবালয়

ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ক্রমবর্ধমান। ক্যাবিনেট যদি দক্ষতার সাথে এবং সুষ্ঠুভাবে নিজের দায়িত্ব পালনে অপারগ হত তবে ক্যাবিনেট তার কার্যকারিতা হারাতো এবং ঐরূপ অবস্থায় ক্যাবিনেটের পক্ষে নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হত না। অক্ষমের ক্ষমতা বৃদ্ধি গণতন্ত্রে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে এবং এ ধরনের ব্যাপার জনগণের বাধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু ব্রিটেনে ক্যাবিনেট কমিটি, বিশেষজ্ঞ কমিটি, সচিবালয় ইত্যাদি সংস্থা ক্যাবিনেটের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে ক্রমবর্ধমান দক্ষতার সাথে প্রয়োগে সাহায্য করে বলেই ক্যাবিনেট-নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে।

উপরোক্ত সংস্থাগুলির ভূমিকা

ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধির কারণ হিসাবে মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ভূমিকার গুরুত্ব হ্রাসের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। আগে পার্লামেন্ট জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে যোগসূত্ররূপে কাজ করতো। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন পেশাদারী গোষ্ঠী সরাসরি মন্ত্রিসভার সাথে সংযোগ রক্ষা করে। এর ফলে ঐ সব গোষ্ঠীর উপর ক্যাবিনেটের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের একনায়কে পরিণতি স্বাভাবিক ও অনিবার্য ছিল। জন-কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণ করা এবং আধুনিক জীবনের জটিলতাকে মোকাবিলা করার জন্য সব দেশেই শাসনবিভাগের ক্ষমতাবৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রিটেনের মত সংসদীয় ব্যবস্থায় ক্যাবিনেটই আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্যাবিনেটই শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। ফলে, অনিবার্যভাবেই ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু ক্ষমতাবৃদ্ধি নয়, ক্যাবিনেটের একক ক্ষমতা এমন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে ক্যাবিনেটের এ অবস্থাকে স্বাভাবিকভাবেই তাত্ত্বিক দিক থেকে ক্যাবিনেট নায়কতন্ত্র বলে অভিহিত করা যায়।

ক্যাবিনেটের এ পরিণতি অনিবার্য ছিল

ক্যাবিনেটের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে একনায়কের মত ক্ষমতা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। জনমত, বিরোধী দলের সমালোচনা ইত্যাদি ক্যাবিনেটের নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। যতক্ষণ ব্রিটেনে বিরোধী দল আছে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্যাবিনেটের পক্ষে পুরোপুরি নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

৩-৭. আইনসভার সাথে শাসনবিভাগের সম্পর্ক
Relation between the Legislature and the Executive

ঐতিহাসিক অবস্থা ও প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে ব্রিটেনে সংসদীয় ব্যবস্থার (Parliamentary system of Government) প্রবর্তন ও বিকাশ ঘটেছে এবং ব্রিটেনেই বস্তুত এ ব্যবস্থার পথিকৃৎ। এরূপ শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেটের সদস্যরা প্রত্যেকেই পার্লামেন্টের সদস্য এবং ক্যাবিনেট নিজের কাজের জন্য পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল থাকে। ক্যাবিনেটের প্রতি পার্লামেন্টের আস্থা না থাকলে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। তত্ত্বগত দিক থেকে ব্রিটেনে কমন্সসভাই মন্ত্রীসভা গঠন করে এবং ইচ্ছা করলে একে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। অর্থাৎ ক্যাবিনেট পার্লামেন্ট সৃষ্ট একটি সংস্থা, তাই ক্যাবিনেটকে পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয় এবং ক্যাবিনেটের প্রতি পার্লামেন্টের অনাস্থা প্রকাশ পেলে ক্যাবিনেটকে পদত্যাগ করতে হয়। পার্লামেন্টের সাথে ক্যাবিনেটের সম্পর্কের এ বিশ্লেষণ তাত্ত্বিক আলোচনা মাত্র।

১৬৮৮ সালের গৌরবজনক বিপ্লবের পরিণতিতে রাজার ক্ষমতা ও বিশেষাধিকারের একটা বিরাট অংশ ধীরে ধীরে পার্লামেন্টের কাছে চলে আসে। ঐ সময়ে মন্ত্রিসভা পরিচালনার ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত ছিল। কিন্তু ওয়ালপোলের প্রধানমন্ত্রিত্বের শুরু থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে এবং পার্লামেন্টের নিছক একটি কমিটি থেকে এক স্বাধীন ও সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ক্যাবিনেটের

অভ্যুত্থান ঘটে। বর্তমানে কমন্সসভা ক্যাবিনেটকে জীবন দান করে ঠিকই, কিন্তু পার্লামেন্টের জীবন ক্যাবিনেটের দয়ার উপর নির্ভর করে।[১]

বর্তমানে পার্লামেন্টের সব কাজকর্ম ক্যাবিনেট নিয়ন্ত্রণ করে। ক্যাবিনেট আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে, সরকারের ব্যয়-বরাদ্দ স্থির করে, কর-কাঠামো ঠিক করে এবং পার্লামেন্টকে দিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নেয়। ক্যাবিনেট নীতি স্থির করে এবং পার্লামেন্ট তা অনুমোদন করে। পার্লামেন্টে যাতে কাবিনেটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন আইন গৃহীত না হয় ক্যাবিনেট সেদিকে লক্ষ্য রাখে। এক কথায় পার্লামেন্টের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই—পার্লামেন্ট শাসনবিভাগ তথা ক্যাবিনেটের ইচ্ছা প্রতিধ্বনিত করার একটি যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

তত্ত্বগত দিক থেকে পার্লামেন্ট ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু বাস্তবে ক্যাবিনেট পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে। এরূপ অবস্থা পরিবর্তনের মূলে আধুনিক দলীয় ব্যবস্থা অনেকাংশে দায়ী। পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ক্যাবিনেট গঠন করে, সরকার চালায়। ক্যাবিনেটের প্রতিটি কাজের পেছনে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন থাকে। এরা দলীয় শৃংখলার জন্য ক্যাবিনেটকে অন্ধভাবে সমর্থন করে। ফলে ক্যাবিনেট নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী পার্লামেন্টকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় না। এজন্য কীথ (Keith) মন্তব্য করেছেন যে, পার্লামেন্টের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট নিশ্চিতভাবে একনায়কতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। হ্যারল্ড ল্যাস্কি মনে করেন যে, সংসদীয় ব্যবস্থার সাফল্যের গোপনসূত্র হল ক্যাবিনেট কর্তৃক পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রণ। যাই হোক জেনিংসকে অনুসরণ করে আমরা বলিতে পারি যে, যদিও এক অর্থে একথা সত্য যে কমন্সসভা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু অন্য অর্থে এবং বাস্তবে দেখা যাবে যে সরকারই কমন্সসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে (Though in one sense it is true that the House controls the Government, in another and more practical sense the Government controls the House of Commons)।

ক্যাবিনেটের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার যে এখনও তত্ত্বগত দিক থেকে পার্লামেন্টের কাছে ক্যাবিনেটকে আস্থাশীল থাকতে হয়, পার্লামেন্টের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর ক্যাবিনেটের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে এবং পার্লামেন্ট ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে সকল পদ্ধতির সাহায্যে ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে তা নীচে আলোচনা করা হল ঃ

১. পার্লামেন্টের সদস্যগণ পার্লামেন্টে রানীর ভাষণের উপর বিতর্ক, বাজেট বিতর্ক, বিল নিয়ে আলোচনার সময় বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ উত্থাপন ও সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করতে পারেন। এ ছাড়াও কোন জরুরী বিষয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা

১. "The House of Commons gives the Cabinet life, but formally it can itself live so long as it is prepared to go on giving life to the Cabinet."

—Harold Laski

(short disscussion) করে এবং দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রস্তাব উত্থাপন করে তাঁরা সরকারের কাজকর্ম আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। ঐ সকল আলোচনা ও সমালোচনা ক্যাবিনেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ সকল সমালোচনায় ক্যাবিনেটের পতন ঘটে না, কিন্তু এর ফলে জনমত গঠিত হয় এবং আগামী নির্বাচনের কথা মনে রেখে ক্যাবিনেট ঐগুলি উপেক্ষা করতে সাহসী হয় না।

২. প্রতিদিন পার্লামেন্টের অধিবেশনের শুরুতে কিছু সময় নির্দিষ্ট রাখা হয় প্রশ্নোত্তরের জন্য। ঐ প্রশ্নোত্তরের সময় সদস্যগণ বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের কাছ থেকে উত্তর আদায় করতে পারেন। মন্ত্রীর উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে সদস্যগণ অতিরিক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। প্রশ্নের মাধ্যমে সরকার সমালোচনার এ পদ্ধতি ক্যাবিনেটকে তৎপর ও সতর্ক রাখে, যাতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে সরকারকে বিপদে ফেলা সম্ভব না হয়। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার এ পদ্ধতি পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। কারণ পার্লামেন্টে প্রশ্ন উত্থাপন করে আলোড়ন সৃষ্টি হতে পারে এরূপ কাজ করা থেকে ক্যাবিনেট বিরত থাকে। মুনরো প্রশ্ন উত্থাপনকে একটি কার্যকর পদ্ধতি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এর কার্যকারিতাকে জুরীর সাহায্যে বিচার করা এবং হেবিয়াস কার্পাসের আদেশের তুল্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

৩. মুলতুবি ও নিন্দাসূচক প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ পার্লামেন্টের আছে বলে ক্যাবিনেট এমন কোন কাজ করতে সাহসী হয় না যার ফলে এর বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব উত্থাপিত হতে পারে।

৪. সরকারী তহবিল নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের একটি অমোঘ অস্ত্র। পার্লামেন্ট ব্যয়-বরাদ্দ ও বাজেট মঞ্জুর না করলে সরকার একটি পয়সাও খরচ করতে পারে না।

৫. পার্লামেন্ট অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করে সরকারের পতন ঘটাতে পারে।

পার্লামেন্টে প্রতিটি সদস্যের আলোচনার এবং ভোটদানের স্বাধীনতা থাকলে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে খুবই শক্তিশালী ও কার্যকর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি যে, দলীয় ব্যবস্থা ও দলীয় শৃঙ্খলা থাকার জন্য যে ক্যাবিনেটের পেছনে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন আছে এমন কোন ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব বা অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করা পার্লামেন্টের পক্ষে সম্ভব নয়। একই কারণে ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরী ও বাজেট পাশ না করে পার্লামেন্টের কোন উপায় থাকে না। তবে এ সকল পদ্ধতির একটি ইতিবাচক দিক আছে। এ সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিরোধী পক্ষ সরকারের সমালোচনা করতে পারে এবং এ সব সমালোচনার কোন সারবত্তা থাকলে তা জনমনে প্রভাব বিস্তার করে এবং এর ফলে সরকার-বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। এ কারণে পার্লামেন্ট সমালোচনা হতে পারে এরূপ কাজ করা থেকে ক্যাবিনেট বিরত থাকার চেষ্টা করে।

৪-৮. ব্রিটিশ ও মার্কিন ক্যাবিনেটের তুলনা

Comparison between British and American Cabinet

ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সাথে মার্কিন ক্যাবিনেটের তুলনা করার আগে ব্রিটিশ ও মার্কিন শাসনব্যবস্থার মধ্যে মৌল কাঠামো ও রূপগত পার্থক্য উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ব্রিটেনে পার্লামেণ্ট বা ক্যাবিনেট পরিচালিত সরকার প্রবর্তিত হয়েছে, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার প্রচলিত। ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট যে ভূমিকা পালন করে এবং যে গুরুত্বের অধিকারী সেরূপ ভূমিকা পালন করা এবং গুরুত্বের অধিকারী হওয়া পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় কোন ক্যাবিনেটের পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুত ক্যাবিনেট বলতে আমরা ব্রিটেনে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্থার কথা জানি তার সাথে মার্কিন ক্যাবিনেটের অনেকাংশেই সাদৃশ্য নেই। যাহোক নীচে আমরা উভয় ক্যাবিনেটের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা উপস্থিত করছি।

উৎসগত সাদৃশ্য

১ ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সাথে মার্কিন ক্যাবিনেটের উৎসগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মার্কিন সংবিধানে বা ব্রিটেনের কোন সাংবিধানিক দলিল ও বিধিবদ্ধ আইনে 'ক্যাবিনেট' শব্দটির উল্লেখ নেই। উভয় ক্যাবিনেটেরই সম্পূর্ণভাবে সংবিধান-বহির্ভূত উপায়ে উদ্ভব ঘটেছে। বলা যায়, সাংবিধানিক রীতিনীতির দ্বারা ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে এবং 'রাজমন্ত্রী আইন' (১৯৩৭) এ 'ক্যাবিনেট' শব্দটির প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন মার্কিন ক্যাবিনেটের আবিষ্কারক ও প্রবর্তক।

ক্যাবিনেট গঠন : রাষ্ট্রপতির শর্তহীন স্বাধীনতা

২. মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যদের নিয়োগ করার সম্পূর্ণ এবং একক ক্ষমতা ভোগ করেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। এ ব্যাপারে কারও সাথে পরামর্শ করার তাঁর কোন আইনগত বা আনুষ্ঠানিক (formal) বাধ্যবাধকতা নেই। ক্যাবিনেট সদস্যদের নিয়োগের ব্যাপারে তিনি শর্তহীন স্বাধীনতা ভোগ করেন। তিনি সাধারণত নিজ দলের এবং প্রয়োজনবোধে অন্য দলের সদস্যদেরও ক্যাবিনেটে গ্রহণ করতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রীর শর্তযুক্ত স্বাধীনতা

আইনের দৃষ্টিতে রাজা বা রানী ক্যাবিনেট সদস্যদের নিয়োগ করলেও প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যদের মনোনীত করেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু তাঁদের মনোনয়ন করার সময়ে তাঁকে রানীর সঙ্গে পরামর্শ করতে হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে রানীর পরামর্শ উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সদস্যদের নিয়োগের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতাও রানী ভোগ করেন। ক্যাবিনেট সদস্যদের নিয়োগের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী স্বাধীন হলেও নিজ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রত্যাশা ও দাবী যাতে মেটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাঁকে সতর্কভাবে ক্যাবিনেট গঠন করতে হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী

৩ ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট সদস্যদের বক্তব্য শুনে নিজের অভিমত স্থির করেন। সাধারণভাবে প্রধানমন্ত্রীর অভিমতকে ক্যাবিনেট গ্রহণ করে এবং প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্যাবিনেটে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ক্যাবিনেট সদস্যদের মতামতকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী উইলসন ১৯৬৭ সালে মিশরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেছিলেন—কিন্তু এ ব্যাপারে ক্যাবিনেট সহকর্মীদের আপত্তির ফলে তিনি ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারেননি।

কিন্তু মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির সহকর্মী নন, ফাইনারের ভাষায় অধীনস্থ 'ব্যক্তিগত কর্মচারী' মাত্র।[১] রাষ্ট্রপতি এদের কর্মচারীদের মত নিয়োগ ও পদচ্যুত করতে পারেন। রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেটকে তাই 'কিচেন ক্যাবিনেট' (Kitchen cabinet) বলা হয়—অর্থাৎ এটি একটি ঘরোয়া সংস্থা। ক্যাবিনেট সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির নিছক পরামর্শদাতা। রাষ্ট্রপতি এঁদের পরামর্শ উপেক্ষা করে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিখ্যাত রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন কোন একটি প্রশ্ন ক্যাবিনেটে উত্থাপন করে ভোট গ্রহণ করেন। লিঙ্কন প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দেন, কিন্তু অন্যান্য সব সদস্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। লিঙ্কন তখন ঘোষণা করেন যে প্রস্তাবটি গৃহীত হল।[২] এ উদাহরণটির মধ্য দিয়ে মার্কিন ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি ও ক্যাবিনেটের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির কর্মচারী

৪. ক্ষমতা বিভাজন নীতি অনুযায়ী মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যগণ আইনসভার (কংগ্রেস) সদস্য নন এবং ক্যাবিনেটের সদস্যরা তাঁদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল নন। আইনসভাও অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে ক্যাবিনেটের সদস্যগণকে অপসারিত করতে পারে না। ক্যাবিনেট সদস্যগণ তাঁদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকেন এবং রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছায় তাঁরা অপসারিত হতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির নিকট দায়িত্বশীল

অন্যদিকে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট গঠিত হয় পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্য থেকে। ক্যাবিনেট সদস্যগণকে পার্লামেণ্টের যে কোন একটি কক্ষের সদস্য হতে হয়। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যগণ ব্যক্তিগত এবং যৌথভাবে পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী থাকেন এবং পার্লামেণ্ট অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে তাঁদের অপসারিত করতে পারে—এরূপ অবস্থায় ক্যাবিনেটের পতন ঘটে।

পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল

৫. মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যরা কংগ্রেসের সদস্য নন, তাই আইনসভা পরিচালনা, নেতৃত্ব দান এবং আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ক্যাবিনেটের কোন ভূমিকা নেই। এজন্য মার্কিন ক্যাবিনেটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক সময় কংগ্রেসে নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ও আইন পাশ করতে দেখা যায়। এরূপও দেখা গিয়েছে যে, ক্যাবিনেট যে আইন চায় কংগ্রেস তা প্রণয়ন করা থেকে বিরত থাকছে।

আইনপ্রণয়নে মার্কিন ক্যাবিনেটের কোন ভূমিকা নাই

১. "The members of the Cabinet are obviously personal assistants of the President."

২. "Lincoln is reputed to have put a question to his cabinet and called for a vote : Lincoln voted 'aye", and all the rest "no", whereupon Lincoln declared, "the 'ayes' have it" ! —Rodee, Anderson, Christol and Greene, Introduction to Political Science. P. 164.

অন্যদিকে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যরা আইনসভার সদস্যই শুধু নন, ব্রিটিশ ক্যাবিনেটই আইনসভা পরিচালনা করে, কোন্ আইন প্রণয়ন করা হবে তা স্থির করে, আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং আইনসভাকে নেতৃত্ব দেয়। দলীয় ব্যবস্থার ফলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ক্যাবিনেটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন আইন প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বরং বলা যায়, ক্যাবিনেটের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করার জন্যই যেন এর অস্তিত্ব। বর্তমানে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পার্লামেণ্টের ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে তা ক্যাবিনেটের ইচ্ছাকে প্রতিধ্বনিত করার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট আইন প্রণয়ন করে

৬. মার্কিন ক্যাবিনেট রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা পরিষদ মাত্র। এটি ঐক্যবদ্ধ, যৌথ (collective) এবং একই চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ কোন সংস্থা নয়। তাই মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্বের নীতি এখানে অনুপস্থিত। অন্যদিকে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ঐক্যবদ্ধ, যৌথভাবে, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বে সুসংগঠিত, একই রাজনৈতিক চিন্তাধারায় পুষ্ট একটি কার্যকর সংস্থা। ফলে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যগণ ব্যক্তিগত ও যৌথ দায়িত্বের নীতির দ্বারা পরিচালিত।

যৌথ সংস্থা নয়

যৌথ সংস্থা

৭. সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের খ্যাতনামা ব্যক্তি ও নেতাদের নিয়ে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট গঠিত হয়—এঁরা জনজীবনেও বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। ব্রিটেনে ক্যাবিনেট সদস্য হওয়া একটা মর্যাদা ও প্রতিপত্তির ব্যাপার। এজন্য জাতীয় জীবনে প্রথিতযশা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য ক্যাবিনেট সদস্য হতে আগ্রহী হন।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার সোপান

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট এতই দুর্বল এবং জাতীয় জীবনে এতই গুরুত্বহীন যে, কোন খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতা বা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি এর সদস্য হবার যৌক্তিকতা খুঁজে পান না। মুনরো এরূপই মনে করেন যে, রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠার সোপান হিসেবে ক্যাবিনেটকে সেখানে দেখা হয় না।[১] একথা ঠিক যে, রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের আমলে বিদেশমন্ত্রী হিসেবে ডালেস বা আরও পরবর্তীকালে হেনরী কিসিংজার তাঁদের পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি হবার বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার সোপান হিসেবে ক্যাবিনেট সদস্যের পদকে কখনই দেখা হয় না। কিন্তু ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনয়নের সময়ে পার্লামেণ্ট সদস্য হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং ক্যাবিনেট সদস্য হিসেবে তাঁর দক্ষতাকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দিতে পারে না

সবকিছু বিবেচনা করে মার্কিন ক্যাবিনেটকে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একটি নিষ্প্রভ ছায়া বলে অভিহিত করা যায়।

৫-২. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী
The British Prime Minister

আগের আলোচনায় আমরা বলেছি যে, রাজা প্রথম জর্জ ক্যাবিনেটের সভায় যোগদান করতেন না এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে একজন ক্যাবিনেট সদস্য ক্যাবিনেট

১. "In the United States······cabinet office is not looked upon as a career." —Munro.

সভায় সভাপতিত্ব করতেন। ঐ সময়ে ওয়ালপোল ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব শুরু করেন, নিজের পছন্দমত লোকদের নিয়ে তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন, মন্ত্রিসভার ঢিলেঢালা ভাব কাটিয়ে তিনি শৃঙ্খলা আরোপ করেন এবং যে সব মন্ত্রীরা তাঁর সঙ্গে ঐকামত হতে ব্যর্থ হন তাঁদের তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন অথবা পদচ্যুত করেন। এভাবে ওয়ালপোলের মন্ত্রিত্বকালেই প্রধানমন্ত্রীর পদের সুপ্ত অংকুরটি আত্মপ্রকাশ করে এবং তাঁকেই ব্রিটেনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী (১৭২২-৪১) বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর পদ বলতে যে ক্ষমতা, অধিকার ও মর্যাদা বোঝায় সে সময় তা ছিল না। অনেক বিষয়েই বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর পদের সাথে ঐ সময়কার প্রধানমন্ত্রীর পদের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্রধানমন্ত্রী পদের উৎপত্তি

১৮৩২ সালের সংস্কার আইনের দ্বারা বর্তমান যুগের প্রধানমন্ত্রীর ধ্যান-ধারণার ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। রাজানুগ্রহে নয়, কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হয়েছেন—সংস্কার আইনের ফলে স্যার রবার্ট পীলের এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে এবং তিনি এভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদকে অলংকৃত করেন। তাই অনেকে প্রধানমন্ত্রীর পদ বলিতে বর্তমানে যা বোঝায় সে দৃষ্টিকোণ থেকে রবার্ট পীলকে ব্রিটেনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলে অভিহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনয়নের উপাদান

ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রীর পদাধিকারীর কি কি গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তা নিয়ে সম্প্রতি কিছু কিছু আলাপ-আলোচনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়ন দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কারণ কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংসদীয় নেতাই প্রধানমন্ত্রীপদে আসীন হন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীকে দলের সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। বর্তমানে সাধারণ নির্বাচন অনেকাংশে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে পরিণত হয়েছে। কোন দলের মনোনীত প্রার্থী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গ্রহণযোগ্য এ প্রশ্নটিকে সামনে রেখেই ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীকে কেবলমাত্র দলীয় সদস্যদের নিকট গ্রহণীয় হলে চলবে না, তাঁকে জনগণ তথা নির্বাচকমণ্ডলীর কাছেও গ্রহণযোগ্য হতে হবে। কারণ তাঁকে সামনে রেখেই ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে ভোট ধরার যন্ত্র কাজ করে।

এ কারণে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পদে মনোনয়নের ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা, পারিবারিক মর্যাদা, সংসদীয় অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। ম্যাকিনতোস (Mackintosh) একটি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে বিশের শতকে প্রথম ষোলজন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ১২ জন এসেছেন ভূস্বামী অথবা ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি পরিবার থেকে এবং একজন শ্রমিক শ্রেণী থেকে। প্রধানমন্ত্রী হবার আগে এদের প্রত্যেকের গড়ে ২৬ বছরের সংসদীয় অভিজ্ঞতা ছিল।[১]

ম্যাডগুইক (Madgwick) প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য পাঁচটি যোগ্যতার কথা বলেছেন।[২] এগুলি হল : ক, সাদা চামড়া, পুরুষ এবং ধর্মপ্রাণ (শ্রীমতী মার্গারেট

---

১. The Government and Politics of Britain, P. T. Mackintosh, P 43.

২. Introduction to British Politics, P. T. Madgwick, P 66.

থ্যাচার প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও এ কথা বলা সঙ্গত হবে না' যে, ব্রিটিশ জাতির প্রধানমন্ত্রী পদে পুরুষ নিয়োগের প্রবণতা আর নেই) খ. বুদ্ধিদীপ্ত না হলেও চলবে—কিন্তু বুদ্ধিমান হতে হবে (বেজহটের ভাষায় বলা যায় প্রথম শ্রেণীর দক্ষ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর চিন্তাবিদ্)[১] ; গ. পরিশ্রমী এবং অন্যকে উদ্যোগী করতে সমর্থ ; ঘ. সমালোচনায় কাতর হবে না এবং সমালোচনার বিরোধিতা করবে না ; ঙ. বিচারবুদ্ধি, ধৈর্য এবং সাহস।

সর্বোপরি একটা কথা বলা প্রয়োজন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীপদে মনোনীত ব্যক্তিকে অবশ্যই রক্ষণশীল এবং বুর্জোয়া ভাবধারায় পুষ্ট হতে হবে। রাজতন্ত্র, প্রিভি কাউন্সিল, লর্ডসভা প্রভৃতির প্রাচীন ভাবধারা ও সংস্কার প্রভাব ও সান্নিধ্যে যাঁকে কাটাতে হবে এবং যাঁকে একটি বুর্জোয়া সরকারের কর্ণধারের দায়িত্ব পালন করতে হবে তার পক্ষে রক্ষণশীলতা ও বুর্জোয়া ভাবধারার ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব নয় এবং উঠলেও ক্ষমতায় আসীন থাকা নিশ্চিত নয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলী

ব্রিটেনের কোন সাংবিধানিক দলিলে প্রধানমন্ত্রীর পদের উল্লেখ ছিল না, প্রচলিত রীতিনীতিকে ভিত্তি করেই এ পদটি গড়ে ওঠে। ১৯১৭ সালের একটি আইনে (*The Chequer Estate Act*) সর্বপ্রথম 'প্রধানমন্ত্রী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ১৯৩৭ সালে 'রাজমন্ত্রী আইন' (*The Ministers of the Crown Act*) এ প্রধানমন্ত্রীর মাইনে এবং অবসরকালীন ভাতার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু কোন বিধিবদ্ধ আইনে বা দলিলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলী আলোচনা করা হয়নি। যাই হোক এবার আমরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলী আলোচনা করছি।

১. কমন্সসভার নেতা

প্রধানমন্ত্রী সাধারণত কমন্সসভা থেকে নির্বাচিত হন এবং কমন্সসভার নেতৃত্বপদে আসীন থাকেন। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে জড়িত থাকেন বলে অনেক সময় পার্লামেন্টের দৈনন্দিন কাজ দেখাশুনার দায়িত্ব তিনি অন্য একজন মন্ত্রীর হাতে অর্পণ করেন। পার্লামেন্টের মাধ্যমে সরকারী নীতি ও সিদ্ধান্ত তিনি জাতির সম্মুখে উপস্থিত করেন। কমন্সসভায় বিরোধীদের আক্রমণ থেকে সরকার ও সহকর্মীদের রক্ষা ও তাঁদের কাজের জবাবদিহি করার মূল দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রী শুধু কমন্সসভার নেতা নন, তিনি এ সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেরও নেতা—তাই প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি কাজের পেছনে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন থাকে বলে তিনি আস্থা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে পার্লামেন্টকে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

২. ক্যাবিনেটের নেতা

তত্ত্বগত দিক থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ক্যাবিনেটের সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অগ্রগণ্য (primus inter pares) বলে অভিহিত করা হলেও বাস্তবে তিনি ক্যাবিনেটের স্রষ্টা, প্রধান এবং নেতা। নির্বাচনের জয়লাভের পরেই প্রধানমন্ত্রীকে ক্যাবিনেট গঠনে মনোনিবেশ করতে হয়। ক্যাবিনেটের আয়তন কি হবে এবং কাদের নিয়ে ক্যাবিনেট

১. "A man of first rate capacity and second rate ideas."

গঠিত হবে তা প্রধানমন্ত্রীই চূড়ান্তভাবে স্থির করেন। ক্যাবিনেট গঠনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী চরম ও অবাধ ক্ষমতা ভোগ করেন। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন, বিভিন্ন বিভাগের কাজে সমন্বয় সাধন করেন এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেন। ক্যাবিনেট সভায় তিনি মন্ত্রীদের বক্তব্য শোনেন এবং তার ভিত্তিতে তিনি নিজের মত স্থির করেন। ক্যাবিনেটে প্রধানমন্ত্রীর অভিমতই প্রাধান্য পায়। ক্যাবিনেটে সাধারণত ভোটের মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ করে মতপার্থক্য দূর করার চেষ্টা করেন। কোন নীতিগত বা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কোন মন্ত্রীর মতপার্থক্য দেখা দিলে ঐ মন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর অভিমত গ্রহণ করতে হয় অথবা পদত্যাগ করতে হয়। ১৯৬৬ সালে ফ্রাঙ্ক কাজিনকে (Frank Cousin) এবং ১৯৬৮ সালে লর্ড লংফোর্ডকে (Lord Longford) ঐ কারণে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী কোন মন্ত্রীর পদত্যাগও দাবী করতে পারেন। বিভিন্ন বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা নিজ নিজ দপ্তরের ব্যাপারে নিজে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করেন, তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং দপ্তরের কাজকর্মের ব্যাপারে তাঁকে অবহিত রাখেন। ক্যাবিনেটের অধিনায়ক হিসেবে ক্যাবিনেটের গঠন, পরিবর্তন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের অবাধ ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ভোগ করেন। দুর্বলচিত্ত প্রধানমন্ত্রীরা অনেক সময় ঐ দায়িত্ব পালনে অপারগ হন। তাই একজন সমালোচক বলেছেন যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে শক্ত হতে হয় এবং কখনও কখনও 'জল্লাদ'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। ১৯৬২ সালে প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান সরকারে নতুন ব্যক্তিত্ব ও নতুন চিন্তা আমদানি করার জন্য মন্ত্রিসভার ব্যাপক পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি সাতজন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করেছিলেন এবং ২৪টি মন্ত্রণালয়ের রদবদল করেছিলেন।

৩. রানীর প্রধান পরামর্শদাতা

রানীর প্রধান পরামর্শদাতা হলেন প্রধানমন্ত্রী। সংবিধান অনুযায়ী রানীকে সব বিষয় জানাতে হয় এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে হয় (The right of the queen to be informed and consulted)। প্রধানমন্ত্রীই রানীকে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত এবং সরকারী নীতি জ্ঞাত করেন এবং রানীর সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ করেন। রানীর বিশেষাধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও সুপারিশ অনুযায়ী রানী কমন্সসভা বাতিল করে নতুন নির্বাচনের ঘোষণা জারী করেন। রানীর সঙ্গে সরকারের যোগসূত্র হল প্রধানমন্ত্রী এবং তিনিই অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে রানীর যোগসূত্র রচনা করেন।

৪. দলের নেতা

প্রধানমন্ত্রী কেবলমাত্র সরকারেই নেতা নন, তিনি একটি রাজনৈতিক দলেরও নেতা। সুতরাং দলের ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে একটি ঐক্যবদ্ধ টিম হিসাবে একে পরিচালনার কঠিন দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীকে বহন করতে হয়। সরকার ও দলের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করতে না পারলে জনমনে প্রভাব বিস্তার করা যায় না। তাই নির্বাচনের কথা মনে রেখে প্রধানমন্ত্রীকে দলের কাজকর্মে সময় দিতে হয়, জনমতের

সংস্পর্শে থাকতে হয় এবং সরকারী কাজকর্মের সমর্থনে দলীয় সদস্যদের উদ্দীপ্ত করতে হয়। এজন্য গোটাদেশ তাঁকে সফর করতে হয়, রেডিও, টেলিভিসান ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে সরকার ও দলের ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে উদ্যোগী হতে হয়। আমরা আগেই বলেছি যে, সাধারণ নির্বাচন বস্তুত দুই দলের নেতার মধ্য থেকে একজনকে প্রধানমন্ত্রী বেছে নেয়ার ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এ দিক থেকে দলীয় নেতা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি।

৫. মন্ত্রিপরিষদের নেতা

প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র ক্যাবিনেটের নেতা নন, তিনি মন্ত্রিপরিষদেরও নেতা। বিস্তৃত পরিধিতে বিচরণ করে সেখান থেকে বেছে প্রধানমন্ত্রীকে আনুমানিক এক'শ জনের মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতে হয় এবং এদের প্রত্যেককে এক একটি দপ্তরের দায়িত্বে নিযুক্ত করতে হয়। মন্ত্রিপরিষদ গঠনের সময় প্রধানমন্ত্রীকে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হয়ঃ ক. মন্ত্রীরা সাধারণত যেন পার্লামেন্টের যে কোন একটি কক্ষের সদস্য হন; খ. মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য যেন লর্ডসভা থেকে গ্রহণ করা হয়; গ. কোন বিভাগীয় মন্ত্রী লর্ডসভার সদস্য হলে ঐ বিভাগের উপমন্ত্রী যেন কমন্সসভা থেকে নিযুক্ত হন; ঘ. স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, শিল্প ও ব্যবসায় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রীদের যেন কমন্সসভা থেকে নিযুক্ত করা হয়; ঙ. দলের অন্যান্য নেতা ও সদস্যরা যেন যোগ্য দায়িত্ব পায় এবং তাঁরা যাতে বিক্ষুব্ধ না হন এমনভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করতে হয়; মন্ত্রিপরিষদ গঠনের ব্যাপারে রানীর পরামর্শ ও মতামত বিবেচনা করতে হয়; চ. সদস্যদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও সততা বিচার করে তাঁদের মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৬. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নীতি নির্ধারণ

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ও পররাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হয়। পররাষ্ট্রের দায়িত্ব অন্য মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও অভিমত গ্রহণ করা হয় এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের কাজকর্মে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। আন্তর্জাতিক সম্মেলন, চুক্তি ও আলোচনাতে প্রধানমন্ত্রী অংশ গ্রহণ করেন। বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা, অন্য রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক সৃষ্টি করা, আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের অভিমতকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা, শত্রুর বিরুদ্ধে মিতালী ও যৌথ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া সৃষ্টি করা ইত্যাদি কারণে প্রধানমন্ত্রীকে মাঝে মাঝেই বিদেশ সফর করতে হয়। বর্তমান প্রকাশ্য কূটনীতির (open diplomacy) যুগে বিভিন্ন দেশের সাথে আলাপ-আলোচনা ও বোঝাপড়ায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

৩-১০. প্রধানমন্ত্রীর পদের গুরুত্ব ও সাংবিধানিক মর্যাদা
Importance and the Constitutional Position of the Office of the Prime Minister

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অনন্য। শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে শুধু ব্রিটেনের নয়, তিনি পৃথিবীর অন্যতম ক্ষমতাশালী শাসক। ক্ষমতা ও অধিকারের

ব্যাপ্তির জন্য তিনি বিপুল মর্যাদার অধিকারী। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি জনগণের নেতায় পরিণত হন। মন্ত্রিপরিষদ ও ক্যাবিনেটের নেতা হিসাবে তিনি ক্যাবিনেটের সদস্যদের কাছ থেকে আনুগত্য লাভ করেন এবং এখানে তাঁর প্রাধান্য প্রশ্নাতীত। সরকারের নীতি নির্ধারণ ও কমন্সসভা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে তিনি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি না নিয়ে কোন মন্ত্রী রানীর সাথে পরামর্শ করতে পারেন না, রানীকে পরামর্শদানের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ভোগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর দল কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার ফলে তিনি তাঁর সরকারের কাজের পেছনে পার্লামেন্টের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত থাকেন।

প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক অবস্থান

প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জেনিংস একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, সংবিধানের প্রতিটি পথই প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছে এবং সব পথই প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে মিলিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এ পথই পথগুলি রানী, পার্লামেন্ট, মন্ত্রিপরিষদ ও ক্যাবিনেট, ক্যাবিনেট, কমনওয়েলথের সদস্যগণ, এমনকি চার্চ ও বিচারালয়ে এসে উপনীত হয়েছে।

উপরোক্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থায় স্বভাবতই প্রধানমন্ত্রী বিপুল ক্ষমতা, ব্যাপক অধিকার, বিরাট মর্যাদা ও বহুল প্রতিপত্তির অধিকারী। মরলে (Morley) প্রধানমন্ত্রীকে 'ক্যাবিনেট তোরণের প্রধান-প্রস্তর' (keystone of the cabinet arch) বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্যার আইভর জেনিংস যথার্থভাবেই মনে করেন যে এ বিশ্লেষণ যথেষ্ট নয়। তাঁহার মতে প্রধানমন্ত্রী হলেন 'সাংবিধানিক তোরণের প্রধান-প্রস্তর' (key-stone of the constitution)। অন্যান্য মন্ত্রীদের সাথে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে গ্রহ এবং উপগ্রহপূর্ণ মহাকাশের সূর্য বলে অভিহিত করেছেন। আর একজন সমালোচকের ভাষায় বলা যায়, ক্যাবিনট হল রাষ্ট্রের পরিচালন-যন্ত্র এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন ঐ পরিচালন-যন্ত্রের চালক।[১]

তিনি রাষ্ট্রের চালক

শুধুমাত্র শাসনতন্ত্র বা প্রচলিত রীতিনীতি প্রধানমন্ত্রীকে এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী করেনি। এর আরও কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, দলীয় ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্তিশালী করেছে এবং দলীয় ব্যবস্থার ফলে পার্লামেন্টের সমর্থন সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত থাকেন। তাই দেখা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর দল ঐক্যবদ্ধ ও সংহত না থাকলে প্রধানমন্ত্রী ঐ পদের ক্ষমতার শীর্ষে উঠতে পারেন না। দলের সংহতি বিপন্ন হতে পারে এমন কোন নীতির পৃষ্ঠপোষকতা তিনি করতে পারেন না। এ কারণেই ১৯৬৯ সালে প্রধানমন্ত্রী উইলসন 'ধর্মঘট-বিরোধী আইন' পাশ করা থেকে বিরত থাকেন। দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্ট বাতিলের পরামর্শ দিতে পারেন বলে পার্লামেন্টের বিরোধী সদস্যরা নতুন নির্বাচনের ঝুঁকি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা করতে সাহসী হন না। তৃতীয়ত, মন্ত্রিপরিষদ এবং ক্যাবিনেট সদস্যরা জানেন যে প্রধানমন্ত্রীর পতনের সাথে তাঁদের পতনও জড়িত এবং অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর অনুকম্পার উপর তাঁদের রাজনৈতিক

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা-বৃদ্ধির সহায়ক কারণ

১. "The Cabinate is the steering wheel of the ship of the State and the Minister is the steer-man."—Ramsay Muir.

ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাই প্রধানমন্ত্রী সর্বদাই তাঁদের কাছ থেকে শর্তহীন সমর্থন পান। চতুর্থত, ক্যাবিনেট সচিবালয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত দপ্তরে পরিণত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাবৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এ সব কারণ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর (অ্যান্টনী ইডেন) ভাষায় বলা যায় যে, দলীয় সমর্থন, সহকর্মী (মন্ত্রী) নির্বাচনের অধিকার এবং পার্লামেন্ট বাতিলের পরামর্শ দানের অধিকার প্রধানমন্ত্রীকে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী করে তুলেছে। ম্যাকিনতোষ বলেছেন যে, ব্রিটেন বস্তুত প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা শাসিত হয়।

ক্যাবিনেট সরকার বনাম প্রধানমন্ত্রীয় সরকার

এ জন্যই বর্তমানে ব্রিটেনে একটি তাত্ত্বিক বিতর্ক শুরু হয়েছে যে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে 'ক্যাবিনেট সরকার' (Cabinet Government) না বলে প্রধানমন্ত্রীয় সরকার (Prime Ministerial Government) বলা উচিত। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট গঠন করেন, ক্যাবিনেট পরিচালনা করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর অভিমতকেই ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তের ছাপ মারা হয়। প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্যাবিনেটে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে না—ক্যাবিনেট সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। সুতরাং ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে ক্যাবিনেট সরকার না বলে প্রধানমন্ত্রীয় সরকার বলাই যুক্তিসঙ্গত বলে অনেকে মনে করেন।

একদা ব্রিটেনের রাজশক্তির ক্ষমতা সীমিত করে পার্লামেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়, পরে পার্লামেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে ক্যাবিনেটের হাতে ন্যস্ত হওয়ায় ক্যাবিনেট নায়কতন্ত্র দেখা দেয়। বর্তমানে ক্যাবিনেটের ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অভিমতকেই ক্যাবিনেট সম্মতির ছাপ দেয় এবং তা ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত বলে প্রচলিত হয়। সুতরাং ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও ভূমিকা লক্ষ্য করে অনেকে বলতে শুরু করেছেন যে, ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থাকে মহামান্য রানীর সরকার (Her Majesty's Government) বা ক্যাবিনেট সরকার (Cabinet Government) না বলে প্রধানমন্ত্রীয় সরকার (Prime Ministerial Government) বলাই সঙ্গত। কিন্তু অন্যদিকে অনেকে মনে করেন যে, ক্যাবিনেটের সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীকে এতটা অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী মনে করা ঠিক হবে না। তাঁরা উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৬৭ সালে প্রধানমন্ত্রী উইলসন মিশরের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ক্যাবিনেটের অন্যান্য সদস্যের আপত্তির জন্য তাঁর পক্ষে ঐ ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব হয়নি।

সাম্প্রতিককালে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা প্রসারিত হচ্ছে। একদিকে বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জটিলতা, অন্যদিকে রেডিও, টেলিভিসন ইত্যাদি প্রচার মাধ্যম তাঁকে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রীয় চরিত্রে পরিণত করেছে। কিন্তু তাঁর ক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটলেও অনেকে মনে করেন যে, তাঁর পক্ষে একনায়কের মত শাসন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ জনগণের মানসিকতা, দলীয় ব্যবস্থা এ ধরনের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার বিরোধী।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও ভূমিকা সম্পর্কে এরূপ প্রান্তিক মত পার্থক্যের অবকাশ অবশ্যই আছে এবং থাকবে। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ক্ষমতাশালী এবং মর্যাদার অধিকারী বলে অভিহিত করা যায়। তবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেকাংশে পদাধিকারির ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয়তা ও দলীয় সমর্থনের উপর নির্ভর করে। পরবর্তী অংশে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করছি।

ব্যক্তিত্বের উপর ক্ষমতা নির্ভর করে

৩-১১ প্রধানমন্ত্রীর পদের গুরুত্ব পদাধিকারীর উপর নির্ভর করে
The Office of the Prime Minster is what its Holder chooses to make it

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ব্যাপক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অধিকারের যথাযোগ্য প্রয়োগ করা বা না-করার উপর প্রধানমন্ত্রী পদাধিকারীর মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্ভর করে। অর্থাৎ পদাধিকারীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, কৌশল-নৈপুণ্য, দলীয় সমর্থন এবং সর্বোপরি ব্যক্তিত্বের উপর তাঁর আমলে প্রধানমন্ত্রীর পদ কতটা মর্যাদায় ভূষিত হবে তা নির্ভর করে। সমালোচকের ভাষায় বলা যায়, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই স্থির করে যে, প্রধানমন্ত্রী কী ভাবে তাঁর কার্য ও ক্ষমতার পরিধি ব্যাখ্যা করবেন, কী ভাবে দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কতটা সফল হবেন।

প্রথমত, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রচলিত রীতিনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে দক্ষ ব্যক্তির পক্ষে এ নমনীয়তার সুযোগ গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রীর কাজ ও ক্ষমতাকে প্রসারিত করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী যদি ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে নিজ দলের উপর প্রভাব বিস্তার করে দলের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে পারেন এবং তাঁর প্রতি কাজের পিছনে দলের অকুণ্ঠ সমর্থন নিশ্চিত করতে পারেন তবে তাঁর পক্ষে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। তৃতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত সততা এবং দক্ষতা দ্বারা জনমনে এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়তে পারলে সহজেই তিনি অনেক বেশি ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে পারেন। চতুর্থত, ব্যক্তিগত কৌশল-নৈপুণ্য, নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা এবং ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রধানমন্ত্রী তাঁর ক্যাবিনেট সহকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ও অনুগত রাখতে সমর্থ হলে তিনি নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সরকার পরিচালনা করতে সমর্থ হন।

তাই দেখা গিয়েছে, যে সব প্রধানমন্ত্রী উপরোক্ত গুণাবলীর দ্বারা জাতি, দল, পার্লামেণ্ট, ক্যাবিনেটের উপর প্রাধান্য স্থাপন এবং প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁরাই গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে সরকারকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে পেরেছেন। অন্যদিকে ব্যক্তিত্বহীন, দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিগণ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দল ও ক্যাবিনেটকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারেননি, জাতির মনে সাহস সঞ্চার করতে পারেননি এবং সরকারকে যথাযোগ্য নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ইতিহাসে এঁরা দুর্বল প্রধানমন্ত্রীরূপে আখ্যা লাভ করেছেন।

একদিকে স্যার রবার্ট ওয়ালপোল (১৭২১), উইলিয়াম পীট, বড় (১৭৬৬), স্যার রবার্ট পীল (১৮৩৪ ও '৪১), বেঞ্জামিন ডিসরেলী (১৮৬৮ ও ১৮৭৪), উইলিয়াম গ্লাডস্টোন (১৮৬৮, ৮০, ৮৬, ও ৯২), আর্থার জেমস্ ব্যালফোর (১৯০২), ডেভিড লয়েড জর্জ (১৯১৬), উইনস্টন চার্চিল (১৯৪০ ও ৫১) প্রমুখ দৃঢ়চেতা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন

প্রধানমন্ত্রীর আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা ব্যক্তিগত প্রয়াসে প্রধানমন্ত্রীর পদকে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলেছিলেন। ওয়ালপোল তো প্রধানমন্ত্রী পদের স্রষ্টা। কিন্তু ওয়ালপোলের পরে পদটি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, পীট কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে প্রধানমন্ত্রীর পদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। প্রধানমন্ত্রী বলতে বর্তমান যুগে আমরা যা বুঝি তার স্রষ্টা রবার্ট পীল। ডিজরেলী তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব দ্বারা সকলের মতের বিরুদ্ধে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করতেন। গ্ল্যাডস্টোনের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব থাকার জন্য সহকর্মীরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পেতেন না। যুদ্ধকালীন সময়ে চার্চিল প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যে দক্ষতা, নৈপুণ্য ও কূটবুদ্ধির (diplomacy) প্রয়োগ দেখিয়েছেন তার কোন তুলনা নেই। এঁরা সকলেই প্রধানমন্ত্রীর পদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন।

অন্যদিকে সল্‌সবেরী, রোজবেরী, নেভিল চেম্বারলেন প্রমুখ প্রধানমন্ত্রীদের ব্যক্তিত্ব, নৈপুণ্য এবং দক্ষতার অভাব ঐ পদের গুরুত্ব ও মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠতে পারেনি। এজন্যই একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হার্বার্ট অ্যাসকুইথ বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রীর পদটি এর পদাধিকারী যেরূপ করবে—পদটি সেরূপ হবে।[১]

---

১. "The office of the Prime Minister is what its holder chooses to make it."—Herbert Asquith

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে আইনসভার জননী (Mother of Parliaments) বলা হয়। ব্রিটিশ আইনসভা ন'শো বছরের প্রাচীন সংস্থা; দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে নিজের অস্তিত্ব ও বিকাশ বজায় রেখেছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্রমবিকাশের চারটি স্তর লক্ষ্য করা যায়ঃ ১. মধ্যযুগে পার্লামেণ্টের উদ্ভব ও বিকাশ; ২. টিউডর ও স্টুয়ার্ট রাজাদের যুগে পার্লামেণ্টের সাথে কর্তৃত্ব নিয়ে রাজশক্তির বিরোধ; ৩. গৌরবজনক বিপ্লব (১৬৮৮) থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত সময়ে দলীয় ব্যবস্থা ও ক্যাবিনেট ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং মন্ত্রিসভার দায়িত্বের তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা; ৪. ১৮৩২ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পার্লামেণ্টের ক্ষমতা হ্রাস।

আগেই বলা হয়েছে যে, ব্রিটেনে পার্লামেণ্ট বলতে রানীসহ পার্লামেণ্টকে (Queen-in-Parliament) বুঝায়। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। উচ্চ বা দ্বিতীয় কক্ষের নাম লর্ডসভা (House of Lords) এবং নিম্ন বা প্রথম কক্ষের নাম কমন্সসভা (House of Commons)। রানী সম্পর্কে আলোচনা আমরা আগেই শেষ করেছি। এবার লর্ডসভা ও কমন্সসভা নিয়ে আলোচনা করা হল।

৪-১. লর্ড সভার উৎপত্তি, গঠন ও কার্যাবলী

Origin, Composition and Functions of the House of Lords

প্রিভি কাউন্সিলের উৎপত্তি আলোচনার সময়ে আমরা বলেছি যে, নর্মান রাজাদের রাজত্বকালে রাজশক্তিকে পরামর্শ দানের জন্য সামন্তপ্রভু, যাজক, নাইট ইত্যাদি 'বিজ্ঞ ব্যক্তি' (wise men)-দের নিয়ে *Magnum Concilium* নামে একটি পরিষদ গঠিত হয়। ঐ পরিষদ আরও পরে বৃহত্তর পরিষদ (Great Council) নামে অভিহিত হয়। রাজশক্তি পরিষদের পরামর্শ মত কাজ করবেন—ঐ নীতি সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য বৃহত্তর পরিষদের নামমাত্র অধিবেশন ডাকা হত। কিন্তু কার্যত রাজশক্তি (যেমন দ্বিতীয় হেনরী) একান্ত বিশ্বাসভাজন কিছু ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। চরিত্রগত দিক থেকেও 'বৃহত্তর পরিষদ' জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা ছিল না, মূলত প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তপ্রভু এবং কিছু সংখ্যক যাজক ঐ সংস্থায় স্থান লাভ করত। চতুর্দশ শতকে ঐ সামন্তপ্রধান বৃহত্তর পরিষদ ব্যারন, যাজক ও সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা পার্লামেণ্টে পরিণত হয়।

লর্ড সভার উৎপত্তি

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে সামন্তপ্রভুরা উচ্চ খেতাব লাভ করে (Peer) স্বতন্ত্র শ্রেণীগত মর্যাদা লাভ করেন। ঐসব পীয়্যারদের নিয়ে পার্লামেণ্টের একটি স্বতন্ত্র কক্ষ সৃষ্টি হয় এবং অষ্টম হেনরীর রাজত্বকাল থেকে ঐ সংস্থা 'লর্ড সভা' নামে অভিহিত হয়। ঐ সময় থেকেই পীয়্যারদেরও নতুন মর্যাদা সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা গড়ে ওঠে। কিন্তু অন্য দিকে ঐ সময় থেকে কমন্সসভার হাতে লর্ডসভার কর্তৃত্বের হস্তান্তর ঘটতে থাকে। টিউডর বংশের রাজত্বকালেও ঐ ধারা অব্যাহত থাকে। স্টুয়ার্টদের রাজত্বকালে রাজা ও কমন্সসভার মধ্যে সম্পর্কের অবনতির সুযোগ গ্রহণ করে লর্ডসভা নিজের কর্তৃত্ব

বৃদ্ধির চেষ্টা করে। কিন্তু স্টুয়ার্ট রাজা প্রথম চার্লসের হত্যার (১৬৪৯) এক সপ্তাহের মধ্যে ঐ বিরোধে বিজয়ী কমন্সসভা লর্ডসভা অপ্রয়োজনীয় ও বিপদজনক (useless and dangerous) এ যুক্তিতে লর্ড সভাকে বাতিল করে। আবার ১৬৬০ সালে রাজশক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার সাথে সাথে লর্ড সভাকেও পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুতরাং ব্রিটেনে ১১ বছর লর্ড সভার অস্তিত্ব ছিল না।

লর্ড সভার পুনরায় প্রতিষ্ঠা ঘটল বটে, কিন্তু গৃহযুদ্ধ কমন্সসভার শক্তি বৃদ্ধি করে এবং লর্ড সভার ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। বিশের শতকে ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের 'পার্লামেন্ট আইন'-এর দ্বারা লর্ড সভার ক্ষমতার উপর চরম আঘাত হানা হয়। ফলে বর্তমানে হৃতক্ষমতা সম্পন্ন লর্ড সভা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার কী উদ্দেশ্য সাধন করে এ সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো।

লর্ড সভার গঠন

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত উপাধি বা খেতাবের ভিত্তিতে লর্ড সভার সদস্যপদ প্রাপ্তি ঘটে। ব্রিটেনে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ডিউক (Duke), মার্কোয়েস (Marquess), আর্ল (Earl), ভাইকাউন্ট (Viscount) এবং ব্যারণ (Baron) ঐ পাঁচ শ্রেণীর উপাধিধারী ব্যক্তিগণ এবং তাদের মৃত্যুর পরে তাদের উত্তরাধিকারী লর্ডগণ লর্ড সভার সদস্যপদ লাভ করেন। উপরোক্ত খেতাব থেকে ক্ষুদ্রতর খেতাবপ্রাপ্ত কাকেও লর্ড সভার সদস্য করা হয় না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত উপাধির ভিত্তিতে কোন মহিলা লর্ড সভার সদস্য হতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত উপাধি ছাড়াও রাজানুগ্রহে প্রাপ্ত খেতাব (Peerage) লাভ করে লর্ড সভার সদস্য হওয়া যায়। রানী নিজের বিশেষাধিকার প্রয়োগ করে নিজের জন্মদিনে বা নববর্ষে ব্যক্তিবিশেষকে তাঁর জীবনকালের জন্য ঐরূপ খেতাব বিতরণ করেন। রানীর কাছ থেকে খেতাবলাভ করে মহিলারাও লর্ড সভার সদস্যা হতে পারেন। বর্তমানে লর্ড সভায় এরূপ ৫০ জন মহিলা লর্ড সদস্যা আছেন।

তৃতীয়ত, ১৭০০ সালের 'স্কটল্যাণ্ডের সাথে একীকরণ আইন' অনুযায়ী স্কটল্যাণ্ডের সমপর্যায়ভুক্ত খেতাবধারী ব্যক্তিগণ নিজেদের মধ্য থেকে ১৬ জনকে নির্বাচিত করে লর্ড সভায় পাঠান। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পার্লামেন্ট গঠনের সময়ে ঐ ১৬টি পদের জন্য নির্বাচন হয়।

চতুর্থত, ১৮০১ সালে 'আয়ার্ল্যাণ্ডের সাথে একীকরণ আইন' অনুযায়ী আয়ার্ল্যাণ্ডের লর্ড খেতাবধারীরা নিজেদের মধ্য থেকে ২৮ জনকে আজীবনের জন্য লর্ড সভার সদস্য নিযুক্ত করেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের লর্ডদের মৃত্যুর পর নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা না থাকায় লর্ড সভায় এদের সদস্যসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

পঞ্চমত, ৯ জন আইন বিশেষজ্ঞ আপীল লর্ড (Lords of Appeal) এবং ২৬ জন ধর্মীয় লর্ডকে (Lords Spiritual) লর্ড সভার মনোনীত করা হয়।

লর্ড সভার গঠনপ্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা দেখা যাবে যে, লর্ড সভার সদস্যপদ ক্রমবর্ধমান। বর্তমানে লর্ড সভার সদস্যসংখ্যা এগার শতকের বেশি, এঁদের মধ্যে

উত্তরাধিকার সূত্রে উপাধিপ্রাপ্ত লর্ডের সংখ্যা আনুমানিক ৮৫০ জন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এগার শ' সদস্যের মধ্যে মাত্র তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতেই লর্ড সভার 'কোরাম' হয় এবং কাজ চলতে পারে। ত্রিশ জন সদস্যের উপস্থিতেই বিল পাশ করা যায়।

লর্ড সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন লর্ড চ্যান্সেলার। তিনি একজন মন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট সদস্য। তিনি লর্ড সভার বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতে পারেন এবং কমন্সসভার স্পীকারের ন্যায় তাঁকে তথাকথিত নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হয় না। তিনি যখন বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন, তখন সভাপতির আসন ছেড়ে লর্ড হিসাবে সভায় তাঁর নির্দিষ্ট আসনে তাঁকে আসীন হতে হয়। ক্ষমতার দিক থেকে তিনি কমন্সসভার স্পীকারের সমকক্ষ নন এবং বিতর্ক নিয়ন্ত্রণে তাঁর কোন ক্ষমতা নেই। প্রস্তাব পেশ করা, ভোট গণনা করা এবং ভোটের ফল ঘোষণা করাই তাঁর কাজ।

লর্ড সভার সভাপতি

উপাধি সংক্রান্ত নিয়মাবলী

ব্রিটেনে দুভাবে উপাধিলাভ করে লর্ড সভার সদস্য হওয়া যায়। প্রথমত, পিতার মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার সূত্রে উপাধি লাভ করে কারো পক্ষে লর্ডসভার সদস্য হওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, রানীর অনুগ্রহে (বাস্তবে মন্ত্রিসভার আনুকূল্যে) জীবনকালের জন্য উপাধি লাভ করে লর্ড সভার সদস্য হওয়া যায়। এতদিন পর্যন্ত এরূপ নিয়ম ছিল যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত লর্ড উপাধি ত্যাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ১৯৬৩ সালে গৃহীত *Peerage Act* অনুসারে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বা আজীবনের জন্য প্রাপ্ত উপাধি ত্যাগ করা যায় এবং উপাধি ত্যাগ করে লর্ড সভার সদস্যপদও ত্যাগ করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাম্প্রতিককালে প্রধানমন্ত্রীপদে আসীন হবার জন্য স্যার এ্যালেক ডগলাস হিউম (১৯৬৩) লর্ড উপাধি ত্যাগ করে কমন্সসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। লর্ড উপাধিধারীরা কমন্সসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না এবং ঐ নির্বাচনে ভোটদান করার অধিকারও পান না।

লর্ড সভার কাজ

যে সব রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত এবং যেখানে ধর্ম, ভাষা, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে জনসমাজ বিভক্ত, সে সব ক্ষেত্রে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠন করে দ্বিতীয় বা উচ্চ কক্ষে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় এবং এখানকার জনসমাজ মোটামুটিভাবে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত। সুতরাং ব্রিটেনে পার্লামেন্টের দ্বিতীয় কক্ষ লর্ড সভার উৎপত্তির কারণ স্বতন্ত্র। আমাদের আলোচনা করা দরকার কি দায়িত্ব পালন ও কি কি কাজ সম্পন্ন করার জন্য ব্রিটেনের লর্ড সভার অস্তিত্ব।

এককেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় দ্বি-কক্ষ

প্রথমেই লর্ড সভার আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজকর্ম আলোচনা করা প্রয়োজন। বর্তমানে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতেও ব্যাপক জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের দায়িত্ব রাষ্ট্রের

হাতে ন্যস্ত হওয়ায় আইনসভার আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজকর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে। লর্ড সভার ক্ষমতা ১৯১১ এবং ১৯৪৯ সালের পার্লামেন্ট আইন[১]-এর দ্বারা বিশেষভাবে হ্রাস-প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এখনও লর্ডসভাকে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। অর্থ বিল এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংক্রান্ত বিল কমন্সসভায় উত্থাপিত হয়। কিন্তু অন্যান্য সব বিল, বিশেষ করে যা বিতর্কিত চরিত্রের নয় সেগুলি লর্ড সভায় উত্থাপিত হয় এবং কমন্সসভায় উত্থাপিত হবার আগে ঐ সব বিলের কাঠামো লর্ড সভার দ্বারা আলোচিত ও নির্ধারিত হয়। লর্ড সভার হাতে প্রচুর সময় থাকার জন্য, লর্ডসভা দলীয় রাজনীতির আবর্তে সাধারণভাবে কম আন্দোলিত হয় বলে এবং এর সদস্যদের নির্বাচনে জয়ী হবার জন্য সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রচেষ্টা থাকে না বলে লর্ড সভা বিলের সংশোধন ও পরিবর্তনের ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। ফলে যে কোন ব্যস্ত সরকারকে লর্ড সভা প্রভূত সাহায্য করতে পারে। লর্ড সভা বে-সরকারী বিল ও হস্তান্তরিত আইন প্রণয়নের (Delegated Legislation) ব্যাপারেও কমন্স সভার সাথে সমান দায়িত্ব পালন করে। হারবার্ট মরিসন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে লর্ড সভার দায়িত্ব-সচেতন চরিত্র ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করেছেন।[২]

১. আইন প্রণয়ন সাংক্রান্ত কাজ

লর্ড সভা ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে কাজ করে। লর্ড সভার মূল ও আপীল দুটি এলাকাই আছে। লর্ড সভার মূল এলাকার গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে, বর্তমানে লর্ডসভা একমাত্র খেতাবের দাবী (claims to the Peerage) সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা মূল এলাকায় সম্পন্ন করে। যুক্তরাজ্যের আপীল মামলার সর্বোচ্চ আদালত হিসাবে লর্ডসভা দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করে। অন্যান্য দেশে এই দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্ট পালন করে। যাহোক লর্ড চ্যান্সেলর, লর্ড সভার ন'জন আইনজ্ঞ সদস্য (The Law Lords) এবং প্রাক্তন বিচারক লর্ডরা আপীল বিচার করেন।

২. বিচার সংক্রান্ত কাজ

লর্ড সভার সদস্যগণ স্থায়ী, তাই অভিজ্ঞ। সেজন্য এ সভাকে প্রধানদের প্রাজ্ঞ পরিষদ বলা হয়। অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ লর্ড সভার সদস্যগণ বিশেষ বিবেচনাপ্রসূত (deliberative) আলোচনার দ্বারা পার্লামেন্টের কাজকর্মে সাহায্য করে। প্রাচীন রাজনীতিবিদ, প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল এবং বিভিন্ন ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ লর্ডরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞান দ্বারা বৈদেশিক সম্পর্ক, কমনওয়েলথ সম্পর্ক এবং যেকোন সাধারণ নীতিসংক্রান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং সরকারকে বিবেচনাপ্রসূত পরামর্শ দেন। দলীয় নির্দেশের (party whip) শিথিলতা এবং স্বাধীনভাবে আলোচনার সুযোগ বেশী থাকায় লর্ড সভার আলোচনা ও মতামতকে সরকার নীতি নির্ধারণের সময় বিশেষভাবে বিবেচনা করে।

৩. বিশেষ বিবেচনা-প্রসূত আলোচনা

---

১. ১৯১১ এবং ১৯৪৯ সালের পার্লামেন্ট আইন সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে

২. Government and Parliament, Herbert Morrison. P. 189

কিছু কিছু সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের হাতিয়ার হিসাবে লর্ড সভাকে ব্যবহার করা হয়। যেমন, পার্লামেন্টের সদস্য নন এরূপ কোন ব্যক্তিকে যদি প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁকে 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত করে লর্ড সভার সদস্য করা হয়। আবার কাকেও মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিয়ে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে একই পদ্ধতিতে লর্ড সভার সদস্য করা হয়। এ ছাড়াও যে সকল প্রধান রাজনীতিবিদ্ বয়সের ভারে আর সচল নয়, অথবা যাঁরা দলীয় রাজনীতিতে আগ্রহী নন—ঐ সকল ব্যক্তিদের সম্মানের সঙ্গে আধা-রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠার উপায় হল লর্ড সভার সদস্য করা।

৪. সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের হাতিয়ার

দলীয় ব্যবস্থায় কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট সরকার অসীম ক্ষমতার অধিকারী। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার জন্য দলীয় ব্যবস্থায় সরকারের কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ অবস্থায় ছাড়া কমন্সসভার কাছ থেকে বাধার সম্মুখীন হয় না। ফলে সরকারের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার কোন উপায় থাকে না। লর্ড সভা এরূপ অবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করে। কমন্সসভার সমর্থনপুষ্ট হয়ে মন্ত্রিসভা যাতে দ্রুত এবং অবিবেচনাপ্রসূত বিল পাশ করতে না পারে লর্ড সভা তা নিশ্চিত করে এবং এরূপ বিলের সমালোচনা এবং বিল পাশ করতে দেরী করিয়ে লর্ড সভা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। লর্ড সভা সব সময় বিলে বাধাদান করতে পারে না এবং বাধা দান করেও না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে লর্ড সভা সমালোচনা দ্বারা জনমত গঠন করে, যার প্রভাব মন্ত্রিসভা উপেক্ষা করতে পারে না।[১] আবার কখনও কখনও লর্ড সভা অবিবেচনাপ্রসূত বিল পাশ থেকে মন্ত্রিসভাকে বিরত করতে সমর্থ হন। ১৯৬৯ সালে ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কারণে নির্বাচন এলাকা সংক্রান্ত একটি বিল উত্থাপন করেন। লর্ড সভার বাধাদানের ফলে বিলটি তিনি বাতিল করতে বাধ্য হন।

৫. নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ

লর্ড সভার ক্ষমতা

বর্তমান শতকে লর্ডসভার ক্ষমতা ব্যাপকভাবে কমানো হয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই লর্ডসভার কার্য সীমাবদ্ধ হয়েছে। ১৯১১ এবং ১৯৪৯ সালের পার্লামেন্ট আইন লর্ডসভার ক্ষমতাকে কিভাবে কমিয়েছে তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

ক. ১৯১১ সালের পার্লামেন্ট আইন (*Parliamentary Act of 1911*): কোন অর্থবিল কমন্স সভায় গৃহীত হবার পর লর্ড সভায় তা গৃহীত হোক বা না হোক এক মাস পরে তা আইনে পরিণত হয়। অর্থাৎ কোন অর্থবিল যদি লর্ড সভা অনুমোদন নাও করে তবুও কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত হবার একমাস পরে তা আইনে পরিণত হয়ে কার্যকর হবে। কোন বিল অর্থবিল কিনা তা স্থির করার দায়িত্ব লোকসভার স্পীকারের উপর অর্পণ করা হয়। দ্বিতীয়ত, ১৯১১ সালের আইনে বিধিবদ্ধ করা হয়

১. "......debates in the Lords have a character and importance of their own and are not without their influence on public opinion and Government policy,"—Government and Parliament, Herbert Morrison p, 185.

(পার্লামেণ্টের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিসংক্রান্ত বিল ব্যতীত) যে কোন সরকারী বিল যদি কমন্স সভার পর পর তিনটি অধিবেশনে গৃহীত হয় এবং যদি প্রথম অধিবেশনে বিলের দ্বিতীয় পাঠ এবং তৃতীয় অধিবেশনে তৃতীয় পাঠের মধ্যে দু বছর সময় অতিবাহিত হয় তবে লর্ড সভার অনুমোদন বাদেই বিলটি রাজকীয় স্বাক্ষর লাভ করে আইনে পরিণত হবে। অর্থাৎ ১৯১১ সালের আইন অনুযায়ী লর্ড সভা কোন সরকারী বিলকে অনুমোদন না করে দু বছর পর্যন্ত ঐ বিলকে আটকে রাখতে পারে, কিন্তু ঐ সময় অতিক্রান্ত হবার পরে লর্ড সভার অনুমোদন ছাড়াই তা আইনে পরিণত হবে। তৃতীয়ত, কমন্সসভার সর্বোচ্চ সময় সীমা (duration) সাত থেকে কমিয়ে পাঁচ বছর করা হয়। চতুর্থত, লর্ড সভার ভোটাভুটিতে সরকার পক্ষের পরাজয়কে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা বলে মনে করা হয় না এবং এ জন্যই লর্ড সভায় পরাজিত হলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয় না। সুতরাং ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন পাশ হবার ফলে শুধু মাত্র প্রচলিত রীতিনীতির দ্বারাই নহে, বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারাও লর্ড সভার ক্ষমতা কমানো হয়।

খ. ১৯৪৯ **সালের পার্লামেণ্ট আইন** (*Parliamentary Act of 1949*) : ১৯৪৯ সালের পার্লামেণ্ট আইনে লর্ড সভার ক্ষমতাকে আরও কমানো হয়। এ আইনে বলা হয়, কোন সরকারী বিল কমন্সসভায় পর পর দুটি অধিবেশনে গৃহীত হলে এবং প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় পাঠ এবং দ্বিতীয় অধিবেশনের তৃতীয় পাঠের মধ্যে এক বছর সময় অতিবাহিত হলে লর্ড সভাব বিনা অনুমোদনেই ঐ বিল রাজকীয় স্বাক্ষর লাভ করে আইনে পরিণত হবে। অর্থাৎ এ আইন ১৯১১ সালের আইন পরিবর্তন করে কমন্স সভার তিনটি অধিবেশনের জায়গায় দুটি অধিবেশন করা হয় এবং এর মধ্যবর্তী সময় দু বছর থেকে এক বছর করা হয়। অন্যান্য ব্যাপারে ১৯১১ সালের আইনের ধারাকে বহাল রাখা হয়। এ আইনটি ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে বলবৎ করা হয় (with retrospective effect)। প্রতিক্রিয়াশীল দ্বিতীয় কক্ষ যাতে প্রগতিশীল কার্যধারার বিরুদ্ধে বাধার সৃষ্টি করতে না পারে সে দিক থেকে ১৯১১ এবং ১৯৪৯ সালের আইন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত ঐ দুটি আইনের মধ্য দিয়ে লর্ডসভার ক্ষমতা ও কার্যকারিতা কমাবার ঘণ্টা ধ্বনিত হয়। তবে ১৯৪৯ সালের আইনের চেয়ে ১৯১১ সালের আইন অধিকতর গুরুত্বের দাবী করতে পারে।

মার্কিন সিনেটের সঙ্গে লর্ড সভার তুলনা

মার্কিন সিনেট পৃথিবীর আইনসভাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ। অন্যদিকে লর্ড সভা একটি দুর্বল দ্বিতীয় কক্ষ। সুতরাং উভয় সভাই আইন-সভার দ্বিতীয় কক্ষ এ সাদৃশ্য ছাড়া এদের মধ্যে অন্য কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই এদের বৈসাদৃশ্যগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন।

১. মার্কিন সিনেটের সদস্যগণ জনগণের দ্বারা ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। কিন্তু লর্ড সভার সদস্যগণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয়, এমনকি অন্য কোন সংস্থা বা নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা অপ্রত্যক্ষভাবেও নির্বাচিত নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে বা রাজানুগ্রহে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা লর্ড সভা গঠিত হয়। স্বভাবতই লর্ড সভার সদস্যদের একটি বিরাট অংশ সামন্তপ্রভু এবং সাধারণত ভু-স্বামী স্বার্থের প্রতি দুর্বল হলেও

বর্তমানে লর্ডগণ শিল্প ও তৎসংক্রান্ত আর্থিক কার্য-কলাপের সংগে জড়িত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা শিল্প ও অন্যান্য আর্থিক উদ্যোগে বিনিয়োগ করছেন। সুতরাং এখন লর্ডসভাকে আর কেবলমাত্র সামন্তস্বার্থের প্রতিনিধি বলা ঠিক নয়। কিন্তু মার্কিন সিনেটের সদস্যগণকে পুঁজিবাদী স্বার্থের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হলেও, সিনেটের সদস্যদের মধ্যে ভু-স্বামী স্বার্থের প্রতিনিধি নেই, এমন নয়।

২. মার্কিন সিনেট একশ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র ও কার্যকর সংস্থা। অন্যদিকে খেতাবধারী এগারো শো ব্যক্তি নিয়ে লর্ডসভা গঠিত। অন্য কারণ বাদ দিলেও লর্ডসভার বিপুল আয়তন যে এ সংস্থার পক্ষে কোন কার্যকর ভূমিকা পালনের অনুকূল নয় তা সহজেই অনুমেয়।

৩. লর্ডসভা এবং সিনেট উভয়ই স্থায়ী সংস্থা, কিন্তু এদের স্থায়িত্বের প্রকৃতি আলাদা। সিনেট সংস্থা হিসাবে স্থায়ী হলেও এর সদস্যরা ছ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রতি দু বছর অন্তর এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যপদ শূন্য হয় এবং নির্বাচনের দ্বারা তা পূরণ করা হয়। লর্ডসভা শুধুমাত্র স্থায়ী সংস্থাই নয়—স্কটল্যাণ্ডের সদস্যগণ বাদে এর অন্যান্য সদস্যরা সারা জীবন এর সদস্য থাকেন এবং বংশানুক্রমে উপাধিপ্রাপ্ত সদস্যগণের মৃত্যুর পরেও তাঁর উত্তরাধিকারী লর্ডসভার সদস্য হন।

৪. মার্কিন সিনেট আইনসভা হওয়া সত্ত্বেও একে মার্কিন রাষ্ট্রপতির কিছু কিছু কাজ অনুমোদনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যেমন, উচ্চপদে রাষ্ট্রপতি যে সকল নিয়োগ করেন সিনেটের অনুমোদন লাভ করে তা কার্যকর হয়। রাষ্ট্রপতি-সম্পাদিত চুক্তি ও সন্ধি সিনেটের অনুমোদন লাভ করতে না পারলে কার্যকর হয় না। কিন্তু ব্রিটেনের লর্ডসভার ঐরূপ কোন ক্ষমতা নেই। সিনেট নানা পদ্ধতিতে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও লর্ডসভার ঐ ক্ষমতা নেই।

৫. কিছু কিছু দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে লর্ডসভা সর্বোচ্চ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আপীল আদালত হিসাবে কাজ করে এবং কমন্সসভা কর্তৃক আনীত ইমপিচমেণ্টের শুনানী এখানে হয়। সিনেট আপীল আদালত হিসাবে কার্য করে না, তবে সিনেট মার্কিন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের ইমপিচমেণ্টের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিচার করতে পারে।

৬. অর্থবিল সিনেট এবং লর্ডসভা কোথাও তোলা যায় না। অর্থবিল বাদে যে কোন বিল সিনেট এবং লর্ডসভায় তোলা যায়। লর্ডসভা কোন বিল এক বছর এবং অর্থবিল মাত্র এক মাস বিলম্ব করাতে পারে। ঐ সময়ের পরে লর্ডসভার অনুমোদন বাদেই ঐ বিল আইনে পরিণত হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সিনেটের ক্ষমতা বেশি। সিনেট যে কোন বিল প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কোন অর্থ বিল সিনেটে উত্থাপন করা না গেলেও প্রতিনিধি সভা কর্তৃক অর্থবিল অনুমোদিত হবার পর সিনেট বিলের নামকরণ বাদে আর সব কিছু পরিবর্তন করতে পারে।

৭. কোন কোন সমালোচক সিনেটের সাথে লর্ডসভার তুলনা করে যথার্থই বলেছেন যে, মার্কিন শাসনব্যবস্থায় এমন অনেক কাজ আছে যা রাষ্ট্রপতি ও সিনেট প্রথম কক্ষ বা প্রতিনিধিসভাকে না জানিয়ে সম্পন্ন করতে পারে, সিনেট ও প্রতিনিধিসভা রাষ্ট্রপতিকে

না জানিয়ে কিছু কিছু কাজ করতে পারে। কিন্তু সিনেটকে না জানিয়ে রাষ্ট্রপতি ও প্রতিনিধিসভা কিছুই করতে পারে না। কিন্তু ব্রিটেনে লর্ডসভার ক্ষমতা ঐরূপ নয়। ব্রিটিশ লর্ডসভাকে উপেক্ষা করে কমন্সসভা অনেক কিছুই করতে পারে। ক্ষমতার দিক থেকে মার্কিন সিনেট পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ, আর ব্রিটিশ লর্ডসভা পৃথিবীর দুর্বল দ্বিতীয় কক্ষগুলির অন্যতম।

৮. বৈদেশিক নীতির বিষয়ে মার্কিন সিনেটের ক্ষমতা খুবই ব্যাপক। লর্ডসভার হাতে এ ব্যাপারে বিশেষ কোন ক্ষমতা অর্পণ করা হয়নি। সিনেটের বৈদেশিক কার্য সংক্রান্ত কমিটি (ফরেন রিলেশনস কমিটি) রাষ্ট্রপতির বৈদেশিক নীতির পর্যালোচনা করে প্রয়োজনবোধে তা কার্যকর না করার জন্য চাপ দিতে পারে। বৈদেশিক সাহায্য-সংক্রান্ত বিষয়ে সিনেটের ক্ষমতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৮.২. লর্ডসভার সমালোচনা এবং সংস্কার প্রস্তাব
Criticism of the House of Lords and the Proposals for its Reform

ব্রিটিশ লর্ডসভাকে একটি প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা, বিত্তশালী ও কায়েমী স্বার্থের দুর্গ এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারা বিরোধী ঘাঁটি বলে অভিহিত করা হয়। লর্ডসভাকে শুধুমাত্র তার প্রকৃতি বা ক্ষমতার জন্য সমালোচনা করা হয় না, লর্ডসভার গঠন সম্পর্কেও তীব্র সমালোচনা আছে।

প্রথমে আমরা লর্ডসভার গঠন সম্পর্কে আলোচনা উপস্থিত করবো। আটশোর বেশি উত্তরাধিকার সূত্রে উপাধিপ্রাপ্ত লর্ড এবং তিনশ জীবনকালের জন্য লর্ড নিয়ে লর্ডসভা গঠিত। উত্তরাধিকার সূত্রে যাঁরা লর্ডসভার সদস্য হয়েছেন (Hereditary Peers) তাঁরাই লর্ডসভার সংখ্যাধিক্য। এরা জাতীয় জীবনে প্রভাবশালী—বিভিন্ন ব্যাংক ও বৃহৎ ব্যবসায়ী সংস্থার পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সাথে জড়িত। জনজীবনের সাথে এদের কোন যোগ থাকে না, কারণ এরা সমাজের উপর মহলের বাসিন্দা এবং নির্বাচকমণ্ডলীর সাথে এঁদের কোন সংস্রব রাখার প্রয়োজন হয় না। অভিজাত বিদ্যালয় এবং অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ কলেজে এঁদের শিক্ষা। স্বভাবতই মানসিক গঠনের দিক থেকে এঁরা রক্ষণশীল, চিন্তার দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল। এদের সংখ্যাধিক্য, প্রধান্য এবং প্রভাবের ছত্রছায়ায় লর্ডসভা কোন কার্যকর ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারে না।

১. লর্ডসভার গঠন সম্পর্কে সমালোচনা

জাতীয় জীবনে অবদানের জন্য যে সকল রাজনীতিবিদ্, বিশেষজ্ঞ ও জ্ঞানীগুণীকে জীবনকালের জন্য উচ্চ খেতাব দিয়ে (Peers Life) লর্ডসভার সদস্য করা হয় তাঁরা অবসরপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি। তাঁরা বুর্জোয়া উদারনৈতিক চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষক হলেও তাঁদের পক্ষে স্বভাবতই ঐ বয়সে কোন উদ্যোগ লওয়া সম্ভব হয় না। ফলে লর্ডসভার রক্ষণশীল চরিত্র পরিবর্তনের কোন সুযোগ থাকে না এবং লর্ডসভা যে কোন প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণার মূর্ত প্রতীক হয়ে দেখা দেয়।

লর্ডসভা এমনভাবে গঠিত যে, প্রকৃতিগত দিক থেকে এ সংস্থা শুধুমাত্র রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীলই নয়, এটি ভূস্বামী এবং বৃহৎ ও একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধি।

স্বভাবতই লর্ডসভার পক্ষে কখনই বিশেষ শ্রেণীস্বার্থ ও বুর্জোয়া ভাবধারার ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব হয় না। এ জন্যই অতীতে লর্ডসভা গ্ল্যাডস্টোনের স্বায়ত্তশাসন নীতি (১৮৫৫), বার্ধক্য ভাতা আইন (১৯০৮), জাতীয় বীমা প্রকল্প (১৯১১) প্রভৃতি প্রগতিশীল ও কল্যাণমূলক কার্যের বিরোধিতা করেছে। ১৯১১ সালের 'পার্লামেন্ট আইন' গৃহীত হবার আগে লর্ডসভা উদারনৈতিক ও শ্রমিকদলের বহু জনকল্যাণমূলক কাজকে বাধাদানের কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। জেনিংস যথার্থই বলেছেন যে, দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল রক্ষণশীল দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?[১] লয়েড জর্জ অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় (১৯০৯) লর্ডসভার তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, ঐ কক্ষ রক্ষণশীল নেতা আর্থার জেমস্ ব্যালফোরের পোষা কুকুর, ঐ কক্ষ তার স্বার্থে চীৎকার করে।

২. কাজের সমালোচনা—ইহা শ্রেণীস্বার্থের রক্ষক

সুতরাং ক্রমশই ব্যাপকভাবে অনুভূত হতে থাকে যে, লর্ডসভার মত এরূপ একটি কক্ষের ব্যাপক ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। ব্রিটেনের বুর্জোয়া আর্থনীতিক কাঠামোতে কোন বৈপ্লবিক কর্মপন্থা বা নীতি গৃহীত হবে এরূপ আশা কেউ পোষণ করে না। কিন্তু যুগের অগ্রগতির সাথে সঙ্গতি রেখে যে সামান্য কল্যাণমুখী ও উদারনৈতিক প্রকল্প ও নীতি বুর্জোয়া রাষ্ট্র গ্রহণ করতে পারে লর্ডসভা সেগুলিরও বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে লর্ডসভার ক্ষমতা কমানোর দাবী উত্থাপিত হতে থাকে এবং ১৯১১ সালে একবার লর্ডসভার ক্ষমতা কমানো হয় এবং আরও পরে ১৯৪৯ সালে আর একবার লর্ডসভার ক্ষমতা কমানো হয়। কিন্তু শ্রমিক দলের অনেক সদস্য মনে করেন যে, লর্ডসভার মত একটি রক্ষণশীল কক্ষকে কোন বিল এক বৎসর বিলম্ব করাবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত নয়। এরূপ বিলম্বের ফলে অনেক সময় বিলের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না। সুতরাং বিল প্রণয়নে বিশৃংখলা সৃষ্টির ক্ষমতা হতে লর্ডসভাকে বঞ্চিত করা প্রয়োজন।

৩. ক্ষমতার সমালোচনা

লর্ডসভার সংস্কার

এ সকল কারণে লর্ডসভাকে বাতিল করা এবং বাতিল করা সম্ভব না হলে এর ব্যাপক সংস্কার সাধন করার প্রয়োজনীতা বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে।

ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল স্বাভাবিক কারণেই এমন কোন সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় যার ফলে লর্ডসভার রক্ষণশীল প্রবণতার পরিবর্তন ঘটে। তাই রক্ষণশীল দল ক্ষমতাসীন থাকা কালে শ্রমিকদলের চাপে লর্ড সভার কয়েকটি তুচ্ছ পরিবর্তন সাধন করে সংস্কারের দাবীকে মোকাবিলা করার চেষ্টা করে। ঐ সংস্কারগুলি হল ঃ

রক্ষণশীল দলের প্রচেষ্টা

১. লর্ড সভার সদস্যদের সভার অধিবেশনে উপস্থিত হার বৃদ্ধির জন্য ১৯৫৭ সালে সদস্যদের ভাতা প্রবর্তন করা হয়; ২. ১৯৫৮ সালে *Life Peerage Act*

১. "The question was, therefore, not whether a Second Chamber was necessary but whether a conservative Second Chamber was necessary." The Queen's Government. P. 72.

পাশ করে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী রানী কর্তৃক জীবনকালের জন্য নারী ও পুরুষকে খেতাব দান করে লর্ডসভার সদস্য করার ব্যবস্থা করা হয়; ৩. ১৯৬৩ সালে *Peerage Act* দ্বারা খেতাব ও লর্ডসভার সদস্যপদ ত্যাগের এবং কমন্স সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার দান করা হয়। বলাবাহুল্য লর্ডসভার সদস্যদের ঐ সকল অধিকার দানের মধ্যে সংস্কারের দাবীকে আবদ্ধ রেখে রক্ষণশীল দল মৌল পরিবর্তনের দাবীকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করে।

শ্রমিক দলের পরিবর্তনপন্থী সদস্যদের দাবী সত্ত্বেও ঐ দলও লর্ড সভাকে সংস্কারের প্রশ্নটিকে কখনই খুব বেশি গুরুত্ব দেয়নি। এর কারণ সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমত, ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের আইনে লর্ড সভার ক্ষমতা কমানোর পরে লর্ড সভার কার্যকারিতা হ্রাস পায় এবং এ আর শ্রমিক সরকারের কাজে খুব বেশি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, লর্ড সভাকে সংস্কার করে দক্ষ ও প্রভাবশালী কক্ষের প্রবর্তন শ্রমিকদলের মনঃপূত নয়। তৃতীয়ত, উত্তরাধিকার সূত্রে সদস্যপদ লাভের প্রথা বিলোপ করে লর্ড সভার সংস্কার করলে এর সদস্যপদের জন্য তিনটি বিকল্পের একটি গ্রহণ করতে হবে: ১. বাছাই (selection) করে লর্ডসভার সদস্য নিয়োগ করা, ২. মনোনয়নের (nomination) মাধ্যমে লর্ড সভার সদস্যপদ পূর্ণ করা; ৩. লর্ডসভার সদস্য পদের জন্য নির্বাচন (election) প্রথা চালু করা। লর্ড সভার সদস্যদের বাছাই বা মনোনীত করার অধিকার কার উপর অর্পণ করা হবে এ ব্যাপারে সমস্যা আছে। কারণ যাঁকেই অধিকার দেওয়া হোক তাঁর বা তাঁর পরামর্শদাতার রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়। অন্যদিকে লর্ড সভার সদস্যরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হলে তা কমন্সসভার সমান ক্ষমতা ও মর্যাদা দাবী করবে। সুতরাং উপরোক্ত তিনটি বিকল্পের একটিও গ্রহণযোগ্য নয়।

শ্রমিকদলের চিন্তা-ভাবনা

১৯৬৭ সালে রানী পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন যে, লর্ড সভার ক্ষমতা হ্রাস করে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ডসভার সদস্যপদ লাভের প্রথা বিলোপ করে একটি বিল আনা হবে যাতে লর্ড সভা গঠনে আধুনিক পার্লামেন্ট ব্যবস্থার কাঠামো গড়ে তোলা যায়। সর্বদলীয় মতৈক্যের ভিত্তিতে ১৯৬৮ সালে একটি বিলও উত্থাপন করা হয়:

সাম্প্রতিক চিন্তা

১ এই বিলে লর্ডসভাকে দুই স্তরে বিভক্ত করার প্রস্তাব ছিল। ২. একদিকে জীবনকালের জন্য যাঁরা উপাধি বা খেতাব পেয়ে লর্ডসভার সদস্য হয়েছেন তাদের নিয়ে একটি স্তর। এরা সংখ্যায় তখন ছিল ২৩০ জন এবং এদেরই কেবলমাত্র ভোটাধিকারের কথা বলা হয়েছে। ৩. অন্যদিকে বংশানুক্রমে যারা লর্ডসভার সদস্যপদ লাভ করেছে তারা। এদের ভোটাধিকার থাকবে না। ৪. উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ডসভার সদস্যপদ বিলোপ করা। এরূপ পদ খালি হলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের দ্বারা তা পূরণ করা। ৫. লর্ডসভা কর্তৃক কোন বিলকে বিলম্ব করার ক্ষমতা এক বছর থেকে কমিয়ে ছ মাস করা।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল এই যে, কমন্স সভায় শ্রমিকদলের বামপন্থী গোষ্ঠী এবং রক্ষণশীল দলের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী বিলটির বিরোধিতা করে এবং ফলে বিলটি পরিত্যক্ত হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ব্রিটেনে শ্রমিক ও রক্ষণশীল দলের মধ্যে বা এদের তথাকথিত দক্ষিণ ও বাম অংশের মধ্যে গুণগত ও মৌলিক পার্থক্য খুব সামান্য এবং এ কারণেই কার্যত লর্ডসভার যে খুব বেশি সংস্কার সাধন করা হবে না সে ব্যাপারে এদের মধ্যে খুব বেশি মতপার্থক্য নেই।

উভয় দল ও উভয় কক্ষ মূলত একই শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধি

ব্রিটিশ রাজনীতিতে বেজহটের সময় থেকেই লর্ড সভার সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে। অথচ আমূল ও মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। মুখ্য দল দুটির এ ব্যাপারে মতপার্থক্য কি এর জন্য দায়ী? অথবা নীতি হিসাবে যাই ঘোষিত হোক, কোন দলই লর্ডসভার আমূল সংস্কারে আন্তরিকভাবে উৎসাহী নয়? অনেকে মনে করেন, বৃটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণ মতৈক্য (general consensus) ও সমজাতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারায় (homogeneous political culture) সকল দল ও গোষ্ঠী লালিত ও পালিত বলে এবং সর্বোপরি উভয় কক্ষই একই আর্থিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে বলে উভয় কক্ষের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে বিরোধের অবকাশ নেই। পূর্বে লর্ড সভার সদস্যগণ সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে কাজ করলেও বর্তমানে আর্থনীতিক বিকাশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তারা শিল্পগত স্বার্থের সহিত পেশাগতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছেন। ব্রিটেনের মত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আইনসভার বিভিন্ন কক্ষের মধ্যে এ ধরনের আপস থাকাই স্বাভাবিক।

৪-৩. লর্ড সভাটিকে থাকার কারণ

Reasons for the Survival of the House of Lords

ব্রিটেনে লর্ড সভার সংস্কারের দাবী শোনা গেলেও এর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনের কথা খুব বেশি শোনা যায় না। অথচ বিদেশী পর্যবেক্ষকদের কাছে এটা খুবই আশ্চর্যজনক বলে মনে হয় যে, লর্ডসভার মত অগণতান্ত্রিক এবং অর্থহীন সংস্থাকে কেন টিকিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং এ প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক যে, ব্রিটেনের এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় লর্ড সভার বিলোপ সাধন করে এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা কেন করা হচ্ছে না?

লর্ডসভা রাখার স্বপক্ষে যুক্তি

প্রথমত, রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন ব্রিটিশ জনগণ লর্ড সভাকে ঐতিহ্যের প্রতীক বলে মনে করেন। তাই লর্ডসভা যতই অযৌক্তিক এবং অগণতান্ত্রিক হোক, কেউ এর বিলোপ চান না, যদিও তাদের লর্ডসভার সংস্কারে আপত্তি নেই (mend them, don't end them)।

১. ঐতিহ্যের প্রতীক

দ্বিতীয়ত, মনে করা হয় যে, লর্ড সভার ক্ষমতা যেভাবে হ্রাস করা হয়েছে তার ফলে ইচ্ছে থাকলেও লর্ড সভার পক্ষে কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সাধন করা সম্ভব নয়।

২. ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা নেই

তৃতীয়ত, বিলের খসড়া পরীক্ষা করা, আইনের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করা ইত্যাদি ব্যাপারে লর্ড সভা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।[১] লর্ডসভায় অনেক খ্যাতনামা আইনবিদ্ এবং প্রাক্তন বিচারকেরা থাকেন। তাঁরা আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিবেচনা করে যে সাহায্য ও পরামর্শ দেন তা খুবই মূল্যবান। প্রশাসন অভিজ্ঞ একজন প্রাক্তন ব্রিটিশ মন্ত্রী হারবার্ট মরিসন মনে করেন যে লর্ডসভাকে তুলে দিলে ঐ সকল দায়িত্ব পালনের জন্য কোন-না-কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে।

৩. আইন প্রণয়নে মূল্যবান সাহায্য

চতুর্থত, লর্ডসভা থাকার জন্য আইন প্রণয়নে দ্বি-মুখী ব্যবস্থা (two-way legislative traffic) গ্রহণ করা হয় বলে বিলের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন, সংশোধন উত্থাপন, বিলম্ব সাধন এবং সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে লর্ডসভা বিলের বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে সমর্থ হয়। লর্ডসভা না থাকলে আইন প্রণয়নে দ্বি-মুখী ব্যবস্থার উপকার থেকে পার্লামেণ্ট বঞ্চিত হবে।

৪. দ্বি-মুখী ব্যবস্থার উপকারিতা

পঞ্চমত, জ্যাকবস এবং জিঙ্কের মতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আলোচনায় উপযুক্ত ও প্রশস্ত স্থান হল লর্ডসভা। আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাব হোক বা আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দর বৃদ্ধি প্রসঙ্গ হোক, বা মজুরি বৃদ্ধি স্থগিতকরণ সংক্রান্ত নীতি নিয়ে আলোচনা হোক বা বায়ু দূষিতকরণ সংক্রান্ত বিষয় হোক—লর্ডসভার সদস্যরা ঐ সকল বিষয়ে উচ্চস্তরের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্, প্রাক্তন রাজনৈতিক নেতা ও বিশেষজ্ঞ সমন্বিত লর্ডসভা ঐ সকল ব্যাপারে যে সকল সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করে তা অনেক সময়ই কমন্সসভার কাছ থেকে পাওয়া যায় না।[২] স্যার আইভার জেনিংসও মনে করেন; যে সকল বিষয় বিতর্কমূলক নয়, অথচ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা সংক্রান্ত—সে সকল বিষয় আলোচনায় লর্ডসভার দক্ষতা প্রশ্নাতীত।

বিভিন্ন ব্যাপারে সুচিন্তিত ও উচ্চ স্তরের আলোচনা

ঐ সকল উপযোগিতার কথা মনে রেখেই হয়তো বর্তমানে আর লর্ডসভার বিলোপের কথা বলা হয় না। বর্তমানে লর্ডসভার সংস্কারের আলোচনাই প্রাধান্য লাভ করেছে এবং ঐ সংস্কারের আলোচনারও মূল কথা হল লর্ডসভার গঠনের পরিবর্তন সাধন। ভবিষ্যতে লর্ডসভার আরও কিছু সংস্কার ঘটতে পারে, কিন্তু লর্ডসভার ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব বেশি আতঙ্কিত হবার কারণ নেই বলে মনে হয়। কারণ নিকট ভবিষ্যতে লর্ডসভার বিলোপ সাধনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

লর্ডসভা সম্প্রতিকালে ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তিকে কোন অবস্থাতেই চ্যালেঞ্জ জানায়নি। দেশের শাসকশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রসারে বাধা সৃষ্টি করেনি, লর্ডসভার অবস্থান কোনক্রমেই রাষ্ট্রের আদর্শগত ভিত্তির বিরোধী নয়, বরং

১. From my own experience I would say that it is certain that drafting imperfections would materially increase if we relied upon single-chamber legislation"—Government and Parliament, Herbert Morrison.

২. Modern Governments, Jacobs and Zink. P. 94-95.

লর্ডসভা ইংরেজ রাজনীতির ঐতিহ্যের বাহক। তাই মনে করা হয়, ঐতিহ্যের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণকে বজায় রেখে তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য এ কক্ষটির অস্তিত্ব বজায় রাখা হচ্ছে এবং হবে।

৪-৪. কমন্সসভার গঠন ও কাজ
Composition and Functions of the House of Commons

কমন্সসভা পৃথিবীর প্রাচীনতম জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা। মধ্যযুগে এর বিকাশ ঘটলেও সপ্তদশ শতক পর্যন্ত কমন্সসভার অধিবেশন বসত অনিয়মিত ভাবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় রানী প্রথম এলিজাবেথের দীর্ঘ ৪৫ বছর রাজত্বের মধ্যে কমন্সসভার অধিবেশন সব মিলিয়ে ছ মাসের বেশী হয়নি। প্রথম জেমস এবং প্রথম চার্লস বহুবছর পার্লামেন্টের সাহায্য না নিয়ে দেশ শাসন করেছেন। গৌরবজনক বিপ্লবের পরে মহাসনদ (১৬৮৯) গৃহীত হবার পর থেকে কমন্সসভার বৈঠক নিয়মিত হতে শুরু করে এবং এর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ব্রিটেনে যদিও সাতশো বছর ধরে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে কিন্তু সেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের স্বীকৃতি একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। অতীতে ব্রিটেনে সামন্ত প্রভুরাই একমাত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারত এবং ক্রমওয়েলের আমলে প্রাপ্তবয়স্কদের শতকরা মাত্র তিন জনের ভোটাধিকার ছিল। ১৮৩২ সালের সংস্কার আইনে (*The Reform Act*) ভোটাধিকার লাভের জন্য যোগ্যতা হিসাবে সম্পত্তির পরিমাণ হ্রাস করা হয়। ফলে কিছু সংখ্যক মধ্যবিত্ত ভোটাধিকার লাভে সমর্থ হয় এবং প্রাপ্তবয়স্কদের শতকরা পাঁচজন ভোটাধিকার লাভ করে। ১৮৬৭ সালের সংস্কার আইনের ফলে ঐ সংখ্যা বেড়ে শতকরা ১৫-তে দাঁড়ায়। ১৮৮৪ সালের সংস্কার আইন শহরে শিল্প শ্রমিকদের ভোটাধিকার দেয়, কিন্তু কৃষিজীবীদের ঐ অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। ঐ সময় ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের হার শতকরা পঁচিশ-এ দাঁড়ায়। ১৯১৮ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐ আইন ত্রিশ বছরের উপর নারীদের সর্বপ্রথম ভোটাধিকার স্বীকার করে। সর্বস্তরের মানুষের জন্য ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় বলে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের হার বৃদ্ধি পেয়ে ঐ সময়ে শতকরা ৭৫-এ দাঁড়ায়। ১৯২৮ সালে নারী ও পুরুষের ভোটের যোগ্যতা সমান করা হয় এবং শতকরা ১০০ জন প্রাপ্তবয়স্কই ভোটাধিকার লাভ করে। ১৯৬৯ সালে নারী ও পুরুষ উভয়ের ভোটাধিকার লাভের বয়স কমিয়ে আঠার বছর করা হয়। ব্রিটেনে প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা একদিনে বর্তমানরূপ লাভ করেনি। বিগত ১৩০ বছর ধরে নির্বাচন ব্যবস্থা ও নির্বাচকমণ্ডলী গঠনে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটেছে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 'প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি ভোট' এবং এক সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন এলাকার (single-chamber constituency) নীতি গৃহীত হয়েছে।

প্রতিনিধিত্ব ও ভোটাধিকার

স্বাভাবিকভাবেই কমন্সসভার সদস্য সংখ্যাও কখনই স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে পারেনি। ১২৯৫ সালের 'মডেল' পার্লামেন্টের সদস্যসংখ্যা ছিল প্রচুর, অষ্টম হেনরীর

রাজত্বকালে (১৫০৯—১৫৪৭) তা হ্রাস পেয়ে ২৯৮ হয়। ১৮৩০ সালে কমন্সসভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫৮-তে দাঁড়ায়। প্রায় একশো বছরে এর সদস্য সংখ্যা আরও ৫০ জন বৃদ্ধি পায় (১৯২২ সালে সদস্যসংখ্যা ৭০৭ জন)। পরে স্বাধীন আইরিশ রিপাবলিক গঠনের ফলে সদস্য সংখ্যা কমে ৬১৫-তে দাঁড়ায়। ১৯৪৪ সালে কমন্সসভার সদস্য সংখ্যা হয় ৬৪০। ১৯৭৮ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে বলা হয় কমন্সসভার সদস্য-সংখ্যা ৬১৩ থেকে খুব বেশী বা কম হবে না।

কমন্সসভার সদস্যসংখ্যা

যা হোক, বর্তমানে কমন্সসভার সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী গোটা দেশকে ভৌগোলিক ভিত্তিতে নির্বাচন অঞ্চলে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি নির্বাচন এলাকা (constituency) থেকে সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচিত হন। ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সের নাগরিক কমন্সসভার প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে। লর্ডসভার সদস্য, বিদেশী, দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইত্যাদিরা কমন্সসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

নির্বাচন এলাকা

ভোটদাতার যোগ্যতা

কমন্সসভার স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর। কিন্তু যুদ্ধ বা ঐরূপ জরুরী অবস্থায় এর কার্যকাল বৃদ্ধি করা যায়। আবার প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রানী পাঁচ বছরের আগেও কমন্সসভা বাতিল করতে পারেন। কমন্সসভার সভাপতি হলেন স্পীকার। স্পীকার সম্পর্কে পরে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো।

আয়ুষ্কাল

কমন্সসভার কাজ ও গুরুত্ব

ব্রিটেনে তত্ত্বগত দিক থেকে রানী, লর্ডসভা ও কমন্সসভাকে নিয়ে পার্লামেন্ট গঠিত ; কিন্তু বাস্তবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বলতে কমন্সসভাকে বুঝায়। এ থেকে ব্রিটিশ পরিষদীয় ব্যবস্থায় কমন্সসভার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। নীচে আমরা ঐ গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার কাজকর্ম আলোচনা করছি।

প্রথমত, আইনসভা হিসেবে কমন্সসভাকে আইন প্রণয়ন করতে হয়। এস. ই. ফাইনার অবশ্য মনে করেন না যে, কমন্সসভা প্রকৃত আইনসভা—তিনি একে শাসনবিভাগের বর্ধিতরূপ (extension of the executive) বলে মনে করেন। কারণ কমন্সসভায় যে সকল বিল উত্থাপিত হয় তার শতকরা নব্বই ভাগ হল সরকারী বিল। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও বিভাগীয় সচিবদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা অনুযায়ী সরকারী বিভাগ ঐ সকল বিল রচনা করে এবং ক্যাবিনেট দ্বারা এবং কমিটি পর্যায়ে তা আলোচিত ও অনুমোদিত হয়। কমন্স সভা বিলের দ্বিতীয় পাঠের (Second Reading) সময় আলোচনার সুযোগ পায়, কিন্তু দলীয় শৃঙ্খলা থাকার জন্য আলোচনা কখনই নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে না। এক কথায় শাসনবিভাগের ইচ্ছা অনুযায়ী বিল উত্থাপিত হয় এবং এর ইচ্ছা অনুযায়ীই বিল কমন্সসভায় অনুমোদিত হয়।

১. আইন প্রণয়ন

দ্বিতীয়ত, বলা হয়, কর ধার্য করা এবং সরকারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব হল কমন্সসভার (Parliamentary control over receipts and expenditure of public money)। এ ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে, সরকার কর প্রস্তাবগুলি স্থির করে এবং

অর্থবিল হিসাবে তা কমন্সসভায় উত্থাপন করে। কমন্সসভা ঐ কর-প্রস্তাব সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ পায় এবং কমন্সসভার অনুমোদন বাদে কোন নতুন কর আরোপ করা যায় না। সরকারের আয়-ব্যয় সংবলিত বাজেট সরকারের অর্থমন্ত্রী কমন্সসভায় উপস্থাপিত করেন। কমন্সসভার অনুমোদন বাদে সরকার কোন নতুন ব্যয় করতে পারে না। বাজেট নিয়ে কমন্স-সভা সাধারণভাবে এবং দফাওয়ারী আলোচনার সুযোগ পায়। যা হোক সরকার কর্তৃক উত্থাপিত আয়, ব্যয় এবং কর প্রস্তাব নিয়ে কমন্সসভা আলোচনা করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচনা করতেও দ্বিধা করে না, কিন্তু মন্ত্রিসভা বা সরকার জানে যে শেষ পর্যন্ত ঐ সকল প্রস্তাব কমন্সসভা অনুমোদন করবে।

২. আর্থিক নিয়ন্ত্রণ

তৃতীয়ত, সরকারের কার্যাবলী ও নীতিকে আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা কমন্সসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ ব্যাপারে মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা কমন্সসভার কাছে। কমন্সসভার সদস্যগণ প্রশ্ন উত্থাপন করে, মুলতুবী প্রশ্ন উত্থাপন করে, বাজেট সংক্রান্ত সাধারণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে, সরকার কর্তৃক উত্থাপিত কোন নীতি সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করে, পার্লামেন্টে রানীর অভিভাষণ আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করে এবং সর্বোপরি অনাস্থা প্রস্তাব সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে মন্ত্রিসভাকে সমালোচনা এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ঐ সকল আলোচনায় বিরোধী দলের সদস্যদের ভূমিকাই প্রধান।

৩. নিয়ন্ত্রণ

চতুর্থত, কমন্সসভার ঐ সকল আলোচনা এবং সমালোচনার প্রভাব ও গুরুত্ব খুব বেশি—এগুলি জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বেজহটকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, ব্রিটিশ কমন্স সভার অধিবেশনকে একটা 'জাতীয় সাংবাদিক সম্মেলন' (a kind of national press conference) বলে অভিহিত করা যায়। পার্লামেন্টে বিরোধীরা সরকারের নীতি ও কার্যের সমালোচনা করেন এবং সরকার পক্ষ নিজের কার্যের সমর্থনে যুক্তি উত্থাপন করে। একদিকে এ সকল সমালোচনা এবং অন্যদিকে সরকার পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত বক্তব্য ও যুক্তি সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিবহাল করে এবং জনমত গঠনে সাহায্য করে। সুতরাং সরকারের কাজকর্ম লক্ষ্য করা এবং একে সমর্থন বা সমালোচনা করা কমন্সসভার অন্যতম কাজ।

৪. সরকারী কাজের সমর্থন এবং সমালোচনা

কমন্সসভার সদস্যগণ কর্তৃক সরকারী কার্যের সমর্থন এবং বিশেষ করে মন্ত্রিসভা কর্তৃক নিজেদের স্বার্থের যৌক্তিকতা উত্থাপনের ফলে জনগণের পক্ষে সরকারী কাজের মূল্যায়ন করা সহজ হয়। অন্যদিকে কমন্সসভায় সরকারী কার্যের সমালোচনাও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ১৯৪০ সালে বিরোধী দল অপেক্ষা ৮১ ভোটের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও কমন্সসভার সমালোচনার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

পঞ্চমত, কমন্সসভাকে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ (political career) গড়ে তোলার সর্বোত্তম স্থান বলে মনে করা হয়। বস্তুত কমন্সসভার সদস্য হিসেবে অভিজ্ঞতা

ও দক্ষতা মন্ত্রিসভায় স্থান লাভের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। আলোচনা ও বিতর্কে দক্ষতা, বিচার-বুদ্ধি, সমস্যা অনুধাবনের ক্ষমতা, নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা ইত্যাদি গুণাবলীর প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে কমন্সসভার সদস্য হিসাবে কার্যরত অবস্থায় এবং এই সকল গুণাবলীর ভিত্তিতেই কমন্সসভার রাজনৈতিক সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে ক্রমান্বয়ে পরিষদীয় সচিব, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, ক্যাবিনেট সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনীত করা হয়। সুতরাং ব্রিটেনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সৃষ্টির ব্যাপারে কমন্স সভার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৫ রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়িবার স্থান

৪.৫. কমন্সসভার স্পীকার

The Speaker of the House of Commons

ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় 'স্পীকার' একটি মর্যাদাসম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ পদ। স্পীকার কমন্সসভার পরিচালক তথা সভাপতি, ঐ সভার অধিকার ও স্বাধীনতার তিনি রক্ষক। যখন থেকে কমন্সসভার স্বতন্ত্র অধিবেশন শুরু হয়, তখন থেকেই সভার কাজ পরিচালনার জন্য একজন সভাপতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ঐ সময়ে কমন্সসভার মুখপাত্র (spokesman) হিসাবে তাঁর মাধ্যমে রাজসমীপে প্রার্থনা, অনুরোধ, মতামত উপস্থিত করা হত এবং এ জন্যই কমন্সসভার সভাপতিকে 'স্পীকার' নামে অভিহিত করার প্রথা প্রচলিত হয়। তবে ১৩৭৭ সাল থেকে স্পীকার পদের স্বীকৃতি দেখা যায় এবং স্যার টমাস হাঙ্গারফোর্ডকে ব্রিটেনের প্রথম স্পীকার হিসেবে অভিহিত করা হয়।

এই পদের উৎপত্তি

কমন্সসভার সদস্যদের মধ্য থেকে একজন স্পীকার নির্বাচিত করা হয়। এ পদে নির্বাচিত ব্যক্তি রানীর সম্মতি সাপেক্ষে (subject to the Royal approval) স্পীকার পদে অধিষ্ঠিত হন। তবে ঐ সম্মতি একান্তভাবেই আনুষ্ঠানিক। ১৬৭৯ সালের পর থেকে রাজশক্তি সব সময়ই কমন্সসভার মনোনয়নকে সম্মতি জানিয়েছেন।

রানীর আনুষ্ঠানিক সম্মতি প্রয়োজন

কমন্সসভার নির্বাচনের পরে এর সদস্যদের মধ্য থেকে একজন স্পীকার নিয়োগ করা হয়। সাধারণত পূর্বতন স্পীকার সুস্থ, সক্ষম এবং ইচ্ছুক থাকলে তাঁকেই ঐ পদে পুনর্নির্বাচিত করা হয়। স্পীকার পদে নতুন কাউকে নির্বাচিত করার প্রয়োজন দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদের সাথে পরামর্শ করে সকলের গ্রহণযোগ্য একজনের নাম স্পীকার পদের জন্য স্থির করেন। সরকার পক্ষীয় একজন সদস্য স্পীকার হিসেবে তাঁর নাম প্রস্তাব করেন এবং বিরোধী সদস্য তা সমর্থন করে। তবে স্পীকার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নজীরও আছে। ১৯৩৫, ১৯৪৫ এবং ১৯৫১ সালে

স্পীকার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য এ প্রথা গড়ে উঠেছে যে, স্পীকার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে না, পূর্বতন স্পীকার আবার নির্বাচিত হতে চাইলে তাঁকে পুনরায় স্পীকার পদে নির্বাচিত করা হবে এবং স্পীকার যে নির্বাচন এলাকা থেকে কমন্সসভার প্রার্থী হন সে কেন্দ্রে অন্য কোন প্রার্থী দেওয়া হয় না।[১]

উপরোক্ত, প্রথাগুলির উদ্দেশ্য হল স্পীকারকে পক্ষপাতহীন, নিরপেক্ষ ও দলীয় স্বার্থের উপরে উঠে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা এবং এ প্রথাগুলি স্পীকার পদের মর্যাদাবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়েছে বলে মনে করা হয়। যদিও একটি রাজনৈতিক দলের একজন সদস্য বা সমর্থক স্পীকার পদে নিযুক্ত হন, তবুও স্পীকার পদে নির্বাচিত হবার পরে তাঁকে 'নিরপেক্ষ ও অদলীয়' বলে গণ্য করা হয়। আশা করা হয় যে, কমন্সসভার ভিতরে ও বাইরে স্পীকার নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে থেকে দল-নিরপেক্ষভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

দল-নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতহীন

স্পীকারের জন্য নির্দিষ্ট আসনে স্পীকার আসীন হবার পরেই আইনের চোখে কমন্সসভা স্বীকৃতি পায়। অর্থাৎ স্পীকারহীন অবস্থায় কমন্সসভার কোন আইনগত স্বীকৃতি নেই। স্পীকারের কর্তৃত্বের প্রতীক হল তাঁর ন্যায়দণ্ড (Mace)। স্পীকারের পোশাক, আড়ম্বরপূর্ণভাবে আগমন ও প্রস্থানকে তাঁর মর্যাদার সাথে জড়িত মনে করা হয়। স্পীকার কমন্সসভা পরিচালনা করেন, কিন্তু কমন্সসভা যখন একটি কমিটি (Committee of the Whole House) হিসেবে কাজ করে, তখন স্পীকার সাধারণ সদস্যের আসন গ্রহণ করেন এবং ঐ কমিটির সভাপতি হিসাবে সভা পরিচালনা করেন। স্পীকার বৎসরে ৮৫০০ পাউন্ড বেতন এবং বিনা ভাড়ায় সরকারী বাসস্থান পান। অবসর গ্রহণের পরে তিনি পেনসন পান এবং লর্ড উপাধিতে (Peer) ভূষিত হয়ে লর্ড সভার সদস্য পদ লাভ করেন।

পোশাক ও ন্যায়দণ্ড

বেতন ও অন্যান্য সুবিধা

ব্রিটেনে ওয়েস্ এ্যান্ড মিনস্ কমিটির (The Committee of Ways and Means) সভাপতি সহকারী স্পীকারের (Deputy Speaker) দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ঐ কমিটির সহ-সভাপতি সহকারী স্পীকারের দায়িত্ব পালন করেন। স্পীকারের আদেশ প্রয়োগ এবং আজ্ঞাপত্র (Warrants) কার্যকর করার জন্য রানী কর্তৃক একজন সার্জেন্ট (The Sergeant-at-Arms) নিযুক্ত থাকেন। এ ছাড়াও ক্লার্ক (The Clark of the House of Commons) ও সহকারী ক্লার্ক রানী কর্তৃক নিযুক্ত হয়।

এই পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা

১. "It seems that the electorate is as determined to maintain the tradition that the Speaker should be re-elected to the House as the parties have to maintain the tradition of re-election within the Chamber." The Government of Great Britain, C. M. Carter and Others, P 113.

স্পীকারের কাজ ও দায়িত্ব

কমন্সসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা এবং এর কাজকর্ম পরিচালিত করা স্পীকারের প্রধান দায়িত্ব। স্পীকারের এ দায়িত্ব অনেকটা আধা-বিচারবিভাগীয় কাজের মত। সুতরাং তাঁর স্বাধীন আচরণ ও পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গী স্পীকারের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন নিশ্চিত করতে পারে। এ ব্যাপারে স্পীকারকে অনেকে খেলার রেফারীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্পীকারকে লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে পরিচালনা-পদ্ধতিগত আইন অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে সভা পরিচালিত হয়।

১. সভাপতিত্ব করা

দ্বিতীয়তঃ, স্পীকার সভার বিতর্ক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি নিজে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন না—সর্বদাই নির্বাক শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। সদস্যদের অধিকার ও সভার শৃঙ্খলা যাতে পরস্পরবিরোধী খাতে প্রবাহিত না হয় সে দিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। সভার শৃঙ্খলা ও সৌজন্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনবোধে তিনি যে কোন সদস্যকে তার বক্তব্য তুলে নিতে নির্দেশ দিতে পারেন এবং গুরুতর অন্যায় ঘটলে সদস্যকে শাস্তি দান করতে পারেন।

২. বিতর্ক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ

তৃতীয়ত, ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি সদস্য ও প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অধিকার রক্ষা এবং সামগ্রিকভাবে সভার মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব স্পীকারের। প্রতিটি দল যাতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার যুক্তিসম্মত সুযোগ পায়, সদস্যরা যাতে আলোচনায় মোটামুটি সমসুযোগ পান এবং সরকার যাতে এ সুযোগের উপর হস্তক্ষেপ না করতে পারে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব স্পীকারের। বিশেষ করে বিরোধী দল, সংখ্যালঘু ও সভার পিছনের সারির (back-bencher) সদস্যদের অধিকার রক্ষার জন্য তাঁকে সচেষ্ট থাকতে হয়। এজন্য সদস্যদের বক্তৃতার ক্রমপর্যায় তিনি নির্ধারণ করেন এবং বক্তৃতার জন্য কাকে কতটা সময় দেয়া হবে তা তিনি স্থির করেন। স্পীকারের অনুমতি বাদে আলোচনা বন্ধের প্রস্তাব (closure motion) উত্থাপন করা যায় না।

৩. সদস্য এবং দলের অধিকার রক্ষা এবং সভার মর্যাদা রক্ষা

চতুর্থত, সংসদীয় পদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য আইন স্পীকার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রচলিত নিয়ম ও অতীতের নজীর দ্বারা পরিচালিত হন। যে কোন প্রস্তাব ও প্রশ্ন সভায় উত্থাপনের অনুমতি দেবার আগে তিনি তা পরিষদীয় আইনসম্মত কিনা বিচার করে দেখেন।

৪. নিয়ম ব্যাখ্যা করা

পঞ্চমত, কোন বিল 'অর্থবিল' কিনা তা স্পীকার স্থির করেন এবং প্রতিটি অর্থবিলে স্পীকারকে এ মর্মে ঘোষণা করতে হয় যে এটা অর্থবিল। ১৯১১ সালের পার্লামেন্ট আইনে স্পীকারকে অর্থবিল স্থির করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

৫. অর্থবিল স্থির করা

ষষ্ঠত, সরকার যাতে সদস্যদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে বা তা খর্ব করতে না পারে তা দেখা যেমন স্পীকারের দায়িত্ব, তেমনি স্পীকারকে লক্ষ্য রাখতে হয় সদস্যরা যাতে অযৌক্তিকভাবে সরকারের কাজকর্মে বাধা দিয়ে কাজের অগ্রগতি রোধ না করে।

৬. কাজের অগ্রগতি নিশ্চিত করা

সপ্তমত, স্পীকার কমন্সসভার মুখপাত্র হিসেবে এর প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তিনি ঐ সভার অধিকারসমূহের (Privileges) অভিভাবক। সভার প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সরকারী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, বিভিন্ন পরিষদীয় সম্মেলনে যোগদান করেন, বিভিন্ন পরিষদীয় প্রতিনিধিদের আপ্যায়ন করেন এবং সভার মুখপাত্র হিসেবে তিনি রানীর সাথে সভার যোগসূত্র রক্ষা করেন। কমন্সসভার অধিকারগুলি রক্ষার দায়িত্ব স্পীকারকে গ্রহণ করতে হয় এবং অধিকার ভঙ্গের ঘটনা ঘটলে তিনি তার প্রতিবিধানে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৭. সভার মুখপাত্র ও প্রতিনিধি

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, ঐ সকল কাজকর্ম ছাড়াও স্পীকারকে বহু ধরনের আরও অনেক কাজ করতে হয়। যেমন. সভার কোন আসন শূন্য হলে উপ-নির্বাচনের জন্য আজ্ঞাপত্র পাঠানো, বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সভাপতি নিয়োগ করা, বে-সরকারী বিলের পরীক্ষক নিয়োগ করা ইত্যাদি। ঐ সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য স্পীকারের অধীনে একটি বৃহৎ দপ্তর থাকে। ঐ দপ্তর এবং পার্লামেন্টের গ্রন্থাগার পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব স্পীকারের উপর ন্যস্ত।

৮. অন্যান্য কার্য

ব্রিটেনে স্পীকারের পদটি শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণই নয়, এর মর্যাদা ও ঐতিহ্যের প্রতীক। একদিকে স্পীকার কমন্সসভার আনুষ্ঠানিক প্রধান, অন্যদিকে, প্রকৃত প্রধান। তিনি সভার প্রধান; সভাপতি, নিয়ন্ত্রক, অধিকারের রক্ষক, আইনের ব্যাখ্যাকর্তা, মুখপাত্র. প্রতিনিধি এবং অভিভাবক। উপরোক্ত প্রতিটি ব্যাপারে তিনি নিজ বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন, কারও পরামর্শের উপর তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ নির্ভর করে না। দলীয় আবর্ত যাতে স্পীকারের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা সৃষ্টি করে এ পদের মর্যাদা খর্ব করিতে না পারে তার জন্য দলীয় ব্যবস্থার মধ্যেও তাঁকে 'নিরপেক্ষ' রাখার সযত্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

স্পীকার পদের গুরুত্ব

৪.৬ পার্লামেন্টের বিশেষ অধিকার
Privileges of the Parliament

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় কক্ষই কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে। এগুলিকে পার্লামেন্টের বিশেষ অধিকার বলা হয়। ঐ বিশেষ অধিকারগুলি দেশের সাধারণ আইনের এক্তিয়ারের বাইরে— এ অধিকারগুলি ভঙ্গ হ'লে তা বিচার ও শাস্তিদানের ক্ষমতা পার্লামেন্টের সংশ্লিষ্ট কক্ষের উপর ন্যস্ত থাকে। তবে পার্লামেন্ট নিজে কোন নতুন অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে পারে না।

পার্লামেন্টের মর্যাদা রক্ষা করা এবং পার্লামেন্টের সদস্যারা যাতে তাঁদের কর্তব্য পালনে কোনরূপ অযৌক্তিক বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয় তার জন্য ঐ বিশেষ সুবিধা ও অধিকারগুলির উৎপত্তি। অতীতে কমন্সসভার সদস্যারা রাজশক্তির হস্তক্ষেপ থেকে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং ঐ অধিকারগুলিই পরবর্তী কালে নজীর হিসাবে (Precedents) পার্লামেন্টের বিশেষ অধিকার নামে অলিখিত আইনে পরিণত হয়। মোটামুটিভাবে লর্ডসভা ও কমন্স-সভার বিশেষ অধিকারগুলি এক। নতুন পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হবার আগে স্পীকার ঐ অধিকারগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থনা করেন এবং রাজশক্তির পক্ষ থেকে লর্ড চ্যান্সেলার ঐ অধিকারগুলি মঞ্জুর করেন।

নীচে আমরা পার্লামেণ্টের বিশেষ সুযোগ ও অধিকারগুলি আলোচনা করছি :

১. **আটক না হবার অধিকার :** পার্লামেণ্টের অধিবেশন শুরু হবার ৪০ দিন আগে থেকে অধিবেশন শেষ হবার ৪০ দিন পর্যন্ত দেওয়ানী দায়ে পার্লামেণ্টের কোন সদস্যকে আটক করা যায় না। ফৌজদারী ও নিরাপত্তামূলক কারণে আটকের বেলায় এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। সভা বা এর কোন কমিটির কাছে পার্লামেণ্টের যে সকল সদস্যের সাক্ষ্য থাকে তাঁদের ক্ষেত্রে এবং সভার কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও ঐ অধিকার প্রযোজ্য।

২. **বাক্‌স্বাধীনতা :** পার্লামেণ্টের সদস্যগণ পার্লামেণ্টে আলোচনা, বিতর্ক ও মতামত প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ বাক্‌স্বাধীনতা ভোগ করেন। পার্লামেণ্টে কোন মতামত প্রকাশের জন্য সদস্যদের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে কোন অভিযোগ উত্থাপন করা যায় না। এ অধিকার রাজশক্তির ক্রোধ থেকে সদস্যকে রক্ষা করার প্রয়াস থেকে উদ্ভূত। রানী প্রথম এলিজাবেথ শর্ত সাপেক্ষে ঐ অধিকারগুলি স্বীকার করেছিলেন। শর্ত ছিল যে, বৈদেশিক নীতি ও রানীর বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে পার্লামেণ্ট কোন আলোচনা করতে পারবে না, কারণ তা পার্লামেণ্টের বিবেচ্য বিষয় নয়। স্টুয়ার্ট রাজারা পার্লামেণ্টের বাক্‌স্বাধীনতার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে এবং পার্লামেণ্টের কয়েকজন সদস্যকে আটক করে। যা হোক, ১৬৮৯ সালে অধিকারের সনদে ঐ অধিকারগুলি স্বীকৃতি পায়।

১৮৪০ সালের পার্লামেণ্টের কাগজপত্র আইন (*Parliamentary Papers Act*) অনুযায়ী পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট, দলিল ও প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে ঐ অধিকার প্রযোজ্য নয় এবং ঐ সকল রিপোর্টে প্রকাশিত বিষয়ের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ আদালতে উপস্থিত করা যায়।

৩. **কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার :** পার্লামেণ্ট যে-কোন বিষয় আলোচনা করতে পারে এবং কার্যপদ্ধতি স্থির ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ১৮৮৪ সালে ব্রাডলফ নামে এক ব্যক্তি নর্দাম্পটন থেকে কমন্সসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি নিজেকে একজন নাস্তিক বলে ঘোষণা করেন। কমন্সসভা তাকে শপথ গ্রহণ করতে দেয়নি। এ ব্যাপারে আদালত ঘোষণা করে যে, কমন্সসভা নিজেই নিজের কাজকর্ম বিচারের চরম অধিকার ভোগ করে এবং এ যুক্তিতে আদালত কমন্সসভার ঐ কাজকে বে-আইনী ঘোষণা করতে অস্বীকার করে।

৪. **নিজের সংবিধান স্থির করার অধিকার :** পার্লামেণ্ট নিজের সংবিধান, অভ্যন্তরীণ পরিচালনা পদ্ধতি ও গঠন স্থির এবং নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী। সভার কোন আসন শূন্য হলে তা পূরণের জন্য লেখ (Writ) জারী করা, কোন সদস্যকে সভার মর্যাদাহানীর জন্য সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা বা তার সদস্যপদ বাতিল করা পার্লামেণ্টের অধিকারের অন্তর্গত। সদস্যদের নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগের মীমাংসার দায়িত্ব আদালতের উপর ন্যস্ত থাকলেও বর্তমান সদস্যদের (sitting members) যোগ্যতা বিচারের অধিকার পার্লামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত করা হয়েছে।

৫. **অধিকার ভঙ্গের জন্য শাস্তিদানের অধিকার :** পার্লামেণ্টের বিশেষ অধিকারগুলি ভঙ্গ করলে একে অধিকার ভঙ্গ বলা হয় এবং পার্লামেণ্টের মর্যাদা ও কার্যকারিতা রক্ষার জন্য পার্লামেণ্ট অধিকার ভঙ্গের ব্যাপারে প্রতিবিধান করার

অধিকারী। পার্লামেন্টে ইচ্ছা করে অসত্য বলা, পার্লামেন্টের সদস্যকে ভয় দেখান, পার্লামেন্টের নির্দেশকে উপেক্ষা করা, পার্লামেন্টের নির্দেশ কার্যকর হতে না দেয়া, পার্লামেন্টকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্ত করা ইত্যাদি কার্যকে সভার অধিকার ভঙ্গ বলে মনে করা হয় এবং এরূপ অধিকার ভঙ্গের দ্বারা সভার অবমাননার জন্য পার্লামেন্টের শাস্তিদানের অধিকার আছে। ঐ সকল ব্যাপার পার্লামেন্টের অধিকার রক্ষা কমিটির নিকট পাঠানো হয় এবং ঐ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পার্লামেন্ট শাস্তিদানের ব্যবস্থা করে।

৪-৭. ব্রিটেনে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা

Parliamentary Committee System in Britain

ব্রিটেনে রানী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকাল থেকেই কমিটি ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। ঐ সময়ে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয় এবং তখন থেকেই ঐ কমিটির পর্যালোচনার জন্য বিল পাঠাবার রীতি চালু হয়। কিন্তু ব্যাপকহারে কমিটি ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে বর্তমান শতকের প্রথম দিকে। সরকারের কাজকর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটায় বিভিন্ন প্রকারের নতুন নতুন আইন-প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞানের (specialised knowledge) প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সরকারী কাজে জটিলতা বৃদ্ধি পাবার জন্য কমিটি ব্যবস্থা আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। তা ছাড়া বিপুল আয়তনবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে সীমিত সময়ের মধ্যে জটিল, সূক্ষ্ম ও বিশেষজ্ঞানধর্মী বিষয়ের সুষ্ঠু আলোচনা সম্ভব নয়। অল্প সংখ্যক বিশেষজ্ঞ, পারদর্শী ও উৎসাহী সদস্য নিয়ে গঠিত কমিটিগুলি আইনের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে দেখতে পারে এবং আইনের উন্নতি বিধান করতে সমর্থ হয়।

উৎপত্তির কারণ

বর্তমানে ব্রিটেনে পাঁচ ধরনের কমিটি আছে। এগুলি হল: ১. সমগ্র কক্ষ কমিটি (Committee of the Whole House), ২. স্থায়ী কমিটি (Standing Committees), ৩. সিলেক্ট কমিটি (Select Committees), ৪. যৌথ কমিটি (Joint Committee) এবং ৫. বে-সরকারী বিল কমিটি (Private Bills Committees)। নীচে এগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

১. **সমগ্র কক্ষ কমিটি** (Committee of the Whole House): সমগ্র কমন্সসভা যখন একটি কমিটি হিসেবে কাজ করে তখন এর নাম 'সমগ্র কক্ষ কমিটি'। কমন্সসভার সকল সদস্য নিয়ে কক্ষ কমিটির অধিবেশন হয়। ওয়েজ এবং মিনস্ কমিটির সভাপতি সমগ্র কক্ষ কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং স্পীকারের আসন ত্যাগ করে কমন্সসভার স্পীকার সাধারণ সদস্য আসনে উপবিষ্ট হন এবং তাঁর ন্যায়দণ্ড টেবিলের নীচে রাখা হয়। কমন্সসভা যখন কক্ষ কমিটি হিসাবে কাজ করে তখন এর কার্য সংক্রান্ত নিয়মাবলী শিথিল করা হয়।

যে কোন বিল এই কমিটির কাছে পাঠানো যায়। তবে সাধারণত ব্যাপক স্বার্থ যে সকল বিলের সাথে জড়িত থাকে ঐ সকল বিল এ কমিটিতে আলোচনা করা হয়। বিলের দ্বিতীয় পাঠের পরেই কমন্সসভার যে কোন সদস্য বিলটিকে সমগ্র কক্ষ কমিটিতে পাঠাবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে। সিলেক্ট কমিটিতে সরকার

পক্ষের সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে অনেক সময় বিতর্কমূলক বিলকে কক্ষ কমিটিতে পাঠিয়ে এর দ্বারা অনুমোদিত করা হয়। আবার দ্রুততার সঙ্গে সরকারের কাজকর্ম সম্পন্ন করার জন্যও এ কমিটির সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

২. **স্থায়ী কমিটি** (Standing Committees) : অর্থ বিল বাদে অন্যান্য সরকারী বিলকে দ্বিতীয় পাঠের পর একটি স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো সংসদীয় রীতি। কমন্স-সভা প্রয়োজন সংখ্যক স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারে। পার্লামেন্টের মনোনয়ন কমিটি আছে যার কাজ হল স্থায়ী কমিটির সদস্যদের নিয়োগ করা। স্থায়ী কমিটিগুলির A, B, C এরূপভাবে নামকরণ করা হয়। ব্রিটেনে বর্তমানে A হইতে F পর্যন্ত ছয়টি স্থায়ী কমিটি আছে। প্রতিটি কমিটি ১৬ থেকে ৩০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। প্রতিটি কমিটির জন্য স্পীকার একজন সভাপতি মনোনীত করেন। স্থায়ী কমিটির অধিবেশন প্রাতঃকালে বসে এবং এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে এর কোরাম হয়।

৩ **সিলেক্ট কমিটি** (Select Committees) : আর্থিক ও পরিদর্শনমূলক কাজ সম্পন্ন করার জন্য কমন্সসভা কতকগুলি সিলেক্ট কমিটি গঠন করে। সাধারণত অনধিক ১৫ জন সদস্য নিয়ে প্রতিটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করা হয় এবং প্রতিটি কমিটি নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি মনোনীত করে। কমিটি তার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করলে যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্যদানের জন্য উপস্থিত হতে আদেশ জারী করতে পারে। সিলেক্ট কমিটি তিন শ্রেণীর হতে পারে :

ক. অধিবেশনকালীন কমিটি (Sessional Committees) : প্রতিটি অধিবেশনের আগে অধিবেশনকালীন কমিটি গঠন করা হয়। কয়েকটি অধিবেশনকালীন কমিটির নাম হল সরকারী হিসাব নিকাশ কমিটি (The Public Accounts Committee, বিশেষাধিকার সংক্রান্ত কমিটি (The Committee of Privileges), পার্লামেন্টারী কমিশনার সংক্রান্ত কমিটি (The Committee for the Parliamentary Commissioner)। সংসদীয় কমিটিগুলির মধ্যে সরকারী হিসাব-নিকাশ কমিটি (Public Accounts Committee) এবং ব্যয় পরীক্ষা কমিটি (Expenditure Committee) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

খ. অস্থায়ী কমিটি (Adhoc Committees) : বিল পরীক্ষা ও সংসদের বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়।

গ. বিশেষজ্ঞ কমিটি (Specialist Committee) : সরকারের প্রতিটি কমিটিকেই কম-বেশি বিশেষজ্ঞের কাজ করতে হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে শিক্ষা, অর্থনীতি, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি সব দপ্তরের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিজ্ঞান ও কলাকৌশলের জ্ঞানকে কাজে লাগান প্রয়োজন। এজন্য কমন্সসভা একাধিক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে।

৪. **যৌথ কমিটি** (Joint Committee) : উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে লর্ডসভা ও কমন্সসভার যৌথ কমিটি গঠন করার নিয়ম চলে আসছে। উভয় কক্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি (যেমন আইন পরিবর্তন, গুরুত্বপূর্ণ বে-সরকারী বিল পর্যালোচনা) আলোচনার জন্য উভয় কক্ষের সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে ক্ষুদ্র আয়তন-বিশিষ্ট যৌথ কমিটি গঠন করা হয়।

৫. **বে-সরকারী বিল কমিটি** (Committee on Private Bills) : বে-সরকারী বিল পর্যালোচনার জন্য ওয়েজ এ্যান্ড মিনস্ কমিটির চেয়ারম্যান এবং সিলেকসন কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত সদস্যদের নিয়ে বে-সরকারী বিল কমিটি গঠন করা হয়। সমর্থিত এবং অসমর্থিত বে-সরকারী বিল পর্যালোচনার জন্য দু শ্রেণীর বে-সরকারী বিল কমিটি গঠিত হয়।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কমিটি ব্যবস্থার দুটি ইতিবাচক দিক লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, কমিটি ব্যবস্থা থাকার জন্য পার্লামেন্টের অনেক সময় বাঁচে এবং দ্বিতীয়ত; বিস্তারিতভাবে সব কিছু বিচার-বিবেচনা করে কমিটি সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু সমালোচকেরা মনে করেন যে, কমিটি ব্যবস্থার বিনিময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ব্রিটেন এবং অন্যান্য দেশে কমিটির প্রাধান্য ও আধিক্য দেখে অনেকে এ ব্যবস্থাকে "কমিটি দ্বারা আইন প্রণয়ন" নামে অভিহিত করেছেন। মাইকেল ফুট মনে করেন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কমিটি ব্যবস্থা রোগের প্রতিষেধক নয় এটা রোগের অস্তিত্বের প্রকাশ।

৪-৮. আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা

Legislative Process

পার্লামেন্টের কার্যাবলীর মধ্যে আইন প্রণয়ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পার্লামেন্টের অনুমোদনের জন্য আইন সংক্রান্ত যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় তাকে 'বিল' বলে।

বিলের দুটি ভাগ

পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হবার পরেও একে বিল বলে এবং রানীর স্বাক্ষর লাভ করে বিল 'আইন'-এ পরিণত হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপিত বিলকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়: ১. **সাধারণ স্বার্থ সংপর্কিত বিল** (Public Bills) এবং ২. **বিশেষ স্বার্থ সংপর্কিত বিল** (Private Bills)। উভয় শ্রেণীর সংপর্কিত বিলগুলিকে আবার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়:

বিল

- সাধারণ স্বার্থ সংপর্কিত বিল (Public Bills)
  - সরকারী বিল (Govt. Bills)
    - **অর্থবিল** (Money Bills)
    - **অন্যান্য বিল** (Other Bills)
  - বেসরকারী সদস্যের বিল (Private Member's Bills)
- বিশেষ স্বার্থ সংপর্কিত আইন প্রণয়ন (Private Legislation)
  - বে-সরকারী (Private Bills)
  - অন্যান্য বিল (Other Bills)

যে সকল বিল জনসমাজের ব্যাপক সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে রচিত হয় তাকে সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল (Public Bills) বলে। এ বিলগুলিকে আবার দু ভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ **সরকারী বিল** (Government Bills) এবং **বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিল** (Private Member's Bill)। মন্ত্রীরা যে বিল উত্থাপন করেন তাই সরকারী বিল। সরকারী বিল আবার দু ভাগে বিভক্তঃ **অর্থ বিল ও অন্যান্য বিল** (যেমন স্বাস্থ্য বিল, শিল্প বিল, শিক্ষা বিল ইত্যাদি)।

সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল

বিশেষ কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ বা গোষ্ঠীর স্বার্থ বা অঞ্চলের স্বার্থ নিয়ে রচিত বিলকে বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল (Private Bills) বলে। যেমন, মিউনিসিপ্যালিটি, স্বায়ত্তশাসন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির ব্যাপারে যে বিল উত্থাপন করা হয় তা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত বিলও দুভাগে বিভক্তঃ **বে-সরকারী বিল এবং অন্যান্য।** কিছু কিছু বিল আছে যেখানে সাধারণ স্বার্থ এবং বিশেষ স্বার্থের মিশ্রণ দেখা যায়। এগুলিকে মিশ্র চরিত্রের বিল বলে।

বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল

ক. সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত (পাবলিক) বিল পাশ পদ্ধতি

এবার আমরা ব্রিটেনে আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা আলোচনা করবো। প্রথমেই অর্থবিল নয় এরূপ সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল বা পাবলিক বিল কিভাবে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আইনে পরিণত হয় তা আলোচনা করা হল।

বিলের উদ্যোগ গ্রহণ ও খসড়া প্রণয়ন

একটি বিল প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন সূত্র থেকে উত্থাপিত হতে পারে। সরকারের কোন বিভাগ (department), দলীয় নেতৃত্ব, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা অন্য কোন সূত্র কোন বিলের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করতে পারে এবং সরকার যদি এরূপ বিল প্রণয়নে স্বীকৃত হয় তবে বিলের খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। পার্লামেন্টের দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৌঁসুলিরা বিলের খসড়া প্রস্তুত করে। বিলের খসড়া প্রস্তুত করা খুবই কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পার্লামেন্টে উত্থাপনের জন্য বহু পাবলিক বিল প্রস্তুত থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সর্বসাকুল্যে বিল আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য বছরে মাত্র ১০০ দিন সময় পায়। সুতরাং বিলের গুরুত্ব অনুযায়ী ভবিষ্যৎ আইন প্রণয়ন কমিটি (Future Legislation Committee) পার্লামেন্টে উত্থাপনের জন্য বিলকে ক্রম পর্যায়ভুক্ত করে।

বিল উত্থাপন ও প্রথম পাঠ

অর্থবিল ব্যতীত অন্য যে কোন পাবলিক বিল পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষে উত্থাপিত হতে পারে। তবে সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ সকল বিল এবং অধিকাংশ পাবলিক বিল কমন্সসভাতেই উত্থাপিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অর্থবিল লর্ড সভায় উত্থাপিত হইতে পারে না, তা কেবলমাত্র কমন্সসভায় উত্থাপিত হয়। যা হোক পাবলিক বিল একজন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত হয়। মার্কিন আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার সাথে এখানে এর বিরাট পার্থক্য। ব্রিটেনের আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে শাসনবিভাগ। পাবলিক বিল উত্থাপন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী।

কোন গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিল অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী নিজে উত্থাপন করেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীরা আইনসভার সদস্য নন, সুতরাং সেখানে মন্ত্রী কর্তৃক আইনসভায় বিল উত্থাপনের প্রশ্নই ওঠে না।

যা হোক, ব্রিটেনে বিলের প্রস্তাবক বা উত্থাপক বিল উত্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করে বা লিখিতভাবে নোটিশ দিয়ে বিল উত্থাপন করতে পারেন। এর পরে যথাসময়ে স্পীকারের আহ্বানে বিলটি সভাকক্ষের টেবিলে উপস্থিত করা হয় এবং সভার কর্মসচিব শুধুমাত্র বিলটির শিরোনামা (Title) পাঠ করেন। একে বিলের প্রথম পাঠ বলে। এ স্তরে বিলটির উত্থাপন ও প্রথম পাঠ সমাপ্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিলটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হলে বিলের প্রস্তাবক, বিলটির উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা এ স্তরে ব্যাখ্যা করতে পারেন। প্রথম পাঠের স্তর অতিক্রম করে বিলটি মুদ্রিত হয়ে পরবর্তী পর্যায়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

দ্বিতীয় পাঠ

সভার কার্যসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত দিনে বিলের প্রস্তাবক 'বিলটি দ্বিতীয়বার পাঠ করা হোক' এ মর্মে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বস্তুত বিলের দ্বিতীয় পাঠই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যায়ে বিলের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যায়ে বিরোধী পক্ষ বিলটির সমালোচনা করে একে বাতিল বা সংশোধনের চেষ্টা করেন। বিরোধীদের সংশোধনী পরাজিত হলে স্পীকার ঘোষণা করেন যে 'বিলটির দ্বিতীয় পাঠ সমাপ্ত হল' এবং বিলটি তখন তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করে।

কমিটি পর্যায়

প্রস্তাবিত বিলটি এইবার যথাযোগ্য কমিটিতে (স্থায়ী কমিটি বা কোন সিলেক্ট কমিটি) প্রতিটি ধারা এবং সংশোধনী সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্যে পেশ করা হয়। কমিটি স্তরে বিলটির প্রতি ধারা-উপধারা নিয়ে আলোচনা এবং ঐ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিলটির সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দাবী নিয়ে আলোচনা চলে। কমিটির স্তর পর্যায়ে আলোচনায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। সকল প্রকার বিচার-বিবেচনার পর কমিটি বিলটি সম্পর্কে সভার কাছে রিপোর্ট দাখিল করে।

রিপোর্ট পর্যায়

বিলটি যদি সমগ্র কক্ষ কমিটিতে আলোচিত হয় তবে আর রিপোর্ট পর্যায়ে কোন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় না, বিলটি নিছক আনুষ্ঠানিক ভাবে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু সমগ্র কক্ষ কমিটিতে বিলটির সংশোধন করা হলে সে সম্বন্ধে রিপোর্ট পর্যায়ে বিবেচনা করা হয়। সে ক্ষেত্রে বিলটিকে কোন স্থায়ী বা সিলেক্ট কমিটি বিবেচনা করে। এরূপ ক্ষেত্রে রিপোর্ট পর্যায়ে বিলের ধারা-উপধারা সম্পর্কে পুনরায় সংশোধন প্রস্তাবাদি উত্থাপিত ও আলোচিত হতে পারে এবং ভোট গণনার দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তৃতীয় পাঠ

তৃতীয় পাঠের কাজ মূলত আনুষ্ঠানিক, কারণ বিলের ভাগ্য আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছে। এ স্তরে আর একবার সংক্ষিপ্ত সাধারণ আলোচনা ও সামান্য ভাষাগত সংশোধন

চলতে পারে। যা হোক এ পর্যায়ে বিলটিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করে তাকে অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

অন্যকক্ষে প্রেরণ

সাধারণত বেশির ভাগ পাবলিক বিল কমন্সসভাতেই উত্থাপিত হয়। কমন্সসভায় উত্থাপিত বিল সেখানে গৃহীত হবার সাথে সাথে তা লর্ডসভায় পাঠানো হয় (বিলটি লর্ডসভায় উত্থাপিত হলে উপরোক্ত বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হবার সাথে সাথে বিলটি কমন্সসভায় প্রেরণ করা হয় এবং কমন্সসভায় ঐ স্তরগুলি অতিক্রম করে বিলটি অনুমোদিত বা বাতিল হয়)। কমন্সসভার মত একইভাবে স্তরগুলি অতিক্রম করে বিলটি যদি লর্ডসভায় বিনা সংশোধনে অনুমোদিত হয় তবে তা রানীর স্বাক্ষরের জন্য পাঠানো করা হয়।

যদি লর্ডসভা কোন নতুন সংশোধনী উত্থাপন করে তবে তা আবার কমন্সসভার বিবেচনার জন্যে পাঠানো হয় এবং যদি কমন্সসভা ঐ সংশোধনকে গ্রহণ করে তবে বিলটিকে রানীর স্বাক্ষরের জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু লর্ডসভা কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধন যদি কমন্সসভা গ্রহণ না করে তা হলে উভয় কক্ষের মধ্যে লিখিত বাণীর মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। কোন মীমাংসায় উপনীত হলে রানীর সম্মতির জন্যে বিলটি পাঠানো হয়। যে ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের মধ্যে কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয়, সেখানে ১৯৪৯ সালের পার্লামেন্টে আইন অনুযায়ী পরপর দুটি অধিবেশনে কমন্সসভা কর্তৃক বিলটি যদি গৃহীত হয় এবং ইতিমধ্যে এক বছর সময় যদি অতিবাহিত হয় তবে লর্ডসভার অনুমোদন বাদেই বিলটি রানীর সম্মতির জন্যে পাঠানো হয় এবং রানীর সম্মতি লাভ করে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

রানীর সম্মতি

প্রতিটি বিল উভয় সভায় উপরোক্ত পর্যায়ক্রমে গৃহীত হবার পরে রানীর সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হয়। রানীর সম্মতি লাভের পর তা আর 'বিল' থাকে না 'আইন'-এ রূপান্তরিত হয়। রানীর সম্মতি দান একান্তভাবেই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার।

খ. বেসরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিল পাশ পদ্ধতি

বিলের শ্রেণীবিভাগ করে আমরা দেখিয়েছি যে বেসরকারী সদস্যরাও পার্লামেন্টে বিল উত্থাপন করতে পারে। বেসরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিল (Private Member's Bill) সরকার পক্ষের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হলে তা পাশ হবার সম্ভাবনা নেই বলা যায়। তা সত্বেও বেসরকারী সদস্যরা যে স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে সে স্বার্থের অনুকূলে বিল উত্থাপন করেন। কেউ কেউ ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা থেকে বিল উত্থাপন করেন। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে না পারলে ঐ সকল বিল খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না।

প্রতিটি অধিবেশনে দশটি শুক্রবার বে-সরকারী বিলের জন্য রাখা হয়। কিন্তু বিলের সংখ্যা বেশি বলে লটারির মাধ্যমে কে কবে বিল উত্থাপন করবে তা স্থির করা হয়। সময়াভাবে বেশিরভাগ বে-সরকারী বিল উত্থাপন করার সুযোগ পাওয়া যায় না। যা হোক, লটারির মাধ্যমে সুযোগ প্রাপ্ত সদস্য প্রশ্নোত্তরের পরে বিলটি উত্থাপন করেন এবং বিলের স্বপক্ষে দশ মিনিট বক্তৃতা করেন। তার পরে সভা বিলটির জন্য যেরূপ

সময় দিতে পারবে সে অনুযায়ী একটির পর একটি স্তর অতিক্রম করে বিলটির অগ্রগতি ঘটে। দ্বিতীয় পাঠ থেকে বে-সরকারী বিল পাশের ব্যাপারে পাবলিক বিলের মত একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সরকার যদি বিলটির প্রতি সদয় থাকে এবং বিলটি আইনে পরিণত হোক তা চান তবে বিলটি অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের ব্যবস্থা করা হয়। তবে বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক আনীত বিল পাশ হওয়া খুবই কষ্টকর। তা সত্ত্বেও সদস্যগণ বে-সরকারী বিল উত্থাপনকে একটি মূল্যবান অধিকার বলে মনে করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বেশির ভাগ বেসরকারী বিল লর্ডসভায় উত্থাপিত হয়।

গ. বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত (প্রাইভেট) বিল পাশ পদ্ধতি

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, দেশের জনগণের সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত বিল ছাড়াও আঞ্চলিক সংস্থা, স্বায়ত্তশাসন মূলক সংস্থা, সরকারী উদ্যোগ ইত্যাদি বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত প্রাইভেট বিল উত্থাপন করা যায়। অষ্টাদশ শতকে পাবলিক ও প্রাইভেট বিলের মধ্যে পার্থক্য করা হয় এবং প্রাইভেট বিল পাশের জন্য স্বতন্ত্র পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে প্রতি বৎসর পঞ্চাশটির মত প্রাইভেট বিল উত্থাপিত হয়।

প্রাইভেট বিল

প্রাইভেট বিল উত্থাপনের জন্য বিল সহ আবেদন প্রাইভেট বিল অফিসে প্রতি বছর ২৭শে নভেম্বরের মধ্যে পেশ করতে হয়। স্থানীয় সংবাদপত্রে দুবার এবং লন্ডন গেজেটে বিলটি প্রকাশ করতে হয় এবং বিলটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগকে বিলের বিষয়বস্তু জ্ঞাত করতে হয়। বিলে প্রস্তাবিত কাজের জন্য ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব প্রকাশ করতে হয় এবং কিছু অর্থ জমা রাখতে হয়। এর পরে স্পীকার ও লর্ডসভা কর্তৃক মনোনীত দুজন 'পরীক্ষক' বিলটি পরীক্ষা করেন। বিলটি নিয়মসঙ্গত ও যথাযথ বলে তাঁরা অভিমত জানালে তা পার্লামেন্টের যে কোন একটি কক্ষে উত্থাপিত হতে পারে। বিলটি সভায় উপস্থাপিত করলেই একে প্রথম পাঠ বলে ধরা হয় এবং এটা একান্তভাবেই আনুষ্ঠানিক।

উত্থাপন ও প্রথম পাঠ

বিলটির দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলটি নিয়ে আলোচনা হয় এবং কেউ বিলটির বিরোধিতা না করলে একে বিরোধিতা-হীন (unopposed) প্রাইভেট বিল কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। বিলটির বিরোধিতা হলে একে প্রাইভেট বিল কমিটিতে পাঠান হয়। এ কমিটি কমন্সসভার চারজন এবং লর্ডসভার পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এ কমিটি অনেকটা আদালতের মত। বিলের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় পক্ষের আইনজীবীরা বিতর্ক ও জেরা করেন এবং সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করেন। বিতর্ক, জেরা ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কমিটি বিলটির যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতার কথা জানিয়ে পার্লামেন্টে বক্তব্য উপস্থিত করে। কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সভা বিলটিকে গ্রহণ বা বর্জন করে। এ স্তরকে তৃতীয় পাঠ বলে। অনুমোদিত বিল লর্ডসভায় পাঠানো হয় এবং লর্ডসভায় গৃহীত হবার পরে রাজকীয় সম্মতি লাভ করে বিলটি আইনে পরিণত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রাইভেট বিল পাশ করা খুবই ব্যয়বহুল ব্যাপার।

অন্যান্য স্তর

ঘ. অর্থবিল পাশ পদ্ধতি

যে সকল পাবলিক বিল সরকারের আর্থনীতিক ব্যাপারের সাথে সংশ্লিষ্ট তাকে অর্থবিল (Money Bill) বলে। অর্থবিলকে সাধারণভাবে দু ভাগে ভাগ করা যায় : ব্যয়-মঞ্জুর সংক্রান্ত ও রাজস্ব সংক্রান্ত। আরও বিস্তারিত ভাবে বলা যায় যে, কোন বিলকে অর্থবিল বলে গণ্য করা হবে যদি বিলটি নিম্নলিখিত কোন একটি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় :

অর্থবিল কাকে বলে

১. কোন কর আরোপ, বাতিল, ছাড়, পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ করা ;

২. সরকার কর্তৃক কোন ঋণকে নিয়ন্ত্রণ বা গ্যারান্টি দান, অথবা সরকার কর্তৃক গৃহীত বা ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ্য কোন আর্থিক দায়িত্ব সম্পর্কীয় কোন আইনের সংশোধন ;

৩. সম্মিলিত রাজকোষ বা আকস্মিক ব্যয়ের ভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাতে অর্থ জমা দেয়া বা তা থেকে অর্থ তোলা ;

৪. সম্মিলিত রাজকোষ থেকে অর্থ ব্যয় করা ;

৫. সম্মিলিত রাজকোষ থেকে কোন ব্যয়কে অনুমোদনীয় ব্যয় (charged expenditure) বলে ঘোষণা বা এরূপ ঘোষিত ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে কোন কর আরোপ, বিলোপ বা ছাড়দান করলে অথবা এর কাছ থেকে কোন জরিমানা, লাইসেন্স ফি দাবি করলে তা অর্থবিল বলে গণ্য হবে না।

অর্থবিলের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, কেবলমাত্র কমন্সসভাতেই অর্থবিল উত্থাপন করা যায়। দ্বিতীয়ত ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা কোন বিল অর্থবিল কিনা তা স্পীকার নির্ধারণ করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। তৃতীয়ত, অর্থবিল পাবলিক বিল এবং রানীর আনুষ্ঠানিক সুপারিশক্রমে মন্ত্রীরাই কেবলমাত্র তা উত্থাপন করতে পারেন। তাই রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী (The Chancellor of the Exchequer) অর্থবিল কমন্সসভায় উত্থাপন করেন।

অর্থবিলের বৈশিষ্ট্য

অর্থবিল উত্থাপন ও প্রথম পাঠ

সরকারের অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাবের মধ্যে সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল বাজেট। আগেই বলা হয়েছে, শাসনবিভাগ বাজেট ও অর্থবিল রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ কাজকর্ম চালাবার জন্য পরবর্তী বৎসরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের আনুমানিক হিসাব তৈরি করে। রাজস্ব বিভাগের চ্যান্সেলার আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে ব্যয়ের হিসাব বিচার বিবেচনা করে আয় ব্যয়ের হিসাব ঠিক করেন এবং আয়-ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাব সম্বলিত বাজেট কমন্সসভায় উত্থাপন করেন। বাজেট উত্থাপনের সাথে সাথে তিনি একটি আর্থিক বিল (Finance Bill) সভায় উত্থাপন করেন। এ আর্থিক বিলই হল প্রধান অর্থবিল। সরকারের আর্থিক প্রস্তাবগুলি কার্যকর করার জন্য এ আর্থিক বিল উত্থাপন করা হয়। যে কোন অর্থবিল (Money Bill) সভায় মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত হয় এবং এর শিরোনাম পাঠের সাথে সাথে প্রথম পাঠ সমাপ্ত হয়।

অন্যান্য স্তর

পার্লামেন্টে অর্থবিল উত্থাপন ও প্রথম পাঠ সমাপ্ত হবার পর বিলটি অন্যান্য সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিলের (Public Bill) মত একই পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়। শুধুমাত্র পার্থক্য হল এই যে, অর্থবিল 'সমগ্র কক্ষ কমিটি'-তে আলোচিত হয়—অন্যান্য সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিলের মত তা স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয় না। দ্বিতীয় পার্থক্য হল, অন্যান্য বিলকে লর্ডসভা এক বছর বিলম্বিত করতে পারে, কিন্তু অর্থবিলকে লর্ডসভা মাত্র একমাস বিলম্বিত করতে পারে। কমন্সসভা কর্তৃক অনুমোদিত কোন অর্থবিল লর্ডসভার অনুমোদন লাভ না করলেও একমাস পরে রানীর সম্মতি লাভ করে তা আইনে পরিণত হয়।[১]

৪-৯. অর্থ ও পার্লামেন্ট
Money and Parliament

অর্থ ছাড়া সরকার কোন কাজ করতে পারে না। সরকারের দেহে রক্ত সঞ্চালন করে অর্থ। গাড়ি যেমন জ্বালানী (fuel) ছাড়া চলতে পারে না, কোন সরকারও তেমনি অর্থ বাদে পরিচালিত হতে পারে না। সরকার পরিচালনায় অর্থের প্রয়োজন ও গুরুত্ব সব চেয়ে বেশি। আর এ অর্থের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণও সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধান বিশেষজ্ঞের ভাষায় বলা যায় যে. আর্থনীতিক পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারাই কমন্সসভা সরকারের উপর নিজের চরম কর্তৃত্ব বজায় রাখে (It is through its financial procedure that the Commons exercises its ultimate authority over the Government)।

অর্থ সম্পর্কে পার্লামেন্টের দায়িত্বকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

১ কোন্ কোন্ সূত্র থেকে জাতীয় রাজস্ব সংগৃহীত হবে তা স্থির করা ; ২. করের পুনর্বিন্যাস করে কিভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা হবে তা নির্ধারণ করা ; ৩. কোন্ কোন্ সূত্র থেকে কত ঋণ নেয়া হবে এবং কত ঋণ শোধ করা হবে তা নির্ণয় করা। অর্থ দপ্তর এ তিনটি বিষয়ের হিসাব সম্বলিত যে প্রস্তাবটি পার্লামেন্টে উত্থাপন করে তাকে 'বাজেট' বলে। বাজেটের বাইরেও আর্থিক ব্যাপারে পার্লামেন্টের আরও কয়েকটি দায়িত্ব আছে ; ৪. রাজস্ব কিভাবে ব্যয় হচ্ছে তা পর্যালোচনা করা ; ৫. সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা।

অর্থ সম্পর্কে পার্লামেন্টের দায়িত্ব

সরকার আগামী বছরের জন্য আয় ও ব্যয়ের যে কর্মসূচী তৈরী করেন সে প্রস্তাবকে 'বাজেট' বলা হয়। বাজেট হল শাসন বিভাগের পক্ষ থেকে আইনসভার কাছে এক ধরনের অনুমতি প্রার্থনা। প্রতি বছর ৩১শে মার্চের মধ্যে বাজেট পার্লামেন্টে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ ১লা এপ্রিল থেকে সরকারের আর্থিক বৎসর শুরু হয়। বাজেট প্রস্তুতের কাজ শুরু হয় অনেকদিন আগে থেকে, বাজেট প্রস্তুতির কাজ শুরু হয় আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস থেকে। ঐ সময়ে বিভিন্ন দপ্তরকে আগামী বছরের জন্য

১. অর্থবিল পাশ সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণার জন্য 'অর্থ ও পার্লামেন্ট' আলোচনা দ্রষ্টব্য

প্রয়োজনীয় ব্যয়ের প্রস্তাব রচনার জন্য অর্থদপ্তর নির্দেশ দেয়। এসব আনুমানিক ব্যয়ের ভিত্তিতে অর্থদপ্তর আগামী বছরের জন্য ব্যয় প্রস্তাব রচনা করে। সে সাথে ব্যয়ের জন্য এ রাজস্ব কোথা থেকে আসবে তাও অর্থ দপ্তরকে আগেই স্থির করতে হয়। সুতরাং অর্থমন্ত্রী (Chancellor of the Exchequer) পার্লামেন্টে যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেন তাতে নিম্নলিখিত তিনটি অংশ থাকে ; ১. বিগত বছরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা করে সভাকে জানান যে আনুমানিক হিসাব (Estimate) থেকে প্রকৃত আয়-ব্যয় কত কম বা বেশি হয়েছে এবং কেন এরূপ হয়েছে ; ২. আগামী বছরের জন্য আয় ও ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব উত্থাপন করা এবং এ প্রসঙ্গে দেশের পূর্ণ কর্মসংস্থান, দ্রব্যমূল্য এবং বিদেশী মুদ্রার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা করা ; ৩. আগামী বছরের জন্য কর ব্যবস্থার রূপরেখা এবং এর স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থিত করা। সভায় উত্থাপিত বাজেট নিয়ে সদস্যগণ আলোচনা ও বিতর্ক করেন।

বাজেট

৩১শে মার্চের মধ্যে বাজেট আলোচনা সমাপ্ত হয় না, অথচ ১লা এপ্রিল থেকে নতুন আর্থিক বছর শুরু হয় এবং সরকারের সচল রাখার জন্য ব্যয় অপরিহার্য। এজন্য পার্লামেন্ট ৩১শে মার্চের মধ্যে আনুমানিক ব্যয়ের কিয়দংশ খরচ করার অনুমোদন দিয়ে 'ভোটস্ অন একাউন্ট' (Votes on Account) পাশ করে এবং এ মর্মে যে 'বিল' উত্থাপিত হয় তাকে 'সঞ্চিত তহবিল বিল' (Consolidated Fund Bill) বলে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সঞ্চিত তহবিল দু প্রকারের : প্রথমত যে সব ব্যয় পার্লামেন্টের অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল নয় তাকে 'Consolidated Fund Services' বলে। যেমন, স্পীকার, বিরোধী পক্ষের নেতা, হাইকোর্টের বিচারক ইত্যাদির মাইনে এ শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয়ত, যে ব্যয়গুলি প্রতি বছর পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন তাকে 'Supply Services' বলে। এই শ্রেণীর অন্তর্গত বিষয়ের জন্যই ভোটস অন্ একাউন্টস্ প্রয়োজন।

সঞ্চিত তহবিল

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিগত বছরের ব্যয়ের যে আনুমানিক হিসাব বিগত বছরের ব্যয় মঞ্জুরী আইনে অনুমোদিত হয়েছিল তা থেকে যদি ব্যয় অধিকতর হয় বা হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে মার্চ মাসে সঞ্চিত তহবিল বিল পাশ করার সময়ে বিগত বছরের অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ (Supplementary Estimates) মঞ্জুর করা হয়।

বাজেট আলোচনা শেষ হবার পরে এবং সমগ্র কক্ষ-কমিটিতে অনুমোদন লাভের পরে বাজেট প্রস্তাবকে কার্যকর করার জন্য দুটি বিল আগস্ট মাসে কমন্সসভায় পেশ করা হয়—১. ব্যয় মঞ্জুরী বিল (*Appropriation Bill*) এবং ২. অর্থ সংগ্রহ বিল (*Finance Bill*)। প্রথম বিলটি বাজেটের ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাবকে অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হয়। এক বছরের আনুমানিক ব্যয়ের যে অংশ ভোটস্ অন একাউন্টে পাশ করা হয়েছে তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ব্যয়কে ব্যয় মঞ্জুরী বিলে অনুমোদন করা হয়। অর্থ সংগ্রহ বিলের আলোচনার সময়ে সদস্যগণ সরকারের আর্থিক ও অন্যান্য নীতির ব্যাপক সমালোচনার

ব্যয় মঞ্জুরী ও অর্থ সংগ্রহ বিল

সুযোগ গ্রহণ করেন। কমন্সসভায় গৃহীত হবার পরে উপরোক্ত বিল দুটিকে লর্ড-সভায় পাঠান হয়। লর্ডসভার অনুমোদন লাভ করার পরে তা আইন-এ পরিণত হয়। লর্ডসভা অনুমোদন না করলে একমাস অপেক্ষা করতে হয় এবং ঐ সময়ের পরে লর্ড-সভার বিনা অনুমোদনেই বিলটি আইনে পরিণত হয়।

অর্থের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ

বাজেট ও অর্থবিলের আলোচনা ও সমালোচনার দ্বারা পার্লামেন্ট অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণের যে প্রচেষ্টা চালায় তা কতটা কার্যকর হয় এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। অর্থ সংগ্রহ বিলের উপর উত্তপ্ত এবং ব্যাপক আলোচনা হয়, কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হয় না (Taxation proposals are put······in a Finance Bill. This the House debates intently and intensively—but to little avail)।[১] ফলে, এতসব উত্তপ্ত ও জ্বালাময়ী বক্তৃতার পরেও দেখা যায় যে, অর্থমন্ত্রী যে ব্যয়-বরাদ্দ ও অর্থসংগ্রহ প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন হুবহু তাই পার্লামেন্ট অনুমোদন করেছে।[২] সুতরাং বাজেট বা অর্থবিলের উপর তত্ত্বমূলক বক্তৃতা দিয়ে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

আলোচনা যথেষ্ট নয়

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে আর কিভাবে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? এ নিয়ন্ত্রণ আসতে পারে দুটি উপায়ে। প্রথমত, সরকারের আয় ও ব্যয় সঠিক নীতি ও পদ্ধতি মেনে চলছে কিনা সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করা। অর্থাৎ সরকারের আর্থিক লেনদেন কেবল পদ্ধতিগত দিক হতে সঠিক হলেই চলবে না তা বিজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা ও ব্যয়-সংকোচের (wisdom, faithfulness and economy) দিক থেকেও খাঁটি কিনা তা অনুসন্ধান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পার্লামেন্টের সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি (Public Accounts Committee) ও ব্যয় কমিটির (Expenditure Committee) ভূমিকার কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সরকার ব্যয় সংক্রান্ত নিয়মাবলী মেনে চলছে কিনা, অনুমোদিত ব্যয়ের পরিমাণের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করছে কিনা এবং দ্রব্য-সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় এবং কন্ট্রাক্ট, পারমিট, লাইসেন্স ইত্যাদি সরকারের স্বার্থে এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে করা হয়েছে কিনা তা বিচার করে দেখা। এজন্য সরকারের আয়-ব্যয়-এর হিসাব রক্ষা ও পরীক্ষা সরকারের প্রভাবমুক্ত অথচ পার্লামেন্টের অধীনস্থ কোন কর্মচারীর দ্বারা সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। ব্রিটেনে এই দায়িত্ব পালন করেন প্রধান নিয়ন্ত্রক ও হিসাব পরীক্ষক (Comptroller and Auditor General)। নীচে আমরা উপরোক্ত কমিটি দুটি এবং প্রধান নিয়ন্ত্রক ও হিসাব পরীক্ষক সম্পর্কে আলোচনা করছি।

নিয়ন্ত্রণের আরও দুটি উপায়

১. S. E. Finer—Comparative Government. P. 179.

২. " ·····a Government decides the level of its expenditure and presents them to the House in the certain knowledge that at the end of the session it will receive everything it has asked for, to the last penny or every item it has specified."

ক. সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি (The Public Accounts Committee)

১৮৬১ সালে গ্লাডস্টোন সর্বপ্রথম সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি গঠন করেন। পনের জন পার্লামেণ্ট সদস্য নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। কমন্সসভায় দলীয় শক্তি অনুপাতে বিভিন্ন দলের সদস্যদের ঐ কমিটিতে রাখা হয়। বিরোধী দলের একজন সদস্যকে ঐ কমিটির সভাপতি করা হয়, যদিও কমিটিতে সরকারী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখা হয়। এ কমিটি বিশেষজ্ঞ কমিটি হিসাবে বিবেচিত হয়।

গঠন

সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি লক্ষ্য রাখে যাতে বরাদ্দ অর্থের বেশি অর্থ ব্যয় না হয় এবং যে কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সে কাজের জন্য তা ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করে। দ্বিতীয়ত, প্রধান নিয়ন্ত্রক ও হিসাব পরীক্ষকের প্রতিবেদন এত বিশাল এবং এত খুঁটিনাটিতে ভরা থাকে যে সাধারণ সদস্যদের পক্ষে তা বিচার করা সম্ভব হয় না। এ কমিটি উক্ত প্রতিবেদনকে বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনের মূল বক্তব্যকে পার্লামেণ্টের কাছে উপস্থিত করে। তৃতীয়ত, এ কমিটি জাতীয় হিসাব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে। পার্লামেণ্টের ঐ কমিটি এ সকল কাজ করে অর্থের উপর পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণকে বৃদ্ধির চেষ্টা করে।

কমিটির কাজ

খ. ব্যয়-পরীক্ষা কমিটি (The Expenditure Committee)

আনুমানিক ব্যয়-বরাদ্দকে পরীক্ষা করার জন্য ব্রিটেনে ১৯১২ সাল থেকে এস্টিমেটস্ কমিটি (Estimates Committee) নামে পার্লামেণ্টের একটি সিলেক্ট কমিটি কাজ করে আসছে। ১৯৭১ সালে এ কমিটির নাম পরিবর্তন করা হয়। বর্তমানে এর নাম ব্যয়-পরীক্ষা কমিটি। ব্যয়-পরীক্ষা কমিটি (Expenditure Committee) পার্লামেণ্টের ৪৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এবং এটি ৮টি উপসমিতিতে বিভক্ত (যেমন, শিল্প, পরিবহন, কৃষি, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি)।

গঠন

সরকারের সকল ব্যয়কে পরীক্ষা করা এবং ব্যয় সংক্রান্ত নীতিকে পর্যালোচনা করার দায়িত্ব এ কমিটির উপর ন্যস্ত। অর্থাৎ পার্লামেণ্টে যে সকল ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদিত হয় ঐগুলির প্রয়োজনীয়তা, ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা উচিত কিনা, ব্যয়ের উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা, ব্যয়গুলি ঘোষিত লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করবে কিনা—এ সকল বিষয়ে খুঁটিনাটি অনুসন্ধানের দায়িত্ব পালন করে ঐ কমিটি। এ সকল অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সুপারিশ সহ কমিটি পার্লামেণ্টে প্রতিবেদন পেশ করে।

গ. প্রধান নিয়ন্ত্রক ও হিসাব পরীক্ষক (The Comptroller and Auditor General)

গ্লাডস্টোন সর্বপ্রথম ১৮৮৬ সালে প্রধান নিয়ন্ত্রক ও হিসাব পরীক্ষকের পদটি সৃষ্টি করেন। প্রধান নিয়ন্ত্রক পার্লামেণ্টের একজন কর্মচারী এবং পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের প্রস্তাব অনুযায়ী তাকে পদচ্যুত করা যায়।

প্রধান নিয়ন্ত্রক ও হিসাব পরীক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হল ব্যয়-মঞ্জুরী আইনের বরাদ্দ অনুযায়ী সরকারের চাহিদা অনুসারে সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণ করা এবং দ্বিতীয়ত, পার্লামেণ্ট যে উদ্দেশ্যে অর্থ মঞ্জুর করেছে সে উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা নিশ্চিত হবার জন্য বিভিন্ন বিভাগের হিসাব পরীক্ষা করে দেখা। হিসাব পরীক্ষা করা এবং নিয়ম-বহির্ভূত ব্যয় সম্পর্কে পার্লামেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তাঁর কর্তব্য। প্রধান নিয়ন্ত্রক ও হিসাব পরীক্ষক পার্লামেণ্টের নিকট তাঁর প্রতিবেদন উপস্থিত করেন।

কার্যাবলী

আমরা প্রথমেই বলেছি যে শুধু অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে নয়, পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে সঙ্কটাপন্ন। ক্ষমতাসীন দলের পার্লামেণ্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার জন্যে দলীয় ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় পার্লামেণ্ট শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারে না। সরকারের বিরুদ্ধে হিসাব পরীক্ষা কমিটি, ব্যয়কমিটি বা প্রধান নিয়ন্ত্রক ও হিসাব পরীক্ষক যদি শাসন বিভাগের বিরুদ্ধে নিয়ম বহির্ভূত ব্যয়ের অভিযোগ প্রতিবেদনে উপস্থিত করেন, তবে পার্লামেণ্টে এ নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা চলতে পারে—কিন্তু শাসন বিভাগের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনে পার্লামেণ্ট অপারগ। কারণ পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ঐ প্রচেষ্টায় সামিল হবে না। এ সকল কমিটির কার্যকলাপ, প্রতিবেদন এবং পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে আলোচনা তাই অনেকটা গতানুগতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু এর একটি অস্তিবাচক দিক আছে, তা হল এই যে ঐ সকল আলোচনা সংবাদপত্র, রেডিও প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচারিত হয় এবং জনমনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে পার্লামেণ্টের কার্যকারিতা সম্পর্কে হতাশা থেকে এস ই. ফাইনার মন্তব্য করেছেন যে, কমন্সসভা কর ও ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করে এরূপ ধারণা আছে, কিন্তু বাস্তবে কমন্সসভা এর কোনটাই করে না (There is a fiction that the House 'controls' taxation and expenditure. In fact it does neither)।

৪-১০ দুই কক্ষের মধ্যে সাংবিধানিক সম্পর্ক

Constitutional Relation Between the two Houses

দ্বি-কক্ষ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের দ্বিতীয় কক্ষ লর্ডসভা এক সময়ে যথেষ্ট ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। কিন্তু বর্তমানে লর্ডসভার গৌরব ও ঐতিহ্য বহুল পরিমাণে লুপ্ত হয়ে প্রথম কক্ষ কমন্সসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লর্ডসভা ও কমন্স সভার কার্যাবলী বিশ্লেষণের দ্বারা এদের পারস্পরিক সাংবিধানিক সম্পর্ক আলোচনা করা হল।

১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন গৃহীত হবার আগে পর্যন্ত লর্ডসভা ও কমন্স-সভা প্রায় সমপরিমাণ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভোগ করত। এর ফলে কমন্সসভা কর্তৃক গৃহীত বিলকে লর্ডসভা নাকচ করে দিতে পারত এবং বাস্তবে ১৯১১ সালের আগে লর্ডসভা বহুবার কমন্সসভা কর্তৃক গৃহীত বিলকে নাকচ করে। কিন্তু ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট আইন লর্ডসভার আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা হ্রাস করে। আমরা আগেই বলেছি, এ আইনে বিধিবদ্ধ করা হয় যে, অর্থ সংক্রান্ত বিল কমন্সসভা কর্তৃক গৃহীত হবার এক মাসের

১৯১১ সালে লর্ড-সভার ক্ষমতা হ্রাস

মধ্যে তা লর্ডসভায় গৃহীত না হলে ঐ বিল লর্ডসভার অনুমোদন বাদেই রাজকীয় সম্মতি লাভ করে আইনে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত, অর্থবিল ব্যতীত অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে স্থির করা হয় যে এরূপ কোনও বিল যদি কমন্সসভা কর্তৃক পরপর তিনটি অধিবেশনে গৃহীত হয় এবং প্রথম অধিবেশনে বিলটির দ্বিতীয় পাঠ এবং তৃতীয় অধিবেশনে বিলটির তৃতীয় পাঠের মধ্যে যদি দু বছর সময় অতিবাহিত হয়, তাহলে উক্ত বিল লর্ডসভার অনুমোদন বাদেই রাজকীয় সম্মতি লাভ করে আইনে পরিণত হবে। কোন বিল অর্থবিল কিনা তা স্থির করার দায়িত্ব কমন্সসভার স্পীকারের উপর অর্পণ করা হয়।

১৯৪৯ সালে ক্ষমতা আরও হ্রাস

যদিও ১৯১১ সালের আইনে লর্ডসভার ক্ষমতাকে কমানো হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন বিলে লর্ডসভার অসম্মতি থাকলে দ্রুত সে বিল পাশ করার অসুবিধা থেকেই যায়। ফলে ১৯৪৯ সালে লর্ডসভার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এর ক্ষমতা আরও কমিয়ে আর একটি পার্লামেণ্ট আইন পাশ করা হয়। ঐ আইনে বলা হয় যে, অর্থবিল বাদে অন্য কোন বিল যদি লর্ডসভায় গৃহীত না হয়, অথচ কমন্সসভার পর পর দুটি অধিবেশনে তা গৃহীত হয় এবং কমন্সসভায় ঐ বিলের প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় পাঠ এবং দ্বিতীয় অধিবেশনের তৃতীয় পাঠের মধ্যে এক বছর সময় অতিক্রান্ত হয় তবে লর্ডসভার দ্বারা অনুমোদিত না হলেও বিলটি রাজকীয় সম্মতি লাভ করে আইনে পরিণত হবে।

হারবার্ট মরিসনের বক্তব্য

হারবার্ট মরিসন ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রী হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে, ১৯৩১ সাল পর্যন্ত লর্ডসভা রক্ষণশীল সরকার কর্তৃক উত্থাপিত বিলগুলির প্রতি সহযোগিতার মনোভাব দেখিয়েছেন, কিন্তু শ্রমিক বা উদারনৈতিক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার সময়ে লর্ডসভার নিকট থেকে ঐরূপ সহযোগিতার মনোভাব পাওয়া যায়নি। ফলে লর্ডসভার ক্ষমতা হ্রাস অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়।' ১৯৪৫-৫১ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে শ্রমিক দল ক্ষমতাসীন থাকে এবং ঐ সময়ে লর্ডসভা শ্রমিক সরকারের দ্বারা উত্থাপিত বিলগুলির বিরোধিতা অনেকাংশে হ্রাস করে। ঐ সময়ে লর্ডসভা কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনীগুলি কমন্সসভা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হবার পরে তা নিয়ে লর্ডসভা আর পীড়াপীড়ি করত না। তবে ঐ সময়ে মৃত্যুদণ্ড রদ করে কমন্সসভা যে বিল পাশ করে লর্ডসভা তা কিছুতেই অনুমোদন করতে স্বীকৃত হয়নি। লোহা ও ইস্পাত বিলের সম্বন্ধেও লর্ডসভার অনুমোদন লাভের জন্য কঠিন প্রচেষ্টা চালাতে হয়।

কোন বিল নিয়ে কমন্সসভা ও লর্ডসভার মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিলে ঐ মত পার্থক্য দূর করার জন্য কতকগুলি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। কমন্সসভা কর্তৃক গৃহীত কোন বিলে যদি লর্ডসভা কোন সংশোধনী আনে যা কমন্সসভা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয় তা হলেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হবে, তবে এরূপ ক্ষেত্রে কমন্সসভা কি কারণে সংশোধনী গ্রহণযোগ্য নয় তা লর্ডসভাকে জানায়। যদি লর্ডসভা নিজের সংশোধনী তুলে নিয়ে বিলটি অনুমোদন করে তবে সহজেই সমাধান হয়। কিন্তু লর্ডসভা যদি

নিজের সংশোধনীতে অটল থাকে, তবে লর্ডসভা তা কমন্সসভাকে জানিয়ে দেয়। কমন্সসভা আবার সংশোধনীটি বিচার-বিবেচনা করে তা গ্রহণ করে বা গ্রহণের অক্ষমতা লর্ডসভাকে জানিয়ে দেয় অথবা কোন বিকল্প সংশোধনী উত্থাপন করে। লর্ডসভা সংশোধনীটি গ্রহণ করলে সমস্যা মিটে যায়। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবেচনা করে লর্ডসভা যদি নিজের সংশোধনীতে অটল থাকে বা বিকল্প সংশোধনী গ্রহণ করতে স্বীকৃত না হয় তবে বিলটি পরিত্যক্ত বলে ধরে নেয়া হবে এবং কমন্সসভাকে ঐ বিল পাশ করাবার জন্য এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। বাস্তবে অবশ্য দেখা যায় যে, দু কক্ষ যাতে মতৈক্যে পৌঁছতে পারে তার জন্য নেপথ্যে আলাপ আলোচনা চলে।[১] জনপ্রতিনিধির দ্বারা (কমন্সসভা দ্বারা) অনুমোদিত বিল লর্ডসভা বাতিল করেছে এরূপ ঘটনা জনগণ খুব ভাল ভাবে গ্রহণ করে না বলে এবং ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য খুব বেশি না থাকার জন্য শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ বিলই উভয় কক্ষের সম্মতি লাভে সমর্থ হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ১৯৪৫ থেকে ৫১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর ব্রিটেনে শ্রমিক দলের সরকার ছিল। কিন্তু ঐ সময়ে শ্রমিক দলের সরকার উত্থাপিত অসংখ্য বিলের মধ্যে মাত্র একটিকে রক্ষণশীল লর্ডসভা শেষ পর্যন্ত বাধা দিয়েছিল।

উভয় পক্ষের মধ্যে মত পার্থক্য দূর করার পদ্ধতি

৪·১১ শাসনবিভাগের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ
Parliamentary Control over the Executives

ব্রিটেনের সাংবিধানিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মধ্যযুগ থেকেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সাথে শাসনবিভাগের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। প্রথমদিকে পার্লামেন্টের সাথে রাজশক্তির এবং পরবর্তীকালে পার্লামেন্টের সাথে ক্যাবিনেটের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। পার্লামেন্ট এক সময়ে দাবী করে যে, পার্লামেন্ট যাদের প্রতিনিধিত্ব করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শাসনবিভগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত থাকা প্রয়োজন। পার্লামেন্ট প্রথম দিকে সামন্ত প্রভুদের স্বার্থ এবং পরে উদীয়মান বুর্জোয়া স্বার্থের প্রতিনিধি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রতিনিধিত্বের নামে পার্লামেন্ট সামন্তযুগে ভূস্বামীদের স্বার্থ এবং পরবর্তী কালে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়াসী হয়।[২] গৌরবজনক বিপ্লবের পর থেকে পার্লামেন্টের প্রাধান্য ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমান শতকের প্রথম পর্যন্ত ঐ ধারা বজায় থাকে। ঐ সময়ে পার্লামেন্ট কর্তৃক শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণের কতকগুলি পদ্ধতি গড়ে ওঠে।

---

১. "But it is more likely that unofficial conversations will take place with a view to a compromise being agreed."—Government and Parliament, Herbert Morrison, P. 191.

২. 'It (Parliament) has always claimed to be acting in the interests of those whom it represents : the feudal magnets, then the bourgeoisie, and latterly an expanding electorate.'—Comparative Government, J. H. Price. P. 99:

১. **নীতি নির্ধারণ ঃ** সরকারের সব মৌল নীতিগুলি সাধারণত পার্লামেন্ট নির্ধারণ করে। পার্লামেন্ট বিস্তারিতভাবে নীতি নির্ধারণ করে না, নীতি সংক্রান্ত মূলসূত্র ও ধারাকে স্থির করে। শাসনবিভাগ ঐ মূলসূত্র ও ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে সরকারের নীতিকে রূপদান করে।

২. **ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর ঃ** সকল ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরের ক্ষমতা যে পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত তা আমরা আগেই বলেছি। পার্লামেন্ট দ্বারা অনুমোদিত না হলে শাসনবিভাগ কোন কর আরোপ করতে পারে না এবং অর্থ ব্যয় করতে পারে না। সরকারী তহবিল নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের একটি অমোঘ অস্ত্র। কিন্তু দলীয় ব্যবস্থায় এ অমোঘ অস্ত্রটি অকেজো হয়ে গিয়েছে। কারণ শাসকদলের পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে বলে শেষ পর্যন্ত শাসনবিভাগের চাহিদা অনুযায়ী পার্লামেন্ট ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করে।

৩. **হিসাব পরীক্ষা ও রিপোর্ট ঃ** ব্যয়-বরাদ্দ যাতে যথাযথভাবে খরচ করা হয় তা দেখা এবং হিসাব পরীক্ষার জন্য কমন্সসভার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আছেন। তাঁকে নিয়ন্ত্রক ও হিসাব পরীক্ষক (The Comptroller and Auditor General) বলা হয়। ১৮৬৬ সালে গ্লাডস্টোন ব্রিটেনে এ পদটি সৃষ্টি করেন। পার্লামেন্টের অনুমোদন অনুযায়ী যাতে শাসনবিভাগ খরচ বরাদ্দ করে তা দেখা এবং যে উদ্দেশ্যে খরচ বরাদ্দ করা হয়েছে তা সাধিত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা নিয়ন্ত্রক ও হিসাব পরীক্ষকের কাজ। এ ব্যাপারে তিনি পার্লামেন্টের কাছে রিপোর্ট দাখিল করেন।

নিয়ন্ত্রক ও হিসাব পরীক্ষকের রিপোর্ট বিচার-বিবেচনার জন্য পার্লামেন্ট পনের জন সংসদ সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। এর নাম সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি (The Public Accounts Committee)। সরকারের প্রতিটি দপ্তর ঐ কমিটির মাধ্যমে নিজ নিজ ব্যয়ের জন্য পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকে। সরকারের দপ্তরগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এদের বল্গাহীন ক্ষমতার লোভ ও নিয়ম না মেনে চলার স্পৃহা অবদমিত রাখতে হিসাব পরীক্ষা কমিটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ ক[illegible]।

এ ছাড়াও পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণকে আরও কার্যকর করার জন্য সরকারের দপ্তরগুলির ব্যয় বরাদ্দের খুঁটিনাটি অনুসন্ধানের জন্য পার্লামেন্ট ৪৯ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটিকে পূর্বে এস্টিমেট কমিটি বলা হত। ১৯৭১ সাল থেকে এ কমিটির নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'ব্যয় পরীক্ষা কমিটি' (Expenditure Committee)।

৪. **প্রশ্ন উত্থাপন ঃ** পার্লামেন্টের অধিবেশনকালে সপ্তাহে চারদিন প্রশ্নোত্তরের জন্য কিছুক্ষণ সময় নির্দিষ্ট থাকে। পার্লামেন্টের সদস্যগণ বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা ঐ সকল প্রশ্নের জবাব দেন। এরূপ প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে এবং এ সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রশ্ন (supplementary questi[illegible]) করে পার্লামেন্টের সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়কে পার্লামেন্ট তুলে ধরার সুযোগ পান এবং এর দ্বারা সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করেন। মুনরো মনে করেন যে, শাসনবিভাগ ও বিশেষ করে আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন একটি কার্যকর ব্যবস্থা।

৫. **বিতর্ক ও সমালোচনা :** উপরোক্ত উপায়গুলি বাদেও পার্লামেন্টের সদস্যগণ বিতর্ক ও সমালোচনায় অংশ গ্রহণ করে শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণে প্রয়াসী হয়। যেমন, রানী প্রতি বছর পার্লামেন্টে যে ভাষণ দেন তার পরিপ্রেক্ষিতে সদস্যগণ সরকারের কাজকর্ম সমালোচনার পর্যাপ্ত সুযোগ পান। প্রতিবছর পার্লামেন্টে বাজেট উত্থাপন করা হয় এবং পার্লামেন্টের সদস্যগণ সরকারের কর প্রস্তাব ও ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনার ব্যাপক সুযোগ পান। পার্লামেন্টে যে সকল বিল উত্থাপন করা হয় তা আলোচনাকালেও সদস্যরা সরকারের নীতি ও বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপ আলোচনার পর্যাপ্ত সুযোগ গ্রহণ করে।

এ ছাড়াও কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পার্লামেন্টে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দাবী করে বা দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রস্তাব উত্থাপন করে শাসনবিভাগের কাজকর্ম আলোচনা করা যায়।

৬. **কমিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ :** পার্লামেন্টের অধীনে সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলী পরীক্ষার জন্য একাধিক কমিটি থাকে। এ কমিটিগুলি এ সম্পর্কে পার্লামেন্টে প্রতিবেদন উপস্থিত করে এবং সদস্যগণ সরকারের ঐ সকল কাজকর্ম আলোচনা করতে পারে। যেমন সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি (Public Accounts Committee), ব্যয় পরীক্ষা কমিটি (The Expenditure Committee), জাতীয়করণ শিল্প সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Nationalised Industries) ইত্যাদি। ঐ সকল কমিটির প্রতিবেদনকে ভিত্তি করে পার্লামেন্টের সদস্যগণ এ সম্পর্কে আলোচনা এবং শাসনবিভাগের কার্যের মূল্যায়ন করতে পারে।

৭. **পার্লামেন্টারী কমিশনার :** ১৯৬৬ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট শাসন বিভাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের জন্য নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্টারী কমিশনারের (Parliamentary Commissioner) অনুকরণে একটি পদ সৃষ্টি করে। ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি দেশে এই পদকে 'অম্বডসম্যান' বলা হয়। ব্রিটেনে রানী পার্লামেন্টারী কমিশনারকে নিযুক্ত করেন এবং পার্লামেন্টের দুই কক্ষের সম্মতি বাদে তাঁকে পদচ্যুত করা যায় না। অর্থাৎ তিনি যাতে শাসনবিভাগের প্রভাবমুক্ত থেকে কাজ করতে পারেন তার জন্য তাঁর নিয়োগ ও পদচ্যুতির ব্যাপারে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জনগণের অভিযোগের ভিত্তিতে পার্লামেন্টের সদস্যগণ শাসনবিভাগের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ তুলে ধরেন সেগুলি তিনি অনুসন্ধান করেন এবং পার্লামেন্টারী কমিশনারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেক্ট কমিটিতে তিনি প্রতিবেদন উপস্থিত করেন। ঐ কমিটি প্রয়োজন মনে করলে তা পার্লামেন্টে উপস্থিত করতে পারে এবং পার্লামেন্ট এ বিষয়ে বিতর্ক করতে পারে। দেখা গিয়েছে যে, পার্লামেন্টারী কমিশনার যে সকল অভিযোগের তদন্ত করেছেন তার মধ্যে শতকরা পনেরটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

ব্রিটেনে পার্লামেন্টারী কমিশনার পদটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অনেকে মনে করেন যে, এ পদটি শাসনবিভাগের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে তাকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক। তাই কোন কোন মহল থেকে এর ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা

হয়েছে। অন্যদিকে অনেকে এ পদটিকে 'কাগজে বাঘ' (Paper Tiger) মনে করেন। লর্ড বাটলার মনে করেন যে, সরকার কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহারকে জনগণের সমালোচনার বাইরে রাখার জন্য এটি নিছক একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

বর্তমান শতকে দলীয় ব্যবস্থা বিকশিত ও সংহত হবার সাথে সাথে শাসনবিভাগের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফলশ্রুতি হিসাবে পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। তাই মনে করা হয় যে, পরিষদীয় ব্যবস্থায় তত্ত্বগতভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করে শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

পার্লামেন্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের মূল্যায়ন

কিন্তু বাস্তবে ঐ নিয়ন্ত্রণের মূল্য কতটা তা বোঝাবার জন্য মুনরোকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেট কর্তৃক গৃহীত বাজেট পার্লামেন্টে গৃহীত হবার পরে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। পার্লামেন্ট প্রশ্ন উত্থাপন করে, আলোচনা করে, সমালোচনা করে, কিন্তু দলীয় প্রথা থাকার জন্য শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে ক্যাবিনেট যা চায় পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটে তাই অনুমোদিত হয়। এস. ই. ফাইনারের ভাষায় বলা যায়—"The Home debates intently and intensively—but to little avail."

৮-১২ অর্পিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা
Delegated Legislation

ব্রিটেনে পার্লামেন্টই আইন প্রণয়নের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। কিন্তু রাষ্ট্রের কাজকর্ম এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে পার্লামেন্টের পক্ষে সকল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আইন রচনা করার মত সময় হাতে থাকে না। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে এমন জটিল ও প্রযুক্তি (technical) জ্ঞান আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন হয় যা পার্লামেন্টের সদস্যদের থাকার কথা নয়। এ সকল কারণে পার্লামেন্ট অনেক আইনের কাঠামো ও উদ্দেশ্য অনুমোদন করে বিস্তারিত বিধান বিধিবন্ধ করার দায়িত্ব শাসন কর্তৃপক্ষ, আঞ্চলিক সংস্থা ইত্যাদির হাতে অর্পণ করে। একে অর্পিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বলে। এরূপভাবে প্রণীত বিধানকে অর্পিত আইন প্রণয়ন (delegated legislation) বা অধস্তন আইন প্রণয়ন (subordinate legislation) বলে। ক্ষমতা অর্পণের প্রযোজনীয়তা ও গুরুত্ব বুঝা যায় যখন আমরা দেখি যে প্রতি বছর পার্লামেন্ট পঞ্চাশ-ষাটটি আইন প্রণয়ন করে, কিন্তু ঐ সময়ে অর্পিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দ্বারা দু হাজারের বেশি বিধান প্রণয়ন করা হয়।[১]

কাকে বলে?

অর্পিত আইন প্রণয়নের শ্রেণীবিভাগ

অর্পিত আইন প্রণয়নকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এগুলি নীচে আলোচনা করা হল ঃ

১. **সপারিষদ রাজাজ্ঞা** (Order-in-Council)

প্রিভি কাউন্সিল যে সপারিষদ রাজাজ্ঞা জারী করে তা অর্পিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অন্তর্গত। সপারিষদ রাজাজ্ঞা দু প্রকারের ঃ বিশেষাধিকার ঘোষণা এবং

১. যেমন, ১৯৪৫ সালে পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের সংখ্যা ৬৬টি অন্যদিকে অর্পিত ক্ষমতার দ্বারা বিধান রচনা করা হয় ২,২৮৭টি।

আইন জারী (Proclamations) করা। উভয়েরই উৎস হল রানীর বিশেষাধিকার সংক্রান্ত ক্ষমতা, তাই আইনসভার অনুমোদনের উপর এগুলি নির্ভরশীল নয়। তবে বাস্তবে সপরিষদ রাজাজ্ঞা মন্ত্রিদের পরামর্শ অনুযায়ী জারী করা হয়, তাই শাসনবিভাগের বা মন্ত্রিদের নির্দেশের সাথে এদের বিশেষ কোন মৌলিক পার্থক্য নেই।

২. **বিধান, আজ্ঞাদেশ এবং প্রবিধান** (Rules, Orders and Regulations)

সপরিষদ রাজাজ্ঞার সাহায্য না নিয়ে শাসনবিভাগ কোন একটি আইনের (Statute) কর্তৃত্বের অধীনে বিধান, আজ্ঞাদেশ ও প্রবিধান রচনা করতে পারে। পার্লামেন্টের পক্ষে আইনের খুঁটিনাটি বিচার করার মত সময় এবং এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও (specialized) যোগ্যতা নেই। তাই পার্লামেন্ট আইনের কাঠামো ও রূপরেখা স্থির করে খুঁটিনাটি বিষয় রচনার দায়িত্ব শাসনবিভাগের উপর ন্যস্ত করে। পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের কাঠামো পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে শাসনবিভাগ। উক্ত আইনের অধীনে বিধান বিধিবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করতে হয় শাসনবিভাগের অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট বিভাগকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মন্ত্রীদের নামে এ ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলেও বাস্তবে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

৩. **সাময়িক ও বিশেষ পদ্ধতি নির্দেশ** (Provisional and Special Procedure Orders)

আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হলে এর জন্য প্রাইভেট বিল পাশ করতে হয়। কিন্তু প্রাইভেট বিল পাশ করা খুবই ব্যয়বহুল এবং সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। সেজন্য ১৮৭০ সাল থেকে 'সাময়িক নির্দেশ' (*Provisional Order*) পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এ পদ্ধতিদ্বারা সরকারী বিভাগ আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে 'সাময়িক নির্দেশ' জারী করে এবং পরে 'সাময়িক নির্দেশ সম্মতি বিল' উত্থাপন করে পার্লামেন্টের অনুমোদন নেয়া হয়।

বিভাগীয় নির্দেশগুলিকে দ্রুত এবং কম ব্যয়ে কার্যকর করার জন্য 'বিশেষ পদ্ধতি নির্দেশ' (Procedure Orders) ১৯৪৫ সাল থেকে চালু করা হয়। পরে ১৯৬৫ সালে এ সম্পর্কে *Special Procedure Act* গৃহীত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সরকারী পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য যদি জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয় তবে 'বিশেষ পদ্ধতি নির্দেশ' দান করে এ কার্য সম্পন্ন করা যেতে পারে।

৪. **উপবিধান** (Bye-Law)

আঞ্চলিক সংস্থা, সরকারী উদ্যোগ সংস্থা, করপোরেশন, পৌরসভা, বন্দর কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি সংস্থা নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য উপবিধান রচনা করতে পারে।

অর্পিত আইন প্রণয়ন পদ্ধতির কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। প্রথমত, এগুলি পার্লামেন্টের দায়িত্বভারকে লাঘব করতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন আইনের অনেক টেকনিক্যাল ব্যাপার থাকে যা সে বিষয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া অন্যের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এ সকল টেকনিক্যাল বিষয়ক আইন কোন বৃহৎ কক্ষে আলোচিত না হয়ে বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় মন্ত্রণালয়ে আলোচিত হওয়া ভাল।

তৃতীয়ত, আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যে সকল অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে পার্লামেন্টের পক্ষে আগেই তা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু হস্তান্তরিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতার দ্বারা সংশ্লিষ্ট দপ্তর সকল দিক আলোচনা করে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য নমনীয় আইন রচনা করতে পারে। চতুর্থত, আইনকে নমনীয় করে রচনা করলে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ থাকে এবং আইনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়। পঞ্চমত, পার্লামেন্ট আইন তৈয়ারী করলে ব্যস্ততা, দ্রুততা এবং বিশেষ জ্ঞানের (specialized knowledge) অভাবে অনেক সময় যে আইন রচনা করেন তা আইনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়। কিন্তু ধীর-স্থির ভাবে প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, চাহিদা, উদ্দেশ্য এবং ভালো-মন্দ বিবেচনা করে সরকারী দপ্তর যথাযোগ্য আইন রচনা করতে পারে।

এর সুবিধা

অর্পিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতাকে বিভিন্ন কারণে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ব্রিটেনের বিখ্যাত 'আইনের অনুশাসন' (Rule of law) অনুযায়ী সর্বোচ্চ সরকারী কর্মচারী থেকে সাধারণ লোক পর্যন্ত সকলেই একই আইনের অধীন। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কোনরূপ সার্বভৌম ক্ষমতা নাই, অথচ তাদের আইন প্রণয়নের অধিকার দিলে তা রীতিবিরোধী হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিদের নামে হস্তান্তরিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পিত হলেও বাস্তবে তা ভোগ ও প্রয়োগ করে আমলারা। আইন প্রণয়নের ব্যাপক ক্ষমতা লাভ করে আমলাতন্ত্র প্রভূত পরিমাণে শক্তিশালী হয়ে ওঠে বলে এ নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। ক্যাবিনেট একনায়কত্বের ছত্রছায়ায় সরকারী কৃত্যক বা আমলারা নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করে আমলারা অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করছে। এরা যেন নূতন ব্রাহ্মণ, বিশেষজ্ঞ নাম গায়ে চাপিয়ে জনস্বার্থ বিরোধী সব কাজে এরা পারঙ্গম। নিজেদের ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন এই তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা জনসাধারণকে প্রশাসন থেকে দূরে রাখতে সর্বদাই সচেষ্ট। "আইনের নানা খুঁটিনাটি দিক আছে"—এ শ্লোগান তুলে এরা সর্বদাই মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার ক্ষমতা হ্রাসের চেষ্টা করে থাকেন। তাই লর্ড হিওয়ার্ট (Lord Justice Hewart) এদের নব স্বৈরতন্ত্র (New Despotism) নামে অভিহিত করেছেন।

সমালোচনা

উপরোক্ত কারণে অর্পিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনের উপর কিছু কিছু বাধা নিষেধ আরোপ করে একে সীমাবদ্ধ রাখার কথা অনেকে বলেছেন। তাই অর্পিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দ্বারা যে সকল প্রশাসনিক বিধান তৈরি করা হয় ঐগুলি বিচার-বিবেচনার জন্য এবং এ ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য পার্লামেন্টের একটি যোগ্য ও ক্ষমতাসম্পন্ন পরামর্শদাতা কমিটি (Advisory Committee) গঠন করা প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করেন।

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ও প্রশাসন সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হারবার্ট মরিসন মনে করেন যে, আইন প্রণয়ন ক্ষমতার হস্তান্তর বাস্তব অবস্থায় অনিবার্য পরিণতি এবং এর

প্রয়োজনীয়তা একটি প্রশ্নাতীত বাস্তব সত্য। তিনি মনে করেন যে, অর্পিত আইন প্রণয়নের প্রতিটি স্তরের উপর পার্লামেন্টের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন।[১]

অর্পিত আইন প্রণয়নের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটেনে কমন্স সভার একটি কমিটি আছে। এ কমিটিকে *Select Committee on Statutory Instruments* বলে। অর্পিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতাবলে কোন নির্দিষ্ট আইনের অধীনে মন্ত্রীরা যে সকল বিধান রচনা করেন সে সকল বিধান পরীক্ষা করে দেখা এবং সভাকে ঐ সম্পর্কে জ্ঞাত করা পার্লামেন্টের এ কমিটির দায়িত্ব।

পার্লামেন্ট কমিটি

পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও মর্যাদা হ্রাস
Decline of Parliament

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সমগ্র ইউরোপীয় দেশগুলিতে পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও মর্যাদা দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে। এমন কি যে পার্লামেন্টকে 'পার্লামেন্ট-সমূহের জননী' বলে অভিহিত করা হয় সে বৃটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও মর্যাদার দ্রুত হ্রাস লক্ষ্য করা যায়। এখন কেবল ইউরোপে নয়, পৃথিবীর যে সকল দেশে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা আছে সেখানেই পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। এ অবস্থা সম্পর্কে লর্ড ব্রাইস বলেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেন পার্লামেন্ট সম্পর্কে জনগণের মোহমুক্তি ঘটছে। বৃটিশ পার্লমেন্টের ক্ষমতা ও মর্যাদা হ্রাসের কারণগুলির বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

প্রথমত, পার্লামেন্টের বাইরে দেশের জনগণের মতামত অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজনীতি, আইন-কানুন, প্রশাসন সকল বিষয়ে সাধারণ নাগরিক আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। আগে নাগরিকদের মনে এ সকল বিষয়ে কোন সচেতনতা ছিল না। দেশের চারদিকে কি ঘটছে সে বিষয়ে জনমত জাগ্রত হত না। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিসন ইত্যাদির প্রচলনও খুব বেশী ছিল না—জনগণের একটা সামান্য অংশের মধ্যেই ঐ প্রচারমাধ্যমগুলি সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে পরিবহন ও সংযোজন ব্যবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হয়েছে। ফলে জনমতের গঠন ও প্রভাব বর্তমান কালে ব্যাপকতা লাভ করেছে।

১. সচেতন জনমত

আজকের দিনে পার্লামেন্টে কি আলোচিত হল, পার্লামেন্ট কি আইন পাশ করলো জনগণের এক ব্যাপক অংশ তা সংবাদপত্র, রেডিও ইত্যাদি বিভিন্ন গণমাধ্যমের (mass media) সাহায্যে সাথে সাথে জানতে পারে এবং নিজেদের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত করতে পারে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠী এ-সকল ব্যাপারে জনমত গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করে। সুতরাং নির্বাচকমণ্ডলীর এ সচেতনতার জন্য পার্লামেন্টের

---

1. "The principle of delegated legislation is, I think, right, but I must emphasis that it is well for Parliament to keep a watchful and even jealous eye on it at all stages."—Government and Parliament, Herbert Morrison. P 163.

সদস্যগণ ক্রমশ তাদের পূর্বেকার স্বাধীনতা হারাচ্ছেন। বলা হয়, বর্তমানে সরকারের জন্ম হয় নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা—পার্লামেণ্ট কক্ষে নয়। অর্থাৎ জনমতের সচেতনতা পার্লামেণ্টের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে তুলেছে এবং এ ক্ষমতা ক্রমশ পার্লামেণ্টের হাত থেকে জনগণের হাতে হস্তান্তরিত হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, অনমনীয় ও শৃঙ্খলাবদ্ধ দলীয় ব্যবস্থা (Rigid Party System) উদ্ভবের ফলে পার্লামেণ্টের হাত থেকে আইন বিভাগীয় উদ্যোগ (Initiative) রাজনৈতিক দলের হাতে হস্তান্তরিত হচ্ছে। পার্লামেণ্টের বিভিন্ন দলীয় শক্তির অবস্থান দেখে যে কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ বিলের ভাগ্যে কি ঘটবে তা আগে থেকেই অনুমান করতে পারে। মনে করা যাক, পার্লামেণ্টের এমন একটি বিল আসছে যাকে পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করে। এরূপ অবস্থায় পার্লামেণ্টে আলোচনা ও বিতর্ক একান্তভাবেই আনুষ্ঠানিক হয়ে দাঁড়ায়, কেননা সকলেই জানে বিলটি পার্লামেণ্টে গৃহীত হবে না। ধরা যাক, বিরোধীদল সরকারের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। সংখ্যাগত দিক থেকে বিরোধীদের সংখ্যা কম এবং এটা নিশ্চিত যে প্রতিটি দলের সদস্যরা নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রেখে দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী ভোট দেবে. সুতরাং অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হবার আগেই বলে দেওয়া যায় যে, অনাস্থা প্রস্তাবটি পার্লামেণ্টে বাতিল হয়ে যাবে। এরূপ অবস্থায় বলা যায় যে, পার্লামেণ্টের আলোচনা একান্তভাবেই আনুষ্ঠানিক এবং পার্লামেণ্টে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তা রাজনৈতিক দলের উপর নির্ভর করে।

২. অনমনীয় দলীয় ব্যবস্থা

পার্লামেণ্টের যে ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে তা ক্যাবিনেটে এবং প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। ক্যাবিনেট শুধুমাত্র পার্লামেণ্টকে পরিচালনাই করে না, আইন প্রণয়নের উদ্যোগও ক্যাবিনেটের হাতে ন্যস্ত। এ ছাড়া পার্লামেণ্টকে ভেঙ্গে দেবার পরামর্শ দানের ক্ষমতা ক্যাবিনেটের আছে বলে ক্যাবিনেট পার্লামেণ্টকে দিয়ে নিজের ইচ্ছামত কাজ করিয়ে নিতে পারে। এর ফলে পার্লামেণ্ট সম্মতিদানের একটি নিষ্প্রাণ যন্ত্রে পরিণত হয়েছে—ক্যাবিনেট নীতি নির্ধারণ করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, পার্লামেণ্ট যন্ত্রের মত তাতে সম্মতির ছাপ মারে।

৩. ক্যাবিনেটের ক্ষমতা বৃদ্ধি

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় পার্লামেণ্টকে নানা ধরনের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন করতে হয়। পার্লামেণ্টের কাজের চাপ খুব বেশি, অথচ কাজ করার মত সময়ের খুব অভাব, তাই কোন ব্যাপার পার্লামেণ্টে বিশদভাবে আলোচনার সুযোগ থাকে না। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কয়েক মিনিটে গ্রহণ করা হয়, কোটি কোটি পাউণ্ড ব্যয়বরাদ্দ কয়েক মিনিটের মধ্যে গৃহীত হয়। ফলে পার্লামেণ্টে আলোচনা ও অনুমোদন একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। পার্লামেণ্টের অত্যধিক কাজের চাপ এর গুরুত্বকে না বাড়িয়ে বরং এর গৌরবকে ম্লান করেছে।

কাজের চাপ

পার্লামেণ্টের কাজের চাপ হ্রাস করার জন্য বিবিধ পন্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এদের মধ্যে আছে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে এগুলির হাতে দায়িত্বভার অর্পণ করা, ঘন ঘন

আলোচনা বন্ধ করার প্রস্তাব (closure motion) গ্রহণ, গিলোটিনের মাধ্যমে ব্যয় বরাদ্দ পাশ করা, শাসনবিভাগের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা ইত্যাদি। এ সকল কম গুরুত্বপূর্ণ কার্য থেকে পার্লামেণ্টকে অব্যাহতি দিয়ে এর কাজের চাপ কমানোর প্রচেষ্টা থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

এ সকল কারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা এবং মর্যাদার উপর চরম আঘাত হেনেছে এবং ফলে পার্লামেণ্ট তার পূর্বেকার গুরুত্ব অনেকাংশে হারিয়েছে। এ সকল কারণের জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই আইনসভার ক্ষমতার ব্যাপক হস্তান্তর (devolution) লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাতে আইনসভার অনেক ক্ষমতা যথাক্রমে ৪৯টি, ৭টি এবং ৮টি সংস্থার হাতে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। ব্রিটেনেও ছোট বড় অনেক কমিটি এবং সংস্থার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে পার্লামেণ্টের কাজের চাপ হ্রাস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঐ সকল কারণ ও পদ্ধতির ফলশ্রুতি হিসেবে ব্রিটেনে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা ও মর্যাদা হ্রাস পাচ্ছে এবং অন্যদিকে ক্যাবিনেট নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হচ্ছে।

ক্ষমতা হস্তান্তর

৪.১৪ মহামান্য রানীর বিরোধীদল
Her Majesty's Opposition

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় মহামান্য রানীর সরকার পরিচালনা করে একটি রাজনৈতিক দল এবং সরকারের বিরোধিতা করে আর একটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক গঠিত মহামান্য রানীর বিরোধীপক্ষ। ব্রিটেনের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধীপক্ষকে সমগুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়—এরা যেন একই বৃন্তের দুটি ফুল। সরকার না থাকলে রাষ্ট্রশাসন করবে কে? আর ঐ সরকারকে সমালোচনা করার ব্যবস্থা না থাকলে গণতন্ত্র চলবে কেমন করে? সুতরাং আইভর জেনিংসকে অনুসরণ করে বলা যায়, মহামান্য রানীর 'বিরোধী পক্ষ' শব্দযুগল অর্থহীন নয়, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মহামান্য রানীর সরকার ও বিরোধী পক্ষ উভয়েরই প্রয়োজন (Her Majesty's Opposition is no idle phrase. Her Majesty needs an Opposition as well as a Government)।[১] অনেকে ব্রিটেনে বিরোধী পক্ষকে মহামান্য রানীর 'বিকল্প সরকার' নামেও অভিহিত করে। পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণায় শুধুমাত্র একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ নয়, বিরোধী দলের স্বীকৃতি একটি অপরিহার্য শর্ত। বিরোধী দলের সমালোচনা এবং বিরোধিতা সরকার পক্ষ গ্রহণযোগ্য মনে না করতে পারেন, কিন্তু বিরোধী পক্ষের বিরোধিতার অধিকারকে মর্যাদা দিতে হবে[২]—এটাই পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মর্মকথা। সুতরাং ব্রিটেনের কমন্সসভায় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত মহামান্য রানীর বিরোধী পক্ষের অস্তিত্ব একটি সাংবিধানিক শর্ত। বিরোধীপক্ষের সাংবিধানিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে বিরোধী পক্ষ অপরিহার্য

১. Sir Ivor Jennings *Law aud the Constitution.*

২. প্রসঙ্গত স্মরণীয়ঃ 'I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.' S. G. Tallentyre's *The Friend of Voltaire*

গণতন্ত্রের কার্যকারিতা বিচার করা হয় (The test of a free country is to examine the status of the body that corresponds to Her Majesty's opposition)।[১]

তাই ১৯৩৭ সালের রাজমন্ত্রী আইনে (*Ministers of the Crown Act, 1937*) প্রধানমন্ত্রীর মাইনের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমন বিরোধী দলনেতাকে সঞ্চিত তহবিল থেকে সরকারকে 'বিরোধিতা' করবার জন্য বাৎসরিক ৪৫০০ পাউণ্ড মাইনে দেবার কথাও বলা হয়েছে। বিরোধী পক্ষের নেতার মাইনে পার্লামেণ্টের অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল নয়। ঐ আইনে বিরোধী পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের নেতার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কমন্সসভায় মহামান্য রানীর বিরোধী দলগুলির মধ্যে যার সদস্যসংখ্যা বেশি সে দল বিরোধী দলের স্বীকৃতি লাভ করবে এবং সে দলের নেতা বিরোধী নেতার মর্যাদালাভ করবে। এ ব্যাপারে কোন সংশয় দেখা দিলে স্পীকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

বিরোধী দল ও নেতার সংজ্ঞা ও স্বীকৃতি

বর্তমানে ব্রিটেনে বিরোধী পক্ষের যে মর্যাদা ও ভূমিকা দেখা যায় অতীতে তা ছিল না। অতীতে কমন্সসভা সামগ্রিকভাবে সরকারকে সমালোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করতো। কিন্তু দলীয় ব্যবস্থা দানা বেঁধে ওঠার ফলে যে দল সরকার গঠন করতো কমন্সসভায় সে দলের সদস্যগণ সরকারকে সমর্থন করতে আরম্ভ করে এবং ক্ষমতাসীন নয় এমন দল বা দলগুলি সরকারের সমালোচনা চালিয়ে যায়। কিন্তু অতীতে বিরোধী দল একটা নেতিবাদক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করতো। হুইগ দলের একজন নেতার ভাষায় বলা যায়ঃ বিরোধী দলের কাজ হল কিছু প্রস্তাব না করা, সকল কিছু বিরোধিতা করা এবং সরকারকে উল্টে দেয়া। কিন্তু বর্তমানে বিরোধীদলের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, বিরোধী দলের কাজ ও ভূমিকা আলোচনা করলে এটা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

বিরোধী দলের অতীত ভূমিকা

এস. ই. ফাইনার ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় বিরোধীপক্ষের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, বিরোধী পক্ষ সুসংগঠিত দলীয় সংগঠন ও শৃঙ্খলা দ্বারা আবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, এর স্থায়িত্ব—অর্থাৎ কমন্সসভায় সর্বদাই বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকে। কোন একটি বিশেষ দল সর্বদা বিরোধী-দলের স্থান গ্রহণ করতে না পারে, কিন্তু কোন-না-কোন দল বিরোধী পক্ষ হিসাবে সর্বদাই থাকে। তৃতীয়ত, ব্রিটেনের প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দল প্রায় সম শক্তির অধিকারী থাকে বলে বলা যায় যে, বিরোধীপক্ষ জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। চতুর্থত, কমন্সসভার আলোচনার বিষয়বস্তু স্থির করার ব্যাপারে বিরোধীপক্ষ অংশ গ্রহণ করে। পঞ্চমত, বিরোধী দল ক্ষমতার বিকল্প কেন্দ্র। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সরকারী দলের পতন ঘটলে বিরোধী দল ক্ষমতার আসীন হয়। অনেকে একে 'শূন্য অঙ্ক খেলা' (zero sum-game) বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ ব্রিটেনে (বর্তমান অবস্থায় দলীয় দিক হইতে তৃতীয় কোন বিকল্প না থাকায়) সরকার পক্ষ যে জনপ্রিয়তা ও আস্থা হারায়, বিরোধী পক্ষ তা অর্জন করে। ষষ্ঠত, উপরোক্ত

বিরোধীপক্ষের বৈশিষ্ট্য

১. Sir Ivor Jennings, *Law and the Constitution.*

বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আমরা আর একটি বৈশিষ্ট্য যোগ করতে চাই : ব্রিটেনে বিরোধী পক্ষ সরকারের বিরোধী হলেও তা রাজশক্তির প্রতি অনুগত।

বিরোধী পক্ষের কাজকর্ম

বিরোধী পক্ষ সভার কার্যধারায় অংশ গ্রহণ করে। বিরোধী পক্ষের সাথে আলোচনা করে সভার কার্যক্রম স্থির করা হয়। সভার আলোচনা, বিতর্ক, আইন প্রণয়ন, বাজেট পাশ, বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করা ইত্যাদি ব্যাপারে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে কমন্সসভার নিয়ন্ত্রণ প্রকৃত পক্ষে বিরোধী পক্ষের নিয়ন্ত্রণে পরিণত হয়েছে। সরকারী হিসাব কমিটি, ব্যয় কমিটি এবং অন্যান্য কমিটির কাজকর্মে বিরোধী সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্রিটেনে অনেক ব্যাপারেই দেখা যায় যে, পার্লামেন্টের সুষ্ঠু পরিচালনায় বিরোধী পক্ষ সরকার পক্ষের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে। বিশেষ করে জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে এবং বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরকার পক্ষ বিরোধী পক্ষের সহযোগিতা লাভে সমর্থ হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সংক্রান্ত সরকারী নীতির প্রতি বিরোধী পক্ষের সমর্থনের কথা উল্লেখ করা যায়।

১. সভার কার্যে অংশগ্রহণ

কিন্তু যে সকল সরকারী নীতি ও কার্যকে বিরোধী পক্ষ জনস্বার্থ তথা শ্রেণীস্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করে সে সকল নীতির সমালোচনা করে সরকারের নীতির পরিবর্তন সাধনে বিরোধী পক্ষ নিরলস প্রচেষ্টা চালায়। বিরোধী পক্ষের বক্তব্যে কোন সারাংশ থাকলে এবং তা দ্বারা জনমত গঠনের সম্ভাবনা থাকলে সরকার পক্ষ অনেক সময় তা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কারণ গণতন্ত্রে জনমতকে অবহেলা করে কোন দলের পক্ষে ক্ষমতায় আসীন থাকা সম্ভব নয়। ব্রিটেনে বিরোধী পক্ষকে 'দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক' বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ সমালোচনার জন্য সমালোচনা নয়, বিরোধী পক্ষের সমালোচনা গঠনমূলক খাতে প্রবাহিত হয় এবং বিরোধী পক্ষ গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে বলে মনে করা হয়।

২. সরকারের সমালোচনা

বিরোধীর পক্ষের সকল চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মের পরিণতি ও লক্ষ্য হল নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকারী ক্ষমতার আসীন হওয়া। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিরোধী পক্ষের সব কাজ ও পরিকল্পনা চলে এবং রণকৌশল নির্ধারিত হয়। বিরাধী পক্ষের সকল ক্রিয়া, কর্ম, পরিকল্পনা ও কৌশলের লক্ষ্য হল সরকার-বিরোধী জনমত সৃষ্টি করা এবং ঐ জনমতকে নিজের অনুকূলে আনা। সরকার যে জন সমর্থন হারায় বিরোধী পক্ষ তা লাভ করে (zero-sum-game)। এ জন্যই বিরোধী পক্ষের প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি সরকার পক্ষ তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখে যাতে সরকার পক্ষের জনসমর্থন বিরোধী পক্ষে না যায়। বার্নাড 'শকে অনুসরণ করে বলা যায়, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে নিজের স্ত্রী অপেক্ষা বিরোধী দলের নেতাকে আরও ভাল করে জানতে হয়। অর্থাৎ বিরোধী পক্ষের নেতার প্রতিটি কথা ও আচরণের অর্থ, কারণ ও উদ্দেশ্য তাঁকে বুঝতে হয় যাতে সরকার পক্ষ যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩. অনুকূল জনমত সৃষ্টি

বিরোধী পক্ষ যদি একটা বিকল্প সরকারের সম্ভাবনা জনমানসে উপস্থিত করতে না পারে তবে সরকার-বিরোধী জনমতকে নিজের অনুকূলে আনা সম্ভব হয় না। এ জন্যই বিরোধী পক্ষ সর্বদাই একটি বিকল্প সরকারের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। বস্তুত ব্রিটেনে বিরোধী পক্ষকে রানীর বিকল্প সরকার (Her Majesty's Alternative Governmant) নামে অভিহিত করা হয়। ১৮২৬ সালে হবহাউস বিদ্রূপাত্মক অর্থে সর্বপ্রথম 'বিকল্প সরকার' পদটি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এটি আর বিদ্রূপাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। পার্লামেন্টে পরাজিত হয়ে মন্ত্রিসভার প্রস্থান ঘটলে বা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল পরাজিত হলে রানীর 'বিকল্প সরকার' ক্ষমতাসীন হয়।

৪. বিকল্প সরকার গঠন

ব্রিটিশ রাজনীতিতে 'বিকল্প মন্ত্রিসভা'র ভূমিকা লক্ষ্য করে বিরোধী পক্ষকে 'ছায়া মন্ত্রিসভা' (Shadow Cabinet) বলা হয়। ১৯৫৫ সাল হতে 'ছায়া মন্ত্রিসভা' এবং 'ছায়া মন্ত্রী' সংক্রান্ত ধারণাটিকে আরও স্পষ্ট করা হয়। ঐ সময়ে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের ভূমিকায় ছিল শ্রমিক দল। শ্রমিকদলের নেতা এটলী (Attlle) একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। দলের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের মধ্যে যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁকে সে বিষয়ে দলের মুখপাত্র করা হয় এবং উক্ত বিয়য়ে দলীয় নীতি পার্লামেন্টে উপস্থিত করা ও সরকারী নীতিকে বিরোধিতার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়। বিরোধী দল ক্ষমতা লাভ করলে কে কোন্ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাবে তা নির্দিষ্ট করে এভাবে ছায়া মন্ত্রীদের সমন্বয়ে 'ছায়া মন্ত্রিসভা' গঠিত হয়।[১] এর পর থেকে বিরোধীদলের বিভিন্ন নেতাকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের 'ছায়া-মন্ত্রী' নামে অভিহিত করা শুরু হয় এবং সংবাদপত্রেও এদের 'আইনবিভাগের ছায়ামন্ত্রী' 'শিক্ষাবিভাগের ছায়ামন্ত্রী' এভাবে উল্লেখ করা হতে থাকে।[২] 'ছায়া-মন্ত্রিসভা' সংক্রান্ত ধারণা এতই ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় যে পরবর্তীকালে প্রতিটি বিরোধী পক্ষ 'ছায়া মন্ত্রিসভা' গঠন করার রীতি অনুসরণ করতে শুরু করে (It was in 1955 when Attlle organized his labour 'Shadow Cabinet' and since then all opposition leaders have followed his precedent and named their teams of spokemen so that the concept of publicly announced Shadow Government is now a well established feature of opposition party organisation in Britain)।[৩]

৫. ছায়ামন্ত্রী ও ছায়া-মন্ত্রিসভা গঠন

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বিরোধী দলের উদ্দেশ্য হল সুযোগের সৎ ব্যবহার করে শাসন ক্ষমতা লাভ করা এবং সরকার গঠন করা। কিন্তু ক্ষমতা লাভের জন্য

১. D. R. Turner, The Shadow Cabinet in British Politics.
২. Herbert Morrison, Government and Politics.
৩. R. M. Punnett, Her Majesty's Shadow Government :Its Evolution and Modern Role.

বিরোধী দল যে-কোন পদ্ধতি গ্রহণ করে না—বলা হয় যে, এ ব্যাপারে বিরোধীদল খেলা-ধূলোর বুর্জোয়া নিয়ম কানুন (rules of the game) মেনে চলে। খেলার বুর্জোয়া নিয়ম-কানুন হল গণতান্ত্রিক উপায়ে অর্থাৎ ভোট যুদ্ধে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসীন হবার জন্য সচেষ্ট হওয়া, অগণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা। (The opposition seeks power to effect the changes it desires, but does not seek power by means which deny democracy) [১]।

৬. গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা লাভ

ব্রিটেনে বিরোধী দলের ভূমিকা

ব্রিটেনে গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের মত শক্তিধর বিরোধী পক্ষের অস্তিত্ব অপরিহার্য মনে করা হয়। শক্তিশালী বিরোধী দল সরকারের কার্য-কলাপ ও নীতির গঠনমূলক সমালোচনা করে সরকারকে সঠিক পথে পরিচালনায় সাহায্য করে, সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে এবং প্রয়োজনে বিকল্প সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত থাকে। সুতরাং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য পার্লামেন্টে শাসকদল এবং বিরোধী দল উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়।

কিন্তু বিরোধী দল যদি বিকল্প সরকার গঠন করার মত শক্তিশালী না হয়, তবে বিরোধী দলের কাছ থেকে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন আশা করা যেতে পারে না। তাই কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের যদি নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠনের সম্ভাবনা না থাকে তবে সে অবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা ও দলীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব অকিঞ্চিৎকর হয়ে দেখা দেয়। ব্রিটেনের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল মোটামুটিভাবে সম ক্ষমতাসম্পন্ন হবার জন্য রক্ষণশীল ও শ্রমিক উভয় দলের পক্ষেই মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভবপর। বস্তুত এ দল দুটি বহুবার পার্লামেন্টে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করেছে। ব্রিটেনে রক্ষণশীল বা শ্রমিক যে দলই বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করুক না কেন, এরা সর্বদাই সরকার পক্ষের সামনে বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের চ্যালেঞ্জ বজায় রাখতে সমর্থ হয় এবং ফলে সরকারের কাজ-কর্মকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে।

সরকারকে সমালোচনা বা নিয়ন্ত্রণ করাই নয়, প্রয়োজনে সরকার পক্ষ জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে আলোচনা ও বোঝাপড়া করে এবং জাতীয় সংকটে একজোটে কাজ করে। অনেক সময়ে বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনাকে সরকারপক্ষ উপেক্ষা করতে সাহসী হয় না, বরং বিরোধী পক্ষের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী নীতির পরিবর্তন করা হয়।

এ প্রসঙ্গে বিরোধী দলের দুটি সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিরোধী দল অনেক সময় 'বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা' করে বলে সরকারের কার্যকারিতা নষ্ট হয় এবং সরকারী কাজকর্মে অপ্রয়োজনীয় বাধার সৃষ্টি হয়। এর জন্য দ্রুত কাজ করার পক্ষেও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। দ্বিতীয়ত; বিরোধী দলের সমালোচনার জন্য অনেক সময় বিদেশে ব্রিটেনের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। যেমন প্রফিউমোর ব্যাপার নিয়ে বিরোধী দলের সমালোচনার জন্য বিদেশে ব্রিটেনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

---

১. A. K. Keith

দলীয় ব্যবস্থা
PARTY SYSTEM

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধ্যানধারণার সাথে রাজনৈতিক দল এবং দলীয় ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ জনগণের সম্মতি নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করাই গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত বলে মনে করা হয়। দলীয় ব্যবস্থায় বিকল্প নীতি ও পন্থার প্রতীক হিসাবে অবস্থান করে রাজনৈতিক দলগুলি এবং নির্বাচনে জনগণ ঐ বিকল্প নীতি ও পন্থার মধ্য থেকে যা অনুমোদন করে সে বিকল্প নীতি ও পন্থার ধারক দল ক্ষমতায় আসীন হয় এবং জনগণের সম্মতি নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করে। তাই ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় সরকার বলতে কোন একটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক গঠিত সরকারকে বুঝায়।

গণতন্ত্র ও দলীয় ব্যবস্থা

কিন্তু এ ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন উন্নত দলীয় ব্যবস্থা (developed party system)। মনে করা হয় যে, রাজনৈতিক আঙ্গিনায় প্রায় সমক্ষমতাসম্পন্ন বহু রাজনৈতিক দল বিচরণ করলে অস্থিরতা দেখা যায় এবং এ অবস্থা সরকারের স্থায়িত্বের পক্ষে অনুকূল নয়। সুতরাং পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে উন্নত এবং দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাকেই গণতন্ত্রের পক্ষে কাম্য বলে মনে করা এবং ব্রিটেনে ঐ দুইটি অবস্থার অস্তিত্ব আছে বলেই ব্রিটেনের গণতন্ত্র দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ মত পোষণ করেন।

৫-১. রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ও দলীয় ব্যবস্থার বিকাশ
Origin of Parties and Development of Party System

ব্রিটেনে দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনেক আগে রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে। তবে প্রথমদিকে পরিণত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে জাতীয় চার্চকে (National Established Church) সমর্থনের প্রশ্নে দুটি উপদলের (faction) আবির্ভাব ঘটে। অষ্টাদশ শতকে টোরী (Tories) এবং হুইগ (Whigs) নামে দুটি রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। টোরী দল সাধারণভাবে রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিল, অন্যদিকে হুইগ দল রাজার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের সমর্থক ছিল।

টোরী ও হুইগ

উনিশ শতকের প্রথমদিকে টোরী এবং হুইগ দল যথাক্রমে রক্ষণশীল (Conservatives) ও উদারনৈতিক (Liberals) দল নামে পরিচিত হয়। প্রথম দিকে উভয় দলই নেতৃত্ব ও নীতির ব্যাপারে ছিল সমপরিমাণে অভিজাততান্ত্রিক। কিন্তু উনিশ শতকে প্রতিনিধিত্বের আইন সংস্কার এবং আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দানের ব্যাপারে উদারনৈতিক দলের অভিজাত ও সম্পদশালী শ্রেণী দলত্যাগ করে রক্ষণশীল দলের শিবিরে জমায়েত হয়। ফলে এরূপ একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে, উদারনৈতিক দল যুগোপযোগী সংস্কার ও পরিবর্তনের পক্ষপাতী এবং তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল।

রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক

১৯০০ সালে ব্রিটেনের রাজনৈতিক মঞ্চে শ্রমিক দলের আবির্ভাব ঘটে। ঐ দল শ্রমজীবী মানুষ ও সমাজের দরিদ্র অংশের প্রতিনিধিত্ব করে বলে দাবী করা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই ঐ দল শ্রমিক, মধ্যবিত্ত এবং এমনকি উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশের সমর্থন লাভ করে অন্যতম শক্তিশালী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। একদিকে যখন শ্রমিক দল শক্তিশালী হয়, অন্যদিকে তখন উদারনৈতিক দল দুর্বল হয়। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের শাসনক্ষমতা রক্ষণশীল এবং উদারনৈতিক দল ভাগাভাগি করে ভোগ করে। ১৯২৪ সালে সর্বপ্রথম শ্রমিকদল উদারনৈতিক দলের সহায়তায় ক্ষমতায় আসীন হয়।

শ্রমিক দলের আবির্ভাব

ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থা

ব্রিটেনের রাজনৈতিক মঞ্চে মূলত দুটি রাজনৈতিক দল অবস্থান করে। সেখানে আরও দুই-একটি দল আছে বটে, কিন্তু সরকার গঠনের ক্ষেত্রে এদের কোন বাস্তব ভূমিকা নেই এবং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ক্ষমতার প্রতিযোগিতা সর্বদাই দুটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭২১ সালে স্যার রবার্ট ওয়ালপোলের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত ক্ষমতার জয়মাল্য টোরী এবং হুইগ দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৫৫ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্তও উপরোক্ত দল দুটি নতুন নামে (রক্ষণশীল এবং উদারনৈতিক) ব্রিটেনে শাসনক্ষমতা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। আবার রক্ষণশীল দলের অভ্যুত্থানের পরে ১৯২৪ থেকে আজ অবধি ক্ষমতার প্রতিযোগিতা রক্ষণশীল এবং শ্রমিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ ব্রিটেনের ক্ষমতার প্রতিযোগিতা সর্বদাই দুটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখতে পাওয়া যায় এবং দুটি দলই সর্বদা ব্রিটেনের রাজনৈতিক মঞ্চে প্রাধান্য বিস্তার করে। কবি ডব্লিউ এস. গিলবার্টের ভাষায় বলা যায়: ব্রিটেনের প্রতিটি বালক-বালিকা এক-একটি ক্ষুদে উদারনৈতিক অথবা ক্ষুদে রক্ষণশীল।

ক্ষমতার লড়াই দু দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ

একাধিক দলের অস্তিত্ব থাকলেও, ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার সাথে দুটি রাজনৈতিক দলই প্রধানত জড়িত থাকে এবং অন্যান্য দলগুলির ভূমিকা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎকর। এ জন্যই ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থাকে 'দ্বি-দলীয়' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ঘটনা হল: ফ্রান্স, ইতালী, ডেনমার্ক, ইস্রায়েল ইত্যাদি দেশে ব্রিটেনের মত কয়েকটি রাজনৈতিক দল আছে, অথচ ঐ সব দেশের কোথাও ব্রিটেনের মত দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। আবার যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা দেখা যায়, কিন্তু সেখানে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার আবির্ভাবের কারণ আলাদা। সুতরাং ব্রিটেনে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার প্রচলন কেন হয়েছে তা জানা প্রয়োজন।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা

প্রথমত মনে করা হয় যে ব্রিটেনের ঐ দুটি দল জনগণের ব্যাপক অংশের শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে বা প্রতিনিধি হিসাবে দাবী করে। কিন্তু এ বক্তব্য কী গ্রহণ করা সম্ভব? ব্রিটেনে শ্রমিক ও রক্ষণশীল দলের নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে যাই বলা হোক না কেন, এদের মধ্যে ঐ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন গুণগত পার্থক্য দেখা যায় না। তাই প্রশ্ন জাগে যে পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা কী

এদের পক্ষে সম্ভব ? সম্ভব নয় বলেই সেখানে উদারনৈতিক, সাম্যবাদী ইত্যাদি দলের অস্তিত্ব রয়েছে—যদিও শক্তির দিক থেকে ঐ দলগুলি উল্লেখযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, সেখানকার জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভৌগোলিক পার্থক্য দুটি মূল ধারায় প্রবাহিত বলে ব্রিটেনের জনগণ মোটামুটিভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত। তৃতীয়ত, দেশটি ক্ষুদ্র বলে ব্রিটেনে আঞ্চলিক স্বার্থ কখনই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। এবং আঞ্চলিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বৃহৎ দেশের মত এখানে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল গড়ে ওঠার সুযোগ নেই। চতুর্থত, ব্রিটেনে অ-দলীয় (non-committed) ব্যক্তিদের জোট বা ভাসমান (floating) ভোট সংগঠিত করে দল গঠনের সুযোগ কম। কারণ, ব্রিটেনের প্রধান দল দুটির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য মূলগত এবং গুণগত পার্থক্য নেই। ফলে এরা অনেক ব্যাপারে আপোষ করে চলে এবং সহজেই নিজেদের মধ্যে ভাসমান ভোট ভাগ করে নেয়। এ ছাড়াও নতুন দল গঠন করার মত রাজনৈতিক আদর্শের দৈন্য এবং আর্থিকসম্পদ ও লোকবলের অভাবও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। পঞ্চমত, বলা হয় যে ব্রিটেনের জনগণের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার পরিপূরক। অর্থাৎ অনেকে মনে করেন যে, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাতেই গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। হ্যারল্ড ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়ঃ Political System "is more satisfactory the more it is able to express itself through the antithesis of two great parties". ষষ্ঠত, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় কোন একটি দল সাধারণত নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয় বলে স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব এবং এ কারণে ব্রিটিশ জনমত দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার স্বপক্ষে।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রচলনের কারণ

৫-২. ব্রিটিশ দলীয় ব্যবস্থা

The British Party System

ব্রিটেনে বর্তমানে রক্ষণশীল এবং শ্রমিক দলকে নিয়ে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত। উদারনৈতিক দল অনেক দিন থেকেই সরকারী ক্ষমতার আঙিনা থেকে বিতাড়িত। ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার পর্যালোচনা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা অনুধাবনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। কারণ আমরা আগেই বলেছি যে, সুসংহত ও সুসংগঠিত দলীয় ব্যবস্থার আবির্ভাবের ফলে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় অনেক গুণগত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যাহোক ব্রিটিশ দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথমেই পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ব্রিটিশ দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

এস. ই. ফাইনার ব্রিটিশ দলীয় ব্যবস্থার ছটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেনঃ ১. দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় ব্রিটেনে কোনো একটি রাজনৈতিক দলের কমন্সসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ প্রায় নিশ্চিত; ২. সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারা ক্যাবিনেট গঠন, ৩. কমন্সসভায় সংখ্যাধিক্য থাকার জন্য ক্যাবিনেটের স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়তা; ৪. পার্লামেন্টের আয়ুষ্কাল পর্যন্ত ক্যাবিনেটের কার্যকালের (duration) নিশ্চয়তা; ৫. ক্যাবিনেটের কার্যকালের মধ্যে

ফাইনারের মতে বৈশিষ্ট্য

সরকার পরিচালনা সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে ক্যাবিনেটের সুস্পষ্ট দায়িত্বশীলতা এবং
৬. সরকারী এবং বিরোধী দল কর্তৃক জনগণের সামনে বিকল্প পছন্দের উপস্থাপনা।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ব্রিটেনের দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় যুগ্ম-শরিক রক্ষণশীল এবং শ্রমিক দলের জনজীবনে প্রভাব খুবই ব্যাপক এবং সাংগঠনিক ভিত্তিও এদের খুব দৃঢ়। বুর্জোয়া দেশের রাজনৈতিক দলগুলির চেয়ে ব্রিটেনের দলগুলি অধিকতর শৃঙ্খলাপরায়ণ ও সুনিয়ন্ত্রিত, যদিও সাম্যবাদী দলগুলির সাথে এ ব্যাপারে তাদের কোন তুলনা করা চলে না। তবে এ কথা বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ইত্যাদি অপেক্ষা ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলির সংগঠন অনেক মজবুত এবং এরা অধিকতর শৃঙ্খলাপরায়ণ। জনজীবনে এদের প্রভাব সম্পর্কে বলা যায় যে, দলের প্রতি আনুগত্য আছে (committed) এরূপ জনসমাজের সমর্থন ঐ দুটি দলের মধ্যে প্রায় সমবিভক্ত।

দলগুলি সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ

ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলি কর্মপরিকল্পনা ভিত্তিক আবেদন নিয়ে জনগণের সামনে উপস্থিত হয়। নির্বাচনের আগে তারা নির্বাচন ইস্তাহার প্রকাশ করে এবং ক্ষমতাসীন হলে ইস্তাহার বর্ণিত কার্যক্রম রূপায়ণে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। বস্তুত নির্বাচনে জয়লাভকে দল নিজের কার্যক্রম রূপায়ণের ব্যাপারে জনগণের সম্মতি বলে মনে করে।

কার্যক্রম ভিত্তিক আবেদন

ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থাকে দলগত অবস্থানের বাস্তব প্রকাশ এবং দলগুলিকে শ্রেণী-ভিত্তিক বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেন। বিশেষ করে শ্রমিক দলকে শ্রমজীবী মানুষ ও সমাজের নিম্নস্তরের জনগণের প্রতিনিধি বলা হয়। শ্রমিক ও দরিদ্র মানুষের উপর শ্রমিক দলের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ব্রিটেনের প্রধান রাজনৈতিক দল দুটি অনেক ক্ষেত্রেই মোটামুটিভাবে একই শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেজন্যই এদের মধ্যে মৌল পার্থক্যের কোন সীমানা অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না।

দুটি দলের মধ্যে মৌল পার্থক্য নেই

ব্রিটেনের প্রধান দুটি দলের সমর্থন মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট, সেজন্য ভাসমান ভোট (floating votes) কোনদিকে ঝোঁকে (swing) তার উপরে দলগত জয়-পরাজয় নির্ভর করে। হিসাবে দেখা গিয়েছে যে, মোট ভোটসংখ্যার তিন শতাংশ ভোট রাজনৈতিক দলগুলির ভাগ্য নির্ধারিত করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শ্রমিক দল অপেক্ষা রক্ষণশীল দল ভাসমান ভোটের তিন শতাংশ বেশী পেয়ে ক্ষমতায় আসীন হয়। আবার ১৯৭৪ সালের অক্টোবরের নির্বাচনে উপরোক্ত ভাসমান ভোট শ্রমিকদলের অনুকূলে চলে আসে এবং ফলে শ্রমিকদল সরকারী ক্ষমতা লাভ করে।

ভাসমান ভোট

	১৯৭০	১৯৭৪, অক্টোবর
রক্ষণশীল দল	৪৬%	৩৬%
শ্রমিক দল	৪৩%	৩৯%

উপরোক্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে, ব্রিটেনের নির্বাচকমণ্ডলীর একটা অংশ খুবই স্পর্শকাতর (sensitive) এবং এ স্পর্শকাতর নির্বাচকেরাই মূলত ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে জয়-পরাজয় মীমাংসায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। অর্থাৎ উভয় দলের প্রতি নির্বাচক বা ভোটারের আনুগত্য মোটামুটি সমান। কিন্তু স্পর্শকাতর ভাসমান ভোটারেরা যে নির্বাচনে যে দলের দিকে ঝোঁকে সে দলই নির্বাচনে জয়ী হয়। এস. ই. ফাইনার ঘনক আইনের (Cube Law) সাহায্যে বিষয়টি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন।

ভোটারদের স্পর্শকাতরতা

সবশেষে আমরা ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার একটি অনুসৃত নীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলি সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা লাভের জন্য সচেষ্ট থাকে, সংবিধান বহির্ভূত কোন উপায়ে ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করে না। এর কারণও সুস্পষ্ট। প্রধান দল দুটির মধ্যে গুণগত ও রাজনৈতিক আদর্শগত কোন মৌল পার্থক্য না থাকার জন্য সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতায় আসীন হবার পথে এদের কোন বাধা থাকে না এবং একটি দল অন্য দলটিকে ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহা প্রকাশ করে না—কারণ ক্ষমতা থেকে বিদায়ী দল জানে যে অপর দলের হাতে তাদের শ্রেণীস্বার্থ বিপন্ন হবে না।

সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা লাভ

এর কারণ হল ব্রিটিশ রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলের মধ্যে গুণগত পার্থক্য খুব সামান্য, পার্থক্যের মধ্যবর্তী সীমানা অস্পষ্ট। যদিও শ্রমিকদল তত্ত্বগতভাবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং এর মূল আবেদন শ্রমিক শ্রেণীর কাছে ; এবং যদিও রক্ষণশীল দলের ভিত্তি হল রাজভক্তি, গীর্জাভক্তি, সাম্রাজ্য প্রীতি, ধনতন্ত্র প্রীতি—তা সত্ত্বেও বাস্তবে এ দুটি দলের চরিত্র ও কার্যে বিশেষ কোন গুণগত প্রভেদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। আসলে এ দল দুটির মধ্যকার পার্থক্যের সীমা ক্রমশই অস্পষ্ট হয়ে আসছে। শ্রমিক দলের মৌল নীতি যা হোক না কেন, ভোটের মোহে এর নেতৃত্ব সমাজতন্ত্রের আদর্শে জল মিশিয়ে সারবস্তু প্রায় বিসর্জন দিয়ে বসেছেন। অন্যদিকে রক্ষণশীল দল তাদের সংস্কার বিসর্জন দিয়ে যুগের সাথে সঙ্গতি রেখে চলার চেষ্টা করছেন। তাই এ দুটি দলের মধ্যকার পার্থকের সীমারেখা ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে।

প্রধান দল দুটির মধ্যকার পার্থক্য সামান্য

ব্রিটিশ দলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির চেয়ে এর নেতাদের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রাজনৈতিক দলগুলি দলীয় নীতি ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে নিজেদের দলের প্রার্থীদের স্বপক্ষে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে ভোট না চেয়ে দলের নেতার নামে ভোট ভিক্ষা করে। চার্চিলকে প্রধানমন্ত্রী করতে হলে রক্ষণশীল দলকে ভোট দাও—একসময়ে রক্ষণশীল দল এরূপ আবেদন জানাত। একই কথা শ্রমিক দল সম্পর্কেও প্রয়োজ্য। শুধু ব্রিটেন নয়, সকল বুর্জোয়া ব্যবস্থাতেই দল অপেক্ষা নেতার স্থান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় এবং নেতার নামে ভোট সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়।

দল অপেক্ষা নেতা গুরুত্বপূর্ণ

দলীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব

ব্রিটেনের গণতন্ত্রের বিকাশ ও সংসদীয় ব্যবস্থার বিবর্তনে দলীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। দলীয় ব্যবস্থার জন্যই সেখানে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে;

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ক্যাবিনেট নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মন্ত্রিসভার উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়েছে। দলীয় ব্যবস্থার ফলেই ব্রিটেনে মন্ত্রিসভায় স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়েছে, একই চিন্তাধারায় লালিত ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের পথ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সরকারী দল ও বিরোধী দলের উদ্ভব ঘটেছে। অন্যদিকে দলীয় ব্যবস্থার ফলশ্রুতি হিসেবে ব্রিটেনে পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

৫-৩. ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলের কাজ
Functions of Parties in Britain

কোন দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশে রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম নির্ধারিত হয়। কোন দেশের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেখানকার সাম্যবাদী দলের কাজকর্ম ও ভূমিকা একরূপ, আবার ব্রিটেনের মত উদারনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের কাজ ও ভূমিকা অনেকাংশেই আলাদা। সুতরাং বলা যায়, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার তারতম্যের ফলে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলীরও তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটেনের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক পটভূমিকায় রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী আলোচনা করা হল :

দলীয় নীতি ও কর্মসূচী প্রচার

১. ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য হল নির্বাচনে জয় লাভ করে ক্ষমতায় আসীন হওয়া। এ উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দল দলীয় নীতি প্রচার করে। দলীয় নীতির সার্থক প্রচারের মধ্য দিয়ে সাফল্যের ভিত্তি রচিত হয়। তাই দলের বিভিন্ন মতের সমন্বয় করে রাজনৈতিক দল নীতি ও কর্মসূচী উত্থাপন করে এবং ঐ সকল কর্মসূচী ব্যাপক প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। সর্বাধিক সংখ্যক জনগণ তথা নির্বাচককে এ নীতি ও কর্মসূচীর দ্বারা প্রভাবিত করাই রাজনৈতিক দলের প্রচার অভিযানের লক্ষ্য।

জনমত গঠন

২. দলীয় নীতি ও কর্মসূচীর দ্বারা নির্বাচককে প্রভাবিত করার অর্থই হল জনমত সৃষ্টি করা। সুতরাং জনমত সৃষ্টি রাজনৈতিক দলের একটি প্রধান কাজ। দলের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করতে পারলে রাজনৈতিক দল সহজেই জনমতের পিঠে চেপে নির্বাচন বৈতরণী পার হতে পারে। লাওয়েল মনে করেন, বিভিন্ন ব্যাপারে জনমত গঠন করা এবং জনমতকে তুলে ধরা রাজনৈতিক দলের কাজ এবং এর জন্যই রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব।

জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষা দান

৩. রাজনৈতিক দলের প্রচার এবং জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা পরোক্ষভাবে জনগণের চেতনার স্তরকে উন্নত করে এবং রাজনৈতিক চিন্তা ও ভাবনার দ্বারা সমৃদ্ধ করে। এজন্যই হ্যারল্ড ল্যাস্কি রাজনৈতিক দলকে চিন্তা-ভাবনার দালাল (broker of ideas) বলে অভিহিত করেছেন। নিজ নিজ কর্মসূচী ও মতাদর্শের ভিত্তিতে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের মুখপত্র, পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি ও অন্যান্য গণ-সংযোগ মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৪. ব্রিটেনের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচন-ভিত্তিক সংগঠন তৈরী করে, কারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা তাদের প্রধান কাজ। ব্রিটেনে অল্পদিনের বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বলে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকে। নির্বাচন যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সংগঠন গড়া, প্রার্থী মনোনীত করা এবং নির্বাচন পরিচালনা করার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি দক্ষ।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ

৫. নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতাসীন হতে পারলে সরকার পরিচালনা করা এবং সরকারের মাধ্যমে দলের নীতি ও কর্মসূচী রূপায়ণ করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ।

সরকার পরিচালনা

৬. ক্ষমতাসীন হতে না পারলে ব্রিটেনে রাজনৈতিক দল দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে এবং পরের নির্বাচনে ক্ষমতা লাভের জন্য প্রয়াস চালায়।

বিরোধী দলের ভূমিকা পালন

৭. জনগণ এবং সরকারের মধ্যে সংযোগ রক্ষার মাধ্যম হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলি কাজ করে।

সংযোগের মাধ্যম

৮. রাজনৈতিক দল থাকার জন্য স্থায়ী সরকার গঠিত হয়। দলীয় ব্যবস্থা না থাকলে পার্লামেন্ট স্বতন্ত্র (independent) সদস্যদের দ্বারা গঠিত হয় এবং ঐ সকল সদস্যদের কোন দলীয় আনুগত্য থাকে না। ফলে ঘন ঘন আনুগত্য পরিবর্তনের সাথে সাথে সরকারেরও ঘন ঘন পতন ও পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং বলা হয় রাজনৈতিক দল সরকারের স্থায়িত্ব আনে।

সরকারকে স্থায়িত্ব দেয়

৯. দুটি নির্বাচনের মধ্যবর্তী অবস্থায় রাজনৈতিক দলগলির প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের অভাব-অভিযোগ, চিন্তা-ভাবনা সরকারী দরবারে পেঁছায়। তাই হারভে এবং ব্যাথার বলেছেন যে, ব্রিটেনে সরকার ও শাসিতের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে রাজনৈতিক দলগুলি।

সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র

৫·৪ ব্রিটেনের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল
Major Political Parties in Britain

আমরা আগেই বলেছি যে, রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য হল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করা এবং উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে শ্রেণীস্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতা করা। সেজন্য বলা যায়, রাজনৈতিক দলের সংগঠন এবং দলীয় আদর্শ ও নীতি এ দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গড়ে ওঠে। নীচে ব্রিটেনের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সংগঠন ও নীতি নিয়ে আলোচনা করা হল ঃ

ক. রক্ষণশীল দল

প্রতিটি নির্বাচন এলাকাকে ভিত্তি করে রক্ষণশীল দলের 'নির্বাচন এলাকা সমিতি' (Constituency Association) গঠিত হয়। নির্বাচন এলাকা সমিতির অধীনে কয়েকটি ওয়ার্ড থাকে। নির্বাচন এলাকা সমিতির দায়িত্ব হল নির্বাচন তহবিলে অর্থ

আদায় করা, দলের সভ্য সংগ্রহ করা, নির্বাচন পরিচালনা করা এবং প্রাথমিকভাবে নির্বাচনের প্রার্থী মনোনীত করা। প্রতিটি নির্বাচন এলাকার কার্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য বেতনভুক্ শিক্ষাপ্রাপ্ত সর্বক্ষণের কর্মী নিয়োগ করা হয়। এদের নির্বাচন এলাকার এজেণ্ট (The Constituency Agent) বলা হয়। নির্বাচন এলাকা সমিতিগুলিকে নিয়ে আবার বারটি 'আঞ্চলিক পর্ষদ্' (Area Council) গঠিত হয়। প্রতিটি আঞ্চলিক পর্ষদের অধীনে কয়েকটি করে নির্বাচন এলাকা সমিতি রয়েছে।

গঠন

জাতীয় স্তরে রক্ষণশীল দলের কেন্দ্রীয় সংগঠনের নাম হল জাতীয় সংস্থার কেন্দ্রীয় পর্ষদ্ (The Central Council of the National Union)। দল এবং এর সংসদীয় শাখার নেতা, কর্মী, মনোনীত সদস্য এবং প্রতিটি নির্বাচন এলাকা থেকে চারজন করে সদস্য নিয়ে কেন্দ্রীয় পর্ষদ্ গঠিত। এর সদস্যসংখ্যা বর্তমানে ৫,৫০০। জাতীয় সংস্থায় পরিচালন সমিতি (The Executive Committee of the National Union) তুলনায় ক্ষুদ্র—এটি ১৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

রক্ষণশীল দলের নেতাকে নির্বাচন করে ঐ দলের পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সদস্যগণ। কিন্তু নির্বাচিত প্রার্থীর নাম পীয়্যার, নির্বাচন এলাকা সমিতি এবং নেতা পদের সম্ভাব্য প্রার্থীদের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। রক্ষণশীল দলের নেতা দলের সভাপতি (Chairman) মনোনীত করেন। সভাপতি দলের কেন্দ্রীয় দপ্তরের প্রধান, কিন্তু কেন্দ্রীয় দপ্তর পরিচালনায় দলের নেতা-ই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন।

রক্ষণশীল দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা হল বাৎসরিক দলীয় সম্মেলন (The Annual Party Conference)। এই সম্মেলনের প্রস্তাব নেতার উপর প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু তা মান্য করে চলা দলের নেতার পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়।

নীতি ও আদর্শ

রক্ষণশীল দল ব্রিটেনের একটি জাতীয় দল এবং জাতীয় ঐক্য রক্ষায় সচেষ্ট ঐ দল শ্রেণী সংঘর্ষে আস্থা পোষণ করে না, বরং বিশ্বাস করে পুঁজি ও শ্রমের সমন্বয়ে এবং সম্পত্তির মালিকানা ভিত্তিক গণতন্ত্রে। রক্ষণশীল দল ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং শিল্পে কোন নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী নয়, এ দল প্রতিযোগিতামূলক আর্থনীতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। 'সাম্য নয় উৎকর্ষতা, (quality and not equality) এবং 'নিরাপত্তা নয়, সুযোগ-সুবিধা' (opportunity rather than security)—এ দুটি হল এ দলের মুখ্য বক্তব্য।

ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং মুনাফার অধিকারে এ দল বিশ্বাস করে। এজন্য রক্ষণশীল দল সকলপ্রকার নিয়ন্ত্রণ, সরকারী উদ্যোগ এবং কেন্দ্রিকতার বিরোধী। মানসিকতার দিক থেকে এ দল সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষপাতী, তবে পরিবর্তিত অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুবর্ণ যুগ যে আর ফিরে আসবে না একথা উপলব্ধি করে বর্তমানে এ দল কিছু কিছু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে। তাই ১৯৪৫ সালে নির্বাচনে পরাজিত হবার পরে রক্ষণশীল দল জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা গ্রহণ করেছে এবং কিছু কিছু সরকারী উদ্যোগকেও মেনে নিয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এ দলের প্রভাব কোন অংশে কম নয়। কিন্তু দলের নেতৃত্ব প্রধানত বিত্তশালী ব্যবসায়ী, পেশাদার এবং সমাজের উপরতলার মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

খ. শ্রমিক দল

শ্রমিক দল হ'ল বিভিন্ন রকমের সংগঠনের একটি সমবায়। প্রতিটি নির্বাচন এলাকার অধীনস্থ এরূপ বিভিন্ন সংস্থাকে নিয়ে নির্বাচন এলাকা সংগঠন (Constituency Organisation) গঠিত। শ্রমিকদলের ঐ নির্বাচন সংগঠন চাঁদা আদায় করে, নির্বাচন পরিচালনা করে, নির্বাচন এলাকার অধীনস্থ স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রার্থী মনোনীত করে এবং পার্লামেন্টের নির্বাচনে নিজ নির্বাচন এলাকার জন্য প্রার্থী মনোনীত করে। নির্বাচন এলাকার সংগঠনের প্রধান হল এর সম্পাদক। এলাকা সংগঠনের উপরে আছে এগারটি আঞ্চলিক পর্ষদ (Regional Councils)।

গঠন

শ্রমিকদলের নীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ সংস্থা হল বাৎসরিক দলীয় সম্মেলন (Annual Conference)। এ সম্মেলনে সারা দেশ থেকে এগার শত প্রতিনিধি যোগদান করেন। এ সম্মেলনে আলোচনার মধ্য দিয়ে দলের নীতি ও কর্মসূচী রচিত হয়। সম্মেলন জাতীয় পরিচালন সমিতিকে (National Executive Committee) নির্বাচিত করে।

জাতীয় পরিচালক সমিতির সদস্যসংখ্যা ২৮, এর মধ্যে ১২ জন শ্রমিক সংস্থা থেকে, ৭ জন দলের নির্বাচন এলাকা কমিটিগুলি থেকে, ১ জন সমাজতান্ত্রিক এবং সমবায় সংস্থাগুলি থেকে নেওয়া হয় এবং ৫ জন মহিলা সদস্যা সম্মেলন দ্বারা নির্বাচিত হয়। দলের নেতা ও সহকারী নেতা পদাধিকার বলে জাতীয় পরিচালক সমিতির সদস্য। জাতীয় পরিচালক সমিতি নিয়মিত মিলিত হয়। এর কাজ হল জাতীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত রূপায়িত করা, দলের আর্থিক ব্যবস্থা দেখাশুনা করা, দলের সদরীয় শাখার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, নিম্নতন শাখাগুলি দেখাশুনা করা এবং দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

শ্রমিকদলের পার্লামেন্টের সদস্যগণ দলের নেতা নির্বাচন করেন। শ্রমিকদলের নেতার স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে তিনি রক্ষণশীল দলের নেতার মত সর্বেসর্বা নন। কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের উপরও শ্রমিক দলের নেতার নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব কম। শ্রমিক দলের সদর দপ্তর Transport House-এ অবস্থিত। এ দপ্তরের দেখাশুনা করেন জাতীয় পরিচালক সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত সাধারণ সম্পাদক।

শ্রমিকদল নিজেকে শ্রমজীবী ও দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি বলে দাবী করে। এ দল আর্থনীতিক ক্ষেত্রে এবং সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষায় এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোন প্রকার বৈপ্লবিক কর্মপন্থায় এ দল বিশ্বাস করে না। বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে যতটুকু অগ্রগতি সম্ভব এ দল তাতেই সন্তুষ্ট।

দলের নীতি ও আদর্শ

ঐ উদ্দেশ্যে এ দল আর্থনীতিক ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি এবং সরকারী উদ্যোগের সম্প্রসারণ চায়। ক্ষমতায় আসীন হয়ে এ দল কয়েকটি শিল্পে জাতীয়করণ নীতি প্রয়োগ করেছিল এবং কিছু কিছু শ্রম কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করেছিল। শ্রমিকদল জাতীয় অর্থনীতির সম্প্রসারণের পক্ষপাতী।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ দল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, কমনওয়েলথের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতি আস্থাশীল বলে দাবী করে।

গ. রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলের মধ্যে তুলনা

রক্ষণশীল দলের সংগঠন ও রাজনীতি মূলত পার্লামেণ্ট ভিত্তিক। কিন্তু শ্রমিক দল পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে মজবুত সংগঠন গঠন করে এবং সংসদীয় শাখার উপর দলের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ আছে। রক্ষণশীল দলের নেতা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি দলের সভাপতিকে মনোনীত করেন এবং সমস্ত দলটাই নেতা-কেন্দ্রিক। এমনকি জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তাব মান্য করা নেতার পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু শ্রমিক দলের নেতা এরূপ ব্যাপক ও শর্তহীন ক্ষমতা ভোগ করেন না। এক কথায় বলা যায়, শ্রমিক দলের সংগঠনে যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও অধিকার আছে তা রক্ষণশীল দলে নেই।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, নীতি এবং আদর্শের ক্ষেত্রে এ দু দলের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তা নয়। নীতি হিসাবে যাই প্রচারিত হোক, শ্রমিক দল কোন অবস্থাতেই শ্রমজীবী মানুষের যথার্থ প্রতিনিধি নয়। বামপন্থী জনগণের ভোট লাভের আশায় রক্ষণশীল দলকে অনেক সময় প্রগতিশীল কথা বলতে হয় এবং প্রগতিশীল কর্মপন্থা প্রচার করতে হয়, ফলে এ দলকে নিজের দক্ষিণপন্থী অবস্থান থেকে মাঝে মধ্যে কিছুটা বামে ঝুঁকতে হয়। অন্যদিকে একই কারণে দক্ষিণপন্থী ভোটার দের মন জয় করার জন্য শ্রমিক দল তার বহু ঘোষিত বামপন্থী অবস্থান থেকে মাঝে মধ্যে একটু দক্ষিণে ঝুঁকতে বাধ্য হয়। ফলে দু দলের অবস্থান প্রায় একই স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে এবং এদের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে। তাই উভয় দলই জনকল্যাণ ও সমাজ কল্যাণের কথা বলে। শ্রমিক দল কয়েকটি শিল্প জাতীয়করণ করেছে, রক্ষণশীল দল অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা মেনে নিয়েছে। বিদেশে পুঁজিলগ্নীর ব্যাপারে উভয় দলই সমান উৎসাহী। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এরা প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গীর অংশীদার। এমনকি ভিয়েতনামের মত অমানবিক যুদ্ধে মার্কিন নীতির সমর্থনে উভয় দল একই ভূমিকা ও নীতি গ্রহণ করেছিল। উভয়-দলই একই রাজনৈতিক সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং বলা যায়, এদের মধ্যে উনিশ-বিশ পার্থক্য (between Tweedledum and Tweedledee)। এ জন্যই হ্যারল্ড ল্যাস্কি বলেছেন যে, কার্যকারিতার দিক থেকে আমাদের দেশে একটি দল আছে এ দলটির দুটি শাখা (শ্রমিক দল ও রক্ষণশীল দল) আছে। শাখা দুটি পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করে

বটে ; কিন্তু তা একান্তভাবেই পারিবারিক কলহ এবং যে-কোন সময়ে এ কলহ মিটমাট করা যায়।[১]

৫-৫. ব্রিটেনে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা
The Role of the Pressure Groups in Britain

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সমর্থকেরা মনে করেন যে উদারনৈতিক ব্যবস্থায় মত প্রকাশের ব্যাপক স্বাধীনতা নিশ্চিত থাকে বলে রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি চাপসৃষ্টিকারী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অবশম্ভাবী। বলা হয় যে, এ জন্যই ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইস্রায়েল ইত্যাদি দেশে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও রাজনীতিতে প্রাধান্য দেখা যায়। এ সকল দেশে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু এরা রাজনৈতিক দল থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিত্ব দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়—একটি রাজনৈতিক দল এবং অন্যটি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। তাই ব্রিটেনে দলীয় ব্যবস্থার মত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকেও অপরিহার্য মনে করা হয়।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রে অবশ্যম্ভাবী

ব্রিটেনে চাপসৃষ্টিকরী গোষ্ঠীগুলিকে দুটি ব্যাপক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: ১. শ্রমিক সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, চার্চ প্রমুখ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এবং ২. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থা, শিশু কল্যাণ সংস্থা প্রভৃতি প্রচারমূলক ও সংরক্ষণ মূলক সংস্থা। প্রথম শ্রেণীর গোষ্ঠীর অস্তিত্ব হল এর সদস্যদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর গোষ্ঠী ব্যাপক জাতীয় স্বার্থ রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকে। ব্রিটেনের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে চেম্বার অব্ কমার্স, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, মেডিক্যাল এসোসিয়েসন, ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব্ টিচার্স, ন্যাশনাল ফার্মার ইউনিয়ন, কনফেডারেশন অব্ ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রিস প্রধান।

দু শ্রেণীর চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্রিটেনের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি ত্রিমুখী প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে—ক. মন্ত্রী ও আমলাদের উপর, খ. পার্লামেন্টের উপর এবং গ. জনগণ ও জনমতের উপর। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী মন্ত্রী, আমলা ও পার্লামেন্টকে প্রভাবিত করে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। অন্যদিকে সংরক্ষণমূলক সংস্থাগুলি প্রচারের মাধ্যমে জনমতকে অনুকূলে আনার চেষ্টা করে। কোন কোন ক্ষেত্রে চাপসৃষ্টি গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় রাজনৈতিক দলগুলিও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

কাহাদের প্রভাবিত করে

আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণে আমলাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবার জন্য চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি নিজেদের স্বার্থরক্ষার প্রয়াস এখান থেকে শুরু করে। ব্রিটেনে আইন প্রণয়নের সময়ে এ আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট গোষ্টীর মতমত গ্রহণ করা

---

১. "Since 1689 we have had for all effective purpose, a single party in control of the state. It has been devided, no doubt, into two wings, (but) its quarrels······have always been family quarrels in which there has always been room for compromise."

হয় এবং এখান থেকেই এদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা শুরু হয়। এ প্রয়াস শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক (formal) পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, টেলিফোন করা, ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা, ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা করা ইত্যাদি সম্ভাব্য সকল ব্যক্তিগত প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। তবে রাজনৈতিক দলগুলি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রস্তাবের বিরোধী হলে দলীয় শৃঙ্খলার জন্য পার্লামেন্টের সদস্যরা ঐ গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার জন্য প্রকাশ্যে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে না।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রভাব থেকে বিরোধী দলও বাদ যায় না। যখনই দেখা যায় যে, বিরোধী দল সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে কোন শ্রেণীর স্বার্থের কিছু সুযোগ ছিনিয়ে এনেছে, খোঁজ করলে তখন দেখা যাবে যে কোন একটি স্বার্থগোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিরোধী পক্ষ এ কাজ করেছে। ব্রিটেনে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি কাকে, কখন এবং কীভাবে প্রভাবিত করে তা আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব নয়।

ব্রিটেনে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর এ ভূমিকা লক্ষ্য করে জনৈক সমালোচক এদের অধিকারকে রাজশক্তির অধিকারের সাথে তুলনা করে বলেছেন যে ব্রিটিশ রানীর মত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকারকে 'পরামর্শ' দান, উৎসাহ দান এবং সতর্ক করার' (the right to be consulted, the right to encourage and the right to warn) ক্ষমতার অধিকারী।

৬ ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা

THE JUDICIAL SYSTEM IN BRITAIN

বর্তমানে ব্রিটেনে যে বিচারব্যবস্থা প্রচলিত তার পত্তন ঘটেছিল অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগে। ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থা দুটি সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত : ১. বিচার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং ২. ন্যায় নিশ্চিত করার জন্য (আইন ও শাসনবিভাগীয় প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে) বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। নর্মান যুগে এবং বিশেষ করে দ্বাদশ শতকে ইংলণ্ড ও ওয়েলস-এ শক্তিশালী ও কেন্দ্রীভূত বিচারব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। এর পরে ধীরে ধীরে রাজশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বিচারবিভাগীয় স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৭০১ সালে *The Act of Settlement* দ্বারা স্থির হয় যে, পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের প্রস্তাব বাদে কোন বিচারককে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা যাবে না। ঐ আইন পাশের দ্বারা বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিত করা হয়।

৬-১. ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

Characteristics of the British Judicial System

ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনার আগে একটি বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য অনেক দেশে গতানুগতিক দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও বিচারবিভাগ দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। মার্কিন কংগ্রেস প্রণীত কোন আইন সংবিধান-বিরোধী হলে সেখানকার সুপ্রীম কোর্ট বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাকে বাতিল ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থায় আদালত এরূপ ক্ষমতা ভোগ করে না।

ব্রিটেনে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে পার্লামেন্ট চূড়ান্ত ক্ষমতা ভোগ করে। সেখানে পার্লামেন্ট প্রণীত আইন সংবিধানসম্মত কিনা তা বিচারের ক্ষমতা আদালতকে অর্পণ করা হয়নি। স্বভাবতই এজন্য ব্রিটিশ বিচারালয়কে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অভিভাবক বলা যায় না।

দ্বিতীয়ত, মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা। ব্রিটিশ সংবিধান লিখিত একটি দলিলে লিপিবদ্ধ নয়, তাই সংবিধান ব্যাখ্যার ব্যাপারে ব্রিটিশ আদালতের কোন ভূমিকা নেই। তবে ব্রিটিশ বিচারবিভাগ পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হলে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে ঐ ব্যাখ্যাকে বাতিল করতে পারে।

তৃতীয়ত, ব্রিটেনে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির অস্তিত্ব না থাকলেও মোটামুটিভাবে বিচারবিভাগ নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। বিচারকেরা মন্ত্রি-সভার সদস্য লর্ড চ্যান্সেলারের পরামর্শ অনুযায়ী রানী কর্তৃক নিযুক্ত হন, কিন্তু একবার বিচারক পদে নিযুক্ত হলে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে প্রস্তাব পাশ করেই একমাত্র বিচারকদের অপসারণ করা যায়। এ ব্যবস্থা বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা

রক্ষার সহায়ক হয়েছে, কারণ এ ব্যবস্থার ফলে বিচারকেরা শাসনবিভাগের প্রভাবমুক্ত থেকে দায়িত্ব পালন করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আজ পর্যন্ত ব্রিটেনে মাত্র একজন বিচারককে তহবিল তছরুপের দায়ে অপসারণ করা হয়েছে।

চতুর্থত, ব্রিটেনের বিচারকেরা যদিও শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে নন বা তাঁরা রাজনীতি-নিরপেক্ষ (uncommitted) নয় তা সত্ত্বেও মনে করা হয় যে, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূল্যবোধসঞ্জাত নিরপেক্ষতা ও সততা তাঁরা বজায় রেখে চলেন। স্যার আইভর জেনিংস বলেছেন যে দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব রাজনৈতিক প্রভাবের কোন অভিযোগ ব্রিটিশ বিচারকদের বিরুদ্ধে শোনা যায় না।

পঞ্চমত, ব্রিটেনের সর্বত্র একই প্রকার সুসংবদ্ধ (unified system) আদালত ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সেখানে ইংলণ্ড ও ওয়েলসের জন্য এক ব্যবস্থা, স্কটল্যাণ্ডের জন্য অন্য ব্যবস্থা, আবার উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা।

ষষ্ঠত, ব্রিটেনে সাধারণ বিচার ব্যবস্থাবহির্ভূত কোন প্রশাসনিক আদালত, বিশেষ আদালত বা সামরিক আদালত নেই। ব্রিটেনের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলেই একই আইন ও আদালতের অধীন।

সপ্তমত, ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থায় পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে কাজ করে। সমগ্র কক্ষ নয়, লর্ড চ্যান্সেলারের অধীনে নয়জন আপীল লর্ড সভার পক্ষ থেকে আপীলের বিচার করেন। ব্রিটেনে আইনসভা কর্তৃক সর্বোচ্চ আপীল আদালতের দায়িত্ব পালন করা একটি অভিনব ঘটনা।

৬·২. ব্রিটেনে বিচারবিভাগীয় সংগঠন
The Judicial Organisation in Britain

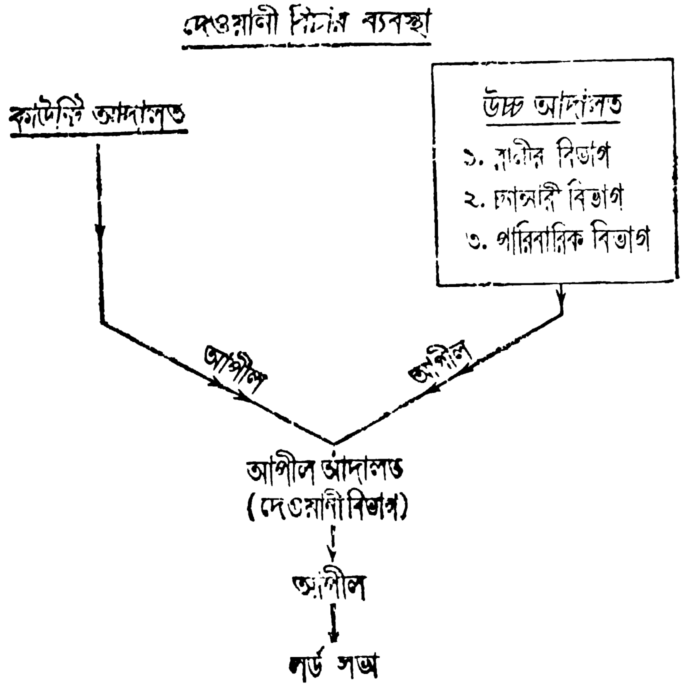
ব্রিটেনে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার এক্তিয়ারের ভিত্তিতে আদালতকে সংগঠিত করা হয়েছে। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলাকে আইনগত পদ্ধতি দ্বারা পার্থক্য করা হয়। কোন মামলার উদ্দেশ্য যদি হয় ক্ষতিপূরণ লাভ করা, তবে ঐ মামলাটি দেওয়ানী আদালতে যায়। অন্যদিকে আসামীকে শাস্তি দান করা উদ্দেশ্য হলে তা ফৌজদারী আদালতে বিচার্য। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপরাধ এবং সমাজের পক্ষ থেকে প্রার্থীত প্রতিকার ফৌজদারী আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত। অন্যদিকে ব্যক্তিগত দাবী-দাওয়া, অধিকার সংরক্ষণ এবং এর প্রতিকার দেওয়ানী আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত।

দেওয়ানী বিচার সংগঠন

দেওয়ানী বিচারব্যবস্থার সব চেয়ে নিম্নে অবস্থিত হল কাউন্টি কোর্ট। ঐ আদালতে সর্বোচ্চ এক হাজার পাউণ্ড অর্থের দাবী সংক্রান্ত মামলার বিচার হয়। কাউন্টি কোর্ট বিভিন্ন ধরনের দেওয়ানী মামলার বিচার করে এবং বেশির ভাগ দেওয়ানী মামলার সূত্রপাত হয় কাউন্টি কোর্টে।

দেওয়ানী মামলা কাউন্টি কোর্টে উত্থাপন না করে উচ্চ আদালতেও (High Court) উত্থাপন করা যায়। সাধারণত অল্প অর্থের দাবী সংক্রান্ত মামলা কাউন্টি আদালতে এবং খুব বেশি অর্থের দাবী সংক্রান্ত মামলা উচ্চ আদালতে উত্থাপন করা হয়।

উচ্চ আদালতের তিনটি বিভাগ আছেঃ ১. রানীর বিভাগ (Queen's Bench Division), ২. চ্যান্সারী বিভাগ (Chancery Division) এবং ৩. পারিবারিক বিভাগ (Family Division)—এখানে ইচ্ছাপত্র, বিবাহ বিচ্ছেদ ও নৌ-বিভাগ সংক্রান্ত বিচার করা হয়।



কাউন্টি আদালত ও উচ্চ আদালত থেকে দেওয়ানী মামলার আপীল করা হয় আপীল আদালতের দেওয়ানী বিভাগে (Court of Appeal, Civil Division)। ঐ আপীল আদালত এবং উচ্চ আদালতকে নিয়ে উর্ধ্বতন আদালত (The Supreme Court of Judicature) গঠিত। অর্থাৎ উর্ধ্বতন আদালত একটি আদালত নয়, আপীল আদালত এবং উচ্চ আদালতের সমন্বয়কে উর্ধ্বতন আদালত বলে।

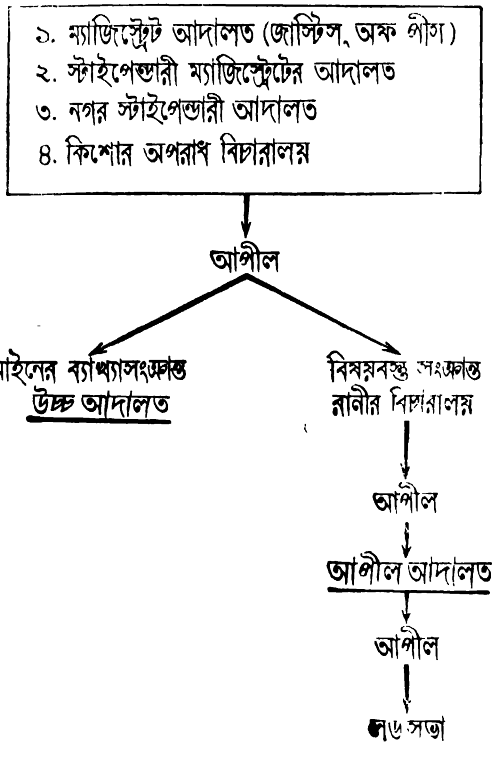
দেওয়ানী মামলার সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে কাজ করে লর্ড সভা। লর্ড সভার লর্ড চ্যান্সেলর এবং নয়জন আপীল লর্ড লর্ড সভার আপীল আদালত হিসেবে কাজ করেন।

ফৌজদারী বিচার সংগঠন

ফৌজদারী বিচার সংগঠনের সবচেয়ে নীচে ক্ষুদ্র দায়রা বিচার বা ম্যাজিস্ট্রেটের (Petty Sessional or Magistrate's Court) আদালত। ঐ আদালতে ছোট ছোট মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয় এবং এখানে জুরীর সাহায্য গ্রহণ করা হয় না।

ম্যাজিস্ট্রেট আদালত চার শ্রেণীর : ১. ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত (জাস্টিস অব পীস বিচার করেন), ২. স্টাইপেন্ডারী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত, ৩. নগর স্টাইপেন্ডারী আদালত এবং ৪. কিশোর অপরাধ বিচারালয়।

ফৌজদারী বিচার সংগঠন



আগে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের উপরে ত্রৈমাসিক দায়রা আদালত ও ভ্রাম্যমাণ আদালত ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে 'আদালত সংক্রান্ত আইন' (*The Courts Act*) দ্বারা এদের বিলোপ করা হয় এবং এর পরিবর্তে রানীর বিচারবিভাগ স্থাপন করা হয়। রানীর বিচারালয় (Crown Courts) গঠিত হয় উচ্চ বিচারালয়ের একজন বিচারপতি, একজন সার্কিট বিচারক ও একজন রেকর্ডার নিয়ে।

ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত থেকে উচ্চ আদালতের বিচারবিভাগে বা রানীর বিচারালয়ে আপীল করা হয়। আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে (on a point of law) আপীল হলে তা উচ্চ আদালতের রানীর বিচারবিভাগে এবং মামলার বিষয়বস্তুর ব্যাপারে (on a matter of fact) আপীল করলে তা রানীর বিচারালয়ে আপীল করা হয়।

রানীর বিচারালয় থেকে ফৌজদারী মামলার আপীল করা হয় আপীল আদালতের ফৌজদারী বিভাগে। রানীর বিচারবিভাগীয় আপীল আদালত যদি মনে করে যে

মামলার গুরুতর আইনের প্রশ্ন জড়িত, তবে লর্ড সভায় আপীল উত্থাপন করা যায়। এমনকি লর্ড সভার এরূপ ঘোষণায় (Certificate) ভিত্তিতেও লর্ড সভায় আপীল করা যায়।

ব্রিটেনে সুবিচার ও ন্যায়কে নিশ্চিত করার জন্য কয়েকটি নীতি অবলম্বন করা হয়ঃ ১. ব্রিটেনে বিচার ব্যবস্থায় গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয় না—জনগণের উপস্থিতিতে খোলা আদালতে বিচার কার্য সম্পন্ন হয়; ২. অভিযুক্তকে অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়; ৩. গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারী মামলায় জুরীর সাহায্যে বিচার করা হয়; ৪. ফরিয়াদী ও বাদী উভয় পক্ষই আইনবিদের সাহায্য গ্রহণ করার অধিকারী। ৫. দ্রুতবিচার ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষতা রক্ষা করা হয়।

সুবিচার নিশ্চিতার্থে কয়েকটি নীতি

কিন্তু ব্রিটেনের বিচার পদ্ধতি খুবই ব্যয় সাপেক্ষ বলে দরিদ্র ও সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায় বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে যে, বিচার ব্যবস্থা রাষ্ট্র-কাঠামো ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার একটা অংশ। তাই আমরা আগেই বলেছি যে, বিচারকদের পক্ষে শ্রেণী স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে ন্যায় বিচার করা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না, কারণ বিচারকেরা শ্রেণীস্বার্থ-নিরপেক্ষ নয়, শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (committed)।

ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থা আলোচনা শেষ করার আগে লর্ড চ্যান্সেলার সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। লর্ড চ্যান্সেলর লর্ড সভার সদস্য এবং তিনি ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একজন সদস্য। ব্রিটেনে আইনবিভাগীয় কোন মন্ত্রী নেই। লর্ড চ্যান্সেলরই মোটামুটিভাবে ঐ দায়িত্ব পালন করেন —যদিও তাঁকে কোন মতেই আইনমন্ত্রী বলা যায় না। তিনি সরকার ও বিচার-বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব পালন করেন। শাসন বিভাগীয় সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে লর্ড সভার আপীল আদালতে বিচারকার্য সম্পন্ন করতে হয়।

লর্ড চ্যান্সেলর

পরিশিষ্ট

ব্রিটেনে আইনানুমোদিত পাবলিক করপোরেশন

(Statutory Public Corporation in Britain)

সরকারী বিভাগ কর্তৃক সরকারী উদ্যোগ পরিচালনায় যে সকল ত্রুটি এবং দুর্বলতা দেখা যায় তা দূর করার জন্য বিকল্প সাংগঠনিক ব্যবস্থার অন্যতম হল পাবলিক করপোরেশন। সাম্প্রতিককালে পাবলিক করপোরেশন খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, যদিও একে একেবারে নতুন আবিষ্কৃত পরিচালন-পদ্ধতি বলা যায় না। ব্রিটেনে সরকারী প্রভাব থেকে মুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিশের শতকের প্রথম থেকেই দেখা যায়। বিগত পঞ্চাশ বছরে সেখানে পাবলিক করপোরেশনের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে (Public corporation is the most important constitutional innovation which has been evolved in Great Britain during the past fifty years)। সরকারী উদ্যোগ পরিচালনার জন্য যদিও অন্যান্য সাংগঠনিক ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু একথা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে পাবলিক করপোরেশনই সবচেয়ে উন্নত ব্যবস্থা। গ্লাডেন বলেছেন, "All political parties now accept the public corporation as being the appropriate instrument for operating state-owned undertakings requiring managements of a commercial or industrial character."

উৎপত্তির কারণ ও বিকাশ

সরকারের গতানুগতিক প্রশাসনিক কাজের মধ্যে যা পড়ে না—যা বিশেষীকৃত চরিত্রের (specialized nature), সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যা সম্পন্ন হ'তে পারে না—যার মধ্যে ব্যবসায়িক উপাদান আছে, সে সব ক্ষেত্রে পাবলিক করপোরেশন গঠন করাই যুক্তিসঙ্গত। যে সব শিল্প জাতীয়করণ করা হয়েছে সেগুলি সাধারণত পাবলিক করপোরেশন গঠন করে পরিচালিত করা হয়। কারণ সরকারী বিভাগের বাধা-ধরা নিয়মের আওতার বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে যাতে কাজ করতে পারে তার জন্যই ঐ সংস্থাগুলি গঠন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। রবসনের ভাষায় বলা যায়, "The underlying reason for the creation of the modern type of public corporation is the need for a high degree of freedom, boldness and enterprise in the management of undertaking of an industrial or commercial character and the desire to escape from the caution and circumspection which is considered typical of government department."

ব্রিটেনে যে সব শিল্পের জাতীয়করণ হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে পাবলিক করপোরেশন গঠন করে পরিচালনা করা হচ্ছে। এ ছাড়া সেখানে অন্যান্য নতুন নতুন ক্ষেত্রেও পাবলিক করপোরেশন গঠন করা হচ্ছে। যেমন, ব্রিটেনের বাইরে বিভিন্ন দেশে ব্রিটিশ কাউন্সিল (British Council), সংস্কৃতি ও শিল্প সংক্রান্ত ব্রিটিশ আর্টস কাউন্সিল (British Arts Council), মৎস্য শিল্পের জন্য 'ফিস্ অথরিটি' (The Fish Authority) ইত্যাদি বহু পাবলিক করপোরেশন গঠন করা হয়েছে।

সরকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতা এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ও নমনীয়তাকে পাবলিক করপোরেশনের মধ্যে রূপ দেয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট (President Roosevelt) বলেছেন যে, করপোরেশনগুলি সরকারী ক্ষমতার অধীনে থাকে, কিন্তু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের নমনীয়তা ও উদ্যোগ ভোগ করে (clothed with the power of government but possessed of the flexibility and initiative of a private enterprise)। পাবলিক করপোরেশনগুলির কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই ঐ উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

পাবলিক করপোরেশনের বৈশিষ্ট্য

১. পাবলিক করপোরেশনগুলি আইনানুমোদিত সংগঠন। বিশেষ আইনের দ্বারা এদের গঠন করা হয় এবং আইনের মধ্যে এদের উদ্দেশ্য, গঠন, কার্যাবলী, দায়িত্ব এবং সুযোগ-সুবিধার কথা বিধিবদ্ধ থাকে। সব কিছুই আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে এদের গঠন কাঠামো খুবই নমনীয়। আইনের সংশোধন না করে এদের পরিবর্তন করা যায় না।

২. আইনের চোখে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাই পাবলিক করপোরেশনের নামে এবং এদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যায় (to sue and being sued), এদের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করা যায়, এরা সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারে।

৩. আইন কর্তৃক ঘোষিত উদ্দেশ্যের বাইরে এরা কোন কাজ বা দায়িত্ব পালন করতে পারে না। নতুন কোন কাজ বা দায়িত্ব এদের হাতে অর্পণ করতে হলে ঐ অনুযায়ী আইন সংশোধন করতে হয়।

৪. সরকারী বাজেট দ্বারা এদের আয়-ব্যয় এবং আর্থিক ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হয় না। সরকারী বিভাগের আয় ও ব্যয় বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী চলে, কিন্তু পাবলিক করপোরেশনের ক্ষেত্রে ঐ ধরনের আর্থিক প্রশাসন আরোপ করা হয় না। এজন্য সরকারী তহবিল বা রাজকোষ হতে ব্যয় করলে যে সব আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয় সে সব আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ পাবলিক করপোরেশনের ক্ষেত্রে আরোপ করা হয় না।

৫. পাবলিক করপোরেশনের কর্মচারীদের সরকারী কৃত্যক থেকে নিযুক্ত করা হয় না।

৬. যদিও পাবলিক করপোরেশনের মৌল নীতি নির্ধারণে ক্যাবিনেট এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রির ভূমিকা থাকে এবং করপোরেশন আইনসভার নিয়ন্ত্রণমুক্ত নহে, তা সত্ত্বেও দৈনন্দিন প্রশাসন এবং সাধারণ নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে পাবলিক করপোরেশন ব্যাপক স্বাধীনতা ভোগ করে, যা সরকারের কোন বিভাগ ভোগ করার অধিকারী নয়।

৭. সরকারী কাজের মূল লক্ষ্য সেবা। যেমন, সরকারের পুলিশ বা কৃষি বিভাগ কোন প্রতিদানের আশা না করে সেবার কাজে নিযুক্ত। অন্যদিকে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হল মুনাফা অর্জন। পাবলিক করোপোরেশনগুলির মুনাফা অর্জন অবশ্যই লক্ষ্য—কিন্তু জনস্বার্থ দেখাও এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং মুনাফা অর্জন এবং জনস্বার্থ রক্ষা করা এ দুটি আপাত বৈষম্যমূলক প্রবণতার সংমিশ্রণ ঘটেছে পাবলিক করপোরেশন নামক সংস্থার মধ্যে। হার্বার্ট মরিসন

(Herbert Morrison) বলেছেন, "The Public Corporation must be no mere capitalist business, the be-all and end-all of which are profits and dividends even though it will quite properly be expected to pay its way"[১]

অধ্যাপক রবসন বলেছেন যে, সরকারী কার্যক্রম থেকে প্রশাসনকে স্বতন্ত্র রাখা, জাতীয় বাজেট থেকে আর্থিক ব্যবস্থাকে পৃথক্ করা, মুনাফা অর্জনের মনোভাব পরিত্যাগ করে জনসেবার দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠা করাই পাবলিক করপোরেশনের বৈশিষ্ট্য।

সুবিধা ও অসুবিধা

পাবলিক করপোরেশন গঠন করে সরকারী উদ্যোগ পরিচালনার যে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে তা আগের আলোচনা থেকে বোঝা গিয়েছে। প্রথমত, পাবলিক করপোরেশন একটি স্বায়ত্তশাসনমূলক নমনীয় প্রতিষ্ঠান। দৈনন্দিন প্রশাসন ও সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে এ মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এর আয়-ব্যয় এবং বাজেট সরকারী বাজেটের নিয়ন্ত্রণাধীন না থাকার জন্য এ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। অধিকতর স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে বলে গবেষণা ও নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এরা সাফল্য অর্জন করতে পারে। সরকারী লাল ফিতার বন্ধন না থাকার জন্য এগুলি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউনলো কমিটি (Brownlow Committee) পাবলিক করপোরেশনের মূল্যায়ন করে যথার্থই বলেছেন যে, কাজের স্বাধীনতা, নমনীয়তা, কার্যগত দক্ষতা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগের মধ্যেই পাবলিক করপোরেশনগুলির মূল্য নিহিত (Its peculiar value lies in freedom of operation, flexibility, business, efficiency and opportunity for experimentation)। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক প্রশাসকদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে না থাকার জন্য এ সব পাবলিক করপোরেশনগুলির নীতি, কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব খুব বেশি কাজ করে না। ফলে করপোরেশনগুলি স্বাধীনভাবে এবং যোগ্যতার সাথে কাজ করতে পারে। তৃতীয়ত, পাবলিক করপোরেশনের কর্মচারীদের সরকারী কৃত্যক থেকে নিয়োগ করতে হয় না বলে প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মচারী নিয়োগ, বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তিবিদ্ নিয়োগ, প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি ব্যাপারে এরা দ্রুত এবং কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। সরকারী বিভাগে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না এ অজুহাতে বছরের পর বছর পদ শূন্য থাকে এবং কাজ হয় না। পাবলিক করপোরেশনের ক্ষেত্রে এরূপ হবার সম্ভাবনা থাকে না।

সুবিধা

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাবলিক করপোরেশনের কিছু কিছু ত্রুটিও আছে। যেমন, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার এবং করপোরেশন উভয়ের মধ্যে কার কতটা এক্তিয়ার এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি এ সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু স্থির করা হয় না। সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে, সাধারণ বা মৌল নীতিসমূহ সরকার নির্ধারণ করবে এবং দৈনন্দিন নীতি নির্ধারণ করবে করপোরেশন। হানসন যথার্থই বলেছেন যে, কোথায় সাধারণ নীতি শেষ হচ্ছে এবং কোথা থেকে দৈনন্দিন নীতি শুরু

১, Socialisation and Transport—Herbert Morrison, P. 158.

হচ্ছে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। স্বভাবতই এ অবস্থায় পরস্পরের এক্তিয়ার নিয়ে বিরোধের সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। অনেক দেশে এ সব বিরোধের সূত্রপাত ঘটেছে। এ সব বিরোধের ফলে পাবলিক করপোরেশনগুলির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা দেখা দেয়— যার পরিণতি যোগ্যতা ও দক্ষতা হ্রাস।

ত্রুটি

আমরা পাবলিক করপোরেশনের যে অসুবিধার কথা আলোচনা করলাম তা সংশোধন এবং প্রতিবিধান করা সম্ভব। উপরে আলোচিত অসুবিধাগুলি থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, সরকারী উদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে পাবলিক করপোরেশন গঠন করা প্রয়োজন। অধ্যাপক রবসন বলেছেন, গণতন্ত্রের পক্ষে পাবলিক করপোরেশনগুলি অতি মূল্যবান সৃজনশীল সাফল্য। যে সব শিল্প জাতীয়করণ হয়েছে তা দর ক্ষেত্র বিশের শতকে এগুলি নিশ্চিতভাবে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শুধুমাত্র জাতীয়করণের ক্ষেত্রে নয়, নতুন নতুন সরকারী ক্রিয়াকর্ম এবং উদ্যোগের ক্ষেত্রেও এরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্বশীলতা

পাবলিক করপোরেশনকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকার এবং পার্লামেন্টের ভূমিকা আছে এবং উভয়ের নিকটই করপোরেশনের দায়িত্বশীলতা আছে। প্রথমে আমরা সরকারী নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করছি। আমরা আগে বলেছি যে পাবলিক করপোরেশনগুলি দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে, কিন্তু মৌল বিষয়গুলির ক্ষেত্রে এরা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। সরকার বা মন্ত্রিরা কি ভাবে পাবলিক করপোরেশনগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে তা নীচে আলোচনা করা হল:

সরকারী নিয়ন্ত্রণ

১. পাবলিক করপোরেশনগুলির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের বা ডাইরেকটারদের মনোনীত করেন। শুধুমাত্র নিযুক্ত করার অধিকার বড় নয়. সরকার এদের অপসারণও করতে পারেন। এ নীতি সব দেশেই অনুসৃত হয়। ভারতে পাবলিক করপোরেশন আইন অনুযায়ী এ সংস্থাগুলির সভাপতি. পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্য, ম্যানেজিং ডাইরেকটর, জেনারেল ম্যানেজার প্রভৃতিদের সরকার নিযুক্ত করেন। কোথাও কোথাও আর্থিক পরামর্শদাতাও (Financial Adviser) সরকার নিয়োগ করেন। উক্ত আইন অনুযায়ী সরকার দুর্নীতি, অযোগ্যতা বা কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাদের নিজ নিজ পদ থেকে অপসারণও করতে পারেন। পাবলিক করপোরেশনের নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পরিচালকমণ্ডলীর ঐ সব সদস্য এবং পরিচালকেরা। সুতরাং তাঁদের নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা দ্বারা সরকার করপোরেশনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পান।

২. সব পাবলিক করপোরেশনের মৌল নীতি প্রণয়ন করেন সরকার। আইন অনুযায়ী করপোরেশন পরিচালনার ব্যাপারে নীতি সংক্রান্ত নির্দেশ (Policy directives) দান করে সরকার। সরকার প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে ঐ নির্দেশ দিয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, করপোরেশনের কার্যাবলী এবং এদের অগ্রগতি সম্পর্কে সরকার যাতে ওয়াকিবহাল থাকতে পারে তার জন্য কিছুদিন অন্তর অন্তর করপোরেশন-

গুলিকে বিভিন্ন খবরাখবর সংক্রান্ত রিপোর্ট (Report), রিটার্ন, স্টেটমেন্টও (Statement) পেশ করতে হয়। যে কোন বিষয় জানার জন্য সরকার করপোরেশনের কাছে খবরাখবর চেয়ে পাঠাতে পারে। ঐ সব রিপোর্ট বা খবরাখবরের ভিত্তিতে সরকার করপোরেশনগুলিকে প্রয়োজনী নির্দেশ দিতে পারে।

৩. করপোরেশনের আর্থিক ব্যাপারে সরকারী কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী তদারকি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। মূলধন বৃদ্ধি, নতুন শেয়ার বণ্টন, ঋণ গ্রহণ, নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত মূলধনী ব্যয় করা, কোম্পানি তুলে দেওয়া, উচ্চবেতনভুক কর্মচারী নিয়োগ করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমতি আগেই নিতে হয়। অর্থ দপ্তরও পরিচালকমণ্ডলীতে নিজের প্রতিনিধি এবং আর্থিক উপদেষ্টার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। কোন কোন ক্ষেত্রে অডিটর জেনারেলের দপ্তর দ্বারা পাবলিক করপোরেশনের হিসাব পরীক্ষা করাবার নিয়ম আছে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলির দ্বারা পাবলিক করপোরেশনের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে অনেক সময় পাবলিক করপোরেশনগুলির ক্ষমতা হ্রাস পায় বলে মনে করা হয়। একথা হয়তো ঠিক। কিন্তু পাবলিক করপোরেশনকে পুরোপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখাও সম্ভব নয়। কারণ সরকারী উদ্যোগের সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। নিয়ন্ত্রণের অধিকার না থাকলে দায়িত্বশীল থাকা সম্ভব হয় না। তবে ঐ নিয়ন্ত্রণ যত কম করা যায়, ততই ভাল।

ব্রিটেন, ভারত ইত্যাদি সংসদীয় গণতন্ত্রে পার্লামেন্টই হল সব রকম জনস্বার্থের অভিভাবক এবং সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কেন্দ্র। পাবলিক করপোরেশন তাদের কাজের জন্য সরকারের কাছে দায়ী থাকে এবং সরকারের জবাবদিহি করার দায়িত্ব থাকে পার্লামেন্টের কাছে। সুতরাং সরকারী উদ্যোগের ব্যাপারে সরকারী নিয়ন্ত্রণই চরম নয়, বরং পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণই শেষ কথা। তাই অনেকে মনে করেন যে, সরকারের নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট নয়—পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ না থেকে শুধুমাত্র মন্ত্রিসভার যদি এ ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে তবে কোথাও কোথাও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চরম শিথিল হতে পারে, আবার কোথাও কোথাও নিয়ন্ত্রণের আধিক্যে সরকারী উদ্যোগগুলির প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে পারে। পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল থাকলে করপোরেশনের এরূপ হবার সম্ভাবনা থাকে না। অ্যাপেলবি কাব্যিক ভাষায় তাই বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পাবলিক করপোরেশনের মাতারূপ পার্লামেন্টকে না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত পিতারূপ মন্ত্রিসভার হাতে একে সমর্পণ করা উচিত নয়। কারণ মন্ত্রিসভা পিতৃত্বের দাবি নিয়ে শৃংখলা রক্ষা করতে গিয়ে যাতে আধিক্য না ঘটায় তা দেখার জন্য মাতারূপ পার্লামেন্টের থাকা প্রয়োজন।

সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ

এবার দেখা যাক সংসদীয় গণতন্ত্রে পাবলিক করপোরেশনগুলির উপরে পার্লামেন্ট কি কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। প্রথমত, যে আইনের মাধ্যমে পাবলিক করপোরেশনটির উদ্ভব ঘটে সে আইনটি পার্লামেন্ট পাশ করে। প্রতিটি করপোরেশন

গঠনের সময়ে পার্লামেন্টকে স্বতন্ত্র আইন পাশ করতে হয়। পার্লামেন্ট প্রণীত আইন দ্বারাই করপোরেশনের জন্ম হয় এবং এখান থেকেই পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়।

দ্বিতীয়, সরকারী উদ্যোগ সম্পর্কে একটি পার্লামেন্টারী কমিটি (Parliamentary Committee on Public Enterprises) আছে। ঐ কমিটির মাধ্যমেও পার্লামেন্ট পাবলিক করপোরেশনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হচ্ছে।

তৃতীয়ত, পাবলিক করপোরেশন সম্পর্কে পার্লামেন্টে আলোচনার মাধ্যমে পার্লামেন্ট এগুলিকে নিয়ন্ত্রণে প্রয়াসী হয়। পাবলিক করপোরেশনগুলির বাৎসরিক রিপোর্ট পার্লামেন্টে উপস্থিত করা হয় এবং রিপোর্ট নিয়ে পার্লামেন্টে আলোচনা হয়। পার্লামেন্টের সদস্যগণ পার্লামেন্টে প্রশ্ন করার সময়ে প্রশ্ন করে, দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রস্তাব তুলে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরের জন্য বাজেট আলোচনা করে এবং প্রতি বছর রাষ্ট্রপ্রধান পার্লামেন্টে যে ভাষণ দেন সে ভাষণ সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে পাবলিক করপোরেশন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন। ঐ সব আলোচনার মধ্য দিয়ে পাবলিক করপোরেশন সম্পর্কে অভাব-অভিযোগ উত্থাপন করার সুযোগ পাওয়া যায়। পার্লামেন্টের ঐ সব আলোচনা সরকারী উদ্যোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। কারণ ঐ সব অভিযোগ এবং আলোচনার ভিত্তিতে সরকারী উদ্যোগগুলির দোষত্রুটি প্রতিবিধানের চেষ্টা করা হয়।

সরকারী উদ্যোগ সংক্রান্ত পার্লামেন্টারী কমিটি

ব্রিটেনে সরকারী উদ্যোগগুলি দেখাশোনার জন্য একটি পার্লামেন্টারী সিলেক্ট কমিটি (Select Committee) গঠনের দাবি উত্থাপিত হওয়ায় এরূপ কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এবং প্রয়োজনীয়তা থাকলে তার গঠন ও কার্যাবলী কি হবে ঐ সব বিষয় পর্যালোচনার জন্য পার্লামেন্ট একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি ১৯৫৩ সালে রিপোর্ট পেশ করে এবং এই রিপোর্টে সরকারী উদ্যোগের জন্য সিলেক্ট কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়। ঐ সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯.. সালে ব্রিটেনে সিলেক্ট কমিটি (Select Committee for nationalized industry) গঠন করা হয়। ব্রিটেনে ঐ কমিটি মোটামুটি সন্তোষজনক ভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করে চলেছে এবং কমিটির কাজকর্ম পার্লামেন্টের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

সরকারী উদ্যোগগুলির জন্য পার্লামেন্টারী কমিটিকে যে কাজকর্ম সম্পন্ন করতে হয় তা নীচে আলোচনা করা হ'ল:

কমিটির কার্যাবলী

১. সরকারী উদ্যোগের হিসেব ও রিপোর্ট পরীক্ষা করা; ২. কোন সরকারী উদ্যোগ সম্পর্কে কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেলের (Comptroller and Auditor General) যদি কোন রিপোর্ট থাকে তবে তা বিবেচনা করা;

৩. সরকারী উদ্যোগের স্বায়ত্তশাসনের (Autonomy) অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী উদ্যোগগুলি যথার্থ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে (sound business principles) এবং বিজ্ঞোচিত ব্যবসায়িক পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা বিচারবিবেচনা করা;

৪. সরকারী হিসেব পরীক্ষা কমিটি, ব্যয় পরীক্ষা কমিটি এবং লোকসভার স্পীকার (Speaker) কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করা।

আইন অনুযায়ী ঐ কমিটি নিম্নলিখিত ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা করতে পারবে না: (ক) সরকারী উদ্যোগ সংক্রান্ত সরকারের মৌল নীতি সম্পর্কে; (খ) করপোরেশনের দৈনন্দিন প্রশাসন সম্পর্কে; (গ) যে সব বিষয় বিবেচনার জন্য আইন অনুযায়ী স্বতন্ত্র সংস্থা গঠন করা হয়েছে, সে সকল বিষয়ে।

সরকারী উদ্যোগ সংক্রান্ত পার্লামেন্টারী কমিটি এর উপরে ন্যস্ত ক্ষমতাবলে পাবলিক করপোরেশনগুলিতে নিয়ন্ত্রণের কার্যকর অধিকার লাভ করেছে।

নমুনা প্রশ্ন

প্রথম অধ্যায়

1. Discuss the sources of the British Constitution.
   [ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার উৎসগুলি আলোচনা কর।] (পৃঃ ১৯—২২)
   (C. U. '81)
2. Does the British Constitution exist ?
   [ব্রিটিশ সংবিধানের অস্তিত্ব আছে কি ?] (পৃঃ ২৩—২৫)
3. Discuss the salient features of the British Constitution.
   [ব্রিটিশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।] (পৃঃ ২৫—৩০)
   (C. U. '69, '74, '76 and 82.)
4. Discuss the nature of the Parliamentary Sovereignty in Britain. [ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতার প্রকৃতি আলোচনা কর।]
   (পৃঃ ৩০—৩৩)
5. 'The British system of Govt. is at once a Monarchy, Aristocracy and Democracy'.—Discuss. ["ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ"—আলোচনা কর।]
   (পৃঃ ৩৬—৩৮)
6. Critically Discuss Dicey's Theory of the Rule of Law.
   [ডাইসীর আইনের অনুশাসন তত্ত্ব আলোচনা ও মূল্যায়ন কর]
   (পৃঃ ৩৩ – ৩৬) (C. U. '63, B. U. Hons. '80)
7. Critically examine the nature and importance of the Rule of Law in the British Political system.
   [ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আইনের অনুশাসনের প্রকৃতি ও গুরুত্ব আলোচনা কর। (পৃঃ ৩৩—৩৬) [B. U. Hons. '82]
8. "The Rule of Law in Great Britain involves the absence of arbitrary power"—Elucidate. [ব্রিটেনের আইনের অনুশাসনের ধারণার সাথে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার অনুপস্থিত জড়িত"—বিশ্লেষণ কর।
   (পৃঃ ৩৩– ৩৬) (C. U. 67)

9. Discuss the nature and importance of the Conventions of the British Constitution. Why are they obeyed ?
[ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রকৃতি আলোচনা কর। এদের মান্য করা হয় কেন ?] (পৃঃ ৩৮– ৪৫) (C U. '66, B. U. Hons. '80)

10. What do you mean by the conventions of the constitution ? Classify the British constitutional conventions. [সাংবিধানিক রীতিনীতি কাকে বলে ? ব্রিটেনে প্রচলিত সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলির শ্রেণীবিভাগ কর] (পৃঃ ৩৮ ৪৫)

11. Distinguish between Law and Conventions. Why are the conventions obeyed ? [আইন ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি কেন মান্য করা হয় ?]
(পৃঃ ৩৮ ৪৫)

12. Define the nature of the conventions in Great Britain and discuss why are they obeyed. [সাংবিধানিক রীতিনীতির সংজ্ঞা দাও এবং উহাদের মান্য করা হয় কেন আলোচনা কর।]
(পৃঃ ৩৮—৪৫) (B. U. '82)

13. Write a note on conventions of the British constitution.
[ব্রিটিশ সংবিধানের রীতিনীতি সম্পর্কে টীকা লিখ।] (পৃঃ ৩৮—৪৫)
(C. U. '80)

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

1. Write a note on each of the following : Magna Carta, Magnum Concilium, Permanent Council, Model Parliament and Bill of Rights. [নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি সম্পর্কে টীকা লিখ : মহাসনদ, বৃহত্তর পরিষদ, স্থায়ী পরিষদ, মডেল পার্লামেন্ট, অধিকারের সনদ।] (পৃঃ ১৬—১৯)

2. Name few historical Charters as the sources of British Constitution. [ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস হিসাবে কয়েকটি ঐতিহাসিক সনদের নাম লিখ।] (পৃঃ ১৯—২২)

3. Discuss two inportant sources of British Constitution;
(পৃঃ ২০—২১) (B. U. '82)

4. Why is the British Constitution called an unwritten Constitution ? [ব্রিটিশ সংবিধানকে কেন অলিখিত বলা হয় ?] (পৃঃ ২৬—২৭)
[B. U. '80]

5. Discuss the importance of Judicial decisions as a source of the British Constitution. [ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস হিসাবে বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের গুরুত্ব আলোচনা কর।] (পৃঃ ২১)

6. **Write a note on Common Law**
[প্রথাগত আইনের উপর টীকা লিখ।] (পৃঃ ২২)
7. **State any two of the salient features of the British Constitutions.** [ব্রিটিশ সংবিধানের যে কোন দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।]
(পৃঃ ২৫—৩০) (B. U. Hons '80)
8. **Does the theory of separation of powers operate in the British system of Govt.** [ব্রিটিশ সরকারী ব্যবস্থায় কী ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি প্রয়োগ করা হয় ?] (পৃঃ ২৮—২৯)
9. **Write a note on Crowned Republic.**
[রাজকীয় প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে টীকা লিখ।] (পৃঃ ৩০)
10. **Is British Parliament Sovereign ?**
[ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কী সার্বভৌম ?] (পৃঃ ২৯—৩০)
11. **Mention the three principles of the Rule of Law as enunciated by Dicey.** [ডাইসীর প্রদত্ত আইনের অনুশাসনের তিনটি সূত্রের উল্লেখ কর।] (পৃঃ ৩৪)
12. **Distinguish between Law and Conventions.**
[আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও]
(পৃঃ ৩৯—৪০) (B. U. '81 and B. U. Hons. '81)
13. **Name few Constitutional conventions as found in the British system of Govt.** [ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার কয়েকটি সাংবিধানিক রীতি-নীতির নাম কর।] (পৃঃ ৪০—৪১)

দ্বিতীয় অধ্যায়

1. **Explain the following maxims : (a) The king is dead, long live the king, (b) The king can do no wrong, (c) The king reigns, but does not rule.** [নিম্নলিখিত প্রবাদগুলি ব্যাখ্যা কর : (ক) রাজার মৃত্যু হইয়াছে, রাজা দীর্ঘজীবী হউক, (খ) রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন না, (গ) রাজা রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না।] (পৃঃ ৪৬-৪৮) (B. U. '63, B. U. Hons '80)
2. **Discuss the nature and importance of the Royal Prerogatives**
[রানীর বিশেষাধিকারের প্রকৃতি ও গুরুত্ব আলোচনা কর।] (পৃঃ ৪৮-৫১)
3. **Discuss the Powers and functions of the Monarchy in the British political system.**
[ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক রাজশক্তির ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা কর।] (পৃঃ ৪৮—৫৬) (B. U. Hons '81)
4. **Discuss the powers and position of the Crown in the British Constitutional System.** [ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজশক্তির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর।] (পৃঃ ৫৩-৫৬) (C. U. 68, 71, 75, 80 '82)

5. Estimate the Role and Powers of the Crown in Britain.
   [ব্রিটেনে রাজশক্তির ক্ষমতা ও ভূমিকার মূল্যায়ন কর ।] (পৃঃ ৫৩—৫৬)
6. Discuss the reasons for the survival of Monarchy in Britain.
   [ব্রিটেনে রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকিবার কারণগুলি আলোচনা কর ।]
   (পৃঃ ৫৬—৫৯) (N. B U. '63, B. U, '66, '80)
7. Make a comparative study between the position and powers of the British Prime Minister and those of the President in U. S. A [মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সাথে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও সাংবিধানিক ভূমিকার তুলনা কর] (মার্কিন সংবিধান দেখ) (C. U. '81)

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

1. Distinguish between the Queen as a person and the Crown as an Institution.
   [ব্যক্তি হিসাবে রানী ও সংস্থা হিসাবে রাজশক্তির মধ্যে পার্থক্য দেখাও ।
   (পৃঃ ৫৩) (B. U. '81)
2. How will you distinguish between the Queen and the Crown?
   [রাজপদ ও রাজতন্ত্রের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করবে ?] (পৃঃ ৪৬)
3. Write a note on : The king is deal, long live the king or The king can do no wrong. [টীকা লিখ : রাজার মৃত্যু হইয়াছে, রাজা দীর্ঘজীবী হউক অথবা রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন না ।] (পৃঃ ৪৬-৫৭)
4. What is meant by the Prerogatives of the Crown? Name two such prerogatives. [রাজপদের বিশেষাধিকার বলিতে কী বুঝ ? দুইটি বিশেষাধিকারের নাম লিখ ।] (পৃঃ ৪৮-৫৯) (B. U. Hons '81)
5. What are the Legislative Powers of the Queen?
   [রানীর আইন সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি কি কি ?] (পৃঃ ৫২)
6. Name four major reasons for the survival of Monarchy in Britain. [ব্রিটেনে রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকিবার প্রধান চারটি কারণ উল্লেখ কর ।] (পৃঃ ৫৬-৫৯) (B. U. '80, B. U. Hons '82)

তৃতীয় অধ্যায়

1. What constitutes the 'Executives' in Britain? Discuss its relation with the Legislature. [ব্রিটেনে কাহাদের লইয়া শাসন-বিভাগ গঠিত ? ইহার সহিত আইন বিভাগের সম্পর্ক আলোচনা কর ।]
   (পৃঃ ৬০, ৭২-৭৩) (C. U. '62, B. U. '63, '65)
2. Discuss the origin, composition, functions and usefulness of the Privy Council. [প্রিভি কাউন্সিলের উৎপত্তি, গঠন এবং কার্যাবলী আলোচনা কর ।] (পৃঃ ৬১-৬২) (C. U. '64)
3. Discuss the composition and functions of the British Cabinet.
   [ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের গঠন এবং কার্যাবলী আলোচনা কর ।] (পৃঃ ৬২-৬৫)

4. **Discuss the Principles of the British Cabinet System.**
[ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার নীতিগুলি আলোচনা কর।]
(পৃঃ ৬৫-৬৭) (C. U. '82)

5. Discuss the theory of Ministerial Responsibility. How is it ensured in Britain ? [ব্রিটেনে মন্ত্রিসভার দায়িত্বের তত্ত্ব আলোচনা কর। কীভাবে ইহা কার্যকর করা হয় ?] (পৃঃ ৬৮-৭২) (C. U. '66)

6. Discuss the characteristics of the British Cabinet.
[ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।]
(পৃঃ ৬৫-৬৭) (C. U. '70, '72, '80)

7. Write a note on the Cabinet Dictatorship in Britain. [ব্রিটেনে ক্যাবিনেট নায়কতন্ত্র সম্পর্কে টীকা লিখ।] (পৃঃ ৬৯ ৭২) (C U. Hons '80)

8. Examine the factors responsible for the gradual increase of control of the Cabinet over the House of commons in Britain. (পৃঃ ৬৯-৭২ এবং ১২৬-২৮) (B. U.Hons '81)

9. Discuss the powers and position of the British Prime Minister.
[ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর।]
(পৃঃ ৭৭-৮৪) (B. U. '81)

10. Discuss the powers and constitutional position of the British Prime Minister. Explain the importance of the office of the Prime Minister. [ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও সাংবিধানিক মর্যাদা আলোচনা কর। প্রধানমন্ত্রীর পদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।] (পৃঃ ৭৭-৮৪) (B. U. Hons '81)

11. 'The office of the Prime Minister is what its holder chooses to make it.' Examine the statement. ["ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পদের গুরুত্ব পদাধিকারীর উপর নির্ভর করে।"—আলোচনা কর।] (পৃঃ ৮৪-৮৫)

12. Is the British Prime Minister the supreme figure in the Cabinet ? (পৃঃ ৭৭-৮৪) (B. U. Hons 80)

13. Discuss the relation between the Executive and the Legislature in England. [ব্রিটেনে শাসনবিভাগের সঙ্গে আইনবিভাগের সম্পর্ক আলোচনা কর। (পৃঃ ৭২-৭৪)

14. Discuss the relation between the British Cabinet and Parliament. How does Parliament Control the Cabinet ? [ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সঙ্গে পার্লামেন্টের সম্পর্ক আলোচনা কর। পার্লামেন্ট কী ভাবে ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে ?] (পৃঃ ৭২-৭৪) (B.U. '63, C. U)

15. Why is the British System of Government called Prime Ministerial Government ? [ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রীর সরকার কেন বলা হয় ?] (পৃঃ ৭৭– ৮৪)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

১ ঐতিহাসিক পটভূমিকা
Historical Background

এক ঃ দেশ ও জনগণ (**Land and the People**)

পৃথিবীর সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি উল্লেখযোগ্য নাম। রাষ্ট্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব মাত্র দু'শ বছরের কিছু বেশী। এই অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশটি বিশ্বরাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন দিকে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর্থিক সম্পদ, সামরিক শক্তি, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের এক চরম স্তরে উপনীত হয়েছে। বিবদমান শিবিরে বিভক্ত বিশ্বশক্তিগুলোর একাংশের নেতৃত্ব দিচ্ছে বর্তমান শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই বিশাল দেশটি উদারনৈতিক গণতন্ত্রের রাজনৈতিক পরিবেশে বুর্জোয়া আর্থিক ব্যবস্থা কায়েম করেছে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বিকশিত করার উপযোগী সংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সংবিধানের যে কোন ছাত্রের কাছে মার্কিন সংবিধান, সেখানকার আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১৭৮৯ সালে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে যখন মার্কিন সংবিধান রচনা করা হয় তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল চল্লিশ লক্ষ এবং ভূখণ্ড ছিল ৮৯০ বর্গমাইল। কিন্তু অন্যান্য মহাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক লোকের আগমন এবং জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে বর্তমানে তা দাঁড়ায় ১৯৪ মিলিয়ন। পাশাপাশি অনেক উপনিবেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের ফলে মার্কিন ভূখণ্ডের পরিমাণ বেড়ে হয় ৩·৬ মিলিয়ন বর্গমাইল। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম দেশ। তবে ভূমির অনুপাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা অনেক কম। যেখানে ব্রিটেনের প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা ৫৭৫ জন, সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বর্গ মাইলে বাস করে মাত্র ৫৩ জন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদি অধিবাসী হ'ল সেখানকার নিগ্রো সম্প্রদায়। তবে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এদের ভূমিকা স্বীকৃত নয়। বিদেশ থেকে এসে যারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তাদের বংশধরেরাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার সংখ্যাধিক্য এবং এরাই সেখানকার রাষ্ট্রীয় জীবনের চালিকাশক্তি। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত জাতি (A nation by immigrants) নামে অভিহিত করা হয়। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্য, জার্মানী এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলো থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ এসে মার্কিন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এর পরে ইতালী এবং ইউরোপের উত্তর ও পূর্বাঞ্চল

থেকে বিভিন্ন জাতির লোকের আগমন ঘটে। বিদেশ থেকে এ দেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের জনস্রোত বন্ধ করার জন্য ১৯২১ সালে *Quota system* চালু করা হয়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের জন্য নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী প্রতি বছর এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার বিদেশীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার দেওয়া হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার বেশীর ভাগই হল শ্বেতকায়, তবে অশ্বেতকায়দের সংখ্যাও উপেক্ষণীয় নয়। ১৭৯০ সালে সেখানকার মোট চল্লিশ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে নিগ্রোদের সংখ্যা ছিল প্রায় আট লক্ষ। এদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই ছিল ক্রীতদাস। ১৯৬০ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় যে, সেখানে নিগ্রোদের সংখ্যা প্রায় উনিশ লক্ষ। নিগ্রো ছাড়াও আছে অন্যান্য অশ্বেতকায় সম্প্রদায়ের ষোল লক্ষ মানুষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে শতকরা নব্বই জন হ'ল খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী—শতকরা ষাট জন প্রোটেস্ট্যান্ট এবং শতকরা ত্রিশ জন রোমান ক্যাথলিক।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মানুষকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠায় এখানে বিভিন্ন আচার, দৃষ্টিভঙ্গী এবং ধ্যান-ধারণার অস্তিত্ব দেখা যায়। এই জন্য মার্কিন সমাজকে বহু বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজ (Pluralistic Society) নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দাবী করা হয় যে, মার্কিন জনগণের মধ্যে সরকার, আদর্শ, শাসনব্যবস্থা এবং সমাজজীবন সম্পর্কে মোটামুটি একটা মতৈক্য দেখা যায়। এর কারণ মার্কিন জনগণের ব্যাপক অংশই ব্রিটিশ রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের অংশীদার। ঐ উত্তরাধিকারের জন্যই মার্কিন জনগণ মোটামুটিভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, সীমিত সরকার, জনগণের সার্বভৌমত্ব, স্বায়ত্তশাসনমূলক স্থানীয় প্রশাসন ইত্যাদি ব্যাপারে মতৈক্য পোষণ করে। তাই ব্রিটিশ রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে আশ্রয় করে মার্কিন দেশে শ্বেতকায় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা জাতিগত সত্তা গড়ে উঠেছে এবং বহু অনৈক্য ও পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও ঐক্যময় সামাজিক পরিমণ্ডলী গড়ে উঠে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে।

দুই: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠার ইতিহাস (Emergence of United States of America)

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ১৭৮৯ সালে জাতি এবং রাষ্ট্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকস্মিকভাবে আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জীবনে ১৭৮৯ সাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা জাতি হিসেবে মার্কিন জাতিকে গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে ১৭৮৯ সালের অনেক আগে থেকেই।

সম্ভবত দশম শতকেই প্রথম বিদেশ থেকে আগত অধিবাসীরা উত্তর আমেরিকায় পাড়ি জমাতে শুরু করে। এই সময় স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলো থেকে ভিংকিংসরা এসে নিউ ইংল্যাণ্ডের আশেপাশে বসতি গড়ে তোলে। এর পরে স্পেন, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড এবং পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে জনগণ এসে আতলান্তিক মহাসাগরের

নিকটবর্তী এলাকায় উপনিবেশ গড়ে তোলে। ইউরোপের দেশগুলো থেকে এবং বিশেষ করে ইংলণ্ড থেকে যারা এসে উপনিবেশ গড়ে তোলেন তারা সঙ্গে নিয়ে আসেন নিজ নিজ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং সরকার গঠন ও পরিচালনার ঐতিহ্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা। ঐ অভিজ্ঞতাকেই মূলধন করে বিভিন্ন উপনিবেশে সরকার গঠন করা হয় —কোথাও ব্রিটিশ রীতিকে অনুসরণ করে, আবার কোথাও ফরাসী বা স্পেন বা ওলন্দাজ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে। এইভাবে আতলান্তিক সাগরের উপকূলে তেরটি উপনিবেশ এবং ঔপনিবেশিক সরকার গঠিত হয়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক জনগণ উত্তর আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করার কারণ বিভিন্ন। কোন একটি দেশ নয়, পশ্চিম ইউরোপের অনেকগুলো দেশ থেকে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ ১৩টি উপনিবেশ ছড়িয়ে পড়ার ফলে এদের আচার-আচরণ, চিন্তাধারা এবং সরকার সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে অভিন্নতা ছিল না—বরং বৈচিত্র্য এবং পার্থক্যই ছিল বেশী। তা সত্ত্বেও উপনিবেশগুলোতে মোটামুটিভাবে ব্রিটিশ ধাঁচকে অনুসরণ করে সরকার গঠিত হয়, যদিও এ ব্যাপারে একটির সঙ্গে অন্যের ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, নিউ ইংলণ্ড প্রভৃতি উপনিবেশগুলোতে শহর ভিত্তিক সরকার গঠন করা হয়, অন্যদিকে কৃষি নির্ভরশীল দক্ষিণের উপনিবেশগুলোতে কাউন্টিকে ভিত্তি করে সরকার সংগঠিত হয়। যাহোক, ঐ আদি ১৩টি উপনিবেশগুলোতে বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা ঐক্যধারা পরিলক্ষিত হয়।

উপরোক্ত উপনিবেশগুলোর মধ্যে পাঁচ-ছটি বাদে অন্য সব কটি উপনিবেশের ওপর ব্রিটিশ সরকারের প্রভাব ছিল ব্যাপ্ত। এরা ইংলণ্ডের রাজার কাছ থেকে যথাযোগ্য সনদ লাভ করে আমেরিকায় ইংরেজ উপনিবেশ গড়ে তোলে। এগুলোতে ইংলণ্ডের রাজার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলণ্ডের রাজা এগুলোর জন্য গভর্ণর নিযুক্ত করতেন। যে সব উপনিবেশে প্রথম দিকে ইংলণ্ডের রাজার নিয়ন্ত্রণ ছিল না সেগুলোও ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসে এবং ইংরেজ উপনিবেশে পরিণত হয়। প্রতিটি উপনিবেশেই আইনসভাও স্থাপিত হয় এবং সর্বত্রই প্রায় একই ধরনের আইন ও বিচার-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

ইংরেজ উপনিবেশ হিসেবে এই তেরটি উপনিবেশ আত্মপ্রকাশ করলেও নিজেদের অধিকার কর্তৃত্ব, স্বাধিকার এবং স্বার্থ সম্পর্কে এরা ছিল সচেতন। ইংলণ্ডের রাজার আশ্রিত ও অনুগত উপনিবেশ হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এরা উৎসাহী ছিল না। মাতৃভূমির স্বার্থরক্ষার নামে ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার চেয়ে নিজ নিজ অঞ্চলের স্বার্থরক্ষার চিন্তাই এদের ভাবিত করে। অন্যদিকে ইংলণ্ডের সরকার ও সরকারী কর্মচারীরা এদের মাতৃভূমির অধীন ও আশ্রিত উপনিবেশ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং ঐ মানসিকতা নিয়েই তাদের সঙ্গে আচরণ করতে থাকে। ফলে ইংলণ্ডের সঙ্গে এদের সম্পর্কের ক্রমশ অবনতি ঘটে এবং সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেয়। অনেকে মনে করেন যে, ঐ উপনিবেশ-গুলোর প্রতি ইংলণ্ডের সরকারের নির্দয়, স্বৈরাচারী এবং সহানুভূতিহীন আচরণই এদের মধ্যে সংঘাতের পটভূমি ও মানসিকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু অন্যদিকে অনেকে

ব্যাখ্যা করেন যে, উপনিবেশগুলো বিপুল পরিমাণ স্বায়ত্তাধিকার ভোগ করতো এবং ব্যাপক স্বাধীনতাভোগের মানসিকতাই তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার প্রচেষ্টায় অসহনীয় মনোভাবের সৃষ্টি হয়—এরই পরিণতিতে উপনিবেশের জনগণ ইংলণ্ডের সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং বিপ্লবের পটভূমিকা রচিত হয়।

ব্রিটিশ সরকারের আশ্রিত হলেও, এই উপনিবেশগুলো ব্যাপক ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী ছিল। ব্রিটিশ সরকার উপনিবেশগুলোর ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করার জন্য প্রয়াসী হয়। তারা সৈন্য পাঠিয়ে উপনিবেশগুলোর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তাদের মোতায়েন করে। ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধি-নিষেধকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সরকার আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, উপনিবেশগুলোর প্রশাসনের জন্য যে ব্যয় হয় তার একটা অংশ উপনিবেশের জনগণের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে তারা তাদের ওপর কয়েকটি কর ধার্য করে। কিন্তু উপনিবেশগুলোর জনগণ কর ধার্যের প্রস্তাবকে নীতিগতভাবে আপত্তি জানায়। তারা বলেন, যে আইনসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব নেই, সেই আইনসভা তাদের ওপর কোন কর ধার্য করতে পারে না (no taxation without representation)। তাদের বক্তব্য হ'ল যে একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা এবং সরকারই কর ধার্যের অধিকার ভোগ করে। সুতরাং শুধু কর আরোপ করাই নয়, উপনিবেশগুলোর জনগণের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইন প্রণয়নের অধিকারকেও তারা চ্যালেঞ্জ জানান এই যুক্তিতে যে সেখানে তাদের কোন প্রতিনিধি নেই। আমেরিকার উপনিবেশগুলোকে সংরক্ষণের নামে সেখানে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর ক্রমবর্ধমান অবস্থিতিকেও তারা অপমানজনক বলে মনে করে।

ফলে উপনিবেশগুলো নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং এইভাবে মাতৃভূমি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে উপনিবেশগুলোর অসন্তোষ থাকলেও এতদিন তারা কোন সক্রিয় প্রতিবাদ জানাতে পারেনি। কারণ উপনিবেশগুলোর নিজেদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। দ্বিতীয়ত, তখন কাছেই কানাডাতে ফরাসী শাসন কায়েম ছিল এবং তাদের ওপরে ফরাসী আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। উপনিবেশগুলো মনে করতো যে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ করলে সম্ভাব্য ফরাসী আক্রমণের সময়ে ইংলণ্ডের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না, ফলে সেখানে ফরাসী শাসন কায়েম হবে। কিন্তু ১৭৬৩ সালে ইতিহাসের পট পরিবর্তন হয়। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসানে কানাডা ইংরেজদের অধিকারে আসায় আমেরিকার উপনিবেশগুলোর ওপরে আর ফরাসী আক্রমণের আশঙ্কা রইল না। ইতিমধ্যে উপনিবেশগুলোর মধ্যে ইংলণ্ড-বিরোধিতার মানসিকতা এদের মধ্যকার বিভেদ ও মতপার্থক্য ভুলে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সময়ে উপনিবেশগুলোর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যে অর্থ ইংলণ্ড ব্যয় করেছিল তা আদায়ের জন্য ১৭৬৪ সালে সুগার অ্যাক্ট (Sugar Act) এবং ১৭৬৫ সালে স্ট্যাম্প অ্যাক্ট (Stamp Act) নামে দুটি আইন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট পাশ করে। ঐ দুটি আইনের দ্বারা আমেরিকার উপনিবেশগুলোতে দলিল এবং আমদানী করা চিনির ওপরে কর ধার্য করা হয়। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে উপনিবেশগুলোর কোন প্রতিনিধি নেই, এই যুক্তিতে তারা ঐ দুটি আইনের বিরোধিতা করে এবং ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণে এগিয়ে আসে।

১৭৬৫ সালের অক্টোবর মাসে নিউইয়র্ক শহরে নয়টি উপনিবেশের প্রতিনিধিরা একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে স্ট্যাম্প অ্যাক্টের বিরোধিতা করে এবং উপনিবেশগুলোর ওপরে বৃটিশ পার্লামেণ্টের কর ধার্যের অধিকারকে অস্বীকার করে। ব্রিটিশ সরকার স্ট্যাম্প অ্যাক্ট প্রত্যাহার করলেও ঘোষণা করে যে, উপনিবেশগুলোর ওপরে কর ধার্যের অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আছে।

১৭৬৭ সালে ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার উপনিবেশগুলোতে চা, কাচ, সীসা, রং ও কাগজ আমদানীর ওপরে শুল্ক ধার্য করায় সেখানে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ সরকার অন্যান্য পণ্যের ওপরে শুল্ক তুলে দেয়, কিন্তু উপনিবেশগুলোতে তাদের কর আরোপের অধিকার যে আছে তা প্রমাণের জন্য চা-এর ওপরে নামমাত্র কর ধার্য করে। এই শুল্কের প্রতিবাদে ১৭৭৩ সালে বোষ্টন বন্দরে একদল মার্কিন ছদ্মবেশে জাহাজে উঠে ৩৪২ পেটি চা সমুদ্রে ফেলে দেয়—যা ইতিহাসে 'বোষ্টন চা আসর' নামে খ্যাত। এই ঘটনাতে ক্রুদ্ধ হয়ে ইংরেজ সরকার উপনিবেশগুলোকে শাস্তিদানের জন্য পাঁচটি দমনমূলক আইন পাশ করে। এই অবস্থার পটভূমিকায় ১৭৭৪ সালে ফিলাডেলফিয়াতে প্রথম উপমহাদেশীয় সম্মেলন (First Continental Congress) অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকার ঐ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব গ্রহণ না করে পুরানো কর নীতি এবং দমন নীতি চালাতে বদ্ধপরিকর থাকেন। ফলে মাতৃভূমির সঙ্গে আমেরিকার তেরটি উপনিবেশের সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ১৭৭৫ সালের মে মাসে তেরটি উপনিবেশের পক্ষ থেকে ফিলাডেলফিয়াতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় উপমহাদেশীয় সম্মেলন (Second Continental Congress) থেকে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জকে তাদের দাবী মানার জন্য এক চরমপত্র দেওয়া হয়। ঐ সম্মেলনে জর্জ ওয়াশিংটনকে উপনিবেশগুলোর পক্ষে সেনানায়ক পদে নিয়োগ করা হয়। ব্রিটিশ সরকার ঐ চরমপত্র নাকচ করে সেখানে সৈন্য পাঠাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে ১৭৭৬ সালে তেরটি উপনিবেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধ (War of Independence) শুরু হয় এবং ১৭৮৩ সালে উপনিবেশগুলোর জয়লাভের মধ্য দিয়ে ঐ যুদ্ধের অবসান ঘটে।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

ব্রিটেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই ১৭৭৬ সালে আমেরিকার তেরটি উপনিবেশ 'জাতীয় সরকার' গঠন করে। ঐ জাতীয় সরকারই বিপ্লবী উপমহাদেশীয় সম্মেলন (Revolutionary Continental Congress) নামে সরকার পরিচালনা করে। ঐ বছরই উপমহাদেশীয় সম্মেলন উপনিবেশগুলোর ঘোষণাপত্র ও লিখিত সংবিধানের খসড়া রচনার দায়িত্ব টমাস জেফারসনের (Thomas Jefferson) নেতৃত্বে একটি কমিটির ওপরে অর্পণ করে। ঐ কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন, জর্জ ওয়াশিংটন, জন অ্যাডামস্, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, রোজার শেরম্যান এবং রবার্ট লিভিংস্টোন। বস্তুত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনায় জেফারসনের ভূমিকাই সর্বাধিক এবং তাঁকে এইজন্য স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের জনক বলা হয়। ১৭৭৬ সালের ২৮শে জুন খসড়া কমিটি স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের খসড়া রচনা করে বিপ্লবী মহাদেশীয় সম্মেলনে পেশ করে এবং ৪ঠা জুলাই ঐ বিপ্লবী সম্মেলনে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' গৃহীত হয়। এই ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গ্রহণ ও ঘোষণা করে আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো ব্রিটেনের শাসন, শোষণ এবং প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে কি আছে ?

স্বাধীনতার ঐ ঘোষণাপত্রে বলা হয় :[১]

"মানব ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরায় এমন প্রয়োজন উপস্থিত হয় যখন রাজনৈতিক সূত্রে আবদ্ধ দুটি জাতির মধ্যে একটি সেই সূত্র ছিন্ন করে পৃথকভাবে বিশ্বের অন্যান্য জাতির সঙ্গে সমান আসন গ্রহণ করে—যে আসন প্রকৃতি ও ঈশ্বরের নিয়মে তার ন্যায্য প্রাপ্য। তবে বিশ্বমানবের মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য কী কারণে সেই রাজনৈতিক সূত্র ছিন্ন করে দিতে বাধ্য হচ্ছে তা সেই জাতির উচিত ঘোষণা করা।

আমরা এ সকল সত্য স্বপ্রমাণিত বলিয়া মনে করি যে, সৃষ্টিকর্তা সকল মানুষকেই সমান করে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাদের প্রত্যেককেই কতগুলি অধিকার দিয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছে বাঁচার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং সুখলাভের অধিকার। এইসব অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে মানবসমাজে শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় এবং এই শাসন-ব্যবস্থার পরিচালকদের শাসন করার ন্যায্য অধিকার লাভ শাসিতের সম্মতির ওপর নির্ভর করে।[২] যখন কোন শাসন-ব্যবস্থা এই অধিকারগুলিকে বিনষ্ট করতে

১. ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই কংগ্রেসে গৃহীত আমেরিকার তেরোটি রাজ্যের সর্বসম্মতিক্রমে রচিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

২. "We hold the e truth, to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed."

উদ্যত হয় তখন সেই শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন বা বিলোপ সাধন করে সেখানে নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করার অধিকার সেই জাতির জনসাধারণের থাকে। এই নূতন শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি এমন সকল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং এর কাঠামো এমনভাবে গঠন করা হবে যাতে জাতির সকল নাগরিকের নিরাপদে ও সুখে জীবন যাপন সম্ভব হয়। স্বাভাবিক বিবেচনা বোধ এটাই বলে, যে শাসন ব্যবস্থা বহুকাল ধরে চলে আসছে ক্ষণিকের সামান্য কোন কারণে তার পরিবর্তন করা উচিত হবে না। এ সম্পর্কে মানুষের সকল অভিজ্ঞতা থেকে এটাই বোঝা গিয়েছে যে, অন্যায় যতদিন অসহনীয় হয়ে না ওঠে ততদিন মানুষ বরং অন্যায়কে সহ্য করে যাওয়া শ্রেয় মনে করে, তবু সেই অন্যায়ের প্রতিবিধানকল্পে পরিচিত এবং অভ্যস্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চায় না। কিন্তু যখন স্বৈরাচারী শাসনে পিষ্ট করার উদ্দেশ্যই একমাত্র লক্ষ্য হয় এবং এই একটি মাত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে উৎপীড়নের পর উৎপীড়ন চালিয়ে যাওয়া হয় এবং একই উদ্দেশ্যে নানাবিধ অন্যায় অধিকারকে কায়েম করার চেষ্টা হয় তখন সেই শাসন-ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ এবং সেখানে নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করা জনগণের অধিকারগত কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। উপনিবেশগুলি এতদিন ধৈর্যসহকারে যে অত্যাচার সহ্য করে এসেছে তা হ'ল তার কাহিনী এবং কারণ, যে কারণে আজ তারা বাধ্য হয়ে আগেকার শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন বোধ করছে। গ্রেট ব্রিটেনের বর্তমান সম্রাটের কার্যাবলীর ইতিহাস হ'ল ক্রমাগত উৎপীড়ন, বঞ্চনা ও অবৈধ অধিকার ভোগের ইতিহাস এবং এ সকলের উদ্দেশ্য হ'ল এখানকার উপনিবেশগুলির উপর স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করা। এর যথার্থতা নির্ধারণের জন্য আমরা নিরপেক্ষ বিশ্বের সম্মুখে প্রমাণ উপস্থিত করছি ঃ

জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য রচিত অতীব প্রয়োজনীয় ও সঙ্গত আইনসমূহে তিনি (ব্রিটেনের রাজা) তাঁর স্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে অস্বীকার করেছেন। তিনি উপনিবেশের শাসনকর্তাদের জরুরী ও বিশেষ প্রয়োজনীয় আইনসমূহ পাস করতে নিষেধ করেছেন, অথবা পাস করলেও তাতে তাঁর স্বীকৃতি জ্ঞাপন না করা পর্যন্ত তার কার্যকারিতা বন্ধ রেখেছেন এবং বন্ধ রাখার পর তা অবহেলাভরে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

কতগুলি বড় জেলার জনগণ আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার ত্যাগ না করলে তিনি ঐ জেলাগুলির জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য আইন পাস করতে অস্বীকার করেছেন। প্রতিনিধি-প্রেরণের এই অধিকার জনসাধারণের কাছে অমূল্য-সম্পদ, কিন্তু স্বৈরাচারী শাসনের কাছে তা বিশেষ ভয়ের বস্তু।

তিনি ইচ্ছা করে সরকারী দপ্তরখানা থেকে বহুদূরে এমন সব অসুবিধাজনক ও অদ্ভুত জায়গায় আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেছেন যাতে সদস্যগণ এরূপ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন যে তাঁর খুশি ও খেয়ালমত ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা দেবার মত উদ্যম ও শক্তি তাঁদের অবশিষ্ট না থাকে।

নাগরিক-অধিকারে তাঁর অন্যায় হস্তক্ষেপে পুরুষোচিত দৃঢ়তার সঙ্গে বাধা প্রদান করায় তিনি প্রতিনিধি সভা বার বার ভেঙ্গে দিয়েছেন।

প্রতিনিধি-সভা ভেঙ্গে দেবার পর তিনি বহুদিন পর্যন্ত নূতন প্রতিনিধি সভা নির্বাচন করতে অস্বীকার করেছেন। তার ফলে আইন-প্রণয়নের অবিনশ্বর অধিকার আবার নাগরিকদের হাতে ফিরে এসেছে। এবং সে অধিকার তারা ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু ইতিমধ্যে রাষ্ট্র বহিরাক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ বিপ্লবজনিত বিপদের সম্মুখীন হবে এমন আশঙ্কা রয়েছে।

তিনি এই সকল রাজ্যের জনসংখ্যা যাতে বৃদ্ধি না পায় তার জন্য চেষ্টা করছেন; সেই উদ্দেশ্যে বিদেশীদের নাগরিকভুক্ত করার আইন পাসে বাধা সৃষ্টি করেছেন; বিদেশীদের এদেশে আসতে উৎসাহিত করার সমস্ত আইন পাস করতে অস্বীকার এবং নূতন জমি পত্তনের শর্তগুলি আরও কঠোর করেছেন।

বিচারকদের ক্ষমতা দান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আইন পাস করতে অস্বীকার করে তিনি বিচারের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছেন।

বেতন নির্ধারণ ও প্রাপ্তি এবং চাকুরীর মেয়াদের জন্য তাঁর ওপর নির্ভরশীল করে বিচারকদের তিনি তাঁর তাঁবেদার করে রেখেছেন।

তিনি বহুবিধ পদ সৃষ্টি করেছেন এবং জনসাধারণকে হয়রান করার জন্য এবং তাদের সম্পদ লুটে নিঃস্ব করার জন্য তিনি সেই সকল পদে তাঁর অজস্র কর্মচারীকে পাঠিয়েছেন।

আমাদের আইনসভার মত না নিয়ে তিনি আমাদের দেশে শান্তির সময়ে বিশাল সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রেখেছেন।

তিনি সামরিক কর্তৃপক্ষকে বে-সামরিক কর্তৃত্বের আওতার বাইরে এনে তাকে উচ্চতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আমাদের সংবিধানে যার উল্লেখ নেই ও আমাদের আইন যাকে স্বীকার করে না তিনি অন্যের সঙ্গে একযোগে আমাদের তেমনি এক কর্তৃত্বের অধীনে নিয়ে গিয়েছেন এবং সেই কর্তৃপক্ষের প্রণীত তথাকথিত আইনসমূহে তিনি তাঁর স্বীকৃতি দান করেছেন; আমাদের দেশে বিশাল সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করার জন্য এবং সেই সৈন্যবাহিনীর কেউ যদি আমাদের দেশের অধিবাসীদের হত্যা করে তবে কৃত্রিম বিচারের মাধ্যমে তাকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য; বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য; আমাদের মত না নিয়ে আমাদের ওপর কর ধার্য করার জন্য; বহুক্ষেত্রে জুরী-বিচারের সুবিধা থেকে আমাদের বঞ্চিত করার জন্য; তথাকথিত অপরাধে বিচারের নাম করে আমাদের সমুদ্রের পরপারে নিয়ে যাবার জন্য; আমাদের প্রতিবেশী এক প্রদেশকে ইংরেজী আইনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে সেখানে স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং সেই স্বৈরাচারের ক্ষেত্র বিস্তৃত করে যাতে এই স্বৈরাচারকে নিদর্শনস্বরূপ ব্যবহার করা যায় এবং হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে ক্রমশ অন্যান্য উপনিবেশে স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তন করা যায় তার জন্য; আমাদের সনদ কেড়ে নিয়ে অতি প্রয়োজনীয় আইনগুলি বিলোপ করে আমাদের শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন

সাধন করার জন্য ; আমাদের আইন-সভার অধিকার হরণ করে আমাদের সকল প্রকার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আত্মসাৎ করার জন্য—এই স্বীকৃতি দান।

আমাদের তাঁর আইনের নিরাপত্তার বহির্ভূত করে এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এখানকার শাসনের সমস্ত দায়িত্ব তিনি পরিত্যাগ করেছেন।

আমাদের সমুদ্রে তিনি লুণ্ঠন চালিয়েছেন, তীরভূমি ছারখার করেছেন, শহরগুলি জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং আমাদের দেশের লোকের প্রাণ হরণ করেছেন।

তিনি এখন এখানে বেতনভুক্ বিদেশী সৈন্যের বিশাল বাহিনী পাঠাতে আরম্ভ করেছেন হত্যা, ধ্বংস ও স্বৈরাচারের তাণ্ডবলীলা সম্পূর্ণ করার জন্য। এই তাণ্ডব-লীলা শুরু হয়েছিল মিথ্যাচার ও নিষ্ঠুরতার পথে, যে মিথ্যাচার ও নিষ্ঠুরতার উদাহরণ পৃথিবীর আদিম যুগেও বিশেষ পাওয়া যায় না এবং যা কোন মতেই এক সভ্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের উপযুক্ত কাজ নয়।

আমাদের স্বদেশবাসী যারা সমুদ্রপথে বন্দী হয়েছেন তাদের তিনি স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য করেছেন, ভাই ও বন্ধুবর্গের হত্যায় জল্লাদের ভূমিকা নিতে তাদের বাধ্য করেছেন, অথবা ভাই ও বন্ধুবর্গের হাতে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করেছেন।

আমাদের মধ্যে তিনি গৃহযুদ্ধের উস্কানি দিয়েছেন এবং আমাদের সীমান্তের অধিবাসীদের ওপর নিষ্ঠুর রেড ইণ্ডিয়ান বর্বরদের লেলিয়ে দিয়েছেন, যে রেড ইণ্ডিয়ানদের যুদ্ধের সর্বজনবিদিত নিয়ম হল বাল-বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোককে নির্বিচারে হত্যা করা। এই সকল উৎপীড়ন চালাবার সময় প্রতিবার আমরা প্রতিকার প্রার্থনা করে অতি বিনীতভাবে আবেদন জানিয়েছি এবং প্রতিবারই আমাদের আবেদনের উত্তরে নূতন উৎপীড়নের ব্যবস্থা হয়েছে। যে রাজার চরিত্রে ও কাজে এইভাবে স্বৈরাচারী শাসকের মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছে, সে রাজা এক স্বাধীন জাতির শাসক হবার অযোগ্য। আমরা আমাদের ইংরেজ ভাইদের মনোযোগ আকর্ষণেও বিরত থাকিনি। আমাদের ওপর তাদের আইনসভার অন্যায় কর্তৃত্ব প্রসারিত করার চেষ্টা সম্পর্কে আমরা তাদের বার বার সাবধান করে দিয়েছি। যে অবস্থায় পড়ে আমরা স্বদেশ ত্যাগ করি এবং এদেশে এসে বসতি স্থাপন করি সেকথাও তাদের স্মরণ করে দিয়েছি। তাদের সহজাত ন্যায়বোধের প্রতি ও তাদের হৃদয়ের উদারতার প্রতি আবেদন জানিয়েছি এবং আমাদের উভয়ের এক আত্মীয়তাসূত্রের উল্লেখ করে এই অন্যায় হস্তক্ষেপ ও এই অবৈধ দখলের প্রতিবাদ জানাতে বলেছি অন্যথায় আমাদের দুই জাতির মধ্যে সমস্ত যোগাযোগ, সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু ন্যায় বিচারের এই আবেদনে তারা বধির থেকেছে, পূর্ব আত্মীয়তার উল্লেখ তারা শুনতে চায়নি। অতএব, আমরা আজ আমাদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিচ্ছি এবং যেমন বিশ্বের অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রে তেমনি ব্রিটিশ জাতির ক্ষেত্রেও, যখন তাদের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হব তখন তারা আমাদের শত্রু, আর শান্তির সময়ে মিত্র জ্ঞান করবো।

অতএব, আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সাধারণ কংগ্রেসে মিলিত হয়ে আমাদের সাধু উদ্দেশ্যের জন্য বিশ্বপিতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি এবং এই সকল উপনিবেশের সৎ নাগরিকদের নামে এবং অনুমতি অনুসারে যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই ঘোষণা করছি যে, এই সংযুক্ত উপনিবেশগুলি ন্যায়সঙ্গত ও অধিকারগত ভাবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ; ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি সকল আনুগত্য থেকে তারা মুক্ত ; তাদের এবং ব্রিটেনের মধ্যে সকল প্রকার রাজনৈতিক বন্ধন ছিন্ন হয়েছে অথবা হওয়া উচিত ; এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে তাদের এখন যুদ্ধ ঘোষণা ও সন্ধি স্থাপন করা, মৈত্র বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করা এবং অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্য যাবতীয় কর্তব্য পালন করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আর ঈশ্বরের অপার করুণার ওপরে নির্ভর করে আমরা এই প্রতিজ্ঞা করছি যে, এই সকল ঘোষণাকে সার্থক করার জন্য আমরা আমাদের ধন, মান, প্রাণ পণ করবো।"

স্বাধীনতার যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় স্বাধীনতার উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র উপনিবেশের জনগণকে নতুন ভাবে উদ্দীপিত করে। অন্যদিকে জনবল, অর্থবল ও সামরিক শক্তির সাহায্যে ব্রিটেন উপনিবেশগুলোকে শিক্ষা দেবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উপনিবেশগুলোর কাছে যা ছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম ব্রিটিশ সরকারের কাছে তা হ'ল বিদ্রোহ। দীর্ঘ সাত বছর সময় ধরে উপনিবেশগুলোর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলে এবং অন্যদিকে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সামরিক শক্তি ঐ বিদ্রোহকে দমন করার জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। অবশেষে মার্কিন উপনিবেশ-গুলোর চূড়ান্ত জয়লাভের ফলে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। এবং ১৭৮৩ সালে প্যারিসের চুক্তিতে আমেরিকার 'বিদ্রোহী' তেরটি উপনিবেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ব্রিটেন স্বীকৃতি দেয়। এইভাবে এক ঐতিহাসিক সাফল্যের মধ্য দিয়ে ১৭৮৩ সালে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর' আত্মপ্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠা ঘটে।

তিন : মার্কিন সংবিধানের ক্রমবিকাশ (Development of the Constitution)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সংবিধান ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে ১৭৮৭ সালে গৃহীত হয়েছিল এবং ১৭৮৯ সাল থেকে ঐ সংবিধান কার্যকর হয়েছিল। ফিলাডেল-ফিয়া সম্মেলনে গৃহীত এই সংবিধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় সংবিধান। ১৭৭৬ সালে ৪ঠা জুলাই ১৩টি উপনিবেশ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Declaration of Independence) গ্রহণ করে উপনিবেশগুলো ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীন ঘোষণা করার পর থেকে বর্তমান সংবিধানের অধীনে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের কাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা তিনটি স্তর অতিক্রম করে।

বর্তমান সংবিধান পর্যন্ত মার্কিন শাসনব্যবস্থার তিনটি স্তর

১. ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করার পরে ১৩টি উপনিবেশকে নিয়ে গঠিত জাতীয় সরকার 'বিপ্লবী উপদেশীয় কংগ্রেস' (Revolutionary Continental

Congress) নামে পরিচালিত হয়। এই শাসনব্যবস্থা কোন লিখিত সংবিধান বা ক্ষমতা প্রয়োগ বিধি দ্বারা পরিচালিত হোত না। ১৭৭৬ সাল থেকে ১৭৮১ সাল পর্যন্ত শাসনব্যবস্থার এই প্রথম স্তর চলে।

২. ১৭৮১ সাল থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত (অর্থাৎ বর্তমান সংবিধান কার্যকর হবার আগে পর্যন্ত) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শাসিত হয় রাষ্ট্রসমবায়ের সনদ (Articles of Confederation) দ্বারা। ইহাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান।

৩. ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে (Philadelphia Convention) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পূর্ণাঙ্গ নতুন সংবিধান রচিত হয় এবং ১৭৮৭ সালে তা গৃহীত হয়। ১৭৮৯ সাল থেকে ঐ সংবিধান অনুযায়ী মার্কিন শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ইহাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সংবিধান। বস্তুত এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় সংবিধান।

রাষ্ট্র সমবায়ের সনদ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান হ'ল রাষ্ট্রসমবায়ের সনদ বা *Articles of Confederation.* আগেই বলা হয়েছে যে আমেরিকার উপনিবেশগুলো স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করার পরেই বিপ্লবী উপমহাদেশীয় সম্মেলন (Revolutionary Continental Congress) টমাস জেফারসনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। ঐ কমিটির ওপরে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং (প্রথম) সংবিধানের খসড়া রচনা করার দায়িত্ব অর্পণ করে। ১৭৭৬ সালের জুন মাসের মধ্যে ঐ কমিটি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়া রচনা করলেও উপনিবেশগুলোর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে গুরুতর মতভেদ দেখা দেওয়ায় সংবিধানের খসড়া রচনায় বিলম্ব ঘটে। অবশেষে ১৭৭৭ সালের ১৫ই নভেম্বর (প্রথম) সংবিধানের খসড়া চূড়ান্ত হয়। কিন্তু উপনিবেশগুলোর মধ্যে ঐ খসড়া নিয়ে মতপার্থক্যের জন্য উপমহাদেশীয় সম্মেলনে সংবিধানের অনুমোদন লাভ (Ratification) পেতে দেরী হয় এবং অবশেষে ১৭৮১ সালের ১লা মার্চ উপমহাদেশীয় সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান বা *Articles of Confederation* চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

রাষ্ট্রসমবায়ের সনদকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করতে দেরী হবার কারণ হ'ল জাতীয় সরকারের ক্ষমতার রূপরেখা এবং বিস্তৃতি সম্পর্কে গুরুতর মতপার্থক্য। ব্যবসায়ী বিত্তবান শ্রেণী এবং ভূস্বামীরা একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার চেয়েছিলেন। কারণ এঁরা মনে করতেন যে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার এদের বিত্ত, ভূমি ও ব্যবসায়িক স্বার্থকে রক্ষা করতে পারবে। বৃহৎ ব্যবসায়ীরা মনে করতেন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার না থাকলে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ট্যারিফ (Tariff) এবং বাণিজ্য প্রতিযোগিতা তাদের ব্যবসায়ী স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। জমির ফাটকাবাজারের ব্যবসায়ীরা (Speculators) রাষ্ট্র সমবায়ের সনদকে তাদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করেননি। এই সকল কারণে

সনদ সম্পর্কে মতভেদের কারণ

এদের মুখপাত্ররা বাণিজ্যিক স্বার্থ, গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থ, বিত্তস্বার্থ তথা টাকা বিনিয়োগের পূর্ণ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শক্তিশালী জাতীয় সরকার গঠনে উৎসাহী ছিলেন এবং এই স্বার্থ যাতে রক্ষিত হয় সেদিকে নজর রেখে রাষ্ট্রসমবায়ের সনদ প্রণয়নের পক্ষে ছিলেন। অন্যদিকে, রাজ্যগুলো তাদের স্বাধীনতার রক্ষার জন্য শক্তিশালী জাতীয় সরকার গঠনের বিরোধী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক টানাপোড়েনের পরে দুর্বল জাতীয় সরকার গঠনের যারা পক্ষে ছিলেন তারাই জয়ী হন এবং রাষ্ট্র সমবায়ের সনদে একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান বা *Articles of Confederation* বাস্তবে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলে—যদিও 'রাষ্ট্রসমবায়' শব্দটি সনদে উল্লিখিত হয়। ১৭৭৬ সাল থেকে ১৭৮১ সাল পর্যন্ত যে অলিখিত শাসনব্যবস্থা অনুসৃত হয়েছিল সেই কাঠামোকে রাষ্ট্রসমবায়ের সনদ খুব বেশী পরিবর্তন করেনি। জাতীয় সরকারের যে কাঠামো প্রচলিত ছিল মোটামুটিভাবে তাকেই গ্রহণ করা হয়।

সনদের বিষয়বস্তু

রাজ্যের প্রতিনিধিদের (Delegates) নিয়ে এক-কক্ষবিশিষ্ট (Unicameral) আইনসভা গঠিত হয়। ঐ আইনসভাকে কংগ্রেস (Congress) নামে অভিহিত করা হয়। আইনসভায় প্রতিটি রাজ্যের (State) একটি করে ভোট থাকবে। কংগ্রেসের যখন অধিবেশন চলবে না তখন কংগ্রেসের কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রতিটি রাজ্যের একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি থাকবে এবং কংগ্রেস ঐ কমিটি গঠন করবে। রাষ্ট্রসমবায়ের সনদে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। জাতীয় সরকারের ক্ষমতার মধ্যে থাকবে বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা, যুদ্ধ ঘোষণা, আমেরিকার প্রাচীন বাসিন্দা রেড ইন্ডিয়ানদের ব্যাপার দেখাশুনা করা, রাষ্ট্রীয় ঋণ নেওয়া, রাজ্যগুলো থেকে সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করা। কিন্তু জাতীয় সরকারের নিজের উদ্যোগে কোন কর ধার্যের ক্ষমতা স্বীকৃত হয়নি। এই সনদে রাজ্যগুলোর জন্য স্বতন্ত্র ও নিজ নিজ আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়।

'রাষ্ট্রসমবায়ের সনদ' বিভিন্ন দিক থেকে ছিল ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমত, সনদে জাতীয় সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো ও ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। সুতরাং জাতীয় সরকারের আইন প্রণয়নের অধিকার স্বীকৃত হলেও তাকে রূপায়িত বা কার্যকর করার ব্যাপারে সনদ নীরব ছিল। এমন কি সনদে মুখ্য শাসকের (Chief Executive) কোন ব্যবস্থা ছিল না।

রাষ্ট্র সমবায়ের সনদের ত্রুটি

১৭৮১ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রশাসন পরিচালনার অসুবিধা দূর করার জন্য চারটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করে। দ্বিতীয়ত, এমনকি জাতীয় কংগ্রেস বা আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতারও কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। জাতীয় কংগ্রেস যে আইন পাশ করতো জনগণের ওপর ঐ আইনের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল না, কারণ এ আইন প্রয়োগের দায়িত্ব রাজ্যগুলোর ওপরে ন্যস্ত ছিল। অধ্যাপক রসিটার (Rossiter) যথার্থই

বলেছেন, *The Congress could resolve and recommend but could not command and coerce*।[১] তৃতীয়ত, একটা জাতীয় সরকারের আইনসভার যে ব্যাপ্তি থাকা প্রয়োজন জাতীয় কংগ্রেসের সেরূপ ক্ষমতা ছিল না। যেমন, জাতীয় কংগ্রেসের কর ধার্য করা এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতা ছিল না। জাতীয় কংগ্রেসের ক্ষমতার এই সীমাবদ্ধতার জন্য অর্থের ব্যাপারে জাতীয় সরকারকে রাজ্যগুলোর মুখাপেক্ষী থাকতে হত এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে কোন ক্ষমতা না থাকায় রাজ্যগুলো নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপরে নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করত। এর ফলে একটা নির্দিষ্ট জাতীয় নীতি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। চতুর্থত, রাষ্ট্রসমবায়ের সনদে জাতীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও কার্যাবলীর কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা করা হয়নি। রাজ্যগুলোর মধ্যে বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব জাতীয় কংগ্রেসের উপর ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু জাতীয় সরকার ও রাজ্যগুলোর মধ্যে বিরোধ মীমাংসার কোন ব্যবস্থা সনদে রাখা হয় না। পঞ্চমত, সনদ সংশোধনের জন্য যে-ব্যবস্থা বিধি রাখা হয়েছিল তা ছিল খুবই দুষ্পরিবর্তনীয়—যে কোন সংশোধন কার্যকর করার জন্য সব কটি, অর্থাৎ তেরটি রাজ্যের অনুমোদন অপরিহার্য ছিল। এইসকল কারণে রাষ্ট্রসমবায়ের সনদ জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে অনুপযুক্ত বিবেচিত হতে থাকে।

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলন, ১৭৮৭

রাষ্ট্রসমবায়ের সনদ কার্যকর থাকাকালীন অবস্থাতেই ঐ সনদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহলে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। ঐ সনদে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এক চরম আর্থিক সংকট দেখা দেয়। স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে জাতীয় সরকারের যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় তা জাতীয় সরকারকে রাজ্যগুলোর দেয় অর্থে পূরণ হয় না। সরকারের সৈন্যবাহিনীর জন্য জাতীয় সরকার বেতন যোগাতে পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। এককথায় সরকারের দেউলিয়া অবস্থা প্রকট হয়ে দেখা দেয়—রাষ্ট্রীয় ঋণ অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অরাজকতা দেখা দেয়। এই অবস্থায় সপ্তদশ শতকের আশির দশকে ইউরোপে যে ব্যাপক মন্দা দেখা দেয় তার প্রভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বীজ শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায় প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। অথচ এই অবস্থার প্রতিকারে জাতীয় সরকারের পক্ষে নির্বাক দর্শক হওয়া ছাড়া কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

সম্মেলনের পটভূমিকা

তেরটি উপনিবেশকে তেরটি রাজ্যের মর্যাদা দিয়ে এদের নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হলেও রাজ্যগুলোর মধ্যে জাতীয় ঐক্যের মানসিকতা বা জাতীয় স্বার্থের ধারণা গড়ে ওঠেনি। ফলে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং ঐ অরাজক অবস্থায় তেরটি রাজ্যের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে এবং গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

১: *Seedtime of the Republic*, C. L. Rossiter p 52.

একদিকে জাতীয় সরকারের ক্ষমতা ও আর্থিক সম্পর্কের দেউলিয়াপনা এবং অন্যদিকে রাজ্যগুলোর মধ্যে স্বার্থগত সংঘাত এমন একটা রূপ নেয় যে একসময়ে মনে হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ঐ অরাজক অবস্থা কাটিয়ে উঠে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ঐ সময় হঠাৎ সম্ভাবনাপূর্ণ এবং ইতিবাচক দিকে ঘটনা মোড় নেয়। ভার্জিনিয়া এবং মেরীল্যান্ড রাজ্য দুটি নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যগত বিরোধ মিটিয়ে একটা দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিতে সাফল্যের সঙ্গে উপনীত হয়। এই সাফল্যের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করার জন্য অন্যান্য রাজ্যগুলোকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয় এবং ১৭৮৬ সালে আন্নাপোলিশে (Annapolis) একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই সম্মেলনে মাত্র ৫টি রাজ্য প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য সম্মেলন সাফল্য অর্জন করতে পারে না। এই সম্মেলন মুলতুবী করার আগে স্থির করা হয় যে, পরবর্তী বছরে ফিলাডেলফিয়াতে রাজ্যগুলোর একটি পূর্ণাঙ্গ সম্মেলন আহবান করা হবে। আরও স্থির হয় যে, ফিলাডেলফিয়া সম্মেলন শুধুমাত্র বাণিজ্যিক সমস্যা আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। সিদ্ধান্ত করা হয় যে, আসন্ন সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মার্কিন কংগ্রেস প্রথম দিকে ফিলাডেলফিয়া-তে প্রস্তাবিত ঐ সম্মেলন ডাকার ব্যাপারে খুব ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু পরে অনেক কিছু বিচারবিবেচনা করে ১৭৮৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিন কংগ্রেস ফিলাডেলফিয়া সম্মেলন আহবানের প্রস্তাবকে অনুমোদন করে।

অবশেষে ১৭৮৭ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলন শুরু হয় এবং ঐ সম্মেলন সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে। এই সম্মেলনে ১২টি রাজ্যের ৫৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। রোড আইল্যান্ড (Rhode Island) সম্মেলনে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই এর কোন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিল না। প্রতিটি রাজ্য থেকে সমসংখ্যক প্রতিনিধি আসে না — বিভিন্ন রাজ্য বিভিন্ন সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠায়। তবে স্থির হয় যে, ছোট-বড় প্রতিটি রাজ্যের সম্মেলনে একটি করে ভোট থাকবে। সম্মেলনে আগত ৫৫ জন প্রতিনিধির মধ্যে সম্মেলনের শেষ পর্যন্ত ৪২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন এবং ৩৯ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে গৃহীত সংবিধানে স্বাক্ষর দান করেন।

যোগদানকারী রাজ্য ও প্রতিনিধি

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের পরিচিতি

১২টি রাজ্য থেকে যে ৫৫ জন প্রতিনিধি ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন তাদের বেশির ভাগই ছিলেন সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী। এদের মধ্যে ২৬ জন কলেজে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত, দুজন

কলেজের সভাপতি, ৩ জন কলেজ অধ্যাপক ছিলেন। ৫৫ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৪৫ জন ছিলেন কংগ্রেস বা আইনসভার সদস্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন জনজীবনে প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব। সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের বয়স ২৬ থেকে ৮১ বছর ছিল। সবচেয়ে প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ ছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (৮১) এবং সবচেয়ে কনিষ্ঠ ছিলেন নিউ জার্সির প্রতিনিধি জোনাথান ডেটন (Jonathan Dayton), তার বয়স ছিল ২৬ বছর। প্রতিনিধিদের গড় বয়স ছিল ৪৩ বছর।

সম্মেলনে উপস্থিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন (George Washington), জেমস ম্যাডিসন (James Madison), বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (Benjamin Franklin), আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন (Alexander Hamilton), টমাস জেফারসন (Thomas Jefferson), জেমস উইলসন (James Wilson), গোভারনিয়র মরিস (Gouverneur Morris), ম্যাক্স ফ্যারাণ্ড (Max Farrand)। সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে ওয়াশিংটন যোগ্যতা, দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, পক্ষপাতহীনতার এক চরম নজীর স্থাপন করে মার্কিন সংবিধানের প্রাণপুরুষ হিসাবে স্থান লাভ করেছেন। তবে মার্কিন সংবিধান রচনায় সবচেয়ে বেশী অবদান হ'ল জেমস্ ম্যাডিসনের, তাই তাঁকে মার্কিন সংবিধানের জনক (Father of the Constitution) আখ্যা দেওয়া হয়।

সম্মেলনের আলোচনা ও প্রবণতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ফিলাডেলফিলা সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম। দীর্ঘ চারমাস ধরে এই সম্মেলন চলে। সম্মেলনের আলোচনা গোপন রাখা হয়, কারণ মনে করা হয়েছিল যে সম্মেলনের আলোচনা প্রকাশিত হলে সম্মেলন তার লক্ষ্য সাধনে সমর্থ হবে না—বাইরে থেকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও শ্রেণীস্বার্থের প্রভাব ও টানাপোড়েনের ফলে সংবিধান রচনা অসম্ভব হয়ে পড়বে। ম্যাডিসন বলেছিলেন যে সম্মেলনের আলোচনা বাইরে প্রকাশিত হলে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে সংবিধান প্রণয়ন সম্ভব হত না (No Constitution would ever have been adopted by the convention if the debates had been public)।

আলোচনার গোপনীয়তা

ফিলাডেলফিয়াতে সর্বসম্মত একটি সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মধ্যেও আঞ্চলিক স্বার্থ ও শ্রেণীস্বার্থের সংঘাত কম ছিল না। বস্তুত এ ব্যাপারে অনেক দুরূহ বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল। ছোট রাজ্যগুলোর সঙ্গে বৃহৎ রাজ্যগুলোর স্বার্থদ্বন্দ্ব, উত্তরের রাজ্যগুলোর সঙ্গে দক্ষিণের রাজ্যগুলোর সংঘাত, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার বনাম দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে বিতর্ক, এক-কক্ষবিশিষ্ট, না দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত

হবে—সে সম্পর্কে মতপার্থক্য ইত্যাদি ঘটনাবহুল ব্যাপার সংবিধান প্রণয়নকে অনেক সময় অনিশ্চিত করে তোলে।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশ রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠন করে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করে। এই প্রস্তাবই ভার্জিনিয়া পরিকল্পনা (Virginia Plan) নামে খ্যাত। পনেরটি প্রস্তাবের আকারে ভার্জিনিয়া পরিকল্পনায় জাতীয় শাসনবিভাগ, জাতীয় বিচারবিভাগ এবং দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়। ঐ প্রস্তাবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্যগুলোর প্রতিনিধি নিয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে এবং উচ্চকক্ষ গঠিত হবে নিম্ন-কক্ষের দ্বারা। জাতীয় শাসনবিভাগের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব রাখা হয়। ভার্জিনিয়া পরিকল্পনায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে আইনসভায় প্রতিনিধি গ্রহণের সুপারিশ করায় ছোট ছোট রাজ্যগুলো আশঙ্কিত হয় এই ভেবে যে রাজ্যগুলোর সমপ্রতিনিধিত্ব না থাকলে তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে এবং এই কারণে ছোট ছোট রাজ্যগুলি ভার্জিনিয়া পরিকল্পনার বিরোধিতা করে।

ভার্জিনিয়া প্ল্যান

ভার্জিনিয়া পরিকল্পনা'র বিরোধিতা করে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো সংবিধানের রূপরেখার একটি বিকল্প পরিকল্পনা পেশ করে। এই প্রস্তাব নিউ জার্সি পরিকল্পনা (New Jercy Plan) নামে বিখ্যাত। ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর পক্ষ থেকে নিউ জার্সি-র প্রতিনিধি উইলিয়াম পিটারসন সম্মেলনে এই পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্বাত্মক ক্ষমতায় সজ্জিত না করে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় (Purely federal) নীতির ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করার চেষ্টা করা হয়। রাজ্যগুলোর জনসংখ্যা যাই হোক না কেন, এই প্রস্তাবে আইনসভায় রাজ্যগুলোর জন্য সম প্রতিনিধিত্বের সুপারিশ করা হয় এবং এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠনের পক্ষে মতপ্রকাশ করা হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভা কংগ্রেসের ক্ষমতা সীমিত করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বিরোধিতা করা হয়।

নিউ জার্সি প্ল্যান

এইভাবে দুটি পরস্পরবিরোধী বিকল্প প্রস্তাব সম্মেলনে উপস্থিত করা হয়। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত প্রকট হয়ে ওঠে এবং সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কতটা থাকবে এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় ছোট বড় সকল রাষ্ট্রের সমপ্রতিনিধিত্ব থাকবে কিনা এই দুটি মৌল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দেয়।

জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির (ভার্জিনিয়া পরিকল্পনা) প্রবক্তারা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে কোন আপস করতে অস্বীকৃত হন, যদিও তাঁরা অন্যান্য বিষয়ে কিছু কিছু আপস করতে সম্মত ছিলেন। অবশেষে সম্মেলনে সর্বোচ্চ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতায় পুষ্ট শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। নিউ জার্সি পরিকল্পনার পক্ষে মাত্র তিনটি ভোট পড়ে। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার

গঠনের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরে সাংবিধানিক অন্যান্য ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা আপোষ প্রস্তাব গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ভার্জিনিয়া প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় আইনসভায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্বের সুপারিশ করা হয়। অন্যদিকে নিউ জার্সি প্রস্তাবে রাজ্যগুলোর সম প্রতিনিধিত্বের দাবী জানান হয়। সম্মেলনে আপোষ রফা হিসেবে স্থির করা হয় যে, কেন্দ্রীয় আইনসভা বা কংগ্রেসকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট করা হবে। কংগ্রেসের উচ্চসভা 'সিনেট' গঠিত হবে রাজ্যগুলোর সম প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এবং নিম্নকক্ষ 'প্রতিনিধিসভা' গঠিত হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে।

আপোষ

জনসংখ্যা নির্ধারণে ক্রীতদাসদের ধরা হবে কিনা সে ব্যাপারেও মতপার্থক্য ছিল। দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে প্রচুর ক্রীতদাস বাস করে, তাই স্বাভাবিক কারণেই ঐ রাজ্যগুলো জনসংখ্যা নির্ধারণের ব্যাপারে ক্রীতদাসদেরও যুক্ত করার দাবী করে। অন্যদিকে, উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে ক্রীতদাসের সংখ্যা কম থাকায় ঐ রাজ্যগুলো এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। অবশেষে আপস প্রস্তাব হিসেবে স্থির হয় যে, একজন ক্রীতদাসকে স্বাধীন নাগরিকের তিন-পঞ্চমাংশ ধরে রাজ্যগুলো জনসংখ্যা স্থির করা হবে। একে বলা হয় *Three-Fifths Compromise*।

বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপার এবং ক্রীতদাসদের নিয়ে ব্যবসার ক্ষেত্রেও আপোষ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কোন কোন রাজ্য ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম ক্ষমতার পক্ষে ছিলেন, কয়েকটি রাজ্য এর বিরোধিতা করেন। ক্রীতদাস আমদানির ব্যাপারে কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে কিনা এ ব্যাপারেও মতভেদ ছিল। আপোস প্রস্তাবে স্থির হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বহির্বাণিজ্য এবং আমদানীর ওপরে শুল্ক আরোপ করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু রপ্তানীর ব্যাপারে কোন শুল্ক থাকবে না। ক্রীতদাস আমদানীর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কোন হস্তক্ষেপ করবে না।

ছ' সপ্তাহের বেশী সময় ধরে আলাপ-আলোচনা এবং অবশেষে পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া গৃহীত হয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর ১২টি রাজ্যের ৩৯ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে গৃহীত খসড়া সংবিধানে স্বাক্ষর করেন।

সংবিধান গ্রহণ

সংবিধানের অনুমোদন

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের খসড়া গৃহীত হয়, কিন্তু তাকে কার্যকর করার জন্য রাজ্যগুলোর অনুমোদন প্রয়োজন। রাজ্যগুলোর দ্বারা অনুমোদন লাভ করেই ঐ খসড়া সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারে। প্রস্তাবিত সংবিধান সকল অঙ্গরাজ্য দ্বারা অনুমোদিত হবে না বলে অনেকের মনেই আশঙ্কা ছিল। রাষ্ট্রসমবায়ের অনুচ্ছেদে

অনুমোদন পদ্ধতি

বলা হয়েছিল যে, সংবিধান সংশোধনের জন্য ১৩টি রাজ্যের অনুমোদন প্রয়োজন। কিন্তু ফিলাডেলফিয়ায় গৃহীত সংবিধান সকল রাজ্য, অঞ্চল ও স্বার্থকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি বলে ১৩টি রাজ্যের দ্বারা সংবিধান অনুমোদন লাভে সমর্থ হবে কিনা সে বিষয়ে সংবিধান প্রণেতাদের গভীর সংশয় ছিল। তাই প্রস্তাবিত সংবিধানের শেষ অনুচ্ছেদে এই ব্যবস্থা করা হয় যে ৯টি রাজ্য অনুমোদন করলেই সংবিধান কার্যকর হতে পারবে।

অনুমোদন

রাজ্যগুলোর অনুমোদন লাভের জন্য ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রস্তাবিত সংবিধান তাদের কাছে পাঠানো হয়। ঐ বছরের (১৭৮৭) ৭ই ডিসেম্বর প্রথমে ডেলাওয়ার (Delaware) সংবিধান অনুমোদন করে। তারপরে পেনসিলভানিয়া, নিউ জার্সি, জর্জিয়া প্রভৃতি রাজ্যগুলো একে একে সংবিধান অনুমোদন করে। ১৭৮৮ সালের ২১শে জুন নিউ হ্যাম্পসায়ার সংবিধান অনুমোদন করার সঙ্গে সঙ্গে ৯টি রাজ্য কর্তৃক অনুমোদন সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভার্জিনিয়া এবং নিউ ইয়র্ক রাজ্য তখন পর্যন্ত সংবিধান অনুমোদন না করার সংবিধান কার্যকর করা সম্পর্কে অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দেয়। কিন্তু এক মাসের মধ্যে ঐ দুটি রাজ্য প্রস্তাবিত সংবিধানকে অনুমোদন করায় সংবিধান কার্যকর করার পথে আইনগত এবং বাস্তব কোন বাধা থাকে না। ১৭৮৮ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমণ্ডলী এবং সিনেট ও প্রতিনিধিসভার প্রতিনিধিদের নির্বাচনের জন্য ঘোষণা করা হয়। স্থির হয় যে, ১৭৮৯ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নতুন সংবিধান অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মলগ্ন ঘোষিত হবে। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের দুটি কক্ষ নতুন সংবিধান অনুযায়ী গঠিত না হওয়ায় এবং নির্ধারিত রাষ্ট্রপতি ঐ সময়ে রাজধানীতে উপস্থিত হতে না পারার জন্য অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়া হয়। ৩০শে এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সভাপতি জর্জ ওয়াশিংটন রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করেন—শুরু হয় নতুন সংবিধানের যাত্রা। এর পরে ১৭৯০ সালের মে মাসের মধ্যে বাকী দুটো রাজ্য সংবিধান অনুমোদন করায় ১৩টি রাজ্য দ্বারাই সংবিধানের অনুমোদন পাওয়া যায়।

মার্কিন সংবিধান

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে গৃহীত মার্কিন সংবিধানটি আকারে খুবই ছোট—দশটি ছাপা পাতায় বিধিবদ্ধ। একটি প্রস্তাবনা এবং ৭টি ধারা নিয়ে মার্কিন সংবিধান। ঐ ৭টি ধারার মধ্যে মাত্র ২১টি উপধারা আছে। সংবিধান গৃহীত হবার পরেই দেখা যায় যে সংবিধানে অধিকার সংক্রান্ত কোন আইন বিধিবদ্ধ করা হয়নি। তাই ১৭৯১ সালে অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের দশটি সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে ঐ অভাব পূরণ করা হয়। সংবিধানের ঐ প্রথম দশটি সংশোধনীকে 'সংশোধনী' হিসেবে না ধরে সংবিধানের অঙ্গ হিসেবে ধরা হয়।

চার ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান, ১৭৮৭ (The Constitution of U. S. A. 1787)

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে গৃহীত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে মার্কিন সংবিধান পঠন-পাঠনের সময়ে মূল সংবিধানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং প্রয়োজনের সময়ে মূল সংবিধানের সঙ্গে তা মিলিয়ে নিতে পারে সেজন্য মূল সংবিধানটি এখানে তুলে ধরা হল।

প্রস্তাবনা

অধিকতর পূর্ণাঙ্গ সংঘবদ্ধ জীবনযাপন, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগ্রহণ, দেশবাসীর কল্যাণলাভ এবং আমাদের ও আমাদের উত্তর-পুরুষদের জীবনে স্বাধীনতার আশীর্বাদ লাভের উদ্দেশ্যে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক-গণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই সংবিধান নিয়মানুগভাবে গ্রহণ করছি।

প্রথম অনুচ্ছেদ

ধারা ১ ॥ এই সংবিধানে প্রদত্ত সমস্ত আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট ও প্রতিনিধিসভা নিয়ে গঠিত কংগ্রেসে ন্যস্ত থাকবে।

ধারা ২ ॥ (ক) প্রতিনিধিসভা বিভিন্ন রাজ্যের নাগরিকগণ কর্তৃক প্রতি দু বছর অন্তর নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে এবং এই নির্বাচকগণের যোগ্যতা রাজ্য আইন-সভার বৃহত্তর শাখার নির্বাচকগণের যোগ্যতা যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ হবে।

(খ) কোন ব্যক্তির পঁচিশ বছর বয়স পূর্ণ না হলে এবং সাত বছর কাল যুক্ত-রাষ্ট্রের নাগরিক না থাকলে তিনি প্রতিনিধিসভার সদস্য হতে পারবেন না। তিনি যে-রাজ্য থেকে সদস্য হিসাবে দাঁড়াবেন সেই রাজ্যের অধিবাসী না হলে সেই রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হতে পারবেন না।

(গ) প্রতিনিধি এবং প্রত্যক্ষ কর যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত রাজ্যগুলির মধ্যে তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে বণ্টিত হবে এবং এই সংখ্যা স্বাধীন নাগরিকদের পূর্ণ সংখ্যার সঙ্গে (এর মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য বাধ্যতামূলক চাকুরিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে ধরা হবে, কিন্তু কর দেয় না এমন রেড ইণ্ডিয়ানদের বাদ দেওয়া হবে) অন্যান্য সকলের জন্য তিন-পঞ্চমাংশ যোগ করে নির্ধারিত হবে। প্রকৃত গণনাকার্য যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের পর তিন বছরের মধ্যে এবং পরবর্তী প্রতি দশ বছর অন্তর আইনের নির্দেশানুসারে সম্পন্ন করতে হবে। প্রতিনিধির সংখ্যা প্রতি ত্রিশ হাজারে একজনের বেশি হবে না কিন্তু প্রত্যেক রাজ্যের অন্ততপক্ষে একজন প্রতিনিধি থাকতেই হবে। এই গণনাকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নিউ হ্যাম্পশায়ার রাজ্য তিনজন, ম্যাসাচুসেটস্ আটজন, রোডআইল্যাণ্ড ও প্রভিডেন্স প্ল্যাণ্টেশনস্ একজন, কানেটিকাট পাঁচজন, নিউ ইয়র্ক ছয়জন, নিউ জার্সি চারজন, পেনসিলভ্যানিয়া আটজন, ডেলাওয়ার একজন,

মেরিল্যাণ্ড ছয়জন, ভার্জিনিয়া দশজন, উত্তর ক্যারোলাইনা পাঁচজন, দক্ষিণ ক্যারোলাইনা পাঁচজন এবং জর্জিয়া তিনজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত করার অধিকারী হবে।

(ঘ) কোন রাজ্যের প্রতিনিধিপদ শূন্য হলে সেই রাজ্যের কর্তৃপক্ষ এরূপ শূন্যপদ পূরণের জন্য নির্বাচন-বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন।

(ঙ) হাউস্ অফ্ রেপ্রেজেণ্টেটিভস্ তাঁদের অধ্যক্ষ ও অন্যান্য আধিকারিক নির্বাচিত করবেন এবং এঁদের অভিযুক্ত করার সম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

ধারা ৩ ॥ (ক) প্রত্যেক রাজ্যের বিধানমণ্ডলী কর্তৃক ছয় বছরের জন্য নির্বাচিত দুজন করে সেনেটর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট গঠিত হবে এবং প্রত্যেক সেনেটরের একটি করে ভোটাধিকার থাকবে।

(খ) প্রথম নির্বাচনের পরে সমবেত হবার অব্যবহিত পরে তাঁরা যথাসম্ভব সমান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবেন। প্রথম শ্রেণীর সেনেটরদের আসন দ্বিতীয় বছর পূর্তির পর, দ্বিতীয় শ্রেণীর সেনেটরদের আসন চতুর্থ বছর পূর্তির পর এবং তৃতীয় শ্রেণীর সেনেটরদের আসন ষষ্ঠ বছর পূর্তির পর ছেড়ে দিতে হবে, যাতে প্রতি দু বছরে এক-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত হতে পারেন। যদি কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর বিরতিকালে, পদত্যাগ হেতু বা অন্য কোন কারণে সেনেটরের আসন শূন্য হয় তা হলে বিধানমণ্ডলী তার পরবর্তী অধিবেশনে উক্ত শূন্যস্থান পূর্ণ না করা পর্যন্ত সেখানকার নির্বাহী কর্তৃপক্ষ সাময়িক ভাবে সেনেটর নিয়োগ করতে পারবেন।

(গ) বয়স ত্রিশ বছর পূর্ণ না হলে এবং ন' বছর কাল যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক না থাকলে এবং নির্বাচন কালে যে রাজ্য থেকে নির্বাচিত হবেন সেই রাজ্যের অধিবাসী না হলে কোন ব্যক্তি সেনেটর হতে পারবেন না।

(ঘ) যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি সেনেটের সভাপতি হবেন কিন্তু সেনেট সমভাবে বিভক্ত না হলে তাঁর কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

(ঙ) সেনেট তার অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত করবে এবং উপরাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে, অথবা যখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কাজ পরিচালনা করবেন, তখন সেনেটের কাজ চালাবার জন্য একজন সাময়িক অধ্যক্ষ নিযুক্ত করবে।

(চ) বিশেষ ধরনের গুরুতর অভিযোগ (impeachment) বিচারের পূর্ণ ক্ষমতা একমাত্র সেনেটের থাকবে। এই উদ্দেশ্যে অধিবেশন আহূত হলে সেনেটররা শপথ গ্রহণ করবেন অথবা সংকল্প বাক্য উচ্চারণ করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির বিচার-কালে সভাপতিত্ব করবেন প্রধান বিচারপতি এবং উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি ছাড়া কারও দণ্ডবিধান করা হবে না।

(ছ) বিশেষ ধরনের গুরুতর অভিযোগে (impeachment) দণ্ড হবে, পদ থেকে অপসারণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের অধীন কোন সম্মানজনক, লাভজনক অথবা আস্থাসূচক

কাজে নিযুক্ত হবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া—এর বেশী কোনো দণ্ড নয়। তবে দণ্ডিত ব্যক্তিকে পুনরায় আইন অনুসারে অভিযুক্ত করে তার বিচার ও দণ্ডবিধান করা যাবে।

ধারা ৪ ॥ (ক) সেনেটর ও প্রতিনিধিবর্গের নির্বাচনের সময়, স্থান ও পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানমণ্ডলী কর্তৃক নির্ধারিত হবে। কিন্তু কেবল সেনেটর নির্বাচনের স্থান ছাড়া কংগ্রেস যে কোন সময় আইনের দ্বারা এই নিয়মাবলী প্রণয়ন অথবা পরিবর্তন করতে পারেন।

(খ) কংগ্রেসের অধিবেশন প্রত্যেক বছর অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হবে এবং এই অধিবেশন কোন্ তারিখে হবে তা কংগ্রেস কর্তৃক আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট না হলে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সোমবার অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা ৫ ॥ (ক) কংগ্রেস ও সেনেট তাদের নিজ নিজ সদস্যদের নির্বাচন, নির্বাচনের ফলাফল ও যোগ্যতার বিচারক হবে এবং প্রত্যেক সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কার্য-পরিচালনার কোরাম স্থির করা হবে। কিন্তু সংখ্যাল্পতার দরুন সভা স্থগিত থাকতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে অনুপস্থিত সদস্যদের উপস্থিত হতে বাধ্য করার এবং শাস্তি বিধান করার ক্ষমতা সেই অল্পসংখ্যক সদস্যগণের থাকবে। এ বিষয়ে কি নিয়ম অনুসরণ করা হবে এবং কিরূপ শাস্তি দেওয়া যেতে পারে তা প্রত্যেক সভা স্থির করবে।

(খ) প্রত্যেক সভা তার কার্যবিধি নির্ধারণ করতে, সদস্যগণের উচ্ছৃংখল আচরণের জন্য শাস্তিদান করতে এবং যে-কোন সদস্যকে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে সভা থেকে বহিষ্কৃত করতে পারবে।

(গ) প্রত্যেক সভা তার কার্যধারার একটি পুস্তিকা রাখবে এবং তাদের বিচারে কার্যধারার যে অংশ গোপন রাখা উচিত সেই অংশ ছাড়া অন্যান্য সব অংশ মাঝে মাঝে প্রকাশ করবে এবং প্রত্যেক সভায় সদস্যদের ইতিবাচক বা নেতিবাচক উত্তর উপস্থিত এক-পঞ্চমাংশ সদস্যের মতানুসারে পুস্তিকায় মুদ্রিত হবে।

(ঘ) কংগ্রেসের অধিবেশ কালে কোন সভাই অন্য সভার বিনা সম্মতিতে তিনদিনের বেশি সময়ের জন্য সভার কার্য স্থগিত রাখতে পারবে না এবং উভয় সভার অধিবেশন কক্ষের বাইরে কোন স্থানে অধিবেশনের ব্যবস্থা করতে পারবে না।

ধারা ৬ ॥ (ক) সেনেটর ও প্রতিনিধিগণ তাঁদের কাজের জন্য আইন-নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক পাবেন এবং তা যুক্তরাষ্ট্রের রাজকোষ থেকে প্রদত্ত হবে। তাঁরা রাজদ্রোহ কিংবা অনুরূপ গুরুতর অপরাধ বা শান্তিভঙ্গের অপরাধে অপরাধী না হলে সকল ক্ষেত্রে তাঁদের নিজ নিজ কক্ষে উপস্থিতকালে এবং সভায় যাবার সময় গ্রেপ্তার করা যাবে না এবং তাঁদের সভার নিজ নিজ কক্ষে কোন বক্তৃতা করার দরুন বা বিতর্কে যোগদানের জন্য কোনরূপ প্রশ্ন করা চলবে না।

(খ) কোন সেনেটর বা প্রতিনিধি যে সময়ের জন্য তিনি নির্বাচিত হয়েছেন সেই

সময়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অধীন কোন বে-সামরিক বিভাগে এমন কোন পদে নিযুক্ত হতে পারবেন না যে-পদ কেবল সেই সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে অথবা যে-পদের বেতন সেই সময়ে বর্ধিত করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অধীন কোন পদে অধিষ্ঠিত থেকে সেনেটের কিংবা কংগ্রেসের সদস্য হতে পারবেন না।

ধারা ৭ ॥ (ক) রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত সমস্ত বিল প্রতিনিধিসভায় প্রথম উপস্থাপিত হবে। কিন্তু অন্যান্য বিলের অনুরূপ এ বিলের ক্ষেত্রেও সেনেট সংশোধন-প্রস্তাব আনতে অথবা আনীত সংশোধন-প্রস্তাবে একমত হতে পারবে।

(খ) প্রত্যেক বিল প্রতিনিধিসভা ও সেনেটে পাস হলে তা আইনে পরিণত হবার আগে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হবে। রাষ্ট্রপতি বিলটি অনুমোদন করলে তাতে স্বাক্ষর করবেন, কিন্তু অনুমোদন না করলে তাঁর আপত্তি জানিয়ে বিলটি যে সভায় উত্থাপিত হয়েছিল সেই সভায় ফেরত দিবেন। সভা আপত্তিগুলি তাদের পুস্তিকায় বিস্তারিত প্রকাশ করে তা পুনর্বিবেচনার জন্য অগ্রসর হবে। এরূপ পুনর্বিবেচনার পর সেই সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য বিলটি পাস করতে সম্মত হলে, আপত্তিগুলি সহ তা অন্যকক্ষে প্রেরিত হবে এবং সেখানে অনুরূপভাবে পুনর্বিবেচিত হবে এবং সেই সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অনুমোদন করলে তা আইনে পরিণত হবে। এসব ক্ষেত্রে উভয় সভাতেই ভোট "হ্যাঁ" বা "না"-দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং বিলের পক্ষে ও বিপক্ষের ভোটদাতাদের নাম সংশ্লিষ্ট সভার পুস্তিকাতে স্থান পাবে। যদি কোন বিল রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করার পর রবিবার বাদ দিয়ে দশ দিনের মধ্যে ফেরত না আসে তা হলে তিনি সম্মতি দিয়েছেন ধরে নিয়ে তা আইনে পরিণত হবে। তবে যদি কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত থাকায় এরূপ ফেরত-আসা সম্ভব না হয় তা হলে তা আইনে পরিণত হবে না।

(গ) সেনেট ও প্রতিনিধি সভার যুগ্ম সম্মতির প্রয়োজন হতে পারে (স্থগিতের প্রশ্ন ব্যতীত) এমন প্রত্যেকটি আদেশ প্রস্তাব বা ভোট যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করতে হবে এবং তা কার্যকরী হবার আগে তাঁর অনুমতি লাভ করতে হবে অথবা তাঁর অনুমতি লাভ না করলে নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ অনুসারে তা সেনেট ও প্রতিনিধিসভার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের দ্বারা পুনরায় পাস করাতে হবে।

ধারা ৮ ॥ (ক) কংগ্রেসের ক্ষমতা থাকবে: কর, শুল্ক, আমদানি শুল্ক ও আন্তঃশুল্ক ধার্য ও সংগ্রহ করার এবং তা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ পরিশোধ, সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সাধারণ কল্যাণ বিধান করার ; তবে এই কর, শুল্ক, আমদানি শুল্ক ও আন্তঃশুল্কের হার যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র সমান থাকবে ;

(খ) যুক্তরাষ্ট্রের নামে অর্থ ঋণ সংগ্রহের ;

(গ) বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ও রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতিদের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবস্থা করার ;

(ঘ) সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশীদের নাগরিক অধিকার দান সম্পর্কে একই প্রকার নিয়ম এবং দেউলিয়া বিষয়ে একই প্রকার আইন প্রণয়ন করার ;

(ঙ) মুদ্রা তৈরি এবং সেই মুদ্রা ও বিদেশী মুদ্রার মূল্য নিরূপণ এবং ওজন পরিমাপের মান নির্ধারণের ;

(চ) যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত মুদ্রা ও সরকারী সিকিউরিটিসমূহ জাল করার অপরাধে শাস্তি বিধানের ;

(ছ) ডাকঘর ও ডাকপথ স্থাপনের ;

(জ) লেখক ও আবিষ্কারকদের তাঁদের সংশ্লিষ্ট রচনা ও আবিষ্কারের ওপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একান্ত অধিকার দান করে বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক কলার অগ্রগতি সাধনের ;

(ঝ) সুপ্রীম কোর্ট থেকে নিম্ন পর্যায়ের ট্রাইবুনাল গঠন করার ;

(ঞ) বাহির সমুদ্রে বোম্বেটেগিরি ও মারাত্মক অপরাধ এবং বিভিন্ন জাতির আইনের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ ব্যাখ্যা করার এবং শাস্তি বিধানের ;

(ট) যুদ্ধ ঘোষণা, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কোন কিছু দখলের আদেশ দান এবং জল ও স্থলে বন্দী ও দখল-করা বস্তু সংক্রান্ত বিধিবিধান রচনার ;

(ঠ) সৈন্যবাহিনী গঠন ও পোষণ করার ; কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে দু বছরের বেশী সময়ের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা যাবে না ;

(ড) নৌবাহিনী গঠনের ও সংরক্ষণের ;

(ঢ) সরকারের বিধিবিধান তৈরীর এবং স্থল ও নৌবাহিনী সংক্রান্ত নিয়মকানুন রচনার ;

(ণ) ইউনিয়নের আইন কার্যকরী করার জন্য, বিদ্রোহ দমন করার জন্য এবং আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাজ্য মিলিশিয়া তলব করার আইনগত ব্যবস্থা করার ;

(ত) মিলিশিয়াকে সংগঠিত, সশস্ত্র ও নিয়মানুবর্ত করা এবং তাদের যে অংশ যুক্তরাষ্ট্রের কাজে নিয়োজিত হতে পারে তাকে পরিচালন করার ; কংগ্রেস কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে রাজ্যগুলিকে তাদের প্রশিক্ষণের ও অফিসার নিয়োগের অধিকার দানের ;

(থ) কোন রাজ্যের স্বেচ্ছানুমতিতে ও কংগ্রেসের গ্রহণ সাপেক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হতে পারে এমন যে-কোন এলাকায় (দশ বর্গ মাইলের বেশি নয়) সব রকম আইন-প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার এবং রাজ্য-আইন-সভার অনুমতিক্রমে ক্রীত যে সকল স্থানে দুর্গ, অস্ত্রাগার, বারুদখানা, জাহাজ নির্মাণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভবন নির্মাণ হতে পারে সেই সকল স্থানে অনুরূপ অধিকার প্রয়োগ করার ;

(দ) উপরোক্ত অধিকারগুলি এবং সংবিধান কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে, অথবা তার কোন বিভাগকে, অথবা তার কোন কর্মচারীকে প্রদত্ত অন্যান্য সকল অধিকার নির্বাহের জন্য উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় সমস্ত আইন প্রণয়নের।

ধারা ৯ ॥ (ক) বর্তমান কোন রাজ্য যদি কোন ব্যক্তির দেশত্যাগে বা ব্যক্তির বিদেশ থেকে এসে বসবাসে অনুমতি দান উপযুক্ত বলে মনে করে তবে তা কংগ্রেস কর্তৃক ১৮০৮ সালের আগে নিষিদ্ধ করা হবে না। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি-পিছু দশ ডলারের অনধিক কর বা শুল্ক ধার্য করা যাবে।

(খ) বিদ্রোহ বা আক্রমণের দরুন সাধারণ নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন না হলে হেবিয়াস্ কর্পাস্ আইনের সুবিধা রহিত করা হবে না।

(গ) মৃত্যুদণ্ড বা অপর কোন দণ্ডে দণ্ডিত কোন ব্যক্তির নাগরিক অধিকার লোপ সম্পর্কিত বা অতীত বিষয় ঘটিত কোন বিল পাস হবে না।

(ঘ) আদমসুমারী বা জনগণনার ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই আদমসুমারী বা জনগণনার আনুপাতিক হার ভিন্ন কোন ব্যক্তিগত কর বা অন্য প্রত্যক্ষ কর বসানো হবে না।

(ঙ) কোন রাজ্য থেকে রপ্তানিকৃত দ্রব্যের উপর কোন কর বা শুল্ক বসানো হবে না।

(চ) কোন বাণিজ্যিক বা রাজস্ব আইনের বলে এক রাজ্যের বন্দরগুলিকে অন্য রাজ্যের বন্দরগুলি অপেক্ষা কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে না এবং এক রাজ্যের অন্তর্গামী বা বহির্গামী কোন জাহাজ অন্য রাজ্যের বন্দরে প্রবেশ করতে, বের হতে বা শুল্ক দিতে বাধ্য থাকবে না।

(ছ আইনের বলে মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দের প্রয়োজন ছাড়া রাজকোষ থেকে কোন অর্থ তোলা যাবে না; এবং সকল সরকারী অর্থের জমা ও খরচের নিয়মিত হিসাব মাঝে মাঝে প্রকাশ করতে হবে।

(জ) যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আভিজাত্যসূচক কোন উপাধি প্রদত্ত হবে না এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অধীন লাভজনক বা দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কংগ্রেসের বিনা অনুমতিতে কোন রাজা, রাজকুমার বা বিদেশী রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোন উপহার, বেতন, চাকুরি বা কোন প্রকার উপাধি গ্রহণ করবে না।

ধারা ১০ ॥ (ক) কোন অঙ্গ রাজ্য কোন চুক্তি করতে, মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন করতে, জোট বা সন্ধিবন্ধ হতে, আক্রমণ ও প্রতিশোধাত্মক দখল করার নির্দেশ দান করতে, মুদ্রা তৈরি করতে, ঋণপত্র ছাড়তে, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছাড়া অন্যকিছুর মাধ্যমে ঋণশোধ করতে, রাজদ্রোহ বা অন্য কোন অপরাধে নাগরিক অধিকার লোপ করতে, অতীত বিষয়ঘটিত কোন বিল, অথবা চুক্তির বাধ্যবাধকতার পক্ষে ক্ষতিকর কোন আইন পাস করতে অথবা আভিজাত্যসূচক কোন উপাধি প্রদান করতে পারবে না।

(খ) পরিদর্শন আইন কার্যকর করার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ছাড়া কোন অঙ্গ রাজ্য কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া আমদানির ও রপ্তানির উপর কোন শুল্ক ধার্য করতে পারবে না এবং কোন রাজ্য কর্তৃক আমদানির ও রপ্তানির ওপর ধার্য সমস্ত শুল্ক বাবদ নীট আয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজকোষের ব্যবহারের জন্য থাকবে এবং এরূপ সমস্ত আইন কংগ্রেসের সংশোধন-ক্ষমতার অধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

(গ) কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া কোন অঙ্গরাজ্য জাহাজের টন প্রতি শুল্ক বসাতে, শান্তিকালে সৈন্য অথবা যুদ্ধজাহাজ রাখতে, অন্য কোন অঙ্গরাজ্য অথবা কোন বিদেশী শক্তির সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে অথবা প্রকৃতপক্ষে আক্রান্ত না হলে অথবা বিলম্ব করা যায় না এমন আশু বিপদে না পড়লে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে পারবে না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ধারা ১ ॥ (ক) শাসন পরিচালনা ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি তাঁর এই পদে চার বছর বহাল থাকবেন এবং একই সময়ের জন্য মনোনীত উপরাষ্ট্রপতিসহ নিম্নরূপে নির্বাচিত হবেন।

(খ) প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য, সেখানকার আইন-সভা যেরূপ নির্দেশ করবে সেই নির্দেশমত কংগ্রেসে রাজ্যের প্রতিনিধিত্বের জন্য সেনেটর ও প্রতিনিধির যে সংখ্যা নির্ধারিত আছে তারই সমসংখ্যক নির্বাচক নিয়োগ করবে; কিন্তু কোন সেনেটর বা প্রতিনিধি অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অধীন লাভজনক বা দায়িত্বপূর্ণ সংস্থার পদাধিকারী কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির নির্বাচক হতে পারবেন না।

(গ) কংগ্রেস নির্বাচক মনোনীত করার তারিখ এবং তাঁদের ভোটদানের তারিখ নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন; সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ঐ তারিখটি একই হবে।

(ঘ) জন্মসূত্রে নাগরিক বা এই সংবিধান গৃহীত হবার সময় যিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছিলেন তিনি ভিন্ন অন্য কেউ রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না। আবার কোন ব্যক্তি পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক না হলে এবং যুক্তরাষ্ট্রের চৌদ্দ বছরের বাসিন্দা না হলে উক্তপদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না।

(ঙ) রাষ্ট্রপতি তাঁর পদ থেকে অপসৃত হলে বা তাঁর মৃত্যু কিংবা পদত্যাগ ঘটলে বা ঐ পদের ক্ষমতা ও কর্তব্যপালনে তাঁর অক্ষমতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কর্তব্যকর্ম উপরাষ্ট্রপতির ওপর বর্তাবে এবং কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি উভয়ের অপসারণ, মৃত্যু, পদত্যাগ বা অক্ষমতার ক্ষেত্রে আইন-বলে কে রাষ্ট্রপতিপদে অস্থায়ীভাবে কার্য করবেন তা ঘোষণা করে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। এই অসুবিধা দূর না হওয়া পর্যন্ত বা একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কাজ চালিয়ে যাবেন।

(চ) রাষ্ট্রপতি তাঁর কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে পারিশ্রমিক পাবেন এবং তিনি যে সময়ের জন্য নির্বাচিত হবেন সেই সময়কালের মধ্যে তা বাড়বে বা কমবে না এবং তিনি ঐ সময় যুক্তরাষ্ট্রের বা কোন অঙ্গরাজ্যের কাছ থেকে আর কোন বেতন নেবেন না।

(ছ) কার্যপরিচালনার ভার গ্রহণের আগে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করবেন, "আমি এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি, যে, আমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কাজ পরিচালনা করব এবং যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে যথাসাধ্য পালন, রক্ষা ও সমর্থন করবো।"

ধারা ২ ॥ (ক) রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর এবং যুক্তরাষ্ট্রের কার্যে আহূত বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যের সামরিক বাহিনীর (militia) সর্বাধিনায়ক হবেন; তিনি লিখিতভাবে প্রত্যেক কার্যনির্বাহী বিভাগের প্রধান কর্মচারীর কাছে তাঁর সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্তব্যকার্য সম্বন্ধীয় যে-কোন বিষয়ে মতামত

চাইতে পারেন ; এবং রাষ্ট্র সংক্রান্ত গুরুতর অভিযোগ ভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত সকল অপরাধ ক্ষমা করার ও দণ্ড হ্রাস করার ক্ষমতা তাঁর থাকবে।

(খ) সেনেটের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে তাঁর সন্ধি বা চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা থাকবে, অবশ্য যদি উপস্থিত সেনেটরদের দুই-তৃতীয়াংশ এই সম্মতি দেন ; এবং রাষ্ট্রদূত অন্যান্য সরকারী মন্ত্রী ও কনসাল, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য সকল কর্মচারী যাঁদের নিয়োগের নিয়ম এখানে অন্যভাবে বর্ণিত হয়নি এবং যা আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—তাঁদের মনোনয়নের এবং সেনেটের পরামর্শ ও অনুমতিক্রমে নিয়োগের ক্ষমতা রষ্ট্রপতির থাকবে ; কিন্তু কংগ্রেস সমীচীন মনে করলে নিম্নতন কর্মচারীদের নিয়োগক্ষমতা আইনবলে কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতিকে অথবা আদালতকে অথবা বিভাগীয় কর্তাদের উপর প্রদান করতে পারেন।

(গ) সেনেটের বিরতিকালে কোন পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতি তা কমিশন জারি করে পূরণ করতে পারেন এবং এই কমিশন পরবর্তী অধিবেশনের শেষে নাকচ হয়ে যাবে।

ধারা ৩ ॥ রাষ্ট্রপতি মাঝে মাঝে কংগ্রেসকে ইউনিয়নের অবস্থা জ্ঞাপন করবেন এবং তাঁর মতে প্রয়োজনীয় ও যথাযোগ্য ব্যবস্থাদি কংগ্রেসের সদস্যদের বিবেচনার জন্য সুপারিশ করবেন ; তিনি বিশেষ ক্ষেত্রে উভয় সভার অথবা যে-কোন একটির অধিবেশন আহ্বান করতে পারবেন এবং অধিবেশন স্থগিতের সময় সম্পর্কে দুই কক্ষের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে তিনি তাঁর মতে উপযুক্ত সময় পর্যন্ত তা স্থগিত রাখতে পারবেন, তিনি রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য সরকারী প্রতিনিধিদের সরকারীভাবে গ্রহণ করবেন ; তিনি আইনের প্রয়োগ যাতে যথাযথভাবে হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সকল কর্মচারী নিয়োগের আদেশ দান করবেন।

ধারা ৪ ॥ রাজদ্রোহ, উৎকোচ গ্রহণ বা অন্যান্য ভয়ানক অপরাধ ও নৈতিক দুষ্কার্যের জন্য যদি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং অন্যান্য অসামরিক অফিসারবর্গ অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডিত হন তবে তাঁদের নিজ নিজ পদ থেকে অপসারিত করা হবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ধারা ১ ॥ যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-ক্ষমতা একটি সুপ্রীম কোর্টের উপর এবং কংগ্রেস কর্তৃক প্রয়োজনমত নিযুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত নিম্নতন আদালতের ওপর ন্যস্ত হবে। সুপ্রীম কোর্ট ও নিম্নতন আদালত উভয়েরই বিচারকগণ যতদিন সদাচার করবেন ততদিন পদাধিকারী থাকবেন এবং তাঁদের কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে পারিশ্রমিক পাবেন। এই পারিশ্রমিক তাঁদের কার্যকালে হ্রাস পাবে না।

ধারা ২ ॥ (ক) বিচার-ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত থাকবে সংবিধান ও যুক্তরাষ্ট্রের আইনগুলির অন্তর্ভুক্ত সমুদয় আইন ও ইকুইটির (equity) মামলার ক্ষেত্রে এবং যেসব সন্ধি করা হয়েছে কিংবা করা হবে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও আইনের বলে সে ক্ষেত্রে,

রাষ্ট্রদূত, অন্যান্য দূত এবং কন্সালদের নিয়ে মামলার ক্ষেত্রে ; সামরিক নৌবাহিনী ও বাণিজ্যপোত সংক্রান্ত সকল মামলার ক্ষেত্রে ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেসব বিরোধে জড়িত সেসব বিরোধের ক্ষেত্রে ; দুই বা ততোধিক অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে, একটি অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে অন্য একটি অঙ্গরাজ্যের নাগরিকদের বিরোধের ক্ষেত্রে ; ভিন্ন অঙ্গরাজ্য কর্তৃক প্রদত্ত জমি নিয়ে একই অঙ্গরাজ্যের নাগরিকদের মধ্যে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে এবং একটি অঙ্গরাজ্য অথবা তার নাগরিকগণ এবং বিদেশী রাষ্ট্র, নাগরিক বা প্রজাগণের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে।

(খ) রাষ্ট্রদূত, অন্যান্য সরকারী দূত ও কন্সালদের ক্ষেত্রে এবং যেখানে কোন রাজ্য মামলায় একপক্ষভুক্ত হবে সেসব ক্ষেত্রে মামলা সুপ্রীম কোর্টের Original Jurisdiction-এর অন্তর্গত হবে। পূর্বে উল্লিখিত আর সব ক্ষেত্রে সকল মামলা, আইন ও ঘটনা উভয়বিধ বিষয়ে, কংগ্রেস কর্তৃক রচিত নিয়মকানুন ও আপত্তি সাপেক্ষে, সুপ্রীম কোর্টের আপীল সীমার অন্তর্ভুক্ত হবে।

(গ) প্রশাসন সংক্রান্ত গুরুতর অপরাধ (impeachment) ছাড়া অন্যান্য সকল অপরাধের বিচার জুরী দ্বারা সম্পাদিত হবে এবং এই বিচার যে অঙ্গরাজ্যে অপরাধ সংঘটিত হবে সেই অঙ্গরাজ্যে নিষ্পন্ন হবে। কিন্তু অপরাধ কোন রাজ্যের সীমার মধ্যে সংঘটিত না হলে কংগ্রেস আইনবলে যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করবেন বিচারকার্য সেইস্থানে নিষ্পন্ন হবে।

ধারা ৩ ॥ (ক) যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ বলতে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা অথবা রাষ্ট্রের শত্রুদের সঙ্গে যোগদান করা, তাদের সাহায্য করা, সুবিধা করে দেওয়া বোঝাবে। রাজদ্রোহের অপরাধে কাকেও দণ্ডিত করা যাবে না যদি তার বিরুদ্ধে দুজন সাক্ষীর প্রমাণ না থাকে অথবা যদি সে প্রকাশ্য আদালতে স্বীকারোক্তি না করে।

(খ) রাজদ্রোহের শাস্তি ঘোষণার অধিকারী কংগ্রেস। রাজদ্রোহের কোন অপরাধীর সম্পত্তি সে জীবিত থাকা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত রাখা চলবে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর এই কারণে তার পরিবারস্থ কারও কোন দুর্ভোগ ভুগতে হবে না।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

ধারা ১ ॥ প্রত্যেক রাজ্যে অপরাপর প্রত্যেক রাজ্যের সরকারী আইন, দলিল ও বিচারধারার প্রতি আস্থা এবং সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। যে পদ্ধতিতে এরূপ আইন, দলিল ও বিচার ও তার ফলাফল প্রমাণিত করা যাবে, কংগ্রেস তা আইনের মাধ্যমে ঠিক করে দেবে।

ধারা ২ ॥ (ক) প্রত্যেক রাজ্যের নাগরিকগণ অন্য রাজ্যের নাগরিকগণের সুযোগ-সুবিধার ও স্বাধীনতার অধিকারী হবে।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি কোন রাজ্যে রাজদ্রোহ, মারাত্মক অপরাধ বা অন্য কোন অপরাধ করে বিচার এড়াবার উদ্দেশ্যে পলায়ন করে এবং তাকে যদি অন্য রাজ্যে পাওয়া যায়, তবে যে রাজ্য থেকে সে পলায়ন করবে সেই রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দাবিতে তাকে যে রাজ্যএলাকায় অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই রাজ্যে নিয়ে যাবার জন্য প্রত্যর্পণ করতে হবে।

(গ) এক রাজ্যের আইনের অধীনে কোন বাধ্যতামূলক চাকুরী বা শ্রমে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি অন্য রাজ্যে পলায়ন করলে সেখানকার কোন আইন বা বিধির ফলে এরূপ চাকরি বা শ্রম থেকে সে অব্যাহতি পাবে না, কিন্তু তার চাকুরী বা শ্রমের উপর যার দাবি থাকবে তার কাছে সে প্রত্যর্পিত হবে।

ধারা ৩ ॥ (ক) কংগ্রেস কর্তৃক কোন নূতন রাজ্য এই ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে ; কিন্তু অন্য কোন অঙ্গ রাজ্যের সীমার মধ্যে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত হতে পারবে না ; অথবা কংগ্রেস ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির আইনসভাসমূহের অনুমতি ছাড়া দুই বা ততোধিক রাজ্যের বা রাজ্যগুলির অংশবিশেষের সংযুক্তির দ্বারা কোন রাজ্য গঠিত হতে পারবে না।

(খ) কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রভুক্ত এলাকা ও তার অন্যান্য সম্পত্তি সম্পর্কিত সমস্ত প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন রচনা করতে এবং তা বাতিল করতে পারবে এবং এই সংবিধানের কোন কিছুই এমনভাবে ব্যাখ্যাত হবে না যা যুক্তরাষ্ট্রের বা কোন একটি অঙ্গ রাজ্যের দাবির পরিপন্থী রূপে গণ্য হতে পারে।

ধারা ৪ ॥ যুক্তরাষ্ট্র এই ইউনিয়নের প্রত্যেক রাজ্যকে সাধারণতন্ত্র সরকার গঠনের নিশ্চয়তা দান করবে এবং প্রত্যেক রাজ্যকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। তা ছাড়া আইনসভার আবেদনক্রমে এবং যখন আইনসভার অধিবেশন সম্ভব নয় তখন কার্য-পরিচালনা কর্তৃপক্ষের আবেদনক্রমে যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গরাজ্যগুলিকে অভ্যন্তরীণ হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করবে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রয়োজনবোধ করলে, কংগ্রেস সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব করবে অথবা রাজ্যগুলির আইন-সভাসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ আবেদন করলে, সংশোধন-প্রস্তাবের জন্য সম্মেলন আহবান করবে। তিন-চতুর্থাংশ রাজ্যের আইন-সভাগুলি যদি অনুমোদন করে অথবা তিন-চতুর্থাংশ রাজ্যে সম্মেলন আহবান করে যদি তা অনুমোদিত করা হয় তা হলে এই সংশোধন সর্ব বিষয়ে সংবিধানের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হবে। এই পদ্ধতির যে-কোন একটি কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী অনুসরণ করা যেতে পারে, কিন্তু ১৮০৮ সালের আগে গৃহীত হতে পারে এমন কোন সংশোধনই কোন প্রকারে প্রথম অনুচ্ছেদের ৯ ধারার (ক) ও (ঘ) উপধারাকে ক্ষুন্ন করতে পারবে না ; এবং কোন রাজ্য, তার সম্মতি ছাড়া সেনেটে ভোটদানের সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

(ক) এই শাসনতন্ত্র গৃহীত হবার আগে সকল ঋণ ও প্রতিশ্রুতি কনফেডারেশনের ক্ষেত্রে যেরূপ বলবৎ ছিল এই সংবিধানের অধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ-ভাবে বলবৎ থাকবে।

(খ) এই শাসনতন্ত্র এবং তার অনুসরণে গৃহীত যুক্তরাষ্ট্রের আইনসমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বের অধীন নিষ্পন্ন অথবা সম্পাদিত সমস্ত চুক্তি দেশের সর্বোচ্চ আইনরূপে গণ্য হবে; এবং প্রত্যেক রাজ্যে বিচারপতিগণ, রাজ্যের শাসনতন্ত্রে অথবা আইনে বিপরীত কিছু থাকলেও, উক্ত সর্বোচ্চ আইন দ্বারা পরিচালিত হবেন।

(গ) পূর্বে উল্লিখিত সেনেটরগণকে, প্রতিনিধিগণকে, বিভিন্ন রাজ্য-আইনসভার সদস্যগণকে ও যুক্তরাষ্ট্রের এবং বিভিন্ন রাজ্যের শাসনপরিচালন ও বিচারবিভাগীয় কর্মচারীদের এই শাসনতন্ত্র সমর্থনের শপথ গ্রহণ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অধীন কোন পদ বা দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজে যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচারে ধর্মের প্রশ্ন আনা হবে না।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

ন'টি রাজ্যের সম্মেলনে এই সংবিধান অনুমোদন লাভ করলে তা ঐ নয়টি রাজ্যে সংবিধান প্রবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট বলে গণ্য হবে।

পাঁচ: মার্কিন সংবিধানের সম্প্রসারণ (Growth of the American Constitution)

১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয় তা সেই সময়কার মার্কিন সমাজের সামাজিক, আর্থনীতিক এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং বিভিন্ন স্বার্থ-সংঘাতের মধ্যে আপোষসূত্র হিসাবে রচিত হয়েছিল। স্বভাবতই তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে রচিত ঐ সংবিধান মার্কিন সমাজের আগামীদিনের সকল প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। পরিবর্তিত অবস্থা এবং নতুন সামাজিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাই মার্কিন সংবিধানকে পরবর্তীকালে সম্প্রসারণ ও বিকশিত করতে হয়েছে।

কোন সংবিধানই অনড় এবং অপরিবর্তনীয় হতে পারে না। বিশেষ করে ১৭৮৭ সালের পরে মার্কিন সমাজের সকল দিকে যে পরিবর্তন সূচিত হয় এবং বিগত দুশো বছর ধরে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক শক্তির যে বিকাশ ও সম্প্রসারণ ঘটে তার সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে মার্কিন সংবিধানের গতিশীলতা রক্ষা করা ছিল অপরিহার্য। পরিবর্তিত সময় ও সামাজিক চাহিদার সঙ্গে যোগ রেখে বিবর্তনের মধ্য দিয়েই সংবিধানের সম্প্রসারণ ঘটে এবং সংবিধানের এই গতিশীলতাই সংবিধানকে যুগোপযোগী করে। মুনরো (Munro) তাঁর *The Government of the United States* গ্রন্থে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, মার্কিন সংবিধান অনড়, অচল বা যান্ত্রিক নয়। ১৭৮৭ সালে মার্কিন সংবিধানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল মাত্র। পরবর্তী

বংশধরেরা ঐ ভিত্তি প্রস্তরের ওপর একটি সংহত কাঠামো তৈরী করেছেন—যা এখনও সমাপ্ত হয়নি। অর্থাৎ ১৭৮৭ সালের সংবিধান যে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তা সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং আগামী দিনেও আরও সম্প্রসারিত হবে। সেজন্য তিনি বলেছেন যে, মার্কিন সংবিধান স্থিতিশীল (Static) নয়, ইহা গতিশীল (Dynamic) এবং বিবর্তনধর্মী—ইহা নিউটনবাদী নয়, ডারউইনবাদী।

তাই বৃহত্তর অর্থে কোন সংবিধান বলতে বিধিবদ্ধ একটি দলিলকে বোঝায় না, তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যক্ত করে। অগ্ এবং রে-এর ভাষায় বলা যায় *Actual Constitution is more than a document.* তাই সংকীর্ণ অর্থে ১৭৮৭ সালে সংবিধানকে মার্কিন সংবিধান নামে অভিহিত করা হলেও, বৃহত্তর অর্থে মার্কিন সংবিধান বলতে ১৭৮৭ সালে প্রণীত সংবিধান এবং পরবর্তীকালে ঐ সংবিধানের যে সকল সংশোধন, পরিবর্তন, সম্প্রসারণ ঘটে তাদের যোগফলকে বোঝায়।

বিবর্তনধর্মী মার্কিন সংবিধান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে মার্কিন সংবিধানে যে সকল উপাদানের সমষ্টিতে গড়ে উঠেছে সেগুলো হ'ল: ১. ১৭৮৭ সালে গৃহীত মার্কিন সংবিধান, ২ ১৭৮৯ সাল থেকে গৃহীত সংশোধনীগুলো (Amendments), ৩. সংবিধান সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, ৪. সংবিধান সংক্রান্ত কংগ্রেস প্রণীত আইন, ৫. রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী কার্য এবং ৬. প্রথা, রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য। বৃহত্তর অর্থে ঐ সকল উপাদান নিয়েই মার্কিন সংবিধান। ১৭৮৭ সালের মার্কিন সাংবিধানিক দলিলের সঙ্গে যে সকল উপাদান যুক্ত হয়ে মার্কিন সংবিধানের বিবর্তন তথা সম্প্রসারণ ঘটেছে সেগুলো আলোচনা করা প্রয়োজন।

১. সাংবিধানিক সংশোধনী

মার্কিন সংবিধান প্রবর্তনের পরে ঐ সংবিধানের প্রথম সম্প্রসারণ ঘটে সংশোধনী (Amendments) গ্রহণের মধ্য দিয়ে। মার্কিন সংবিধান কার্যকর হওয়ার (১৭৮৭) চার বছরের মধ্যে (১৭৯১) সালে দশটি সংশোধনী গৃহীত হয়। ঐ দশটি সংশোধনীকে একত্রে একটি সংশোধনী হিসাবে অনেক সময় ধরা হয়। মূল সংবিধানে 'অধিকার' সংক্রান্ত কোন সাংবিধানিক আইন গৃহীত না হওয়ায় দুটি সংশোধনের জন্য ১৭৯১ সালে উপরোক্ত দশটি সংশোধনী গ্রহণ করে জনগণের অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। অর্থাৎ প্রথম দশটি সংশোধনীর দ্বারা অধিকারের সনদ (Bill of Rights) বিধিবদ্ধ করা হয়।

মার্কিন সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি খুবই জটিল বলে মার্কিন সংবিধানকে সহজে পরিবর্তন করা যায় না। তাই মার্কিন সংবিধান কার্যকর হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত দুশো বছরে মার্কিন সংবিধানের আনুষ্ঠানিকভাবে মাত্র ২৪টি সংশোধনী (formal amendments) গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দশটি সংশোধনী হয় সংবিধান প্রণয়নের চার বছরের মধ্যে, পরের দুটি সংশোধনী গৃহীত হয় কুড়ি বছরের মধ্যে। বাকী ১২টি সংশোধনী গৃহীত হয় বিগত ১৭৫ বছরের মধ্যে।

মার্কিন সংবিধানের ২৪টি সংশোধনী সাংবিধানিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এনেছে তাকে এইভাবে তুলে ধরা যায়ঃ ১. জনগণের অধিকারকে বিধিবদ্ধ করা, ২. কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতার ওপরে বাধানিষেধ আরোপ করা, ৩. সরকারী কার্যপরিধিকে সম্প্রসারিত করা, ৪. সার্বজনীন ভোটাধিকারকে সম্প্রসারিত করা, এবং ৫. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রসারিত করা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সংশোধনীর দ্বারা মার্কিন সংবিধানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং বহু সাংবিধানিক চাহিদাকে মেটানো হয়েছে। সংশোধন-গুলো মূল সংবিধানের অনেকগুলো অপূর্ণতাকে দূর করে সংবিধানকে সম্প্রসারিত করেছে।

২. সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত

মার্কিন সংবিধানের বিকাশ এবং সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিচারবিভাগের ভূমিকা বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। মার্কিন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি খুবই জটিল ও কষ্টকর বলে অনেক সময় প্রয়োজনীয় মুহূর্তে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবিধান সংশোধন করা সম্ভব হয় না। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করে সুপ্রীম কোর্ট। ঊনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তের (Judicial decisions) দ্বারা মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাকে চরিতার্থ করে মার্কিন সংবিধান সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

কোন মামলা বিচার করার সময়ে মার্কিন বিচারালয় সেখানকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় গৃহীত আইন এবং শাসনবিভাগীয় নির্দেশের সাংবিধানিক বৈধতা বিচার করার ক্ষমতা ভোগ করে। এই ক্ষমতাকে বলে বিচার-বিভাগীয় সমীক্ষার (Judicial Review) ক্ষমতা। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে মার্কিন বিচারালয় সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারাকে ব্যাখ্যা করে। সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মার্কিন বিচারালয় সাংবিধানিক ধারাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন যার ফলে অর্থের পরিবর্তন হতে পারে এবং সংবিধানে নতুন মাত্রা যুক্ত হতে পারে।[1] মার্কিন বিচারালয় কর্তৃক সংবিধানের ব্যাখ্যা অনেক সময় সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনকে মেটায় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সংশোধনী গ্রহণ করার জটিল পদ্ধতি পরিহার করতে সাহায্য করে। সুপ্রীম কোর্টের এই ভূমিকার জন্য উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) মার্কিন সুপ্রীম কোর্টকে একটি চলমান সাংবিধানিক

1. This opens wide opportunity to make them mean something different from and probably more than, they previously had been supposed to mean, with the result of giving the constitution a new twist or slant.

—Ogg and Ray, *Eslsentias of American Govt.* p. 38.

সভা (a kind of continuous constitutional convention) নামে অভিহিত করেছেন।

সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা এবং সংবিধানের ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংবিধানের সংশোধন তথা সম্প্রসারণ মার্কিন সাংবিধানিক ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুপ্রীম কোর্টের এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ১৮০৩ সালের *Marbury vs. Madison* মামলাটি নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করে। এই মামলার পর থেকে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরা সংবিধানের যে ব্যাখ্যা দেন এবং যে অর্থ করেন তাই সাংবিধানিক আইন হিসাবে স্বীকৃতি পায়। এইজন্যই মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হিউজ (Hughes) বলেছেন, *We are under the constitution, but the constitution is what the judges say it is.*

৩. আইনসভা প্রণীত আইন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা শাসন পরিচালনার সাধারণ কাঠামোর রূপরেখা সংবিধানে বিধিবদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু খুটিনাটি বিষয়কে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, যখন যেমন প্রয়োজন দেখা দেবে সেই অনুসারে কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে ঐ প্রয়োজনকে পূরণ করবে। যেমন, সংবিধানে বলা হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন উপরাষ্ট্রপতি থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু উপরাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতে ঐ দায়িত্ব কে পালন করবেন সংবিধানে তা বলা হয়নি। পরবর্তীকালে কংগ্রেস এ সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করে সংবিধানের এই অপূর্ণতা দূর করে। এমনিভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভা কংগ্রেস এবং এমনকি রাজ্যের আইনসভাগুলোও বিভিন্ন সময়ে বহু আইন প্রণয়ন করে অনেক সাংবিধানিক প্রয়োজনকে মিটিয়েছে এবং ঐগুলোকে সংবিধানের অঙ্গ হিসেবে মনে করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মার্কিন সংবিধানকে সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে কংগ্রেস এবং রাজ্য আইনসভাগুলি প্রণীত আইনের ভূমিকা রয়েছে। তবে ঐ আইন যদি সংবিধানের আদর্শ ও ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এবং এ ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তবে আদালত ঐ আইন বাতিল করতে পারে।

৪. শাসনবিভাগের কার্যাবলী

মার্কিন সংবিধানের সম্প্রাসারণের ব্যাপারে বিচারবিভাগ এবং আইনবিভাগের মত শাসনবিভাগ এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষেরও ভূমিকা রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় যে শাসন কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের কার্যাবলী দ্বারাও মার্কিন সংবিধানের অনেক প্রয়োজন মেটান হয়েছে। যে সকল বিষয় মূল সংবিধানে কিছু বলা হয়নি সে সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতিরা তাঁদের সাংবিধানিক ক্ষমতা দ্বারা কিছু কিছু সাংবিধানিক প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন এবং সংবিধানকে ঐভাবে প্রয়োগ করেছেন। শাসনবিভাগ এবং প্রশাসনের এই কাজ অনেক ক্ষেত্রে সাংবিধানিক আইনের অভাব পূরণ করে সংবিধানকে

বিকশিত করেছে। কিন্তু এরূপ কোন বিশেষ কাজকে যদি আদালত সংবিধানসম্মত নয় বলে বিবেচনা এবং ঘোষণা করে তবে তা কার্যকর হতে পারবে না। অর্থাৎ আইন-বিভাগ প্রণীত আইনের মত ঐ সকল শাসনতান্ত্রিক নির্দেশ, ব্যাখ্যা এবং কাজ সুপ্রীম কোর্টের মতে সংবিধানসম্মত বলে বিবেচিত হতে হবে।

৫. প্রথা, রীতিনীতি ও ঐতিহ্য

দেশের প্রথা, রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে অনেক সাংবিধানিক নিয়ম গড়ে উঠে—যা বিধিবদ্ধ সংবিধানে স্থান পায় না। ব্রিটেনের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় প্রচলিত রীতিনীতির ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। ব্রিটেনের মত এত ব্যাপক না হলেও, মার্কিন সাং-বিধানিক ব্যবস্থায়ও প্রথা, রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য সীমিত ভাবে হলেও সাংবিধানিক বিকাশে সাহায্য করেছে। সরকার পরিচালন পদ্ধতির অনেক বিষয়ই সংবিধানে লেখা নেই—সেগুলো প্রচলিত প্রথা এবং রীতিনীতি ধরে চলে এবং পরে ঐগুলো দেশের রাজনৈতিক-সাংবিধানিক ঐতিহ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। যেমন, রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনের জন্য যে নির্বাচকমণ্ডলী (Electoral College) গঠিত হয় তাদের নির্বাচন কার্যপদ্ধতি প্রথাকে কেন্দ্র করে চলে আসছে এবং তা জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। সংবিধানে মার্কিন ক্যাবিনেট সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। বস্তুত প্রথা, রাজনীতি এবং ঐতিহ্যকে ভিত্তি করেই মার্কিন ক্যাবিনেটের আত্মপ্রকাশ এবং সম্প্রসারণ ঘটেছে। তাই মার্কিন সংবিধানের বিকাশের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, ১৭৮৭ সালে গৃহীত মার্কিন সংবিধানে সংবিধানের রূপরেখা তথা কাঠামোটা গড়ে তোলা হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশোধনী, বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, আইনসভা প্রণীত আইন, শাসনবিভাগীয় কার্যাবলী এবং প্রথা, রীতিনীতি ও ঐতিহ্য প্রভৃতি উপাদান সাংবিধানিক চাহিদাকে মিটিয়ে সংবিধান সম্প্রসারিত ও বিকশিত করে তুলেছে। মার্কিন সংবিধানের এই সম্প্রসারণ পদ্ধতি একটা ধারাবাহিক প্রবাহ—যা প্রতিনিয়ত সংবিধানের বিকাশে সাহায্য করছে। মার্কিন সংবিধানে এই সচলতার জন্যই মুনরো এই সংবিধানকে বিবর্তনধর্মী বা ডারউইনবাদী বলে অভিহিত করেছেন।

২ | মার্কিন সংবিধানের উৎস, চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য
Sources, Character and Features

এক : মার্কিন সংবিধানের উৎস (Sources of the Constitution)

দাবী করা হয় যে, মার্কিন সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংবিধান প্রণেতাদের কোন বিদেশী সংবিধানকে অনুসরণ করতে হয়নি, বা অন্যের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার কোন প্রচেষ্টা করতে হয়নি। বলা হয়, ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে গৃহীত মার্কিন সংবিধান স্বদেশী অভিজ্ঞতা এবং উত্তরাধিকারের ফসল। মার্কিন সংবিধান প্রণেতাদের ছিল ব্রিটিশ উত্তরাধিকার এবং অ্যাংলো-মার্কিন শাসনব্যবস্থা বা সরকারের গভীর অভিজ্ঞতা। ঐ উত্তরাধিকার এবং অভিজ্ঞতাবোধের সঙ্গে বাস্তববোধ, দূরদৃষ্টি এবং প্রয়োজনকে উপলব্ধি করার মত প্রাজ্ঞতার সংমিশ্রণে মার্কিন সংবিধান প্রণীত হয়েছে বলে অনেক সংবিধান বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন।

সংবিধান প্রণেতাদের অনেকেই ভাটেল (Vattel), মন্তেস্কু (Montesquiu) এবং উপমহাদেশের অন্যান্য দার্শনিকদের শিক্ষায় প্রভাবিত ছিলেন। এঁদের ইতিহাসের জ্ঞান ছিল প্রখর। বিভিন্ন রাষ্ট্রসমবায়ের শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁরা প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন কোন কোন ব্যবস্থা সংবিধানে গৃহীত হওয়া এবং না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করে মার্কিন সংবিধান প্রণেতারা সাধারণ আইন (Common Law), মহাসনদের (Magna Carta) আদর্শ এবং অধিকারের সনদের (Bill of Rights) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। জন লক্ (John Locke) এবং ব্ল্যাকস্টোনের (Blackstone)-এর দর্শন তাঁদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষ করে জন লকের সম্পত্তি (property) সংক্রান্ত মতবাদের প্রভাব মার্কিন সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

মার্কিন সমাজ জীবনে ব্রিটিশ রাজনীতি, দর্শন, আইন ও প্রচলিত রীতিনীতির প্রভাব বহুদিন আগে থেকেই ব্যাপ্ত ছিল। তাই মার্কিন সংবিধান প্রণয়নের অনেক, আগে থেকেই রাজনীতি, দর্শন, আইন ও রীতিনীতির ব্রিটিশ উত্তরাধিকার মার্কিন সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ভিত্তি হিসেবে দেখা দিয়েছিল। সুতরাং ১৭৮৭ সালের সংবিধানেও ঐ উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করা খুবই স্বাভাবিক। তাই যুক্তি অপেক্ষা অভিজ্ঞতা এবং অনুসরণ অপেক্ষা উত্তরাধিকারই মার্কিন সংবিধানের প্রধান উৎস হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

দুই : মার্কিন সংবিধানের শ্রেণী চরিত্র (Class Character of the Constitution of the United States)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস এবং সংবিধান সম্পর্কে লেখা বই-এ ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে মতপার্থক্যকে গুরুত্ব দিয়ে দেখান হয়েছে এবং বলা হয়েছে একটা আপোষ রফা হিসেবে এদের মধ্যে ঐক্যমত সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতিনিধিদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু মৌল বিষয়ে প্রথম থেকেই এঁদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল এবং ঐ মৌল বিষয় হল শ্রেণীগত স্বার্থের অভিন্নতা। বর্তমান শতকে J. Allen Smith-এর লেখা *The Spirit of American Government*, Charles A. Beard-এর লেখা *An Economic Interpretation of the Constitution of the United States* এবং Allen M. Potter-এর লেখা *American Government and* Politics গ্রন্থে মার্কিন সংবিধান প্রণেতাদের শ্রেণী-স্বার্থ, দৃষ্টিভঙ্গী, উদ্দেশ্য এবং সংবিধানের আর্থনীতিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করা হয়েছে। ঐ বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে যে সকল প্রতিনিধি সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং সম্পত্তিগত স্বার্থের প্রতিনিধি। এঁদের মধ্যে শ্রেণীগত স্বার্থের যে অভিন্নতা ছিল তারই ফসল হল ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে গৃহীত স বিধান।

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে গৃহীত সম্মেলন কার্যকর হবার আগে পর্যন্ত মার্কিন শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হ'ত রাষ্ট্রসরকারের অনুচ্ছেদ (Articles of Confederation) দ্বারা। ঐ সংবিধানে কেন্দ্রে দুর্বল সরকার স্থাপন করা হয়েছিল—যার ফলশ্রুতি হিসেবে অনেক ব্যাপারে রাজ্যগুলো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে। ফলে, ব্যবসায়ীরা রাজ্যগুলোর ট্যারিফ (Tariff) ও বাণিজ্য নীতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, জমির ফাটকাবাজিদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এবং সরকারী বণ্ড ক্রেতা ও সম্পত্তির মালিকদের স্বার্থ কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক দুর্বলতা এবং রাজ্যগুলোর নিয়ন্ত্রণের ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই ব্যবসায়ী এবং জমি ও সম্পত্তির মালিকেরা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার চেয়েছিলেন যাতে তাঁদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষিত হতে পারে এবং জাতীয়তাবাদীরা (Nationalist) শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের দাবী উত্থাপন করে তাঁদের স্বার্থকেই রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্রেণীস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করা হয়েছিল যাতে প্রস্তাবিত সংবিধান শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সম্মেলনে উপস্থিত ৫৫ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৪ জন ভূস্বামী—জমির ফাটকাবাজী ছিল তাঁদের পেশা, ১৪ জন ক্রীতদাস ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ২৪ জন ছিলেন মহাজনী কারবারী, ১১ জন ছিলেন শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী, ১৫ জন ক্রীতদাসের মালিক, ১৪ জন সরকারী বণ্ড ও শেয়ারের মালিক। প্রতিনিধিদের মধ্যে একজনও মজুরীজীবী, কৃষক বা ছোট জমির মালিক ছিলেন না।

প্রতিনিধিদের শ্রেণীস্বার্থ

দেশের যারা জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ, সম্মেলনে তাদের কোন প্রতিনিধি ছিল না। অর্থাৎ এককথায় জমির মালিক, সম্পত্তির মালিক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং মহাজনী কারবারীরাই প্রতিনিধি হিসেবে সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন যাতে নতুন সংবিধান এমনভাবে রচিত হয় যা তাদের স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা এমন একটি সংবিধান চেয়েছিলেন যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী হবে, রাজ্যগুলোর ওপরে নির্ভরশীল না থেকে জনগণের উপরে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করবে এবং তাদের সম্পত্তিগত স্বার্থকে রক্ষা করবে। তাই প্রতিনিধিদের মধ্যে যতই মতভেদ থাক না কেন, এই সমস্বার্থ ও মৌল ব্যাপারে তাঁরা ঐক্যমত ছিলেন। তাঁরা জানতেন যে, শক্তিশালী রাজ্যগুলোর পরিবর্তে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনেই তাঁদের স্বার্থ রক্ষিত এবং বিকশিত হতে পারে। সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধি অর্থাৎ সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে তাঁদের সম্পত্তি ও ব্যবসায়িক স্বার্থ উপযোগী একটি শক্তিশালী সরকার গঠিত হয়, অথচ ঐ সরকার যেন তাদের সম্পত্তির অধিকার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার মত শক্তিশালী না হয় (…how to have a government strong enough to protect property rights and mercantile interests, yet not so strong as to infringe property rights and political liberty)[১]। ঐ দুটো উদ্দেশ্যের ফলশ্রুতি হ'ল ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে গৃহীত মার্কিন সংবিধান। সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেক ব্যাপারে মতানৈক্য থাকলেও মৌল বিষয়ে তাঁরা একমত ছিলেন যে, শ্রেণীবিভক্ত মার্কিন সমাজে তাঁরা হলেন সম্পদবান শ্রেণী এবং এমন একটি সংবিধান তাঁদের প্রণয়ন করতে হবে যা সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে এবং ঐ অধিকারকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।[২]

উদ্দেশ্য

এই উদ্দেশ্যেই মার্কিন সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা হয়েছিল, ক্ষমতা বিভাজন নীতি স্বীকৃত হয়েছিল এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির (checks and balances) দ্বারা সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থা এবং বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিনিধিসভাকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাজ্যগুলোর বিভিন্নমুখী আইন যাতে সংবিধান প্রণেতাদের শ্রেণীস্বার্থ ক্ষুণ্ন করতে না পারে তার জন্য ব্যবসায়, বাণিজ্য, আমদানী, রপ্তানী, মুদ্রা ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাজ্যগুলোর হাতে কোন ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়নি। উপরন্তু, সংবিধান

১. *American Government and Politics*, Allen M. Potter, pp. 19-20.

২. "They accepted almost without argument the theory that society divides into classes along economic lines. They saw their task as one of preserving property rights, with which they equated liberty, from the attacks of the poorer classes." p-19

প্রণেতাদের নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য যে সংবিধান রচিত হয়েছে তা যাতে মান্য করা হয় এবং রাজ্যগুলো যাতে তার বিরোধিতা করতে না পারে সেজন্য সংবিধানে বলা হল ঃ এই সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন, রাজ্যের বিচারকরা এই আইন মানতে বাধ্য এবং রাজ্যের কোন আইন সংবিধান বিরোধী বলে বিবেচিত হলে তা বাতিল বলে পরিগণিত হবে (This Constitution. ··shall be the supreme law of the land ; and the judges in every state shall be bound thereby, anything in the Constitution or laws of any state to the contrary notwithstanding)।

সংবিধান প্রণেতারা জানতেন যে, তাঁদের শ্রেণীস্বার্থকে প্রতিফলিত করে সংবিধান রচনায় সকল প্রতিনিধিকে সামিল করতে হলে কয়েকটি গৌণ প্রশ্নে আপোষ করা অপরিহার্য। তাই বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বার্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করার কাজে তাঁদের এগিয়ে আসতে হয়েছিল। স্বল্প জমির মালিকদের স্বার্থের প্রতি এঁরা উদাসীন থাকলেও দক্ষিণ অঞ্চলের বাগিচার মালিকদের স্বার্থের সঙ্গে উত্তর অঞ্চলের বাণিজ্যিক স্বার্থের মধ্যে এরা আপোষ করেছিলেন। তাই একদিকে বাগিচার মালিকদের স্বার্থের দিকে নজর রেখে ক্রীতদাস ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। অন্যদিকে বাণিজ্যিক স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য তাদের জন্য দেশীয় বাজারকে মুক্ত রাখা হয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক শর্ত নিশ্চিত করা হয়। বাণিজ্যিক স্বার্থ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার চেয়েছিল, কিন্তু অন্যান্য স্বার্থ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার থাকাতে আপত্তি না করলেও সরকারের কোন একটি বিভাগের চরম ক্ষমতা লাভের বিরোধী ছিল। তাই সংবিধানে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে বিভিন্ন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যবস্থা করা হয়।

সংবিধান প্রণেতাদের ব্রিটিশ উত্তরাধিকার এবং অ্যাংলো-মার্কিন সরকারের অভিজ্ঞতা সংবিধান প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের একটি উন্নত মডেল হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদটি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই তাঁকে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি যাতে সম্রাট তৃতীয় জর্জের মত স্বৈরাচারী হতে না পারেন, তাই রাষ্ট্রপতিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত করা তাঁর ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখার ব্যবস্থা সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। সরকারের কোন পদ বা সংস্থা যাতে স্বৈরাচারী হয়ে সংবিধান প্রণেতাদের আর্থিক অধিকারের ওপরে আঘাত হানতে না পারেন তাই ক্ষমতা বিভাজনের পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতিকে কার্যকর করা হয়েছে। তাই চার্লস বেয়ার্ড মার্কিন সংবিধানকে একটি আর্থিক দলিল (Economic Charter) নামে অভিহিত করেছেন।

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রসমবায়ের অনুচ্ছেদকে (সংবিধান) প্রয়োজনীয় সংশোধন করা। কিন্তু সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিরা তাঁদের জমিগত, বাণিজ্যিক, শিল্পগত, মহাজনী, সম্পত্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্য ঐ সংবিধানকে

যথেষ্ট মনে না করার জন্য সম্পূর্ণ নতুন সংবিধান রচনায় ব্রতী হন—যে সংবিধানে তাঁদের সম্পত্তি, জমি ও বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। ফলে রাষ্ট্রসমবায়ের সংবিধানকে সংশোধন না করে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে মার্কিন সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থের উপযোগী নতুন সংবিধান রচিত হয় এবং তা সংবিধান প্রণেতাদের প্রচেষ্টায় অনুমোদন লাভ করে।

তিন : মার্কিন সংবিধানের বৈশিষ্ট্য (Features of the Constitution of the United States)

কোন দেশের সংবিধানকে সেখানকার বিভিন্ন সরকারী সংস্থা (organs of government), সরকারী ক্ষমতায় আসীন বা সরকারী পদাধিকারীর কার্যাবলী, ক্ষমতা ও সাংবিধানিক ভূমিকা এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিধি হিসেবে দেখা হয়। গঠন কাঠামো এবং কার্যাবলীর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন দেশের সংবিধানে যেমন কিছু কিছু সাদৃশ্যধর্মী উপাদান থাকে, তেমনি কিছু কিছু মৌল বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—যা অন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থায় থাকে না। বিভিন্ন দেশের সংবিধানের মধ্যে যে সাদৃশ্যধর্মী উপাদানগুলো দেখা যায়, সেগুলোকে গতানুগতিক বৈশিষ্ট্য নামে অভিহিত করা যায়। যেমন, সংবিধানটি লিখিত, না অলিখিত ; এককেন্দ্রীয়, না যুক্তরাষ্ট্রীয় ; সহজ পরিবর্তনশীল, না দুষ্পরিবর্তনীয়। কিন্তু ঐ গতানুগতিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও প্রতিটি সংবিধানের কিছু কিছু নিজস্ব মৌল বৈশিষ্ট্য (basic characteristics) থাকে যা সেই সংবিধানকে অনন্যতা দান করে এবং অন্য সংবিধান থেকে পার্থক্য সৃষ্টি করে। যেমন, মার্কিন সংবিধানের ক্ষমতা বিভাজন, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি, বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা ইত্যাদিকে মার্কিন সংবিধানের মৌল নীতি বলে অভিহিত করা যায়। সুতরাং যে কোন সংবিধানের বৈশিষ্ট্যকে গতানুগতিক বৈশিষ্ট্য এবং মৌল বৈশিষ্ট্য এইভাবে চিহ্নিত করাই সমীচীন।

মার্কিন সংবিধানের গতানুগতিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথমে আলোচনা করা হ'ল।

১ প্রধানত লিখিত সংবিধান

মার্কিন সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে লিখিত মার্কিন সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৩টি অঙ্গরাজ্য কর্তৃক সংবিধান অনুমোদিত হয়। আজ পর্যন্ত ঐ সংবিধানকে ২৬ বার লিখিতভাবে সংশোধন করা হয়। ঐ সংশোধনীগুলোও মার্কিন লিখিত সংবিধানের অঙ্গ। সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও তার গঠন কাঠামো, ক্ষমতা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সংবিধানে লিখিতভাবে স্থান পেয়েছে। সুতরাং বলা যায়, মার্কিন শাসনব্যবস্থা লিখিত সাংবিধানিক বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

কিন্তু একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, লিখিত সাংবিধানিক বিধির বাইরে মার্কিন সাংবিধানিক ব্যবস্থায় অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। লিখিত সংবিধান ছাড়াই কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইন, শাসনবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত এবং

প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথা মার্কিন শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় ভূমিকা পালন করে এবং মার্কিন সংবিধানের যুগোপযোগী সামঞ্জস্য বিধান তথা গতিশীলতা রক্ষায় সাহায্য করে। এদের মধ্যে সাংবিধানিক রীতিনীতি এবং প্রথা লিখিত নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মার্কিন সংবিধান প্রধানত লিখিত হলেও অলিখিত সাংবিধানিক রীতিনীতি এবং প্রথা শাসন পরিকল্পনার আঙ্গিক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। হারম্যান ফাইনার বলেছেন যে, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা হ'ল রাজনৈতিক আচরণের এমন কতকগুলো বিধি যেগুলো বিধিবদ্ধ আইন বা বিচারকের রায় হিসেবে স্বীকৃত নয়, অথচ সাংবিধানিক বিধির পরিপূরক হিসেবে গড়ে উঠেছে।

বস্তুত পৃথিবীর কোন সংবিধানই পুরোপুরি লিখিত বা পুরোপুরি অলিখিত হতে পারে না। বরং যে কোন সংবিধানকে, প্রধানত লিখিত এবং প্রধানত অলিখিত বলেই অভিহিত করা ভাল। মার্কিন সংবিধানকে প্রধানত লিখিত বলে অভিহিত করা উচিত। ঠিক তেমনি, ব্রিটিশ সংবিধানকে অলিখিত না বলে প্রধানত অলিখিত সংবিধান বলাই সঙ্গত।

২. রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা

শাসনবিভাগ গঠনের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের আধুনিক সংবিধানকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—আইনসভা বা মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার। মার্কিন সংবিধান হ'ল রাষ্ট্রপতি চালিত সরকারের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ এবং এই ব্যবস্থা মার্কিন সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যে সাংবিধানিক ব্যবস্থায় শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে আইনসভা বা মন্ত্রিসভা চালিত সরকার বলে। অন্যদিকে সর্বোচ্চ শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতা যদি আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল নন এমন কোন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে তবে সেই ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি চালিত ব্যবস্থা বলে। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী মার্কিন রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বোচ্চ শাসন বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধানের দ্বিতীয় ধারায় শাসনবিভাগের সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি আইনসভার বা মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য নন এবং আইনসভার কাছে তাঁর দায়িত্ব নেই। আইনসভার আস্থার ওপরে তাঁর রাষ্ট্রপতি পদে আসীন থাকা নির্ভর করে না। তাঁকে কেবলমাত্র সংবিধান নির্দেশিত উপায়ে বিচার করে পদচ্যুত (Impeachment) করা যায়। মার্কিন রাষ্ট্রপতির অধীনে একটি মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট আছে, তবে মন্ত্রিরা রাষ্ট্রপতির সহকর্মী নন—অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। মন্ত্রি-সভার সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ মানতে তিনি বাধ্য নন।

উপরোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে মার্কিন শাসনব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি চালিত ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায় মার্কিন সংবিধান রাষ্ট্রপতি চালিত ব্যবস্থা কায়েম করেছে।

তত্ত্বগতভাবে দুষ্পরিবর্তনীয়

মার্কিন সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলে অভিহিত করা হয়। কোন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি সহজ না জটিল তার ভিত্তিতে সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় বলা হয়। মার্কিন সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি খুবই জটিল বলে এই সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় আখ্যা দেওয়া হয়। মার্কিন সংবিধান সংশোধনের জন্য দুটি স্তর আছে। প্রথমে সংশোধন প্রস্তাব কংগ্রেসের উভয়কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা বা দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গরাজ্যের অনুরোধক্রমে আহূত জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত হতে হবে। সংবিধান সংশোধনের ঐ গৃহীত প্রস্তাব রাজ্যগুলোর তিন-চতুর্থাংশ আইনসভায় বা প্রতিটি রাজ্যে আহূত গণসম্মেলনের তিন-চতুর্থাংশ সম্মেলনের দ্বারা অনুমোদিত (Ratified) হতে হবে। পদ্ধতিটি খুবই জটিল। তাই মার্কিন সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয় যাতে এককভাবে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার সংবিধান সংশোধন করে ক্ষমতা বণ্টন পদ্ধতিকে নিজের স্বার্থে সহজে পরিবর্তিত করতে না পারে। সুতরাং বলা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সাজুয্য বজায় রেখে সঙ্গতভাবেই মার্কিন সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় রাখা হয়েছে।

তত্ত্বগতভাবে মার্কিন সংবিধানকে যতটা দুষ্পরিবর্তনীয় বলে মনে করা হয় বাস্তবে ঘটনা তা নয়। তত্ত্বগতভাবে মার্কিন সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়, তাই বিগত দুশো বছরে আনুষ্ঠানিকভাবে মাত্র ২৪ বার মার্কিন সংবিধানের সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে বিচারবিভাগের ব্যাখ্যা, কংগ্রেস প্রণীত আইন, শাসনবিভাগের সিদ্ধান্ত, প্রথা ও রীতিনীতির দ্বারা সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনকে মেটান হয়েছে। তাই মার্কিন সংবিধানের আনুষ্ঠানিক (formal) সংশোধন পদ্ধতি জটিল হলেও সেখানে সংবিধানের বাইরে অনেক উপায় আবিষ্কার করে সংশোধন পদ্ধতিকে সহজ করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, তত্ত্বগতভাবে মার্কিন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি দুষ্পরিবর্তনীয় হলেও বাস্তবে এবং কার্যক্ষেত্রে অতটা দুষ্পরিবর্তনীয় নয়।

৪. যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

মার্কিন সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে, যদিও সংবিধানের কোথাও 'যুক্তরাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। কতকগুলো অঙ্গরাজ্যের সমন্বয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুযায়ী সেখানে কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার আছে এবং রাজ্যগুলোতে রাজ্য সরকার আছে। দ্বিতীয়ত, সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলোর ক্ষমতা এবং এক্তিয়ার নির্দেশ করা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মার্কিন সংবিধানে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারের ক্ষমতাকে নির্দিষ্ট করে দিয়ে অবশিষ্ট ক্ষমতা রাজ্যগুলোর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

অর্থাৎ মার্কিন সংবিধানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়েছে। তৃতীয়ত, মার্কিন সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার এক্তিয়ার বা অন্য কোন বিরোধ মীমাংসা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে মান্য করে একটি নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত—সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা করেছে। চতুর্থত, সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার অধিকার কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের ওপর ন্যস্ত না করে মার্কিন সংবিধান তা সুপ্রীম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করেছে এবং এর দ্বারা বিচারবিভাগের প্রাধান্য সুনিশ্চিত করেছে—যা যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পঞ্চমত, মার্কিন সংবিধানে বিচারবিভাগের প্রাধান্য নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, সংবিধান হ'ল দেশের সর্বোচ্চ আইন এবং শাসন, আইন ও বিচারবিভাগকে ঐ আইন মান্য করে চলতে হবে। কেন্দ্রের বা রাজ্যের আইনবিভাগ যদি সংবিধান বিরোধী কোন আইন রচনা করে বা শাসনবিভাগ যদি ঐরূপ কোন নির্দেশ জারী করে তবে সুপ্রীম কোর্ট তা বাতিল করতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মৌল নীতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলো মার্কিন সংবিধানে গৃহীত এবং বিধিবদ্ধ হয়েছে। তাই মার্কিন সংবিধানকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান বলতে কোন বাধা নেই। অনেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আদর্শ মডেল বলে দাবী করেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রাজ্যগুলোর ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রের যে মডেল সংবিধান প্রণেতারা গ্রহণ করেছিলেন তা অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে। অনেকে এটাকে মার্কিন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি বলে মনে করেন।

৫. ক্ষমতা বিভাজন নীতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল ক্ষমতা বিভাজন নীতির প্রয়োগ। সরকারের শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ এবং বিচারবিভাগকে পরস্পর থেকে আলাদা করা এবং ঐ তিনটি বিভাগের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার বা কর্তৃত্ব স্বতন্ত্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে ন্যস্ত করাকে ক্ষমতা বিভাজন নীতি বলে। ক্ষমতা বিভাজন নীতি প্রয়োগের ফলে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিভাগ তিনটি পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র থাকে এবং এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। মার্কিন সংবিধান প্রণেতারা লকের সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ এবং মন্টেস্কুর ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার্থে ক্ষমতা বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত বক্তব্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে মার্কিন সংবিধানে ক্ষমতা বিভাজন নীতিকে গ্রহণ করেছিলেন। মার্কিন সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পত্তিগত অধিকারের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে তাঁরা ক্ষমতা বিভাজন নীতিকে সাংবিধানিক ব্যবস্থায় স্থান দিয়েছিলেন। তাই ফাইনার (Dr. Finer) বলেছেন যে,

এই নীতি গ্রহণের কারণ

মঁন্তেস্কুর ক্ষমতা-বিভাজন নীতির প্রভাবেই হোক বা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার তাগিদেই হোক, সংবিধান প্রণেতারা ক্ষমতা বিভাজন নীতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে কার্যকর করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতাবিভাজন নীতি স্বীকৃত হয়নি—ব্রিটেনে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ লক্ষ্য করা যায়। যদিও ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা মার্কিন সংবিধান প্রণেতারা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ক্ষমতা বিভাজনের নীতিকে গ্রহণ করেছিলেন।

মার্কিন সংবিধানের প্রথম ধারায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বা কেন্দ্রীয় আইনসভা কংগ্রেসের ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধারায় শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা শাসনবিভাগীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী মার্কিন রাষ্ট্রপতির ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় ধারায় বিচারসংক্রান্ত কার্যাবলী ও ক্ষমতা মার্কিন বিচারালয়ের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। ব্রিটেনের আইনসভা বা পার্লামেন্টের সদস্যদের দ্বারা শাসনবিভাগ গঠিত হয় এবং শাসনবিভাগ আইনসভাকে পরিচালনা করে এবং আইনবিভাগের কাছে দায়িত্বশীল থাকে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি বা তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের মনোনীত করা হয় না। মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইনভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত না হয়ে জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিসভার সদস্যরা আইনসভার সদস্য নন, তাঁরা আইনসভার অধিবেশনে যোগদান করেন না এবং আইনসভাকে পরিচালনা করেন না। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের জন্য স্বতন্ত্র এক্তিয়ার সংবিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং ঐ এক্তিয়ারের মধ্যে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে—সুপ্রীম কোর্টের কাজে কংগ্রেস বা রাষ্ট্রপতি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। সুতরাং দাবী করা হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বিভাজন নীতি পুরোপুরি কার্যকর করা হয়েছে।

কিভাবে এই নীতি কার্যকর করা হয়েছে

কিন্তু বাস্তবে এই দাবী যথার্থ নয়। একথা ঠিক যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছুটা পরিমাণে ক্ষমতা বিভাজন নীতি সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে—কিন্তু ক্ষমতা বিভাজন নীতির পুরোপুরি প্রয়োগ সেখানে কার্যকর হয়েছে, এই দাবী ঠিক নয়। বস্তুত পুরোপুরিভাবে ক্ষমতা বিভাজন নীতিকে কার্যকর করা সম্ভব নয় এবং হয়তো তা কাম্যও নয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বিভাজন নীতির সীমিত প্রয়োগ দেখা যায়। এ ব্যাপারে কয়েকটি উদাহরণ উপস্থিত করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক নয়।

সীমিত ক্ষমতা বিভাজন কার্যকর

প্রথমত, মার্কিন বিচারব্যবস্থাকে যতটা স্বাধীন মনে করা হয়, বাস্তবে মার্কিন বিচারব্যবস্থা ততটা স্বাধীন নয়। মার্কিন বিচারবিভাগ অন্য দুটি বিভাগের (শাসন ও আইনবিভাগ) ওপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট কতজন বিচারক

নিয়ে গঠিত হবে তা কংগ্রেস আইন করে স্থির করেন এবং বিচারকদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। সুতরাং মার্কিন কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রপতি একযোগে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মনোমত ব্যক্তিদের বিচারক পদে নিয়োগ করতে পারেন। যেমন, রাষ্ট্রপতি রূজভেল্টের 'নিউ ডিল' নীতি (New Deal Policy) সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সংবিধান বিরোধী ঘোষিত হবার পরে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের শূন্য স্থানগুলো এমন বিচারপতিদের দ্বারা পূরণ করেছিলেন যাঁরা 'নিউ ডিলকে' সংবিধান সম্মত বলে মনে করতেন। রাষ্ট্রপতির পেছনে আইনসভা এবং বিশেষ করে আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ সিনেটের আশীর্বাদ থাকলে রাষ্ট্রপতি বিচারবিভাগের ওপরে এইভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এইজন্য দেখা যায় যে, মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট অনেক সময় দেশের শাসকবর্গের রাজনৈতিক প্রবণতাকে বিরোধিতা করতে উৎসাহী হয় না, বরং প্রচলিত রাজনৈতিক ধারাকে অনুসরণ করে রায় দেয়।

বিচারবিভাগের ওপরে শাসন ও আইন-বিভাগের প্রভাব

দ্বিতীয়ত, আপাতদৃষ্টিতে মার্কিন শাসন ও বিচারবিভাগকে যতটা পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা হয় বাস্তবে ঘটনা তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের ক্ষমতার মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রয়েছে। যেমন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে বাণী (Presidential message) পাঠাতে পারেন এবং কংগ্রেসে নিজ দলীয় সদস্যদের দ্বারা নিজ ইচ্ছাকে কার্যকর করতে পারেন। কংগ্রেস যদি রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বিল পাশ করে তবে রাষ্ট্রপতি ঐ বিলে ভিটো (Veto) প্রয়োগ করতে পারেন। তাই মার্কিন আইনসভাকে অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতির ওপরে, অর্থাৎ শাসনবিভাগের ওপরে নির্ভরশীল থাকতে হয়।

আইনবিভাগের ওপরে প্রভাব

তৃতীয়ত, অন্যদিকে রাষ্ট্রপতিকেও কংগ্রেসের ওপরে নির্ভরশীল থেকে চলতে হয়। কংগ্রেস বাজেট পাশ করে টাকা খরচের ব্যবস্থা না করলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে শাসন পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রপতি যে সকল উচ্চপদে নিয়োগের ক্ষমতা ভোগ করেন সেগুলোর ক্ষেত্রে তিনি সিনেটের পরামর্শ গ্রহণ করেন কারণ ঐ নিয়োগগুলো কার্যকর করার জন্য সিনেটের অনুমোদন অপরিহার্য। রাষ্ট্রপতি যে সকল চুক্তি করেন সেগুলোও সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন পেলে কার্যকর হয়।

শাসনবিভাগের ওপরে প্রভাব

চতুর্থত, মার্কিন আইনসভা যে সকল আইন প্রণয়ন করে এবং শাসনবিভাগে যে সকল শাসনতান্ত্রিক নির্দেশ জারী করে সেগুলো যদি সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান বিরোধী বলে মনে করে তবে সুপ্রীম কোর্ট তাকে বাতিল করতে পারে। সুতরাং কংগ্রেস প্রণীত আইন ও শাসনতান্ত্রিক নির্দেশ সুপ্রীম কোর্টের রায় বা সিদ্ধান্ত দ্বারা যে কোন সময় সংবিধান বিরোধী বলে

বিচারবিভাগের প্রভাব

ঘোষিত হয়ে বাতিল হয়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও আইনসভা ও শাসনবিভাগের ওপরে সুপ্রীম কোর্টের প্রভাব লক্ষণীয়।

মার্কিন সংবিধানে একদিকে যেমন ক্ষমতা বিভাজন নীতি আছে—অর্থাৎ আইন-বিভাগ, শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনি অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি Theory of checks and balances) কার্যকর থাকায় তিনটি বিভাগকেই পরস্পরের ওপরে নির্ভরশীল থেকে চলতে হয়। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনিবার্যভাবেই শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ এবং বিচারবিভাগের পরস্পরের প্রভাব মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে চলার স্বাধীনতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং এর ফলে সেখানে ক্ষমতা বিভাজন নীতির পুরোপুরি প্রয়োগ ঘটতে পারেনি।

৬. কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন

১৭৮৭ সালে যখন মার্কিন সংবিধান গৃহীত হয়, তখন কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার এবং ১৩টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। বর্তমানে অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০টি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল কেন্দ্রীয় এবং অঙ্গরাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন। মার্কিন সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দিয়েছে। সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাগুলোকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে অবশিষ্ট ক্ষমতা (Reserved Powers) রাজ্যগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে। অর্থাৎ মার্কিন সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাগুলোকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং তালিকার বাইরে অবশিষ্ট সব ক্ষমতা রাজ্যগুলো ভোগ করবে। তবে অবশিষ্ট ক্ষমতার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পর্কে যদি সংবিধান রাজ্যের এক্তিয়ারের ওপরে বাধা নিষেধ আরোপ করে তবে ঐ ক্ষমতা রাজ্যসরকার প্রয়োগ করতে পারবে না। এই সংবিধানিক ব্যবস্থা সম্পর্কে দশম সংশোধনীতে (Tenth Amendment) বলা হয়েছে—*The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.*

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারগুলো যাতে সংবিধানে নির্দেশিত ক্ষমতা ও এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে কাজ করে এবং একে অন্যের এক্তিয়ারে অনুপ্রবেশ না করে তা দেখার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে সংবিধানে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া এবং তা যাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো মান্য করে চলে তা দেখার দায়িত্ব বিচারকদের ওপরে ন্যস্ত করা মার্কিন সংবিধানের একটি বৈশিষ্ট্য।

তবে এ ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের কার্যাবলী সন্তোষজনক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সম্প্রতিকালে সুপ্রীম কোর্টের অনেক সিদ্ধান্তের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়েছে এবং রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীকতার ঝোঁক ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭. বিচার বিভাগের প্রাধান্য

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্যের সরকারের মধ্যে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি সরকার যাতে নিজ নিজ ক্ষমতা ও এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। তা ছাড়া সংবিধান বিরোধী কোন আইন প্রণীত হ'লে এবং শাসনবিভাগীয় নির্দেশ জারী হলে তা বাতিল করার সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই দায়িত্ব বিচারালয়ের ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান বিরোধী কোন আইন গৃহীত হলে বা কোন নির্দেশ জারী করা হ'লে তার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করা যায়। সুপ্রীম কোর্টের বিবেচনায় ঐ আইন বা নির্দেশ সংবিধান বিরোধী বলে মনে হলে সুপ্রীম কোর্ট তাকে বাতিল করতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতাকে বিচার-বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা বলে। মার্কিন বিচারালয়কে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতার দ্বারা সজ্জিত করে বিচারবিভাগের প্রাধান্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

মার্কিন বিচারবিভাগের প্রাধান্য আর একটি দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে। মার্কিন সংবিধানে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন যাতে মান্য করা হয় তা দেখার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং এই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত মান্য করা বাধ্যতামূলক।

তাছাড়া মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে কাজ করে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের যে ব্যাখ্যা দেন তাকেই সাংবিধানিক ব্যাখ্যা বলে মেনে নেওয়া হয়। এই জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হিউজ (Hughes) বলেছেন যে, আমরা একটি সংবিধানের ছত্রচ্ছায়ায় বাস করি—কিন্তু সংবিধানার্থ হ'ল বিচারকেরা যা বলেন তাই।[১] অর্থাৎ বিচারকদের ব্যাখ্যা অনুসারে সংবিধানের অর্থ নির্ধারিত হয়। এককথায় মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইভাবে সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার চরম ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করে সেখানে বিচারবিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৮. সংবিধানের প্রাধান্য

যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল সংবিধানের প্রাধান্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারবিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা সংবিধানের প্রাধান্যকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারকে নিজ নিজ সাংবিধানিক এক্তিয়ারের মধ্যে কাজ করা সুনিশ্চিত করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও 'সংবিধানের প্রাধান্য' প্রতিষ্ঠা করে বলা হয়েছে

1. We are und. . a Constitution, but the Constitution is what the judges say it is Charles Evans Hughes, C. J.

যে, এই সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন (the Constitution is the supreme law of the land)।

মার্কিন সংবিধান কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্যের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দিয়েছে, সরকারের তিনটি বিভাগ—শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ এবং বিচারবিভাগের ক্ষমতা ও এক্তিয়ারকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং জনগণের অধিকারকে বিধিবদ্ধ করেছে। ঐ ক্ষমতা এবং এক্তিয়ার ভঙ্গ করে কোন আইন প্রণীত হলে বা শাসনবিভাগীয় নির্দেশ জারী করা হলে বা জনগণের সংবিধান স্বীকৃত অধিকারবিরোধী কোন আইন রচিত হলে বা শাসনবিভাগীয় নির্দেশ জারী করা হলে বা সংবিধানের কোন ধারা বা উদ্দেশ্য বিরোধী কোন আইন প্রণীত হলে বা শাসনবিভাগীয় নির্দেশ জারী করা হলে সুপ্রীম কোর্ট তাকে বাতিল করতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতাকে বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা বলা হয় এবং এই বিচারালয়ের ক্ষমতার দ্বারা মার্কিন সংবিধানের প্রাধান্যকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। মার্কিন সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন এবং ঐ সংবিধান বিরোধী কোন আইন বা শাসনবিভাগীয় নির্দেশকে বাতিল করার ক্ষমতা বিচারালয়ের হাতে ন্যস্ত থাকায় মার্কিন সংবিধানের প্রাধান্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৯ নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি

মার্কিন সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির (Theory of checks and balances) প্রয়োগ। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি কাকে বলে সে সম্পর্কে আগে আলোচনা করা প্রয়োজন।

তত্ত্বগতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বিভাজন নীতি কার্যকর আছে বলে মনে করা হয়। মার্কিন আইনসভা বা কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে, শাসনবিভাগ তথা রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগীয় সর্বোচ্চ এবং সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং মার্কিন বিচারালয় স্বাধীনভাবে বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। কিন্তু মার্কিন শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মার্কিন শাসনব্যবস্থায় উপরোক্ত তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন এবং বিভাগ তিনটির স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে যা বলা যায় তা হ'ল তাত্ত্বিক বক্তব্য। বাস্তবে তিনটি বিভাগ অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের ওপরে নির্ভরশীল থাকে এবং একে অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে না। সরকারের বিভাগে তিনটি যাতে ক্ষমতা বিভাজনের সুযোগ নিয়ে চরম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য প্রতিটি বিভাগের ক্ষমতার ওপরে অপর দুটি বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আরোপ করে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তিনটি বিভাগের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা গড়ে তোলা হয়েছে। অর্থাৎ মার্কিন শাসনবিভাগের কার্যকারিতা আইন ও বিচারবিভাগের সহযোগিতার উপরে যেমন নির্ভর করে, তেমনি আইনবিভাগ অনেকাংশে শাসনবিভাগ

ও বিচারবিভাগের ওপরে এবং বিচারবিভাগ শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের ওপরে নির্ভরশীল। তিনটি বিভাগের এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ক্ষমতা বিভাজনের নীতিকে অনেকটা পরিমাণে ব্যতিক্রম করে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতিকে মার্কিন শাসনব্যবস্থায় প্রয়োগ করেছে। বস্তুত, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি মার্কিন সংবিধানের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির ওপরে কংগ্রেস এবং সুপ্রীম কোর্ট প্রভাব বিস্তার করে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে এবং শাসনব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করে। মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে প্রশাসন পরিচালনার জন্য কংগ্রেসের ওপরে নির্ভরশীল থাকতে হয়, কারণ কংগ্রেস বাজেট পাশ না করলে বা অর্থ অনুমোদন না করলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রশাসন পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি উচ্চপদে নিয়োগের যে ক্ষমতা ভোগ করেন তাও কংগ্রেসের অনুমোদনের ওপরে নির্ভর করে। কংগ্রেস অনুমোদন না করলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ কার্যকর হতে পারে না। রাষ্ট্রপতি যে সকল চুক্তি করেন তা কার্যকর হবার আগে সিনেটের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি যে সকল শাসনতান্ত্রিক নির্দেশ জারী করেন সুপ্রীম কোর্ট তাকে সংবিধান বিরোধী বলে মনে করলে বাতিল করে দিতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রপতি তথা শাসনবিভাগের ওপরে কংগ্রেস এবং সুপ্রীম কোর্ট নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে।

রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ

আবার, আইনবিভাগে তথা কংগ্রেসের ওপরে রাষ্ট্রপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ক্ষমতা সংবিধানে স্বীকৃত। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ করে নিজের ইচ্ছামত আইনসভাকে পরিচালনায় প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। তাছাড়া, রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কংগ্রেস কোন বিল পাশ করলে রাষ্ট্রপতি ঐ বিলের উপরে 'ভেটো' প্রয়োগ করতে পারেন। তাই মার্কিন কংগ্রেসকে অনেকটা রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করতে হয়। অন্যদিকে, মার্কিন কংগ্রেস যে বিল পাশ করে সেই বিল যদি সুপ্রীম কোর্টের বিবেচনায় অসাংবিধানিক বলে মনে হয় তবে সুপ্রীম কোর্ট বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঐ বিলকে বা বিলের কোন অংশকে বাতিল করতে পারে। অর্থাৎ কংগ্রেসের ক্ষমতার ওপরে রাষ্ট্রপতি ও সুপ্রীম কোর্টের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আরোপ করে কংগ্রেস যাতে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে না পারে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ

অন্যদিকে, মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ওপরেই রাষ্ট্রপতি এবং কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থা সংবিধানে গৃহীত হয়েছে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারকের সংখ্যা কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে স্থির করে এবং রাষ্ট্রপতি বিচারকদের নিয়োগ করেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস ইচ্ছা করলে বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং বিচারকদের শূন্যপদে মনোমত ব্যক্তিদের বিচারক হিসাবে নিয়োগ করতে পারে। এই সম্ভাবনা থাকার জন্য মার্কিন সুপ্রীম

সুপ্রীম কোর্টকে নিয়ন্ত্রণ

কোর্ট সাধারণত কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক ইচ্ছা ও প্রবণতার সঙ্গে সাজুয্য বজায় রেখে চলতে বাধ্য হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মার্কিন সংবিধান প্রণেতারা 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি' প্রয়োগ করে একটি বিভাগের উপরে অন্য দুটি বিভাগের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে শাসন-ব্যবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যবস্থা সংবিধানে বিধিবদ্ধ করেছেন। মনে করা হয় যে, এই নীতিকে প্রয়োগ করে তাঁরা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য এবং বুর্জোয়া শোষণ-ব্যবস্থায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন—যাতে কোন একটি বিভাগ এককভাবে স্থিতাবস্থা নষ্ট করে সাংবিধানিক ভারসাম্য ব্যাহত করতে না পারে।

১০. অনুমিত ক্ষমতার তত্ত্ব

মার্কিন সাংবিধানিক ব্যবস্থায় জাতীয় আইনসভা কংগ্রেসের ক্ষমতার প্রসারণ আলোচনার ক্ষেত্রে 'অনুমিত ক্ষমতার তত্ত্ব' (Theory of Implied Powers) বিশেষ-ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আগে মনে করা হোত যে, যে সকল নির্দিষ্ট বিষয়ে কংগ্রেসের আইন প্রণয়নের অধিকার বিধিবদ্ধ করা হয়েছে কংগ্রেস ঐ সকল নির্দিষ্ট বিষয়ের ব্যাপারেই একমাত্র আইন প্রণয়নের অধিকারী। কিন্তু ১৮১৭ সালে *Mc Culloch vs. Maryland* মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায় থেকে অনুমিত ক্ষমতার তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে এবং কংগ্রেসের আইন প্রণয়নের বাধাধরা ক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটে।

মার্কিন কংগ্রেস *Bank of the United States* গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন পাশ করে এবং ঐ আইনানুযায়ী তা গঠন করা হয়। ঐ ব্যাংক গঠনের সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয় *Mc Culloch vs. Maryland* মামলায়। ঐ মামলায় দাবী করা হয় যে, মার্কিন সংবিধানের কোন ধারায় কংগ্রেসকে ব্যাংক গঠন করার ক্ষমতা বা অধিকার দেওয়া হয়নি। সুতরাং কংগ্রেসের আইন বলে গঠিত *Bank of the United States* অবৈধ। এই মামলার রায় দিতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি জন মার্শাল (Marshall) বলেন যে, সংবিধানের ১নং অনুচ্ছেদের অষ্টম ধারায় বলা হয়েছে যে, কর, শুল্ক ধার্য এবং তা সংগ্রহ, যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ পরিশোধ, যুক্তরাষ্ট্রের নামে অর্থ গ্রহণ, মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে মার্কিন কংগ্রেসের অধিকার থাকবে এবং ঐ সকল অধিকার প্রয়োগের জন্য কংগ্রেস উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারবে (The Congress shall have powers ···to make all laws which shall be necessary and proper for carrying into execution the foregoing powers vested by this constitution in the government of the United States, or in any department or offices thereof.)। প্রধান বিচারপতি মার্শাল আরও বলেন যে 'অনুমিত ক্ষমতার' জন্য *the Government of the Union, though limited in its powers, is supreme within its sphere of action.*

সুপ্রীম কোর্টের উপরোক্ত রায় থেকে কংগ্রেসের অনুমিত ক্ষমতার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রধান বিচারপতি মার্শাল ঘোষণা করেন যে, সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদের অষ্টম ধারা অনুযায়ী মার্কিন কংগ্রেসের কর ধার্য করা, ঋণ গ্রহণ করা, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদির অধিকার স্বীকৃত হওয়ার অর্থ হ'ল এই যে, উপরোক্ত ক্ষমতাগুলো প্রয়োগ করার জন্য কংগ্রেস প্রয়োজনীয় সংস্থা গড়ে তুলতে পারবে এবং *Bank of the United States* হ'ল ঐরূপ একটি প্রয়োজনীয় সংস্থা। অর্থাৎ সংশোধনের প্রথম অনুচ্ছেদের অষ্টম ধারা মার্কিন কংগ্রেসের অনুমিত ক্ষমতার উৎস। সংবিধানে নির্দিষ্ট-ভাবে লেখা না থাকলেও অনুমিত ক্ষমতার তত্ত্ব দ্বারা মার্কিন কংগ্রেসের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে।

অনেকে মনে করেন যে, কংগ্রেসের অনুমিত ক্ষমতার সঙ্গে রাজ্যের ক্ষমতার সংঘর্ষ ঘটতে পারে। কারণ যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, কংগ্রেসের সংবিধান নির্দিষ্ট ক্ষমতার বাইরেও অনুমিত ক্ষমতা আছে, তবে কংগ্রেসের ক্ষমতার সীমা ও এক্তিয়ার অস্পষ্ট হয়ে পড়ে এবং সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের ক্ষমতা রাজ্যের জন্য সংরক্ষিত ক্ষমতায় প্রসারিত হতে পারে—যা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বস্তুত অনুমিত ক্ষমতার তত্ত্ব কংগ্রেসের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে অনেক ক্ষেত্রেই সম্প্রসারিত করেছে। যাহোক, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই যে অনুমিত ক্ষমতার তত্ত্ব মার্কিন সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

৩

সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি

Amendment Procedure

এক : মার্কিন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি (Methods of Amendment)

সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিকে সংবিধানের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংবিধান যাতে পরিবর্তিত হয়ে সামঞ্জস্য রাখতে পারে, সেজন্য সংবিধান কিভাবে পরিবর্তন করা হবে সে সম্পর্কে নিয়মাবলী সংবিধানের মধ্যেই বিধিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তাই যে সকল রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত সেখানে সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি লিখিতভাবে সংবিধানে সংকলিত করা হয়।

১৭৮৭ সালের মার্কিন সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। এই সংবিধানের পঞ্চম অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রয়োজনবোধ করলে কংগ্রেস সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব করবে অথবা, রাজ্যগুলির আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ আবেদন করলে, সংশোধন প্রস্তাবের জন্য সম্মেলন আহ্বান করবে। তিন-চতুর্থাংশ রাজ্যের আইনসভাগুলি যদি ঐ সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদন করে অথবা তিন-চতুর্থাংশ রাজ্য সম্মেলন আহ্বান করে যদি তা অনুমোদিত করা হয়, তা হলে ঐ সংশোধন গৃহীত হয়ে সংবিধানের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হবে।. উপরোক্ত পদ্ধতির যে-কোন একটি কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী অনুসরণ করা যেতে পারে।

সংশোধন সম্পর্কে সাংবিধানিক ব্যবস্থা

মার্কিন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি একটু জটিল, তাই সংবিধান সংশোধনের উপরোক্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সংবিধান সংশোধনের জন্য সংবিধানে দুটি স্তরের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মার্কিন সংবিধানকে সংশোধনের জন্য দুটি স্তর অতিক্রম করতে হবে ঃ

সাংবিধানিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যা

প্রথমত, সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব (Proposal) উত্থাপন করা বা আনয়ন করা ;

দ্বিতীয়ত, উক্ত সংশোধন প্রস্তাবকে অনুমোদন (Ratification) করা।

প্রথম স্তর, অর্থাৎ সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য দুটি পদ্ধতির কথা সংবিধানে বলা হয়েছে। এই প্রস্তাব দুটি হ'ল ঃ

১. সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব কংগ্রেসের উভয় কক্ষ কর্তৃক আলাদাভাবে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদ্বারা গৃহীত হতে হবে। অথবা,

২. দুই তৃতীয়াংশ অঙ্গরাজ্যের অনুরোধক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত এক জাতীয় সম্মেলনে (National Convention) সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হতে হবে।

সংবিধান সংশোধন করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণের জন্য উপরোক্ত যে কোন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। যে কোন একটি পদ্ধতিতে সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত হলে তা অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হবে। অনুমোদনের ক্ষমতা মূলত অঙ্গরাজ্যগুলোর আইনসভার ওপরে অর্পণ করা হয়েছে। সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদনের জন্যও সংবিধানে দুটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে—এর যে কোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। ঐ পদ্ধতি দুটি হ'ল ঃ

১. অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভার তিন-চতুর্থাংশ আইনসভার দ্বারা অনুমোদন, অথবা

২। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে আলাদাভাবে আহূত গণসম্মেলনের (convention) তিন-চতুর্থাংশের দ্বারা অনুমোদন।

অনুমোদন লাভের জন্য উপরোক্ত দুটি পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ করা হবে তা কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করে স্থির করবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মার্কিন সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রথম স্তরে প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য দুটি বিকল্প পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় স্তরে অনুমোদনের জন্য দুটি বিকল্প পদ্ধতি সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধানের প্রতিটি স্তরের যে কোন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করে সংবিধানকে সংশোধন করা যায়। কতদিনের মধ্যে গৃহীত সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হতে হবে সে ব্যাপারে সংবিধানে কিছু বলা হয়নি।

সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন এবং অনুমোদনের জন্য দুটি করে বিকল্প থাকলেও সাধারণত সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব কংগ্রেস দ্বারা উত্থাপন এবং তিন-চতুর্থাংশ রাজ্য আইনসভার দ্বারা তা অনুমোদন করার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির সমালোচনা

মার্কিন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিকে বিভিন্ন কারণে সমালোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মার্কিন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিকে খুবই জটিল বলে মনে করেন। বেশীর ভাগ রাষ্ট্রে আইনসভায় একটা নির্দিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হলে সংবিধান সংশোধন করা যায়। কিন্তু মার্কিন সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সংবিধান সংশোধনের জন্য দুটি স্তর নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রথমত, দুটি বিকল্প উপায়ের মধ্যে একটি দ্বারা প্রস্তাব উত্থাপন (Proposal) এবং দ্বিতীয়ত, পরে তা আবার দুটি বিকল্পের মধ্যে একটি দ্বারা অনুমোদিত (Ratification) করার পদ্ধতি থাকায় মার্কিন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি জটিল হয়েছে।

১. জটিল

দ্বিতীয়ত, এই জটিলতা সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিকে দুষ্পরিবর্তনীয় বা অনমনীয় করে তুলেছে। সংবিধান বিশেষজ্ঞের মতে মার্কিন সংবিধান হল দুষ্পরিবর্তনীয়

সংবিধানের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন এবং অনুমোদনের জন্য দুটি করে বিকল্প আছে। তবে অধিকাংশক্ষেত্রে কংগ্রেস কর্তৃক প্রস্তাব উত্থাপন এবং তিন-চতুর্থাংশ ক্ষেত্রে আইনসভা কর্তৃক ঐ প্রস্তাব অনুমোদনের পদ্ধতি সংশোধনের রাজ্য প্রয়োগ করা হয়। আইনসভার উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং পরে তা আবার তিন-চতুর্থাংশ রাজ্য আইনসভার দ্বারা অনুমোদন লাভ করা সহজ নয়। কোন সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ৫০টি রাজ্যের অন্তত ৩৭-৩৮টি রাজ্য আইনসভার অনুমোদন লাভ করা একটা কঠিন কাজ। এইভাবে সংবিধান সংশোধন করা খুবই কষ্টকর। তাই মার্কিন সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় বা অনমনীয় বলা যেতে পারে। মার্কিন সংবিধান যে কতটা দুষ্পরিবর্তনশীল তা বোঝার জন্য উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে, আজ পর্যন্ত কংগ্রেসে উত্থাপিত চার হাজারটি সংশোধনীর মধ্যে মাত্র ছাব্বিশটি অনুমোদিত হয়েছে।

২. দুষ্পরিবর্তনীয়

তৃতীয়ত, মার্কিন সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনশীলতার জন্য প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে মার্কিন সংবিধানকে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সংশোধন করা যায় না বলে সংবিধান বহির্ভূত উপায়ে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনকে মেটাবার চেষ্টা করা হয়। মার্কিন বিচারালয় সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে এমনভাবে সংবিধানের ব্যাখ্যা করেন যার দ্বারা সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন সাধিত হয়। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের যে ব্যাখ্যা দেন তাই সাংবিধানিক বিধি বলে মান্য করা হয় (The Constitution is what the judges say it is)। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে সংবিধান সংশোধনের সম্ভাবনা না থাকলে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের কাছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাংবিধানিক ব্যাখ্যা চাওয়া হয় এবং সুপ্রীম কোর্টের ঐ ব্যাখ্যা সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করে। অনেক সময় সুপ্রীম কোর্ট বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগ করেও সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনকে মেটায়। সুতরাং আনুষ্ঠানিকভাবে সংবিধান নির্দেশিত পথে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি অনমনীয় এবং জটিল হবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্যভাবে সংবিধান সংশোধনের পথ উন্মুক্ত হয়েছে—একথা বলা যেতে পারে।

৩. সংবিধান বহির্ভূত পথে সংশোধন

চতুর্থত, মার্কিন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি খুব জটিল হবার জন্য সংবিধান সংশোধনে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। এর ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন অনেক সময়ই করা সম্ভব হয় না বলে সংশোধনের জন্য সুপ্রীম কোর্টের সংবিধান ব্যাখ্যার ওপরে নির্ভর করতে হয়।

৪. সময় সাপেক্ষ

দুই: মার্কিন সংবিধান সংশোধনের ঘটনাবলী (Facts about Constitutional Amendments)

১৭৮৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান গৃহীত হয়। তারপর বহুবার চেষ্টা

হয়েছে এই সংবিধান সংশোধন করবার। এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রথম ১০০ বছরে কংগ্রেসে অন্তত ১৩০০ সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত করা হয়। পরবর্তীকালে সংশোধনী প্রস্তাবের সংখ্যা দাঁড়ায় এর দু'গুণেরও বেশি।

এই সব প্রস্তাবের মধ্যে কিছু ছিল এমন চরিত্রের যা গৃহীত হলে কংগ্রেসের সদস্য-দের মন্ত্রিসভায় পদগ্রহণে আর বাধা থাকত না এবং ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মত এখানেও প্রশাসনিক ও আইন-প্রণয়ন বিভাগ দুটির মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হত। কিন্তু এর ফলে সংবিধানে গৃহীত শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন শাখার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় এবং ভারসাম্য রক্ষার নীতি ব্যাহত হত।

সংবিধান সংশোধনের অন্যান্য প্রস্তাবগুলিতে বিভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্রপতি এবং কংগ্রেস সদস্যদের পদাধিকারকাল সীমিত করার অথবা তার পরিবর্তন করার চেষ্টা হয়।

বিশেষ করে এই শতকের গোড়ার দিকে কোন ব্যক্তি যাতে মাত্র একবারের জন্য রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হতে পারেন এবং রাষ্ট্রপতির শাসনকাল যাতে ছয় বছর নির্দিষ্ট হয় এবং এক ব্যক্তির একাধিকবার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন বন্ধ হয় সে সম্পর্কে প্রচুর সং-শোধনী প্রস্তাব আসে। এই প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের যুক্তি ছিল এই যে, রাষ্ট্রপতি পদে কোন ব্যক্তির পুনর্নির্বাচন যদি বন্ধ করা যায় তাহলে রাষ্ট্রপতি পদে থাকা কালে সেই ব্যক্তি দ্বিতীয় বার নির্বাচনে সাফল্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর কর্মনীতি স্থির করবার প্রলোভন ত্যাগ করবেন।

আবার আরও প্রস্তাব আনা হয়েছিল যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি-দের এক বিশেষ পদমর্যাদা দেবার ব্যবস্থা হয়, যাতে রাষ্ট্রপতি পদ পরিত্যাগের পর তাঁদের আর সাধারণ নাগরিকের জীবনে ফিরে যেতে না হয়।

কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত কোন বিল নাকচ করবার যে-ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে তাই নিয়ে রাষ্ট্রপতি এবং কংগ্রেসের কখনও কখনও মতবিরোধ দেখা দেওয়ার ফলে মাঝে মাঝে কংগ্রেসে এরকম প্রস্তাবও উত্থাপিত করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতির নাকচ করা বিল পুনরায় কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস করা চলবে, সংবিধান-নির্দিষ্ট কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হবে না।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে বিল নাকচ করার এই ক্ষমতা দেবার পর সংবিধান-প্রণেতাগণ যখন এ বিষয় নিয়ে পুনরায় আলোচনা করেন তখন তাঁরা এই রকম ধারণা করেছিলেন যে, এই ক্ষমতার ব্যবহার রাষ্ট্রপতিকে বিশেষ একটা করতে হবে না। সংবিধান-প্রণেতাগণ ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের কথা মনে রেখে এই রকম ধারণা করেছিলেন। কারণ, ১৭০৮ সালের পর ব্রিটেনের কোন রাজা পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত কোন আইন নামঞ্জুর করেন নি। এই অবস্থায় মার্কিন সংবিধান-প্রণেতাগণ ধরে নিয়েছিলেন যে, ব্রিটেনের রাজশক্তি যেখানে তাঁর বিশেষ অধিকার প্রয়োগের দ্বারা দেশের আইনসভাকে অগ্রাহ্য করতে সাহসী হননি, সেখানে মার্কিন রাষ্ট্রপতি সুনির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সংবিধান-প্রদত্ত তাঁর এই বিশেষ অধিকার ঘন ঘন প্রয়োগ করবেন না।

যদিও নানাভাবে সংবিধানের পরিবর্তন সাধনের জন্য এ-পর্যন্ত অন্তত ৪০০০ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে, তথাপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোটা ইতিহাসে মাত্র ৩১টি প্রস্তাব অঙ্গরাজ্য-গুলির অনুমোদন লাভের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে অনুমোদন লাভ করেছে মোট মাত্র ২৬টি।

যেসব সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত এবং সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে তার মধ্যে ১২টি হয়েছে ১৭৮৯ থেকে ১৮০৪ সালের মধ্যে প্রথম দু'জন রাষ্ট্রপতির শাসনকালে। তারপর ১৮৬৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত সংবিধানের আর কোন পরিবর্তন করা হয়নি। ১৮৬৫ সাল থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে সংবিধান তিনবার সংশোধন করা হয়। উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে বিরোধের ফলে এই সংশোধনগুলির প্রয়োজন হয়। ১৮৭০ সালের পর থেকে ১৯১৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে আর কোন সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। সাম্প্রতিক কালে যে এগারটি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে সেগুলি হয়েছে ১৯১৩ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে। তবে এর মধ্যে একটি সংশোধনী প্রস্তাব পূর্ববর্তী অপর একটি সংশোধনীকে (সুরাপান-বর্জন) নাকচ করার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়। ফলে প্রকৃত সংশোধনী প্রস্তাবের সংখ্যা দাঁড়ায় দশটি।

তবে একটা কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। যে ২৬টি সংশোধনী প্রস্তাব অঙ্গরাজ্যগুলির অনুমোদন লাভ করেছে তার কোনটিতেই রাষ্ট্রীয় মূলনীতির বা শ্রেণীস্বার্থের বা বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোন বিচ্যুতি ঘটেনি এবং সংবিধানের যে-বৈশিষ্ট্য শাসনতন্ত্রের তিনটি শাখার কর্মধারাকে পৃথক করে এ সকল সংশোধনের ফলে তারও কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

সমগ্রভাবে বিচার করলে এই সব সংশোধনের ফলে যে সকল পরিবর্তনগুলি ঘটেছে তাদের মোটামুটি এইভাবে ভাগ করা যায়:

১. যে সংশোধনগুলি একত্রে *Bill of Rights* বা মানবাধিকারের দলিল নামে পরিচিত—ঐ সব সংশোধনের ফলে নাগরিকদের অধিকার শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

২. কয়েকটি সামাজিক সংস্কার, যেমন—দাসত্বপ্রথার বিলোপ-সাধন, নিগ্রোদের কিছু নাগরিক অধিকার দান; নরনারীদের সমান ভোটাধিকার দান, জাতীয় কাজে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে ফেডারেল সরকারের আয়কর বসিয়ে অর্থসংগ্রহের অধিকার লাভ ইত্যাদি।

৩. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতির পরিবর্তন সাধন। যেমন, অঙ্গরাজ্যগুলির আইন-সভার সদস্যদের পরিবর্তে অঙ্গরাজ্যগুলির নাগরিকগণ কর্তৃক সিনেটের সদস্যবর্গ নির্বাচন; নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির কার্যকাল এবং কংগ্রেসের অধিবেশন মার্চ-এর পরিবর্তে জানুয়ারী থেকে শুরু করা; রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ চার বছর ধার্য করা এবং দুবারের বেশি কোন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন নিষিদ্ধ করা।

আজ পর্যন্ত মাত্র একটি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হবার পর নাকচ করা হয়। এটি হচ্ছে অষ্টাদশ সংশোধন, যার দ্বারা মাদক-পানীয় প্রস্তুত ও বিক্রি করা নিষিদ্ধ করা

হয়েছিল। ১৯১৯ সালে এই সংশোধন অনুমোদন লাভ করে এবং ১৯৩৩ সালে একবিংশ সংশোধনের দ্বারা এটা সম্পূর্ণ নাকচ করা হয়। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাদকদ্রব্য বর্জন অসফল বলে প্রমাণিত হয়।

কোন ব্যক্তি দুবারের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে পারবেন না এরকম একটি সংবিধান সংশোধনীর জন্য বহু বছর ধরে চেষ্টা করা হয়। অবশেষে ১৯৫১ সালে দ্বাবিংশ সংশোধনের দ্বারা এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং অঙ্গরাজ্যগুলির অনুমোদন লাভ করে। এরপর থেকে আর কোন ব্যক্তি চার বছর করে দুটি কার্যকালের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটন নিজে দুবারের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে অস্বীকার করে যে রীতির প্রচলন করেছিলেন তা রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের আগে পর্যন্ত সকল প্রেসিডেণ্টই মেনে এসেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ১৯৪২ সালে তৃতীয়বার এবং ১৯৪৪ সালে চতুর্থবার নির্বাচন প্রার্থী হয়ে এই রীতি ভঙ্গ করেন। ১৯৫১ সালে দুবারের বেশী রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হতে না পারার রীতিকে সংবিধান সংশোধন করে আইনে পরিণত করা হয়েছে।

তিন : সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির তুলনা (Comparative Study of Amending Methods)

মার্কিন সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতির সঙ্গে ব্রিটিশ ও সোভিয়েত সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন।

(ক) মার্কিন ও ব্রিটিশ সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির তুলনা

মার্কিন ও ব্রিটিশ সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির তুলনা করার আগে দুটি সংবিধানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা অলিখিত এবং এককেন্দ্রিক। অলিখিত হবার জন্য ব্রিটেনের সংবিধান সংশোধনী পদ্ধতি লিখিতভাবে বিধিবদ্ধ হয়নি। দ্বিতীয়ত, ব্রিটেনে এককেন্দ্রীক শাসন থাকায় সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে আইনসভাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী—এ ব্যাপারে রাজ্যের ভূমিকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে মার্কিন সংবিধান লিখিত এবং সেখানে সংশোধনী ব্যবস্থা লিখিতভাবে সংবিধানে বিধিবদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া মার্কিন শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় হবার জন্য সেখানে সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় আইনসভা কংগ্রেস এবং রাজ্য ও রাজ্য আইনসভাগুলির ভূমিকা স্বীকৃত। ফলে ব্রিটিশ সংবিধানের চেয়ে মার্কিন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি অনেক জটিল, অনমনীয় এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাগুলোর মধ্যে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে সবচেয়ে সুপরিবর্তনীয় বা নমনীয় বলে অভিহিত করা হয়। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সাধারণ আইন এবং সংবিধান সংশোধনীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে পদ্ধতিতে আইন পাশ করে সেই পদ্ধতিতে ব্রিটিশ সংবিধানকে সংশোধন করা যায়। অর্থাৎ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের দুটি কক্ষ—লর্ডসভা ও কমন্সসভার উপস্থিত সদস্যদের

সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে যে কোন সাংবিধানিক সংশোধনী বিল গৃহীত হয়ে রাজা বা রাণীর সম্মতি লাভ করে তা আইনে পরিণত হয়।

অন্যদিকে, মার্কিন সংবিধান হ'ল চরম অনমনীয় সংবিধানের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। মার্কিন সংবিধান প্রণেতারা ইচ্ছাকৃতভাবেই সংশোধন পদ্ধতিকে জটিল এবং অনমনীয় করেছেন। এর প্রধান কারণ হ'ল, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যের স্বাধিকার যাতে যথেচ্ছ সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে ব্যাহত না হয় তার দিকে দৃষ্টি রেখে মার্কিন সংবিধান প্রণেতারা সচেষ্ট থেকেছেন যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার সহজে সংবিধান পরিবর্তন করে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিকে দুর্বল করতে না পারে। তা ছাড়া মার্কিন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যে ভাবে সম্পত্তিবানদের স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সংবিধানকে তৈরী করা হয়েছে সংবিধান নমনীয় করে যাতে ঐ ভারসাম্য নষ্ট না হয় সেজন্যও সংশোধন পদ্ধতিকে জটিল এবং অনমনীয় রাখা হয়েছে। মার্কিন সংবিধান সংশোধনের জন্য দুটি স্তর লিপিবদ্ধ হয়েছে—প্রস্তাব (Proposal) গ্রহণ এবং অনুমোদন (Ratification)। সংশোধনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় আইনসভা কংগ্রেস এবং রাজ্য সরকার ও রাজ্য আইনসভার ভূমিকাকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। প্রথম স্তরের জন্য সংশোধনী প্রস্তাব কংগ্রেসের উভয় কক্ষে উত্থাপিত হয়ে উভয় কক্ষের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা গৃহীত হতে হবে, অথবা দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গরাজ্যের অনুরোধক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত এক জাতীয় সম্মেলনে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হতে হবে। উপরোক্ত যে কোন একটি উপায়ে প্রথম স্তর অতিক্রম করার পরে ঐ সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভার তিন-চতুর্থাংশ দ্বারা অনুমোদিত হবে, অথবা প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে আলাদাভাবে আহূত গণসম্মেলনের তিন-চতুর্থাংশের দ্বারা সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হতে হবে। এইভাবে সেখানে দুটি স্তর অতিক্রম করে সংবিধান সংশোধনী আইন গৃহীত হতে হয়।

ব্রিটিশ সংবিধানকে আপাতদৃষ্টিতে যতটা নমনীয় মনে হয় বাস্তবে ব্রিটিশ সংবিধান ততটা নমনীয় নয়। অন্যদিকে মার্কিন সংবিধানকে আপাতদৃষ্টিতে যতটা অনমনীয় মনে হয়, বাস্তবে ঘটনা তা নয়। কারণ ব্রিটিশ সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে সচেতন জনমত, আইনসভার আলাপ-আলোচনা এবং বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং জটিলতা সৃষ্টি করে যে, সহজে সংবিধান সংশোধন করা যায় না। তাই বলা হয় যে তত্ত্বগতদিক থেকে ব্রিটিশ নমনীয় হলেও কার্যক্ষেত্রে অতটা নমনীয় নয়।

অন্যদিকে, মার্কিন সংবিধান অনমনীয় হলেও প্রয়োজনের সাথে যাতে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে সেজন্য সুপ্রীম কোর্টের সংবিধান ব্যাখ্যা বা বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতার প্রয়োগের দ্বারা সংবিধান নির্দেশিত সংশোধনী পদ্ধতির বাইরে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনকে মেটান হয়। তাই বলা যেতে পারে যে, আনুষ্ঠানিক উপায়ে মার্কিন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি অনমনীয় হলেও অন্য উপায়ের দ্বারা ঐ প্রয়োজনকে

মেটান যায় বলে বাস্তবে সংবিধান অনমনীয় থাকেনি। বিগত দুশো বছর ধরে মার্কিন সংবিধানকে আনুষ্ঠানিকভাবে মাত্র ২৬ বার সংশোধন করা হয়েছে—কিন্তু অন্য উপায়ে সংশোধনের প্রয়োজন সিদ্ধ করা হয়েছে অসংখ্যবার।

(খ) মার্কিন ও সোভিয়েত সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির তুলনা

মার্কিন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি কিছুটা অনমনীয় হওয়া উচিত বলে মনে করা হয় যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার কে এককভাবে সহজেই শাসনব্যবস্থার সংশোধন করে যুক্তরাষ্ট্রীয়ব্যবস্থার স্থায়িত্বকে বিঘ্নিত করতে না পারে। তাই মার্কিন সংবিধানে সংশোধন পদ্ধতিকে জটিল ও অনমনীয় রাখা হয়েছে। সেখানে এমনভাবে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হয়েছে যাতে কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং রাজ্য আইনসভার সম্মতি ছাড়া সংবিধানকে সংশোধন করা না যায়।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি যুক্তরাষ্ট্র হলেও সেখানে সংবিধান সংশোধন ব্যবস্থাকে অনেক সরল রাখা হয়েছে এবং ঐ সংশোধনব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনেক নমনীয়। সেখানে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েতের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয়কক্ষের প্রত্যেকের মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হলে সোভিয়েত সংবিধান সংশোধিত হতে পারে।

সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নে সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে আঞ্চলিক সরকারগুলোর কোন ভূমিকা স্বীকৃত হয়নি এবং অনেকে এই ব্যাপারকে যুক্তরাষ্ট্রসম্মত বলে মনে করেন না। পাশ্চাত্য সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেলকে স মনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শ ও নীতিকে বিচার করেন এবং সেই অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকারের ভূমিকাকে নির্ধারণ করেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, সোভিয়েত বিপ্লবের পরে সেখানে জাতিগত সমস্যার সমাধান তথা বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করার তাগিদ থেকে সোভিয়েতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মডেলের সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেলের সাদৃশ্য না-ও থাকতে পারে এবং বাস্তবে নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা যেতে পারে যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য ও আদর্শ রূপায়ণে বাধা হয়ে ওঠেনি, বরং সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নে আঞ্চলিক সরকারগুলোর কোন ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও এদের কোন অসন্তোষ বা বঞ্চনার অভিযোগ নেই। সুতরাং মার্কিন মডেলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলেও সোভিয়েত সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিকে ত্রুটিপূর্ণ বলা ঠিক নয়—কারণ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানের দিক থেকে ঐ ব্যবস্থা সেখানে সর্বোত্তম বলে প্রমাণিত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একদিকে শক্তিশালী জাতীয় সরকার গঠন এবং অন্যদিকে রাজ্যের অধিকারকে বজায় রাখার তাগিদ থেকে সেখানকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি স্থির করা হয়েছিল—এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য। তাছাড়া সেখানকার বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত যাতে শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার স্থিতাবস্থাকে বিঘ্নিত করতে না পারে সেজন্য সংবিধানকে অনমনীয় করা হয়েছিল।

মার্কিন সংবিধানকে অনমনীয় করা হয়েছে, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে তা নমনীয় হয়ে পড়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে সংবিধান সংশোধন কষ্টকর হলেও বিচারবিভাগের সাহায্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন সময়ে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনকে মেটাতে হয়েছে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের অনমনীয়তার বিশুদ্ধতাই বা রাখা হল কোথাও ? সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বার্থ-দ্বন্দ্ব, শ্রেণীস্বার্থের টানা-পোড়েন বা কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত নেই। তাই সেখানে শ্রেণীস্বার্থের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য বা অন্য কোন কারণে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিকে অনাবশ্যক জটিল করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। তাই সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সংবিধান নির্দিষ্ট উপায়ের বাইরে সংবিধান সংশোধনেরও প্রয়োজন হয় না।

চার ঃ মার্কিন সংবিধান সংশোধনীসমূহ (Constitutional Amendments)

বিগত দুশো বছরে মার্কিন সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে মাত্র ২৬বার সংশোধন করা হয়েছে। মার্কিন সংবিধান সংশোধনীগুলিকে নীচে তুলে ধরা হল ঃ

[**প্রথম দশটি সংশোধনীর** প্রস্তাব পাশ হয় ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯ এবং অনুমোদিত হয় ১৫ই ডিসেম্বর, ১৭৯১]

প্রথম সংশোধনী

কোন ধর্ম প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বা কোন ধর্মের স্বাধীন প্রচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস কোন আইন রচনা করতে পারবে না। মত প্রকাশের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জনসাধারণের শান্তিপূর্ণভাবে মিলিত হবার অধিকার এবং তাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার প্রার্থনা করে সরকারের কাছে আবেদন জানাবার অধিকার খর্ব করে কংগ্রেস কোন আইন পাশ করতে পারবে না।

দ্বিতীয় সংশোধনী

একটি সুনিয়ন্ত্রিত সশস্ত্র মিলিশিয়া (Militia) স্বাধীন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন। তাই, নাগরিকদের অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার হরণ করা চলবে না।

তৃতীয় সংশোধনী

শান্তির সময়ে কোন নাগরিকের গৃহে তার সম্মতি না নিয়ে সৈন্য রাখা চলবে না এবং যুদ্ধের সময়ে রাখতে হলেও এ সম্পর্কে যে আইন করা হবে সেই আইনের বিধান অনুযায়ী রাখতে হবে।

চতুর্থ সংশোধনী

নিজেদের শরীর, বাড়ী, কাগজপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের নিরাপত্তা এবং তা থানাতল্লাশী ও আটক থেকে রক্ষা পাবার যে অধিকার জনসাধারণের রয়েছে তা ভাঙ্গা চলবে না। পরোয়ানা জারীর প্রয়োজন হলে সেই কারণ বলতে হবে এবং তখন যে স্থানে থানাতল্লাশী করা হবে তার বিবরণ, যে সকল লোককে গ্রেপ্তার করা হবে তাদের নাম এবং কোন জিনিস আটক করা হলে সেইসব জিনিসের বিবরণ দিতে হবে।

পঞ্চম সংশোধনী

জুরীর লিখিত অভিযোগপত্র ছাড়া কোন ব্যক্তিকে কোন মারাত্মক অথবা ঘৃণ্য অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা চলবে না। তবে যুদ্ধের সময়ে অথবা জরুরী অবস্থায় কর্তব্যরত স্থল বাহিনীর ও নৌ বাহিনীর কোন সৈন্য অথবা সশস্ত্র নাগরিক বাহিনীর কোন সদস্যের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করা যাবে। কোন ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য দুবার দৈহিক শাস্তি দেওয়া যাবে না এবং ফৌজদারী মামলায় জড়িত কোন আসামীকে তারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না, অথবা আইনানুগ পন্থা ছাড়া তার প্রাণ, স্বাধীনতা বা সম্পত্তি হরণ করা যাবে না। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কারও সম্পত্তি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে না।

ষষ্ঠ সংশোধনী

ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রকাশ্য ও দ্রুত বিচার চাওয়ার অধিকার থাকবে এবং এই বিচার হবে যেখানে অপরাধ ঘটেছে সেই জেলার ও রাজ্যের নিরপেক্ষ জুরি-মণ্ডলীর দ্বারা। কোন্ জেলায় অপরাধ ঘটেছে তা আগে আইন-বিভাগ নির্ধারণ করবে। তা ছাড়া অভিযুক্তকে অভিযোগের কারণ ও প্রকার জানাতে হবে, তার বিপক্ষে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদের তার সামনে হাজির করতে হবে, তার পক্ষের সাক্ষীদের আনার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা থাকবে এবং অভিযুক্ত তার আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য আইন-জীবীর সাহায্য পাবে।

সপ্তম সংশোধনী

দেশের প্রচলিত আইনে যেসকল মামলা রুজু হয়, সেই সকল মামলায় বিবাদের বিষয়ের মূল্য যদি কুড়ি ডলারের বেশি হয়, তবে সেই সকল মামলার অভিযুক্তের জুরির বিচার পাবার অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে। মামলার যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে জুরীরা একবার বিবেচনা করেছেন, সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের কোন আদালত আর পুনর্বিবেচনা করতে পারবে না। যদি না প্রচলিত আইনে এই পুনর্বিবেচনা সম্বন্ধে কোন নির্দেশ থাকে।

অষ্টম সংশোধনী

জামিনের জন্য অত্যধিক টাকা দাবি করা চলবে না, অত্যধিক টাকা জরিমানাও করা যাবে না। কোন শাস্তি নিষ্ঠুর অথবা অস্বাভাবিক হতে পারবে না।

নবম সংশোধনী

সংবিধানে কতকগুলি অধিকারের উল্লেখ থাকার অর্থ এই নয় যে, এগুলির বাইরে যে সকল অধিকার জনসাধারণ ভোগ করে আসছে সেগুলি অস্বীকার করা বা খর্ব করা।

দশম সংশোধনী

সংবিধান যেসকল অধিকার যুক্তরাষ্ট্রকে দেয়নি, এবং যে-সকল অধিকার রাজ্যগুলিকে দিতে বারণ করেনি সেই সকল অধিকার জনসাধারণের অথবা রাজ্যগুলির জন্য সংরক্ষিত আছে বলে ধরে নিতে হবে।

একাদশ সংশোধনী

[প্রস্তাব গৃহীত ৪ঠা মার্চ, ১৭৯৪ ; অনুমোদিত ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৫]

যুক্তরাষ্ট্রের এক রাজ্যের বিরুদ্ধে অন্য কোন রাজ্যের নাগরিকগণ কর্তৃক আনীত কোনো অভিযোগে অথবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক বা প্রজাগণ কর্তৃক আনীত কোন অভিযোগে, আইনগত বা ইকুইটি-গত কোন প্রশ্নে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে না।

দ্বাদশ সংশোধনী

[প্রস্তাব গৃহীত ৯ই ডিসেম্বর, ১৮০৩ ; অনুমোদিত ২৭শে জুলাই, ১৮০৩]

নির্বাচকগণ তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে মিলিত হবেন এবং ভোটপত্রের সাহায্যে রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির জন্য ভোট দিবেন—রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির অন্তত একজন নির্বাচকদের সঙ্গে একই রাজ্যের বাসিন্দা হবেন না। ভোটপত্রে তাঁরা রাষ্ট্রপতি পদের জন্য যাঁকে ভোট দিবেন তাঁর নাম উল্লেখ করবেন এবং ভিন্ন ভোটপত্রে উপরাষ্ট্রপতির নাম উল্লেখ করবেন এবং তাঁরা ভিন্ন এক তালিকায় রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য যে-সব ব্যক্তিদের তাঁরা ভোট দিয়েছেন সেই সমস্ত ব্যক্তির নাম ও প্রত্যেকের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করবেন, তালিকাগুলি তাঁরা স্বাক্ষর ও সীল করে সিনেটের সভাপতির উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে পাঠাবেন। সিনেটের সভাপতি সিনেট ও প্রতিনিধিসভার সামনে সমস্ত নিদর্শিত পত্রগুলি খুলবেন এবং তখন ভোট গণনা করা হবে। রাষ্ট্রপতি পদের জন্য যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন তিনি রাষ্ট্রপতি হবেন যদি এই ভোটসংখ্যা নিযুক্ত নির্বাচকদের পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগুরু হয় ; কিন্তু যদি কেউ এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় তা হলে তালিকায় রাষ্ট্রপতি-পদের জন্য সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত তিনজনের মধ্য থেকে প্রতিনিধিসভা ভোটপত্রের সাহায্যে অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালে ভোটদান করবে রাজ্যগুলি এবং প্রত্যেক রাজ্যের একটি ভোট দিবার অধিকার থাকবে। এই উদ্দেশ্যে কোরাম গঠিত হবে দুই-তৃতীয়াংশ রাজ্যের সদস্য কিংবা সদস্যদের নিয়ে এবং নির্বাচনের জন্যে রাজ্যগুলির মধ্যে বেশীর ভাগ রাজ্যের ভোটের প্রয়োজন হবে। এবং যদি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভার

প্রতিনিধি সভার ওপর বর্তায় এবং প্রতিনিধিসভা পরবর্তী ৪ঠা মার্চের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না করে তা হলে, রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হলে বা তিনি অন্য কোন শাসনতান্ত্রিক অক্ষমতাগ্রস্ত হলে, উপরাষ্ট্রপতি যেমন রাষ্ট্রপতি হিসাবে কার্যপরিচালনা করে থাকেন, এক্ষেত্রেও তেমনি করবেন। যিনি উপরাষ্ট্রপতি পদে সর্বাধিক ভোট পাবেন তিনি উপরাষ্ট্রপতি হবেন। যদি সেই ভোটসংখ্যা নিযুক্ত নির্বাচকদের পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় এবং যদি কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পান তবে তালিকায় সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত দুজনের মধ্য থেকে সিনেট একজনকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করবেন, এই উদ্দেশ্যে কোরাম গঠিত হবে সকল সিনেটরের দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে এবং নির্বাচনে সিনেটরদের মোট সংখ্যার মধ্যে বেশীর ভাগের ভোটের প্রয়োজন হবে। কিন্তু যুক্ত-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিপদ লাভে কোন ব্যক্তির সংবিধানগত অযোগ্যতা থাকলে তিনি উপরাষ্ট্রপতি পদেরও যোগ্য হবেন না।

ত্রয়োদশ সংশোধনী

[প্রস্তাব গৃহীত ৩১শে জানুয়ারী, ১৮৬৫ ; অনুমোদিত ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৬৫]

(ক) দাসত্বের অস্তিত্ব, অথবা যথাযথ বিচারের ফলে অপরাধের দণ্ড হিসাবে ছাড়া বাধ্যতামূলক শ্রমের অস্তিত্ব, যুক্তরাষ্ট্রে অথবা যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন এলাকার কোন স্থানে থাকবে না।

(খ) কংগ্রেসের যথোপযুক্ত আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদ বলবৎ করবার ক্ষমতা থাকবে।

চতুর্দশ সংশোধনী

[প্রস্তাব গৃহীত ১৩ই জুন, ১৮৬৬ ; অনুমোদিত ৯ই জুলাই, ১৮৬৮]

(ক) যুক্তরাষ্ট্রে জন্মেছেন এমন-সব ব্যক্তি অথবা নাগরিক-অধিকার-প্রাপ্ত সকল ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের এবং যে অঙ্গরাজ্যের তাঁরা অধিবাসী সেই রাজ্যের নাগরিক হিসাবে গণ্য হবেন। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হতে পারে কোনো অঙ্গরাজ্য এমন কোন আইন-প্রণয়ন করতে অথবা বলবৎ করতে পারবে না; অথবা কোন অঙ্গরাজ্য বিনা বিচারে কোন ব্যক্তিকে তার জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না; অথবা কোন অঙ্গরাজ্য তার কর্তৃত্বাধীন এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে আইনের সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

(খ) কর-দায়মুক্ত রেড ইণ্ডিয়ান ছাড়া প্রত্যেক রাজ্যে সমস্ত জনসংখ্যা গণনা করে সেই সংখ্যা অনুসারে উক্ত রাজ্যের প্রতিনিধিসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হবে। কিন্তু যখন এরূপ রাজ্যের একুশ বছর বয়স্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক কোন পুরুষ সদস্যকে, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্বাচক (electors), কংগ্রেসের প্রতিনিধি, রাজ্যের ব্যবস্থাপক ও বিচার বিভাগীয় কর্মচারী বা তার আইনসভার সদস্য নির্বাচনে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় অথবা ঐ অধিকারকে কোনভাবে সঙ্কুচিত করা হয়

এবং যদি তা বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ বা কোন অপরাধ ভিন্ন অন্য কারণে করা হয়, সেক্ষেত্রে রাজ্যের প্রতিনিধি-সংখ্যা, রাজ্যের একুশ বছর বয়স্ক সকল পুরুষ নাগরিকদের সংখ্যার মধ্যে ঐরূপ পুরুষ নাগরিকদের সংখ্যার অনুপাতে কমে যাবে।

(গ) কোন ব্যক্তি সিনেটর বা কংগ্রেসের প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচক অথবা যুক্তরাষ্ট্র বা কোন অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত বে-সামরিক বা সামরিক কোন পদাধিকারী হতে পারবেন না, যিনি আগে কংগ্রেসের সদস্য বা যুক্তরাষ্ট্রের কোন অফিসার বা রাজ্য আইনসভার সদস্য বা কোন রাজ্যের ব্যবস্থাপক বা বিচারবিভাগীয় অফিসার হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সমর্থনের শপথ গ্রহণ করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছিলেন বা তার শত্রুকে সুবিধা ও সাহায্য দিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের প্রত্যেক সভার দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের দ্বারা এইরূপ বাধা অপসারণ করা যাবে।

(ঘ) পেন্সন-প্রদানের জন্য এবং বিদ্রোহ দমনকার্যে সাহায্যার্থে অর্থ প্রদানের জন্য কৃত ঋণসহ যুক্তরাষ্ট্রের সকল সরকারী ঋণ যা আইনানুসারে করা হয়েছে তার বৈধতা অস্বীকার করা চলবে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সহায়তার জন্য কৃত ঋণ বা দায় বা কোন দাস চলে যাওয়ায় অথবা তার মুক্তির দরুন কোন ক্ষতি সম্পর্কে কোন দাবি যুক্তরাষ্ট্র বা তার অন্তর্ভুক্ত কোন রাজ্য স্বীকার করবে না বা পরিশোধ করবে না। এইসব ঋণ, দায় ও দাবি অবৈধ ও বাতিল বলে ধরা হবে।

(ঙ) কংগ্রেস যথোপযুক্ত আইন দ্বারা এই অনুচ্ছেদের ধারাগুলি বলবৎ করার ক্ষমতাধিকারী হবে।

পঞ্চদশ সংশোধনী

[প্রস্তাব গৃহীত ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৯ ; অনুমোদিত ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০]

(ক) জাতি, বর্ণ বা পূর্বেকার দাসত্ব অবস্থার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ভোটাধিকার যুক্তরাষ্ট্র বা কোন রাজ্য কর্তৃক নাকচ বা হ্রাস করা যাবে না।

(খ) কংগ্রেস যথোপযুক্ত আইনদ্বারা এই অনুচ্ছেদ বলবৎ করতে ক্ষমতাধিকারী হবে।

ষোড়শ সংশোধনী

[প্রস্তাব গৃহীত ২রা জুলাই, ১৯০৯ ; অনুমোদিত ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১০]

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বণ্টন না করে এবং কোন গণনা বা আদমসুমারি গ্রাহ্য না করে যে কোন সূত্রে উপার্জিত আয়ের ওপর কর ধার্য করা ও আদায়ের ক্ষমতা কংগ্রেসের থাকবে।

সপ্তদশ সংশোধনী

[প্রস্তাব গৃহীত ১৩ই মে, ১৯১২ ; অনুমোদিত ৮ই এপ্রিল, ১৯১৩]

(ক) যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের জনসাধারণ কর্তৃক ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত দুজন করে সিনেটর নিয়ে গঠিত হবে এবং প্রত্যেক সিনেটরের একটি করে ভোট

থাকবে। প্রত্যেক রাজ্যের নির্বাচকদের বৃহত্তর রাজ্য আইন-সভার নির্বাচকদের অনুরূপ যোগ্যতা থাকতে হবে।

(খ) সেনেটে কোন রাজ্যের প্রতিনিধিপদ শূন্য হলে সেই রাজ্যের কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষ এরূপ শূন্যস্থান পূরণের জন্য নির্বাচন-বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন; কিন্তু কোন রাজ্যের আইনসভা সেখানকার জনসাধারণ কর্তৃক আইন-সভার নির্দেশমতো নির্বাচনের দ্বারা উক্ত শূন্যস্থান পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষকে অস্থায়ী নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন।

(গ) এই সংশোধন সংবিধানের অঙ্গ হিসাবে বৈধ প্রতিপন্ন হবার আগে যেসকল সেনেটর নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের নির্বাচন বা নির্বাচিত সেনেটরের কার্যকাল ক্ষুন্ন হতে পারে এমনভাবে ব্যাখ্যাত হবে না।

অষ্টাদশ সংশোধনী

[প্রস্তাব গৃহীত ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯১৭, অনুমোদিত ১৬ই জানুয়ারী, ১৯১৯]

(ক) এই অনুচ্ছেদ অনুমোদিত হবার এক বছর পর থেকে পানের উদ্দেশ্যে দেশাভ্যন্তরে উত্তেজক মদ্য উৎপাদন, বিক্রয় বা চালান, তার আমদানি বা যুক্তরাষ্ট্র ও তার এলাকা থেকে তার রপ্তানি এতদ্বারা নিষিদ্ধ করা হল।

(খ) যথোপযুক্ত আইনদ্বারা একই সঙ্গে এই অনুচ্ছেদ বলবৎ করার ক্ষমতা কংগ্রেস ও বিভিন্ন রাজ্যের থাকবে।

(গ) এই অনুচ্ছেদটি কার্যকরী হবে না, যদি এটা সংবিধানের ব্যবস্থামত কংগ্রেস-দ্বারা রাজ্যসমূহে প্রেরণের তারিখ থেকে সাত বছরের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের আইন-সভা কর্তৃক সংবিধানের সংশোধন হিসাবে অনুমোদিত না হয়।

উনবিংশতিতম সংশোধনী

[প্রস্তাব গৃহীত ৪ঠা জুন, ১৯১৯, অনুমোদিত ১৮ই আগষ্ট, ১৯২০]

(ক) যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণের ভোটাধিকার, শুধু পুরুষ বা নারী এই কারণে, যুক্তরাষ্ট্র বা কোন রাজ্য কর্তৃক অস্বীকার করা বা হ্রাস করা হবে না।

(খ) এই অনুচ্ছেদ যথোপযুক্ত আইনদ্বারা বলবৎ করার ক্ষমতা কংগ্রেসের থাকবে।

বিংশতিতম সংশোধনী

[প্রস্তাব গৃহীত ২রা মার্চ, ১৯৩২, অনুমোদিত ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৩]

(ক) এই অনুচ্ছেদ অনুমোদিত না হলে যে বছর কার্যকাল শেষ হবার কথা, এখন এই অনুচ্ছেদ অনুমোদিত হওয়ায়, সেই বছর ২০শে জানুয়ারী দ্বিপ্রহরে রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির কার্যকাল এবং ৩রা জানুয়ারী সেনেটর ও প্রতিনিধিদের কার্যকাল শেষ হবে, এবং তার পর থেকে নূতন নির্বাচিতদের কার্যকাল শুরু হবে।

(খ) কংগ্রেসের অধিবেশন প্রত্যেক বছর অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হবে এবং এরূপ অধিবেশনের তারিখ আইনবলে ভিন্নরূপ নির্দিষ্ট না হলে অধিবেশন জানুয়ারী মাসের ৩রা তারিখের দ্বিপ্রহরে অনুষ্ঠিত হবে।

(গ) যদি রাষ্ট্রপতির কার্যকালের প্রারম্ভের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মৃত্যুমুখে পতিত হন তা হলে নির্বাচিত উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হবেন। যদি কার্যকালের জন্য নির্দিষ্ট সময় শুরু হবার আগে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হন অথবা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি উপযুক্ততা প্রমাণে ব্যর্থ হন, তা হলে নির্বাচিত উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির উপযুক্ততা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির কাজ চালাবেন এবং নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও নির্বাচিত উপরাষ্ট্রপতি উভয়েই উপযুক্ততা প্রমাণিত না করতে পারলে কংগ্রেস এই পরিস্থিতিতে আইনসম্মত উপায়ে কর্তব্য নির্ধারণ করবেন, কে রাষ্ট্রপতির কাজ করবেন তা ঘোষণা করবেন ; রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি তাঁদের উপযুক্ততা প্রমাণ না করা পর্যন্ত ঐ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কাজ করবেন।

(ঘ) প্রতিনিধিসভার ওপর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভার পড়লে তাঁরা যেসব ব্যক্তির মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করবেন সেই সকল ব্যক্তির কারুর মৃত্যু হলে সেক্ষেত্রে কংগ্রেস আইন দ্বারা এরূপ অবস্থার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

(ঙ) (ক) ধারা ও (খ) ধারা এই অনুচ্ছেদ অনুমোদিত হবার পরবর্তী অক্টোবরের ১৫ই তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

(চ) এই অনুচ্ছেদ দাখিল করার তারিখ থেকে সাত বছরের মধ্যে অঙ্গরাজ্যগুলির তিন-চতুর্থাংশের আইন-সভা দ্বারা এই অনুচ্ছেদ সংবিধানের সংশোধন হিসাবে অনুমোদিত না হলে তা কার্যকরী হবে না।

একবিংশতিতম সংশোধনী

[প্রস্তাব গৃহীত ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩, অনুমোদিত ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩]

(ক) যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধনের অষ্টাদশ অনুচ্ছেদটি এতদ্বারা বাতিল হল।

(খ) আইন অমান্য করে যুক্তরাষ্ট্রের কোন রাজ্যে, এলাকায় বা উপনিবেশে উত্তেজক মদ্য চালান, আমদানি, বিক্রয়, ব্যবহারের জন্য মজুত, এতদ্বারা নিষিদ্ধ করা হল।

(গ) কংগ্রেস কর্তৃক রাজ্যসমূহে দাখিল করার তারিখ থেকে সাত বছরের মধ্যে সংবিধানের ব্যবস্থানুসারে বিভিন্ন রাজ্যের কন্‌ভেনসন্‌ কর্তৃক সংবিধানের সংশোধন হিসাবে অনুমোদিত না হলে এই অনুচ্ছেদ কার্যকর হবে না।

দ্বাবিংশতিতম সংশোধনী

[প্রস্তাব গৃহীত ২১শে মার্চ ১৯৪৭, অনুমোদিত ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১]

(ক) রাষ্ট্রপতি পদে কেউই দুবারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবেন না ; এবং যে ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত অপর কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট কার্যকালে রাষ্ট্রপতি হিসাবে

অথবা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিরূপে দুই বছরাধিককাল কাজ করেছেন সে ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে একবারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবেন না। কিন্তু কংগ্রেসের এই অনুচ্ছেদ প্রস্তাবকালে রাষ্ট্রপতি পদে কার্যরত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে না এবং রাষ্ট্রপতি বা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কার্যকালের সময়ে এই অনুচ্ছেদ কার্যকর হলে তা কোন ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্রপতির বা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কার্যকালের অবশিষ্ট সময়ে পদে বহাল থাকতে বাধা হবে না।

(খ) কংগ্রেস কর্তৃক রাজ্যসমূহে দাখিল করার তারিখ থেকে সাত বছরের মধ্যে সংবিধানের সংশোধন হিসাবে তিন-চতুর্থাংশ রাজ্যের আইন-সভা কর্তৃক অনুমোদিত না হলে এই সংশোধনী কার্যকর হবে না।

ত্রয়োবিংশতিতম সংশোধনী

(প্রস্তাব গৃহীত ১৬ই জুন, ১৯৬০, অনুমোদিত ২৯শে মার্চ, ১৯৬১)

(ক) কংগ্রেসের নির্দেশমত সরকারের কর্মক্ষেত্র জেলাগুলি (District) নিয়োগ করবে।

রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনের নির্বাচকের সংখ্যা, বা জেলাগুলি যদি রাজ্য হোত তবে তার সিনেট ও প্রতিনিধিসভার সদস্য সংখ্যার সমান অথচ যা কোনক্রমেই সর্বনিম্ন জনসংখ্যাবিশিষ্ট রাজ্যের বেশি হতে পারবে না সেই সংখ্যার সঙ্গে রাজ্য যাদের নিয়োগ করবে তা যুক্ত হবে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচক হিসাবে এবং এরা জেলাতে মিলিত হবে সেই সকল কাজ করার জন্য বা সংবিধানের দ্বাদশ অনুচ্ছেদ বর্ণিত হয়েছে।

(খ) এই ধারাকে প্রয়োগ করার জন্য কংগ্রেসের প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের অধিকার থাকবে।

চতুর্বিংশতিতম সংশোধনী

(প্রস্তাব গৃহীত ২৭শে আগস্ট ১৯৬১, অনুমোদিত ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৬৪)

(ক) কর না-দেবার জন্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সিনেট, প্রতিনিধিসভা ইত্যাদির নির্বাচনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(খ) এই ধারাকে প্রয়োগ করার জন্য কংগ্রেসের প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করার অধিকার থাকবে।

পঞ্চবিংশতিতম সংশোধনী

(প্রস্তাব গৃহীত ৬ই জুলাই, ১৯৬৫, অনুমোদিত ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭)

(ক) রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা হলে বা তিনি পদত্যাগ করলে বা তাঁর মৃত্যু ঘটলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হবেন।

(খ) উপরাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করবেন এবং ঐ মনোনয়ন কংগ্রেসের উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হলে তিনি কার্যভার গ্রহণ করবেন।

(গ) রাষ্ট্রপতি যখন সিনেট ও প্রতিনিধিসভার অধ্যক্ষকে লিখিতভাবে তাঁর পদের কাজ ও দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন এবং যতক্ষণ এর বিরোধী কিছু লিখিত-ভাবে না-জানান ততদিন পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি কার্যকর রাষ্ট্রপতি (Acting President) হিসাবে কাজ করবেন।

(ঘ) যখন উপরাষ্ট্রপতি এবং শাসনবিভাগীয় উচ্চকর্মচারীরা লিখিতভাবে বা কংগ্রেস আইন করে সিনেট এবং প্রতিনিধিসভাকে জানান যে, রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালনে অক্ষম তখন সঙ্গে সঙ্গে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন।

* * * *

ষড়্‌বিংশতিতম সংশোধনী

(প্রস্তাব গৃহীত ২৩শে মার্চ, ১৯৭১, অনুমোদিত ৩০শে জুন, ১৯৭১)

(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আঠার বছর বা তার উর্ধ্বের নাগরিকদের ভোটাধিকার বয়সগত কারণে অস্বীকার করা যাবে না।

(খ) কংগ্রেস এই ধারাকে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে প্রয়োগ করতে পারবে।

৪

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা
American Federalism

এক : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উৎপত্তি (Origin of Federal System)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও প্রাচীন বলে অভিহিত করা হয় (American Federalism is older than the United States of America)।[১] ইংলণ্ড থেকে এসে যারা আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন তারা ইংলণ্ডের রাজশক্তি এবং ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করতেন। দ্বি-কর্তৃপক্ষের কাছে আনুগত্য প্রকাশের এই মানসিকতাই আমেরিকার উপনিবেশ স্থাপনকারীদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল এবং ঐ মানসিকতাই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উৎস বলে মনে করা হয়—কারণ সমগ্র এবং অংশের কাছে আনুগত্য যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য।[২] পরবর্তী সময়ে আমেরিকার উপনিবেশগুলোতে একদিকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিজেদের কর্তৃত্ব স্বীকার করা এবং অন্যদিকে বৈদেশিক ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব মেনে নেবার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা বণ্টন (division of powers) নীতি কার্যকর হয়—যা যুক্তরাষ্ট্রের একটি বৈশিষ্ট্য।

যুক্তরাষ্ট্রীয় মানসিকতা

যুক্তরাষ্ট্রীয় মানসিকতার উত্তরাধিকার নিয়ে ১৭৮১ সালে উপমহাদেশীয় সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যে প্রথম সংবিধান *Articles of Confederation* রচনা করা হয়, সেখানে ১৩টি রাজ্যের সমন্বয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যদিও সংবিধান বা সনদে 'রাষ্ট্রসমবায়' শব্দটি উল্লেখিত থাকে। ঐ সনদে বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা, যুদ্ধ ঘোষণা, আমেরিকার প্রাচীন বাসিন্দা রেড্ ইণ্ডিয়ানদের ব্যাপার দেখা-শোনা করা, রাষ্ট্রীয় ঋণ-সংগ্রহ করা, রাজ্যগুলো থেকে সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করা ইত্যাদি ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরে অর্পিত হয় এবং অবশিষ্ট ক্ষমতা রাজ্যগুলোর জন্য নির্দিষ্ট করে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে রূপ দেওয়া হয়।

রাষ্ট্র সমবায়ের সনদে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

একটি জাতীয় সরকারের ক্ষমতার যে ব্যাপ্তি থাকা প্রয়োজন রাষ্ট্রসমবায়ের সনদে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারের সে ক্ষমতা ছিল না। কর ধার্য করা এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থের জন্য নির্ভরশীল থাকতে হ'ত। তাছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট ক্ষমতা বণ্টন হ'ল যুক্তরাষ্ট্রের নির্যাস। কিন্তু

ঐ ব্যবস্থার ত্রুটি

---

১. *American Government and Politics*, Allen M. Potter, p. 36.

২. "Federalism involves civic loyalties to a political whole and its parts that are distinct yet not inconsistent".—ঐ

ঐ সনদে ক্ষমতা বণ্টনের সীমারেখা খুব একটা স্পষ্ট ছিল না। তাছাড়া ঐ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে নতুন সংবিধান প্রণয়নের সময়ে সংবিধান প্রণেতাদের উপরোক্ত ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন থেকে নতুন সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিন্যাস করার দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল। বিশেষ করে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাতে গিয়ে জাতীয় সরকারকে দেউলিয়া হতে হয়, এবং নতুন সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক বিন্যাসকে পরিবর্তন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু রাজ্যগুলোর মধ্যে স্বার্থগত সংঘাত, সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে আঞ্চলিক ও শ্রেণীস্বার্থের প্রভাব ও টানাপোড়েন, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার বনাম দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে বিতর্ক ইত্যাদি উপাদান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সংবিধানে কি রূপ নেবে তা অনিশ্চিত করে তোলে। ভার্জিনিয়া পরিকল্পনায় (Verginia Plan) শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে এমন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হয়। অন্যদিকে নিউজার্সি পরিকল্পনায় (New Jersey Plan) কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্বাধিক ক্ষমতায় সজ্জিত না করে 'প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি'-র (Purely federal) প্রতিফলন ঘটে এমন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার জন্য আহ্বান জানান হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বনাম রাজ্যসরকারের ক্ষমতা কতটা হবে তা নিয়ে সংবিধান প্রণেতারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। ভার্জিনিয়া পরিকল্পনার জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে কোন আপোষ করতে অস্বীকার করেন। অবশেষে সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতায় পুষ্ট শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ফিলাডেলফিয়াতে সংবিধান প্রণেতাদের মতপার্থক্য

দুই : যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Federalism)

শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয়, কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, সোবিয়েত ইউনিয়ন, ব্রাজিল, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। হারম্যান ফাইনার বলেছেন যেখানে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ আঞ্চলিক এলাকাগুলির হাতে এবং অন্য অংশ কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে। (A federal state in one in which part of authority and power is vested in the local areas while another part is vested in a central institution deliberately constituted by an association of the local areas)। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় —এই দুই ধরনের সরকার থাকে এবং সংবিধান দ্বারা এরা গঠিত এবং এদের ক্ষমতা বণ্টিত হয়। কে. সি. হুইয়ার বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র হ'ল এমন এক ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলো নিজ নিজ এলাকা ও সংবিধান স্বীকৃত

যুক্তরাষ্ট্র কি ?

এক্তিয়ারের মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করে। ডাইসী মনে করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হ'ল এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে জাতীয় ঐক্য ও ক্ষমতার সঙ্গে রাজ্যগুলোর অধিকারের সমন্বয় সাধন করা হয় (A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of 'state right')। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্যের সরকারের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় যাতে সমষ্টিগত স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং আঞ্চলিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলি আঞ্চলিক সরকারগুলির এক্তিয়ারে রাখা হয়। তবে সকল যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টনের ব্যাপারে একই নীতি গ্রহণ করা হয় না। কোথাও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে অবশিষ্ট ক্ষমতা রাজ্য সরকারকে ন্যস্ত করা হয়। আবার কোথাও এর বিপরীত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়—আঞ্চলিক সরকারের জন্য ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে ন্যস্ত করা হয়। ভারতে অবশ্য তৃতীয় আর একটি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষমতাকে তিনটি ভাগ করে একটি কেন্দ্রের একটি রাজ্যের এবং তৃতীয়টিকে কেন্দ্র ও রাজ্যের যুগ্ম এক্তিয়ারে রাখা হয়েছে।

দুটি কারণে বা উপায়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হতে পারে। প্রথমত, অনেকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্র আত্মরক্ষা, নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি (centripetal force) প্রক্রিয়া করে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। এই পদ্ধতিকে *Process of Centralization* বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এভাবে গঠিত হয়েছে। অন্যদিকে বিশাল এককেন্দ্রীক রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্য বা জাতি, ধর্ম, ভাষাগত পার্থক্যের জন্য ভেঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রাতিগ শক্তি (centrifugal force) প্রক্রিয়া করে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। ১৯৩৫ সালে এইভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। এই পদ্ধতিকে *Process of Decentralization* বলে।

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কারণ

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পেছনে যে মানসিকতা কাজ করে তা হল মিলনের আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু একত্র না হওয়া (They desire union but not unity)। অর্থাৎ একদিকে জাতীয় ঐক্য এবং অন্যদিকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা—এই আপাত বিরোধী দুটি ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে—এরূপ অবস্থায় রাজনৈতিক সমাধান হল যুক্তরাষ্ট্র গঠন।

মানসিকতা

যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। নীচে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হ'ল।

১. যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুই শ্রেণীর সরকারের (two sets of governments) অবস্থিতি দেখা যায়। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে এক প্রকার এবং কেন্দ্রে আর এক প্রকার সরকার অবস্থান করে।

২. সংবিধানগত স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উৎপত্তি ঘটে এবং

যুক্তরাষ্ট্রের দু শ্রেণীর সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতার বণ্টন ও পরস্পরের এক্তিয়ার শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্দেশ করে দেওয়া হয় ; যদিও ঐ বণ্টন নীতি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকারের। নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে উভয় সরকারই চরম ক্ষমতার অধিকারী এবং কেউ কারও অধীন নয়।

৩. সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে যাতে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারসমূহ সুনিশ্চিতভাবে পরিচালিত হতে পারে তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত (written constitution) হওয়া প্রয়োজন। উড্রো উইলসনের মতে লিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য না হলেও এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৪. সংবিধানের অবিসংবাদিত প্রাধান্য (supremacy of the constitution) যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। সংবিধানের প্রাধান্য না থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে কাজকর্ম চলতে পারে না।

৫. সংবিধানের ধারাগুলো যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য এবং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলোর অধিকার ও ক্ষমতা রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Judiciary) থাকা প্রয়োজন। শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে অথবা কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার এক্তিয়ার নিয়ে কোন মতভেদ উপস্থিত হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত তার নিষ্পত্তি করবে। অর্থাৎ এককথায় যুক্তরাষ্ট্রে বিচারবিভাগীয় প্রাধান্য (supremacy of Judiciary) থাকা উচিত। বিচারবিভাগীয় প্রাধান্য রক্ষার দ্বারাই সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৬ কেন্দ্রীয় বা অঙ্গরাজ্যগুলোর সরকার যাতে নিজেদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন করে অন্যের ক্ষমতা হস্তগত ও আত্মসাৎ করতে না পারে তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid) হওয়া কাম্য।

৭. সমানাধিকারের ভিত্তিতে অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্বের জন্য আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভার দুটি কক্ষ সৃষ্টি করে দ্বিতীয় বা উচ্চকক্ষে (Second or Upper Chamber) অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্বকে সুনিশ্চিত করা হয়।

বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যের কতটা পরিমাণ অস্তিত্ব রয়েছে তার ভিত্তিতে হুইয়ার (Wheare) যুক্তরাষ্ট্র (Federal) এবং আধা-যুক্তরাষ্ট্র (Quasi-federal) এই দু'ধরনের শ্রেণীবিভাগ করার পক্ষপাতী। কোন কোন রাষ্ট্র কাঠামোগত দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র হলেও বাস্তবে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় উপাদানের এত অভাব থাকে যে তাকে পরিপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্র বলা যায় না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ইত্যাদি দেশের শাসনব্যবস্থাকে আধা-যুক্তরাষ্ট্র বলা যেতে পারে।

তিন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় 'মডেল' (American Model of Federation)

মার্কিন সংবিধান হল পৃথিবীর প্রথম লিখিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান। সংবিধান বিশেষজ্ঞরা 'আদর্শ' যুক্তরাষ্ট্র' বলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় 'মডেল'কে বোঝেন। অর্থাৎ সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেল মনে করেন। তাই তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেলকে সামনে রেখেই বিচার করেন কোন্ দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কোন্ দেশ আধা-যুক্তরাষ্ট্র, বা কোন্ দেশ এককেন্দ্রীক। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন দেশের সাংবিধানিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সকল দেশের সমস্যা এক নয়, বা সমস্যার প্রকৃতিও এক নয়। তাই একই উপায়ে বা একই যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেলকে অনুসরণ করে সকল দেশের সমস্যার সমাধান নাও হতে পারে।

মার্কিন মডেল একমাত্র নিয়ামক নয়

যেমন বলা যায়, সোবিয়েত বিপ্লবের পরে সেখানে জাতিগত সমস্যার সমাধান তথা বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জনসমাজের আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে একটি ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠন করার তাগিদ থেকে সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। এবং বলা বাহুল্য, সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেলের সব বিষয়ে সাদৃশ্য নাও থাকতে পারে এবং বাস্তবে নেই। কিন্তু তা সত্তেও কালের বিচারে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে. সোবিয়েত ইউনিয়নে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করা হয়েছে তা সেখানকার জটিল জাতিগত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে সফল হয়েছে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হ'লেও সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানের পক্ষে ঐ ব্যবস্থাই সর্বোত্তম বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সোবিয়েতে কি হয়েছে

তাছাড়া মনে রাখা প্রয়োজন যে, যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা একটা সাংবিধানিক ব্যবস্থা মাত্র— কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা মডেল কোন মহৎ আদর্শ বা চিরন্তন ন্যায়ের প্রতীক নয়; তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মডেলও অবশ্যগ্রহণীয় কোন মৌল আদর্শ নয়। সুতরাং যে দেশে যে সাংবিধানিক ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব সেই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই সে দেশের পক্ষে আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।

উপরোক্ত যুক্তিকে অনুসরণ করে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেলের বিচারে ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র, না আধা-যুক্তরাষ্ট্র সেটা বড় কথা নয়। মূল কথা হ'ল. ভারতের মত বহু ভাষাভাষী এক বিরাট দেশের ঐক্যকে বজায় রেখে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জনসমাজ ও অঞ্চলের দাবী ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সুষ্ঠু রূপ দেবার দায়িত্ব পালনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কতটা সফল হয়েছে। তার উপরই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সার্থকতা নির্ভর করে— নির্ভর করে না কোন্ মডেলকে আমরা কতটা গ্রহণ করেছি, বা কতটা বর্জন করেছি তার ওপরে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কতটা সার্থক

চার ॥ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (**Features of American Federal System**)

রাষ্ট্র সমবায়ের শাসনব্যবস্থাকে অনুসরণ করে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে মার্কিন শাসনব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় করা হয়, যদিও মার্কিন সংবিধানের কোথাও 'যুক্তরাষ্ট্র' শব্দটি লিপিবদ্ধ করা হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হ'ল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক এবং আগেই বলা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যের অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেলের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান কতটা যুক্তরাষ্ট্রীয় তা বিচার করা হয়। স্বভাবতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

ক. মৌল বৈশিষ্ট্য

যে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে মার্কিন সংবিধান সহ সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছে, প্রথমে মার্কিন সংবিধানের সেই বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হ'ল। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মৌল বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

১. দ্বৈত সরকার

সংবিধান স্বীকৃত একটি মাত্র সরকারের অস্তিত্ব এবং ঐ সরকারের অপ্রতিহত ক্ষমতা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুধরনের সরকার থাকে—কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক বা অঙ্গরাজ্য সরকার। উভয় শ্রেণীর সরকারের উৎপত্তি সংবিধান থেকে এবং সংবিধানই এদের ক্ষমতার উৎস এবং সংবিধানের দ্বারাই এরা নিয়ন্ত্রিত হয়। বস্তুত দুধরনের সরকারের উপস্থিতিতেই কোন সংবিধানকে যুক্তরাষ্ট্রীয় মাত্রা দান করে।

যেহেতু মার্কিন শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়, তাই সেখানে দুধরনের সরকারের অস্তিত্ব দেখা যায়। একদিকে কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকার বা জাতীয় সরকার বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং অন্যদিকে অঙ্গরাজ্যগলিতে অঙ্গরাজ্য সরকার। মার্কিন সংবিধানে উভয় শ্রেণীর সরকারের গঠন বিধিবদ্ধ হয়েছে এবং এদের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে।

২. লিখিত সংবিধান

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় যেহেতু কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের উৎপত্তি হয় সংবিধান থেকে এবং সংবিধানে এদের ক্ষমতা নির্দিষ্ট থাকে—তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান লিখিত হওয়া উচিত বলে মনে করা হয়। উড্রো উইলসন বলেছেন, লিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য না হলেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত। এই লিখিত সংবিধানে জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে লিখিতভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এবং এই কারণে

জাতীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বা রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা কম। বিরোধ দেখা দিলেও সংবিধানের লিখিত বিধির দ্বারা তা মীমাংসা করা সহজ। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন সংবিধানেই সব কিছু লিখিত থাকতে পারে না— অলিখিত অনেক বিষয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন, অনেক শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত ইত্যাদি মার্কিন শাসনব্যবস্থার সাংবিধানিক উপাদানে পরিণত হয়েছে। এইজন্য মার্কিন সংবিধানকে গতিশীল, বিবর্তনধর্মী বা ডারউইনবাদী বলে অভিহিত করা হয়।

সুতরাং একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, লিখিত সাংবিধানিক বিধির বাইরে মার্কিন সাংবিধানিক ব্যবস্থায় অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। লিখিত সংবিধান ছাড়াই কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইন, শাসনবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত এবং প্রচলিত রীতি নীতি ও প্রথা মার্কিন শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় ভূমিকা পালন করে এবং মার্কিন সংবিধানের যুগোপযোগী সামঞ্জস্য বিধান তথা গতিশীলতা রক্ষায় সাহায্য করে। এদের মধ্যে সাংবিধানিক রীতিনীতি এবং প্রথা লিখিত নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মার্কিন সংবিধান প্রধানত লিখিত হলেও সাংবিধানিক রীতিনীতি এবং প্রথা শাসন পরিকল্পনার আঙ্গিক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা হ'ল রাজনৈতিক আচরণের এমন কতকগুলো বিধি যেগুলো বিধিবদ্ধ আইন বা বিচারকের রায় হিসেবে স্বীকৃত নয়, অথচ সাংবিধানিক বিধির পরিপূরক হিসেবে গড়ে উঠেছে। বস্তুত পৃথিবীর কোন সংবিধানই পুরোপুরি লিখিত বা পুরোপুরি অলিখিত হতে পারে না। বরং যে কোন সংবিধানকে, প্রধানত লিখিত বা প্রধানত অলিখিত বলেই অভিহিত করা ভাল। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানকে প্রধানত লিখিত বলে অভিহিত করা উচিত।

৩. **দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান**

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় বা অঙ্গরাজ্যের কোন সরকার যাতে নিজেদের সুবিধা এবং স্বার্থে সংবিধান সংশোধন করে অন্য সরকারের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে না পারে সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া আবশ্যক বলে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেছেন। কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান নমনীয় হলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সুযোগ পেলেই নিজ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে পারে এবং এর ফলে কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিতকে দুর্বল করতে পারে।

মার্কিন সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় বা অনমনীয়। শুধু দুষ্পরিবর্তনীয় নয়, চরম মাত্রায় দুষ্পরিবর্তনীয়। ব্রিটেনে যেমন সাধারণ বিল পাশের মত সংবিধানকে সংশোধন করা যায়, মার্কিন সংবিধানকে সেভাবে সংশোধন করা যায় না। মার্কিন সংবিধানকে সংশোধনের জন্য এক জটিল ও কষ্টকর পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। শাসনতন্ত্রের পাঁচ নম্বর ধারা অনুযায়ী সংবিধান সংশোধনের দুটি স্তরের কথা বলা হয়েছে। প্রথম সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন এবং দ্বিতীয় ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন। সংশোধনী প্রস্তাব

উত্থাপনের জন্য দু'টি বিকল্প রয়েছেঃ (১) মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অথবা (২) দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গরাজ্যের আইনসভার অনুরোধক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত কনভেনশনে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা যায়। উপরোক্ত যে কোন একটি পদ্ধতিতে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তা নীচের যে-কোন একটি পদ্ধতিতে অনুমোদিত হতে হবেঃ (১) অঙ্গ রাজ্যগুলোর আইন-সভার তিন-চতুর্থাংশ আইনসভায় বা (২) অঙ্গরাজ্যগুলো আহূত তিন-চতুর্থাংশ কনভেনশনে ঐ সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত (Ratified) হলে সংবিধান সংশোধন কার্যকর হতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মার্কিন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি খুবই অনমনীয় এবং জটিল। তাই বিগত ২০০ বছরে মাত্র ২৬ বার মার্কিন সংবিধানের সংশোধন করা হয়েছে। তবে প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে তত্ত্বগত দিক থেকে মার্কিন সংবিধান অনমনীয় হলেও বাস্তবে অন্যান্য উপায়ে মার্কিন সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজনকে মেটাবার সুযোগ আছে বা সুযোগ তৈরী করা হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, তত্ত্বগতভাবে মার্কিন সংবিধানকে যতটা দুষ্পরিবর্তনীয় বলে মনে করা হয় বাস্তবে ঘটনা তা নয়। আগেই বলা হয়েছে, তত্ত্বগতভাবে মার্কিন সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়, তাই বিগত দুশো বছরে আনুষ্ঠানিকভাবে মাত্র ২৬ বার মার্কিন সংবিধানের সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে বিচারবিভাগের ব্যাখ্যা, কংগ্রেস প্রণীত আইন, শাসনবিভাগের সিদ্ধান্ত, প্রথা, রীতিনীতির দ্বারা সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনকে মেটান হয়েছে। তাই মার্কিন সংবিধানের আনুষ্ঠানিক (formal) সংশোধন পদ্ধতি জটিল হলেও সেখানে সংবিধানের বাইরে অনেক উপায় আবিষ্কার করে সংশোধন পদ্ধতিকে সহজলভ্য করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, তত্ত্বগতভাবে মার্কিন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি খুবই দুষ্পরিবর্তনীয় হলেও বাস্তবে এবং কার্যক্ষেত্রে অতটা দুষ্পরিবর্তনীয় নয়।

৪. কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রে এবং রাজ্যে দুধরনের সরকারের অস্তিত্ব থাকে বলে উভয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি অন্যতম শর্ত। কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্যের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ব্যাপারে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। মার্কিন সংবিধান প্রণেতাদের কাছে ক্ষমতা কীভাবে বণ্টন করা হবে তা একটা সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। একদল চেয়েছিলেন জাতীয় সরকারের হাতে সর্বাধিক ক্ষমতা ন্যস্ত করে তাকে শক্তিশালী করতে। অন্যদিকে যে তেরটি রাজ্য মিলিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেছিল সেই রাজ্যগুলো রাজ্যের ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিল। ফলে, সংবিধান প্রণেতাদের খুব সতর্কতার সঙ্গে উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্য এমন এক ক্ষমতা বণ্টন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়—যা James Madison-এর ভাষায় *neither wholly national nor wholly federal.*

মার্কিন সংবিধানে কেন্দ্রের ক্ষমতাকে সংবিধানে নির্দিষ্ট করে দিয়ে অবশিষ্ট ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলোকে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১ (৮) নং ধারার কর ধার্য, তা সংগ্রহ, যুক্তরাষ্ট্রের নামে ঋণ গ্রহণ করা, বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা, মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনা, ডাক এবং ডাকপথ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও পরিচালন, যুদ্ধ ঘোষণা, সন্ধি স্থাপন, সৈন্যবাহিনী ও নৌ-বাহিনী নিয়ন্ত্রণ, বিদেশীদের নাগরিক অধিকার দান, নিম্ন পর্যায়ের ট্রাইবুনাল গঠন, মিলিশিয়া সংগঠিত করণ ইত্যাদি ক্ষমতা কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারের ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে।

সংবিধানের ১ (১০) নং ধারায় রাজ্যগুলো কর্তৃক বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপন, জোটবন্ধ হওয়া, মৈত্রীস্থাপন, রাষ্ট্রসমবায় গঠন করা, মুদ্রা প্রচলন করা, কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া জাহাজের শুল্ক ধার্য করা, শান্তির সময়ে সৈন্য বা যুদ্ধ জাহাজ রাখা ইত্যাদি কতকগুলো ক্ষমতা প্রয়োগের ওপরে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বলা যায়, যে ক্ষমতাগুলো কেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং যে ক্ষমতাগুলো রাজ্য কর্তৃক প্রয়োগের ওপরে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়নি, সেই সকল ক্ষমতা রাজ্যগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে। সংবিধানের ১০ম সংশোধনী আইনে (১৭৯১) এই কথা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, সংবিধান যে ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় (কেন্দ্রীয়) সরকারকে অর্পণ করেনি, এবং যে ক্ষমতা রাজ্যের নয় বলে ঘোষণা করেনি, —সেই সকল ক্ষমতা রাজ্য প্রয়োগ করতে পারবে—অর্থাৎ রাজ্যের হাতে ন্যস্ত থাকবে (The powers not delegated to the United States by the constitution, nor prohibited to it by the states, are reserved to the states respectively or to the people)।

সুতরাং বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করে অবশিষ্ট ক্ষমতা রাজ্যগুলোর হাতে ন্যস্ত রাখার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও ক্ষমতা বন্টনের এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে *McCulloch vs. Maryland* মামলায় অনুমিত ক্ষমতার (Theory of Implied powers) নীতি ব্যাখ্যা দ্বারা এবং মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও সংঘাতের ফলে কেন্দ্রের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে স্বতন্ত্র সরকার থাকে। এরূপ অবস্থায় এদের মধ্যে সাংবিধানিক প্রশ্নে বিরোধের ক্ষেত্রে তা মীমাংসার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত থাকা প্রয়োজন। সেই স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ আদালত সংবিধানের রক্ষক এবং চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে কাজ করবে। কেন্দ্র বা রাজ্য সংবিধান বিরোধী কোন আইন পাশ করলে বা প্রশাসনিক নির্দেশ জারী করলে তাকে বাতিল করা এবং সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার জন্য কোন নিরপেক্ষ আদালত না থাকলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে না। সেই আদালতকে শুধুমাত্র স্বাধীন এবং

নিরপেক্ষ হলেই চলবে না, সেই আদালতের নিরঙ্কুশ প্রাধান্যও প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই উদ্দেশ্যে স্বাধীন, নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে থেকে কাজ করে না—এটি হল স্বাধীন নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের যে ব্যাখ্যা দেন তাই চূড়ান্ত। এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন যে, আমরা একটা সংবিধানের অধীন, কিন্তু বিচারকরা যা বলেন তাই সংবিধান (We are under a constitution, but the constitution is what the judges say it is)। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের এই ভূমিকার জন্য অনেকে একে 'আইনসভার তৃতীয় কক্ষ' নামে অভিহিত করেন।

তত্ত্বগতভাবে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত হলেও অনেকে মনে করেন যে, সেখানকার সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোন বিচারকের পক্ষে শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং বিচারালয়ের নিরপেক্ষতার যে কথা বলা হয় তা আপেক্ষিক। প্রত্যেক দেশেই বিচারালয় সেখানকার ক্ষমতাসীন শ্রেণীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার ভূমিকা পালন করে—মার্কিন বিচারালয়ও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই মনে রাখতে হবে যে, মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে নয়।

৬. বিচার বিভাগের প্রাধান্য

বিচারবিভাগীয় প্রাধান্যকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় এবং অঙ্গরাজ্যের সরকারের মধ্যে বিভক্ত থাকে। উভয় সরকার যাতে নিজ নিজ ক্ষমতা ও এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া সংবিধান বিরোধী কোন আইন প্রণীত হ'লে বা শাসনবিভাগীয় নির্দেশ জারী হলে তা বাতিল করার সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই দায়িত্ব বিচারালয়ের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান বিরোধী কোন আইন গৃহীত হলে বা কোন নির্দেশ জারী করা হলে তার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করা যায়। সুপ্রীম কোর্টের বিবেচনায় ঐ আইন বা নির্দেশ সংবিধান বিরোধী বলে মনে হলে সুপ্রীম কোর্ট তাকে বাতিল করতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতাকে বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা (Power of Judicial Review) বলে। মার্কিন বিচারালয়কে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতার দ্বারা সজ্জিত করে বিচারবিভাগের প্রাধান্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

মার্কিন বিচারবিভাগের প্রাধান্য আর একটি দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে। মার্কিন সংবিধানে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন যাতে মান্য করা হয়

তা দেখার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং এই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

তাছাড়া, মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে কাজ করে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের যে ব্যাখ্যা দেন তাকেই সাংবিধানিক ব্যাখ্যা বলে মেনে নেওয়া হয়। এই জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন বিচারপতি হিউজ Charles Evans Hughes) বলেছেন যে, আমরা একটি সংবিধানের ছত্রছায়ায় বাস করি— কিন্তু সংবিধান হ'ল বিচারকেরা যা বলেন তাই। অর্থাৎ বিচারকদের ব্যাখ্যা অনুসারে সংবিধানের অর্থ নির্ধারিত হয়। এককথায় মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে কাজ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এইভাবে সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার চরম ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করে সেখানে বিচারবিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৭. শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য

বিচারালয়কে সৃষ্টি করে সংবিধান। তাই বিচারালয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য শাসনতন্ত্র বা সংবিধানের প্রাধান্য স্থাপন করা অপরিহার্য। তাই বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং সাফল্যের শর্ত হ'ল শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার উৎপত্তি, ক্ষমতা এবং ক্ষমতা বণ্টনের উৎস হ'ল সংবিধান। সুতরাং সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত না হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তিই থাকে না।

মার্কিন সংবিধানে খুব পরিষ্কারভাবে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্যকে স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানের ৬ (২) ধারায় বলা হয়েছে যে মার্কিন শাসনতন্ত্র দেশের সর্বোচ্চ আইনরূপে গণ্য হবে এবং প্রত্যেক রাজ্যে বিচারপতিরা এই আইনের দ্বারা চালিত হবেন (This constitution······shall be the supreme law of the land····· and the Judges in every state shall be bound thereby)। মার্কিন শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখা ও তাকে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। তাই মার্কিন সংবিধানের বা 'সর্বোচ্চ আইনের'' কিভাবে প্রয়োগ ঘটবে বা কি ভাবে তাকে ব্যাখ্যা করা হবে তা অনেকাংশে বিচারকদের ব্যাখ্যার ওপরে নির্ভরশীল। Robert C. Bone যথার্থই বলেছেন, *But how to apply and interpret "the supreme Law of the Land" has been a matter for almost continuous judicial interpretation and reinterpretation*।[১] সুতরাং অনেকের মতে, মার্কিন শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য সেখানকার বিচারালয়ের প্রাধান্যে পরিণত হয়েছে।

৮. দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভাকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত প্রভৃতি দেশের আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রে

---

১. *American Government*, Robert C. Bone, p. 27.

আইনসভার একটি কক্ষকে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক এবং অপর কক্ষকে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বমূলক করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই অধ্যাপক ফাইনার দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে অভিহিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষকে রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হিসাবে গঠন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার শর্ত হিসাবে মার্কিন আইনসভা কংগ্রেসকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট করা হয়েছে। ইহার প্রথম বা নিম্ন কক্ষের নাম প্রতিনিধিসভা (House of Representatives)। নিম্ন কক্ষ প্রতিনিধিসভা হল জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা। দেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে জনপ্রতিনিধিসভা গঠিত। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসের দ্বিতীয় বা উচ্চ কক্ষ সিনেট (Senate) হ'ল অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা। প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে দুজন করে প্রতিনিধি নিয়ে মোট একশত সদস্যের সমন্বয়ে সিনেট গঠিত হয়। মনে করা হয় যে, রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব-মূলক সংস্থা হিসাবে দ্বিতীয় কক্ষ রাজ্যগুলোর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। বাস্তবে এই ধারণা কতটা সত্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। প্রতিটি দেশেই জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রথম কক্ষই প্রধান এবং অধিকতর শক্তিশালী। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় কক্ষ সিনেট প্রথম কক্ষ থেকে অনেক বেশী ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে। কিন্তু রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হিসাবে সিনেট তার ক্ষমতা ও মর্যাদাকে কতটা কাজে লাগায় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যে কোন বুর্জোয়া দেশের আইনসভার মত মার্কিন সিনেটও সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া স্বার্থরক্ষায় কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে।

খ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

এবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলোকে আলোচনা করা হ'ল।

১. দ্বৈত নাগরিকতা

নাগরিকদের জন্য দ্বৈত নাগরিকতার স্বীকৃতি কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রহণ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও দ্বৈত নাগরিকতা স্বীকৃত। প্রতিটি নাগরিক একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং অন্যদিকে যে অঙ্গরাজ্যে সে বাস করে সেই অঙ্গরাজ্যের নাগরিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকতাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেবার কারণ হ'ল এই, যে উপনিবেশগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেছিল তাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং নিজ নিজ উপনিবেশ সম্পর্কে স্পর্শকাতরতা এত বেশী ছিল যে তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকতার সঙ্গে অঙ্গরাজ্যের নাগরিকতার স্বীকৃতি অপরিহার্য মনে করে-ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে দ্বৈত নাগরিকতা নেই, আমরা সকলেই ভারতের নাগরিক। দ্বৈত নাগরিকতা দ্বৈত আনুগত্যের সৃষ্টি করে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমকালীন প্রয়োজন থেকে দ্বৈত নাগরিকতাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং সেই সাংবিধানিক ব্যবস্থা এখনও চলছে।

১০. উচ্চকক্ষে রাজ্যগুলির সমান প্রতিনিধিত্ব

যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে জাতীয় আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের সমপ্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা প্রয়োজনীয় বলে মার্কিন সংবিধান প্রণেতাগণ মনে করেছিলেন। ভারত বা সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি মান্য করা হয়নি এবং অনেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে রাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্বকে অপরিহার্য মনে করেন না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেল অনুযায়ী আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে সমপ্রতিনিধিত্বের নীতিকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়। তাই সেখানে সাংবিধানিক ব্যবস্থায় জাতীয় আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ সিনেটে প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে দুজন করে প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা স্বীকৃতি পেয়েছে। ভারতে যেখানে দ্বিতীয় কক্ষ রাজ্যসভায় উত্তরপ্রদেশের প্রতিনিধি সংখ্যা ৩৪ জন, সেখানে আসামের প্রতিনিধি মাত্র ৭ জন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ নিউইয়র্ক রাজ্য এবং ক্ষুদ্র আলাস্কা রাজ্য সিনেটে দুজন করে প্রতিনিধি পাঠায়। সুতরাং বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে রাজ্যগুলোর সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকৃত। মার্কিন অসম আর্থনীতিক ব্যবস্থায় রাজ্যগুলোর সমপ্রতিনিধিত্ব রাজ্যগুলোর স্বার্থ কতটা রক্ষা করতে পারে সে বিষয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তা ছাড়া দলীয় ব্যবস্থায় প্রতিনিধিরা বাস্তবে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন না, প্রতিনিধিত্ব করেন রাজনৈতিক দলের—এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন।

১১. অঙ্গরাজ্যের স্বতন্ত্র সংবিধান

যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান ছাড়াও প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জন্য স্বতন্ত্র সংবিধান মার্কিন ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভারতে রাজ্যগুলোর কোন স্বতন্ত্র সংবিধান নেই, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রত্যেকের আলাদা সংবিধান আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল তেরটি উপনিবেশের ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দ্বারা। কিন্তু ঐ উপনিবেশগুলো নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীকারকে পুরোপুরি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল না। তাই জাতীয় সরকারের এক্তিয়ারের বাইরে অঙ্গ রাজ্যগুলোর যে ক্ষমতা রয়েছে তা পরিচালনার জন্য প্রতিটি রাজ্যের স্বতন্ত্র সংবিধানের দাবি স্বীকৃত হয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের আলাদা আলাদা লিখিত সংবিধান আছে। এবং তার অনেকগুলোই একাধিকবার সংশোধিত হয়েছে।

মার্কিন অঙ্গরাজ্যগুলোর সংবিধানে সরকারী কাঠামো ও সংগঠনের চেয়ে সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশী আলোকপাত করা হয়েছে। অঙ্গরাজ্যের সংবিধানগুলোর মধ্যে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত হলেও বেশীর ভাগই যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকে আকারে বড়। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে, নির্বাচিত রাজ্য প্রধান গভর্ণরের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। নেব্রাস্কা (Nebraska) ছাড়া প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের সংবিধানে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অঙ্গরাজ্যের

সংবিধানে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে প্রায় সব উচ্চতন প্রশাসনিক পদে নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যাহোক, প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের নিজ নিজ স্বতন্ত্র সংবিধানের অস্তিত্ব যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

১২. রাজ্য ও জাতীয় সরকারের পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা ও কর্তব্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল অঙ্গরাজ্য ও জাতীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পারস্পরিক বাধ্যবাধকতাকে সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা। এই ব্যাপারটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমে, অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রতি জাতীয় সরকারের কর্তব্যগুলো আলোচনা করা যেতে পারে।

জাতীয় সরকারের কর্তব্য

রাজ্যগুলোকে এবং তার ভূখণ্ডকে বহিরাক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ হিংসাত্মক ঘটনা থেকে রক্ষা করা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দায়িত্ব। তবে অভ্যন্তরীণ হিংসাত্মক ঘটনা থেকে রাজ্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকার এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ওপরে যুক্তভাবে ন্যস্ত। এ ব্যাপারে রাজ্য-সরকার ব্যর্থ হলে তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাহায্য চাইতে পারে। আবার কোন অঙ্গরাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সম্পত্তি এবং অধিকার রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার অঙ্গরাজ্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে। রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার আরকানাসে (Arkanas) এবং রাষ্ট্রপতি কেনেডি মিসিসিপিতে (Mississipi) সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর গভর্ণরদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন।

রাজ্যগুলোতে প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মার্কিন কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রপতি দৃষ্টি রাখবেন যাতে রাজ্যগুলিতে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে প্রজাতান্ত্রিক সরকার বলতে বাস্তবে কি বোঝায় সে সম্পর্কে সংবিধানে কিছু বলা হয়নি

কোন রাজ্যের অনুমতি না নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সেই রাজ্যের ভূখণ্ডের পরিবর্তন করতে পারবে না বা কোন রাজ্যকে একাধিক রাজ্যে বিভক্ত করতে পারবে না।

রাজ্যগুলো সম্পর্কে যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কতকগুলো দায়িত্ব আছে, ঠিক তেমনি রাজ্যগুলোরও কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাছে কতকগুলো কর্তব্য রয়েছে।

রাজ্যের বাধ্যবাধকতা

মার্কিন সংবিধানে বলা হয়েছে, যে ক্ষমতাগুলো যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়নি বা জনগণের জন্য সংরক্ষণ করা হয়নি, সেই সকল ক্ষমতা রাজ্যগুলোর হাতে ন্যস্ত। সংবিধান রাজ্যগুলোকে উপরোক্ত ক্ষমতা অর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যগুলোর ওপরে কতকগুলো বাধা-

নিষেধ ও কর্তব্য আরোপ করেছে। রাজ্যগুলো বিদেশে রপ্তানী বা বিদেশ থেকে আমদানীর ওপরে কোন শুল্ক ধার্য করতে পারবে না, যদি না তা রাজ্যের আইন প্রয়োগের জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। আইনের যথাবিহিত পদ্ধতিতে (Due Process of Law) ছাড়া কোন ব্যক্তির জীবন, সম্পত্তি এবং স্বাধীনতার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। রাজ্যগুলো নিজেদের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারবে, কিন্তু বহির্বাণিজ্যে তাদের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া কোন রাজ্য বিদেশের সঙ্গে কোন চুক্তি বা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না। কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া কোন রাজ্য শান্তির সময়ে সৈন্যবাহিনী রাখতে পারবে না বা কোন যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারবে না। রাজ্যগুলো মুদ্রা তৈরী করা এবং নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করা থেকে বিরত থাকবে

১৩. নতুন রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি

মার্কিন সংবিধানে বলা হয়েছে যে, রাজ্যের অনুমতি না নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কোন রাজ্যের ভূখণ্ড বা সীমানার পরিবর্তন করতে পারবে না বা কোন রাজ্যকে একাধিক রাজ্যে বিভক্ত করতে পারবে না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা মার্কিন সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে মার্কিন সংবিধানের চতুর্থ অনুচ্ছেদের (৩) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, নতুন কোন রাজ্যকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস অন্তর্ভুক্ত করতে পারে—কিন্তু কোন অঙ্গরাজ্যের সীমার মধ্যে নতুন কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত হতে পারবে না, অথবা সংশ্লিষ্ট আইনসভার অনুমতি ছাড়া দুই বা ততোধিক রাজ্যের বা রাজ্যগুলোর অংশ বিশেষের সংযুক্তির দ্বারা কোন রাজ্য গঠিত হতে পারবে না। বস্তুত, ফিলাডেলফিয়া সংবিধান গৃহীত হবার পরে বহুসংখ্যক রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির ফলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে রাজ্যগুলোর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তের থেকে পঞ্চাশে। সর্বশেষে ১৯৫৯ সালে আলাস্কা ও হাওয়াইকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য প্রথমে সেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে মার্কিন কংগ্রেসের কাছে আবেদন করতে হয়। কংগ্রেসে ঐ আবেদন গৃহীত হবার পরে রাষ্ট্রপতি অন্তর্ভুক্তি বিলে স্বাক্ষর করলে অন্তর্ভুক্তি কার্যকর হয়।

১৪. ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন

কিছুদিন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখা দিচ্ছে এবং এই প্রবণতা হ'ল ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের প্রবণতা। এই প্রবণতার জন্য ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া সংবিধানে গৃহীত ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান মার্কিন সাংবিধানিক ব্যবস্থার মৌল পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠছে এবং এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ একটা বৈশিষ্ট্য হিসাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

বিগত দুশো বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে—সেখানে একদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ ও তাকে শক্তিশালী করার জন্য ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে, আবার অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট থেকে মুক্তিলাভের জন্য ক্রমাগত আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে। যুদ্ধ, আর্থিক মন্দা এবং তা থেকে উৎসারিত সংকট, জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির জন্য শিল্প ও পরিবহনের উন্নতি, বিভিন্ন দেশে মার্কিন আগ্রাসী কার্যকলাপ, বিদেশী বাজার দখলের প্রয়াস, আণবিক অস্ত্রের প্রসার, আণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা ইত্যাদি কারণে সেখানে স্বাভাবিক গতিতে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে এবং ঘটছে। এর সঙ্গে বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে সাহায্য করেছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যগুলোর ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে ঐ সকল ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে—যাকে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন নামে অভিহিত করা হয়। তাই ১৭৮৭ সালে গৃহীত সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যে রূপরেখা নির্দিষ্ট ছিল, বাস্তবে আজ তা নেই। সেখানে ক্ষমতার ব্যাপক কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে এবং এটা ব্যবহারিক দিক থেকে সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দিয়েছে।

পাঁচ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি: এটি কি একটি আদর্শ যুক্তরাষ্ট্র? (Nature of American Federation : Is it an Ideal Federation ?)

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কাকে বলে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের মৌল এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনার পরে স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি মূল্যায়নের প্রশ্ন এসে পড়ে এবং আলোচনা করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি একটি আদর্শ যুক্তরাষ্ট্র?

পাশ্চাত্য সংবিধানে বিশেষজ্ঞরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় 'মডেলকে' আদর্শ যুক্তরাষ্ট্র বলে মনে করেন। ঐ 'মডেল' অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি গড়ে ওঠা প্রয়োজন বলে মনে করেন। মার্কিন সংবিধানের কোথাও 'যুক্তরাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহার করা না হ'লেও একথা ঠিক যে, মার্কিন ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন দেশের সাংবিধানিক সমস্যার সমাধান এবং প্রয়োজনীয়তার পটভূমিকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সকল দেশের সমস্যা এক নয়, বা সমস্যার প্রকৃতিও এক নয়। তাই একই উপায়ে বা একই মডেলকে অনুসরণ করে সকল দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে না।

যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৮৭ সালে সংবিধান প্রবর্তনের সময়ে সেখানকার বিভিন্ন সমস্যা, স্বার্থ, চাহিদার টানাপোড়েনের ফলশ্রুতি হল সংবিধানে গৃহীত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। সংবিধান প্রণেতারা ঐ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যে কাঠামো ও রূপরেখা গ্রহণ করেছিলেন তা সেই সময়ের পটভূমিকায় ছিল সর্বোত্তম, কারণ তাই ছিল

সংবিধান প্রণেতাদের কাছে মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য। সংবিধান প্রণয়নের সময়ে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যবসায়িক স্বার্থ, ছোট রাজ্যের সঙ্গে বৃহৎ রাজ্যের স্বার্থদ্বন্দ্ব, উত্তরের রাজ্যগুলোর সঙ্গে দক্ষিণের রাজ্যগুলোর সংঘাত, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের স্বপক্ষে ভার্জিনিয়া প্ল্যান (Virginia Plan), তাকে বিরোধিতা করে নিউজার্সি পরিকল্পনা (New Jersey Plan) ইত্যাদি শক্তিগুলোর টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা একটা সাংবিধানিক ব্যবস্থামাত্র—কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা মডেল কোন মহৎ আদর্শ বা চিরন্তন ন্যায়ের প্রতীক নয়।

বিগত দুশ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তথাকথিত যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। হুইয়ার (K. C. Wheare) তাঁর *Federal Government* গ্রন্থে এর কারণ হিসেবে বলেছেন যে, যুদ্ধ ও আর্থিক মন্দা, শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বৈপ্লবিক অগ্রগতি, বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ইত্যাদি কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণ ঘটেছে এবং এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, বর্তমান শতকে রাজনীতি ও অর্থনীতির জটিলতা, সরকারের সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সম্প্রসারণ, আণবিক শক্তির প্রসার, বুর্জোয়া অর্থনীতির সংকট ইত্যাদি উপাদান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাকে প্রসারিত (growth of federal powers) করেছে ও অন্যদিকে রাজ্যের ক্ষমতাকে সীমিত করেছে। পটার (Allen Potter) তাঁর *American Government and Politics* গ্রন্থে যুদ্ধ, আর্থিক সংকট, জনকল্যাণমূলক কাজের সম্প্রসারণ, কেন্দ্রের আর্থিক অনুদান, শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার, বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ইত্যাদির পটভূমিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রকৃতিগত পরিবর্তনকে তুলে ধরেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রকৃতিগত এই পরিবর্তনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল বা original মডেলের সঙ্গে এর বর্তমান ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাই এই পরিবর্তিত অবস্থাকে যুক্তিগ্রাহ্য এবং গ্রহণীয় করার জন্য মার্কিন পণ্ডিতেরা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি নতুন নামের সংযোজন করেছেন। এই নামটি হল 'সমবায়মূলক যুক্তরাষ্ট্র' (Co-operative Federation। সমবায়মূলক যুক্তরাষ্ট্র হ'ল এমন এক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যেখানে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পরস্পরের সহযোগী, কিন্তু আর্থিক ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলো কিছুটা পরিমাণে কেন্দ্রের ওপরে নির্ভরশীল থাকে এবং জাতীয় পুনর্গঠনে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য যৌথ প্রয়াস চালায়। দাবী করা হয় যে, সমবায়মূলক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করা হয়, কিন্তু এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে রাজ্যসরকারগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে না।

সমবায়মূলক যুক্তরাষ্ট্র

সুতরাং বলা যায়, ১৭৮৭ সালের মার্কিন সংবিধানে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছিল তাকে বিভিন্ন কারণে এবং যুগের প্রয়োজনের দাবীতে পরিবর্তন করতে হয়েছে এবং ঐ কারণ ও প্রয়োজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেল বলতে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বোঝান হোত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তা থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, এই পরিবর্তনের ফলে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মৌল বৈশিষ্ট্য ব্যাহত হয়েছে? বা এর ফলে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় বলে অভিহিত করা যায়? এই সব প্রশ্ন এড়িয়ে সেখানে ক্ষমতার অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণের বিষয়টিকে মার্কিন সংবিধান-বিশেষজ্ঞরা অবশ্যম্ভাবী এবং কাম্য বলে স্বীকার করে নিয়ে *Co-operative Federation* নামটি আমদানী করেছেন। তাঁরা মনে করেন, ১৭৮৭ সালের অবস্থার পটভূমিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল আদর্শ। আবার ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যে নতুন রূপ নিয়েছে সেই সমবায়মূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে আদর্শ যুক্তরাষ্ট্র।

সুতরাং বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আদর্শ মডেল বলে কিছু নেই এবং কোন একটি দেশের যুক্তরাষ্ট্রের মডেল অনুসারে বিচার করে অন্য দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা ঠিক নয়। কোন দেশের নিজস্ব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সব দেশের সমস্যার চরিত্র এক নয়, তাই একই পদ্ধতিতে সকল দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে উপায়ে তার যুক্তরাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধান করেছে, সোবিয়েত বিপ্লবের পরে সোবিয়েত ইউনিয়নে জাতিগত সমস্যার সমাধান তথা বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রয়াস একই উপায়ে সমাধান করতে পারেনি। তাই উভয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মৌলিক পার্থক্য আছে এবং থাকবে। আবার বুর্জোয়া সংকট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে পরিবর্তন এনেছে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে, কিন্তু সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। তাই কোন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে—কিন্তু তা আদর্শ কিনা ঐ বিশ্লেষণ অর্থহীন। কারণ, আদর্শ যুক্তরাষ্ট্র বিচারের কোন মানদণ্ড আছে কি?

অনেকে প্রশ্ন করেন, অত্যধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কি আর যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করা যায়? গ্রিফিথ্ (E. S. Griffith) তাঁর *The American System of Government* গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, *All in all, the question may properly be raised as to whether the United States is any longer properly classified as a federation.*[১]

---

১. p. 28

ছয় : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ (Centralization of Powers in U. S. A.)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার সময়ে আমরা বলেছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিক থেকে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মার্কিন সংবিধানে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে আলাদা করে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বিগত দুশো বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার সম্প্রসারণ হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ (Centralization) ঘটেছে। ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে মার্কিন সংবিধান গৃহীত হবার পর থেকে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও রাজ্যগুলোর স্বাধীকারের প্রশ্নটিও যথেষ্ট গুরুত্বলাভ করেছিল এবং বলা যায় যে এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আঠারো শতকের শেষদিকে এবং বিশেষ করে উনিশ শতকের প্রথম থেকেই কতকগুলো ঘটনাপরাম্পরা কেন্দ্রীকরণের সুযোগ এবং প্রবণতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

প্রথমেই এ ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৭৯৬ সালে *Ware vs. Hilton* মামলায় সুপ্রীম কোর্ট রাজ্যগুলোর আইন প্রণয়নের অধিকারকে চুক্তির (Treaties) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে বলে ঘোষণা করেন। এর আগে ১৭৯০ সালে সুপ্রীম কোর্ট রাজ্যের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের অধিকার মেনে নিয়ে রাজ্য আদালত থেকে আপীল মামলা *Clarke vs Harwood* গ্রহণ করে। ১৮১০ সালে সুপ্রীম কোর্ট *Fletcher vs. Peck* মামলায় চুক্তির বাধ্যবাধকতা মানার জন্য রাজ্যগুলোকে নির্দেশ দেয়। ১৮১৯ সালে *McCulloch vs. Maryland* মামলায় বিচারালয় অনুমিত ক্ষমতার তত্ত্বকে স্বীকার করে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষমতাকে প্রসারিত করে এবং ঘোষণা করে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার উৎস হল জনগণ। কেন্দ্রীয় আইন ও প্রশাসনকে কার্যকর করার জন্য সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হিসেবে স্বীকৃত নয় এমন সকল বিষয়েও কেন্দ্রীয় আইনসভা বা কংগ্রেসের আইন প্রণয়নের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই ভাবে মার্কিন সংবিধান গৃহীত হবার পর থেকেই সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীকরণের পথ সুগম হয়।

ক্ষমতাবৃদ্ধির ঐতিহাসিক পটভূমিকা :
১ বিচারালয়ের ভূমিকা

দ্বিতীয়ত, আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ জাতীয়তাবাদী শক্তিকে জয়ী করে এবং এর ফলে রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন এবং মার্কিন কংগ্রেস গৃহযুদ্ধের সময়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক, আর্থিক এবং অন্যান্য শক্তিকে বৃদ্ধি করতে সফল হন। গৃহযুদ্ধ থেমে যাবার পরেও কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা চলতে থাকে এবং তা স্বাভাবিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

২. গৃহযুদ্ধ

তৃতীয়ত, আর্থনীতিক ঘটনাবলী কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাকে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্নদিকে স্বাভাবিক গতিতে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে। আর্থিক ক্ষেত্রে মার্কিন কংগ্রেস এমন অনেক বিষয়ে আইন রচনা করে এবং মার্কিন প্রশাসন এমন অনেক শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করে, যে সকল বিষয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য নির্দিষ্ট নয়। কিন্তু মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের সম্প্রসারিত এক্তিয়ারকে সমর্থন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় যে কোন বিষয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারের বাইরে নয়। যেমন শিক্ষা, শ্রম, গৃহপ্রকল্প, পূর্ত ও রাস্তা নির্মাণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের অধীন ছিল। কিন্তু *United States vs. Butler* মামলায় বলা হল যে, সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়গুলোতেই কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ার সীমিত নয়, কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল বিষয়ে রাজ্যগুলোকে অনুদান (Grants-in-aid) দেন সে সকল বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রসারিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমনভাবে আর্থিক ব্যবস্থা বিন্যস্ত যে রাজ্যগুলো পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় অনুদান দেওয়া সেখানকার সাংবিধানিক বিধি। অথচ অনুদান দানের যুক্তিতে সেখানে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটানো হয়।

৩. আর্থিক বিষয় এবং প্রবণতা

উপরোক্ত ঐতিহাসিক পটভূমিকা মনে রেখে মার্কিন শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণের কারণগুলো পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন সংবিধান বিশেষজ্ঞ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। কে. সি হুইয়ার (K. C. Wheare) তাঁর *Federal Government* গ্রন্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার ব্যাপক কেন্দ্রীকরণের কারণগুলো বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে যুদ্ধ, আর্থিক মন্দা, মার্কিন বিচার-বিভাগীয় সিদ্ধান্ত, কেন্দ্রীয় অনুদানের ওপর রাজ্যগুলোর নির্ভরশীলতা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের সম্প্রসারণ, শিল্প ও প্রযুক্তি বিদ্যায় অগ্রগতি, পরিবহন ব্যবস্থায় বিপ্লব ইত্যাদি কারণগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ প্রায় প্রতিটি যুক্তরাষ্ট্রেই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়েছে। আবার অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও বাজারের সম্প্রসারণ, সামরিক প্রস্তুতি, আণবিক গবেষণা এবং আণবিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণকে অপরিহার্য করে তুলেছে।

অ্যালেন পটার (Allen M. Potter) তাঁর *American Government and Politics* গ্রন্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক ব্যবস্থার পটভূমিকায় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব তথা আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে। যুদ্ধ, যুদ্ধভীতি, যুদ্ধ পরিচালনা এবং তার জন্যে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি কারণগুলোর জন্যে কেন্দ্রীয়

১. রাজস্ব কেন্দ্রীকরণ

সরকারের ক্ষমতার সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে, ঐ কারণগুলো বর্তমান থাকা অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার এমন সকল ক্ষমতা নিজের এক্তিয়ারে নিয়ে আসে যা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নয়। যুদ্ধ থেমে গেলেও পরবর্তীকালে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিকে বা ঠাণ্ডা যুদ্ধ (Cold War)-কে মোকাবিলার নামে কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ ক্ষমতা থেকে যায় এবং তা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হিসেবে স্বীকৃত হয়।

প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণ

পটার দেখিয়েছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজস্ব ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেছেন যে, ১৯৩৩ সালের পর থেকে মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থায় যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে তাকে সরকারী ব্যয় নির্বাহের কারণ হিসেবে দেখান হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে প্রশাসনের ব্যয় বেড়েছে এবং সরকার ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে। প্রশাসনের এই শক্তি অর্জন প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে সাহায্য করেছে।

অনুদান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক ব্যবস্থা এমন ভাবে বিন্যস্ত যে রাজ্যগুলোকে সরকার পরিচালনার জন্যে কেন্দ্রীয় অনুদানের (Grants-in-aid) ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। অঙ্গরাজ্যের এই সীমিত আর্থিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নিজের এক্তিয়ারকে সম্প্রসারণ করেছে। রাজ্যগুলোকে যেসব বিষয়ে কেন্দ্রীয় আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় সে সকল ক্ষেত্রেই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ

রেল, খাদ্য এবং ঔষধ, ব্যাঙ্কিং এবং ট্রাস্টবিরোধী আইন ইত্যাদি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু হয়। কিন্তু তখন তা ছিল সরকারের সাময়িক ব্যবস্থা, কিন্তু পরবর্তী কালে তাই কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাভাবিক ক্ষমতায় পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তীকালে মূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারের ক্ষমতা ব্যাপ্ত হয় এবং এই ভাবে সেখানে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটে।

জনকল্যাণমূলক কাজ

বর্তমান যুগে, এমনকি বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোতেও জনকল্যাণমূলক সামাজিক কাজকর্মের প্রসার ঘটছে। জনকল্যাণমূলক কাজের এই প্রসার কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য ও ক্ষমতাকেও প্রসারিত করছে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের সম্প্রসারণ যাতে সমান ভাবে ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্যে মার্কিন প্রশাসন এবং আইনসভাকে এমন অনেক বিষয় পরিচালনা এবং আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে যা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হল ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ।

সর্বোপরি বলা প্রয়োজন যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী স্বার্থরক্ষার জন্যে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ অবশ্যম্ভাবী। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের কোনটিই সোচ্চার নয়। গণতান্ত্রিক দল (Democratic Party) যখন ক্ষমতাসীন থাকে তখন সাধারণতন্ত্রী দলের (Republican Party) পক্ষ থেকে দুর্বল কণ্ঠে অত্যধিক কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে বক্তব্য শোনা যায়। কিন্তু সেই সাধারণতন্ত্রী দল যখন ক্ষমতাসীন হয় তখন তারা কেন্দ্রীকরণের প্রবণতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বার্থে শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ, বিচারালয়, রাজনৈতিক দল, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী—প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কেন্দ্রীকরণের সাহায্য ও সহযোগিতা করছে। কারণ পুঁজিবাদী সংকট থেকে উদ্ধার এবং পুঁজিবাদের অস্তিত্বের জন্যে সেখানে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য।

পুঁজিবাদী স্বার্থ

৫

মার্কিন দলীয় ব্যবস্থা
American Party System

এক : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থা (Party System in the U. S. A.)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রবক্তাদের বক্তব্য সংক্ষেপে তুলে ধরা প্রয়োজন।

❖ গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থার উপযোগিতা

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় দলপ্রথাকে অনেকেই অপরিহার্য বলে মনে করেন। বলা হয়, একাধিক দলের অস্তিত্ব গণতন্ত্রকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলে। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল অনেক কাজ করে। প্রথমেই বলা যায় যে, একাধিক দল নাগরিকদের, বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় নাগরিকদের প্রতিনিধি নির্বাচনে সহায়তা করে। রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে দূরবর্তী শহরের মেয়র পদপ্রার্থীরা কোন না কোন দলের মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়ান। দ্বিতীয়ত, জাতীয় জীবনে যে মুখ্য বিষয়গুলি সাধারণ মানুষের চিত্ত আলোড়িত করে, সেই বিষয়গুলোর ওপর রাজনৈতিক দলগুলোই জনমত সংগঠিত করে। বস্তুতপক্ষে স্বাধীন জনমত গঠনে রাজনৈতিক দলগুলো খুবই সাহায্য করে। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দল থাকার জন্য সরকারের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। দলীয় আনুগত্য, দলীয় শৃংখলার জন্যই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা টিকে থাকে। চতুর্থত, বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, স্বার্থগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীর দাবীগুলি একসূত্রে গ্রথিত করে রাজনৈতিকদলগুলো সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ মঞ্চ বা Common Platform গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

পঞ্চমত, রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা ও ঐক্যের মনোভাব সৃষ্টি করে। মন্ত্রীসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় এই দলীয় প্রাধান্য সব সময়েই অনুভূত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থাও এখন সম্পূর্ণ দলনির্ভর হয়ে পড়েছে। আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে এখন দলই যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে।

রাজনৈতিকদল নির্বাচকদের বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে ওয়াকিবহাল রাখে। রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমেই নির্বাচকমণ্ডলী তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করেন। অতএব বলা যায়, স্বার্থের গ্রন্থীকরণ, জনমত গঠন, নেতা বা ক্ষমতার অধিকারীদের নির্বাচন, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার

এক বাতাবরণ সৃষ্টি করা. সরকারের কাজ ও নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা. সাধারণ মানুষের বিভিন্ন অংশের দাবীদাওয়াগুলোকে তুলে ধরাই হল রাজনৈতিক দলগুলোর মুখ্য কাজ। আরো বিশদভাবে বলা যায় যে. ক্ষমতা দখল করা এবং সেই ক্ষমতা ধরে রাখারই চেষ্টা হল রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান কাজ। তাই মুনরো বলেন যে. দলীয় ব্যবস্থার সাহায্য ছাড়া কোন দেশে বেশীদিন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হয় না এবং সম্ভব হবে না (No country has ever been able to maintain over considerable period of time any form of democratic government without the aid of political parties And it is safe to prophesy that no country ever will)।

খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলব্যবস্থার উদ্ভব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে. সংবিধান রচনার সময় থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলীয় ব্যবস্থায় সূত্রপাত শুরু হয়েছে। তখন থেকেই শহর, কাউণ্টি বা রাজ্যগুলোতে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে আঞ্চলিক কিছু চক্র বা উপদল সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। যখন নতুন সংবিধান রাজ্যগুলোর কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়, তখনই ফেডারেলিস্টরা রাজ্য আইনসভায় যাতে সংবিধানের সমর্থকগণ বেশি সংখ্যায় যান, তার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করেছিলেন। ফলে তাঁদের সঙ্গে সেইসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরোধ শুরু হয়. যাঁরা ছিলেন রাজ্যগুলোর অধিকতর ক্ষমতা বা স্বায়ত্তশাসনের প্রবক্তা। ফলে একদিকে ছিলেন জাতীয় ঐক্য তথা শক্তিশালী কেন্দ্রের সমর্থকগণ, আর অন্যদিকে ছিলেন তাঁরা যাঁদের মূল ধ্বনি ছিল রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা। তাই দেখা যায়, ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনেও প্রতিনিধিগণ দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে প্রায় দুভাগ হয়ে পড়েছিলেন। হ্যামিলটনের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি-গণ ছিলেন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থক। অপরদিকে সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রতিনিধিগণ জেফারসনের নেতৃত্বে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন এই দলীয় মনোভাব বা দলীয় আনুগত্যের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাই দলের ঊর্ধ্বে জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে তিনি হ্যামিলটন ও জেফারসন—দুজনকেই মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু ওয়াশিংটন যখন দ্বিতীয় বার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তখন জেফারসন পদত্যাগ করেন। জর্জ ওয়াশিংটন রাজনৈতিক দলের প্রভাব বৃদ্ধিতে আদৌ খুশি ছিলেন না। তিনি ভেবেছিলেন যে, অত্যধিক দলপ্রীতি বা দলীয় আনুগত্য জাতীয় ঐক্যকে ক্ষুন্ন করবে। তাই তিনি বিদায়ের প্রাক্কালে এক বাণীতে দেশবাসীকে অত্যধিক দলপ্রীতির কুফল সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, "এরকম একটা অভিমত আছে যে স্বাধীন দেশগুলোতে দলব্যবস্থা সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এবং জনসাধারণের স্বাধীনতার স্পৃহা বা মনোভাব

সজীব রাখতে সাহায্য করে। অবশ্য একটা সীমার ভিতর থাকলে একথা সম্ভবত সত্য, এবং বিশেষ করে রাজতন্ত্রের মত সরকারগুলোর ক্ষেত্রে নাগরিকদের স্বদেশপ্রেম দলীয় ব্যবস্থাকে খুব বেশি অনুগ্রহ না দেখিয়েও সহ্য করতে পারে। কিন্তু যে সব সরকার নির্বাচিত, যে সব সরকারের গণভিত্তি আছে, সেই সব সরকারের ক্ষেত্রে এই দলীয় মনোবৃত্তি বা দলীয় আনুগত্যকে প্রশ্রয় না দেওয়াই সঙ্গত। কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটন যদিও অত্যধিক দলীয় আনুগত্য বা দলীয় মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তিনি স্বয়ং ফেডারেলিস্ট দলের নেতা ও মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছেন। বলা যেতে পারে, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন বা তাদের জয় সুনিশ্চিত করার জন্য দলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওয়াশিংটন অবহিত ছিলেন। কিন্তু দলীয় রাজনীতির নামে উপদলীয় কোন্দল ও তিক্ততার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে এই উপদলীয় কোন্দল ও তার বিষময় পরিণতি সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু বলাবাহুল্য, প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের সতর্কবাণীতে কোন কাজ হয়নি। তাঁর অবসর গ্রহণের পরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে দলীয় কোন্দল, দলীয় আনুগত্য, দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগের মতই অব্যাহত থাকে।

ওয়াশিংটনের পরে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন জন অ্যাডামস্ (John Adams)। তিনি ফেডারেলিস্ট এবং ফেডারেলিস্টদের যাঁরা বিরোধী ছিলেন—তাঁদের মধ্যে ভাঙন রোধ করতে পারেননি। বরং বলা যায়, অ্যাডামস ও হ্যামিলটনের মধ্যে আলোচনা ও প্রকাশ্য বিতর্ক ফেডারেলিস্টদের দুর্বলতাকে আরও প্রকট করে তুলেছিল। ফলে, ১৮০০ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ফেডারেলিস্টদের পরাজিত করে জেফারসন নির্বাচিত হন। এই সময় জাতীয় জীবনে দুটি দলের আধিপত্য ও প্রাধান্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাঁরা কৃষি ও জমিজমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন, তারা মোটামুটি জেফারসনকে ভোট দিয়ে জয়ী করেছিলেন। আর যাঁরা শিল্প ও ব্যবসা, সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা মোটামুটি অ্যাডামসকে ভোট দিয়েছিলেন। অ্যাডামসের নেতৃত্বে ফেডারেলিস্টরা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন, জাতীয় ঐক্য, শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় সম্প্রসারণ ইত্যাদির পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদিকে জেফারসনের নেতৃত্বে ফেডারেলিস্টদের বিরোধীরা রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা অর্পণের পক্ষপাতী ছিলেন। তারা কৃষক, জমির মালিক এবং সীমান্তবাসী মানুষের কথা বেশি করে বলতেন। মানুষের অধিকারের ওপর এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর তারা বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন। কিন্তু ফেডারেলিস্টগণ অধিকার অপেক্ষা শাসন ও শৃঙ্খলার ওপর বেশি জোর দিতেন।

ফেডারেলিস্টদের ক্ষমতা ক্রমশই কমতে থাকে। ফলে ১৮২০ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তারা কোন প্রার্থীই দিলেন না। ফেডারেলিস্টদের বিরোধীরা যারা ইতিমধ্যে রিপাবলিকান নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তারাই কার্যত জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে

অপ্রতিহত প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। ধীরে ধীরে ফেডারেলিস্ট দলের অবলুপ্তি ঘটে। কিন্তু শীঘ্রই রিপাবলিকান দল, অর্থাৎ যারা ফেডারেলিস্টদের বিরোধী ছিলেন, তাদের মধ্যেও নানারকম চক্র ও উপদলের সৃষ্টি হল। রিপাবলিকান দলে তখন হেনরি ক্লে, উইলিয়াম ক্রফোর্ড, অ্যানড্রু জ্যাকসন, ডুইট ক্লিনটন, জন কুইনসি অ্যাডামস্, জন. সি. স্যালজান প্রমুখ নেতাদের নিজস্ব উপদল গড়ে উঠেছিল। দলীয় রাজনীতি অন্তত সেযুগে তিক্ত ব্যক্তিগত রাজনীতিতে পরিণত হয়েছিল। ১৮২৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোন প্রার্থী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট না পাওয়ায় প্রতিনিধি পরিষদ জন কুইনসি অ্যাডামস্কে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করে। পরে জন অ্যাডামস ও অ্যানড্রু জ্যাকসন (Andrew Jackson)—এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নেতাদের ঘিরে দুটি উপদল গড়ে ওঠে। অ্যানড্রু জ্যাকসনের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীকে বলা হত ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান, আর অ্যাডামসের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীকে বলা হত ন্যাশনাল রিপাবলিকানস—যাদের পরে হুইগ বলেও অভিহিত করা হত।

১৮২৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দুই দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। একদিকে ছিল ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকানস্ এবং অপরদিকে ন্যাশনাল রিপাবলিকানস্। নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান দলের নেতা (অন্য আর একজন) অ্যানড্রু জ্যাকসন বিজয়ী হন। অ্যানড্রু জ্যাকসন ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি অত্যন্ত শক্ত হাতে সরকার পরিচালন করতেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে শাসন করেননি, তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজত্ব করেছেন। তাঁর সময়ে দলব্যবস্থা আরও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। ১৮৩২ সালে জ্যাকসন রাষ্ট্রপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন। ১৮৩৬ সালের নির্বাচনেও একজন ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান প্রার্থী জয়ী হন। ১৮৩৪ সালে ন্যাশনালিস্ট রিপাবলিকানস্ এবং কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকানস্ একত্র হয়ে হুইগ পার্টি গঠন করে। ১৮৪০ সালের নির্বাচনে এই হুইগ দল জয় লাভ করে, কিন্তু নির্বাচনের কিছু পরেই রাষ্ট্রপতি মারা যান।

১৮৪৪ সালে যদিও হুইগ দল ডেমোক্রেটিক দলের কাছে নির্বাচনী সংগ্রামে পর্যুদস্ত হয়, কিন্তু ১৮৪৮ সালে হুইগ দল পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হয়। ১৮৫২ সাল থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত ডেমোক্রেটিক দল রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করে।

১৮৬০ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মূল বিষয় ছিল ক্রীতদাস প্রথা। ক্রীতদাস প্রথা বিলোপ করা ছিল নবগঠিত রিপাবলিকান দলের মূল নির্বাচনী ধ্বনি। এই রিপাবলিকান দল পুরোনো হুইগ দল ভেঙে গঠিত হয়েছিল। রিপাবলিকান দলের নেতা অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পর ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ করেন। প্রতিবাদে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করল। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন গভীর আদর্শবাদ ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে সক্ষম হলেন। ফলে রিপাবলিকান দলের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা দুইই

বৃদ্ধি পায়। এরপর একটানা চব্বিশ বছর রিপাবলিকান দল কেন্দ্রে শাসনক্ষমতা ভোগ করে। ১৮৮৪ সালে ডেমোক্রেটিক দল যদিও ক্ষমতায় ফিরে আসে, কিন্তু পরবর্তী দুটি সাধারণ নির্বাচনে দলের বিপর্যয় হয়। আবার ১৮৯২ সালে ডেমোক্রেটিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও, পরবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দল পরাভূত হয়। প্রায় ষোল বছর পরে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী উড্রো উইলসন জয়ী হন এবং তিনি পরপর দুবার রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কোন পক্ষ অবলম্বন না করার জন্য মার্কিন নাগরিকগণ বিপুল ভোটে উড্রো উইলসনকে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় পর ঘটনার চাপে উড্রো উইলসনকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের পর ভার্সাই শান্তি চুক্তি সম্পাদন এবং জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে প্রেসিডেণ্ট উইলসনের আন্তরিক সমর্থন ছিল। কিন্তু রিপাবলিকান দল বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জড়িয়ে পড়ায় ঘোরতর বিপক্ষে ছিল। রিপাবলিকান নেতাদের অভিমত ছিল এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে বেশি জড়িয়ে না পড়ে। ফলে মার্কিন সিনেট ভার্সাই শান্তিচুক্তি অনুমোদন করতে অস্বীকার করে এবং ১৯২০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দল পরাজিত হয়। ১৯২০ সালে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হার্ডিং নির্বাচনে বিজয়ী হন, কিন্তু পুরো চার বৎসরও তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করতে পারেননি। তাঁর অকালমৃত্যু হওয়ায় উপরাষ্ট্রপতি কেলভিন কুলিজ (১৯২৩-২৯) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এইভাবে রিপাবলিকান দল ক্ষমতা দখল করে থাকে।

কিন্তু ত্রিশের মন্দা ইতিমধ্যে মার্কিন অর্থনীতিতে তার করাল ছায়া বিস্তার করে। কিন্তু রিপাবলিকান দল পুরাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাভাবনার জন্য জাতির সামনে নতুন কোন পথের সন্ধান দিতে ব্যর্থ হয়। এই সময় ফ্র্যাংকলিন ডি রুজভেল্ট ডেমোক্রেটিক দলের নেতা হিসেবে জাতির সামনে এমন এক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের প্রস্তাব রাখলেন যার মূলকথা ছিল নিয়োগ বা চাকরি বাড়াতে হলে সরকারের ব্যয় বাড়াতে হবে। এইভাবে জনকল্যাণমূলক কাজে সরকারের ব্যয় বিপুলভাবে বৃদ্ধি করলেই অর্থনৈতিক মন্দা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। ঐ বক্তব্য জনগণের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করে এবং রুজভেল্ট রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। পর পর চারবার তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এক ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট হঠাৎ মারা যান এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন উপরাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান। ১৯৪৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী হিসাবের ট্রুম্যান জয়ী হন। এইভাবে টানা কুড়ি বছর (১৯৩২-৫২ সাল) ডেমোক্রেটিক দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করেন। ১৯৫২ সালের পর ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আট বছর রিপাবলিকান দলের নেতা ইউরোপে মিত্রশক্তির

ভূতপূর্ব (মার্কিন) সৈন্যাধ্যক্ষ ডুইট ডি. আইসেনহাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী তরুণ রোমান ক্যাথলিক প্রার্থী জন কেনেডি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। মানবাধিকার, বিশ্বশান্তি ইত্যাদির কথা বলে তিনি ডেমোক্রেটিক দলকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তোলেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে উপরাষ্ট্রপতি জনসন রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভাব গ্রহণ করেন। ডেমোক্রেটিক দল এইভাবে একটানা আট বছর শাসন করার পর নিকসনের নেতৃত্বে রিপাবলিকান দল পুনরায় ক্ষমতার ফিরে আসে (১৯৬৮-৭৬)। পরে চার বছরের জন্য জিমি কার্টারের নেতৃত্বে ডেমোক্রেটিক দল পুনরায় ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু ১৯৮০ সালে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী রেগন রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হন এবং তিনি এখন দ্বিতীয় বারের জন্য রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

গ. মার্কিন দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিন থেকেই দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন তৃতীয় রাজনৈতিক দল নেই। তৃতীয় কেন, আরো অনেক বেশি রাজনৈতিক দল হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে। কিন্তু রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে মূলত দুটি দলই অভিনয় করে, দুটি দলই জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে মূল ভূমিকা পালন করে। এতাবৎ কাল এই দুটি দলের বাইরে অন্য কোন দলের প্রার্থী রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয় লাভ করতে পারেননি। অত্যন্ত সফল রাষ্ট্রপতি থিয়োডোর রুজভেল্ট দুবার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পর তৃতীয়বার প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর দল তাঁকে মনোনয়ন দিতে অস্বীকার করে; তখন তিনি নতুন একটি দল গঠন করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তৃতীয় দলের প্রার্থী হিসাবে জনসাধারণ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। কখনও নতুন নতুন দাবী. বা ভাবনা চিন্তাকে কেন্দ্র করে একটি নতুন রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় যে দুটি মূল দল ঐ তৃতীয় দলের আদর্শ, কর্মসূচী বা রণধ্বনি গ্রহণ করেছে। তাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এখন পর্যন্ত এই দুটি প্রধান দলের প্রার্থীরা ছাড়া অন্য কেউ সফল হতে পারেননি। এখন দুটি প্রধান দলের একটি রিপাবলিকান দল এবং অন্যটি ডেমোক্রেটিক দল নামে অভিহিত।

রিপাবলিকান দল হ্যামিলটনের নেতৃত্বে পরিচালিত ফেডারেলিস্ট পার্টির উত্তরসূরী। প্রথমে ফেডারেলিস্ট, পরে ন্যাশনাল রিপাবলিকান, তারপরে হুইগ এবং সবশেষে রিপাবলিকান নামে পরিচিত—এই দলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশের সময় থেকেই সাধারণ মানুষের এক বিরাট অংশের আনুগত্য লাভ করে আসছে। অন্য দিকে, জেফারসনের নেতৃত্বে গঠিত দলটি প্রথমে অ্যান্টি-ফেডারেলিস্ট নামে পরিচিত ছিল। পরে রিপাবলিকান, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান, এবং অবশেষে ডেমোক্রেটিক নামে এই দলটি পরিচিত হয়। রিপাবলিকান পার্টির মতো ডেমোক্রেটিক দলও অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা,

উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ক্লিনটন রসিটার (Clinton Rossiter) মনে করেন যে, "গণতন্ত্র ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই, রাজনীতি ব্যতীত গণতন্ত্র নেই, রাজনৈতিক দল ছাড়া রাজনীতি নেই, এবং আপস ও মধ্যপন্থা ছাড়া কোন রাজনৈতিক দল নেই" (No America without democracy, no democracy without politics, no politics without parties, no parties without compromise and moderation)।

ঘ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রধান দলসমূহ

দুটি প্রধান দল ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরো কিছু অপ্রধান রাজনৈতিক দল ছিল এবং আছে। উদাহরণ হিসেবে সোস্যালিস্ট দল, কমিউনিস্ট দল, ফার্মারস দলের নাম উল্লেখ করা যায়। অতীতে মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করণের দাবীতে প্রহিবিশান দল (Prohibition Party) নামে একটি রাজনৈতিক দল খুবই সক্রিয় ছিল। এই প্রহিবিশান দল ১৮৭২ সালে প্রথম সম্মেলন আহ্বান করে। এই দলের মূল বক্তব্য ছিল মদ উৎপাদন, বিক্রয় বা রপ্তানি সম্পূর্ণ বন্ধ করা। ১৯২০ সাল পর্যন্ত এই দলটি মদ উৎপাদন ও বিক্রয়ের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়নের দাবী জানায়। তারপরে সংবিধানের অষ্টাদশ সংশোধনী যাতে গৃহীত ও কার্যকর হয় তার জন্য আরো বারো বছর এই দল আন্দোলন পরিচালনা করে। ১৯৩৩ সালে অষ্টাদশ সংবিধান সংশোধনীতে কাম্য পরিবর্তন ঘটলে এই দলের অবলুপ্তি ঘটে।

বর্তমান শতকের প্রথম দিকে দুটো সংগঠন একত্রিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক দল গঠিত হয়। এই দুটি সংগঠন ছিল সোস্যালিস্ট লেবার পার্টি এবং সোস্যালিস্ট ডেমোক্রেটিক পার্টি। শহরাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক দলের কিছু সমর্থক দেখা যায়। এই দল মোটামুটি সুশৃঙ্খল এবং এদের একটি সুনির্দিষ্ট কার্যসূচী আছে। রেলপথ জাতীয়করণ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং খনি, বনভূমি, বৃহৎ কলকারখানার ওপর সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা, বেকারের জন্য কাজ এবং সামাজিক নিরাপত্তা আরো বেশী করে সুনিশ্চিত করা এদের দাবীর অন্তর্ভুক্ত। সমাজতান্ত্রিক দলের রাজনৈতিক দাবী হল সিনেটের অবলুপ্তি, বিচারকদের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা হ্রাস বা বিলোপ, নির্বাচনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, গণভোট ও গণউদ্যোগের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

কমিউনিস্ট পার্টি মূলতঃ বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিক শ্রেণীর দল। এই দল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থক, যারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে উদগ্রীব, তারা বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে এই দলকে সবসময় জাতীয়তাবিরোধী, হিংসাত্মক পদ্ধতির অনুরাগী বলে চিত্রিত করতে চেষ্টা করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটিশ শ্রমিক দলের মত কোন গণতান্ত্রিক সমাজবাদী পার্টি নেই। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য যে সব ট্রেড ইউনিয়ন আছে, তারা প্রধানত শ্রমিকদের স্বার্থেই কাজ করে। কিন্তু ভোটের সময় শ্রমিকরা মূলত দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের ভোট দেয়। রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব, কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ, সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের দরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল জীবনযাত্রা এবং শ্রমিক শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র অংশের উন্নত জীবন ধারণের মান সেখানে শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা বা তীক্ষ্ণতা অনেক হ্রাস করেছে। ফলে বুদ্ধিজীবী, কৃষ্ণাঙ্গ বা শ্রমিক শ্রেণীর একাংশের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব থাকলেও জনজীবনে কমিউনিস্টদের প্রভাব খুবই কম। তাছাড়া ইদানীং কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে ব্ল্যাক মুসলিম পার্টি খুব প্রভাব বিস্তার করেছে। এদের দাবী মুসলিম কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য একটি সমান স্বতন্ত্র রাজ্যগঠন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

যেহেতু অপ্রধান দলগুলির নেতৃত্ব অনেক সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে থাকে, আর যেহেতু এই মধ্যবিত্তদের মধ্যে দোকানদার, ক্ষুদ্রচাষী, শিল্পশ্রমিক বা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারীরাও পড়ে, ফলে এই সব দলের নেতৃত্ব অনেক সময়ই সুসংহত হয় না। অভ্যন্তরীণ কলহ ও দলাদলির ফলে অনেক সময় দল দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আবার দেখা যায়, কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার পর এই সব ছোট ছোট দলের নেতৃত্ব বৃহৎ দুটি দলের সঙ্গে আপস রফা করে। দীর্ঘস্থায়ী, একটানা আন্দোলন পরিচালনা করতে তারা আর কোন উৎসাহ বোধ করে না। ফলে এই অপ্রধান দলগুলি কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আবার অনেক সময় দেখা যায়, এই সব তৃতীয় দলের নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী বা তাদের দলের সঙ্গে সমঝোতা করে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, ১৮৯৬ সালে পপুলিস্ট পার্টি (Populist Party) নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী ব্রায়ানকে (Bryan) সমর্থন করে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণীর কোন বৈপ্লবিক রাজনৈতিক মতাদর্শ না থাকায় তারা বৃহৎ বুর্জোয়াদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে অক্ষম হয়েছে। শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা অর্থনীতিবাদের পাঁকে নিমজ্জিত। তাঁরা দুটি প্রধান দলের সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধতে ব্যস্ত। শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুপস্থিত। আর এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নিজেদের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

৬. প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল হল ডেমোক্রেটিক দল (Democratic Party) এবং রিপাবলিকান দল (Republican Party)। এই দল দুটির কর্মসূচী আলোচনা করা প্রয়োজন।

দলীয় কর্মসূচী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রধান দলই স্থিতাবস্থার সমর্থক, দুটি দলই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, সাংবিধানিক রাজনীতি, আইনের শাসন, পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কমিউনিজম প্রতিরোধে বিশ্বাস করে। লর্ড ব্রাইস সঠিক কারণেই মন্তব্য করেছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি দল যেন দুটি বোতল যাতে দুরকম লেবেল লাগানো আছে, কিন্তু কোন বোতলেই কিছু থাকে না। দুটি দলের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দর্শনের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তাই কোন একজন মার্কিন নাগরিক কেন একটি বিশেষ দলের প্রতি অনুগত, তার সঠিক কারণ জোর দিয়ে বলা যায় না। ফাইনারের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের একটি মাত্র দলের প্রতিই আনুগত্য আছে, যে দলটির নাম হল 'রিপাবলিকান-ডেমোক্রেটিক' দল। এই দলটি আবার নির্বাচন, ক্ষমতা ইত্যাদি দখলের জন্য সমান দুটি উপদলে বিভক্ত। এই উপদল দুটির একটির নাম রিপাবলিকান এবং অন্যটির নাম ডেমোক্রেটিক। বস্তুতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রধান দলের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য বলে কিছু নেই। মতাদর্শগত বিশুদ্ধতা, কঠোর শৃঙ্খলা বা কোন বিশেষ নেতার প্রতি আনুগত্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান রাজনৈতিক দল দুটিতে দেখা যায় না। দুটি দলেই দেখা যায় অসংখ্য স্বার্থ-গোষ্ঠী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা সক্রিয়। দুই দলই ভারতের কংগ্রেস বা কুম্ভমেলার মত। চরম বামপন্থী থেকে চরম দক্ষিণপন্থী সবরকম মত ও পথের নাগরিকগণ দুটি দলেরই ভোটার।

অবশ্য প্রথমদিকে বর্তমান রিপাবলিকান পার্টির পূর্বসূরী ফেডারেলিস্ট পার্টি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার, জাতীয় ঐক্য, শিল্প, কলকারখানার প্রসার, সংরক্ষণ নীতি ইত্যাদিতে বিশ্বাস ক'রত। এই ফেডারেলিস্ট দলের নেতা ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন, অ্যাডামস, হ্যামিলটন প্রভৃতি। অপরদিকে জেফারসনের নেতৃত্বে গঠিত অ্যান্টি ফেডারেলিস্ট দল রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার দাবীতে সোচ্চার ছিল। ব্যক্তি-মানুষের অধিকার বা স্বাধীনতা সম্পর্কেও এই দল অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। ফেডারেলিস্টরা শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতির সমর্থক ছিলেন, যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি দ্রুত গড়ে ওঠে। অ্যান্টি-ফেডারেলিস্টরা ছিলেন অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থক, তারা সংরক্ষণনীতির বিরোধী ছিলেন। প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতি শ্রেণী, কলকারখানার মালিক, ব্যাঙ্কের মালিক, শহরাঞ্চলের মানুষেরা ছিলেন ফেডারেলিস্ট দলের সমর্থক। অন্যদিকে জমিজমার মালিক, বাগিচার মালিক, দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা ছিলেন অ্যান্টি-ফেডারেলিস্ট দলের সমর্থক।

পরবর্তীকালে ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ নিয়ে দুটি দলের মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। রিপাবলিকান দল যেহেতু শিল্পপতি পুঁজির মালিকদের পার্টি ছিল, তাই এই দল ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ দাবী করেছিল। অন্যদিকে ডেমোক্রেটিক দল ছিল

দক্ষিণাঞ্চলের বড় বড় জমির মালিক ও বাগিচা মালিকদের দল। তাই এই দল ক্রীতদাস প্রথা অবসানের বিরোধী ছিল। এই ক্রীতদাস প্রথাকে উপলক্ষ করে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত এই গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয় এবং দেশ ঐক্যবদ্ধ থাকে। কিন্তু এর ফলে রিপাবলিকান দলের মর্যাদা ও প্রভাব অনেক বৃদ্ধি পায় এবং বিশের শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত রিপাবলিকান দলের এই প্রাধান্য অব্যাহত ছিল।

বিশের শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন ঘটেছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রসার, লাতিন আমেরিকার দেশগুলির বাজার দখল করার ফলে এখন জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পেরই প্রাধান্য। এখন আর শিল্প বনাম কৃষি বিতর্কের বিশেষ কিছু নেই। আগে দুটি প্রধান দলের মধ্যে বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করবে, কি করবে না—এই নিয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ ছিল। কিন্তু এখন দুটি দলই চায় যে, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করুক, দুটি দলই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমর্থক, সমাজতন্ত্র ও জোটনিরপেক্ষতার বিরোধী। উনিশ শতকে যদি ক্রীতদাস প্রথা বিলোপের ক্ষেত্রে রিপাবলিকান দল একটি প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে, তা হলে বিশের শতকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে গৃহীত নববিধানের কর্মসূচী (New Deal Programmes) ডেমোক্রেটিক দলকে সাধারণ মানুষের অনেক কাছে নিয়ে এসেছে। রুজভেল্ট ও কেনেডির নেতৃত্বে ডেমোক্রেটিক দল নিজেদের গণভিত্তিকে অনেক প্রসারিত করতে পেরেছে।

কিন্তু একথাও ঠিক যে, এখনো রিপাবলিকান দলের তুলনায় ডেমোক্রেটিক দলের জনপ্রিয়তা দক্ষিণাঞ্চলে বেশি। এখনো কৃষকরা, জমির মালিকরা ডেমোক্রেটিক দলের প্রতি বেশি অনুরক্ত। শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষ্ণাঙ্গ জনসমাজ মোটামুটি ডেমোক্রেটিক দলের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে উচ্চবিত্ত শ্রেণী, রক্ষণশীল ও অভিজাত সম্প্রদায় রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক। আর যদিও আদর্শ বা কর্মসূচীর দিক দিয়ে বিচার করলে উভয় দলই স্থিতাবস্থার সমর্থক, কিন্তু তুলনায় রিপাবলিকান পার্টি অধিকতর রক্ষণশীল এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অপেক্ষাকৃত আক্রমণাত্মক ও আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাস করে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে উভয় দলই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে বিশ্বাস করে। উভয় দলই চায় যে, পারমাণবিক অস্ত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখুক। উভয় দলই সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধী এবং উভয় দলই ইস্রায়েল ও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে একই নীতিতে বিশ্বাস করে। উভয় দলই ন্যাটো, সিয়েটো, সেনটো প্রভৃতি সামরিক চুক্তির সমর্থক। কিন্তু তবুও দেখা যায়, রিপাবলিকান দলের তুলনায় ডেমোক্রেটিক দল অনেক কম আগ্রাসী। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ডেমোক্রেটিক পার্টি আরো আলাপ-আলোচনা, আরো সহিষ্ণুতা এবং আরো

বেশি মানবাধিকারের নীতিতে বিশ্বাস করে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উভয় দলই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দৃঢ় সমর্থক এবং সমাজতন্ত্র কিংবা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু ডেমোক্রেটিক দল রিপাবলিকান দলের তুলনায় আরো বেশি সামাজিক নিরাপত্তার দাবী জানায়। উভয় দলই সাংবিধানিক শাসন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অবাধ নির্বাচন, ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। উড্রো উইলসনের মতে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক দলের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, রিপাবলিকান দলের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর ডেমোক্রেটিক দলে তারা সবসময়েই সংখ্যালঘিষ্ঠ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মতে দলীয় আনুগত্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক সময় পারিবারিক আনুগত্যের ওপর নির্ভর করে। সাধারণত নাগরিকরা তাদের পিতা বা পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কোন একটি পার্টিকে নিজের বলে মনে করেন এবং সেই অনুযায়ী ভোট দেন। অর্থাৎ বিচার বুদ্ধি বা বিশ্লেষণ নয়, কোন রকম আদর্শও নয়, কেবল মাত্র পিতা বা পিতামহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অধিকাংশ মার্কিন নাগরিক ভোট দিয়ে থাকেন বা দল বেছে নেন। সাধারণত দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল যেহেতু পালাক্রমে ক্ষমতায় আসে, ফলে কালক্রমে তাদের মধ্যে আদর্শগত বা কর্মসূচীগত কোন তীব্র মতপার্থক্য দেখা যায় না। যেহেতু দুটি দলই ভোটের মাধ্যমে বার বার ক্ষমতায় আসে, ফলে তারা নির্বাচন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে কখনো যায় না। আর যেহেতু ভোটের মাধ্যমে তারা ক্ষমতা দখল করে, ফলে বিভিন্ন শ্রেণী বা স্বার্থগোষ্ঠীর চাপের কাছে কিছুটা নতি স্বীকার করে, স্থিতাবস্থা বজায় রেখে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার রক্ষক হিসেবে দুটি দলই কাজ করে। ক্লিনটন রসিটারের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এর "স্বৈরতান্ত্রিক দ্বিদল ব্যবস্থা"—*The most momentious fact about the American politics is that we live under a persistent, obdurate, one might almost say tyrannical, two-party system"*.

চ. দলীয় সংগঠন

সাংগঠনিক শিথিলতা মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। একটি রাজনৈতিক দলকে ভালভাবে কাজ করতে হলে তার সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বা ঐক্যের প্রয়োজন হয়। ক্ষমতা দখল করতে হলে কিংবা ক্ষমতা বজায় রাখতে গেলে দলীয় শৃঙ্খলা বা দলীয় ঐক্যের অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলেরই সাংগঠনিক নিয়ম শৃঙ্খলা বা বাঁধুনি অত্যন্ত শিথিল। সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভাকে দলীয় ঐক্য বজায় রাখতে হয়। কেননা মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ঐক্য বা শৃঙ্খলার ওপর। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় যেহেতু রাষ্ট্রপতি বা তাঁর মন্ত্রিসভা আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল

থাকে না, ফলে দলের লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা, মতাদর্শগত ঐক্য বা নেতৃত্বের প্রতি অবিচলিত আনুগত্যের কোন প্রয়োজন হয় না।

তাই অনেক সময় দেখা যায়, রিপাবলিকান দলের প্রতি অনুগত নাগরিকগণ ডেমোক্রেটিক দলকে ভোট দিচ্ছেন। আইনসভায় অর্থাৎ কংগ্রেসে অনেক সময় ডেমোক্রেটিক দলের সদস্যরা রিপাবলিকান দলের সদস্যদের সঙ্গে একত্রে সরকারী বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেয় কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতির নিজের দলের সদস্যরাই অনেক সময় রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেন। আরো দেখা যায়, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্যকমিটি বা রাজ্য নেতৃত্বের ওপর খুব বেশি খবরদারি করেন না। আবার রাজ্য নেতৃত্ব জেলা নেতৃত্বের ওপর, কিংবা শহর বা কাউন্টি কমিটির ওপর খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন না বা নির্দেশ পাঠান না। অগ এবং রে Ogg and Ray) এই অভিমত প্রকাশ করেছেন, *There is no flow of authority either up or down the scale no genuine integration.* অর্থাৎ মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার ওপর থেকে নীচে কিংবা নীচ থেকে ওপরে কোন কর্তৃত্বের ধারা নেই, কোন যথার্থ সংহতি নেই।

জাতীয় কমিটি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলীয় ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে আছে National Committee বা জাতীয় কমিটি। ডেমোক্রেটিক দলের জাতীয় কমিটি প্রত্যেক রাজ্য থেকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতীয় কমিটির সদস্যগণ দলের জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাজ্য প্রতিনিধিদের দ্বারা মনোনীত হন। কিন্তু কোন কোন রাজ্যে এই প্রতিনিধিগণ হয় রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক সরাসরি নির্বাচিত হন কিংবা কোন রাজ্যকমিটি বা সরাসরি প্রাইমারির দ্বারা নির্বাচিত হন। বিশেষ করে ডেমোক্রেটিক দলের জাতীয় কমিটির সদস্যগণ বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্নভাবে নির্বাচিত হন। যেহেতু প্রত্যেক রাজ্য থেকে জাতীয় কমিটিতে দুজন করে সদস্য নির্বাচিত হন, ফলে জাতীয় কমিটিতে উভয় দলের প্রায় একশ জন করে সদস্য থাকেন।

যদিও জাতীয় কমিটির তত্ত্বগতভাবে অনেক ক্ষমতা আছে, কিন্তু কার্যত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করতেই জাতীয় কমিটির সব সময় ব্যয় হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ঠিক ছমাস আগে থেকে জাতীয় কমিটির কাজ খুবই বেড়ে যায়। প্রথমত, জাতীয় কমিটি স্থির করে কখন এবং কোথায় রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী মনোনয়নের জন্য দলের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে দলের জাতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্বাচনের আহ্বান জানান হয়। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনী অভিযান কিভাবে পরিচালিত হবে তা ঠিক করা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন সাবকমিটির সদস্যদের নির্বাচন করা জাতীয় কমিটির অন্যতম প্রধান কাজ নির্বাচন উপলক্ষে প্রচারাভিযান পরিচালনা করা, অর্থ সংগ্রহ করা, বক্তা ঠিক করা, সভা সমিতির আয়োজন করা, নির্বাচনের দিন ভোটারদের নিয়ে আসা—এই সব কিছুই জাতীয় কমিটির দায়িত্বে

অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর থেকে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে পর্যন্ত জাতীয় কমিটির আর বিশেষ কোন কাজ থাকে না।

সাধারণত জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রচারাভিযান সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনার জন্য একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বেশির ভাগ সময়েই বাস্তবে রাষ্ট্রপতির পদের জন্য দলের প্রার্থী এই চেয়ারম্যানকে মনোনীত করেন, যদিও সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ অনুষ্ঠানিক ভাবে চেয়ারম্যানকে নির্বাচন করেন। দলের জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে এই চেয়ারম্যান সমগ্র নির্বাচন-অভিযান পরিচালনা করেন।

তিনিই স্থির করেন কিভাবে নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহ করা হবে, কিভাবে পার্টির পক্ষে দুর্বল এলাকার শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করা হবে, কিভাবে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে মুখ্য বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে, আর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর দুর্বল স্থানে কিভাবে আঘাত করা হবে। স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যানকে খুবই তীক্ষ্নবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজনীতিবিদ্ হতে হয়। যদি রাষ্ট্রপতি পদে দলীয় প্রার্থী জয়ী হন, তাহলে চেয়ারম্যান সাধারণত তাঁর কাজের সাফল্যের জন্য পুরস্কার হিসেবে প্রশাসনের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। রাষ্ট্রপতি যখন চাকরি ও অন্যান্য অনুগ্রহ বিতরণ করেন, তখন চেয়ারম্যান অনেক সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেন।

জাতীয় কমিটির আবার কয়েকটি সাবকমিটি বা উপসমিতি আছে। এই সাবকমিটি-গুলির মধ্যে এক্সিকিউটিভ কমিটি বা কার্যনির্বাহক কমিটি প্রধান। তাছাড়া অর্থ-সংক্রান্ত সাবকমিটি (Financial Sub-committee), প্রচার সাবকমিটি (Publicity Sub-committee), স্পীকারের দপ্তর (Speaker's Bureau), সংগঠন কমিটি (Organization Committee) প্রভৃতি সাবকমিটি আছে। এই সব সাবকমিটি অনেক কাজ করে এবং এদের কাজের তত্ত্বাবধান করেন চেয়ারম্যান। তাছাড়া জাতীয় কমিটির একজন সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষ আছেন। সেক্রেটারি বা সম্পাদক পার্টির অফিস সংক্রান্ত কাজকর্মের তদারকি করেন। আর কোষাধ্যক্ষ পার্টির তহবিলের ভারপ্রাপ্ত, তাঁর প্রধান কাজ হল কোটি কোটি ডলার সংগ্রহ করা যাতে পার্টি নির্বাচনী সংগ্রামে জয় লাভ করে।

কংগ্রেসের নির্বাচনী অভিযান কমিটি

জাতীয় কমিটি কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেসের নির্বাচনে দলীয় সদস্যরা যাতে দল জয় লাভ করে সেজন্য উভয় দলের কংগ্রেসের নির্বাচনী অভিযান সংক্রান্ত একটি করে কমিটি আছে। অবশ্য অর্থের জন্য এই কমিটি জাতীয় কমিটির ওপর নির্ভরশীল। এই কমিটি নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিচার বিশ্লেষণ করে এবং দলীয় প্রার্থীদের জয়লাভ যাতে সহজেই হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে। সাধারণত প্রত্যেক রাজ্য থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যদের মনোনীত করেন কংগ্রেসের দলীয় নেতৃত্ব।

রাজ্য কেন্দ্রীয় কমিটি (State Central Committee)

প্রত্যেক রাজ্যে দলের কাজ পরিচালনা করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি ও একজন চেয়ারম্যান থাকেন। এই কমিটির সদস্যদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পার্টি সদস্যরা নির্বাচন করেন। সাধারণত রাজ্যস্তরের নেতারা এই কমিটিতে স্থান পান। রাজ্যস্তরে নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা করা, তহবিল সংগ্রহ করা, প্রার্থী মনোনয়ন করা, জনসভার আয়োজন করা, বক্তা ঠিক করা, প্রচার পুস্তিকা রচনা করা এই কমিটির কাজের মধ্যে পড়ে। এই কমিটির একজন চেয়ারম্যান থাকেন, কিন্তু তিনি বেশির ভাগ সময়েই নামে মাত্র প্রধান হিসাবে কাজ করেন। রাজ্যস্তরে দলের প্রকৃত নেতা হিসাবে কাজ করেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের গভর্ণর বা গভর্ণর পদের জন্য দলীয় প্রার্থী। রাজ্যের কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ থাকেন। সম্পাদক করা হয় সাধারণত একজন বেতনভোগী ব্যক্তিকে।

কাউন্টি কমিটি (County Committee)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় তিন হাজারের ওপর কাউন্টি আছে। আর এই কাউন্টি-গুলোতে উভয় দলেরই কাউন্টি কমিটি কাজ করে। এই কাউন্টি কমিটি নিম্নতন কমিটিগুলোর কাজের তত্ত্বাবধান করে, রাজ্য কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে ভালভাবে চলে সেদিকে লক্ষ্য রাখে। প্রত্যেক কাউন্টি কমিটির একজন চেয়ারম্যান বা সভাপতি থাকেন। যদি কাউন্টি কমিটি কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে কাউন্টি কমিটির চেয়ারম্যান কিছু অনুগ্রহ বিতরণের সুযোগ পান। তাছাড়া স্থানীয় কমিটি এবং রাজ্যকমিটির মধ্যে একাধিক জেলা কমিটি কাজ করে। বিচার বিভাগীয় জেলা, কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য জেলা, সিনেটে নির্বাচনের জেলা কমিটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এই জেলা কমিটিগুলির ক্ষমতা, প্রভাব বা গঠন পদ্ধতি এক এক রাজ্যে এক এক রকম। পার্টির সর্বনিম্নে শহর এলাকার ওয়ার্ড কমিটি এবং গ্রামীণ এলাকার গ্রাম কমিটি আছে। তাছাড়া একশ থেকে পাঁচশ ভোটার নিয়ে গঠিত নির্বাচনী ইউনিটগুলি পার্টির অত্যন্ত সক্রিয় সংগঠনরূপে নীচের দিকে কাজ করে।

দলগুলির আর্থিক সংস্থান

বলাবাহুল্য মার্কিন নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় নির্বাচনে ঢালাও কালো টাকার ব্যবহার করা হয়। নির্বাচনী প্রচারাভিযানে লক্ষ লক্ষ প্রচার পত্র ও পুস্তিকা ছাপার জন্য, নির্বাচন কর্মীদের দৈনন্দিন খরচার জন্য, অসংখ্য সভা-সমিতি আয়োজন করার জন্য, ভোটের দিনে ভোটারদের নিয়ে আসার জন্য কয়েকশো কোটি ডলার প্রয়োজন হয়। আগেই বলা হয়েছে, দুটি দলের মধ্যে আদর্শগত পার্থক বিশেষ নেই। তাই আদর্শ, কর্মসূচী ইত্যাদির ওপর জোর না দিয়ে উভয় দলের নেতারাই চেষ্টা করেন বিপুল অর্থব্যয়ে দলীয় প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে নির্বাচনে জয়ী হতে। দলের সদস্যরা এই বিপুল অর্থের সামান্য

অংশই দিয়ে থাকেন। বেশির ভাগ অর্থই বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, করপোরেশান, শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়। ব্যবসায়ী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাছে থেকে চাপ দিয়ে যাতে অর্থসংগ্রহ না করা হয়, সেজন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে কতগুলি আইন পাশ করা হয়েছে। নির্বাচনে যাতে বেশি খরচ না হয়, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচনী ব্যয়ের ওপর একটি ঊর্ধ্বসীমাও আরোপ করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলিও আইন অনুযায়ী কোন রকম নির্বাচনী তহবিলে দান করতে পারে না। তবে এই সব নিষেধাজ্ঞা বা আইন কাগজে কলমেই মানা হয়। নির্বাচনী ব্যয় দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তাই দলগুলোও বৈধ ও অবৈধ উপায়ে করপোরেশান, শিল্পপতি, উচ্চপদস্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারি কর্মচারী, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতিদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করে। ফলে নির্বাচনী ব্যয়ের ঊর্ধ্বসীমা কার্যত অর্থহীন হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির আদর্শহীনতা, লোভ ও দুর্নীতি নির্বাচনী রাজনীতিকে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলেছে।

দুই: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিদলীয় প্রথার বৈশিষ্ট্য: ব্রিটেনের দলপ্রথার সঙ্গে তুলনা (Features of American Party System: A Comparative Study of British and American Party Systems)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রিটিশ ও মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার তুলনা তুলে ধরা যেতে পারে।

(১) সংবিধানের বাইরে দলপ্রথার অগ্রগতি (extra-constitutional growth): গ্রেট ব্রিটেনের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দুটি প্রধান দল সংবিধানের স্বীকৃতি বা অনুমোদন না নিয়েই গড়ে উঠেছে। মার্কিন সংবিধানের প্রণেতারা স্পষ্টতই দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন দলীয় রাজনীতি, উপদলীয় কোন্দল জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করবে। তাই ফিলাডেলফিয়ায় মহাসম্মেলনে ম্যাডিসন তীব্র-ভাষায় দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটন স্বয়ং এই দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তাঁর বিদায় ভাষণে জাতিকে দলপ্রথার বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি চালিত সরকার, রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন ইত্যাদি দলপ্রথার দৌরাত্ম্য বন্ধ করার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছিল।

কিন্তু সংবিধান গৃহীত এবং বিধিবদ্ধ হওয়ার আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলপ্রথার উদ্ভব ঘটেছিল। শহর, কাউন্টি এবং রাজ্যগুলিতে স্থানীয় উপদল গড়ে উঠেছিল —যেখানে নিজেদের পছন্দমত দলীয় প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার চেষ্টা করা হত। এমনকি ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনেও প্রতিনিধিগণ ফেডারেলিস্ট এবং অ্যান্টি-ফেডারেলিস্ট— এই দুটি উপদলে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটনের অবসর গ্রহণের পর এই দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্ররূপ ধারণ করে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে ক্রমশই দলগুলো মুখ্য

ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে। এখন জাতীয় স্তরে, রাজ্যস্তরে কিংবা স্থানীয় স্তরে সরকার গঠন দলপ্রথার ওপরেই নির্ভর করে। জনমত গঠন, প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা করা, সরকারের কর্মসূচী স্থির করা, বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কিংবা স্বার্থগোষ্ঠীর পরস্পর বিরোধী দাবীদাওয়ার মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করা হল রাজনৈতিক দলগুলোর মুখ্য কাজ। কিন্তু রাজনৈতিক দলকে কখনোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের অংশ হিসাবে দেখা হয় না বা এর কোন সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। Ogg and Ray-র মতে দলগুলি হল মূলত *Voluntary bodies largely autonomous and self-sufficing. Their activities go far towards making federal and state governments function as they do. But they are not themselves government organs.*

২) গ্রেট ব্রিটেনের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আমরা শক্তিশালী দ্বিদলীয় প্রথার অস্তিত্ব দেখতে পাই। সংবিধান রচনা ও গ্রহণের সময় থেকেই রাজনীতিবিদরা প্রধানত দুটি শিবিরে বিভক্ত ছিলেন। গ্রেট ব্রিটেনের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও জনমত দুটি প্রধান দলের পক্ষেই রায় দিয়েছে। গ্রিফিতের (Griffith) মতে উভয় রাষ্ট্রেই *Certain inexorable trend seems to cause public support to gravitate toward two major parties.* একথা ঠিক যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক সময়ই নতুন আদর্শ বা শ্লোগান নিয়ে নতুন নতুন পার্টি গঠিত হয়েছে। কিছু জনপ্রিয়তাও তারা অনেক সময় অর্জন করেছে। কিন্তু এইসব দল কখনোই দ্বিদলীয় ব্যবস্থার মূলে আঘাত হানতে পারেনি। *Free Soil Party The Green Backers The Populists, The Prohibitionists* থিয়োডর রুজভেল্টের *The National Progressive Party*-র মত অনেক দলের উত্থান ও পতন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সোস্যালিস্ট পার্টি ১৯০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিউইয়র্ক শহরে এই দলের কিছু প্রভাব আছে। ১৯১৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় এবং শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই দলের কিছু প্রভাব আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাঝে মাঝেই এই রকম তৃতীয় দলের উদ্ভব হয়েছে। নতুন নতুন প্রস্তাব, নতুন নীতিগত বক্তব্য এরা জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করে। কিন্তু দেখা যায় যে, অনতিবিলম্বেই এদের বক্তব্য ও দাবীদাওয়া প্রধান দুটি দল গ্রহণ করেছে। এই সব তৃতীয় দল কখনোই দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আবির্ভূত হয়নি।

বলা হয়, ইংরাজদের মত মার্কিন নাগরিকগণও আদর্শ নিয়ে বেশি মাথা ঘামান না। রাজনীতির ক্ষেত্রে মার্কিন নাগরিকগণ খুব বেশি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী নন। বরং স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য তারা দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করেছেন। আবার ভারতের মত সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক বা জাতপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ওঠেনি। তৃতীয়ত, ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, তা এখনো অব্যাহত আছে। চতুর্থত, মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন ব্যবস্থা, বিশেষ করে ইলেকটোরাল কলেজ বা নির্বাচক মণ্ডলীর মাধ্যমে নির্বাচন পদ্ধতি এবং একটি কেন্দ্র থেকে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে একজন মাত্র প্রার্থীর আইনসভায় নির্বাচন দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও সংহত হতে সাহায্য করেছে। পঞ্চমত, দুটি প্রধান দলই অপ্রধান দলগুলোর মূল বক্তব্য ও দাবীদাওয়া গ্রহণ করে নিজেদের গণ সমর্থন ভিত্তি প্রসারিত করে। সমালোচকদের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার নেতৃত্ব আছে একচেটিয়া পুঁজির মালিক ও শিল্পপতিরা। দুটি প্রধান দলই এই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে। দুটি প্রধান দলই স্থিতাবস্থার ভক্ত। তাই শাসক শ্রেণীও নিজেদের শ্রেণীস্বার্থেই এই দুটি প্রধান দলকে সমর্থন করে; কেন না দ্বিদলীয় ব্যবস্থার বিরোধীদল কখনোই "Anti establishment opposition" বা স্থিতাবস্থার বিরোধী হিসাবে কাজ করতে পারে না।

(৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুটি প্রধান দলের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য বিশেষ নেই। কিন্তু ব্রিটেনের দুটি প্রধান দলের মধ্যে যথেষ্ট আদর্শগত পার্থক্য আছে। ব্রিটেনে কনজারভেটিভ পার্টি বা রক্ষণশীল দল মূলত উচ্চবিত্তদের স্বার্থ রক্ষা করে। কিন্তু শ্রমিকদল সেক্ষেত্রে শ্রমিক, কর্মচারী ও নিম্নবিত্তদের স্বার্থরক্ষায় অধিকতর আগ্রহী। ব্রিটেনে কনজারভেটিভ পার্টি খুব বেশি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ নীতির বিরোধী। সমাজতন্ত্র ও কাম্যডানজমের বিরুদ্ধে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অধিকতর ব্যয়ের বিরুদ্ধে কনজারভেটিভ পার্টি সোচ্চার। এই দল সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী। পক্ষান্তরে শ্রমিকদল গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, মূল শিল্পের জাতীয়করণ, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী নীতিতে বিশ্বাস করে।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুটি প্রধান দলের মধ্যে আদর্শগত কোন পার্থক্য নেই বললেই চলে। তাই ফাইনারের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেবল একটিমাত্র দলই আছে। সে দলটির নাম রিপাবলিকান-ডেমোক্রেটিক পার্টি (Republican-Democratic party)। এই রিপাবলিকান-ডেমোক্রেটিক পার্টির অর্দ্ধেক হল রিপাবলিকান এবং বাকি অর্দ্ধেক ডেমোক্রেটিক।

আগে বলা হত, রিপাবলিকান পার্টি ধনী ও উচ্চ বিত্তদের দল, আর ডেমোক্রেটিক পার্টি গরীব ও নিম্নবিত্তদের দল। কিন্তু এখন আর এই পার্থক্য নেই। কেন না এখন ডেমোক্রেটিক দলেও প্রচুর শিল্পপতি, কলকারখানার মালিক বা বিত্তশালী মানুষ আছেন। আগে রিপাবলিকান দল উত্তরাঞ্চলে এবং ডেমোক্রেটিক দল দক্ষিণাঞ্চলে শক্তিশালী ছিল। কিন্তু এখন উভয় দলই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র নিজেদের সমর্থন ভিত্তি প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছে।

দুটি দলের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল এই যে, যখন একটি দল ক্ষমতায় আসীন হয়, তখন অন্যদল ক্ষমতায় থাকে না। উভয় দলই পুঁজিবাদী অর্থনীতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, আইনের শাসন এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। উভয় দলই বিশ্ব রাজনীতিতে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য বিস্তারে বিশ্বাসী। উভয় দলই সমাজতন্ত্রের বিরোধী, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের বিরোধী, পরাধীন জাতিগুলোর মুক্তি আন্দোলনের বিরোধী। উভয় দলই ইসরাইল ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থক। উভয় দলই সাম্রাজ্যবাদ-আগ্রাসী নীতির সমর্থক। জর্জ নোভাকের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলই বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর বাম ও দক্ষিণ বাহু হিসাবে কাজ করে।

(৪) মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রধান দলের সমর্থক-গণ প্রধানত পারিবারিক সূত্রে বা আঞ্চলিক সূত্রে কোন বিশেষ দলের সমর্থক হিসাবে কাজ করেন। সাধারণত পিতা বা পিতামহের দলের প্রতি নাগরিকদের একটি স্বাভাবিক আনুগত্য বোধ থাকে। দ্বিতীয়ত, দেশের কয়েকটি অঞ্চল বা ভূখণ্ড দীর্ঘকাল ধরে একটি বিশেষ দলের সমর্থক হিসাবে চিহ্নিত। আবার দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মানুষের বেশি ঝোঁক ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতি। আর স্বচ্ছল মানুষেরা রিপাবলিকান পার্টির প্রতি বেশী অনুগত। শিল্পাঞ্চলগুলিতে রিপাবলিকান পার্টির প্রাধান্য, আর কৃষিপ্রধান অঞ্চলে মোটামুটি ডেমোক্রেটিক দলের প্রাধান্য এখনো আছে।

(৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি হল আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গড়ে তোলা স্থানীয় শাখাসমূহ। এইসব স্থানীয় শাখাগুলো স্থানীয় বিষয় নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে। এমনকি কংগ্রেস বা রাজ্য আইনসভায় নির্বাচিত সদস্যগণ ও জাতীয় সমস্যার তুলনায় স্থানীয় সমস্যা বা বিষয় সম্পর্কেই অধিকতর আগ্রহী। কিন্তু একটি মহাদেশের মত বিশাল রাষ্ট্রে স্থানীয় সমস্যার মধ্যেই এত বৈচিত্র্য ও পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে যে একই দলের সদস্যরা অনেকসময় অঞ্চলভেদে ভিন্ন অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। নিগ্রোদের সমান অধিকার সম্পর্কে জর্জিয়ার একজন ডেমোক্রেটিক নেতা কানেকটিকাটের একজন ডেমোক্রেটিক নেতার সঙ্গে একমত হতে পারেন না। কেননা এ ক্ষেত্রে একমত হওয়ার অর্থ নিজের রাজনৈতিক অপমৃত্যু ডেকে আনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনে জয়লাভ করা এবং চাকরি ও অনুগ্রহ বণ্টন করা হল দলের প্রধান কাজ। সরকার পরিচালনা করা বা পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহার কাজে রূপায়িত করা, একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে দলের নির্বাচিত সদস্য ও নেতাদের ওপর শৃঙ্খলা আরোপের চেষ্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না। দুই দলের এই উগ্র আঞ্চলিকতাকে sectionalism নামে অভিহিত করা হয়।

(৬) ব্রিটেনের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলের এক বিরাট ভূমিকা আছে। যেহেতু ব্রিটেনে বিরোধীদলের নেতা হয় ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, নতুবা ভাবী প্রধানমন্ত্রী—তাই জনসাধারণ তাঁকে এক বিশেষ মর্যাদা দেয়। তাঁর বেতন সরকার বহন করে, তিনি ছায়া মন্ত্রিসভার প্রধান, প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেন। শুধু তাই নয়, বিরোধীদল সবসময়ই বিকল্প কর্মসূচী, বিকল্প কার্যক্রম নিয়ে আগামী সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতা দখলের

চেষ্টা করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলের কোন সাংবিধানিক মর্যাদা নেই।

(৭) আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রধান দলেই বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রভাব খুব বেশি। এইসব গোষ্ঠী নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করে, নেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু ব্রিটেনের দুটি প্রধান দলে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ভূমিকা তুলনায় কম। তাই ব্রিটেনের দল দুটিতে অনেক বেশি সংহতি ও শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়।

তিন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (Interest or Pressure Groups in the United States)

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পেশা, ভাষা, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, জাতি, ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন স্বার্থকে কেন্দ্র করে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। শ্রেণী বিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন পেশা ও স্বার্থের লোকেরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে. কেননা তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থগোষ্ঠী বা শ্রেণীগুলোকে কাজ করতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত পৃথিবীর আর কোন দেশে এত স্বার্থগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়নি। একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মানুষেরাও অনেক সময় পরস্পরাবিরোধী স্বার্থের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী গঠন করে নিজেদের স্বার্থ তথা অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করে। ১৮৩৫ সালেই টকভিল মন্তব্য করেছিলেন যে. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত পৃথিবীর আর কোন দেশে সংগঠন গড়ার নীতিকে এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়নি। ১৯৬১ সালে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভি. ও. কী (V. O. Key) মন্তব্য করেছেন যে. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি সম্যকভাবে অনুধাবন করার জন্য এইসব চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও স্বার্থগোষ্ঠীগুলোর কাজকর্ম সম্বন্ধে অবহিত থাকা প্রয়োজন। এই সব গোষ্ঠীগুলো জনসাধারণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংযোগ সূত্র হিসাবে কাজ করে। প্রশাসনের ওপর, রাজনৈতিক নেতাদের ওপর চাপসৃষ্টি করে, জনমতকে প্রভাবিত করে এই সব স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করে। যে কোন রাজনৈতিক দলের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হল ক্ষমতা দখল করা এবং সেই ক্ষমতা বজায় রাখা। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রার্থী দেয়. নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা করে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর বিরোধী স্বার্থের গ্রন্থিকরণ করে এবং তাদের দাবী দাওয়া তুলে ধরে। কিন্তু স্বার্থগোষ্ঠী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কখনো ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে না। রাজনৈতিক কর্মসূচী বা মতাদর্শ প্রচার করা, নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া কিংবা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করা স্বার্থগোষ্ঠীর কাজ নয়। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর একমাত্র কাজ হল নিজেদের গোষ্ঠীগত স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রশাসন, আইনসভা, বিচারবিভাগ, সংবাদপত্র এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করা, তাদের প্রভাবিত করা।

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কৌশল

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে। প্রথমেই তারা চেষ্টা করে সেইসব প্রার্থীকে সাহায্য করতে যারা আইনসভায় নির্বাচিত হলে তাদের হয়ে কথা বলবে। এজন্য ঐসকল প্রার্থী যাতে জয়ী হন, সেই উদ্দেশ্যে তারা নির্বাচনী প্রচারের সময় অর্থ ও লোকজন দিয়ে সাহায্য করে। এইভাবে নির্বাচন প্রার্থীর স্বপক্ষে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো প্রচার অভিযানে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়ত, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো সরকারী কর্মচারী ও আইনসভার সদস্যদের নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, যাতে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত তাদের অনুকূলে যায়। তৃতীয়ত, জনমত প্রভাবিত করার জন্য তারা পত্রপুস্তিকা প্রকাশ করে, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয়, এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে। চতুর্থত, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক নেতাদের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। তালাও অর্থ সাহায্য করে, প্রার্থী মনোনয়নের সময় প্রভাব বিস্তার করে, নিজেদের মনোনীত প্রার্থীদের সাহায্য করে তারা রাজনৈতিক দলগুলোকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে চায়। আবার কোন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী যদি কোন প্রার্থীকে পছন্দ না করে, তাহলে সেই প্রার্থীর পরাজয়ের জন্যও তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে। এইভাবে প্রার্থী মনোনয়নের সময় প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষ বিশেষ প্রার্থীর নির্বাচনী অভিযানে সহায়তা করে, গণমাধ্যমগুলোতে নিজেদের বক্তব্য প্রচার করে, আইনসভার সদস্যদের কাছে দরবার করে, সরকারী কর্মচারীদের প্রভাবিত করে এরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করে। কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটির কাছে বক্তব্য পেশ করেও এরা নিজেদের অনুকূলে আইন প্রণয়নের চেষ্টা করে।

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব বিস্তারের স্তর

যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, আর যেহেতু রাজ্য সরকারগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী, ফলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠগুলো কেবল মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে না, রাজ্যস্তরেও আইনসভা, প্রশাসন, রাজনৈতিক দল বা গণমাধ্যমগুলোর ওপর তারা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। এই ভাবে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত যাতে তাদের অনুকূলে আসে, সেজন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে।

১. রাজ্যস্তরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা

তাছাড়া প্রশাসনিক স্তরে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, তাদের বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত করে, বা তাদের মনোরঞ্জন করে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। বিশেষ করে ব্রিটেন বা ভারতের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা দীর্ঘদিনের জন্য নিযুক্ত হন না। তাঁদের আচরণবিধি ততটা কঠোর নয়। বরং তাঁরা অনেক সময়ই পাদপ্রদীপের আলোয় থাকতে ভালবাসেন। এই সব উচ্চপদস্থ

২. প্রশাসনিক স্তরে

সরকারী কর্মচারীদের অনেক অনুগ্রহ বিতরণের ক্ষমতা আছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার জনকল্যাণ ও সমাজসেবামূলক খাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। সামরিক খাতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ব্যয়ভার বৃদ্ধি করে চলেছে। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো চেষ্টা করে কি করে সরকারের বিভিন্ন কাজের ঠিকাদারী পাওয়া যায়। এক কথায় বলা যায়, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো চেষ্টা করে কি ভাবে সরকারের আর্থিক লেনদেনে ভাগ বসান যায়, ঠিকাদারী পাওয়া যায়।

৩. আইনসভাকে

কংগ্রেসের উভয় কক্ষের সদস্যরা যাতে প্রভাবিত হন, যাতে তারা দ্রুত কোন আইন পাশ করেন, বা কোন আইন ফেলে রেখে দেন, বা কোন অবাঞ্ছিত বিলের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়, তার জন্য এই সব স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি বা *Lobbyist*গণ খুবই সক্রিয়। বিশেষ করে মার্কিন কংগ্রেসের কমিটিগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই এই কমিটিগুলো ক্ষুদে আইন সভা নামে পরিচিত। এই কমিটিগুলোর সামনে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপিত করে, সদস্যদের নানারকম তথ্যজ্ঞাপন করে, তাদের কাছে দরবার করে, চিঠি পত্র পাঠিয়ে, এমনকি কখনো কখনো আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে এই সব স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো কমিটির সিদ্ধান্ত নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। আবার অনেক সময় কংগ্রেসের কিছু সদস্য এই সব চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেন।

৪. বিচার বিভাগকে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারবিভাগ অত্যন্ত শক্তিশালী। ন্যায় বিচারের নামে, আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির নামে বিচারালয় যে-কোন সরকারী আদেশ বা আইন নাকচ বলে ঘোষণা করতে পারেন। সংবিধানের ব্যাখ্যাতা ও অভিভাবক হিসাবে সংবিধানের কোন ধারা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দেবেন, সেই ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয়। ফলে বিচারপতি মনোনয়নের সময় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। কেন না পছন্দমত বিচারপতি পাওয়া গেলে বিচারালয়ের রায়ও অনুকূলে আসতে বাধ্য। তাছাড়া, বিচারালয়ের কাছে গণ আবেদন পত্র পেশ করে, বিভিন্ন মামলায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো আদালতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপদ্ধতি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল ও জটিল। ফলে বিভিন্ন মানবাধিকারের মামলায় বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গ ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার মামলা চালাতে গেলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ প্রচুর অর্থব্যয় করে এইসব মামলায় রায় নিজেদের অনুকূলে আনার চেষ্টা করে।

৫. রাজনৈতিক দলকে

আগেই বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন স্তরে এইসব স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অত্যন্ত সক্রিয় থাকে। দলের কর্মসূচী প্রণয়নে, প্রার্থী মনোনয়নে, অর্থসংগ্রহের সময় কিংবা নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা কালে এইসব স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী অত্যন্ত সজাগ সক্রিয় থাকে। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান দুটি দলই সাংগঠনিক দিক থেকে অনেকটা শিথিল। দুটি দলেই মতাদর্শগত সংগ্রাম প্রায় অনুপস্থিত. দুটি দলেরই নির্বাচন অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রধান দলই স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায়, ফলে উভয় দলেই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো অত্যন্ত সজাগ ও তৎপর থাকে। এইসব চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী অনেক সময় পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজ করে। আবার অনেক সময় তারা জোট বেঁধে, দলনিরপেক্ষভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। ক্ষমতা বিভাজন নীতি, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, দ্বিদলীয় ব্যবস্থা, দলীয় স্তরে কঠোর শৃঙ্খলা বা মতাদর্শের অভাব, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় রুদ্ধশ্বাস প্রতিযোগিতা ও সীমাহীন দুর্নীতি এইসব চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলোকে টিকিয়ে রেখেছে।

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলোর সংগঠন

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির সাফল্য বা কার্যকারিতা নির্ভর করে, তাদের সাংগঠনিক শক্তির ওপর। যদি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সংহতি বোধ প্রবল হয়, যদি কর্মকর্তারা দক্ষ হন, যদি গোষ্ঠীসদস্যদের মধ্যে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সংবাদের নিয়মিত আদান প্রদান হয়, যদি গোষ্ঠীর তরফ থেকে রাজধানী ওয়াশিংটনে নিয়মিত অফিস খোলা হয় এবং এই অফিস যদি তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে, তবে সেই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নিশ্চয়ই কিছু সফলতা অর্জন করে। গোষ্ঠী ও সংগঠনের স্থায়ী কর্মচারী এবং বেতনভুক সম্পাদক থাকলে কাজ আরো ভালো হয়। সাধারণত সম্পাদক গোষ্ঠীর পক্ষে কাজকর্ম পরিচালনা করেন, কংগ্রেসের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন, প্রয়োজনীয় প্রচারপত্র ও পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশ করে জনমতকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আনার চেষ্টা করেন।

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলোর প্রকারভেদ

অর্থনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করেই অধিকাংশ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। যেমন কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে অসংখ্য স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কৃষির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মাধ্যমে চাপ দেয় যাতে কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য ধার্য করা হয়, যাতে মার্কিন কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। আবার শিল্প ও কলকারখানার মালিকেরা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী গড়ে তোলেন যাতে করভার কম হয়, সরকারী নিয়ন্ত্রণ কম হয়। অস্ত্র ব্যবসায়ীরা চাপসৃষ্টি করে যাতে পৃথিবীতে যুদ্ধের উত্তেজনা বাড়ে এবং যাতে অস্ত্রশস্ত্র আরো বেশি বিক্রী হয়। আবার মানবাধিকার নিয়ে যারা লড়াই করেন তারা চেষ্টা করেন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ, বহিরাগত মানুষ যাতে সমান অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র বসবাস করতে পারেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় অনেক ছাত্র, যুবক, অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবী যুদ্ধের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ সভা ও মিছিল সংগঠিত করেছিলেন, শান্তির স্বপক্ষে প্রচার করেছিলেন। বিশ্বশান্তির

পক্ষে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক সংগঠনগুলিও অনেক সময় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ভূমিকা পালন করে।

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সমালোচনা

বলা হয় এই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করতে দ্বিধা বোধ করে না। ফলে এরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি ও জনজীবনে দুর্নীতির ধারক ও বাহক হিসাবে কাজ করে। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, কংগ্রেসের সদস্য, সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি, সাংবাদিক বা রাজনৈতিক নেতা, এককথায় সমাজ ও জনজীবনের কর্ণধারদের এই সব স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বৈধ, অবৈধ সব রকম ভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। উৎকোচ প্রদান, মিথ্যা প্রচার, ভীতি প্রদর্শন—কোনকিছুতেই এরা পিছিয়ে আসে না।

তাই আইন প্রণয়ন করে অনেক সময় এদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়েছে। ঐ আইনে বলা হয়েছে যে এইসব স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী যেন সরকারের কাছে প্রতি বছর এদের কার্যাবিবরণী এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করে। উৎকোচ গ্রহণ প্রমাণিত হওয়ায় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির শাস্তি হওয়ার ফলে এখন উৎকোচ দেওয়ার রীতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

কিন্তু এইসব স্বার্থান্বেষী ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর স্বপক্ষে বলা হয় যে, এরা অত্যন্ত সফলভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর দাবীদাওয়া ও চাহিদাগুলি জনসমক্ষে নিয়ে আসে। ফলে দলগুলির মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাত দেখা যায়। এর জন্য মার্কিন দ্বিদলীয় ব্যবস্থা অনেক বেশি খোলামেলা। এর ফলে মার্কিন কংগ্রেসেও দলীয় শৃঙ্খলার কড়াকড়ি অপেক্ষাকৃত কম। বলা হয়, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সংঘাত এই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির কাজকর্মের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার নির্যাস প্রতিযোগিতা, সীমাহীন লোভ, টিকে থাকার লড়াই এই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির কাজকর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়।

৬ নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা

Civil Rights and Liberties

এক : অধিকারের দলিল (Bill of Rights)

১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্রষ্টারা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে (Declaration of Independence) বলেছিলেন, "আমরা এই সত্যকে স্বপ্রমাণিত বলে মনে করি যে, সৃষ্টিকর্তা সকল মানুষকেই সমান করে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাদের প্রত্যেককেই কতকগুলো অধিকার দিয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছে বাঁচার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং সুখলাভের অধিকার। এইসব অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে মানবসমাজে শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় এবং এই শাসন-ব্যবস্থার পরিচালকদের শাসন করার ন্যায্য অধিকার লাভ শাসিতের সম্মতির ওপর নির্ভর করে।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্রষ্টারা মানুষের অধিকারের ওপর এত গুরুত্ব দান করলেও খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে এই ঘোষণার এগার বছর পরে ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে তাঁরা যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে সংবিধান প্রণয়ন করেন তখন জনগণের অধিকার সংক্রান্ত কোন দলিল সেই সংবিধানে স্থান পায়নি। সংবিধান প্রণেতাদের 'জনগণের অধিকার' সম্পর্কে এই নির্লিপ্ততা সমালোচিত হয়েছে। এ্যালেন পটার-এর (Allen M Potter) ভাষায় বলা যায়, *The constitution was generally criticised for the absence of a Bill of Rights.*[1]

সংবিধানে অধিকারের দলিলের অনুপস্থিতি

মার্কিন সংবিধান প্রণেতারা অবশ্য মনে করেছিলেন যে, সংবিধানের ধারার মধ্যেই জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, তাই আলাদা করে আর *Bill of Rights* বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে, সংবিধানে অধিকারের বিল লিপিবদ্ধ করা শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, ক্ষতিকারকও বটে। কারণ, সংবিধান কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারকে ক্ষমতা অর্পণ করে (delegate) এবং যেসব ক্ষমতা জাতীয় সরকারকে অর্পণ করেনি সেইসব ক্ষমতা রাজ্যের জন্যে সংরক্ষিত থাকে। সংবিধান প্রণেতারা মনে করেছিলেন যে, সংবিধানে অধিকারের দলিল লিপিবদ্ধ করে ক্ষমতা প্রয়োগের ওপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করলে জাতীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের উপরোক্ত নীতির ওপরে আঘাত হানা হবে।

সংবিধান প্রণেতাদের যুক্তি

কিন্তু সংবিধান গৃহীত হবার পরেই বোঝা গেল যে, উপরোক্ত অভিমত অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাঁরা সংবিধান সংশোধন করে অধিকারের দলিল বিধিবদ্ধ

১. *American Government and Politics*, Allen. M. Potter, P. 33

করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করেন। এমনকি কোন কোন মহল থেকে বলা হয় যে *Bill of Rights*-কে সংবিধানে স্থান দেওয়া না হলে তাঁরা সংবিধানকে অনুমোদন (Ratification) করবেন না। এই অবস্থায় *Bill of Rights*-কে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। এ অবস্থায় অধিকারের দলিল বা *Bill of Rights* কে সাংবিধানিক বিধি হিসেবে গ্রহণের দুটি পথ খোলা ছিল। নতুন করে সংবিধান সভা আহ্বান করে *Bill of Rights*-কে গ্রহণ করা, অথবা সংবিধান সংশোধন করে *Bill of Rights*-কে অন্তর্ভুক্ত করা। সংবিধানে *Bill of Rights*-কে গ্রহণ করার জন্যে দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহণ করা হল।

সংবিধানে অধিকারের দলিলের জন্য চাপ

১৭৮৯ সালের জুন মাসে জেম্‌স্‌ ম্যাডিসন্‌ (James Madison) মার্কিন কংগ্রেসে প্রতিনিধি সভায় দশটি সংশোধনী (Amendments) প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৭৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐ দশটি সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত (Ratified) হয়।

অধিকারের দলিল গ্রহণ

মার্কিন সংবিধানে এই প্রথম দশটি সংশোধনীতে মার্কিন জনগণের জন্যে অধিকারকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, তাই এই দশটি সংশোধনীকে একত্রে অধিকারের দলিল বা *Bill of Rights* নামে অভিহিত করা হয়। এই দশটি সংশোধনী আইন যেহেতু অধিকারকে সুনিশ্চিত করেছে, তাই এই প্রথম দশটি সংশোধনীকে সংশোধনী আইন হিসেবে বিবেচনা না করে মূল সংবিধানের অংশ হিসেবে অভিহিত করা হয়। পটারের (Potter) ভাষায় বলা যায়, *They are generally considered part of the original constitution.* প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, ১৭৯৮ সালে যে একাদশ সংশোধনী আইন গৃহীত হয় তাকে দশম সংশোধনী আইনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং তার পরিপূরক বলে মনে করার জন্যে এই একাদশ সংশোধনী আইনকেও অনেক সময় *Bill of Rights*-এর অন্তর্গত বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি, মার্কিন সংবিধানের প্রথম দশটি সংশোধনী (Amendments) এবং অংশত একাদশ সংশোধনীকে একত্রে মার্কিন সংবিধানে অধিকারের দলিল বা *Bill of Rights* নামে অভিহিত করা হয়।

অধিকারের দলিল কি

অধিকারের দলিলে স্বীকৃত অধিকার

উপরোক্ত সংশোধনগুলিতে বা অধিকারের দলিলে (Bill of Rights) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্যে যেসকল অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে তা আলোচনা করা হল।

প্রথম সংশোধনী ঃ কোন ধর্ম প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বা কোন ধর্মের স্বাধীন প্রচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস কোন আইন রচনা করতে পারবে না। মত প্রকাশের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জনসাধারণের শান্তিপূর্ণভাবে মিলিত হবার অধিকার এবং

তাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার প্রার্থনা করে সরকারের কাছে আবেদন জানাবার অধিকার খর্ব করে কংগ্রেস কোন আইন পাশ করতে পারবে না।

দ্বিতীয় সংশোধনী: একটি সুনিয়ন্ত্রিত সশস্ত্র মিলিশিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন। তাই, নাগরিকদের অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার হরণ করা চলবে না।

তৃতীয় সংশোধনী: শান্তির সময়ে কোন নাগরিকের গৃহে তার সম্মতি না নিয়ে সৈন্য রাখা চলবে না এবং যুদ্ধের সময়ে সৈন্য রাখতে হলেও সে সম্পর্কে যে আইন করা হবে সেই আইনের বিধান অনুযায়ী রাখতে হবে।

চতুর্থ সংশোধনী: নিজেদের শরীর, বাড়ী, কাগজপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের নিরাপত্তা এবং তা খানাতল্লাশী ও আটক থেকে রক্ষা পাবার যে অধিকার জনসাধারণের রয়েছে তা অমান্য করা চলবে না। পরোয়ানা জারীর প্রয়োজন হলে তার কারণ বলতে হবে এবং তখন যে স্থানে খানাতল্লাশী করা হবে তার বিবরণ, যে সকল লোককে গ্রেপ্তার করা হবে তাদের নাম এবং কোন জিনিস আটক করা হলে সেসব জিনিসের বিবরণ দিতে হবে।

পঞ্চম সংশোধনী: জুরির লিখিত অভিযোগপত্র ছাড়া কোন ব্যক্তিকে কোন মারাত্মক অথবা ঘৃণ্য অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা চলবে না। তবে যুদ্ধের সময়ে অথবা জরুরী অবস্থায় কর্তব্যরত স্থল বাহিনীর ও নৌ বাহিনীর কোন সৈন্য অথবা সশস্ত্র নাগরিক বাহিনীর কোন সদস্যের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করা যাবে। কোন ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য দুবার দৈহিক শাস্তি দেওয়া যাবে না এবং ফৌজদারী মামলায় জড়িত কোন আসামীকে তারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না, অথবা আইনানুগ পদ্ধতি ছাড়া তার প্রাণ, স্বাধীনতা বা সম্পত্তি হরণ করা যাবে না। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কারও সম্পত্তি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে না।

ষষ্ঠ সংশোধনী: ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রকাশ্য ও দ্রুত বিচার চাওয়ার অধিকার থাকবে এবং এই বিচার হবে যেখানে অপরাধ ঘটেছে সেই জেলার ও রাজ্যের নিরপেক্ষ জুরিমণ্ডলীর দ্বারা। কোন্ জেলায় অপরাধ ঘটেছে তা আগে আইন-বিভাগ নির্ধারণ করবে। তা ছাড়া অভিযুক্তকে অভিযোগের কারণ ও প্রকার জানাতে হবে, তার বিপক্ষে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদের তার সামনে হাজির করতে হবে, তার পক্ষের সাক্ষীদের আনার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা থাকবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তার আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য আইনজীবীর সাহায্য পাবে।

সপ্তম সংশোধনী: দেশের প্রচলিত আইনে যে সকল মামলা দায়ের হয়, সেই সকল মামলার বিবাদের বিষয়ের মূল্য যদি কুড়ি ডলারের বেশি হয়, তবে সেই সকল মামলার অভিযুক্তের জুরির বিচার পাবার অধিকার থাকবে। মামলার যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে জুরিরা একবার বিবেচনা করেছেন, সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের কোন

আদালত আর পুনর্বিবেচনা করতে পারবে না যদি না প্রচলিত আইনে ঐ পুনর্বিবেচনা সম্বন্ধে কোন নির্দেশ থাকে।

অষ্টম সংশোধনী: জামিনের জন্য অত্যধিক টাকা দাবি করা চলবে না, অত্যধিক টাকা জরিমানাও করা যাবে না। কোন শাস্তি নিষ্ঠুর অথবা অস্বাভাবিক হতে পারবে না।

নবম সংশোধনী: সংবিধানে কতকগুলি অধিকারের উল্লেখ থাকার অর্থ এই নয় যে, এগুলির বাইরে যে সকল অধিকার জনসাধারণ ভোগ করে আসছে সেগুলি অস্বীকার বা খর্ব করা হবে।

দশম সংশোধনী: সংবিধান যে সকল অধিকার যুক্তরাষ্ট্রকে দেয়নি, এবং যে-সকল অধিকার রাজ্যগুলিকে দিতে বারণ করেনি সেই সকল অধিকার জনসাধারণের অথবা রাজ্যগুলির জন্য সংরক্ষিত আছে বলে ধরে নিতে হবে।

উপরোক্ত প্রথম দশটি সংশোধনী ছাড়াও একাদশ সংশোধনীতে (১৭৯৫ সালে অনুমোদিত) নাগরিক অধিকার অংশত স্বীকৃত হয়েছে বলে একাদশ সংশোধনীকেও অনেক সময় *Bill of Rights*-এর পরিপূরক বলে মনে করা হয়। একাদশ সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের এক রাজ্যের বিরুদ্ধে অন্য কোন রাজ্যের নাগরিকগণ কর্তৃক আনীত কোনো অভিযোগে বা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক বা প্রজাগণ কর্তৃক আনীত কোন অভিযোগে, আইনগত বা ইকুইটি গত কোন প্রশ্নে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে না।

মার্কিন সংবিধানের প্রথম দশটি সংশোধনীর মাধ্যমে যে অধিকারের দলিলকে বিধিবদ্ধ করা হয় তাকে অনেকে মার্কিন জনগণের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ নামে অভিহিত করেছে। বিচারপতি জ্যাকসন (Justice Jackson) বলেছেন যে, অধিকারের দলিলের উদ্দেশ্য হল কতগুলো বিষয়কে রাজনৈতিক পরিবর্তনজনিত বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখা, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রাখা এবং ঐগুলোকে আদালতের পক্ষে পালন-যোগ্য আইনগত নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা (The very purpose of Bill of Rights was to withdraw certain subjects from the jurisdiction of political controversy, place them beyond the reach of majorities and officials and to establish them as legal principles to be applied by Courts)। মার্কিন সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানের প্রথম দশটি সংশোধনীকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন এবং জেমস্ ম্যাডিসন (James Madison), যাঁকে মার্কিন সংবিধানের জনক নামে অভিহিত করা হয়, বলেছেন যে, *Bill of Rights*-এর মধ্য দিয়ে মার্কিন নাগরিকদের নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

গুরুত্ব

সমালোচনা

কিন্তু সমালোচকরা মনে করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারের দলিলের মধ্য দিয়ে জনগণের সব অধিকার ও স্বাধীনতাকে বিধৃত ও নিশ্চিত করা হয় নি। এই জন্যে পরবর্তীকালে *Bill of Rights*-এর এই অপূর্ণতা দূর করার জন্যে আরো কতগুলো সংশোধনী গ্রহণ করতে হয়েছিল। সুতরাং অধিকারের দলিলের ত্রুটি হল এই যে, একটি দলিলের মধ্য দিয়ে মার্কিন জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তাই মুনরো (Munro) বলেছেন, *So we have nowhere a complete statement of just what constitutional rights an American citizen possesses or does not possess.*

দ্বিতীয়ত, অ্যালেন পটার মনে করেন যে *Bill of Rights* মার্কিন সংবিধানের মৌল ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন ঘটায়নি (The Bill of Rights did not, in fact, alter the basic constitutional system laid down in the constitution)। অধিকারের দলিলের মধ্য দিয়ে এমন কতকগুলো স্বাধীনতা এবং পদ্ধতিগত অধিকার (Procedural Rights) বিবৃত হয়েছে যেগুলোকে রক্ষা করার জন্যে সংবিধান প্রণেতারা এবং বিক্ষুব্ধবাদীরা উভয়েই সমান আগ্রহশীল ছিলেন। তাই অধিকারের দলিলকে অনেকে সমন্বয়কারী প্রয়াস (conciliatory gesture) নামে অভিহিত করেছেন।

তৃতীয়ত, ব্রিটেনে জনগণের জন্য অধিকার ও স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে সংবিধানে স্বীকৃত না হলেও সেখানকার জনগণ বাস্তবে যে অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করে মার্কিন জনগণ তা ভোগ করে না। মার্কিন অধিকারের দলিলে বিষয়গত অধিকার অপেক্ষা পদ্ধতিগত অধিকারকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেখানে আর্থিক সংকটের সময়, বুর্জোয়া সংকটের সময় জনগণের অধিকারের ওপর অনেক বেশী হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়, সেখানকার নিগ্রো সম্প্রদায়ের ওপর মার্কিন প্রশাসন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করে তা 'অধিকারের দলিল'-এর মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়নি।

সর্বোপরি বলা প্রয়োজন যে, কোন বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় জনগণের জন্য আর্থিক অধিকার স্বীকৃত থাকতে পারে না—এবং মার্কিন সংবিধানও এর ব্যতিক্রম নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'অধিকারের দলিল'-এ কোন আর্থিক অধিকার স্বীকৃত হয়নি, রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যেই ঐ 'অধিকারের দলিল' সীমিত।

দুই : মার্কিন গণতন্ত্র এবং নাগরিক অধিকার (American Democracy and Civil Rights)

পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলে অভিহিত করা হয়। জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার সর্বোচ্চ প্রকাশ উদার-নৈতিক গণতন্ত্রের নির্যাস বলে দাবী করা হয়। অর্থাৎ দাবী করা হয় যে, জনগণের

প্রকৃত স্বাধীনতা ও অধিকার কেবলমাত্র উদারনৈতিক গণতন্ত্রেই সুনিশ্চিত থাকে, তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশী সুরক্ষিত। উপরোক্ত দাবী কতটা পরিমাণে গ্রহণযোগ্য তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং পুঁজিবাদী স্বার্থকে লালন করাই মার্কিন শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য। ভোটাধিকার, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা, একাধিক রাজনৈতিক দলের সহাবস্থান, নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার সংরক্ষণ এবং বিচারালয়ের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে সেখানে গণতন্ত্রকে বাস্তব ও অর্থবহ করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা হল এই যে, ঐ সকল ব্যবস্থা সেখানকার শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে সাজুয্য বজায় রেখে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যাতে পুঁজিবাদী স্বার্থ তথা শ্রেণীস্বার্থ বজায় থাকে, শোষণব্যবস্থা কায়েম থাকে, উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা পুঁজিবাদী শ্রেণীর অধীন থাকে, মুষ্টিমেয় লোকের (Elite) প্রাধান্য বজায় থাকে এবং বিচারালয় শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

মার্কিন গণতন্ত্র

কোন সমাজব্যবস্থা রাজনৈতিক আদর্শ-নিরপেক্ষ হতে পারে না। সুতরাং মার্কিন সমাজব্যবস্থা পুঁজিবাদী আদর্শ ও স্বার্থকে বাদ দিয়ে গড়ে উঠতে পারে না। তাই মার্কিন গণতন্ত্রে সমানাধিকার হল শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় শাসন ও শোষণের অবস্থিতি, সার্বজনীন ভোটাধিকারের অর্থ হল দীর্ঘদিন ধরে সেখানকার মূল বাসিন্দা নিগ্রোদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা, প্রতিনিধিত্বের অর্থ হল জনসংখ্যার বিপুল অংশকে (নিগ্রোদের) সমাজব্যবস্থায় কোন উচ্চপদে অধীন হতে না দেওয়া; আইন কর্তৃক সকলকে সমভাবে সংরক্ষিত (Equal protection of laws) করার অর্থ হল শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থকে আইনের নামে পদদলিত করা, স্বাধীনতা বলতে সীমিত ও পক্ষপাতমূলক রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে স্বীকার করা, অধিকার বলতে আর্থিক ও সামাজিক অধিকারের অনুপস্থিতি এবং আদালতের নিরপেক্ষতা বলতে পুঁজিবাদী স্বার্থরক্ষায় আদালতের সক্রিয় ভূমিকা পালনকে বোঝায়। সুতরাং মার্কিন গণতন্ত্র হ'ল উদারনীতির আবরণে পুঁজিবাদী স্বার্থ ও শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখার একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

স্বভাবতই এরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের জন্য যে স্বাধীনতা ও অধিকারের কথা বলা হয় তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কোন অধিকার বা স্বাধীনতা সমাজব্যবস্থা-নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মৌল স্বার্থকে বাদ দিয়ে যেখানে জনগণের কোন অধিকার ও স্বাধীনতা থাকতে পারে না, তাই সেখানে অধিকার এবং 'স্বাধীনতা'কে আপেক্ষিক ধারণা এবং শাসক শ্রেণীর স্বার্থ এবং ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন বলে মনে করা হয়। যেখানে স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে বিরোধে কর্তৃত্বের প্রাধান্য মান্য করা হয় এবং স্বীকৃত অধিকারকে নানা ধরনের আইনের

দ্বারা সীমিত করা হয় (Liberty, here, had to give ground to authority; and rights, once widely recognized, were curbed by law)[১], সেখানে পুঁজিবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য স্বাধীনতার ওপরে কর্তৃত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পুঁজিবাদী স্বার্থ বিরোধী অধিকারকে নানাভাবে আইনের দ্বারা সীমিত করা হয়। শ্রেণী স্বার্থে শাসক শ্রেণীর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যই প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln) কর্তৃত্ব বা *Authority*-এর প্রাধান্যকে নিশ্চিত করার জন্যই অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার অজুহাতে সরকারী কর্তৃত্বকে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি গৃহযুদ্ধের সময়ে (civil war) প্রশ্ন করেছিলেন, *Must a government of necessity be too strong for the liberties of its own people, or too weak to maintain its own existence?* তাঁর এই প্রশ্ন কি ইঙ্গিত বহন করে তা খুবই স্পষ্ট। বস্তুত এই সময় থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে *Industrial capitalism*-এর সূত্রপাত ঘটে (It marks the rise of Industrial capitalism)[২]।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদারনৈতিক গণতন্ত্রের 'উদার নীতি' এবং 'গণতন্ত্র' সেখানকার মূল অধিবাসী অশ্বেতকায় সম্প্রদায় বা নিগ্রোদের প্রতি সংবিধান প্রণেতা থেকে শুরু করে বর্তমান শাসক সম্প্রদায় পর্যন্ত বিগত দুশো বছরের পক্ষপাতিত্ব, অবহেলা, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং তাদের জন্য স্বীকৃত তথাকথিত অধিকার ও স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে তারা নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আইন ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের শিকার হয়েছে এবং নিজের দেশে নাগরিকের অধিকার পায়নি বা পেলেও দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা পেয়েছে। সেখানে ক্রীতদাস নিগ্রোদের নাগরিক বলে স্বীকার করা হয়নি। এমনকি *Dred Scott Case*-এ দেখা যায় যে, ক্রীতদাস নয় এমন নিগ্রোকেও মার্কিন নাগরিক বলে স্বীকার করা হয়নি (A Negro, even a free one, is not a citizen of the United States)[৩]। এমনকি কিছুদিন আগেও তাদের প্রকৃত নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়নি (Until recently, they have fallen far short of granting the Negroes real civil rights)[৪]। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের জনসংখ্যার অনুপাতে কংগ্রেস, প্রশাসন ও মর্যাদাপূর্ণ পদে নিগ্রো প্রতিনিধিত্ব এতই কম যে তা উল্লেখ করার মত নয়।

নিগ্রোদের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের স্বরূপ

১. *American Democracy*, Carr, Bernstein, Murphy, p. 395
২. American Government and Politics p 50
৩. ঐ p 49.
৪. ঐ p 50.

তিন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা (Civil Rights and Liberties in U.S.A.)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংশোধনী আইন, বিশেষ করে প্রথম দশটি সংশোধনী (Bill of Rights), সংবিধানের বিভিন্ন অংশ এবং বিচারবিভাগের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে মার্কিন নাগরিকদের জন্য যে সকল অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে সেগুলোকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায় : ১. বিষয়গত অধিকার (Substantive Rights) এবং ২. পদ্ধতিগত অধিকার (Procedural Rights)। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাগুলো বিষয়গত অধিকারের মধ্যে পড়ে, অন্যদিকে অধিকার সংরক্ষণ ব্যাপারে সরকারী বাধ্যবাধকতা পদ্ধতিগত অধিকারের অন্তর্গত।

বিষয়গত এবং পদ্ধতিগত অধিকার

বিষয়গত অধিকার বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যে আছে ধর্মের স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার, অস্ত্র রাখার অধিকার, আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকার, সভা-সমিতি গঠনের অধিকার ইত্যাদি। অন্যদিকে পদ্ধতিগত অধিকারের মধ্যে আছে দুবার শাস্তিদান এবং নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেবার অধিকার, জুরি এবং আইনজীবীর সাহায্য পাবার অধিকার, বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ সংক্রান্ত লেখ এর অধিকার ইত্যাদি।

নীচে বিষয়গত এবং পদ্ধতিগত অধিকারকে আলাদা করে আলোচনা করা হল।

ক. বিষয়গত অধিকার (Substantive Rights)

প্রথমে মার্কিন নাগরিকদের বিষয়গত অধিকারগুলো (Substantive Rights) যা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নামে পরিচিত তা আলোচনা করা হল।

১ ধর্মের স্বাধীনতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংশোধনী আইনে (First Amendment) ধর্মীয় স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, কোন ধর্ম প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বা কোন ধর্মের প্রচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মার্কিন কংগ্রেস কোন আইন রচনা করতে পারবে না। এর অর্থ হ'ল : প্রথমত, রাষ্ট্র কোন ধর্ম প্রবর্তন করতে পারবে না, দ্বিতীয়ত, কোন ধর্মের প্রচারে রাষ্ট্র বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।

ধর্ম প্রবর্তন বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট ১৯৪৭ সালে *Everson vs. Board of Education* মামলায় বলেছে যে, মার্কিন কংগ্রেস এমন কোন আইন পাশ করতে পারবে না, যে আইন কোন একটি ধর্মকে বা সকল ধর্মকে সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতা করে বা একটি ধর্ম থেকে অন্য ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে। চার্চে যাবার বা না-যাবার জন্যে বা কোন ধর্মীয় উপাসনা করা বা না করার জন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় উপাসনার দ্বিতীয় দিক হ'ল, ধর্মের প্রচার, ধর্মীয় উপাসনা ইত্যাদির ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। যে কোন ধর্মের বা ব্যক্তিগতভাবে যে কোন ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে সাংবিধানিক দিক থেকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

তবে *Reynolds vs United States* (১৮৭৯) মামলায় সুপ্রীম কোর্ট বলেছে যে, ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর হস্তক্ষেপ চলবে না, কিন্তু ধর্মীয় উপাসনার (Practice) পদ্ধতিতে আইন হস্তক্ষেপ করতে পারে। অর্থাৎ ধর্মীয় উপাসনা পদ্ধতি এমন হতে পারবে না যা আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হয়।

২. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকেও প্রথম সংশোধনী আইনে স্বীকার করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করে মার্কিন কংগ্রেস কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবে না। সুতরাং মত প্রকাশের এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সেখানে সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপরে সুপ্রীম কোর্ট বাধা নিষেধের কথা বলেছে। সুপ্রীম কোর্টের মতে এমন কোন মত প্রকাশ করা যাবে না যা 'বিপজ্জনক' (dangerous) এবং কুৎসা (Scandalous)। কোন মতামত 'বিপজ্জনক' বা 'কুৎসাপূর্ণ' কিনা তা বিচার করবে কে? এই শব্দ দুটি, বিশেষ করে 'বিপজ্জনক' শব্দটি আপেক্ষিক। বুর্জোয়া স্বার্থের দিক থেকে যে মতামত 'বিপজ্জনক' বলে বিবেচিত হবে, শ্রমজীবী মানুষের কাছে তা বিপজ্জনক বলে প্রতীয়মান হতে নাও পারে। ১৯৫১ সালে সুপ্রীম কোর্ট সেখানকার কমিউনিস্টদের মতামতকে 'বিপজ্জনক' ও ষড়যন্ত্রমূলক বলে অভিহিত করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বুর্জোয়া স্বার্থবিরোধী হলে যে তা সহ্য করা হয় না তা অনেক ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে।

৩. সমবেত হওয়া ও আবেদনের অধিকার

প্রথম সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে, জনসাধারণের শান্তিপূর্ণভাবে মিলিত হবার অধিকার এবং তাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার প্রার্থনা করে সরকারের কাছে আবেদন জানাবার অধিকার খর্ব করে মার্কিন কংগ্রেস কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবে না। অর্থাৎ মার্কিন জনগণের একদিকে সভা করা, আলাপ আলোচনা করা এবং তার মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করার অধিকার এবং অন্যদিকে সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনের অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত।

কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ফলে এই অধিকার সীমিত হয়ে পড়েছে। অনেক সমাবেশকে সুপ্রীম কোর্ট 'বে-আইনী' বলে ঘোষণা করেছে, নিগ্রোদের অনেক সমাবেশের ওপরে প্রশাসন বাধা নিষেধ আরোপ করেছে।

৪. সম্পত্তির অধিকার

বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় সম্পত্তির অধিকারকে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্বাভাবিক অধিকার বলে স্বীকার করা হয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পত্তির অধিকারকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয় এবং এই অধিকারকে পবিত্র অধিকার বলে মনে করা হয়। কোন প্রকার

হস্তক্ষেপ বাদে এবং নিয়ন্ত্রণমুক্তভাবে সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয়, ভোগ ও সঞ্চয় করা হল সম্পত্তির অধিকারের নির্যাস। তাই মার্কিন সংবিধানে সম্পত্তির অধিকারের ওপরে জাতীয় ও রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের ওপরে নানা ভাবে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে।

পঞ্চম সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে, আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি ছাড়া বা আইনানুগ পন্থা ছাড়া কোন নাগরিকের সম্পত্তি হরণ করা যাবে না এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কারো সম্পত্তি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে না। চতুর্দশ সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে, কোন অংগরাজ্য কোন ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মার্কিন সংবিধানে দুটি সংশোধনী আইনে অল্প কয়েকটি কথায় খুব বেশী শব্দ ব্যবহার না করে সম্পত্তির অধিকারকে চূড়ান্তভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রের প্রয়োজনেও আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি ছাড়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা চলবে না।

রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বা সমষ্টিগত স্বার্থে আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসরণ করে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরকার গ্রহণ করেছে। কিন্তু এর দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পত্তির অধিকার সীমিত—এ কথা বলা যায় না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, ভোগ ও সঞ্চয়ের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বরং সংবিধানে বলা হয়েছে, ঐ অধিকার খর্ব করে মার্কিন কংগ্রেস কোন আইন পাশ করতে পারবে না। এই ঢালাও সম্পত্তির অধিকার থাকার জন্যেই সেখানে শোষণ ব্যবস্থা জোরদার হতে পেরেছে। বস্তুত, ব্যক্তিগত সম্পত্তির চূড়ান্ত অধিকার মার্কিন পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

৫ ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ সংশোধনী আইনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ঐ সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে গৃহ, দেহ, কাগজপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের নিরাপত্তা জনগণ ভোগ করবে। খানা-তল্লাসি এবং আটক থেকে রক্ষা পাওয়ার যে অধিকার জনগণের রয়েছে তা অমান্য করা চলবে না। গ্রেপ্তারের বা খানাতল্লাসির জন্যে পরোয়ানা জারীর প্রয়োজন হলে তার কারণ বিবৃত করতে হবে এবং যে স্থানে খানাতল্লাসী করা হবে তার বিবরণ, যে সকল লোককে গ্রেপ্তার করা হবে তাদের নাম এবং যে সব জিনিস আটক করা হবে সেই সব জিনিসের বিবরণ দিতে হবে।

তৃতীয় সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে, কোন নাগরিকের গৃহে তার সম্মতি না নিয়ে সৈন্য রাখা চলবে না এবং যুদ্ধের সময়ে সৈন্য রাখতে হলেও এসম্পর্কে যে আইন করা হবে সেই আইনের বিধান অনুযায়ী সৈন্য রাখতে হবে।

৬. অস্ত্র রাখার অধিকার

দ্বিতীয় সংশোধনী আইনে নাগরিকদের অস্ত্র ব্যবহারের অধিকারকে স্বীকার করে বলা হয়েছে অস্ত্র ব্যবহারের অধিকারকে হরণ করা যাবে না। এর অর্থ অস্ত্র রাখা ও তাকে বহন করার জন্যে কোন সরকারী অনুমতি প্রয়োজন হবে না। একদিকে অস্ত্র রাখার এই ঢালাও অধিকার এবং অন্যদিকে পুঁজিবাদী সমাজের নাগরিক অপরাধ প্রবণতার জন্যে এই অধিকারটি বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

৭. আইনকর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকার

মার্কিন সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোন রাজ্য তার এলাকার মধ্যে কাউকে আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না (No state shall deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws)। তাছাড়া সুপ্রীম কোর্টের মতে পঞ্চম সংশোধনীতে আইনের যথাবিহিত ধারায়ও সমভাবে সংরক্ষণকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের মতে আইন কর্তৃক সমানভাবে সংরক্ষিত হবার অর্থ হল সম অবস্থায় সমানভাবে আইন কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়া। অর্থাৎ সম অবস্থায় থাকলে সমান সুযোগ সুবিধা পাবার অধিকারকে বোঝায়। এই ধারা অনুযায়ী সম অবস্থায় যারা থাকবেন সরকার তাদের মধ্যে কোন বৈষম্য করতে পারবে না, বা তাদের কাউকে সমান সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৮. সভা-সমিতি গঠনের অধিকার

মার্কিন সংবিধানে বা অধিকারের দলিলের কোথাও সভা-সমিতি গঠনের অধিকারের (Right to form association) কথা বলা হয়নি। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট ১৯৫৮ সালে *NAACP vs Albama* মামলায় বলেছে যে, সংবিধানে সভা-সমিতি গঠনের অধিকারের কথা নির্দিষ্টভাবে বলা না হলেও এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সংবিধান যে স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করছে তা থেকে সভা-সমিতির গঠনের অধিকারকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং এই অধিকারটি মার্কিন নাগরিক অধিকারের অঙ্গ। তবে অন্যান্য অধিকারের মত এই অধিকারটিও চরম অধিকার নয়। বর্তমান শতকের চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে মার্কিন উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সভা-সমিতি গঠনের অধিকার হরণ করে কংগ্রেস বিভিন্ন আইন রচনা করে। ১৯৫৪ সালে *Communist Control Act* পাশ করে কমিউনিস্টদের সভা-সমিতির ওপরে বিধিনিষেধ আরোপ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

খ. পদ্ধতিগত অধিকার (Procedural Rights)

এবারে কয়েকটি পদ্ধতিগত অধিকার আলোচনা করা হল ঃ

১. দুবার শাস্তিদান এবং নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেবার অধিকার

পঞ্চম সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্যে

দুবার শাস্তি দেওয়া যাবে না। তাছাড়া বলা হয়েছে, ফৌজদারী মামলায় জড়িত কোন আসামীকে তার নিজের বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না এবং আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি ছাড়া তার প্রাণ ও স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না।

১০. জুরি এবং আইনজীবীর সাহায্য পাবার অধিকার

মার্কিন সংবিধানে জুরির সাহায্য পাবার অধিকার স্বীকৃত। এ সম্পর্কে পঞ্চম সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে জুরির (Jury) লিখিত অভিযোগপত্র ছাড়া কোন ব্যক্তিকে কোন মারাত্মক বা ঘৃণ্য অপরাধের জন্যে অভিযুক্ত করা চলবে না।

ষষ্ঠ সংশোধনীতে বলা হয়েছে, ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রকাশ্য ও দ্রুত বিচার চাওয়ার অধিকার থাকবে এবং এই বিচার হবে যেখানে অপরাধ ঘটেছে সেই জেলার এবং রাজ্যের জুরিদের দ্বারা।

সপ্তম সংশোধনীতে বলা হয়েছে, দেশের প্রচলিত আইনে যেসব মামলা দায়ের করা হয়, সেই সকল মামলার বিবাদী বিষয়ের মূল্য যদি বিশ ডলারের বেশী হয়, তবে সেই সকল মামলার অভিযুক্তের জুরির বিচার পাবার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে। মামলার যে বিষয়গুলো সম্বন্ধে জুরিরা একবার বিবেচনা করেছেন, সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের কোন আদালত আর পুনর্বিবেচনা করতে পারবে না যদি না প্রচলিত আইনে ঐ পুনর্বিবেচনা সম্বন্ধে কোন নির্দেশ থাকে। অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজীবী নিয়োগ করতে পারবে এবং আইনজীবীর সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পাববে।

১১ বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ লেখ সংক্রান্ত অধিকার

মার্কিন নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণের লেখ সংক্রান্ত অধিকার (Rights to the Writ of Habeas Corpus একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত অধিকার। কাকেও আটক বা গ্রেপ্তার করা হলে আটকের কারণ জানা, আটক ব্যক্তিকে সশরীরে আদালতে উপস্থিত করার নির্দেশ দান এবং কাউকে বে-আইনী-ভাবে আটক করা হলে মুক্তি দিতে নির্দেশ দান আদালত করতে পারে বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ লেখ অনুসারে। তবে জননিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনে এই লেখ সংক্রান্ত অধিকার সীমিত করা যায়।

সমালোচনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের জন্য যে সকল অধিকার ও স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা হয়েছে বিভিন্ন কারণে তার সমালোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্থনীতিক অধিকার বলতে সম্পত্তির অধিকারকে বোঝান হয় এবং এই সম্পত্তির অধিকারকে সংরক্ষণের ব্যাপারে মার্কিন সংবিধান এবং বিচারালয়ের নিরলস প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সম্পত্তির অধিকারের বিরুদ্ধে কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ না করে ঐ অধিকারকে চরম অধিকারে পরিণত করা হয়েছে। বস্তুত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার

বৈশিষ্ট্যই হ'ল নিয়ন্ত্রণহীন উদ্যোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সম্পত্তির অধিকার। কিন্তু চরমভাবে এই অধিকারকে সংরক্ষণের অর্থ হ'ল শোষণ-ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়া এবং যাদের সম্পত্তি আছে সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে অন্যকে শোষণ করে সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করা। অন্যদিকে সম্পত্তির অধিকার ছাড়া অন্য কোন অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত না হবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চাকরির অধিকার, জীবন ধারণের জন্য পর্যাপ্ত বেতন পাবার অধিকার ইত্যাদি সংবিধানে স্বীকৃত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা এবং স্বদেশে পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দেওয়ায় বিভিন্ন সময়ে মার্কিন সরকার বিভিন্ন আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশ জারী করে নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপরে আঘাত হেনেছে এবং ঐগুলোকে সীমিত করেছে। বর্তমান শতকের চল্লিশের দশকে, এবং বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে ম্যাকার্থীবাদের (McCarthyism) যুগে আনুগত্য আদায়ের নামে নাগরিকদের অধিকারকে দলিত করা হয়েছে। যাঁরা মার্কিন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মার্কিন আগ্রাসী নীতির বিরোধিতা করেন তাঁদের দমন করার জন্যে *Smith Act* (১৯৪০), *McCarran Act* (১৯৫০), *Communist Control Act* (১৯৫৪) প্রভৃতি আইন পাশ করে একশ্রেণীর নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতাকে হরণ বা সীমিত করা হয়।

তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অশ্বেতকায় নিগ্রোদের জন্যে অধিকার ও স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত তো করা হয়ইনি, বরং তাদের প্রতি বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। নিগ্রোদের মধ্যে যারা ক্রীতদাস ছিল তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করা হয়নি, এমনকি ক্রীতদাস নয় এমন অনেক নিগ্রোকেও নাগরিকতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। বহুদিন ধরে নিগ্রোদের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। আইনের চোখে সমতার কথা বলা হলেও ট্রেনের একই কামরায় শ্বেতকায়দের সঙ্গে অশ্বেতকায়দের যাতায়াত করা নিষিদ্ধ ছিল। কোন কোন বিশেষ স্কুলে শ্বেতকায়দের ভর্তি, দক্ষিণ আমেরিকায় নিগ্রোদের ভোটাধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদির ব্যাপারে হস্তক্ষেপে আদালত অক্ষমতা জ্ঞাপন করে (১৯০৩)। বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায়দের জন্যে আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা আদালত অনুমোদন করে। নিগ্রোদের কাছে সম্পত্তি বিক্রয় বন্ধের প্রতিবিধানে আদালত অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছে। বর্তমানেও এই সকল ব্যবস্থার খুব বেশী প্রতিকার হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদালত এবং প্রশাসন বৈষম্যমূলক আচরণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রতিবিধান করেছে—কিন্তু তা খুব বেশী অর্থবহ হয়ে ওঠেনি। অ্যালেন পটার তাই যথার্থই বলেছেন, *None of these decisions helped the Negroes very much in practice. Separate facilities were still not in fact equal ; Negroes were prevented from voting by a number of legal devices and by social pressure and in 1926 the court refused to dis-*

turb the right of private persons to enter into restrictive covenants barring the sale or lease of property to Negroes.[১]

সমালোচনাকে আর দীর্ঘায়িত না করে বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিকারের দলিল সহ (Bill of Rights) অন্যান্য যে সকল অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা হয়েছে তা সর্বশ্রেণীর নাগরিকদের জন্য সমানভাবে সংরক্ষিত নয়। অন্যান্যদের জন্য যা সংরক্ষিত করা হয়েছে তাও পুঁজিবাদী স্বার্থ ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে যতক্ষণ পর্যন্ত সংঘাত সৃষ্টি না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীকৃত—কিন্তু পুঁজিবাদী স্বার্থের সঙ্গে যেখানেই অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধ দেখা দিয়েছে সেখানেই কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে বা প্রশাসন নির্দেশ জারী করে বা বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের দ্বারা অধিকার এবং স্বাধীনতার ওপরে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা বাঁচাবার জন্য এটা অপরিহার্য।

১. *American Governments and Politics*, Allen, M. Potter. P. 285

৭ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা
Federal Legislature

এক ঃ মার্কিন কংগ্রেস (The American Congress)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কংগ্রেস নামে অভিহিত। মার্কিন কংগ্রেস একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়। মার্কিন কেন্দ্রীয় আইনসভা কংগ্রেস, দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত—প্রথম বা নিম্ন কক্ষের নাম প্রতিনিধিসভা এবং দ্বিতীয় বা উচ্চ কক্ষের নাম সিনেট।

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নিম্ন কক্ষ বা প্রথম কক্ষ বিভিন্ন রাজ্যের লোকসংখ্যা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল রাজ্যের লোকসংখ্যা বেশী সেই সকল রাজ্য লোকসংখ্যার ভিত্তিতে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি নিম্ন বা প্রথম কক্ষে পাঠায়। আর যে সকল রাজ্যের লোকসংখ্যা কম সে সকল রাজ্য কম সংখ্যক প্রতিনিধি নিম্নকক্ষে পাঠায়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, নেভাদা, ডেলা-ওয়্যার, উত্তর ডাকোটা, আলাস্কা, ভারমণ্ট প্রভৃতি রাজ্য যেখানে নিম্নকক্ষে মাত্র একজন করে প্রতিনিধি পাঠায় সেক্ষেত্রে একমাত্র ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি সভায় ৪৩ জন প্রতিনিধি পাঠায়।

কিন্তু কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ সিনেট অঙ্গরাজ্যসমূহের সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত। ছোট-বড় প্রতিটি অঙ্গরাজ্য সিনেটে দুইজন করে প্রতিনিধি পাঠায়। বলা হয়, অঙ্গরাজ্যসমূহের সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত হওয়ার ফলে সিনেট অঙ্গরাজ্য গুলির স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারে। শুধু তাই নয়, লোকসংখ্যা, আয়তন, সম্পদ, রাজনৈতিক গুরুত্ব নির্বিশেষে প্রতিটি অঙ্গরাজ্য সমান মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী—এই তত্ত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তিকে আরো শক্তিশালী করে তোলে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট হবে, না দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হবে—এই নিয়ে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিয়েছিল। প্রচলিত 'রাষ্ট্র সমবায়ের শাসনতন্ত্র" (Articles of Confederation) অনুযায়ী যে কংগ্রেস (আইনসভা) গঠিত হয়েছিল তা ছিল এককক্ষবিশিষ্ট। ফলে জনবহুল রাজ্যগুলি, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলি দাবী করেছিল যে গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী জনসংখ্যার ভিত্তিতেই যেন আইনসভা গঠিত হয়। পক্ষান্তরে দাক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি যাদের লোকসংখ্যা অনেক কম ছিল, তারা দাবী করেছিল এমন সাংবিধানিক ব্যবস্থা যাতে রাজ্যগুলির সমান মর্যাদা ও অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। এই

দুই পরস্পর বিরোধী দাবীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে স্থির হয় যে, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী একটি কক্ষ জনসংখ্যার ভিত্তিতে গঠিত হবে এবং অপর কক্ষটি গঠিত হবে অঙ্গরাজ্যসমূহের সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে।

কংগ্রেস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যে শ্রেণী উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে, যে শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক, আইন সব সময়ই সেই শ্রেণীর স্বার্থে রচিত হয়। সে শ্রেণীই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীকে সন্ত্রস্ত করতে, তাদের উপর দমন-পীড়ন অব্যাহত রাখতে। বলাবাহুল্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা কংগ্রেসের ওপর নিজেদের প্রাধান্য এমনভাবে বজায় রেখেছে, যাতে কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইন কখনই তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে না যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, ভারসাম্যের নীতি প্রকৃতপক্ষে পুঁজির মালিকদের স্বার্থই রক্ষা করেছে এবং মার্কিন কংগ্রেস ঐ স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে।

দুই : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিসভা (House of Representatives)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষের নাম প্রতিনিধি সভা। ৪৩৫ জন সদস্য নিয়ে প্রতিনিধিসভা গঠিত। অবশ্য যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রবর্তিত হয়, তখন প্রতিনিধি সভায় সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৫ জন। প্রত্যেক দশ বছর অন্তর লোকগণনার পর আবার নতুন করে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যা স্থির করা হয়। জনপ্রতিনিধির সভার সদস্যগণ দু' বছরের জন্য নির্বাচিত হন। জনপ্রতিনিধি সভায় নির্বাচনে কারা ভোট দেবেন, তা স্থির করে অঙ্গরাজ্য। ফলে নির্বাচক হওয়ার যোগ্যতা এবং নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করে। কোন কোন অঙ্গরাজ্য কর প্রদানকে, আবার কোন কোন অঙ্গরাজ্য শিক্ষাগত যোগ্যতাকে ভোটাধিকারের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছে। তবে সংবিধানের পঞ্চদশ ও উনবিংশ সংশোধন আইনে বলা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেবলমাত্র জাতি, বর্ণ, নারীত্ব বা পূর্ব দাসত্বের অজুহাতে কোন নাগরিককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। ১৯৬৩ সালে সংবিধানের চব্বিশতম সংশোধনে বলা হয়েছে যে, কর প্রদানে অক্ষম—এই অজুহাতে কোন মার্কিন নাগরিককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এইসব কারণে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধি সভার ক্ষেত্রে প্রকৃত পক্ষে সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বর্তমানে ১৮ বৎসর বয়স্ক যে কোন মার্কিন নাগরিক প্রতিনিধি সভার সদস্য নির্বাচনে ভোট দিতে পারে। প্রতিনিধি সভার সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যকে কয়েকটি নির্বাচনী জেলায় ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক জেলা থেকে একজন করে প্রতিনিধি প্রতিনিধি সভায় নির্বাচিত হন।

গঠন

১৯৬৪ সালে সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করে যে সংবিধানের ১ নং ধারা অনুযায়ী নির্বাচনী জেলাগুলির লোকসংখ্যায় সমতা বজায় থাকা প্রয়োজন। অবশ্য এই

নির্বাচনী জেলাগুলির সীমানা নির্ধারণ করা এক জটিল ব্যাপার। রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, জাতিগত, বর্ণগত, দলীয় আনুগত্য ইত্যাদি নানারকম বিষয় বিবেচনা করে নির্বাচনী জেলা নির্ধারণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, যেখানে একমাত্র ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য ৪৩ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করে; সেখানে নেভাদা, আলাস্কা, ডেলাওয়ার, উত্তর ডাকোটা, ভারমণ্ট প্রভৃতি রাজ্য একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করে।

যোগ্যতা

প্রতিনিধি সভায় সদস্য নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রার্থীদের কতগুলি যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়। প্রথমত, নির্বাচন প্রার্থীকে অন্তত পঁচিশ বছর বয়স্ক হতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাঁকে কমপক্ষে সাত বছরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে। তৃতীয়ত, তিনি যে অঙ্গরাজ্য থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, তাঁকে সেই রাজ্যে বসবাস করতে হবে। চতুর্থত, কোন সরকারি কর্মচারী সাধারণত কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন না।

সংবিধানে বলা হয়েছে যে, প্রতিনিধি সভার সদস্যগণ আইন অনুযায়ী তাঁদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি পাবেন। এখন সদস্যগণ বছরে ৫৭,৫০০ ডলার বেতন ছাড়াও অন্যান্য ভাতা পান। সভাকক্ষে সদস্যগণ পূর্ণ বাক্‌স্বাধীনতা ভোগ করেন, এবং সভাকক্ষে কিছু বলার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে কোন অভিযোগ আনা যায় না। প্রতিনিধি সভার অধিবেশনের সময় কোন সদস্যকে দেওয়ানী অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা যায় না। ফৌজদারী অপরাধের অভিযোগে অবশ্য কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা যায়। মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যগণ যে বিপুল পরিমাণ বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পান তা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখা যায় না।

প্রতিনিধি সভার অধিবেশন বছরে অন্তত একবার আহ্বান করতে হয়। সাধারণত প্রতি বছর ৩রা জানুয়ারি সভার অধিবেশন বসে এবং ৩১শে জুলাই পর্যন্ত চলে। একই সঙ্গে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের অধিবেশন শেষ হয়। রাষ্ট্রপতি যে কোন সময় প্রতিনিধি সভার বিশেষ অধিবেশন ডাকতে পারেন। তাছাড়া ১৯৪৩ সালের একটি প্রস্তাব অনুযায়ী সিনেটের সভাপতি, প্রতিনিধি সভার স্পীকার কিংবা সিনেট ও প্রতিনিধি সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু দলের নেতৃদ্বয় বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন। প্রতিনিধি সভায় সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে স্পীকার হিসাবে নির্বাচিত করেন। স্পীকার সভার কাজ পরিচালনা করেন এবং শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। অন্যান্য দেশের আইনসভার মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভাও কতকগুলি কমিটির মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী

(১) প্রতিনিধি সভার প্রধান কাজ হল কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হিসাবে বিভিন্ন বিল পাশ করা। অর্থবিল সবসময়ই প্রথমে প্রতিনিধি সভায় উপস্থাপিত করা হয়। তবে প্রতিটি বিল পাশের জন্য কংগ্রেসের উভয় কক্ষের সম্মতি প্রয়োজন। কোন বিলকে

কেন্দ্র করে যদি সিনেট ও প্রতিনিধি সভার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে উভয় কক্ষের সমসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত কনফারেন্স কমিটি বিষয়টির নিষ্পত্তি করে।

(২) সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রেও প্রতিনিধি সভা এবং সিনেট সমান ক্ষমতা ভোগ করে।

(৩) নতুন কোন অঙ্গরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে সিনেটের মত প্রতিনিধি সভার সম্মতিও প্রয়োজন।

(৪) রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিনিধি সভাই ইমপিচমেণ্ট প্রস্তাব আনতে পারে। কিন্তু এই ইমপিচমেণ্ট প্রস্তাবের বিচার করে সিনেট।

(৫) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোন প্রার্থী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলে প্রতিনিধি সভা প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে প্রথম তিনজন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচন করতে পারে।

(৬) সভার কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নিয়মকানুন প্রতিনিধি সভা নিজেই প্রণয়ন করে।

কিন্তু কংগ্রেসের উভয় কক্ষের ক্ষমতা ও কাজের একটি তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেট নিম্নকক্ষের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটকে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ বলে অভিহিত করা হয়।

তিন: জনপ্রতিনিধিসভার অধ্যক্ষ বা স্পীকার (The Speaker of the House of Representatives)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধি সভায় সভাপতিত্ব করেন স্পীকার। ব্রিটিশ কমন্স সভার অনুকরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি সভার কাজ পরিচালনা করেন স্পীকার। স্পীকার প্রতিনিধি সভার সদস্যের দ্বারা দু' বছরের জন্য নির্বাচিত হন। নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। ফলে প্রতিনিধিসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রার্থীই সাধারণত স্পীকার পদে নির্বাচিত হন। ব্রিটেনে স্পীকার নির্বাচনের পর তিনি দলের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তিনি কোন দলীয় সভায় উপস্থিত হন না, দলীয় ভোট-সভায় যোগ দেন না বা কোন দলীয় বৈঠকে বক্তৃতা করেন না। তিনি সম্পূর্ণ দলনিরপেক্ষ আচরণ করেন এবং নিরপেক্ষভাবে সভার কাজ পরিচালনা করেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধি সভার স্পীকার আদৌ দলনিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারেন না। বরং তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবেই কাজ করেন। রাষ্ট্রপতি ও প্রতিনিধি সভার মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেন স্পীকার। বলা হয়, সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভার সঙ্গে সংসদের সম্পর্ক অনেক গভীর হয়। মন্ত্রীরাই সেখানে আইনসভার

পদের প্রকৃতি

নেতা হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রীরা আইনসভায় উপস্থিত থাকতে পারেন না। ফলে প্রশাসনের মুখপাত্র হিসাবে স্পীকারকেই কাজ করতে হয়। এক কথায় বলা যায় যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধিসভাব স্পীকার অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে কাজ করেন। স্পীকার প্রতিনিধি সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রয়োজন বোধ করলে ভোটও দেন।

স্পীকারের ক্ষমতা

মার্কিন প্রতিনিধি সভার স্পীকার প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনীতিবিদ্ হিসাবে পরিচিত। উনিশ শতকে স্পীকারের ক্ষমতা এত ব্যাপক ছিল যে তাঁকে অনেক সময় জার (Czar) নামে অভিহিত করা হত। স্পীকার টমাস রীড জার রীড নামেই পরিচিত ছিলেন। হেনরী ক্লে, যোসেফ ক্যানন, টমাস রীড প্রমুখ স্পীকারেরা যে ক্ষমতা ভোগ করতেন, এখন অবশ্য স্পীকাররা সেই ক্ষমতা ভোগ করেন না। কিন্তু এখনও মার্কিন কংগ্রেসে স্পীকারই সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। উনিশ শতকে স্পীকারের যারা অনুগ্রহভাজন হতেন, তারাই একমাত্র সভাকক্ষে বসার অধিকার ভোগ করতেন। স্পীকারই সব কমিটির সদস্যদের মনোনয়ন করতেন। বিধি কমিটির (Rules Committee) চেয়ারম্যান হিসাবে বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও তিনি অপরিসীম ক্ষমতা ভোগ করতেন।

কিন্তু ১৯১০-১১ সালে স্পীকারের প্রভুত্ব ও যথেচ্ছারের বিরুদ্ধে রিপাবলিকান দলের এক শক্তিশালী অংশ ডেমোক্রেটিক দলের এক অংশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে স্পীকারের ক্ষমতা অনেক হ্রাস পায়। বিভিন্ন কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে, কিংবা রুলস কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি যে অপ্রতিহত ক্ষমতা ভোগ করতেন তার অবসান ঘটে। স্পীকার মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি সভার প্রধান হিসাবে সভার কাজ পরিচালনা করেন। সভার আলোচ্যসূচী নির্ধারণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সদস্যদের বক্তৃতাদানের জন্য তিনি অনুমতি দেন এবং তাঁদের সময় সীমা স্থির করে দেন। বক্তব্য পেশ করা, প্রস্তাব উত্থাপন করা, সংশোধন দাবী করা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্পীকারের অনুমতি প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, বক্তব্য পেশ করতে অনুমতি দানের সময় স্পীকার নিজের দলের সদস্যদের প্রতি কিছুটা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু যেহেতু স্পীকারকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে কাজ করতে হয়, ফলে তাঁর দলীয় পক্ষপাতিত্ব এখন সকলেই মেনে নিয়েছেন। কার্যবিধি অনুযায়ী প্রতিনিধি সভার স্পীকারের আর একটি কাজ হল সভার কাজ পরিচালনা করা। যদি কোন নিয়ম বা বিধি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে স্পীকারের ব্যাখ্যা সভা মেনে নেয়। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে যদিও স্পীকারের রুলিং বা ব্যাখ্যা বাতিল করা যায়, কিন্তু কদাচিৎ এরকম ঘটনা ঘটে। স্পীকার সভায় উপস্থাপিত বিলগুলি আরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা ও সংশোধনের জন্য

বিভিন্ন কমিটিতে পাঠান। যদিও এখন সভার ক্লার্ক মোটামুটিভাবে এই কাজ সম্পাদন করেন, কিন্তু এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন স্পীকার।

সভায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রাথমিক দায়িত্ব হল স্পীকারের। সদস্যরা যাতে সভায় যথাযথ আচরণ করেন, যাতে তারা বিশৃঙ্খল আচরণে লিপ্ত না হন, বা অশালীন শব্দ প্রয়োগ না করেন সেদিকে স্পীকার লক্ষ্য রাখেন। তিনি প্রয়োজন-বোধ করলে কোন আপত্তিজনক মন্তব্য সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দিতে পারেন। কোন সদস্য স্পীকারের সতর্কবাণী বা তিরস্কারে কর্ণপাত না করলে স্পীকার তাকে সভা থেকে বহিষ্কার করতে পারেন না। এ বিষয়ে সভার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। অবশ্য প্রতিনিধি সভায় বিশৃঙ্খলা যদি চূড়ান্ত আকার ধারন করে, তাহলে তিনি সভার কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে পারেন।

কিন্তু স্পীকারের ক্ষমতা ও মর্যাদা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতা, বাক্‌পটুতা, চরিত্র ও কর্মদক্ষতার ওপরে। যদি তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব থাকে, তাহলে তিনি দ্রুত ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করতে পারেন এবং সভার কাজকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে পারেন। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে কোন স্পীকার দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটে প্রতিনিধি সভার ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। ব্রিটিশ স্পীকার কখনো এরকমের ক্ষমতা ভোগ করেন না। তবুও ব্রিটিশ স্পীকার যেহেতু কঠোর নিরপেক্ষতার সঙ্গে সভার কাজ পরিচালনা করেন, যেহেতু তিনি পরে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন, এবং যেহেতু তিনি অনেক বছর ধরে স্পীকারের পদে আসীন থাকেন তাই তিনি যে মর্যাদা ভোগ করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পীকার সেই মর্যাদা কখনো ভোগ করেন না।

স্পীকারের ক্ষমতা ও কাজের মূল্যায়ন

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পীকার একই সময়ে দ্বৈত ভূমিকা পালন করেন। একদিকে তিনি প্রতিনিধি সভায় স্পীকার হিসাবে যতদূর সম্ভব নিয়ম অনুযায়ী সভার কাজ পরিচালনা করেন, সভার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করেন, সদস্যদের বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ দেন এবং অপরদিকে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে চেষ্টা করেন যাতে বিলগুলি দ্রুত প্রতিনিধি সভা অনুমোদন করে, প্রশাসনের নীতিগুলি যাতে সভা সমর্থন করে। প্রতিনিধি সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের প্রথম দু-তিনজনের মধ্যে তিনি অন্যতম। সুতরাং তাঁর প্রধান প্রচেষ্টা হল কিভাবে দলীয় কর্মসূচী অনুযায়ী সভার কাজ পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে দলের স্বার্থরক্ষা করা যায়। প্রতিনিধি সভায় সদস্যের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়ায় আইন প্রণয়ন এখন একটি জটিল বিষয়ে পরিণত হওয়ায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সংসদীয় সরকারের মত কঠোর দলীয় ভিত্তিতে পরিচালিত না হয়ে, অনেক শিথিল ও ঢিলেঢালা হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পীকারের ক্ষমতা ব্রিটিশ স্পীকারের তুলনায় অনেক বেশি।

চার : ব্রিটিশ স্পীকার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পীকারের মধ্যে তুলনা (Comparison between British and American Speakers)

মার্কিন প্রতিনিধি সভার স্পীকার ব্রিটিশ কমান্স সভার স্পীকারের মত আইনসভার নিম্নকক্ষের সভাপতি। কিন্তু এঁদের ভূমিকা, কাজ কিংবা পরিচালন পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি।

ব্রিটেনে স্পীকার নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী সাধারণত বিরোধীদলের নেতার সঙ্গে আলোচনা করে একজন সর্বসম্মত প্রার্থী মনোনয়নের চেষ্টা করেন। যদিও সাধারণত প্রধানমন্ত্রী তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে আলোচনায় বসেন, কিন্তু এ বিষয়ে কোন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নেই। যদি কমন্স সভার স্পীকার পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান, তাহলে তাঁকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। নির্বাচনের পরে তাঁকে সাধারণত স্পীকার হিসাবে পুনরায় নির্বাচিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বৃটেনে স্পীকার যতদিন স্পীকার হিসাবে কাজ করতে চান, তাঁকে ততদিন স্পীকার হিসাবে রাখা হয়। যেহেতু স্পীকার দলনিরপেক্ষ হিসাবে কাজ করেন, ফলে ব্রিটেনে এই ব্যবস্থা সফল হয়েছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধি সভায় স্পীকার দলীয় প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন এবং নির্বাচনের পরেও তিনি দলীয় প্রতিনিধিরূপে কাজ করেন।

ব্রিটিশ কমন্সসভার স্পীকার দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তিনি দলের সভায় উপস্থিত হন না, কোন দলীয় ভোজসভায় যোগদান করেন না বা কোন দলীয় সমাবেশে বক্তৃতা দেন না। তিনি দলের উর্ধ্বে থেকে কমন্সসভার কাজ পরিচালনা করেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধি সভার স্পীকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবেই কাজ করেন। তিনি দলীয় রাজনীতির অন্যতম প্রধান মুখপাত্র রূপেই কাজ করেন। ফলে তাঁকে কখনোই দলের উর্ধ্বে দেখা হয় না, বা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না। কমন্সসভা এবং প্রতিনিধিসভার স্পীকার উভয়েই নিজ নিজ সভার কাজ পরিচালনা করেন। সদস্যদের বক্তৃতা দিতে অনুমতি দান করা, সভার শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা, সভায় নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করা, প্রস্তাব উপস্থাপনে অনুমোদন দেওয়া উভয় রাষ্ট্রেই স্পীকারের কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

ব্রিটিশ কমন্সসভার স্পীকার সাধারণত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন না, তাঁর মূল কাজ হল সদস্যদের বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া এবং যদি ভোটের প্রয়োজন হয় তাহলে ভোটের আয়োজন করা। কিন্তু একমাত্র নির্ণায়ক ভোট (casting vote) ছাড়া তিনি কোন ভোট দেন না। আর এই নির্ণায়ক ভোটও তিনি এমনভাবে দেন যাতে আরো আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু প্রতিনিধি সভার স্পীকার

অনেক সময়ই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন এবং ভোট দেন। তিনি সর্বদা দলীয় সদস্য হিসাবে দলের স্বার্থ রক্ষা করে চলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধি সভার স্পীকার আগে যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করতেন, এখন সেই ক্ষমতা আর নেই। আগের মত তিনি আর নিজের মনোমত ব্যক্তিদের দিয়ে কমিটিগুলি গঠন করতে পারেন না। আগের মত তিনি আর ইচ্ছামত সভার কাজ পরিচালনা করতে পারেন না। ১৯১০-১১ সালের বিদ্রোহের ফলে তাঁর ক্ষমতা অনেক হ্রাস পেয়েছে। দলীয় নেতা হিসাবে তাঁর অত্যধিক ক্ষমতা প্রতিনিধি সভার অনেকেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু ব্রিটেনে স্পীকারের ক্ষমতা হ্রাস করার কোন সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। যেহেতু তিনি দলের উর্ধ্বে অবস্থান করেন, যেহেতু তিনি দলের শক্তি বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেন না, ফলে ব্রিটিশ স্পীকারের ক্ষমতা আগের মতই আছে, তাঁর ক্ষমতা হ্রাস করা হয়নি।

ব্রিটেনের স্পীকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পীকারের তুলনায় আর্থিক ক্ষেত্রে অধিকতর ক্ষমতা ভোগ করেন। কোন বিল অর্থ বিল কিনা—এই ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে সেই সন্দেহের নিরশন করেন ব্রিটিশ স্পীকার। যখনই কোন অর্থবিল কমন্সসভা থেকে পাঠান হয় তখন সেই অর্থবিল স্পীকারের স্বাক্ষরযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিনিধি সভায় স্পীকারের এই ক্ষমতা নেই।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্রিটিশ স্পীকার সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ হিসাবে বিবেচিত হন। তাঁর দলনিরপেক্ষতা এবং দীর্ঘদিন একই পদে আসীন থাকা তাঁকে এমন এক গৌরব ও পদমর্যাদা দিয়েছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্পীকার কল্পনাও করতে পারেন না। তিনি রানী ও কমন্সসভার মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেন।

কিন্তু ক্ষমতার দিক থেকে বিবেচনা করলে একথা অনস্বীকার্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভার স্পীকার অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। তিনি একদিকে সভার কাজ পরিচালনা করেন, অন্যদিকে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা। তিনি রাষ্ট্রপতি ও প্রতিনিধি সভার মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেন। তিনি প্রতিনিধি সভার বিতর্কে অংশ গ্রহণ এবং দলীয় নীতি, দলীয় কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভায় তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীনতা থাকায় এবং দল ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল হওয়ার ফলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্পীকারের পক্ষে এতটা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়েছে।

পাঁচ : মার্কিন সিনেট (The American Senate)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেসের উচ্চতর কক্ষের নাম সিনেট (Senate)। অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভার উচ্চতর কক্ষের মর্যাদা বা সম্মান থাকলেও ক্ষমতা নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, যদিও ব্রিটেনের লর্ড সভায় সে দেশের অত্যন্ত প্রাচীন অভিজাত বংশের সন্তানগণ এবং উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকগণ

আসন গ্রহণ করেন, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে লর্ডসভা কমন্সসভার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। প্রথম থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনজীবনে সিনেট এক বিশেষ মর্যাদা ভোগ করে আসছে। বিশেষ করে যখন রাজ্যগুলি নিজেদের ক্ষমতা বা মর্যাদা সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল, তখন সিনেটের সদস্যগণ নিজ নিজ রাজ্যের মহিমান্বিত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতেন। পরবর্তীকালে যদিও পৃথিবীর সর্বত্র আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষের ক্ষমতা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু সিনেটের ক্ষমতা বা মর্যাদা আদৌ কমেনি বরং তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে সারা পৃথিবীতে মার্কিন সিনেটের মত শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ আর নেই।

অঙ্গরাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সিনেট গঠিত হয়। প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে মোট দুজন করে প্রতিনিধি সিনেটে নির্বাচিত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্য থাকায় সিনেটের মোট সদস্য সংখ্যা এখন ১০০ জন। সংবিধানে একথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন অঙ্গরাজ্যের সম্মতি ছাড়া সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যকে সমপ্রতিনিধিত্বের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা চলবে না।

গঠন

এই সমপ্রতিনিধিত্বের অধিকার রাজ্যগুলির সমান অধিকার ও মর্যাদার তত্ত্বকে শক্তিশালী করেছে। যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন, ফলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও জনবহুল রাজ্যগুলির প্রতিনিধিরাও সিনেটে যথেষ্ট মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করেন। সিনেটের সদস্যগণ সাধারণত নিজ নিজ রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে স্বাধীনভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত। অবশ্য অনেকে এই সমপ্রতিনিধিত্বের নীতিকে গণতন্ত্র বিরোধী বলে মনে করেন। তাঁদের মতে নিউইয়র্ক রাজ্যের জনসংখ্যা নেভাদার একশগুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও নিউইয়র্ক এবং নেভাদা সিনেটে সমসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠায়। শুধু তাই নয়, হাওয়াই, আলাস্কাসহ কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যের জনসংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার মোট এক-পঞ্চমাংশ হওয়া সত্ত্বেও তারা অর্ধেকের বেশি প্রতিনিধি পাঠায়। আপাতদৃষ্টিতে গণতন্ত্রবিরোধী বলে মনে হলেও এই সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে এবং অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাধিকার রক্ষা করেছে।

সিনেটের সদস্য হিসাবে নির্বাচন প্রার্থীদের নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। প্রথমত, নির্বাচন প্রার্থীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাঁকে কমপক্ষে ত্রিশ বছর বয়স্ক হতে হবে। তৃতীয়ত, তিনি যে অঙ্গরাজ্য থেকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াবেন, তাঁকে সেই অঙ্গরাজ্যে অন্তত ন'বছর বসবাস করতে হবে। এই ন'বছরের বসবাসের ওপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। চতুর্থত, কোন আদালতের দ্বারা তিনি পাগল, দেউলিয়া, খুনী বা বিকৃতমস্তিষ্ক বলে ঘোষিত হলে চলবে না। পঞ্চমত, তিনি যেন সরকারি কর্মচারী না হন কিংবা সরকারের সঙ্গে লাভজনক সম্পর্কে আবদ্ধ না হন।

সদস্যপদের যোগ্যতা

সংবিধান প্রণেতারা প্রথমে স্থির করেছিলেন যে, সিনেটের সদস্যরা অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, সিনেটের সদস্যরা অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হলে অঙ্গরাজ্যের সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক অনেক বেশি নিবিড় হবে। তাছাড়া সংবিধান প্রণেতারা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচন অপেক্ষা আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচন পদ্ধতিকে অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। কিন্তু এই পরোক্ষ নির্বাচনে পরে নানারকম দুর্নীতি দেখা দেয়। দলপ্রথা উদ্ভবের ফলেও এর কার্যকারিতা হ্রাস পায়। ফলে ১৯১৩ সালে সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনের ফলে সিনেটের সদস্যগণ এখন অঙ্গরাজ্যগুলির ভোটদাতাগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

নির্বাচন

সিনেট একটি স্থায়ী সংস্থা তবে এর প্রত্যেক সদস্যের কার্যকাল ছ'বৎসর। প্রতি দুই বছর অন্তর সিনেটের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্য পদত্যাগী সদস্যগণ পুনরায় নির্বাচন প্রার্থী হতে পারেন। সদস্যরা এমনভাবে অবসর গ্রহণ করেন, যাতে একই সময়ে এক অঙ্গরাজ্য থেকে দুজন সদস্যের পদ খালি না হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক সিনেট সদস্য যাতে রাজ্যের সমস্ত ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হতে পারেন, তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে সিনেটের প্রত্যেক সদস্য দাবী ক'রতে পারেন যে তিনি সমগ্র অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি। সিনেটের সদস্যগণ জনপ্রতিনিধি সভার সদস্যদের মত বছরে একটি সুনির্দিষ্ট বেতন ও ভাতা পান।

কার্যকাল

সিনেটের সভায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি সভাপতিত্ব করেন। তবে তিনি সাধারণত সভার কাজ পরিচালনা করেন, কিন্তু কোন বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন না বা ভোট দেন না। কেবলমাত্র যদি কোন বিষয়ে পক্ষে এবং বিপক্ষে সমান ভোট হয়, তাহলে তিনি একটি নির্ণায়ক ভোট দিতে পারেন। জনপ্রতিনিধি সভার মত সিনেটও কতগুলি কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটিগুলির মাধ্যমে সিনেট অনেক বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও গভীরভাবে নিজের দায়িত্বভার পালন করে। সিনেটের অধিবেশন সাধারণত জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হয়।

সভাপতি

সিনেট কি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ বলে অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন কারণে বিগত দুশো বছরে সিনেটের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে মার্কিন সিনেটের যে ক্ষমতা তা পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রের আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষের নেই। সিনেটের শক্তির ব্যাপ্তি বোঝার জন্য এর ক্ষমতা ও কাজ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

সিনেটের ক্ষমতা ও কাজ

(১) প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত যে কোন আইন সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। তাই যে কোন বিল জনপ্রতিনিধি সভায় গৃহীত

সিনেটেও উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। একথা ঠিক যে, অর্থবিল প্রথমে জনপ্রতিনিধি সভায় উপস্থাপিত করতে হয়। কিন্তু সিনেট অর্থবিলের শিরোনাম ছাড়া বাকী যে কোন অংশের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে।

(২) মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী শাসনবিভাগ বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সন্ধি, চুক্তি বা কোন আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে আলোচনা করে এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ঐ সকল সন্ধি, চুক্তি বা আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা সিনেটের অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হয়। সাধারণত রাষ্ট্রপতি যে সকল সন্ধি বা চুক্তি সম্পাদনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, সিনেট সেগুলি দুই তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে অনুমোদন করে। কিন্তু ভার্সাই চুক্তির মতো আন্তর্জাতিক সন্ধিকেও মার্কিন সিনেট প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই এখন রাষ্ট্রপতি কোন সন্ধি বা চুক্তির খসড়া সিনেটে পেশ করার আগেই দলনেতাদের সঙ্গে ভাল করে আলোচনা করে নেন, তাদের নৈশভোজে আপ্যায়িত করে প্রভাবিত করেন। ফলে সিনেট সাধারণত কোন সন্ধি বা চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে না, যদিও প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা সিনেট ভোগ করে।

(৩) সিনেট রাষ্ট্রপতির নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতাকে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সরকারি কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে সিনেটের অনুমোদন নিতে হয়। সাধারণত নিয়োগের আগে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ সিনেটের নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটির কাছে পেশ করা হয়। সেই কমিটি অনুমোদন করলে সিনেট সাধারণত কোন নিয়োগে আপত্তি জানায় না। প্রথা অনুযায়ী যদি রাষ্ট্রপতি নিজের দলভুক্ত সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করেন, তাহলেই সিনেট রাষ্ট্রপতির সুপারিশ মেনে নেয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় কোন অঙ্গরাজ্যে উচ্চপদস্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারী কর্মচারী নিয়োগের সময় যদি রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যের কোন সিনেটরের সঙ্গে পরামর্শ করে নেন, তাহলেও সিনেট এই অনুমোদন দিতে অস্বীকার করে না। একে বলা হয় সিনেটের ভদ্রতা। কিন্তু যদি রাষ্ট্রপতি নিজের দলীয় সদস্যের সঙ্গেও আলোচনা না করেন, তাহলে অনেক সময় সিনেট রাষ্ট্রপতির নিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ অনুমোদন করতে অস্বীকার করে। রাষ্ট্রপতি নিকসনের সময় একাধিকবার এই ঘটনা ঘটেছিল। কিংবা সিনেট যদি মনে করে যে অযোগ্য ব্যক্তির নাম সুপারিশ করা হয়েছে, তাহলেও সিনেট অনেক সময় ঐ নিয়োগ অনুমোদন করতে অস্বীকার করে।

(৪) সিনেট শাসনবিভাগের যে কোন বিষয় সম্পর্কে তদন্ত বা অনুসন্ধান করার জন্য কমিটি নিয়োগ করতে পারে। এই সব তদন্ত বা অনুসন্ধান কমিটি যে কোন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করতে পারে, প্রকাশ্য শুনানীর ব্যবস্থা করতে পারে, যে কোন সরকারি নথিপত্র তলব করতে পারে। ফলে সরকারি কর্মচারীরা এই সব তদন্ত কমিটি সম্পর্কে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত থাকে। দেখা গিয়েছে যে, সিনেটের ঐ সব তদন্ত কমিটির প্রচেষ্টায় বহু দুর্নীতি, স্বজনপোষণ কিংবা তহবিল তছরুপের ঘটনা জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং দোষী সরকারি কর্মচারীর শাস্তি হয়েছে।

(৫) উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোন প্রার্থী যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভে ব্যর্থ হন, তাহলে অধিক সংখ্যক ভোট পেয়েছেন এই রকম প্রার্থীদের মধ্য থেকে সিনেট একজনকে উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচন করতে পারে।

(৬) সিনেট রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি কিংবা কোন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনা ইমপিচমেণ্ট বা অভিযোগের বিচার করে। এই ইমপিচমেণ্ট প্রস্তাব বা মহা অভিযোগ জনপ্রতিনিধি সভা সিনেটের কাছে পেশ করে। সিনেট দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। যখন সিনেট কোন ইমপিচমেণ্ট প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে, তখন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন।

(৭) সিনেট যে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করতে পারে। সাধারণত রাষ্ট্রপতিরা সিনেটের এই অনুরোধ মেনে চলেন। কারণ, সিনেটের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিরা সহজে নিতে চান না। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের সিনেটের অনুমোদন নিয়ে কাজ করতে হয়।

সিনেটের ক্ষমতার তুলনামূলক পর্যালোচনা

মার্কিন সিনেটের উপরোক্ত ক্ষমতাগুলোর প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষগুলির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলেই সিনেটের ক্ষমতা সহজেই উপলব্ধি করা যায় এবং দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতের রাজ্যসভার অর্থবিল সংশোধনের কোন ক্ষমতা নেই, কিংবা চোদ্দ দিনের বেশি অর্থবিল ধরে রাখার ক্ষমতা নেই। ১৪ দিনের মধ্যে অর্থবিল লোকসভায় ফেরত না পাঠালে লোকসভা একতরফা ভাবে ঘোষণা করতে পারে যে অর্থবিল পার্লামেণ্ট গ্রহণ করেছে এবং অর্থবিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠান হল। কোন বিল অর্থবিল কিনা এবিষয়ে সন্দেহের নিরসনের জন্য লোকসভার স্পীকারের সার্টিফিকেটই যথেষ্ট। যদি কোন বিল পাশ করা নিয়ে লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি উভয়-কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন ডাকতে পারেন এবং এই যুগ্ম অধিবেশনে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। যেহেতু লোকসভার সদস্য সংখ্যা রাজ্যসভার দ্বিগুণেরও বেশি, সেজন্য এসব ক্ষেত্রে লোকসভার সিদ্ধান্তই জয়ী হয়। ভারতে মন্ত্রিপরিষদ যেভাবে লোকসভার কাছে দায়ী, রাজ্যসভার কাছে নয়। রাজ্যসভার সদস্যগণ হয় পরোক্ষভাবে নির্বাচিত, নয়তো মনোনীত। এই পরোক্ষ নির্বাচন বা মনোনীত হবার জন্য রাজ্যসভার সদস্যদের ক্ষমতা বা প্রভাব কিছুটা কম। কিন্তু মার্কিন সিনেটের সদস্যদের ক্ষমতা ও প্রভাব অনেক বেশী। আরো মনে রাখা প্রয়োজন যে, অঙ্গরাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে রাজ্যসভা গঠিত নয়। ফলে রাজ্যসভা

ভারত

ঠিক মার্কিন সিনেটের মত রাজ্যগুলোর স্বার্থের রক্ষক (champion of state rights) হিসাবে কাজ করতে পারে না।

একথা ঠিক যে তত্ত্বগতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে আইনসভার উভয় কক্ষই সমান ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনসভার অধিবেশন বছরে মাত্র ২০ দিন থেকে ২৪ দিন অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু সেখানে আইনসভায় কোন বিরোধী দল নেই এবং যেহেতু আইনসভা মূলত একটি অনুমোদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করে, তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতিপুঞ্জের সোভিয়েত তত্ত্বগতভাবে অনেক ক্ষমতায় অধিকারী হলেও, মার্কিন সিনেটের মত প্রশাসনে বা জনজীবনে দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

কানাডায়ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। উচ্চকক্ষের নাম সিনেট এবং নিম্নকক্ষের নাম কমন্সসভা (House of Commons)। কিন্তু কানাডায় সিনেটের ক্ষমতা বা মর্যাদা মার্কিন সিনেটের চেয়ে অনেক কম। কারণ কানাডায় সিনেট মূলত মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত। সিনেটের সদস্যগণ গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হন এবং তাঁরা সারা জীবনের জন্য সদস্য হিসাবে কাজ করেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই সেখানে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমন্সসভার তুলনায় সিনেটের ক্ষমতা বা মর্যাদা অনেক কম।

কানাডা

ব্রিটিশ লর্ডসভার সঙ্গে তুলনা করলেও দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট লর্ডসভার তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। সিনেটের সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত, কিন্তু লর্ডসভার সদস্যগণ হয় বংশানুক্রমিক ভাবে নয়তো উপাধি লাভ করে লর্ডসভার সদস্যপদ লাভ করেন। যদিও কোন বিল আইনে পরিণত হওয়ার আগে উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু বাস্তবে কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত কোন বিল লর্ডসভা এক বছরের বেশি আটকে রাখতে পারে না। কোন সাধারণ বিল যদি পর পর দুবার কমন্সসভা কর্তৃক গৃহীত হয় এবং যদি প্রথম অধিবেশনে বিলটির দ্বিতীয় পাঠ ও দ্বিতীয় অধিবেশনে বিলটির তৃতীয় পাঠের মধ্যে সময়ের ব্যবধান এক বছর হয় তাহলে লর্ডসভার সম্মতি ছাড়াই বিলটি রানীর অনুমোদনের জন্য পাঠান যায়।

ব্রিটেন

অর্থবিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভার বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই। অর্থবিলের কোন ধারা সংশোধন করার ক্ষমতা লর্ডসভার নেই। কমন্স সভায় প্রথমে অর্থবিল উপস্থাপিত হয়। পরে অর্থবিল লর্ডসভায় মাত্র ৩০ দিনের জন্য আলোচনার উদ্দেশ্যে পাঠান হয়। যদি লর্ডসভা ৩০ দিনের মধ্যে বিল ফেরত না পাঠায়, তাহলে কমন্সসভা একতরফা ভাবে ঘোষণা করতে পারে যে পার্লামেন্ট অর্থবিল গ্রহণ করেছে। কিন্তু মার্কিন সিনেট অর্থবিলের শিরোনামাট ছাড়া বাদবাকী সব কিছুই পরিবর্তন করতে পারে।

সিনেট প্রশাসন ব্যবস্থাকে বিভিন্ন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তদন্ত কমিটি গঠন করে কোন সন্ধি বা চুক্তি অগ্রাহ্য করে, বিভিন্ন নিয়োগ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ অনুমোদন করে বা অগ্রাহ্য করে, এবং সর্বোপরি আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি বা হ্রাস করে সিনেট শাসন বিভাগ বা প্রশাসনকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু ব্রিটেনে মন্ত্রিসভার সদস্যরা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে লর্ডসভার কাছে দায়ী থাকে না। অবশ্য বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা সিনেটের তুলনায় লর্ডসভার কিছুটা বেশি। লর্ডসভা ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসেবে কাজ করে। তা সত্ত্বেও বলা যায় সিনেটের তুলনায় ব্রিটেনের লর্ডসভার ক্ষমতা অনেক কম।

সিনেটের শক্তিবৃদ্ধির কারণ

মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সিনেটের শক্তিবৃদ্ধির কারণগুলো পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

(১) বিভিন্ন কারণে সিনেটের ক্ষমতা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। সিনেট অপেক্ষাকৃত-ভাবে একটি ক্ষুদ্রতর সংস্থা হওয়ার জন্য এর সদস্যরা অনেক বেশি কার্যকরভাবে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন। মাত্র একশ জন সদস্য নিয়ে গঠিত সিনেট জনপ্রতিনিধি সভা অপেক্ষা অনেক বেশি সাফল্যের সঙ্গে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। আরো দেখা যায় যে, ভারতের রাজ্যসভা, সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতিপুঞ্জের সোভিয়েত কিংবা ব্রিটিশ লর্ডসভা সিনেটের তুলনায় এত বড় আকারের যে তারা সিনেটের মত ভালভাবে কাজ করতে পারে না বা দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।

সিনেটের শক্তিবৃদ্ধির কারণ

(২) তাছাড়া সিনেট অঙ্গরাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য সিনেটে দুজন প্রতিনিধি পাঠায়। এই প্রতিনিধিরা যেহেতু বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত হন, ফলে সিনেটের প্রত্যেক সদস্য দাবী করতে পারেন যে তিনি সমগ্র অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি। এতে সিনেট সদস্যদের মান মর্যাদা বা প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে গেছে।

(৩) ১৯১৩ সালের পর থেকে সিনেটের সদস্যরা জনসাধারণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ায় জন্য সিনেটের সদস্যদের ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেক বেড়েছে। প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য সিনেটের সদস্যরা কোন রকম হীনমন্যতায় ভোগেন না। তাঁরা জানেন যে তাঁরা জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত, তাঁদের সঙ্গে জনসাধারণের নিবিড় যোগাযোগ আছে এবং জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার তাঁরাও অংশীদার।

(৪) যেহেতু সিনেট একটি চিরস্থায়ী পরিষদ এবং যেহেতু সিনেটের সদস্যগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুনর্নির্বাচন প্রার্থী হন, ফলে সিনেটের সদস্যগণ অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে সিনেটের সদস্য হিসেবে কাজ করেন। ফলে তাঁরা প্রতিনিধি সভার

সদস্যদের তুলনায় অনেক বেশি অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী হন। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিংবা জনজীবনে সিনেটের সদস্যরাই নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।

(৫) তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ এবং ভারসাম্যের নীতিতে গভীর ভাবে বিশ্বাস করতেন। যাতে রাষ্ট্রপতি রাজকীয় ক্ষমতা ও মর্যাদা দাবী না করেন, সেজন্য তাঁরা চেয়েছিলেন যে সিনেট যেন এমনভাবে কাজ করে যাতে রাষ্ট্রপতি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী না হন। এইজন্য তাঁরা সিনেটের ক্ষমতা এমনভাবে বৃদ্ধি করেছিলেন যাতে রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতা সংযত ভাবে প্রয়োগ করেন। আবার অন্যদিকে প্রতিনিধিসভা যাতে গণতন্ত্রের নামে যথেচ্ছাচার না করে, ক্ষমতামদমত্ত না হয়ে ওঠে, তার জন্য তাঁরা সিনেটের হাতে অনেক ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন। সুখের বিষয় সিনেট তাঁদের এই প্রত্যাশাকে পূরণ করেছে। এক দিকে প্রেসিডেন্টের রাজকীয় ক্ষমতার কামনা বাসনা এবং অন্যদিকে জনপ্রতিনিধি সভার যথেচ্ছাচারের প্রবণতাকে প্রতিহত করে সিনেট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি শক্তিশালী স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন। যেহেতু মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইনসভার কাছে দায়ী নন, তাই তিনি প্রায় নিরঙ্কুশ বা অপ্রতিহত ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। কিন্তু এর ফলে রাষ্ট্রপতির যাতে স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব না গড়ে ওঠে, সেই উদ্দেশ্যেই সিনেটের হাতে কিছু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। সন্ধি-চুক্তি অনুমোদনের ক্ষেত্রে, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে এবং কোন ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব সিনেটের কাছে উপস্থাপিত হলে কিংবা তদন্ত কমিটি গঠন করে সিনেট রাষ্ট্রপতি তথা শাসনবিভাগকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(৬) তাছাড়া আগে সিনেটের সদস্যদের বক্তৃতার কোন সময় সীমা ছিল না। তাঁরা যতক্ষণ ইচ্ছা বক্তৃতা দিতে পারতেন। ফলে দীর্ঘসময় ধরে বক্তৃতা করে তাঁরা অনেক সময় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বিল আটকে দিতেন। একে বলা হত *filibustering tactics*। এখন যদিও বক্তৃতার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়, তবুও একথা ঠিক যে সিনেটের সদস্যরা বক্তৃতার জন্য দীর্ঘ সময় পান। ফলে জনপ্রতিনিধিসভার সদস্যদের তুলনায় সিনেটের সদস্যগণ অনেক বেশি কার্যকর ভাবে জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে পারেন।

(৭) সিনেটের সদস্যগণ দলমত নির্বিশেষে নিজেদের অধিকার ও সম্মান রক্ষার জন্য অত্যন্ত তৎপর। যদি তাঁরা মনে করেন যে, শাসনবিভাগ বা জনপ্রতিনিধি সভা তাঁদের সম্মান ক্ষুণ্ণ করেছে বা অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করেছে, তাহলে তাঁরা একযোগে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের দল যখন সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভোগ করত, তখনও সিনেট রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের সুপ্রীম কোর্টের পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। কারণ, সিনেটের সদস্যদের মনে

হয়েছিল যে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট তাঁদের সঙ্গে আগে বিলটি সম্পর্কে পরামর্শ না করে সিনেটের অবমাননা করেছেন।

(৮) দেখা যায় ভারত, ব্রিটেন, কানাডা প্রভৃতি রাষ্ট্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ক্ষমতাভিলাষী নেতারা নিম্নকক্ষে নির্বাচিত হওয়াকেই শ্রেয় বলে মনে করেন। যেহেতু পরিষদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার নিম্নকক্ষই অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী, ফলে রাজনৈতিক দলগুলির শক্তিশালী নেতারা নিম্নকক্ষেই সাধারণত নির্বাচিত হন। ভারতে জওহরলাল নেহরু, ব্রিটেনে উইনস্টন চার্চিল প্রমুখ নেতারা তাই নিম্নকক্ষের সদস্য হিসাবেই কাজ করে গেছেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রখ্যাত সাংবাদিক, ধনকুবের, অধ্যাপক বা রাজনীতিবিদরা সিনেটে নির্বাচিত হওয়াকে পরম সৌভাগ্য বলে মনে করেন। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় রাজনীতিতে সিনেটের সদস্যপদকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৯) বলা হয়, সিনেটের সদস্যগণ নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রদূতের মত আচরণ করেন। দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছর ধরে এই প্রথা গড়ে উঠেছে। ফলে সিনেটের সদস্যগণ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে যে বিপুল মর্যাদা ভোগ করেন তা অকল্পনীয়।

(১০) পরিশেষে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৃহৎ শক্তি বলে পরিগণিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি যেহেতু বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে, ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারও এখন খুবই শক্তিশালী। একথা ঠিক যে, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি এখন প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাই বৃদ্ধি পায়নি, সেই সঙ্গে সিনেটের ক্ষমতাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সব কারণে অধ্যাপক স্ট্রং (Strong) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটকে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ বলে অভিহিত করেছেন।

ছয় : মার্কিন কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and Functions of the Congress)

প্রতিনিধি সভা এবং সিনেট নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস গঠিত। কংগ্রেসের প্রধান কাজ হল আইন প্রণয়ন করা। যেহেতু শাসনতন্ত্রের প্রণেতাগণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিতে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, তাই আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা কংগ্রেসকে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরা "নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি'তেও গভীর বিশ্বাস পোষণ করতেন, তাই কংগ্রেসকে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ছাড়াও কিছু কিছু শাসনবিভাগীয়, বিচারবিভাগীয় এবং সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। অনেকে কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করেন—(১) আবশ্যিক ক্ষমতা এবং (২) ঐচ্ছিক ক্ষমতা। যে সব কাজ করা কংগ্রেসের পক্ষে বাধ্যতামূলক, সেসব ক্ষমতাকে আবশ্যিক

ক্ষমতা বলে। আর ঐচ্ছিক ক্ষমতা হল সেসব ক্ষমতা যা কংগ্রেস প্রয়োজন মনে করলে ব্যবহার করতে পারে। আবশ্যিক ক্ষমতাগুলি কংগ্রেসকে ব্যবহার করতেই হয়, নয়তো শাসনব্যবস্থায় একটা সংকট দেখা দিতে পারে। সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ কংগ্রেসের ক্ষমতাকে মোটামুটি সাত ভাগে ভাগ করেছেন। (১) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (২) শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা, (৩) বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা, (৪) সংবিধান সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৫) নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৬) নির্দেশমূলক ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৭) তদন্ত করার ক্ষমতা।

১. আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসাবে কংগ্রেসের প্রধান কাজ হল আইন প্রণয়ন করা। কোন বিল আইনে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন উভয় কক্ষের সম্মতি। একমাত্র অর্থবিল ছাড়া অন্য যে কোন বিল কংগ্রেসের যে কোন কক্ষে প্রথমে উপস্থাপিত করা যায়। অর্থবিল সবসময়েই প্রথমে প্রতিনিধি সভায় উপস্থাপিত করতে হয়। কোন বিল সম্পর্কে উভয় কক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বিলটি উভয় কক্ষের সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত কনফারেন্স কমিটিতে পেশ করা হয়। আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা দুভাবে কংগ্রেস প্রয়োগ করে। প্রথমত সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারকে যে সব ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে কংগ্রেসে সেই সব বিষয়ের ওপর আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু সংবিধান প্রদত্ত ঐ ক্ষমতা ছাড়াও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং বিচারালয়ের রায়ের ফলে কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে। এই ক্ষমতাগুলির মধ্যে অনুমিত ক্ষমতা (Implied Powers), অন্তর্নিহিত ক্ষমতা (Inherent Powers) এবং জরুরী ক্ষমতার করা উল্লেখ করা যায়। বিশেষ জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে ক্ষমতা তাকে অনুমিত ক্ষমতা বলে। দেশের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। সংবিধান গৃহীত হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও কংগ্রেস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে একটি বিল প্রস্তুত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের এই রকম কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে কিনা এ নিয়ে জাতীয় স্তরে এক উত্তপ্ত বিতর্কের সূত্রপাত হয়। হ্যামিলটন প্রমুখ নেতাগণ মনে করেন যে, অনুমিত ক্ষমতার বলে কংগ্রেসে এরকম আইন প্রণয়ন করতে পারে। হ্যামিলটন ও তাঁর সমর্থকগণ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধির পক্ষে ছিলেন। কিন্তু জেফারসন ও তাঁর সহযোগীরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাঁদের অভিমত ছিল এই যে, কংগ্রেসের এরকম কোন আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা নেই, তাই কংগ্রেস যদি এরকম কোন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয় তাহলে তা সংবিধান বিরোধী হবে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মার্শাল ও তাঁর সহকর্মিগণ একটি মামলার (McCulloch v. Maryland) রায় দান কালে সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেন যে অনুমিত ক্ষমতায় বলে কংগ্রেসের আইন প্রণয়নের অধিকার আছে। সংবিধানে

যে সব বিষয়ে কংগ্রেসকে আইন প্রণয়ন করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে সেই সব বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে না পারলেও অন্যান্য সব বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার কংগ্রেসের আছে। আর এই সব আইন কখনোই শাসনতন্ত্রবিরোধী বলে বিবেচিত হবে না। সুতরাং অনুমিত ক্ষমতার বলে কংগ্রেস অনেক আইন প্রণয়ন করতে পারে।

বৈদেশিক নীতি প্রয়োগের জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সব ক্ষমতার প্রয়োজন হয় তাকেই সাধারণত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বলে। যুদ্ধ ঘোষণা করা, সন্ধি অনুমোদন করা, শান্তি স্থাপন করা, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা অন্তর্নিহিত ক্ষমতায় অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য কংগ্রেস বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে পারে। ত্রিশের দশকে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় যে ভয়াবহ সংকট ও মন্দা দেখা গিয়েছিল, সেই মন্দা কাটিয়ে ওঠায় জন্য কংগ্রেস অনেক জরুরী আইন প্রণয়ন করেছিল। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও কংগ্রেস অনেক জরুরী আইন প্রণয়ন করেছিল। অবশ্য ১৯৩৪ সালে একটি রায়দান কালে সুপ্রীম কোর্ট এই অভিমত পোষণ করে যে জরুরী অবস্থা কংগ্রেসের কোন নতুন ক্ষমতা সৃষ্টি করে না কিংবা সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটায় না। জরুরী অবস্থায় কংগ্রেস যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, স্বাভাবিক অবস্থায় কংগ্রেসের সেই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার নেই।

২. শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা

নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতাগণ কংগ্রেসের হাতে কিছু শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। অবশ্য এই সব ক্ষমতা কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেট কেবলমাত্র প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রপতি যে সব যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করেন, সেইসব নিয়োগ সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। সিনেট কোন নিয়োগ অনুমোদন না করলে, সেইসব নিয়োগ কার্যকর হয় না। তাছাড়া শাসনবিভাগ যখন কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি বা চুক্তিতে উপনীত হয়, সেই সব সন্ধি বা চুক্তি আগেই সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কোন সন্ধিকে অনুমোদন করে প্রস্তাব গ্রহণ করলে সেই সন্ধি কার্যকর করা সম্ভব হয়।

৩. বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনা ইমপিচমেণ্ট প্রস্তাবের বিচার করে। প্রথমে নিম্নকক্ষে ইমপিচমেণ্ট প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। প্রতিনিধিসভা এই ইমপিচমেণ্ট প্রস্তাব অনুমোদন করে সিনেটের কাছে অনুসন্ধান ও বিচারের জন্য পাঠায়। সিনেট যখন কোন ইমপিচমেণ্ট প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে তখন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন। অভিযোগ প্রমাণিত

হলে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন থাকলে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাকে স্বপদ থেকে অপসারিত করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সত্তরের দশকে রাষ্ট্রপতি নিকসন এই ইমপিচমেণ্ট প্রস্তাবের ভয়েই স্বয়ং পদত্যাগ করেছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের নিম্নে অবস্থিত সকল আদালত কংগ্রেসের আইনের মাধ্যমে গঠিত হয়।

৪. **সংবিধান সংক্রান্ত ক্ষমতা**

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রেও কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে। মনে রাখতে হবে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সংবিধান হল যাবতীয় ক্ষমতার উৎস। আর এই সংবিধানের চার দেওয়ালের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় সরকারগুলিকে কাজ করতে হয়। তাই প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সংবিধানকে দেশের মূল আইন হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এই সংবিধান মোটামুটি দুষ্পরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। মার্কিন সংবিধানের ৫নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতায়, কিংবা দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গরাজ্যের আইনসভাগুলির অনুরোধে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত একটি কনভেনশনে সংবিধান সংশোধনের যে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা যায়। পরে অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভা সমূহের তিন-চতুর্থাংশ কর্তৃক কিংবা উক্ত উদ্দেশ্যে অঙ্গরাজ্যসমূহে আহূত কনভেনশনের তিন-চতুর্থাংশ কর্তৃক সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হলে সংবিধান সংশোধন করা সম্ভব হয়।

সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব রাজ্যের আইনসভাগুলির কাছে অনুমোদনের জন্য রাখা হবে, না এই উদ্দেশ্যে রাজ্যগুলিতে বিশেষ কনভেনশন ডাকা হবে, তা কংগ্রেস স্থির করে।

৫. **নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রশাসনিক দপ্তর বা এজেন্সী গড়ে তোলা এবং তাদের কাজকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখা কংগ্রেসের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে প্রশাসনিক এজেন্সী, দপ্তর ইত্যাদি গড়ে তোলে। আইন প্রণয়ন করে কংগ্রেস বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর ও এজেন্সীগুলিকে কংগ্রেসের কাছে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রশাসনিক এজেন্সী ও দপ্তরগুলির জন্য ব্যয় বরাদ্দ দাবী মঞ্জুর করে বা তা অস্বীকার করে কংগ্রেস সরকারি দপ্তরগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

৬. **তদন্তমূলক কার্যকলাপ**

সংবিধানে তদন্তমূলক কার্যকলাপের দায়িত্ব কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত করা হয়নি। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট এই অভিমত প্রকাশ করেছে যে কংগ্রেসের তদন্তমূলক কার্যকলাপ হল কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন মূলক ক্ষমতার সহযোগী ক্ষমতা। কংগ্রেস যে সব আইন প্রণয়ন করে, সেই সব আইনের যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কিনা, তা দেখার জন্য কংগ্রেস তদন্ত করতে পারে। তবে এই ক্ষমতা কংগ্রেসের অবাধ নয়, অনেক ভাবনা-চিন্তা করে, সাবধানতার সঙ্গে কংগ্রেস এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

(৭) **নির্বাচনমূলক ক্ষমতা**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কিছু নির্বাচনমূলক ক্ষমতাও আছে। রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোন প্রার্থী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করলে, রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের ওপর এসে পড়ে। রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থীদের মধ্যে যে তিনজন প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজনকে প্রতিনিধিসভা রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত করতে পারে। আর উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থীদের মধ্যে যে দুজন সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন, তাঁদের একজনকে সিনেট উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত করতে পারে। তাছাড়া কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে প্রতিনিধি সভার সদস্যদের নির্বাচনের স্থান, কাল ও পদ্ধতি স্থির করে দিতে পারে। এমনকি সদস্যদের যোগ্যতা কিংবা তাঁদের নির্বাচন যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা, এ বিষয়েও কংগ্রেস সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে কংগ্রেস যে কোন সদস্যকে সভার অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করতে পারে।

৮. **প্রতিনিধিত্বমূলক**

পরিশেষে বলা যায় যে, কংগ্রেসের সদস্যগণ নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধি হিসাবে তাদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেন। তাই নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁরা গভীর যোগাযোগ রক্ষা করেন। সরকারের কোন কাজ জনস্বার্থবিরোধী বলে মনে হলে তাঁরা তার প্রতিবাদ করেন। নির্বাচকমণ্ডলীর স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁরা নানারকম সুপারিশ করেন। কংগ্রেসের সদস্যরা খুব ভাল করেই জানেন যে প্রতিনিধি হিসাবে তাঁরা ভাল কাজ না করলে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁরা সফল নাও হতে পারেন।

ছয়ঃ কংগ্রেসের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা (Congress as a Leviathan in chains)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিতে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে কংগ্রেস প্রায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করে। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রেও অনেক ক্ষমতা ভোগ করে। আবার শাসন বিভাগের ওপরেও কংগ্রেসের অনেক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তি অনুমোদনের ক্ষেত্রে, কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক হাজার হাজার উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে, কিংবা তদন্ত কমিটি গঠনের বিষয়ে কংগ্রেসের প্রভূত ক্ষমতা রয়েছে। আর্থিক বরাদ্দ সম্পূর্ণ বন্ধ করে, কিংবা আর্থিক বরাদ্দ হ্রাস বৃদ্ধি করেও কংগ্রেস শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন মনে করতেন যে, রাষ্ট্রপতির তুলনায় কংগ্রেস অধিকতর শক্তিশালী। কিন্তু উড্রো উইলসনের এই অভিমত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং অনেকেই মনে করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের ক্ষমতা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। তাই বলা হয় যে, কংগ্রেস যেন একটি অতিকায় শক্তিশালী সামুদ্রিক জীব যার হাত-পা শৃঙ্খলাবদ্ধ (Congress is a Leviathan in chains).

১. প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের প্রণেতারা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনে বিশ্বাস পোষণ করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, সরকারের কাজ যতদূর সম্ভব সীমিত হওয়া প্রয়োজন। এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শন, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি এবং ভারসাম্যের তত্ত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের কোন বিভাগকেই অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করেছে।

২. দ্বিতীয়ত, আমরা দেখতে পাই, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও মার্কিন কংগ্রেসের ক্ষমতা অপ্রতিহত নয়। কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত যে কোন বিলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন, নতুবা সেই বিল আইনে পরিণত হয় না। রাষ্ট্রপতি যদি কোন বিলে অনুমোদন দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে সেই বিল পুনরায় পাশ করা খুবই কঠিন। তাছাড়া দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপতিরা এখন পকেট ভেটো প্রায়শই প্রয়োগ করেন। দলপ্রথার যেভাবে বিবর্তন ঘটেছে, তাতে রাষ্ট্রপতি তাঁর দলের সাহায্যে আইন প্রণয়নের পথে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারেন।

৩. তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি মাঝে মাঝে কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ করেন। এই বাণীর মাধ্যমে তিনি কংগ্রেসকে কতগুলি বিলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। যদি কংগ্রেসের উভয় কক্ষে তাঁর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে তাহলে তাঁর বাণী অনুযায়ী কংগ্রেস দ্রুত বিল পাশ করতে চেষ্টা করে। সুতরাং বাণীপ্রেরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে অনেক সময়ই প্রভাবিত করেন।

৪. চতুর্থত, রাষ্ট্রপতি দূরদর্শন, বেতার বা সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জনমতকে অনেক সময় এমনভাবে প্রভাবিত করেন যে কংগ্রেস তার বিরোধিতা করতে সক্ষম হয় না। দেখা যায়, রাষ্ট্রপতি সংবাদ মাধ্যমগুলির মাধ্যমে যে বক্তব্য রাখেন সাধারণ মানুষ তাকেই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। ফলে কংগ্রেস অনেক সময় এই জনমতের জোয়ারে ভেসে যায়।

৫. পঞ্চমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির অনুগ্রহ বিতরণের বিপুল ক্ষমতা আছে। তিনি হাজার হাজার উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, রাষ্ট্রদূত, বাণিজ্যদূত, ক্যাবিনেটের সদস্য, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারপতি ইত্যাদি পদে নিয়োগ করেন। একটু বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্যের সঙ্গে এই নিয়োগ বিতরণের ক্ষমতা প্রয়োগ করলেই তিনি কংগ্রেসের অনেক সদস্যের বিরোধিতার তীব্রতা হ্রাস করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রাষ্ট্রপতি কেনেডি ভিয়েতনামে হেনরী ক্যাবট-লজকে (সিনিয়ার) রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করে রিপাবলিকান দলের একাংশের তাঁর ভিয়েতনাম নীতির প্রতি সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

৬. ষষ্ঠত, প্রতিবছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের অধিবেশন যখন শুরু হয় তখন রাষ্ট্রপতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কংগ্রেসের সদস্যগণের সামনে নিজে উপস্থিত হয়ে ভাষণ দান করেন। ঐ ভাষণে রাষ্ট্রপতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তাঁর সরকার কর্তৃক যে সব নীতি অনুসৃত

হবে তার ওপরে আলোকপাত করেন। রাষ্ট্রপতির এই ভাষণ কংগ্রেসের সদস্য তথা সাধারণ মানুষের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

৭. সপ্তমত, মনে রাখতে হবে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস একটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা নয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস যে কোন বিষয়ের ওপর আইন প্রণয়ন করতে পারে না। কংগ্রেস কেবলমাত্র সেইসব বিষয়ের ওপরেই আইন প্রণয়ন করতে পারে, সংবিধান অনুযায়ী যে বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত। বাদবাকী সমস্ত বিষয়গুলি রাজ্য-সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। বস্তুত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা হিসাবে কংগ্রেসের ক্ষমতা সবসময়েই সীমাবদ্ধ। এককেন্দ্রিক সরকারের আইনসভার মত কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অসীম বা অবাধ ক্ষমতা কখনোই দাবী করতে পারে না।

অষ্টমত, যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি লিখিত, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান আছে, আর যেহেতু ঐ সংবিধানই সব ক্ষমতার উৎস, তাই ঐ সংবিধানের চার দেওয়ালের মধ্যে সরকারের সব বিভাগকে কাজ করতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের ক্ষমতাও এই সংবিধানের দ্বারাই সীমিত। কোন অবস্থাতেই কংগ্রেস এই সাংবিধানিক সীমা লঙ্ঘন করতে পারে না। কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কংগ্রেস শাসনবিভাগকে অর্পণ করতে পারে না। যদিও সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী কংগ্রেস এখন কিছু কিছু ক্ষমতা প্রশাসনিক বিভাগসমূহেকে অর্পণ করছে, কিন্তু কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ ক্ষমতা শাসন বিভাগকে অর্পণ করতে পারে না।

নবমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের সংবিধান সংশোধনের একক কোন ক্ষমতা নেই। দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গরাজ্য অনুরোধ করলে কংগ্রেস সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্যে সম্মেলন আহ্বান করতে পারে। কিন্তু তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের আইনসভা অনুমোদন না করলে কোন সংশোধন গৃহীত হয় না। কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে একমাত্র বিদ্রোহ বা আক্রমণের সময় ছাড়া অন্য সময়ে বন্দী প্রত্যক্ষকরণের (Habeas Corpus) অধিকার বাতিল করতে পারে না। নাগরিক অধিকার সংকোচনের ক্ষমতাও কংগ্রেসকে অর্পণ করা হয়নি। কংগ্রেস নতুন আইন প্রণয়ন করে পূর্বে অনুষ্ঠিত অপরাধের শাস্তি দিতে পারে না। কংগ্রেস এককভাবে আইন প্রণয়ন করে কোন অঙ্গরাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করতে পারে না। আবার কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে কোন অঙ্গরাজ্যকে সিনেটে সমান প্রতিনিধিত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে জুরির সাহায্যে বিচার ব্যবস্থা বাতিল করতে পারে না। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস এমন কোন আইন পাশ করতে পারে না যে আইন সাধারণ মানুষের সম্পত্তির অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করবে। সম্পত্তির অধিকার পুঁজিবাদী সমাজের সকল অধিকারের ভিত্তি। সংবিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করে কংগ্রেস

এমন কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে না, যা কোন নাগরিককে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে।

দশমত, বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনাও কংগ্রেসের ক্ষমতা বহুল পরিমাণে খর্ব করেছে। এখন সুপ্রীম কোর্ট বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার নামে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত যে কোন আইনকে বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারে। আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত যে কোন আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে এবং সুপ্রীম কোর্ট যদি কোন আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে তাহলে সেই আইনকে আর কার্যকর করা যায় না।

পরিশেষে বলা যায়, পৃথিবীর প্রায় সব বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই অর্থনৈতিক সংকট, ক্রমবর্ধমান বেকারি, সমরসজ্জা ইত্যাদির জন্য শাসনবিভাগের ক্ষমতা বাড়ছে। সাধারণ মানুষও আশা করে যে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা একমাত্র শাসনবিভাগই সমাধান করতে পারে। ফলে, পৃথিবীর সর্বত্রই আইনসভায় ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, শাসনবিভাগের ক্ষমতা বাড়ছে। তাছাড়া কংগ্রেসের সদস্যরা বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এবং স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে অভ্যস্ত। ফলে তাঁদের সততা বা পক্ষপাতিত্বহীনতার ওপর এখন জনসাধারণের আস্থা কম। আরো বলা হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের সদস্যরা মূলত উচ্চবিত্ত, শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। কৃষ্ণাঙ্গ, বহিরাগত বা নিম্নবিত্ত মার্কিন নাগরিকদের প্রতিনিধি হিসাবে তারা কাজ করেন না। জনগণের ব্যাপক অংশের প্রতিনিধিত্ব না করবার জন্য কংগ্রেসের ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেক হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু তবুও এখনো কংগ্রেসের ক্ষমতা অনেক। তাই একে ঠিক শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্তিশালী অতিকায় সামুদ্রিক জীব বলে বর্ণনা করলে ভুল হবে।

সাত : কংগ্রেসের আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি (Process of Law making in Congress)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি আলোচনার সময় প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি বা তাঁর মন্ত্রিসভা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন রকম নেতৃত্ব দান করেন না। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর যেহেতু মার্কিন সংবিধান দাঁড়িয়ে আছে, তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনবিভাগ আইন প্রণয়নে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে না বা নেতৃত্ব দেয় না। কিন্তু ব্রিটেনে আইন প্রণয়নে মন্ত্রীরাই প্রধানত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অধিকাংশ বিল তাঁরাই উত্থাপন করেন। তাই ব্রিটেনে পার্লামেণ্ট যে সব বিল পাস করে, সেই বিলগুলি মূলত সরকারি বিল। কিন্তু ব্রিটেনের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি বিল বলে কিছু নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিলগুলি মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা হয়—(১) প্রাইভেট বিল ও (২) পাবলিক বিল। যে সব বিলের সঙ্গে সরকারি নীতি বা জনস্বার্থের প্রশ্ন জড়িত থাকে, সেই সব বিলকে পাবলিক বিল বলে। আর যে সব বিল বিশেষ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর

স্বার্থে উপস্থাপিত হয়, সেইসব বিলকে প্রাইভেট বিল বলা হয়। বিল ছাড়াও কংগ্রেসের উভয় পক্ষ যৌথ প্রস্তাব ও যুগ্ম প্রস্তাব পাশ করতে পারে। কংগ্রেসের উভয় কক্ষ যৌথ প্রস্তাব পাস করে তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠায়। সাধারণত সাময়িক ভাবে কোন আইন প্রণয়নের জন্য যৌথ প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাষ্ট্রপতি এই যৌথ প্রস্তাবে সম্মতি দান করলেই তা আইনে পরিণত হয়। কিন্তু যৌথ প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতির কোন সম্মতির প্রয়োজন নেই। কেন না যৌথ প্রস্তাব কখনোই আইনের মত কার্যকর হয় না। যৌথ প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস কেবলমাত্র কোন বিষয়ের ওপর নিজের মতামত জ্ঞাপন করে।

প্রতিনিধি সভা এবং সিনেটের যে কোন সদস্য বিল উত্থাপন করতে আগ্রহী হলে নিজের স্বাক্ষরযুক্ত বিলের একটি কপি নিজ নিজ কক্ষে রক্ষিত একটি নির্দিষ্ট বাক্সে ফেলেন। এইভাবে বিলের স্বাক্ষর যুক্ত একটি কপি বাক্সে ফেললেই বিলটি উত্থাপন করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এর পরে বিলটি ছেপে সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হয় এবং একেই বিলের প্রথম পাঠ বলে গণ্য করা হয়। পরে বিলের বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিলগুলিকে স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। এই কমিটিস্তরে বিলগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। তাই রাষ্ট্রপতি উইলসন এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে কমিটিগুলি ক্ষুদে আইন সভায় পরিণত হয়েছে। অনেকে বলেন যে, আইন প্রণয়নের প্রকৃত ক্ষমতা সিনেট বা প্রতিনিধিসভার হাতে নেই, এই ক্ষমতা প্রকৃত-পক্ষে কমিটিগুলির হাতে ন্যস্ত। কমিটিস্তরে যদি আলোচনা করে দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত বিলে অনেক ত্রুটি আছে বা বিলটি পাস করা এখনই কোন দরকার নেই, তাহলে বিলটি কমিটি স্তরেই শেষ হয়ে যায়। দেখা যায়, শতকরা ৯৫টি বিল এই ভাবেই বাতিল হয়। যে সমস্ত বিল কমিটি অনুমোদন করে, সেই সব বিল সম্পর্কে আরও অনেক অনুসন্ধান করা হয়। অনেক সময় বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাব কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটিস্তরে বিলটি অনুমোদিত হওয়ার পর বিলটির বিষয়বস্তু, গুরুত্ব বা শ্রেণী অনুযায়ী বিলটিকে তালিকাভুক্ত করা (calendar) হয়। তারপর কমিটির রিপোর্ট সহ বিলটিকে সিনেট বা প্রতিনিধিসভার সমগ্র কক্ষের কমিটির সামনে আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করা হয়। একেই বলা হয় দ্বিতীয় পাঠ বা Second Reading। সমগ্র কক্ষের কমিটিতে যখন বিলটির আলোচনা হয়, তখন অনেক সংশোধনী প্রস্তাব তোলা যায়। সমগ্র কক্ষের কমিটিতে নিয়মকানুনের তত কড়াকড়ি থাকে না। এই সমগ্র কক্ষের কমিটিতে স্পীকার বা উপরাষ্ট্রপতি সভাপতিত্ব করেন না। দ্বিতীয় পাঠের পর বিলটিকে পুনরায় প্রতিনিধি সভার বা সিনেটে পাঠানো হয়। এই সময় বিলটির ওপর খুব বিস্তৃতভাবে না হলেও কিছু আলোচনা করা হয়। একে বলা হয় বিলের তৃতীয় পাঠ। এই তৃতীয় পাঠের পর বিলটি চূড়ান্তভাবে গ্রহণের জন্য ভোট নেওয়া হয়।

এইভাবে বিলটি একটি কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর সেই কক্ষের অধ্যক্ষ স্বাক্ষর করে বিলটি অন্যকক্ষে পাঠান। অর্থাৎ বিলটি যদি প্রতিনিধিসভা গ্রহণ করে, তাহলে স্পীকার বিলে স্বাক্ষর করে বিলটি সিনেটে পাঠান। আবার যদি সিনেট প্রথমে বিলটি আলোচনা করে গ্রহণ করে, তাহলে উপরাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরযুক্ত হয়ে বিলটি প্রতিনিধি-সভায় আসে। যে কক্ষে বিলটি পাঠানো হয়, সেই কক্ষেও বিলটিকে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। শেষ পর্যন্ত এই কক্ষ বিলটিকে গ্রহণ করতে পারে, আবার অগ্রাহ্যও করতে পারে। কংগ্রেসের উভয়কক্ষই যদি বিলটি গ্রহণ করে, তাহলে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিয়ে স্বাক্ষর দান করলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। কিন্তু যদি রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর দিতে অসম্মত হন, তাহলে যে কক্ষে বিলটি প্রথমে গৃহীত হয়েছিল, সেই কক্ষে স্বাক্ষর দানে অসম্মতির কারণ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বিলটি ফেরত পাঠান। যদি তখন উভয়কক্ষে উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে বিলটি পুনরায় পাশ করে, তাহলে রাষ্ট্রপতির অসম্মতি সত্ত্বেও বিলটি আইনে পরিণত হয়। আবার কংগ্রেসের অধিবেশন চলার সময় যদি রাষ্ট্রপতি দশদিনের মধ্যে কোন বিলে সম্মতি না দিয়ে ফেলে রাখেন, তাহলেও বিলটি আইনে পরিণত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে প্রথম এবং শেষ কথা বলার অধিকার একমাত্র কংগ্রেসের।

আইন প্রণয়নে অন্যান্য প্রভাব

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কোন নতুন আইন প্রণয়ন সম্পর্কে প্রস্তাব কেবলমাত্র কংগ্রেসেরই করার অধিকার আছে। আইন প্রণয়নের সমস্ত ব্যবস্থা কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণ করে এবং এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্তও কংগ্রেসেরই। কিন্তু কোন আইনের খসড়া তৈরি করা অথবা কোন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করা—এগুলি কংগ্রেস ছাড়া অন্যেরাও করতে পারে।

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক অথবা কৃষক সংঘ, উকিল অথবা ডাক্তারদের সমিতি, কোন স্বদেশ-হিতৈষী অথবা দাতব্য প্রতিষ্ঠান কিংবা খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন শাখার গীর্জা-গুলোর অন্তর্ভুক্ত সংঘ, করদাতাদের অথবা সমাজের অন্য যে-কোন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান যে-কোন সময় তাদের নিজেদের প্রস্তাবিত আইনের পরিকল্পনা নিয়ে উপস্থিত হয়ে এবং প্রভাব বিস্তার করে কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে তদ্বির করে এই পরিকল্পনার সমর্থক সংগ্রহে উদ্যোগী হতে পারে।

তা ছাড়া, আজকাল বিভিন্ন শাসন পরিচালন শাখার কর্তৃপক্ষগণও তাঁদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা খসড়া আইন তৈরি করিয়ে কংগ্রেসের কাছে তা পেশ করেন। এঁদের ঐসব আইনের খসড়া হয় রাষ্ট্রপতি মারফত, অথবা, তাঁর মন্ত্রিসভার কোন সদস্যের মারফত, কিংবা সংশ্লিষ্ট শাসনপরিচালন শাখা নিজেরাই

কংগ্রেসের কাছে পেশ করে থাকেন এবং তারপর আইনটি কংগ্রেসের যে কমিটির বিষয়ভুক্ত সেই কমিটির চেয়ারম্যান আইনের খসড়াটি কংগ্রেসে উপস্থাপিত করেন।

এ ছাড়া আইনসভার যে-কোন সদস্য এককভাবে অথবা অন্যান্য সদস্যদের পক্ষ থেকে যে-কোন সময় তিনি যে সভার সদস্য সেই সভায় যে-কোন বিষয়ে আইন পাসের জন্য বিল উপস্থাপিত করতে পারেন।

১৯৬০ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে মোট ৫,১১৩টি সরকারী এবং বে-সরকারী বিল ও প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয় এবং তার মধ্যে ৬৭৩টি আইন হিসাবে পাস হয়। যেগুলি শেষপর্যন্ত আইনে পরিণত হয়নি তার মধ্যে কয়েকটি এক কক্ষে গৃহীত হয় কিন্তু অন্য কক্ষে গৃহীত হতে পারে না। তার ফলে, সেগুলি অন্তত সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

আইনের বিল কংগ্রেসের এক অধিবেশনে পরিত্যক্ত হলেও তা পরবর্তী অধিবেশনে পুনরায় উপস্থাপিত করে আইনে পরিণত করা চলে। সেইজন্য পরিত্যক্ত বিলগুলির মধ্যে যদি কোনটি বিষয়ের গুরুত্বের জন্য এবং জোর তদ্বিরের ফলে পুনর্বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হয়, তা হলে অনেক সময় দ্বিতীয় চেষ্টায় তা আইনে পরিণত হয়।

তবে সাধারণভাবে নিম্নোক্ত দুই শ্রেণীর বিলেরই কংগ্রেসে পাস হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে :

প্রথম শ্রেণী : "নিশ্চয় পাস হবার বিল" (অর্থাৎ এই ধরনের বিল পাস হতেই হবে)। এইসব বিলের পিছনে রাষ্ট্রপতি এবং কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতির দলভুক্ত নেতৃস্থানীয় সদস্যদের সক্রিয় সমর্থন থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণী : যেসব সরকারী বিল নিয়ে বিতর্কের আশংকা থাকে না এবং যেগুলি কংগ্রেসে দুই দলের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন পায় এবং যেসব বে-সরকারী বিল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় সেগুলিরও কংগ্রেসে অনুমোদিত হবার সম্ভাবনা বেশি।

সরকারী ও বেসরকারী বিল

কংগ্রেস মহলে "সরকারী বিল", "বে-সরকারী বিল"—এই কথা দুটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আইন-প্রণয়নের তালিকায় যখন বিলগুলি স্থান পায় তখন কাজের সুবিধার জন্য বিলগুলিকে এই দুই নামে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু বিল "সরকারী" হোক আর "বে-সরকারী" হোক—পাস হতে গেলে দুটিকেই একই পথে যেতে হবে এবং পাস হয়ে আইনে পরিণত হবার পর আইনের চোখে দুয়েরই মর্যাদা সমান। এই দুই বিলের মধ্যে পার্থক্য শুধু মাত্র প্রকৃতিগত।

"সরকারী বিল" হচ্ছে সেইসকল বিল যার অন্তর্ভুক্ত বিষয়টির সঙ্গে দেশের সমস্ত লোকের স্বার্থ জড়িত, যার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় এবং যেটি জনস্বার্থের খাতিরে আইনে পরিণত হওয়া দরকার।

আর "বে-সরকারী বিল" সেইগুলিকে বলা হয় যেগুলির সঙ্গে কোন-এক ব্যক্তি বা বিশেষ কোন গোষ্ঠীর স্বার্থ জড়িত এবং যেগুলি প্রধানত সেই ব্যক্তি বা সেই গোষ্ঠীর কল্যাণে পাস করা হয়। এই জন্যে বলা যেতে পারে যে বে-সরকারী বিলগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত।

"সরকারী" বিল ও প্রস্তাবগুলির লক্ষ্য হচ্ছে সামগ্রিক, আর "বে-সরকারী" বিলগুলির লক্ষ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট কোন বিষয়। তাই প্রথমগুলি হচ্ছে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত আইন আর দ্বিতীয়গুলি হচ্ছে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত আইন।

অনেক বে-সরকারী বিল উপস্থাপিত হয় এবং পরে আইনে পরিণত হয় ব্যক্তিবিশেষের সাহায্যার্থে। হয়তো কোন ব্যক্তির সম্পত্তির কোন ক্ষতি হল অথবা সম্পত্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। আইনের মাধ্যমে সে ব্যক্তি কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে না। এইরকম ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য দেবার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করতে হয়। তবে বেশির ভাগ বে-সরকারী বিল আজকাল আনা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়িভাবে বসবাসের ইচ্ছা নিয়ে যেসব বিদেশী একা অথবা ছোট ছোট দলে আসেন তাঁদের সেই অধিকার দিতে।

বে-সরকারী অভিবাসন আইন সাধারণত যেরকম ক্ষেত্রে পাস করা হয়ে থাকে সেগুলি হচ্ছে এই ধরনের, যেমন কেউ কোন দেশ থেকে নাটকীয় অবস্থার মধ্যে পালিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে বাস করতে চায় অথবা কেউ অস্থায়িভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করছে, অথচ দেশে ফিরে যেতেও পারছে না।

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত না হলে বে-সরকারী বিল সাধারণত আইনে পরিণত হয় না। সেনেট এবং প্রতিনিধিসভা সর্বসম্মতিক্রমে বে সরকারী বিল গ্রহণ করলে তবে সেটি আইনে পরিণত হয়। কংগ্রেসের যে-কোন কক্ষের একজন সদস্যের আপত্তি এইরকম আইন পাস বন্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট এবং এই আপত্তির কোন কারণ দেখাবার প্রয়োজন হয় না। কাঠামোর দিক থেকে সরকারী এবং বে-সরকারী বিলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

বিভিন্ন নামে চিহ্নিত বিল

কংগ্রেসের উভয় কক্ষেই প্রস্তাবিত বিলগুলি চারটি বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়:

বিল ঃ সরকারী, বেসরকারী প্রায় সমস্ত আইনের প্রস্তাবই এই নামে পরিচিত।

যুক্ত প্রস্তাব ঃ এই যুক্ত প্রস্তাব বিলের মত আইনে পরিণত হতে গেলে তাতে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর প্রয়োজন। অনেক সময় যুক্ত প্রস্তাবকে বিলের আকারে এবং বিলকে যুক্ত প্রস্তাবের আকারে আইন-সভায় উপস্থাপিত করা হয়। যুক্ত প্রস্তাব এবং বিল আইনসভায় উপস্থাপন ও বিবেচনা করবার নিয়মও এক।

সম-উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাব ঃ এই প্রস্তাবগুলি সাধারণত আইন নয় এবং এগুলি সম্পূর্ণ কংগ্রেসের নিজস্ব ব্যাপার এবং এইসব প্রস্তাবে কংগ্রেসের নিজস্ব কোন মত,

উদ্দেশ্য বা নীতি প্রকাশিত হয়। যেমন এই রকম এক প্রস্তাবে কংগ্রেস এক সময়ে বলেছিল যে, কমিউনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যভুক্ত করা উচিত হবে না। এই ধরনের প্রস্তাব যখন কংগ্রেসের দুই কক্ষ কর্তৃক পাস হয় তখন তাকে রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে কংগ্রেসের ঘোষণা বলে ধরা হয়।

একক প্রস্তাব : এই ধরনের প্রস্তাবের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ এবং কংগ্রেসের মাত্র একটি কক্ষ এই প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই প্রস্তাব সেনেট কিংবা প্রতিনিধিসভা এককভাবে পাস করে এবং এই প্রস্তাবের আগে "যুক্ত" অথবা "সম-উদ্দেশ্যমূলক" এরূপ কোন কথা থাকে না।

আট : মার্কিন কংগ্রেসের কমিটি ব্যবস্থা (Committee System of the American Congress)

বিশের শতকে সরকারের কাজকর্ম এত বেড়ে গেছে যে স্বাভাবিক ভাবেই আইনসভার ওপর অত্যধিক চাপ পড়ছে। নিত্য নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় আইনসভা অনেক সময় সমানভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে না। তাছাড়া আইনসভার সদস্যদেরও সময় কম। তাঁরা অনেক সময় নিজ নিজ পেশা বা দলীয় রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। আবার একথাও ঠিক যে আইন প্রণয়নের জন্য যে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন তা অনেক সদস্যেরই থাকে না। প্রশাসন, রাজনীতি বা জনজীবন সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা না থাকলে অনেক সময়ই সদস্যরা কোন ব্যাপারে গঠনমূলক প্রস্তাব দিতে ব্যর্থ হন। তাই পৃথিবীর সর্বত্র আইনসভাগুলি এখন কমিটির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। কেননা আইনসভার মতো একটি বড় সংস্থা সকল বিষয়ে কখনই সেই মনোযোগ দিতে পারে না, যা ছোট ছোট কমিটিগুলি দিতে পারে। লোকচক্ষুর অন্তরালে, হৈ-হট্টগোল না করে কমিটিগুলি গভীর ভাবে যে কোন বিলের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব করতে পারে। আইনসভায় দলীয় রাজনীতির যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়, কমিটি মিটিং এ সেই উত্তাপ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেশ থাকে না। ফলে কমিটির সদস্যগণ খোলামনে, ঠাণ্ডা মাথায় যে কোন বিলের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পান এবং বিলটিকে আরো উন্নত করার জন্য গঠনমূলক প্রস্তাব রাখতে পারেন।

উৎপত্তির কারণ

তাই পৃথিবীর সর্বত্রই আইনসভার ওপর কাজের চাপ হ্রাস করার জন্য, প্রস্তাবিত বিলগুলির যথার্থ সংশোধনের জন্য কমিটির ব্যবস্থা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এর ব্যতিক্রম নয়। মার্কিন কংগ্রেসে কমিটিগুলির ভূমিকা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এই কমিটি ব্যবস্থা গড়ে উঠতে দীর্ঘ সময় লেগেছে, কিন্তু এখন কমিটি ছাড়া মার্কিন কংগ্রেসের কথা ভাবাই যায় না। বলা হয় মার্কিন কংগ্রেসের কাজ তার উভয় কক্ষে সম্পাদিত হয় না—মার্কিন কংগ্রেসের কাজগুলি কমিটির মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। এক কথায় বলা যায় যে, কমিটিগুলি এখন ক্ষুদ্রতর

আইন সভার পরিণত হয়েছে। অন্য যে কোন দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে কমিটি ব্যবস্থার উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল এবং কংগ্রেস কমিটিগুলির কাছে খুব বেশি বাধা সৃষ্টি করে না বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে না।

১৯৪৬ সালের কংগ্রেসের পুনর্গঠন আইন অনুযায়ী উভয় কক্ষের স্থায়ী কমিটি বা স্ট্যান্ডিং কমিটির সংখ্যা স্থির করে দেওয়া হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী এখন সিনেটের ষোলটি স্থায়ী কমিটি এবং প্রতিনিধি সভার কুড়িটি স্থায়ী কমিটি রয়েছে। প্রত্যেক কমিটিই কোন না কোন বিষয়ের ওপর আইন প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত। কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে উভয় কক্ষই কমিটি গঠন করে। যেমন, শ্রম, কৃষি, আয়-ব্যয়, ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, সশস্ত্র বাহিনী, মুদ্রা, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি। সিনেট ও প্রতিনিধিসভা এই কমিটিগুলির মাধ্যমে তাদের আইন প্রণয়নমূলক কাজকর্ম সম্পাদন করে।

কমিটির সংখ্যা

প্রতিনিধি সভার প্রত্যেক স্থায়ী কমিটিতে ৯ থেকে ৫০ জন সদস্য থাকতে পারে। অন্য দিকে সিনেটের স্থায়ী কমিটিতে সাধারণত ১০ থেকে ১৯ জন পর্যন্ত সদস্য থাকেন। যদিও স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ আনুষ্ঠানিক ভাবে সমগ্র কক্ষের সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত হন, কিন্তু কার্যত প্রতিটি দলের সদস্য মনোনয়ন কমিটি প্রত্যেক স্থায়ী কমিটিতে দলীয় প্রার্থীদের নাম আগে স্থির করে। পরে স্থায়ী কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা প্রতিটি কক্ষে সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হয়। একজন সদস্য একই সময়ে দুটির বেশি কমিটির সদস্য থাকতে পারেন না। যেহেতু কোন কোন কমিটি অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফলে ঐ সব কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য সদস্যদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব থাকে। বলা হয়, সদস্যদের অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা, জনজীবনে তাদের পরিচিতির ওপর নির্ভর করে তাঁরা কোন্ কমিটির সদস্য হবেন কোন্ কমিটিতে কতজন সদস্য থাকবেন, এই বিষয় নিয়ে প্রত্যেক কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা সংশ্লিষ্ট কক্ষের সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতার সঙ্গে আলোচনা করেন। দু-একটি কমিটি ছাড়া প্রত্যেক কক্ষেই দলীয় সদস্য সংখ্যার সমানুপাতিক হারে কমিটির সদস্য সংখ্যা ভাগ বাঁটোয়ারা করা হয়। সাধারণত দেখা যায় যেনিয়মাবলী সংক্রান্ত কমিটি, উপায় নির্ধারণী কমিটি, কিংবা ব্যয় সংক্রান্ত কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বেশি প্রতিনিধিত্বের দাবী করে।

সদস্য সংখ্যা

প্রত্যেক কমিটিতে চেয়ারম্যানের পদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কমিটির চেয়ারম্যানগণ বিপুল মর্যাদার অধিকারী। তিনি যদিও সমগ্র কক্ষের সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত হন, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের যে সদস্য কমিটির সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে যুক্ত, কমিটির কাজে যার বহুদিনের অভিজ্ঞতা আছে, সাধারণত তিনিই চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হন। বলা হয়, অভিজ্ঞতা ও প্রচীনত্বের ভিত্তিতে চেয়ারম্যান নির্বাচন করায় কমিটিগুলি ভাল ভাবে কাজ করতে পারে। কেন না চেয়ারম্যানরা অভিজ্ঞতার দ্বারা কমিটির মিটিং কিভাবে

চেয়ারম্যান

পরিচালনা করলে ভাল হয় তা ভাল করেই জানেন। কিন্তু সমালোচকদের মতে কেবলমাত্র প্রাচীনত্ব ও অভিজ্ঞতার ওপর জোর দিলে যাঁরা নবীন, যাঁদের উৎসাহ এবং কর্মোদ্যোগ আছে, তাঁদের প্রতি অবিচার করা হয়।

১৯১১ সালে কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে স্পীকারের কর্তৃত্বের অবসানের পর এখন চেয়ারম্যানরা কংগ্রেসের নেতায় পরিণত হয়েছেন। তাঁরা ইচ্ছা করলে সাবকমিটি গঠন করতে পারেন। দলের প্রতি আনুগত্য রেখেও তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামত চলেন। প্রয়োজন মনে করলে তাঁরা দলের প্রতিষ্ঠিত নেতাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আদৌ দ্বিধা বোধ করেন না। কমিটির অনুগত সদস্যদের তাঁরা বিভিন্ন ভাবে পুরস্কৃত করতে পারেন। আবার যে সব সদস্য তাঁদের বিরুদ্ধে থাকেন, তাঁদের নানা ভাবে চেয়ারম্যানরা বিব্রত করতে পারেন। কমিটির সভা আহ্বান করা বা মুলতুবি রাখা চেয়ারম্যানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

অন্যান্য কমিটি

স্থায়ী কমিটি ছাড়াও কংগ্রেসের আরো অনেক কমিটি আছে। এই কমিটিগুলি হল: সমগ্র কক্ষের কমিটি (Committee of the Whole House), যুগ্ম কমিটি (Joint Committee), কনফারেন্স কমিটি (Conference Committee) এবং বিশেষ কমিটি (Special Committee)। উপরোক্ত কমিটিগুলি নিয়ে নীচে আলাদা করে আলোচনা করা হল।

১. সমগ্র কক্ষের কমিটি

কংগ্রেসের কোন কোন কাজ কক্ষের সকল সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটি সম্পন্ন করে। যখন সমগ্র কক্ষ কমিটি হিসেবে কাজ করে তখন সকল সদস্যের তাতে অংশ গ্রহণ করার অধিকার আছে। কিন্তু যখন কোন কক্ষ সমগ্র কক্ষের কমিটি হিসেবে কাজ করে তখন স্পীকার বা উপরাষ্ট্রপতি প্রতিনিধিসভা বা সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন না। তখন সমগ্র কক্ষ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে অপর কোন ব্যক্তি সভার কাজ পরিচালনা করেন। প্রতিনিধিসভা যখন সমগ্র কক্ষের কমিটি হিসাবে মিলিত হয়, তখন কমপক্ষে একশ জনের উপস্থিতি প্রয়োজন। কিন্তু এখন আর সমগ্র কক্ষের কমিটির প্রয়োজনীয়তা আগের মত অনুভূত হয় না। এখন প্রতিনিধি সভা বা সিনেটের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই কমিটির প্রয়োজনীয়তা কমে গেছে। ১৯৩০ সালের পর থেকে সিনেট বিল বা প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য সমগ্র কক্ষের কমিটির কোন সভা আহ্বান করেনি। চুক্তি বিবেচনা করার জন্য অবশ্য এই কমিটির সভা ডাকা হয়।

২. যুগ্ম কমিটি

কংগ্রেসের উভয় কক্ষের যৌথ প্রস্তাব বা আইনের মাধ্যমে যুগ্ম কমিটি গঠিত হয়। উভয় কক্ষের সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এই সব যুগ্ম কমিটি গঠিত হয়। স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে যখন কোন কাজ হয় না, কিংবা যখন শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন তখন সাধারণত যুগ্মকমিটি গঠিত হয়। আণবিক শক্তি সংক্রান্ত যুগ্মকমিটি একটি বিধিবদ্ধ যুগ্ম কমিটি।

৩. বিশেষ কমিটি

সাময়িকভাবে কোন বিশেষ ধরনের বিষয় বিবেচনা করার জন্য কংগ্রেসের বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। তবে এই কমিটি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অবশ্য অতীতে এই সব বিশেষ কমিটির কাজ অনেক সময় জনসাধারণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

৪. কনফারেন্স কমিটি

যখন কংগ্রেসের উভয় কক্ষ কোন বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে তখন উভয় কক্ষের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উভয় কক্ষের সদস্য নিয়ে কনফারেন্স কমিটি গঠিত হয়।

কমিটির গুরুত্ব

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে কমিটি ছাড়া মার্কিন কংগ্রেস অচল। তথ্য সংগ্রহ করা, সাক্ষ্য-গ্রহণ করা, শুনানী নেওয়া, তদন্ত পরিচালনা করা ; তদন্ত শেষে রিপোর্ট তৈরি করা, আইনের খসড়া করা—এসমস্তই কমিটিকে করতে হয় এবং এর ওপর নির্ভর করে কংগ্রেস তার কমিটির প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এমন হতে পারে যে, কোন আইন সম্পর্কে কমিটি যে রিপোর্ট দেয়, সেনেট বা প্রতিনিধি সভা তা অগ্রাহ্য করল অথবা সংশোধন করল কিংবা তার ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ মুলতুবী রাখল অথবা কমিটির কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে সে সম্পর্কে আরও বিচার-বিবেচনা করতে অথবা বিলটি সংশোধন করতে কমিটিকে নির্দেশ দিল। এসব সত্ত্বেও সুসংগঠিত ও দক্ষ কমিটি ছাড়া মার্কিন কংগ্রেসের আইনসভার কক্ষ দুটির পক্ষে কাজ চালানো অসম্ভব।

ক্রমশ আইন-প্রণয়নের সমস্যা ও জটিলতা যত বাড়তে লাগল, কমিটির প্রয়োজনীয়তা তত বেশি অনুভূত হতে লাগল। ব্রাইস্ বলেছেন, স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার পক্ষে সবচেয়ে বড় যে অসুবিধা স্থায়িভাবে থেকে যায় তা হল আইন-প্রণয়ন অথবা শাসন-পরিচালনার বিষয়ে বহুসংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত আইনসভাকে দিয়ে অবাধে এবং তাড়াতাড়ি কাজ করিয়ে নেওয়া।

এই অসুবিধা দূর করার প্রধান উপায় হল কমিটি-প্রথা। এই প্রথা ব্রিটেনে কিছুটা এবং ফ্রান্স তার চেয়ে বেশি গ্রহণ করেছে। তবে সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিটি-প্রথা সৃষ্টি হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে, যেমন সৃষ্টি হয়েছে অন্য কতগুলি রাজনৈতিক রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান, যেগুলির কথা সংবিধানে উল্লেখ নেই—অথচ যেগুলি এখন প্রচলিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম দিকে প্রতিনিধিসভা প্রধানত আইন প্রণয়ন করত, আর সেনেটের ওপর ছিল শাসন-পরিচালনার কাজের দায়িত্ব। তখন কমিটি বিশেষ ছিল না এবং তখন কমিটির প্রয়োজনও অনুভূত হয়নি।

সংবিধান গৃহীত হয়ে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার তের বছর পর ১৮০২ সালে প্রতিনিধি সভার মাত্র পাঁচটি স্ট্যান্ডিং কমিটি ছিল, আর ১৮১৬ সালের পূর্বপর্যন্ত সেনেটের কোন কমিটিই ছিল না। অবশ্য এর পর থেকে কমিটি-প্রথার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় এবং আইন-প্রণয়নের ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব এসে পড়ায় কমিটি-গুলিকে ক্রমশ শাসন-ব্যবস্থার বাড়তি প্রত্যঙ্গ হিসাবে যোগ করা হতে থাকে।

কালক্রমে কংগ্রেসের এই কমিটিগুলির গঠন, সংখ্যা, তাদের ক্ষমতা এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ম-কানুনের বহু পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং নানাভাবে রদবদল করতে হয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য।

এখন কংগ্রেসের দুটি শাখার যে স্থায়ী কমিটিগুলি আছে সেগুলি গঠিত হয় ১৯৪৬ সালের "লেজিসলেটিভ রিঅর্গানাইজেসন্ অ্যাক্ট' বা আইনসভা-পুনর্গঠন-আইনবলে। আর বিশেষ কমিটি বা অস্থায়ী কমিটি গঠন করতে হলে তা করা হয় সংশ্লিষ্ট শাখা-আইনসভায় এক প্রস্তাব পাস করে। সাবকমিটি গঠন করা হয় প্রতিনিধিসভা বা সেনেটের আদেশে। অনেক সময় আইন-প্রণয়নের কাজের সুবিধার জন্য কোন স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান তাঁর সহযোগীদের মত নিয়ে সাবকমিটি নিযুক্ত করেন।

ইদানীং কালে কমিটি-প্রথায় উল্লেখযোগ্য যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে সাব-কমিটিগুলির দ্রুত সংখ্যা-বৃদ্ধি। আর সমাজের দিক থেকে তার চেয়েও উল্লেখ-যোগ্য এবং মৌলিক পরিবর্তন যেটা গোড়া থেকে লক্ষ্য করা গেছে সেটা হল কমিটিগুলির কার্যবিবরণী প্রচার করার দিকে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা।

জাতীয় নিরাপত্তার কারণে কমিটিগুলির গোপন অধিবেশন অনেক সময় প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তা ছাড়া ঘরোয়াভাবে যখন কোন আইন প্রণয়ন সম্পর্কে কমিটির সদস্যরা আলোচনা করেন তখন সেসব অধিবেশনেও গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। আজকাল প্রায় সব অধিবেশনই প্রকাশ্য এবং সেখানে সংবাদপত্রের ও রেডিওর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকেন।

কমিটিগুলির সমস্ত অধিবেশনই ছিল গোপন, যেমন ছিল কংগ্রেসের কিছু কিছু দৈনিক অধিবেশন। ১৮২০ সাল নাগাদ প্রতিনিধিসভা এই গোপন অধিবেশন-প্রথা বন্ধ করে দেয়। ১৯২৯ সালের পর থেকে সিনেটের অধিবেশন আর গোপনে বসেনি। কংগ্রেস তখন থেকে সাধারণভাবে এই নীতি গ্রহণ করে যে জনস্বার্থের বিঘ্ন না ঘটিয়ে সরকারী সমস্ত কাজ যতদূর সম্ভব প্রকাশ্যভাবে সম্পন্ন করা উচিত। কংগ্রেসের কমিটিগুলিও এই নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

কমিটিতে কোন্ কোন্ সদস্যকে নেওয়া হবে সেটা নির্ভর করে প্রধানত দুটি বিষয়ের ওপরে—সদস্যপদে জ্যেষ্ঠত্ব এবং সদস্যদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ। এই ভিত্তিতে দলের নেতা অথবা পরিচালকগোষ্ঠী কমিটির শূন্য পদগুলি পূরণ করেন। কমিটির সভাপতি কমিটির সভ্যপদে জ্যেষ্ঠত্বের বিচারে নিযুক্ত করা হয়।

কমিটিগুলির আকারগত বিভিন্নতা থাকলেও সভ্যপদ সাধারণত প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে অর্থাৎ রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাটদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়। কংগ্রেসের যে কক্ষে কমিটি গঠন করে সেই কক্ষে এই দুই দলের সদস্য-সংখ্যা যেরকম থাকে কমিটিতে সেই আনুপাতিক ভিত্তিতে সভ্য নিযুক্ত করা হয়।

'লেজিসলেটিভ্ রিঅর্গানাইজেসন্ অ্যাক্ট' বা আইন-প্রণয়ন সম্পর্কিত পুনর্গঠন আইনটি যখন পাস হয় তখন আশা করা গিয়েছিল যে, আইনসভা দুটির স্থায়ী কমিটির সংখ্যা কমানোর ফলে কংগ্রেসের কাজ বেশ সরল ও সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন হবে। কারণ তখন বহুধা বিচ্ছিন্ন আইন-প্রণয়নের দায়িত্ব সুসম্বদ্ধ হবে। একশো সদস্য-বিশিষ্ট সেনেটের স্থায়ী কমিটি সংখ্যা ৩৩ থেকে কমিয়ে ১৬ করা হল আর ৪৩৭ সদস্য-বিশিষ্ট হাউস অফ্ রেপ্রেজেণ্টেটিভ্সের ৪৮টি কমিয়ে ২০টি করা হল। প্রতি নতুন কমিটিকে গভর্মেণ্টের প্রধান কর্ম পরিকল্পনাগুলির ভার ভাগ করে দেওয়া হল।

আইন-প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত হওয়া দূরে থাক, কমিটিগুলির সংখ্যা কমানোর ফলে দেখা গেল স্বল্পসংখ্যক কমিটির তুলনায় কাজের বোঝা অতিরিক্ত ভারী হয়েছে এবং কাজগুলি ঠিকভাবে করতে হলে কমিটিগুলিতে সাব-কমিটিতে বিভক্ত না করলে উপায় থাকে না। কমিটিগুলিও নিজেরা ক্রমশ সাবকমিটিতে বিভিক্ত হওয়ার ফলে কমিটি এবং সাবকমিটির সংখ্যা বেড়ে এত বেশি হয়েছে যে কংগ্রেসের ইতিহাসে ইতিপূর্বে এরূপ হয় নি।

কমিটিগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক ফল দাঁড়িয়েছে এই যে কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যকেই আজকাল কমিটির কাজে আগেকার তুলনায় অনেক বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়— কখনও শুনানী, কখনও বা তদন্ত, আবার কখনও বিভিন্ন আলোচনা বৈঠকে মিলিত হওয়া, প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। তা ছাড়াও রয়েছে আইন-প্রণয়নের মূল কাজ।

১৯৬১ সালে ৮৭তম কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনশেষে কর্তব্যরত কমিটি ও সাব-কমিটির মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল দু'শরও বেশি। এর মধ্যে রয়েছে ৩৪টি যুক্ত বা জয়েণ্ট কমিটি; সেনেটের ১৬টি স্থায়ী কমিটি এবং ৬৬টি সাব-কমিটি এবং হাউস অফ্ রেপ্রেজেণ্টেটিভসের ২০টি স্থায়ী কমিটি এবং ৯৩টি সাব-কমিটি। এ ছাড়া কতগুলি সিলেকট্ বা বিশেষ কমিটিও রয়েছে।

এদের মধ্যে ইদানীংকালে যে স্থায়ী কমিটিগুলি কাজ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে সেগুলি হচ্ছে কংগ্রেসের দুই শাখা-আইনসভার বরাদ্দ মঞ্জুর কমিটি, বিচার-বিভাগীয় কমিটি এবং সেনেটের পররাষ্ট্রবিভাগীয় কমিটি।

পররাষ্ট্র বিষয়ক সমস্যা, আইন প্রণয়ন, সন্ধি ও চুক্তি, মন্ত্রণা এবং প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক মনোনীত বিভিন্ন পদস্থ রাজকর্মচারী ও রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ নিয়ে সেনেটে পররাষ্ট্র বিভাগীয় কমিটি সব সময়েই ব্যস্ত থাকে। এই কমিটি আটটি উপদেষ্টা সাব-কমিটিতে বিভক্ত এবং এদের প্রত্যেকের শাসন-পরিচালন ও আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত দায়িত্ব থাকে।

এইসব সাব-কমিটির প্রতিটি সদস্যকে বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের অবস্থা এবং সেখানকার সমস্যা সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। ১৯৬০ সালের শেষ কয়েক মাস এই কমিটির প্রত্যেক সদস্য ইউরোপ, এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি পরিভ্রমণ করেন এইসব দেশের সমস্যাগুলি জানতে ও বুঝতে এবং অন্যান্য সকল কমিটির সুবিধার জন্য সেই সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি করতে। এসব তাঁরা করেছিলেন ১৯৬১ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের প্রস্তুতি হিসাবে।

অল্পদিন আগে কংগ্রেসের একটি অধিবেশনকালে পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির ১০২টি বৈঠক হয; তা ছাড়া এই কমিটিকে ২২টি বিভিন্ন বিষয়ে শুনানী নিতে হয় এবং নীতি-নির্ধারণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য ২৮ বার কমিটির সদস্যদের তলব করা হয়। উপরন্তু এই কমিটির সাব-কমিটিগুলি ৪৮টি আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক এবং ২৮টি নীতি-নির্ধারণ বিষয়ে পরামর্শ-সভা ডাকেন।

ওপরের বিবরণ থেকে কংগ্রেসের কতগুলি প্রধান কমিটিকে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় তার একটা ছবি পাওয়া যাবে। এর মধ্যে রয়েছে সেইসব কমিটি বাইরের দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলি যাদের প্রধান কর্মদায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তার মানে এই নয় যে, অন্যান্য কমিটিগুলির গুরুত্ব কম। যে কমিটি তদন্ত করবার জন্য গঠিত হয় তাদের কর্মব্যস্ততা পররাষ্ট্র-বিষয়ক কমিটিরই মত।

মার্কিন কমিটি ব্যবস্থা ও ব্রিটিশ কমিটি ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন—উভয় রাষ্ট্রেই এখন কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে আইন সভার কাজ বহুল পরিমাণে সম্পাদিত হয়। কিন্তু উভয় দেশের কমিটি ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

১. ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রিরা পার্লামেন্টের নেতা হিসাবে কাজ করেন। তাঁরাই বিল উপস্থাপন করেন, বিলের সমর্থনে বক্তৃতা দেন কিংবা বিলের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। শাসক দলের সদস্যদের ওপরেও এই নির্দেশ থ যে সরকার তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক উত্থাপিত বিল যেন তাঁরা সমর্থন করেন। এককথায় শাসন-বিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা, দলীয় শৃঙ্খলা ইত্যাদির জন্য ব্রিটেনে আইন পাস করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি বা তাঁর কোন ক্যাবিনেট সদস্য কংগ্রেসে কোন বিল উত্থাপন করতে পারেন না। কমিটির সদস্যগণই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে বিল উত্থাপন করেন। এক কথায় বলা যায় যে, ব্রিটেনের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রিরা যে ভূমিকা পালন করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই ভূমিকা পালন করেন কমিটির চেয়ারম্যানরা।

২, ব্রিটেনে বিলের দ্বিতীয় পাঠের সময়েও অনেক সময় বিলটি কান কমিটিতে পাঠানো হয়। যেহেতু মন্ত্রিরা কমিটির রিপোর্ট সভাকক্ষে উপস্থাপিত করেন, ফলে

কমিটির চেয়ারম্যানদের ভূমিকা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক সময় কোন বিল উপস্থাপনের পরেই কমিটিতে পাঠানো হয়, বিলটির প্রথম পাঠের জন্য অপেক্ষা করা হয় না। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিটির চেয়ারম্যানদের নামেই বিল প্রচারিত হয়।

৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটিতে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত সতর্ক ও তৎপর থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সবসময়ই কমিটিতে নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখে। কিন্তু ব্রিটেনে কমিটি সদস্য নির্বাচনের সময় এতটা দলীয় মনোভাবের প্রাধান্য দেখা যায় না। মার্কিন প্রতিনিধিসভায় প্রথমে কমিটি সদস্যগণ দল কর্তৃক মনোনীত হন, পরে তাঁরা সমগ্র কক্ষ দ্বারা নির্বাচিত হন। কিন্তু ব্রিটেনে কমন্সসভার নির্বাচনী কমিটি অন্যান্য কমিটির সদস্যদের মনোনীত করে।

৪। সদস্যসংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, ব্রিটেনে কমিটির সদস্যসংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কমিটিগুলির সদস্যসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি।

৫. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের সদস্যদের মান-মর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তি নির্ভর করে তাঁরা কোন কমিটির সদস্য তার ওপরে। কেননা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়নে কমিটিগুলিই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তাই গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলির সদস্য বা চেয়ারম্যান পদের জন্যে সদস্যদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার মনোভাব দেখা যায়। কিন্তু যেহেতু ব্রিটেনে কমিটিগুলি ততটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না, ফলে সদস্যগণ কোন কমিটির সদস্য পদ লাভের জন্য ততটা ব্যগ্র নন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিটির চেয়ারম্যানগণ বিপুল ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী। তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কিন্তু ব্রিটেনে কমিটির চেয়ারম্যানরা তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ ভূমিকা পালন করেন।

নয়ঃ মার্কিন কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটি এবং সাব-কমিটি (Committees and Sub-Committies of Congress)

(ক) সিনেট এবং প্রতিনিধি সভার যুগ্ম কমিটি

১। **মুদ্রণ সম্পর্কে যুগ্ম কমিটি**—এই কমিটির কাজ হ'ল সরকারী মুদ্রণ অফিস দ্বারা আইন, ব্যবস্থাপক ও বিচার সংস্থাসমূহের সকল সরকারী দলিলপত্র মুদ্রণ ও বাঁধাই। এই কমিটি মুদ্রণ অফিসের বোর্ড অফ গভর্নরস্ হিসাবে কাজ করে।

২। **গ্রন্থাগার সম্পর্কে যুগ্ম কমিটি**—পুস্তক ক্রয় বা সংগ্রহ কংগ্রেসের গ্রন্থাগার পরিচালন-নীতি নির্ধারণ এবং কংগ্রেসের গ্রন্থাগারের সাধারণ তত্ত্বাবধান এই কমিটির কাজ।

৩। **পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত যুগ্ম কমিটি**—এই কমিটি পারমাণবিক শক্তি কমিশনের কার্যাদি নিরন্তর পর্যবেক্ষণ করতে এবং পারমাণবিক শক্তির উন্নয়ন, ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যাপার সর্বদা পর্যবেক্ষণে রাখতে আইনসিদ্ধভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

৪। **অভ্যন্তরীণ রাজস্ব ও কর সম্পর্কিত যুগ্ম কমিটি**- এই কমিটি প্রতিনিধি সভার 'ওয়েজ অ্যান্ড মিনস্' এবং সেনেট ফিনান্স কমিটির অধীন একটি সংস্থা। ঐ কমিটি দুটি একত্রে সকল রাজস্ব আইন-প্রণয়ন করে। আইনজীবী, বিশ্লেষক, অর্থনীতিবিদ্ ও পরিসংখ্যানবিদ্‌দের নিয়ে এই যুগ্ম কমিটির একদল কর্মী আছেন যাঁরা দুটি আইনসভা কমিটির কাজের সুবিধার জন্য কর-নীতি ও কার্যসূচী ক্রমাগত পর্যালোচনা করেন।

৫। **সরকারী দলিলপত্র বিন্যাস সম্পর্কিত যুগ্ম কমিটি**—আইন-প্রদত্ত অধিকার-বলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই কমিটি সরকারী নথিরক্ষক সরকারী দলিলপত্র রক্ষণাবেক্ষণের যে কাজ করে তা পর্যবেক্ষণ করে।

৬। **প্রতিরক্ষা-উৎপাদন সম্পর্কিত যুগ্ম কমিটি**—প্রতিরক্ষা-উৎপাদন-আইন অনুসারে সৃষ্ট এই কমিটি কংগ্রেসের ইচ্ছানুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য প্রতিরক্ষা কর্মসূচী পরীক্ষা করে। এই কমিটি ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্য-পর্যালোচনা কাজও সম্পাদন করে।

৭। **অর্থনৈতিক রিপোর্ট সম্পর্কিত যুগ্ম কমিটি**—এই কমিটি রাষ্ট্রপতির কংগ্রেসে প্রদত্ত বার্ষিক অর্থনৈতিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করে এবং রিপোর্টে উল্লিখিত আইন-প্রণয়নের জন্য কংগ্রেসকে রিপোর্ট দাখিল করে। কমিটির মতে কংগ্রেসের সহায়তা হতে পারে এমন অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কেও পর্যালোচনা করার অধিকার এই যুগ্ম কমিটির আছে।

৮। **অনাবশ্যক ফেডারেল ব্যয় হ্রাস সম্পর্কিত যুগ্ম কমিটি**—দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে যে কোন স্তরে সরকারী কাজ ও ব্যয় পর্যালোচনা করার আইনগত ব্যাপক অধিকার এই কমিটির আছে। এ ছাড়া প্রশাসনে এমন অনাবশ্যক ব্যয় ও অপচয় আছে যা রাষ্ট্রপতির বাজেট বরাদ্দ নিয়ে কংগ্রেসে আলোচনাকালে বন্ধ করা সম্ভব। সেই সকল বিষয় অনুসন্ধান করার অধিকার এই কমিটির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

৯। **অভিবাসন এবং জাতি-নির্ধারণ-নীতি সম্পর্কে যুগ্ম কমিটি**—ইহা একটি নূতন কমিটি; ইহার কাজ অনেকটা চৌকিদারের, অর্থাৎ অভিবাসন আইন প্রযুক্ত হবে কি না সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া। ১৯৫৩ সালে অভিবাসন-সাব-কমিটি ইউরোপে জনসংখ্যার চাপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। এই তথ্য পরে যুগ্ম কমিটির কাজে লাগে।

১০। **নাভাজো-হোপি রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রশাসন সম্পর্কিত যুগ্ম কমিটি**—দক্ষিণ-পশ্চিম সংরক্ষিত রেড ইণ্ডিয়ান এলাকার ইণ্ডিয়ান উপজাতি নাভাজো হোপিদের পুনর্বাসন কর্মসূচীর প্রশাসন-ব্যবস্থা পরীক্ষা এবং তাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় আইন-প্রণয়নে প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য সৃষ্ট ইহা আর একটি চৌকিদারী কমিটি।

এইসব যুগ্ম কমিটির একটিও সাব-কমিটির মাধ্যমে কাজ করে না। সিনেট ও প্রতিনিধিসভার সদস্য নিয়ে এই কমিটিগুলি গঠন করা হয়। এই কমিটিগুলির আয়তন বিভিন্ন প্রকারের এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। কংগ্রেসের যে-কোন শাখার সদস্য এইসব কমিটির চেয়ারম্যান হতে পারেন।

(খ) সিনেটের কমিটি ও সাব-কমিটি

১। স্ট্যাণ্ডিং কমিটিসমূহ

(ক) **কৃষি ও বন বিষয়ক**—১৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত। কৃষিবিভাগের সকল আইন-প্রণয়ন এই কমিটির কর্মপরিধির অন্তর্গত।

(খ) **অর্থবরাদ্দ মঞ্জুর বিষয়ক**—২৩ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত। অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কিত সমস্ত বিল এই কমিটির এক্তিয়ারে। এই বিলগুলি প্রতিনিধিসভায় প্রথম উত্থাপিত হয় এবং তারপর সেখান থেকে এই কমিটিতে আসে। এই কমিটির ১১টি সাব-কমিটি আছে।

(গ) **সামরিক বাহিনী বিষয়ক**—১৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত। কেবল অর্থ-বরাদ্দ-মঞ্জুর কমিটি ছাড়া অন্যান্য কমিটির মত এই কমিটিও সামরিক কাজ সংক্রান্ত মূল নীতি-নির্ধারক এবং সামরিক বাহিনীর পরিচালনা বিষয়ে আইন-প্রণয়নের কাজে ব্যাপৃত থাকে।

(ঘ) **ব্যাঙ্কিং ও দেশের প্রচলিত মুদ্রা বিষয়ক**—১৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত। এর নাম থেকেই বোঝা যাবে, ব্যাঙ্কিং ও জাতীয় মুদ্রা সংক্রান্ত সকল আইন-প্রণয়নের ওপর এই কমিটির কর্তৃত্ব রয়েছে।

(ঙ) **কলাম্বিয়া জেলা বিষয়ক**—এই কমিটি ৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। কলাম্বিয়া জেলা ফেডারেল সরকারের এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এই জেলায় জাতীয় রাজধানী ওয়াশিংটনে অবস্থিত। এই জেলার শাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের ওপর কংগ্রেসের একচ্ছত্র অধিকার সংবিধান থেকে দেওয়া হয়েছে। জাতীয় রাজধানীর উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল নীতি নির্ধারণের প্রধান দায়িত্ব এই কমিটির ওপরে ন্যস্ত।

(চ) **অর্থ কমিটি**—এই কমিটি ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। "ওয়েজ অ্যান্ড মিনস্" কমিটির সঙ্গে প্রতিনিধিসভার যে সম্পর্ক এই কমিটির সঙ্গে সিনেটেরও ঠিক সেই সম্পর্ক। এই দুই কমিটি কর ও শুল্কনীতি সমেত সমস্ত রাজস্ব-উৎপাদক আইন-প্রণয়নে স্ব স্ব আইনসভার পক্ষে কাজ করে থাকে।

(ছ) **বৈদেশিক নীতি বিষয়ক**—১৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত। সিনেটের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত কমিটিগুলির একটি হচ্ছে এই বৈদেশিক-নীতি-বিষয়ক কমিটি। আইন-প্রণয়ন ও প্রশাসনিক—এই দুরকম কাজ থাকে সিনেটের। এই কমিটি উভয়-ক্ষেত্রেই সিনেটের হয়ে কাজ করে। এই কমিটির কাছে তার বিবেচনার জন্য যে-বিষয়গুলি আসে সেগুলি হচ্ছে বৈদেশিক-নীতি-নির্ধারণ, যুদ্ধ-ঘোষণা, নিরপেক্ষতা-রক্ষা, বৈদেশিক সাহায্য, সিনেটের অনুমোদন-সাপেক্ষ সমস্ত সন্ধি ও চুক্তি এবং শাসনপরিচালন-বিভাগ কৃত চুক্তি; এবং পররাষ্ট্র বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহের পদগুলিতে রাষ্ট্রপতির মনোনয়নসমূহ।

(জ) **প্রশাসনিক পরিচালন ব্যবস্থা বিষয়ক**—এই কমিটি ১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। মূলত এই কমিটির কাজ হচ্ছে চৌকিদারের কাজ, তদন্তকারীর কাজ। এই কমিটির দৃষ্টি সরকারের সমস্ত কাজের ওপর ন্যস্ত রয়েছে এবং ইদানীং এই কমিটির প্রধান কাজ হল দুর্নীতি, কমিউনিস্ট কার্যকলাপ এবং শাসন-পরিচালন বিভাগগুলির যাবতীয় নিয়মবহির্ভূত কার্যকলাপ সম্পর্কে আনীত সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করা।

(ঝ) **স্বরাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের অধীন দ্বীপগুলির প্রশাসন বিষয়ক**—১৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত। স্বরাষ্ট্র বিভাগের যাবতীয় আইন-প্রণয়ন ও নীতি-নির্ধারণ এই কমিটির কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। আলাস্কা, হাওয়াই, পুর্তোরিকো, ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ, গুয়াম, সামোয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত অছিভুক্ত (Trust) এলাকাগুলির প্রশাসন তদারক করা এই কমিটির কাজ।

(ঞ) **আন্তঃরাজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক**—১৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত। এই কমিটির কোন স্থায়ী সাব-কমিটি নেই। সাধারণভাবে এই কমিটি আন্তঃরাজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখে।

(ট) **বিচার বিভাগীয়**—এই কমিটি ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সাব-কমিটি সহযোগে এই কমিটির কার্য-পরিধি খুবই বিস্তৃত।

(ঠ) **শ্রমিক ও জনকল্যাণ বিষয়ক**—১৩ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত। শাসন-পরিচালন-শাখার দুটি বিভাগ—শ্রমিক বিভাগ এবং নতুন-সৃষ্ট স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণ বিভাগ। এই দুটি বিভাগের কার্য-কলাপ এই কমিটির আওতায় পড়ে এবং এই দু' বিভাগের সমস্যা ও কর্মনীতি সংক্রান্ত আইন-প্রণয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্বও এই কমিটির ওপর ন্যস্ত।

(ড) **ডাক বিভাগ ও বে-সামরিক কর্মচারী বিষয়ক**—এই কমিটি ১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এই কমিটি ডাক বিভাগীয় কর্মচারী ও অন্যান্য বে-সামরিক সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়গুলি দেখে। এই কমিটির কোন স্থায়ী সাব-কমিটি নেই।

(ঢ) **পূর্ত বিভাগ**—১৩ জন সদস্য। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, সরকারী ভবন ও মাঠ এবং পথ—এ তিনটি বিষয় এই কমিটির দায়িত্বে আছে।

(ণ) **পরিচালন বিধি ও প্রশাসন বিষয়ক**—এই কমিটি ৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সিনেটের যাবতীয় নিয়মকানুন, সিনেটের কমিটিগুলির ব্যবহারের জন্য তহবিল, কংগ্রেসভবনের প্রশাসন, লাইব্রেরী অব কংগ্রেস, সিনেট লাইব্রেরী, ইত্যাদি বিষয় এই কমিটির কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

বেশির ভাগ স্ট্যান্ডিং কমিটি সপ্তাহে একবার বা মাসে দুবার নিয়মিতভাবে বৈঠকে মিলিত হন। চেয়ারম্যানের আহ্বানে অর্থ-বরাদ্দ-মঞ্জুর কমিটির বৈঠক বসে। সমস্ত কমিটি এবং সাব-কমিটি যে-কোন সময় এবং যতবার প্রয়োজন ততবার বৈঠকে বসাতে পারে।

২। **সিলেক্ট্ ও স্পেশ্যাল কমিটি**

উল্লিখিত ১৫টি স্ট্যান্ডিং কমিটি ছাড়াও সেনেটের নিম্নোক্ত তিনটি সিলেক্ট বা বিশেষ কমিটি আছে :

(ক) **মেজারিটি-পলিসি-কমিটি বা সংখ্যাগুরু দলের নীতি-নির্ধারক কমিটি :** বর্তমানে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তার মধ্য থেকে ১১ জন সেনেটর নিয়ে এই কমিটি গঠিত। এই কমিটি সেনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কর্মসূচী পরিচালিত করে।

(খ) **মাইনরিটি-পলিসি-কমিটি বা সংখ্যালঘু দলের নীতি-নির্ধারক কমিটি :** সংখ্যালঘুদলের নয় জন সেনেটর নিয়ে গঠিত এই কমিটি অনুরূপভাবে সংখ্যালঘুদলের কার্যসূচী নির্ধারণ করে।

(গ) **সিলেক্ট্ কমিটি অন স্মল্ বিজনেস্ বা ক্ষুদ্র ব্যবসায় সম্পর্কে সিলেক্ট্ কমিটি :** এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৩।

(গ) **যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিসভার কমিটি ও সাব-কমিটিসমূহ।**

সব সময় অভিন্ন না হলেও প্রতিনিধিসভার তথাকথিত স্থায়ী বা স্ট্যান্ডিং কমিটি গুলো অধিকাংশক্ষেত্রে সেনেটের স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর মত কাজ করে এবং একই বা অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী।

১। **স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ**

(ক) **কৃষি বিষয়ক**—এই কমিটি ৩৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এই কমিটির কর্ম-পরিধি ও ক্ষমতা সিনেটের অনুরূপ কমিটির মত।

(খ) **অর্থ-বরাদ্দ-মঞ্জুর বিষয়ক**—এই কমিটি ৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। হাউস কমিটিগুলির মধ্যে ইহাই সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে কর্মব্যস্ত। এই কমিটির কাজ সিনেটের অনুরূপ কমিটির মত।

(গ) **সশস্ত্রবাহিনী বিষয়ক**—৪০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এই কমিটির দায়িত্ব সিনেটের অনুরূপ কমিটির মত।

(ঘ) **ব্যাঙ্কিং ও দেশের প্রচলিত মুদ্রা বিষয়ক**—৩০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। দায়িত্বভার সেনেটের অনুরূপ কমিটির মত। এ কমিটির কোন সাব-কমিটি নেই।

(ঙ) **কলাম্বিয়া জেলা বিষয়ক**—২৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এই কমিটির দায়িত্বের বিবরণ সিনেটের অনুরূপ কমিটির মত। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আমোদপ্রমোদ ; সরকারী নিয়োগ,—রাস্তাঘাট ও যানবাহন ; জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, জীবন-বীমা ও ব্যাঙ্কিং—এইসব সম্পর্কে বিভিন্ন সাব-কমিটি আছে।

(চ) **শিক্ষা ও শ্রম বিষয়ক**—এই কমিটি ৩০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এই কমিটির অনুরূপ কোন কমিটি সিনেটের নেই। সাধারণভাবে শিক্ষা ও শ্রম বিষয়ে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলি এই কমিটির কাছে আসে।

(ছ) **বৈদেশিক নীতি বিষয়ক**—৩২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। প্রতিনিধিসভার বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত কমিটি শুধু মাত্র আইন-প্রণয়ন ও নীতি-নির্ধারণ বিষয়ে দায়িত্বভারপ্রাপ্ত। সিনেটের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত কমিটির মত প্রতিনিধিসভার কমিটির কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই।

(জ) **প্রশাসনিক পরিচালনব্যবস্থা বিষয়ক**—৩০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। নতুন গঠিত এই কমিটির সঙ্গে সিনেটের এই নামের কমিটির ঘনিষ্ঠ মিল আছে।

(ঝ) **হাউস-প্রশাসন বিষয়ক**—২৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সাধারণভাবে বলতে গেলে সিনেট পরিচালন-বিধি-কমিটির যে কাজ এই কমিটিরও ঠিক একই কাজ।

(ঞ) **স্বরাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ দ্বীপগুলির প্রশাসন বিষয়ক**—৩৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিটির দায়িত্বভার মোটামুটিভাবে সিনেটের অনুরূপ কমিটির মত।

(ট) **আন্তঃরাজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক**—৩৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এই নামের সিনেট কমিটি সিনেটের পক্ষে যে-কাজ করে এই কমিটিও প্রতিনিধিসভার পক্ষে সেই কাজ করে।

(ঠ) **বিচার-বিভাগীয়**—এই কমিটি ৩২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এদের দায়িত্বের সঙ্গে সিনেট বিচারবিভাগীয় কমিটির দায়িত্বের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে।

(ড) **বাণিজ্যপোত ও মৎস্যচাষ বিষয়ক**—৩২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সিনেটে অনুরূপ কোন কমিটি নেই। এই কমিটির কর্মপরিধির অন্তর্গত হচ্ছে : মৎস্য-চাষ, বাণিজ্য জাহাজ, এবং আর এমন কতগুলি বিষয় যেগুলি সিনেটের বিভিন্ন কমিটির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

(ঢ) **ডাকঘর ও সিভিল সার্ভিস বিষয়ক**—২৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এই নামে সিনেটে অনুরূপ কমিটি আছে।

(ণ) **পূর্ত বিষয়ক**—এই কমিটি ৩৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। পূর্ত সম্পর্কে সিনেটের অনুরূপ কমিটির সমতুল্য দায়িত্ব এই কমিটির। এই কমিটির নদী ও পোতাশ্রয়, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও পথঘাট এবং সরকারী ভবন ও মাঠ সম্পর্কে সাব-কমিটি রয়েছে।

(ত) **বিধি বিষয়ক**—১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এই কমিটির আধা-রাজনৈতিক, আধা-আইন প্রণেতার চেহারা ও ক্ষমতা একে কংগ্রেসের কমিটিগুলির মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী কমিটিতে পরিণত করেছে। এই কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একমাত্র আপীল চলে সমগ্র হাউসের সদস্যদের কাছে।

(থ) **অ-মার্কিনী কার্যকলাপ বিষয়ক**—৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। চালু কমিটি-গুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোট এই কমিটি হচ্ছে প্রধানত তদন্ত কমিটি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করা এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধাচরণ করা এই কমিটির কাজ। এই কমিটির ওপর কমিউনিস্টদের গুপ্ত স্থান থেকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব পড়ায় আইনপ্রণয়ন-সংস্থা হিসাবে এই কমিটি এক অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে।

(দ) **অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের বিষয় সম্বন্ধীয়**—২২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সিনেটের এই কমিটির অনুরূপ কোন কমিটি নহে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই কমিটি সৃষ্ট হয় যুদ্ধফেরৎ মার্কিন সৈন্যদের সম্পর্কে আইন-প্রণয়ন সমস্যাদির প্রতি এই কমিটি যাতে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে তার জন্যে।

(ধ) **ওয়েজ অ্যান্ড মীনস্ (অর্থ সম্পর্কিত)**—২৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সিনেটের সঙ্গে ফিনান্স কমিটির যে সম্পর্ক এই কমিটির সঙ্গে প্রতিনিধিসভার সেই এক সম্পর্ক।

২। **সিলেক্ট্ কমিটিসমূহ**

(ক) **ক্ষুদ্র ব্যবসায়-কমিটি**—১১ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। একই নামে সিনেটের অনুরূপ কমিটি আছে। এই কমিটির কোন সাব-কমিটি নেই। প্রতিনিধিসভার এই একটি মাত্র সিলেক্ট কমিটি। এইসব সিলেক্ট্ কমিটির অধিকাংশই একটিমাত্র উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করতে গঠিত হয় এবং সেজন্য সাধারণত এগুলি স্থায়ী না হয়ে অস্থায়ী হয়।

দশ : কংগ্রেস ও বৈদেশিক নীতি (Congress and Foreign Policy)

মার্কিন সংবিধানের নিয়ম-অনুযায়ী বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ এবং তা কাজে পরিণত করার দায়িত্ব যুক্তভাবে রাষ্ট্রপতি এবং কংগ্রেসের। এই ক্ষেত্রে কে কী ভাবে কাজ করবেন সংবিধানে সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ও আভাসে নির্দেশ দেওয়া আছে।

যুক্তভাবে এই কাজ কী করে সম্পন্ন করা হয় তা ভাল করে বোঝানোর জন্য এই যুগ্ম-দায়িত্বের বিবিধ ক্ষেত্রগুলি নীচে উল্লেখ করা হল :

১। বৈদেশিক নীতি পরিচালনার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন্ নীতি অনুসরণ করা হবে তা রাষ্ট্রপতি অথবা তাঁর পররাষ্ট্র-সচিব গ্রহণ করেন।

২। উপরোক্ত এই বিশেষ অধিকার রাষ্ট্রপতির থাকা সত্ত্বেও কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পন্ন করতে হলে তা "সিনেটের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং সেনেটের অনুমতি নিয়ে' করতে হবে এবং সে চুক্তি কার্যকর হতে হলে তা সিনেটে উপস্থিত এবং ভোট দানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হওয়া চাই।

৩। কোন বৈদেশিক নীতি অনুযায়ী কাজ করতে হলে তার জন্য যেহেতু অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হয়, অথবা আইনসভার অনুমিত বা তার কাছ থেকে বিশেষ অধিকার চাইতে হয়, সে কারণে পররাষ্ট্র নীতি কী হবে বা না হবে সে বিষয়ে শেষ কথা বলবার অধিকারী হচ্ছে কংগ্রেস।

আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেমন কংগ্রেসের একচ্ছত্র অধিকার, তেমনি অন্য কতগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন কোন সন্ধি সম্পাদন সম্পর্কে আলোচনা একমাত্র রাষ্ট্রপতি চালাতে পারেন; বিদেশী কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও মন্ত্রীদের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা-সহকারে গ্রহণ করার একমাত্র অধিকারও রাষ্ট্রপতির। বিদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত, মন্ত্রী, প্রতিনিধি ও বাণিজ্যদূত নিয়োগ রাষ্ট্রপতি করে থাকেন। অবশ্য রাষ্ট্রপতির এই সব নিয়োগ সিনেটের অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত হয় না।

তবে যদি এরকম কোন সন্দেহ বা আশঙ্কা দেখা দেয় যে, রাষ্ট্রপতির কোনো কাজ বা সিদ্ধান্ত-গ্রহণে দেশের লোকের সমর্থন হয়তো পাওয়া যাবে না, তা হলে রাষ্ট্রপতিকে তখন বাধ্য হয়েই কংগ্রেসের এবং দেশের জনমতের সমর্থন পাবার চেষ্টা করতে হয়। কারণ, রাষ্ট্রপতি যে সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন তার গঠন ও পোষণের দায়িত্ব কংগ্রেসের। রাষ্ট্রপতি আবার যে আইন শাসনক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন তা রচনা করে কংগ্রেস।

১৯৫০ সালে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান যখম কোরিয়ায় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী আক্রমণ চালাবার জন্য মার্কিন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন তখন তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে কংগ্রেস এবং দেশের জনসাধারণ তাঁর এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করবে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে বলা হয়েছিল যে যেখানে এ রকম ব্যাপক আকারে যুদ্ধ, সেখানে আগে কংগ্রেসের মত না নিয়ে সমস্ত দেশকে এইভাবে যুদ্ধে ঠেলে দেওয়া রাষ্ট্রপতির উচিত হয়নি। কারণ সংবিধান অনুযায়ী একমাত্র কংগ্রেসই যুদ্ধ-ঘোষণা করতে পারে।

এভাবেও কংগ্রেস পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সংবিধানের ধারা কংগ্রেস কর্তৃক যেসকল আইন পাস করা হয় সেই সব আইন এবং যে সকল সন্ধিপত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাক্ষর থাকে সেই সকল সন্ধিপত্রকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ভাষায় বলা হয় "সর্বোচ্চ আইন" (Supreme law)। বিচারকের চোখে কংগ্রেস-প্রণীত আইন এবং সন্ধিপত্র দুইই সমান মর্যাদা পায় এবং এই দুয়ের মধ্যে যেটি পরে ঘটেছে সেটিই প্রাধান্য পায়। এর ফলে অনেক সময় এমন হতে পারে যে, কংগ্রেস প্রণীত কোন আইন (কোন সন্ধিপত্রের পরে পাস হওয়ার দরুন) সন্ধিপত্রকে নাকচ করে দিতে পারে, আবার তেমনি কোন সন্ধিপত্র অনুরূপ কারণে কংগ্রেস প্রণীত আইনকে বাতিল করতে পারে।

এই কারণে কোন সময় কংগ্রেস যদি কোন সন্ধিপত্রের প্রয়োগ আপত্তিকর মনে করে তবে নতুন আইন প্রণয়ন করে কংগ্রেস এই সন্ধিপত্রকে অকেজো করে দিতে পারে ; অথবা সন্ধিপত্র যদি এমন হয় যে তা কার্যকরী করতে হলে কংগ্রেস কর্তৃক আইন পাস করে তা করতে হয়, তা হলে কংগ্রেস সে রকম আইন পাস করতে অস্বীকার করতে পারে।

তা ছাড়া, কোন সন্ধিপত্র অথবা কংগ্রেস প্রণীত আইন সংবিধান-বিরোধী ঘোষণা করবার অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের আছে। সেরূপ ক্ষেত্রে সেই সন্ধিপত্র অথবা আইনের কোন কার্যকর ক্ষমতা থাকবে না। অবশ্য কোন সন্ধিপত্র অথবা তার কোন অংশবিশেষ এ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান-বিরোধী ঘোষণা করেননি, কিন্তু করবার সম্ভাবনা যে নেই এমন কথা বলা যায় না। কারণ আদালতের মতে কংগ্রেস-প্রণীত আইনের মতো সন্ধিপত্রকেও সমানভাবে সংবিধানের প্রাধান্য মেনে নিতে হয়।

সিনেটের অনুমোদন ছাড়া চুক্তি সম্পাদনের কোন অধিকার রাষ্ট্রপতির আছে বলে সংবিধান কোথাও স্বীকার করে নেয়নি। তবে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে চুক্তি সম্পাদনের জন্য কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে বিশেষ অধিকার দিতে পারে অথবা রাষ্ট্রপতি অন্য কোন অধিকারের মাধ্যমে এই ক্ষমতা পেতে পারেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এরকম বহু উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস অথবা সিনেটের সঙ্গে পরামর্শ না করে এমন অনেক চুক্তি সম্পাদন করেছেন অথবা এমন অনেক চুক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কতগুলি দায়িত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছে অথবা কতগুলি বাধ্যবাধকতার মধ্যে যেতে হয়েছে।

সংবিধান-নির্দিষ্ট কোন অধিকার না থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে অনেক সময় বৈদেশিক চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা চালাতে হয়। এটা তিনি করেন পররাষ্ট্র বিষয়ে তাঁর যে অধিকার আছে সেই অধিকারবলে অথবা রাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে। রাষ্ট্রপতির এইভাবে ক্ষমতার ব্যবহার সম্পর্কে কংগ্রেসে ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন উঠেছে এবং এই সমস্যা নিয়ে সুপ্রীম কোর্টকেও বহুবার মাথা ঘামাতে হয়েছে। তবুও কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা খর্ব করার কোন চেষ্টা হয়নি এবং তিনি এটা চালিয়ে যাচ্ছেন। পররাষ্ট্রনীতির অঙ্গ হিসাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত এই ধরনের চুক্তি সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের আমলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের কিছু আগে থেকে এবং যোগদানের পরে।

এই ধরনের চুক্তি নিয়ে তখনই বিতর্ক দেখা দেয় যখন এরকম মনে করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি এবিষয়ে তাঁর অধিকারকে ছাড়িয়ে গেছেন অথবা যখন দেখা যায় যে সম্পাদিত চুক্তির শর্তগুলি আইনসভার অথবা দেশের লোকের অনুমোদন লাভ করছে না। এই

ধরনের যে সকল চুক্তি গোপনে সম্পাদিত হয় এবং যার শর্তগুলি প্রথমে অপ্রকাশিত থাকে, এই গোপনীয়তার জন্য সেগুলি নিয়ে বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পরীক্ষা করা হয় এবং প্রায়ই সে চুক্তিগুলি দেশবাসীর বিরুদ্ধ সমালোচনার লক্ষ্য হয়, বিশেষ করে অপ্রকাশিত শর্তগুলি প্রকাশ হবার পরে। স্বাক্ষরিত হবার সময় গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয় বলে এই সব চুক্তিকে কিছুটা সন্দেহের চোখেও দেখা হয়।

বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বেশির ভাগ সময়েই মার্কিন বুর্জোয়া ব্যবস্থার রক্ষক ও সমর্থক হিসাবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং কংগ্রেস পারস্পরিক সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করে থাকেন। বুর্জোয়া স্বার্থের মধ্যে স্ব-বিরোধিতার জন্য মাঝে মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। কিন্তু কঠিন মতবিরোধ খুব কম সময় দেখা দেয় এবং দেখা দিলেও সেটা এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছে না যেখানে রাষ্ট্রপতি এবং কংগ্রেসের মত সম্পূর্ণ বিপরীত-মুখী হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে রাষ্ট্রপতি-প্রস্তাবিত কোন নীতি বা পরিকল্পনাকে সিনেট হয়তো নাকচ করে দেয়, যেমন দিয়েছিল ভার্সাই সন্ধি-প্রস্তাবকে। কিন্তু এরূপ ঘটনা নিয়মের ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। কারণ মনে রাখতে হবে যে, মার্কিন কংগ্রেস ও সিনেট একই শ্রেণীস্বার্থের রক্ষক।

৮

মার্কিন শাসনবিভাগ

American Executive

এক : মার্কিন শাসনবিভাগ (American Executive)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগ এবং এর কাঠামো আলোচনা করার সময়ে মার্কিন সংবিধানের দুটো বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। প্রথম বৈশিষ্ট্য হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত ঐ ব্যবস্থারই পরিপূরক হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসন ও আইনবিভাগের এক্তিয়ারকে স্বতন্ত্র করে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে সীমিতভাবে হলেও কার্যকর করা হয়েছে। মার্কিন সংবিধানের উপরোক্ত দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে মার্কিন শাসন-বিভাগের রূপরেখা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তিনি আইনসভা বা কংগ্রেসের সদস্য নন—এবং কংগ্রেসের কাছে দায়িত্বশীল নন। কংগ্রেসের আস্থার ওপরে তাঁর রাষ্ট্রপতি পদে আসীন থাকা নির্ভর করে না। তাই মার্কিন রাষ্ট্রপতির শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে কারও পরামর্শ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য উপরাষ্ট্রপতি আছেন। রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করার জন্য আছেন মন্ত্রিসভা। কিন্তু মন্ত্রিসভার পরামর্শ মানতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য নন। মন্ত্রিসভার সদস্যরা রাষ্ট্রপতির সহকর্মী নন—তাঁরা হলেন তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। ব্রিটেনের রাজা বা রানী হলেন আনুষ্ঠানিক প্রধান—সেখানে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত। সেখানে মন্ত্রিসভার সদস্যরা আইনসভারও সদস্য এবং আইনসভার কাছে মন্ত্রিসভা দায়িত্বশীল থাকে। ফলে ব্রিটেনের শাসনবিভাগকে সর্বদাই আইনসভার আস্থা অর্জন করে চলতে হয়। মার্কিন শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও এক্তিয়ার চূড়ান্ত এবং এ ব্যাপারে তাঁকে কারও কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয় না বা কারও পরামর্শ মেনে চলতে হয় না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী এবং ঐ ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে তাকে সাংবিধানিক দিক থেকে কারো পরামর্শ মানতে হয় না এবং তার কার্যাবলীর জন্যে কোথাও জবাবদিহি করতে হয় না। মার্কিন শাসন কাঠামোতে শাসনবিভাগীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রপতির পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে মার্কিন রাষ্ট্রপতির মতো এত ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন একক কর্তৃত্ব দেখা যায় না। সুতরাং মার্কিন শাসনকাঠামোর

প্রধান গুরুত্ব হল এর রাষ্ট্রপতির পদটি। রাষ্ট্রপতির পদের পাশাপাশি শাসন-কাঠামোতে উপরাষ্ট্রপতির একটি পদ আছে। উপরাষ্ট্রপতি সাধারণ অবস্থায় খুব বেশী শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতা ভোগ করেন না, তবে রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে বা রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে তিনি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

মার্কিন শাসন কাঠামোর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর মন্ত্রিসভা। ব্রিটেনের ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভা বলতে আমরা যা বুঝি সেরূপ ক্ষমতাশালী মন্ত্রিসভা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নেই এবং রাষ্ট্রপতি চালিত ব্যবস্থায় থাকা সম্ভবও নয়। মার্কিন মন্ত্রিসভার সদস্যরা আইনসভার সদস্য নন—তাঁরা রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত কর্মচারী মাত্র। ব্রিটেনে মন্ত্রি-সভার পরামর্শ মানতে রাজা বা রানী বাধ্য। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মন্ত্রিসভা এরূপ কোন ক্ষমতা বা মর্যাদা ভোগ করে না।

প্রতি দেশেই বর্তমান যুগে শাসনবিভাগের ক্ষমতা এবং এক্তিয়ার ক্রমশ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিশেষ করে পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণ, আণবিক অস্ত্রের প্রসার, ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিবেশ, জনকল্যাণমূলক কর্মধারার প্রসার ইত্যাদি কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার কেন্দ্রী-ভবনের ফলে মার্কিন শাসনবিভাগ তথা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বর্তমান যুগে সরকার বলতে অন্যান্য দেশের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্কিন শাসনবিভাগকেই বোঝায় এবং ঐ শাসনবিভাগের মধ্যমণি হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি শুধু শাসনবিভাগেরই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন। অনেকে মনে করেন যে, বুর্জোয়া স্বার্থরক্ষা এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতিকে পরিচালনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনবিভাগ তথা রাষ্ট্রপতির পদকে ব্যাপক ক্ষমতায় সজ্জিত করে এবং কারও কাছে দায়িত্বশীল না রেখে গড়ে তোলা হয়েছে। মার্কিন শাসনাধীন হল বুর্জোয়া স্বার্থ এবং সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সংরক্ষণের জন্য গঠিত প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা।

দুই : মার্কিন রাষ্ট্রপতি (American President

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ঐ শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগের সর্বময় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রপতি-শাসিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগীয় নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্য নন, আইনসভার প্রতি তাঁর কোন দায়িত্ব নেই এবং আইনসভার আস্থা বা অনাস্থার ওপর তাঁর পদের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল নয়। এককথায় সংবিধান প্রণেতারা একটা শক্তিশালী 'জাতীয় শাসনবিভাগ' গঠন করার জন্যে রাষ্ট্রপতিকে বিপুল ক্ষমতায় সজ্জিত করেছিলেন। তবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

যাতে সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে না পারে তার জন্যে তাঁরা শক্তিশালী রাষ্ট্রপতি পদ সৃষ্টি করেও কয়েকটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কাজকর্মের ওপরে আইনবিভাগের নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্যের নীতি প্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ওপর কিছু কিছু বাধানিষেধ আরোপ করেছিলেন।

বিগত দুশ বছর ধরে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটেছে। বিশেষ করে বর্তমান শতকে বিশ্বরাজনীতির পটভূমিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়া স্বার্থকে সংরক্ষণ করা এবং সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে প্রয়োগ করার জন্যে বুর্জোয়া স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে শাসনতান্ত্রিক বাধানিষেধ অতিক্রম করে মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে প্রসারিত করা হয়েছে এবং মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মুখ্য অভিনেতা হিসেবে রাষ্ট্রপতির পদটিকে গড়ে তোলা হয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদটিকে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, জাতীয় চেতনা, জাতীয় স্বার্থ এবং জাতীয় রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রতীক হিসাবে দেখা হয়। মনে করা হয় যে মার্কিন রাষ্ট্রপতি হলেন জাতীয় স্বার্থের রক্ষক। তাই মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদে যদিও দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচন হয় এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি যদিও কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের শাসন-বিভাগের প্রধান, কিন্তু একবার নির্বাচিত হবার পরে তিনি কোন দলীয় প্রার্থী সেকথা মনে রাখা হয় না—তাঁকে জাতীয় শাসকের (National Executive) পদে বরণ করে নেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান রাজনৈতিক দল দুটির মধ্যে নীতি ও আদর্শগত পার্থক্য খুবই কম—উভয় দলই বুর্জোয়া স্বার্থের রক্ষক। সেজন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে যে দল থেকে প্রার্থী নির্বাচিত হন না কেন, তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়া স্বার্থের প্রধান রক্ষক হিসাবে দেখা হয়।

রাষ্ট্রপতি পদের প্রকৃতি

মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদটি একটা প্রতিষ্ঠানে (Institution) পরিণত হয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি, তাঁর মন্ত্রিসভা এবং সচিবালয়কে নিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যাকে বলা হয় *Presidency*। রাষ্ট্রপতির পদের এই প্রতিষ্ঠানীকরণের (Institutionalization) ফলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সম্প্রসারণ অনিবার্য করে তোলা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিরূপ প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবার জন্য *White House* শব্দ দুটো প্রয়োগ করা হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতির সর্বোচ্চ শাসন ক্ষমতাকে প্রয়োগ এবং বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ নীতির উৎস ও প্রয়োগের ব্যাপারে *White House*-এর ভূমিকা অনন্য। যাহোক, একথা বলা যেতে পারে যে সাংবিধানিক প্রণেতারা রাষ্ট্রশক্তির পদটিকে যতটা ক্ষমতাশালী করতে চেয়েছিলেন, দীর্ঘদিনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কারণে রাষ্ট্রপতি পদের ক্ষমতা তার চেয়ে বাস্তবে অনেক বেশী হয়ে উঠেছে।

প্রতিষ্ঠান

ক. রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা

মার্কিন রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হবার জন্য সংবিধানে কতগুলো যোগ্যতাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থীদের

তিনটি যোগ্যতা থাকা অপরিহার্য। প্রথমত, তাঁর বয়স অন্তত ৩৫ বছর হতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মসূত্রে (by birth) নাগরিক হতে হবে। তৃতীয়ত তাঁকে অন্তত ১৪ বছর সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করতে হবে। তবে তাঁর পক্ষে ঐ ১৪ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে বাস করা অপরিহার্য নয়।

খ. রাষ্ট্রপতির কার্যকাল

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে অনেক আলাপ আলোচনার পর মার্কিন সংবিধানে রাষ্ট্রপতির কার্যকালকে চার বছর ধার্য করা হয় এবং রাষ্ট্রপতির পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। কিন্তু কোন একজন রাষ্ট্রপতি কতবার পুনর্নির্বাচিত হতে পারবেন সে সম্পর্কে ১৭৮৭ সালের মূল সংবিধানে কোন উল্লেখ ছিল না। নির্দিষ্ট-ভাবে কিছু উল্লেখিত না থাকায় ধরে নেওয়া হয় যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে যতবার ইচ্ছে পুনর্নির্বাচিত হওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন প্রার্থী হতে আপত্তি করেন এবং নির্বাচনে দাঁড়ান না। পরবর্তী কালে রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসন ১৮০১ সালে তৃতীয়বারের জন্যে রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হতে অস্বীকৃত হন। উপরোক্ত দুটি তাৎপর্যপূর্ণ সাংবিধানিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা শাসনতান্ত্রিক প্রথা গড়ে ওঠে যে তৃতীয়বারের জন্যে কেউ রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে পারবেন না। কিন্তু ১৮৮৭ সালে ইউলিসিস্ সিমসন গ্র্যান্ড তৃতীয়বারের জন্যে রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রতিনিধিসভা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে তৃতীয়বারের জন্যে কোন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হবার বিরোধিতা করে। এর পরে থিওডোর রুজভেল্ট (১৯০১—১৯০৯) ১৯০৯ সালে শাসনতান্ত্রিক প্রথা অমান্য করে তৃতীয়বারের জন্যে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হন; কিন্তু তিনি জয়ী হতে পারেন না। ফ্র্যাঙ্কলিন ডেলানা রুজ্ভেল্ট হলেন প্রথম ও শেষ রাষ্ট্রপতি যিনি শাসনতান্ত্রিক রীতিকে অমান্য করে পরপর চারবার (১৯৩৩—১৯৪৫) রাষ্ট্রপতি পদে নির্বা[illegible] হয়েছিলেন। ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টের দু'বারের বেশী রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবার এই নজীর যাতে অন্য কেও গ্রহণ করতে না পারে তাই ১৯৫১ সালে দ্বাবিংশতিতম সংবিধান সংশোধনী আইন পাস করে রাষ্ট্রপতির কার্যকালকে দু বারের (Two terms) জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়। ঐ সংশোধনী আইনে বলা হয় যে কেউ রাষ্ট্রপতি পদে তৃতীয়বার প্রার্থী হতে পারবেন না।

মূল সংবিধানে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ৪ বছর নির্দিষ্ট ছিল। ঐ ব্যবস্থাকে বহাল রেখে ১৯৫১ সালের সংশোধনী আইনে রাষ্ট্রপতি পদে দু'বারের বেশী প্রার্থী হবার ওপর নিষেধ আরোপ করা হয়। সুতরাং বলা যায় যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ৪ বছর এবং তিনি দু'বারের বেশী রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হতে পারবেন না।

গ. রাষ্ট্রপতির নির্বাচন

মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে কোন্ পদ্ধতিতে নির্বাচিত করা হবে সে বিষয়ে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে প্রতিনিধিরা ব্যাপক আলাপ আলোচনা করেন। ঐ আলোচনার দু'টি বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। একটি প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করার ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত করার কথা বলা হয়। অন্য একটি প্রস্তাবে একটি নির্বাচন সংস্থা গড়ে ঐ সংস্থার দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে পরোক্ষ ভাবে নির্বাচনের কথা বলা হয়। প্রথম প্রস্তাবটি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পরিপন্থী এবং রাষ্ট্রপতির মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক নয় মনে করে শেষ পর্যন্ত একটি স্বতন্ত্র নির্বাচন সংস্থার (Electoral College) দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করার ব্যবস্থা সংবিধানে গৃহীত হয়।

সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম ধারায় মার্কিন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করার জন্যে যে নির্বাচক সংস্থা (Electoral College) গঠন করা হয় সেই সংস্থার সদস্যদের নির্বাচন করার জন্যে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের ১৮ বছর ও তার বেশী বয়স্ক নাগরিকেরা ভোট দেন। এবং তাদের ভোটে নির্বাচন সংস্থার সদস্যরা নির্বাচিত হন। প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে প্রতিনিধিসভা ও সিনেটে যে কজন সদস্য নির্বাচিত হন সেই সমসংখ্যক সদস্য প্রতিটি অংগরাজ্য থেকে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনের জন্যে গঠিত নির্বাচক সংস্থায় নির্বাচিত হন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করার জন্যে নির্বাচক সংস্থায় প্রতি অংগরাজ্য থেকে প্রতিনিধিসভা ও সিনেটের সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকে। ঐ নির্বাচক সংস্থার নির্বাচন কিভাবে হবে তা প্রতি রাজ্যের আইনসভা স্থির করে। মার্কিন কংগ্রেসের কোন কক্ষের সদস্য এবং সরকারী কর্মচারী নির্বাচন সংস্থার সদস্য হতে পারবে না।

সমগ্র দেশে একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্বাচন সংস্থার সদস্যরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। এই নির্বাচন গোপন ব্যালটে করা হয়, রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন হবার জন্যে প্রার্থীকে নির্বাচন সংস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেতে হবে। কোন প্রার্থী সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোট না পেলে প্রথম তিনজন প্রার্থীর মধ্যে থেকে একজনকে প্রতিনিধি সভার গোপন ভোটে নির্বাচিত করে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্যে সংবিধানে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের ফলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ব্যবস্থা বাস্তবে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন প্রার্থীরাই শুধুমাত্র দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হন না, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য এমনকি নির্বাচক সংস্থার সদস্যরাও দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। দলভিত্তিক নির্বাচকসংস্থার সদস্য নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত হবার ফলে আগে থেকেই বোঝা যায় কোন দলের প্রার্থী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভ করবে। বস্তুত, দলীয় ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতিকে সমালোচনা করে এই পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্যে অনেকে দাবী জানিয়েছেন।

ঘ. রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের গুরুত্ব

মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির নির্বাচন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শুধু দেশের ভেতরে নয়, মার্কিন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন দেশের বাইরেও গুরুত্ব লাভ করে। আমেরিকার জনজীবনে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন তাই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্যে প্রার্থীরা ৮-৯ মাস আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং এ জন্যে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। রাষ্ট্রপতির পদে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন লাভ ঘটে একটা দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এবং নির্বাচনে প্রার্থীকে ব্যাপক প্রচারে অংশ গ্রহণ করতে হয়। প্রার্থী মনোনয়নের জন্যে প্রধান দুটো দলই গণসমাবেশ বা Convention আয়োজন করে। এই জনসমাবেশ থেকে যাতে প্রার্থী হিসেবে কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম প্রস্তাবিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে প্রার্থীদের প্রচার অভিযান চালাতে হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। ঐ Convention এর মধ্যে দিয়ে প্রতিটি দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়ার পরে দুটি প্রধান দলের মনোনীত প্রার্থীরা দ্বিতীয়বার প্রচার অভিযান শুরু করেন।

ঙ. রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা

মার্কিন সংবিধানে রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে যে, কোন রাষ্ট্রপতির কার্যকাল চলাকালীন অবস্থায় তাঁর বেতন বা পারিশ্রমিক পরিবর্তন করা যাবে না। মার্কিন কংগ্রেস আইনের দ্বারা রাষ্ট্রপতির বেতন-ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা স্থির করেন। কংগ্রেস প্রণীত আইন অনুযায়ী মার্কিন রাষ্ট্রপতি বছরে এক লক্ষ ডলার বেতন ও অন্যান্য খরচ বাবদ আরও পঞ্চাশ হাজার ডলার অতিরিক্ত ভাতা পান। এছাড়া রাষ্ট্রপতি ভবনের রক্ষণা-বেক্ষণ এবং রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত কর্মচারীবৃন্দ ও নিরাপত্তা বাহিনীর জন্যে আলাদা অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা রয়েছে।

চ. রাষ্ট্রপতির অপসারণ

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল চার বছর হলেও, ঐ কার্যকাল শেষ হবার আগেই রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচমেণ্টের (Impeachment) সাহায্যে অপসারণ করা যায়। সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের চতুর্থ ধারায় বলা হয়েছে যে, দেশদ্রোহিতা, উৎকোচ গ্রহণ বা অন্য কোন ভয়ানক অপরাধ ও নৈতিক দুষ্কর্মের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডিত হলে তাঁরা নিজ নিজ পদ থেকে অপসারিত হবেন। রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচ করার ব্যাপারে কি পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তা সংবিধানে বলা হয়েছে। উপরোক্ত অপরাধের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের ক্ষমতা প্রতিনিধিসভার ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। মার্কিন প্রতিনিধিসভায় অভিযোগ প্রস্তাব অনুমোদিত হলে তা বিচারের জন্য সিনেটে তা প্রেরণ করা হয়। সুপ্রীম

কোর্টের প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে সিনেটে দু-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে ঐ প্রস্তাব অনুমোদিত হলে রাষ্ট্রপতি তাঁর পদ থেকে অপসারিত হন। আজ পর্যন্ত কোন মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা হয়নি। রাষ্ট্রপতি এণ্ড্রু জ্যাকসনের (১৮২৯-১৮৩৭) বিরুদ্ধে অপসারণের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু অপসারণের প্রস্তাবের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভোটের চেয়ে এক ভোট কম হওয়ায় ঐ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়নি।

ছ. রাষ্ট্রপতির অব্যাহতি

রাষ্ট্রপতি পদে কার্যকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি কয়েকটি সাংবিধানিক অব্যাহতি ভোগ করেন। রাষ্ট্রপতিপদে কার্যকালে তাঁর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যায় না এবং আদালতে তাঁকে সাক্ষ্যদানের জন্য উপস্থিত হতে বলা যায় না। ঐ সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ তোলা যায় না। কংগ্রেসের কোন কমিটির সামনে তাঁকে উপস্থাপিত হবার জন্য নির্দেশ দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আদালত কোন জরিমানা করতে পারে না।

তিন ঃ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সম্প্রসারণ (Growth of the Presidency)

মার্কিন সংবিধান প্রণেতারা যেভাবে মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে নির্দিষ্ট করেছিলেন, বর্তমানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সংবিধান নির্দিষ্ট ঐ চৌহদ্দীর মধ্যে আবদ্ধ নেই। বিগত দুশো বছর ধরে সেখানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং এ ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্ট বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি, বরং সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থাও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্প্রসারণে সাহায্য করেছে। বস্তুত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সম্প্রসারণ মার্কিন শাসনব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রাষ্ট্রপতি পদের ক্ষমতা বৃদ্ধির পেছনে রয়েছে একদিকে রাষ্ট্রপতি পদে আসীন ব্যক্তিত্বদের ভূমিকা ও প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে বুর্জোয়া স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও সামাজিক শক্তিগুলোর মিলিত প্রক্রিয়া।

বিগত দুশো বছর ধরে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রধান উপাদান হিসাবে কয়েকজন রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত প্রয়াসকে চিহ্নিত করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম দিকের রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে ওয়াশিংটন (Washington) এবং জেফারসন (Jefferson) রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার কতকগুলো ব্যাখ্যার দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করেন। রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হয়ে ওয়াশিংটন এই ধারণার সৃষ্টি করেন যে, রাষ্ট্রপতি হলেন তাঁর ক্যাবিনেটের প্রভু এবং মার্কিন কংগ্রেস এই বক্তব্যকে স্বীকার করে নেয়। অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা মোকাবিলা করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির চরম ক্ষমতাকেও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রপতি জেফারসন বিদেশী ভূখণ্ডকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আনার জন্য প্রয়োজনীয় চুক্তি করার অধিকার রাষ্ট্রপতির আছে—এই অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রপতি জ্যাকসনের (Jackson) আমলে দলীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন শুরু হয় এবং রাষ্ট্রপতি বিজয়ী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃত হয়ে রাষ্ট্রপতি পদের ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত

১. বিভিন্ন রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত ভূমিকা

করেন। এই সময়ে তাঁর আমলে বিভিন্ন উচ্চপদে নিয়োগে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বা অনুগ্রহ বণ্টনের অধিকার (Spoils System) স্বীকৃত হয়। শুধুমাত্র বিলের ওপরে নয়, জ্যাকসন নীতিগত প্রশ্নেও রাষ্ট্রপতির 'ভিটো' (veto) প্রয়োগের ক্ষমতাকেও প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln) রাষ্ট্রপতির পদকে শুধুমাত্র আইনের প্রয়োগকর্তার মধ্যে সীমিত না রেখে তিনি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান (Commander-in-Chief) হিসাবে চিহ্নিত করেন।

বিশের শতকে বিভিন্ন রাষ্ট্রপতির দ্বারা এই পদের ক্ষমতা আরও প্রসারিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি থিয়োডর রুজভেল্ট (Theodore Roosevelt) এবং উড্রো উইলসন (Widrow Wilson) হস্তান্তরিত আইন প্রণয়নের (delegated legislation) ক্ষমতা কার্যকর করে বিভিন্ন ব্যাপারে এবং বিশেষ করে দেশের আর্থিক জীবনে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করেন। ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট (Franklin Roosevelt) বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বের স্বীকৃতি আদায় করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট এবং ট্রুম্যান (Truman) বিভিন্ন পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের অনুমতি না নিয়ে কোরিয়ায় সৈন্য পাঠিয়ে যুদ্ধ বাধান, ইস্পাত কারখানা বাজেয়াপ্ত করা, মার্শাল প্লান গ্রহণ করা ইত্যাদি ঘটনাবলী ঐ সময়ে রাষ্ট্রপতিকে অভূতপূর্ব ক্ষমতায় সজ্জিত করে। এর পরে রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার (Eisenhower) কিছুটা রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলেও রাষ্ট্রপতি কেনেডি (Kennedy) রুজভেল্ট-ট্রুম্যান উত্তরাধিকারকেই গ্রহণ করেন। এর পরবর্তীকালে আণবিক অস্ত্রের প্রসার, দেশে দেশে মার্কিন সামরিক কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং আগ্রাসী নীতি পরিচালনা করা, ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরিবেশ জিইয়ে রাখা ইত্যাদি নীতি ও উপাদানের সাহায্য নিয়ে পরবর্তী রাষ্ট্রপতিরা এই পদের ক্ষমতাকে ক্রমাগত সম্প্রসারিত করে যাচ্ছেন।

২. কংগ্রেসের ভূমিকা

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবৃদ্ধির ব্যাপারে মার্কিন কংগ্রেসেরও অবদান রয়েছে। মার্কিন কংগ্রেস প্রায়শই রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্ব ও ইচ্ছাকে অনুমোদনই শুধু করেনি, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবৃদ্ধির ব্যাপারে ইতিবাচক ভূমিকাও গ্রহণ করেছে। অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় মার্কিন কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির হাতে আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব হস্তান্তর করে তাঁকে একনায়কের ভূমিকার অবতীর্ণ হতে সাহায্য করেছে। যেমন. ১৯২১ সালের বাজেট হিসেব সংক্রান্ত আইন রাষ্ট্রপতিকে বাজেট প্রস্তুত করে তা কংগ্রেসে উত্থাপনের ক্ষমতা দান করেছে। ১৯৩৪ সালের পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি আইন দ্বারা কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির হাতে ট্যারিফ (Tariff) নির্ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করেছে।

রাষ্ট্রপতি পদের ক্ষমতাবৃদ্ধির ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তও দায়ী। সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত করে যে, পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং ঐ সরকারের

প্রধান রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রশ্নাতীত এবং ঐ ক্ষমতা সংবিধানের নির্দেশের ওপরে নির্ভর করে না, ঐ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির পদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের পরস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্ট কোন কোন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনে অক্ষমতা জানান, কারণ সুপ্রীম কোর্টের মতে বিষয়গুলো রাজনৈতিক চরিত্রের। সুপ্রীম কোর্টের এই দ্বিধা পরোক্ষভাবে দেশের ভিতরে এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির পদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। গ্রিফিথ (Earnest S. Griffith) বলেছেন যে. সুপ্রীম কোর্ট অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতি পদের ক্ষমতা সম্প্রসারণকে সহনশীলতার মনোভাব নিয়ে দেখেছেন (The Supreme Court on the whole looked with tolerant eyes upon the aggrandijement of the office)[১]

৩. সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা

এ ছাড়াও অন্য কতকগুলো কারণ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। যুদ্ধ, ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরিবেশ. বুর্জোয়া সংকট, আণবিক অস্ত্রের উদ্ভাবন ও প্রসার, আধুনিক সরকারের জটিলতা ইত্যাদি কারণ রাষ্ট্রপতির পদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। কংগ্রেসের সদস্যদের মত রাষ্ট্রপতি কেবলমাত্র কোন বিশেষ অঞ্চল বা এলাকার প্রতিনিধি নন, তিনি জাতির প্রতিনিধি। সুতরাং তিনি হলেন জাতীয় নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দু। জাতীয় সরকারের প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতি দ্বি-দলীয় মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি প্রধান দলের নেতা। এই সকল ঘটনা রাষ্ট্রপতির পদের ক্ষমতা বৃদ্ধিকে নিশ্চিতভাবে সাহায্য করেছে।

৪ অন্যান্য উপাদান

বস্তুত, মার্কিন সাংবিধানিক ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিগত দুশো বছর ধরে বিভিন্ন কারণ এবং প্রক্রিয়ায় মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতির পদের ক্ষমতাবৃদ্ধি।

চার : রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and Functions of the President)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি শাসনবিভাগের আনুষ্ঠানিক ও প্রকৃত প্রধান। মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে শাসনবিভাগীয় প্রধান বলা হলেও তাঁর ক্ষমতা কেবলমাত্র শাসনবিভাগীয় কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করলে ভুল করা হবে। শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বিপুল ক্ষমতা ভোগ করেন। মার্কিন সংবিধান পাঠ করে রাষ্ট্রপতির প্রকৃত ক্ষমতা বোঝা যাবে না। প্রথমত, মার্কিন সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে কি কি ক্ষমতায় সজ্জিত করতে চেয়েছিলেন তা সংবিধানে সুস্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, সংবিধানের বাইরেও বিগত দুশো বছর ধরে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বিভিন্ন কারণে এবং বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে। অনেকে বলেন, মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেবলমাত্র প্রধান শাসক নন, তিনি প্রধান আইনপ্রণেতা এবং বৈদেশিক নীতির রূপকার। মার্কিন

১. American System of Government, Earnest S. Griffith, p. 75.

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাগুলোকে পর্যালোচনা করলে তাঁর ক্ষমতার রূপরেখা সপষ্ট হয়ে উঠবে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করার রীতি গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রপতির ঐ তিনটি ক্ষমতা হ'ল—শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা, আইনবিভাগীয় ক্ষমতা এবং বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা।

ক. শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা

মার্কিন রাষ্ট্রপতির শাসনবিভাগীয় ক্ষমতাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে।

১. রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

মার্কিন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক এবং প্রকৃত প্রধান। আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ব্রিটেনের রানী, ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এবং কানাডার গভর্ণর জেনারেল অপেক্ষা বেশী ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রদূত সহ বিদেশের মাননীয় অতিথিদের গ্রহণ ও আপ্যায়িত করেন, সম্মান ও মর্যাদা বিতরণ করেন, বিদেশী অতিথিদের সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করেন, রাষ্ট্রপতির নামে বিভিন্ন কল্যাণ তহবিল পরিচালনা করেন, বিভিন্ন ব্যাপারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি জাতীয় নেতার প্রতীক হিসেবে সম্মানিত হন। এমনকি তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। বিশেষ করে জাতীয় সংকটের সময়ে তিনি সমগ্র জাতির মুখপাত্র হিসেবে স্বীকৃত হন।

২. আইনের প্রয়োগকর্তা হিসেবে রাষ্ট্রপতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন যাতে বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয় তা দেখার দায়িত্ব সংবিধান রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করেছে। এবং এজন্য তাঁকে শপথ গ্রহণ করতে হয় যে, তিনি মার্কিন সংবিধান ও আইনকে সংরক্ষণ এবং পৃষ্টপোষকতা করবেন। সুতরাং তত্ত্বগতদিক থেকে মার্কিন সংবিধান ও আইন সংরক্ষণের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যাপ্ত। তবে কার্যক্ষেত্রে এই দায়িত্ব পালন করে ন্যায়বিচার বিভাগ (Department of Justice), যুক্তরাষ্ট্রীয় জেলান্তরের অ্যাটর্নী, মার্শাল এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। তবে প্রয়োজন বিবেচিত হলে রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। ১৯৫৭ সালে রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার (Eisenhower) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের রায় প্রয়োগের ব্যাপারে সেনাবাহিনীকে কাজে লাগিয়েছিলেন। আইন প্রয়োগের ব্যাপারে রাজ্যগুলো সাহায্য চাইলে রাষ্ট্রপতি তাদের সাহায্য করেন। রাজ্যগুলো দাবী করলে রাষ্ট্রপতি রাজ্যগুলোকে সাহায্য করার জন্য সেনা বা পুলিশ পাঠাতে পারেন। এমনকি এ ব্যাপারে রাজ্যগুলো অসম্মত হলে অবস্থার গুরুত্ব বুঝে রাষ্ট্রপতি তাদের সাহায্য গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন।

৩. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেন। মার্কিন সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে যে, সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ রাষ্ট্রপতি বিদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত (Ambassadors), মন্ত্রী, পরামর্শদাতা এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ করতে পারেন। অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের অন্যান্য পদে নিয়োগের ক্ষমতা কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির একার ওপরে ন্যস্ত করতে পারে এবং কার্যত রাষ্ট্রপতি নিজেই ঐ সকল নিম্নস্তরের সরকারী পদে নিয়োগ করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিদেশে দূত, মন্ত্রিসভার সদস্য, বিচারক ইত্যাদি পদে নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঐ সকল নিয়োগ সিনেটের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বেশীর ভাগ নিয়োগকে সিনেট অনুমোদন করেন। একে সিনেটের সৌজন্য (Senatorial Courtesy) বলে। তবে নিম্নস্তরের সরকারী পদে নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি একাই ভোগ করেন।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, বাস্তবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগের ক্ষমতা বা রাষ্ট্রপতি যে সকল নিয়োগ করেন সেগুলো দুটি দিক থেকে সীমাবদ্ধ। প্রথমত, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট উচ্চ পদগুলিতে নিয়োগ একমাত্র সিনেটের অনুমোদন লাভ করেই কার্যকর হতে পারে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক যে কোন নিয়োগকে সিনেট অনুমোদন করবে এমন কোন রীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠে নি। বাস্তবে সিনেট রাষ্ট্রপতির অনেক নিয়োগকে বাতিল করেছে। দ্বিতীয়ত, যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ (Merit system of appointments) নীতি অনুসারে ১৮৮৩ সালে (Pendletom Act) গৃহীত হবার পর থেকে রাষ্ট্রপতি যে সকল নিয়োগ করেন তার ৮৫%-কে অ-রাজনৈতিক নিয়োগ হিসাবে ধরা হয় এবং ঐ সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত কোন ভূমিকা থাকে না। মার্কিন রাষ্ট্রপতি যে সকল দূত, কূটনৈতিক কর্মী, পরামর্শদাতা, এবং মন্ত্রিদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে বা মৃত্যু মুখে পতিত হলে বা রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হলে তাঁরা পদত্যাগ করেন এবং নতুন রাষ্ট্রপতি ঐ সকল পদে নতুন করে নিয়োগ করেন।

দেখা গিয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের বিভিন্ন পদে পঁচিশ হাজার কার্যচারীকে নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ভোগ করেন। এই সকল পদের মধ্যে ব্যাপক পদে রাষ্ট্রপতির নিজস্ব নিয়োগ ক্ষমতা রয়েছে। এই সকল পদে নিয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি অনুগ্রহ বণ্টনের (Distribution of spoils) সুযোগ পান এবং তিনি তাঁর নিজের ও তাঁর দলের স্বার্থে ঐ অনুগ্রহ বণ্টন করেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারকদের পদচ্যুত করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নেই। একমাত্র ইমপিচমেন্ট পদ্ধতির সাহায্যে তাঁদের পদচ্যুত করা যায়। কিন্তু অন্যান্য পদে রাষ্ট্রপতি

যাঁদের নিয়োগ করেছেন তাঁদের রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত করতে পারেন কিনা সে সম্পর্কে সংবিধানে কিছু বলা হয়নি। তবে মনে করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি যাঁদের নিয়োগ করেন তাঁদের পদচ্যুতির ক্ষমতাও তিনি ভোগ করেন। একমাত্র বিচারকদের সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য নয়, যেহেতু বিচারকদের পদচ্যুতির পদ্ধতি সংবিধানে আলাদা করে বলা হয়েছে।

৪. **প্রতিরক্ষাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা**

রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধান শাসক হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেন। সৈন্য বাহিনীকে সংগঠিত করা, প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন স্তরে কর্মচারী নিয়োগ এবং বরখাস্ত করা, প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় করা, বিদেশে সৈন্য প্রেরণ করা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ক্ষমতা ভোগ করেন। শান্তিকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতির এইসব ক্ষমতা কিছুটা আনুষ্ঠানিক হলেও যুদ্ধকালীন অবস্থায় বা বিদেশে ঘাঁটি নির্মাণ ও সৈন্য মোতায়েনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতায় পরিণত হয়। এই ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার ১৯৫৫ সালে ফরমোসায় এবং ১৯৫৭ সালে মধ্য প্রাচ্যে সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন, ১৯৬২ সালে কেনেডি কিউবায় নৌ-অবরোধ করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা পরবর্তীকালে মার্কিন রাজনীতিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং সিনেট সদস্যদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যুদ্ধ ও শান্তির মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এককভাবে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোন কর্মসূচী রূপায়িত করতে পারেন কিনা সে সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দেয়। কংগ্রেস প্রণীত একটি বিলে (১৯৭৩) বিধিবদ্ধ করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি বিদেশে সৈন্য প্রেরণ করলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তা কংগ্রেসকে জানাতে হবে এবং রাষ্ট্রপতির ঐ কাজ কংগ্রেসের দ্বারা অনুমোদিত না হলে সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে। মার্কিন বুর্জোয়া ব্যবস্থার স্বার্থে দেশে বিদেশে আগ্রাসী নীতি পরিচালনার জন্যে বিভিন্ন স্থানে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ এবং সৈন্য বাহিনী মোতায়েন করা যেমন মার্কিন রাজনীতির একটি অঙ্গ তেমনি বুর্জোয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যে কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এ ব্যাপারে কংগ্রেসের বিরোধও একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

খ **আইনবিষয়ক ক্ষমতা**

মার্কিন রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগীয় প্রধান হওয়ার জন্যে এবং মার্কিন সংবিধানে কিছুটা পরিমাণে ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর হওয়ার জন্যে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতির আইনবিষয়ক কোন ক্ষমতা নেই। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হ'ল এই যে, মার্কিন সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে আইন প্রণয়নের ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করেছে। বাস্তব অবস্থার দিকে তাকিয়ে অনেকে তাই মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে প্রধান আইন প্রণেতা (chief legislator) নামে অভিহিত করেন। যাহোক, রাষ্ট্রপতির আইনবিষয়ক ক্ষমতাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হ'ল।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি সাধারণ অবস্থায় কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করতে না পারলেও তিনি মার্কিন কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন। কংগ্রেসের দুটি কক্ষ যদি অধিবেশন স্থগিত (adjournment) সম্পর্কে ঐকামত না হয় তা হলে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আলোচনার জন্যে কংগ্রেসের অধিবেশন চলা উচিত বলে যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন তা হলে তিনি সেই মর্মে কংগ্রেসকে অনুরোধ জানাতে পারেন। রাষ্ট্রপতির এই অনুরোধ মান্য করা কংগ্রেসের পক্ষে বাস্তবে বাধ্যতামূলক, কারণ তা না হলে কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন ঐ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কংগ্রেসে আলোচিত হওয়ার জন্যে।

. অধিবেশন আহ্বান

মার্কিন সংবিধানে আছে যে, রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন ব্যাপার মার্কিন কংগ্রেসকে অবহিত করবেন এবং যেসব বিষয়ে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করবেন সে সকল বিষয়ে কংগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। এই সাংবিধানিক ক্ষমতাটি রাষ্ট্রপতিকে আইন-প্রণয়ণের উদ্যোগ গ্রহণের অধিকার দিয়েছে। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে সে সব বিষয় অবহিত করেন কংগ্রেস সে সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুযায়ী এবং তাঁর উদ্যোগে বিভিন্ন আইন প্রণয়নের কাজের সূত্রপাত ঘটে। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে এ ব্যাপারে বাণী (Presidential message) পাঠাতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে যে সব বিষয়ে অবহিত করেন এবং ঐ সকল বিষয়ে যে সকল আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন মনে করেন সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির বাণী বা প্রস্তাবের সঙ্গে আইনের একটি খসড়াও কংগ্রেসের বিবেচনার জন্যে পাঠান হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়নের প্রথম উদ্যোগ আসে প্রধানত রাষ্ট্রপতির দিক থেকে। মার্কিন কংগ্রেসের উভয়কক্ষে যদি রাষ্ট্রপতির দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে তবে মার্কিন কংগ্রেসের পক্ষে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুযায়ী আইত-প্রণয়ন করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতির দলের ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও কংগ্রেসের পক্ষে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাকে অমান্য করে আইন-প্রণয়নের ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

২. আইন প্রণয়ন

শাসনতান্ত্রিক নির্দেশ (Excecutive Orders) জারী করে এবং আইন প্রণয়নের অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়নের দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি যে সকল শাসনতান্ত্রিক নির্দেশ জারী করেন সেগুলো আইনের মত কার্যকর হয়। পরে ঐ সকল নির্দেশকে কংগ্রেস যথাযথ আইনে রূপদান করে। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস আইনের রূপ-রেখা স্থির করে সে সম্পর্কে রুলস্ ও রেগুলেসন (Ruls and Regulations) প্রণয়নের দায়িত্ব শাসনবিভাগকে অর্পণ করে। অর্পিত বা হস্তান্তরিত

৩. হস্তান্তরিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা

এই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দ্বারা রুলস্ ও রেগুলেসন প্রণয়ন করে রাষ্ট্রপতি তথা শাসনবিভাগ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভোগ করেন। আইন প্রণয়নের এই অর্পিত ক্ষমতার জন্য শাসনবিভাগকে *a subsidiary branch of law-making authority* হিসাবে অভিহিত করা হয়।

আইনসভা তথা আইন প্রণয়নকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে 'রাষ্ট্রপতির ভিটো' (Presidential Veto) প্রয়োগের ক্ষমতা একটি অমোঘ অস্ত্র। কংগ্রেসে যে সকল বিল গৃহীত হয় সেগুলো রাষ্ট্রপতির সম্মতি (স্বাক্ষর) লাভ করে আইনে পরিণত হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ না করলে কোন বিল 'আইন'-এ পরিণত হয় না। সুতরাং কংগ্রেস প্রণীত প্রতিটি বিলই রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের জন্য তাঁর কাছে প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য প্রেরিত বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে পরেন এবং সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে বিলটি আইনে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত, বিলে সম্মতি দান করে তিনি দশদিনের মধ্যে বিলটি কংগ্রেসের কাছে ফেরত পাঠাতে পারেন। বা কংগ্রেসের কাছে ফেরত না পাঠিয়ে নিজে ধরে রাখতে পারেন। উপরোক্ত দুটো ক্ষেত্রেই ধরা হবে যে, রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি না দিয়ে 'ভিটো' (veto) প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু বিলটি কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ফেরত পাঠাবার পরে কংগ্রেসের উভয় কক্ষ যদি আবার বিলটিকে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ করে তবে রাষ্ট্রপতির ভিটো সত্ত্বেও বিলটি আইনে পরিণত হবে। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি না দিয়ে দশ দিন ধরে যদি নিজের কাছে রেখে দেন এবং ইতিমধ্যে যদি কংগ্রেসের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে তবে বিলটি বাতিল হয়েছে বলে ধরা হবে। রাষ্ট্রপতির এই কাজকে 'পকেট ভিটো'- (Pocket Veto) প্রয়োগ বলা হয়। পকেট ভিটো প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি তাঁর অনভিপ্রেত বিলকে বাতিল করাতে পারেন।

৪. ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা

মুনরো (Munro) মনে করেন, ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে কংগ্রেসের তৃতীয় কক্ষে পরিণত করেছে (Veto power has developed the Presidency into something like a third Chamber of Congress)। তাই মার্কিন রাষ্ট্রপতির 'ভিটো' প্রয়োগের ক্ষমতাকে সংস্কার করার বিভিন্ন প্রস্তাব বিভিন্ন সময়ে তোলা হয়েছে।

গ. বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা

মার্কিন রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারকদের মনোনীত করেন। রাষ্ট্রপতির দ্বারা বিচারক মনোনয়ন সিনেটের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে কার্যকর হয়। সুতরাং রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা চরম নয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনেক মনোনয়ন সিনেট বাতিল করে দিয়েছে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারবিভাগে রাষ্ট্রপতি যাঁদের মনোনয়ন দেন তার শতকরা ২৬ ভাগ মনোনয়নকে সিনেট অনুমোদন করেনি।

১. মনোনয়ন

মার্কিন সংবিধানে দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার (to grant reprieves and pardons) রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন বা দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ডাদেশ হ্রাস করতে পারেন। তবে ইমপিচমেণ্ট পদ্ধতিতে যারা দণ্ডিত হন, তাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না। শুধু ব্যক্তিবিশেষকেই নয়, রাষ্ট্রপতি গোষ্ঠীকেও ক্ষমা করতে (amensty) পারেন। গৃহযুদ্ধের পরে রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন একটি বিরাট গোষ্ঠীকে ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন।

২. ক্ষমা প্রদর্শন

অনেকে মনে করেন যে, বিচারবিভাগীয় সদস্য মনোনয়ন বা ক্ষমা প্রদর্শন রাষ্ট্রপতির বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা নয়। রাষ্ট্রপতি ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন প্রধান শাসক হিসেবে। সুতরাং ঐগুলো রাষ্ট্রপতির শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার অন্তর্গত।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

মার্কিন সংবিধানে বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। মার্কিন সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে বিপুল ক্ষমতা দিয়েছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ ক্ষমতার ওপরে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি (Theory of checks and balances) প্রয়োগের দ্বারা মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ওপরে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। সংবিধান যে বিপুল ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করেছে ঐ ক্ষমতা যাতে তাঁকে একনায়কে পরিণত না করে তা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ওপরে সংবিধানগত দিক থেকে কংগ্রেস এবং সুপ্রীম কোর্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। তাছাড়া সংবিধানের বাইরে আমলাতন্ত্র, জনমত, ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীরা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

রাষ্ট্রপতির সব কর্মসূচী রূপায়ণ নির্ভর করে আর্থিক বরাদ্দের ওপরে—আর্থিক বরাদ্দ না হলে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতিকে আর্থিক বরাদ্দের জন্য কংগ্রেসের ওপরে নির্ভর করতে হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রপতিকে অভ্যন্তরীণ নীতি বা বৈদেশিক নীতি বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা – যে কোন ব্যাপারে কোন কর্মসূচীকে রূপায়িত করতে হলে কংগ্রেসের ওপরে নির্ভর করতে হয় আর্থিক বরাদ্দের জন্য। তাই কংগ্রেসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির পক্ষে কোন ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগ সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রপতি যে সকল নিয়োগ করেন তা কার্যকর করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে সিনেটের অনুমোদন প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি যে সকল সন্ধি বা চুক্তি করেন সেগুলোর কার্যকারিতাও সিনেটের অনুমোদনের ওপরে নির্ভর করে। সুতরাং এ দুটো ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতি চরম ক্ষমতা ভোগ করেন না, সিনেটের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে ভোগ করেন এবং এই

১. আইন বিভাগের দ্বারা সীমিত

ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ওপরে সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে। তাছাড়া, ইমপিচমেন্ট পদ্ধতির সাহায্যে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করতে পারে—কংগ্রেসের এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাঁর ক্ষমতাকে সীমিত রাখতে সাহায্য করে।

২. বিচার বিভাগ

বিচারালয়ও নানা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ওপরে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। মার্কিন বিচারালয় বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা (Power of Judicial Review) ভোগ করে। রাষ্ট্রপতি যে সকল শাসনবিভাগীয় নির্দেশ (Executive orders) জারী করেন এবং যে সকল চুক্তি করেন মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা দ্বারা ঐগুলোর বৈধতা বিচার করতে পারে এবং সুপ্রীম কোর্টের মতে কোন নির্দেশ বা চুক্তি সংবিধানবিরোধী বলে বিবেচিত হলে ঐ সকল নির্দেশ বা চুক্তিকে সুপ্রীম কোর্ট অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। সুতরাং সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতার প্রয়োগ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ওপরে একটি সীমাবদ্ধতা বিশেষ।

৩. অন্যান্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বুর্জোয়া গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতারা, আমলারা, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী প্রভৃতি রাষ্ট্রপতির ওপরে প্রভাব বিস্তার করে এবং তাঁরা নিজ নিজ স্বার্থে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেন। এঁদের প্রভাব অনেক সময়ই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ওপরে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। তাছাড়া মার্কিন জনমতও অনেক সময় রাষ্ট্রপতির কৃত কাজকর্মের সমালোচনায় মুখর হয়ে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং সাংবিধানিক পদ্ধতির বাইরেও উপরোক্ত সংস্থা ও গোষ্ঠী অনেক সময় রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করে বা তাঁর ওপরে প্রভাব বিস্তার করে তাঁর ক্ষমতার ওপরে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে।

মূল্যায়ন

মার্কিন রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি শাসনবিভাগীয় ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেন। শুধু শাসনবিভাগীয় ক্ষমতাই নয়, মার্কিন রাষ্ট্রপতি যেগুলো ঠিক শাসনবিভাগীয় নয় এমন অনেক ক্ষমতা এবং আইনবিষয়ক অনেক ক্ষমতা ভোগ করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতির এই বিপুল ক্ষমতা দেখে অনেকে বলেছেন যে, ব্রিটেনে রাণী ও প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষমতা ভোগ করেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি একাই উভয়ের একত্র ক্ষমতা ভোগ করেন। অনেকে তাই মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদকে মৃদু ধরনের একনায়কত্ব (Mild type of Presidential dictatorship) নামে আখ্যায়িত করেছেন।

একথা ঠিক যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিপুল ক্ষমতার অধিকারী এবং বিভিন্ন কারণে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, বিপুল ক্ষমতায় সজ্জিত মার্কিন রাষ্ট্রপতি যাতে 'একনায়কে' পরিণত হতে না পারেন সেজন্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ওপরে সংবিধান কতকগুলো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ও নীতি নির্ধারণের ক্ষমতাকে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভা ও কংগ্রেসের সঙ্গে

ভাগ করে ভোগ করেন, চুক্তি করার ক্ষমতা সিনেটের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করেন, বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষমতা কংগ্রেস এবং বিশেষ করে সিনেটের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করেন। রাষ্ট্রপতির প্রশাসনিক নির্দেশকে সংবিধান বিরোধী মনে করলে সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা যেমন ব্যাপক, তেমনি ঐ ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থাও কম নয়। ঐ সকল সাংবিধানিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির বিপুল ক্ষমতা যাতে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয় তাকে নিশ্চিত করে। তবে কংগ্রেস, সুপ্রীম কোর্ট এবং আমলাদের সহযোগিতা ও আশীর্বাদ লাভ করলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁর সংবিধান স্বীকৃত ক্ষমতা দ্বারা একনায়কে পরিণত হতে পারেন।

পাঁচ : মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা (Position of the President)

মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি অনন্য পদমর্যাদা ভোগ করেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিক প্রধানের পদমর্যাদা ভোগ করেন, প্রধান শাসক হিসেবে সর্বোচ্চ শাসকের ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভ করেন, জাতির নেতা হিসেবে তিনি বিশেষ জাতীয় মর্যাদা ভোগ করেন আইনবিষয়ক ক্ষমতার দ্বারা তিনি প্রধান আইন প্রণেতা হিসেবে মর্যাদার অধিকারী। তাছাড়া মার্কিন রাষ্ট্রপতি বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে প্রভূত মর্যাদা ভোগ করেন। এক কথায়, বিশ্বে অন্য কোন রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধান শাসক মার্কিন রাষ্ট্রপতির মত এত বিপুল ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করেন না।

রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিদেশের মাননীয় অতিথিদের আপ্যায়ন করেন। বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের গ্রহণ করেন, সম্মান ও মর্যাদা বিতরণ করেন, জাতীয় নেতা হিসেবে সম্মানিত হন। সর্বোচ্চ শাসক হিসেবে তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে আইনকে প্রয়োগ করেন, বিদেশে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন, মন্ত্রী, পরামর্শদাতা, রাষ্ট্রদূত, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ করেন। প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান হিসেবে প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিয়োগ ও বরখাস্ত করেন, প্রতিরক্ষা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেন, বিদেশে সৈন্য পাঠান, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করেন। রাষ্ট্রপতি আন্তর্জাতিক চুক্তি করেন, সন্ধি করেন, অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন।

শুধু শাসনবিভাগীয় ক্ষমতাই নয়, মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইন বিভাগীয় ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেন। তিনি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন। তিনি কংগ্রেসে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। কংগ্রেস প্রণীত বিল রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর লাভ করে আইন-এ পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতি বিলে সম্মতি দিতে পারেন, অথবা ভিটো (Veto) প্রয়োগ করতে পারেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি হলেন শাসন এবং আইন বিষয়ক সকল কার্যধারার প্রধান উৎস, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রক, মার্কিন নীতির প্রধান প্রবক্তা এবং মার্কিন বুর্জোয়া ব্যবস্থার ধারক ও বাহক। স্বাভাবিকভাবেই বিপুল ক্ষমতার

সজ্জিত মার্কিন রাষ্ট্রপতি মার্কিন সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদা ভোগ করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতির বিশেষ পদমর্যাদাকে বোঝবার জন্য অনেকে বলেন যে, ব্রিটেনের রানী ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদার যোগফল হলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। কেউ কেউ মনে করেন, ক্ষমতা ও সাংবিধানিক পদমর্যাদায় মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদটি রাষ্ট্রপতি নামক একনায়ককে (Presidential Dictatorship) পরিণত হয়েছে। এ ছাড়াও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংবিধান প্রণেতারা মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে যে ক্ষমতা দিয়েছিলেন এবং যে পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটেছে। রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি জেফারসন, জ্যাকসন, লিঙ্কন, থিয়োডর রুজভেল্ট, উইলসন, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট প্রত্যেকেই মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদের ক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারা এই পদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এঁদের উদ্যোগের ফলে মার্কিন প্রশাসনের নেতৃত্ব থেকে জাতির নেতৃত্ব মার্কিন রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত হয়েছে এবং মার্কিন জীবনের সর্বস্তরে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব (Presidential leadership) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলাবাহুল্য এই ঘটনা প্রবাহ রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছে।

রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা ও পদমর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখেই সি. এফ. স্ট্রং (C. F. Strong) বলেছেন, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় মার্কিন রাষ্ট্রপতির মত এত বিপুল ক্ষমতা ও পদমর্যাদার অন্যকোন পদাধিকারী দেখা যায় না (In no other constitutional State in the world to-day there exists an officer with such vast powers as those of the President of the American Union)।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পরামর্শদাতা সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য যে যথার্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা [illegible] ও চূড়ান্ত নয়, এ কথা মনে রেখে মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদার মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ওপরে মার্কিন সংবিধান কতকগুলো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে, রাষ্ট্রপতিকে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে-গুলোকে কার্যকর করা রাষ্ট্রপতির ওপরে এককভাবে নির্ভর করে না। যেমন, আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি করা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা এবং নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির যে ক্ষমতা রয়েছে ঐ ক্ষমতাকে রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক দিক থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করেন। তেমনি, বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির যে ক্ষমতা রয়েছে ঐ ক্ষমতা তিনি কংগ্রেস এবং বিশেষ করে সিনেটের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করেন। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগ তথা শাসনবিভাগীয় নির্দেশগুলো সংবিধানসম্মত হয়েছে কিনা তা বিচার করে সুপ্রীম কোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের মতে সংবিধানসম্মত বলে বিবেচিত না হলে সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির শাসনবিভাগীয়

নির্দেশকে বাতিল করতে পাবে। সুতরাং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য রয়েছে বিভিন্ন সংস্থা। তাই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে যতটা চূড়ান্ত মনে হয়, বাস্তবে ঘটনা তা নয়। রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা যেহেতু তাঁর ক্ষমতার সঙ্গে সমান্তরাল সেজন্য স্বভাবতই তাঁর পদমর্যাদা মূল্যায়নের সময়ে তাঁর ক্ষমতার ওপরে ঐ নিয়ন্ত্রণমূলক সীমাবদ্ধতাকে মনে রাখা প্রযোজন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ঐ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক দিক থেকে অনন্য পদমর্যাদার অধিকারী। কোন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মার্কিন রাষ্ট্রপতির মত এত মর্যাদাসম্পন্ন কোন শাসক বা রাষ্ট্র-প্রধান দেখা যায় না। তবে মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা অনেকাংশে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব, জাতির ওপরে প্রভাব, নিজ দলের ওপরে কর্তৃত্ব, ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং সর্বোপরি বুর্জোয়া স্বার্থ রক্ষায় তাঁর সাফল্যের ওপরে নির্ভর করে। তাছাড়া বিরোধী রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিসনসহ প্রচার মাধ্যমে, আমলাতন্ত্র, পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্য সরকার, শ্রমিক সংঘ, চাপসৃষ্টিকারীগোষ্ঠী প্রভৃতি উপাদান এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদাকে রূপ দেয়।

ছয়ঃ মার্কিন রাষ্ট্রপতির ভূমিকা এবং নেতৃত্ব (**Presidential Role and Leadership**)

মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি পদের প্রকৃতি বোঝার জন্য রাষ্ট্রপতির ভূমিকা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বস্তুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির ভূমিকাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব (Presidential leadership) প্রতিষ্ঠা করেছে।

ক্লিনটন রোসিটার (Clinton Rossiter) তাঁর *The American Democracy* গ্রন্থে মার্কিন রাষ্ট্রপতির ভূমিকাকে কয়েকটিভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন।

১. **রাষ্ট্রপ্রধানঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধানের আনুষ্ঠানিক ভূমিকা (Ceremonial role) পালন করেন। মাননীয় বিদেশী অতিথিদের গ্রহণ ও আপ্যায়ন করা, তাঁদের সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করা, বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা সহ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে বিবিধ ভূমিকা পালন করতে হয়।

২. **প্রধান শাসকঃ** সংসদীয় ব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক প্রধান এবং প্রকৃত প্রধানের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যেমন ব্রিটেনে রানী হলেন আনুষ্ঠানিক প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-চালিত ব্যবস্থায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আনুষ্ঠানিক কার্যাবলী এবং প্রধান শাসক হিসেবে প্রকৃত শাসকের ভূমিকা পালন করেন। প্রধান শাসক হিসেবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব হল আইন যাতে যথাযথভাবে রূপায়িত হয় তা নিশ্চিত করা (To take care that the Laws be faithfully executed)। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে তিন মিলিয়ন সরকারী কর্মচারী আইন অনুযায়ী প্রশাসন পরিকল্পনায় নিযুক্ত সেই সকল কর্মচারীদের

নেতৃত্ব দিয়ে সঠিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রপতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। নিয়োগ ও পদচ্যুত করা হল রাষ্ট্রপতির হাতে দুটি অস্ত্র যার সাহায্যে রাষ্ট্রপতি নিয়ন্ত্রণ রজায় রাখেন।

৩. **প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান:** অতীতে প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা ছিল মোটামুটিভাবে আনুষ্ঠানিক। কিন্তু প্রশাসনে জটিলতাবৃদ্ধি, আণবিক অস্ত্রের প্রসার, দেশে মার্কিন সৈন্যবাহিনী মোতায়েন, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কোম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে অঘোষিত যুদ্ধ পরিচালনা প্রভৃতি কারণে কিছুদিন থেকে প্রতিরক্ষাবাহিনীর প্রধান হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রপতির ভূমিকায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রতিরক্ষাবাহিনীর প্রধান হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিভিন্ন দেশে সৈন্য সমাবেশ এবং অঘোষিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য মার্কিন কংগ্রেস ১৯৭৩ সালে একটি আইন পাশ করে।

৪ **প্রধান কূটনীতিবিদ:** বৈদেশিক তথা কূটনৈতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মার্কিন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস এবং বিশেষ করে সিনেটের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে ভোগ করলেও এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ভূমিকাই সর্বাধিক। রাষ্ট্রপতির এই ভূমিকার স্বীকৃতি সংবিধানে গৃহীত হবার পর থেকেই দেখা যায়। ১৭৯৯ সালে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জন মার্শাল (John Marshall) বলেছিলেন যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জাতির প্রতিনিধিত্ব করেন (the sole organ of the nation in its external relations and its sole representative with foreign nations)। বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার জন্য অর্থ কংগ্রেস মঞ্জুর করে এবং বিদেশের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি যে সকল চুক্তি ও সন্ধি করেন সেগুলো সিনেট অনুমোদন করে। সুতরাং কংগ্রেস প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর না করে এবং সিনেট চুক্তি ও সন্ধি অনুমোদন না করে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, এ ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস বা বিশেষ করে সিনেট সাধারণত রাষ্ট্রপতির কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

৫. **প্রধান আইনপ্রণেতা:** মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রধান শাসক হলেও আইনপ্রণেতা হিসেবেই তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে প্রধান শাসক এবং প্রধান আইনপ্রণেতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। বস্তুত রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বের সাফল্য বহুলাংশে আইন প্রণয়নে তাঁর ভূমিকার ওপরে নির্ভর করে। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের কাছে বাণীর (Presidential message) মাধ্যমে আইনের খসড়া উপস্থিত করে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারপরে বিভিন্ন স্তরে ভিটো, পকেট ভিটো প্রয়োগ করে আইনসভাকে প্রভাবিত করেন। তাছাড়া হোয়াইট হাউসের কর্মচারীদের দিয়ে বা তিনি নিজে ভোজসভায় আপ্যায়িত করে, টেলিফোন করে প্রাতঃরাশ সভায় ডেকে ইত্যাদি নানা উপায়ে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কংগ্রেসের সদস্যদের প্রভাবিত করেন এবং নিজের ইচ্ছানুযায়ী আইন প্রণয়ন করিয়ে নেন। এই সকল

কারণে মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে আইনপ্রণেতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। বস্তুত, আইন প্রণয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁর সামগ্রিক নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং বজায় রাখেন।

৬. **দলপ্রধান :** মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁর দলের নেতা। তাঁকে শুধু দক্ষ শাসক হলেই চলে না, সার্থক রাজনীতিবিদ্‌ও হতে হয়। দলের সদস্যদের মধ্যে জনপ্রিয়তা এবং দলের ওপরে নিয়ন্ত্রণ না থাকলে কোন মার্কিন রাষ্ট্রপতির পক্ষে যথাযথ ভূমিকা পালন করে রাষ্ট্রপতি সুলভ নেতৃত্ব দান সম্ভব হয় না। তাই রাষ্ট্রপতি হবার আগে দলীয় ক্ষমতার ভিত্তি রচনা এবং রাষ্ট্রপতি হবার পরে ঐ ভিত্‌কে শক্তিশালী করার জন্য তাঁকে সচেষ্ট থাকতে হয়। নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে যাঁরা কোন দলের নয় তাঁদের দলীয় সমর্থন আদায়ের জন্য রাষ্ট্রপতিকে সচেষ্ট থকতে হয় এবং বিভিন্ন সুযোগ গ্রহণ করতে হয়।

৭. **জনগণের কণ্ঠস্বর :** মার্কিন রাষ্ট্রপতি জাতিকে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাঁর মধ্য দিয়ে জাতির কণ্ঠস্বর (Voice of the People) ধ্বনিত হয় বলে ধরা হয়। রাষ্ট্রপতির এই ভূমিকার জন্য তাঁকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হয়। রেডিও, টেলিভিসন প্রভৃতি গণমাধ্যমের সাহায্যে জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির যোগাযোগ রক্ষিত হয় এবং রাষ্ট্রপতির চিন্তা, ভাবনা, ইচ্ছা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় জাতির প্রতিনিধি এবং জনগণের কণ্ঠস্বর হিসেবে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা বর্তমান যুগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৮. **শান্তি ও যুদ্ধের রক্ষক :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করবে কিনা, দেশে দেশে অস্ত্র রপ্তানী করে বিশ্বে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করা হবে কিনা, দেশে দেশে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করে ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে কিনা, পারমাণবিক অস্ত্র বৃদ্ধি এবং অস্ত্রসজ্জা প্রসারিত করা হবে কিনা, অঘোষিত যুদ্ধ লাগিয়ে সর্বনাশা যুদ্ধে পৃথিবীকে জড়িত করা হবে কিনা বা মার্কিন জনগণকে যুদ্ধহীন পৃথিবীতে শান্তিময় জীবন যাপন করতে দেওয়া হবে কিনা—সবকিছুই মার্কিন রাষ্ট্রপতির ওপরে নির্ভর করে। অর্থাৎ শান্তি ও যুদ্ধের প্রশ্নেও তিনিই নেতৃত্ব দেন —যুদ্ধ বাধানো বা এবং শান্তি রক্ষা করা তাঁর ওপরে নির্ভর করে। বস্তুত যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে মার্কিন রাষ্ট্রপতির ভূমিকা শুধুমাত্র মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নয়, গোটা বিশ্বের কাছেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৯. **সমৃদ্ধির সংরক্ষক :** মার্কিন বুর্জোয়া ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে শাসক-শোষক শ্রেণীর সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। মার্কিন বুর্জোয়া অর্থনীতিতে যাতে উৎপাদন ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে মুনাফা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় তা দেখার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির এবং এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করার জন্য অনেকগুলো সংস্থা রয়েছে।

সংবিধান-প্রদত্ত ক্ষমতা এবং সংবিধানের বাইরে রীতি অনুযায়ী গড়ে-ওঠা ক্ষমতা প্রয়োগ করে মার্কিন রাষ্ট্রপতি যে ভূমিকা পালন করেন তা আলোচনা করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির ঐ ভূমিকা মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বকে (Presidential Leadership) প্রতিষ্ঠা করেছে। অর্থাৎ মার্কিন রাষ্ট্রপতির চিরায়ত সাংবিধানিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অর্জিত দায়িত্ব মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে যে অনন্য ভূমিকা দান করেছে তাকে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব বা *Presidential leadership* নামে অভিহিত করা যায়। মার্কিন রাষ্ট্রপতির বিবিধ ও বহুমুখী ক্ষমতার সঙ্গে পরিবর্তিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক প্রক্রিয়া এবং রাষ্ট্রপতিদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। আব্রাহাম লিংকন, থিয়োডর রুজভেল্ট, উড্রো উইলসন প্রমুখ রাষ্ট্রপতিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় জীবনে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিদের কতকগুলো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত, অনেক সময় বিরুদ্ধ জনমতের জন্য রাষ্ট্রপতিরা ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ভূমিকা পালন করে নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতির প্রতি কংগ্রেস যদি সহযোগিতার হস্তকে প্রসারিত না করে তবে অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতি তাঁর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন এবং রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতিকে বিভিন্ন ব্যাপারে আমলাতন্ত্রের পরামর্শ অনুসারে চলতে হয়: অনেক সময় রাষ্ট্রপতি তার পদমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব দিয়েও আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না বা বুঝতে পারেন না যে আমলাতন্ত্র যে পরামর্শ দিচ্ছে সেই পরামর্শ অনুসারে চললে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দানে ব্যর্থ হবেন। চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। তাঁরা বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতির কোন কোন উদ্যোগকে বাতিল করে দিতে পারে।

নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সীমাবদ্ধতা

উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যে সকল রাষ্ট্রপতির উৎসাহ, উদ্যোগ, সদিচ্ছা, সুযোগ গ্রহণের যোগ্যতা আছে তাঁরা মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বকে সরকারী তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। নিয়োগের ক্ষমতা, পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণের (distribution of spoils) ক্ষমতা, রাষ্ট্রপতির পদের সম্মান ও মর্যাদা, গণ-প্রচার মাধ্যমের একচেটিয়া সুবিধা এবং সর্বোপরি সাংবিধানিক উপাদানের সাহায্যে মার্কিন রাষ্ট্রপতিরা সকল সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে নিজেদের যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন, জনমতকে নিজের অনুকূলে আনতে পারেন, কংগ্রেসকে প্রভাবিত করতে পারেন, বিচারালয়কে বোঝাতে পারেন এবং আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন—এবং এই সকল ইতিবাচক রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

উপসংহার

সাত : মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আইনসভার সম্পর্ক (Relation between President and the Congress)

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগের প্রধান, তাই তাঁর আইন প্রণয়নের কোন ক্ষমতা নেই এবং তিনি আইনসভাকে প্রভাবিত করতে পারেন না। এরূপ ধারণা সৃষ্টি হবার মূলে দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি চালিত ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং ঐ ব্যবস্থায় শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা আইনসভা কংগ্রেসের কোন কক্ষের সদস্য নন, রাষ্ট্রপতি তাঁর কাজের জন্য কংগ্রেসের কাছে দায়িত্বশীল থাকেন না এবং কংগ্রেস অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে যতটা বাস্তবে সম্ভব কার্যকর করা হয়েছে। ক্ষমতাস্বতন্ত্রী নীতি অনুযায়ী সরকারের তিনটি বিভাগ—শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র থাকে এবং এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ বা অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। উপরোক্ত দুটো কারণে স্বাভাবিকভাবেই মনে মনে হতে পারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগীয় প্রধান মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আইনসভা কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক নেই—মার্কিন রাষ্ট্রপতির আইনবিভাগীয় কোন কাজ বা দায়-দায়িত্ব নেই, মার্কিন রাষ্ট্রপতি বা কংগ্রেস একে অন্যকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এদের মধ্যে সম্পর্ক নেই

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে উপরোক্ত ধারণা ঠিক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কংগ্রেসও রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই জন্যই বলা হয় যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতির আইনবিভাগীয় কোন কাজ নেই—এই বক্তব্য তাত্ত্বিক বা দার্শনিক অভিব্যক্তি মাত্র, বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই (To say that the American President has no legislative function is to talk philosophy, not fact)।

বাস্তব অবস্থা

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক

মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মার্কিন রাষ্ট্রপতির আইনবিভাগীয় কার্যাবলী তুলে ধরা যেতে পারে।

মার্কিন রাষ্ট্রপাত কংগ্রেসের সদস্য নন, তিনি কংগ্রেসের সভায় যোগদান করেন না এবং সাংবিধানিক দিক থেকে তিন কংগ্রেসের কাছে দায়িত্বশীল নন, তাঁর পদের স্থায়িত্ব কংগ্রেসের আস্থার ওপরে নির্ভর করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক রয়েছে এবং রাষ্ট্রপতির গুরুত্বপূর্ণ আইনবিভাগীয় ক্ষমতা ও

কার্যাবলী রয়েছে। মার্কিন সংবিধানে রাষ্ট্রপতির আইনবিভাগীয় ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্কের কয়েকটি বিষয় নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ঐগুলো ছাড়াও আরও অনেক ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ব্যাপক স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে।

অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত রাখা

সাধারণ অবস্থায় মার্কিন কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বানের ক্ষমতা মার্কিন রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়নি। কিন্তু মার্কিন সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের তৃতীয় ধারা অনুসারে বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের উভয় কক্ষ সিনেট এবং প্রতিনিধিসভার বা যে কোন একটি কক্ষের বিশেষ অধিবেশন (special session) আহ্বান করতে পারবেন। বস্তুত বিংশতিতম সংশোধনী আইন অনুমোদিত হবার আগে পর্যন্ত মার্কিন রাষ্ট্রপতিরা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতেন। সাধারণ অবস্থায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত (adjournment) রাখার ক্ষমতা ভোগ করেন না। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিতের সময় সম্পর্কে কংগ্রেসের দুটি কক্ষ—সিনেট এবং প্রতিনিধিসভার মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে ঐ একই ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজের মতে উপযুক্ত সময় পর্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত রাখতে পারবেন। রাষ্ট্রপতির মতে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিশেষ কাজ (business) সম্পন্ন করার জন্য রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের অধিবেশনের দিন বৃদ্ধি করার জন্য কংগ্রেসের ওপরে চাপ দিতে পারেন।

আইনের উদ্যোগ

মার্কিন আইনসভা বা কংগ্রেস যে সকল বিল প্রণয়ন করে সে ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান শতকে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির উদ্যোগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের তৃতীয় ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি মাঝে মাঝে কংগ্রেসকে ইউনিয়নের অবস্থা জ্ঞাপন করবেন এবং তাঁর মতে প্রয়োজনীয় ও যথাযোগ্য ব্যবস্থাদি কংগ্রেসের সদস্যদের বিবেচনার জন্য সুপারিশ করবেন। এই ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে বাণী (Presidential Messages) পাঠাতে পারেন। উড্রো উইলসন এই ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করেন। ডব্লু ই. বিংক্লে (W. E. Binkley) তাঁর *The President as Chief Legislator* গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, উইলসন আইন প্রণয়নের ওপরে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে প্রসারিত করে এ ব্যাপারে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর সমতুল্য করেছেন। এর পর থেকে রাষ্ট্রপতিরা কংগ্রেসে নিছক বাণী পাঠাবার পরিবর্তে তাঁদের বাণীর মাধ্যমে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করা, প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের জন্য বিলের খসড়া কংগ্রেসে উপস্থিত করা, বাজেটের রূপরেখা কংগ্রেসে প্রেরণ করা, আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থিত করা প্রভৃতি শুরু করেন।

কংগ্রেস যে সকল আইন পাশ করে, শাসনবিভাগ সেগুলোর খসড়া প্রস্তুত করে এবং কংগ্রেসে সেগুলো বন্ধু সদস্যদের দ্বারা উত্থাপন করার এবং ঐ বিল গ্রহণের জন্য

রাষ্ট্রপতির বাণী দ্বারা বা অন্যান্য উপায়ে কংগ্রেসকে চাপ দিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হয়। এই ভাবে কংগ্রেসের ওপরে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রপতির আইনবিভাগীয় কাজ এবং রাষ্ট্রপতি-কংগ্রেস সম্পর্কের একটা গুরুত্ব-পূর্ণ দিক হল রাষ্ট্রপতির ভিটো (Veto) সংক্রান্ত ক্ষমতা। মার্কিন সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদের সপ্তম ধারায় রাষ্ট্রপতির ভিটো সংক্রান্ত ক্ষমতাকে বিস্তৃতভাবে বিধি-বদ্ধ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, কংগ্রেস প্রণীত বিল আইন-এ পরিণত হবার আগে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে হবে। রাষ্ট্রপতি বিলটি অনুমোদন করলে তাতে তিনি স্বাক্ষর করবেন। কিন্তু তিনি যদি বিলটি অনুমোদন না করেন তবে তিনি তাঁর আপত্তি জানিয়ে বিলটি কংগ্রেসের যে কক্ষে উত্থাপিত হয়েছিল সেই কক্ষে ফেরত দেবেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত বিলটি আবার কংগ্রেসের কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা অনুমোদিত হলে তা আইন-এ পরিণত হবে। রাষ্ট্রপতি কোন বিল অনুমোদন না করলে তাকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভিটো প্রয়োগ বলে ধরা হয়।

ভিটো ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির কাছে বিল উত্থাপিত হবার পরে রাষ্ট্রপতি নীচের যে কোন একটি উপায় গ্রহণ করতে পারেন।

১. রাষ্ট্রপতি দশ দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর দিয়ে তা ফেরত পাঠাতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দান করায় তাঁর ভিটো প্রয়োগের কোন কথাই ওঠে না।

২. রাষ্ট্রপতি বিলটিতে স্বাক্ষর না করে দশদিনের মধ্যে তা ফেরত পাঠিয়ে দিলে ধরা হবে যে রাষ্ট্রপতি বিলটিতে 'ভিটো' (Presidential Veto) প্রয়োগ করেছেন।

৩. রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি না দিয়ে দশদিন ধরে যদি নিজের কাছে রেখে দেন এবং ইতিমধ্যে যদি কংগ্রেসের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে তবে বিলটি বাতিল হয়েছে বলে ধরা হবে। রাষ্ট্রপতির এই কাজকে পকেট ভিটো (Pocket Veto) বলে। পকেট ভিটো প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি অনভিপ্রেত বিলকে বাতিল করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা বহুবার প্রয়োগ হতে দেখা গিয়েছে। বস্তুত, ভিটো প্রয়োগ রাষ্ট্রপতির হাতে একটি অমোঘ অস্ত্র এবং এই অস্ত্র প্রয়োগ করে তিনি আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণে সফল হন।

উপরোক্ত আইনবিভাগীয় ক্ষমতার প্রয়োগ ছাড়াও রাষ্ট্রপতি সংবিধান বহির্ভূত আরো অনেক উপায়ে (extra-constitutional means) কংগ্রেসকে প্রভাবিত করতে পারেন। বস্তুত, রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই দিকগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্রথমত, মার্কিন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত যোগাযোগ রেখে এবং তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রপতির এই প্রয়াস শুধুমাত্র কংগ্রেসে তাঁর নিজদলীয় সদস্যদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়,

অন্যদলের সদস্যদেরও তিনি একই ভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। কোন বিশেষ আইন প্রণয়ন বা বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে কংগ্রেসের সমর্থন আদায়ের জন্য রাষ্ট্রপতিরা অনেক সময়ই বিরোধী দলনেতাদের সঙ্গে মিলিত হন।

ব্যক্তিগত যোগাযোগ

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতিরা তাঁদের অনুগ্রহ বণ্টনের (distribution of spoils) দ্বারাও কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অতীতে অনুগ্রহ বণ্টন রাষ্ট্রপতিদের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা এনে দিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির অনুগ্রহ বণ্টনের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় এই পদ্ধতিতে প্রভাব বিস্তারেও কিছুটা ভাঁটা পড়েছে। তা সত্ত্বেও এখনো মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিপুল সংখ্যক উচ্চপদে নিয়োগের ক্ষমতা বণ্টন করে কংগ্রেসের সদস্যদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন।

অনুগ্রহ বণ্টন

তৃতীয়ত, মার্কিন রাষ্ট্রপতিরা জনমত গঠনের মাধ্যমগুলোর সাহায্য নিয়ে নিজের বক্তব্যের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করে। সেই জনমতের সাহায্যে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রপতি কি আইন চান, কি নীতি গ্রহণ করছেন, কংগ্রেসে তিনি কি বাণী পাঠালেন—এইসব সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। এই প্রচারের ফলে মার্কিন জনজীবনে জাতীয় নেতার অনুকূলে জনমত গঠিত হয় এবং ঐ জনমতের প্রভাব মার্কিন কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে (The President can create a public sentiment which party leaders dare not to ignore)। রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি রেগন পর্যন্ত প্রায় সকলেই সাংবাদিক সম্মেলনকে জনমত সৃষ্টির বাহন হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করেছেন।

জনমত গঠন

চতুর্থত, রাষ্ট্রপতি হলেন প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতা। একটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষনেতা হিসেবে রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতা দিয়ে কংগ্রেসে ... দলীয় সদস্যদের প্রভাবিত করেন এবং তাঁদের মাধ্যমে কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রপতি যে দলের নেতা সেই দলের সদস্যরা রাষ্ট্রপতিকে সন্তুষ্ট করার জন্য সচেষ্ট থাকে, তাই রাষ্ট্রপতির পক্ষে তাঁদের প্রভাবিত করা সহজ হয়। তবে পরবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতির পক্ষে যদি পুনর্নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তখন দলীয় সদস্যদের মাধ্যমে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনাও হ্রাস পায়।

দলের নেতা হিসাবে নিয়ন্ত্রণ

সর্বোপরি, রাষ্ট্রপতি তাঁর শাসনবিভাগের বিভিন্ন শাখা ও বিভাগের সাহায্যে এবং বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সাহায্যে তাঁর নীতি ও কর্মপন্থাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেন। একে বলা হয় রাষ্ট্রপতির লবি করা (Lobbying)। রাষ্ট্রপতি এই লবির সাহায্যে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে সমান্তরালভাবে কংগ্রেসকে পরিচালনার চেষ্টা করেন।

রাষ্ট্রপতির লবি

কংগ্রেস কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ ঃ সম্পর্কের অন্যদিক

রাষ্ট্রপতির আইন বিভাগীয় কার্যকরী আলোচনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি কিভাবে আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে আইনসভাকে নেতৃত্ব দেন তা তুলে ধরা হল। কিন্তু এটা হল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্কের একটা দিক। অন্যদিকটা হ'ল কংগ্রেস কিভাবে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

মার্কিন শাসনব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি (Theory of checks and balances) যেমন কংগ্রেসের ওপরে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণকে কায়েম করেছে, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কংগ্রেসের হাতেও ক্ষমতা রয়েছে।

প্রথমত, শাসনকার্য পরিচালনা এবং কর্মসূচী রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজন অর্থ। ঐ অর্থ বরাদ্দ করে কংগ্রেস। সুতরাং রাষ্ট্রপতির প্রতিটি কর্মসূচী এবং অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক নীতি যাতে কার্যকর হয় তার জন্য রাষ্ট্রপতিকে কংগ্রেসের ওপরে নির্ভরশীল থাকতে হয়। রাষ্ট্রপতির কোন নীতিকে রূপায়িত করার জন্য কংগ্রেস যদি অর্থ বরাদ্দ করতে অস্বীকার করে তবে রাষ্ট্রপতির পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয় না। তাই অর্থ বরাদ্দের ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র—যার সাহায্যে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। নীতি রচনা করেন রাষ্ট্রপতি, ঐ নীতিকে কার্যকর করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করে কংগ্রেস এবং সেই অর্থের সাহায্যে রাষ্ট্রপতির নীতিকে কার্যকর করা হয়। সুতরাং রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক রয়েছে।

আর্থিক বরাদ্দ

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যে সকল চুক্তি করেন বা সন্ধি করেন সেগুলো কংগ্রেসের দ্বিতীয় কক্ষ সিনেটে অনুমোদিত হয়ে কার্যকর হয়। রাষ্ট্রপতি যে সকল বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন তাতে আর্থিক অঙ্গীকার থাকলে কংগ্রেসের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির কতকগুলো নিয়োগ কার্যকর হবার জন্য সিনেটের অনুমোদন প্রয়োজন। সুতরাং রাষ্ট্রপতির অনেক কাজকর্ম এবং উদ্যোগ সিনেটের অনুমোদনের ওপরে নির্ভরশীল।

অনুমোদন

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যে সকল বিলের ওপরে 'ভিটো' প্রয়োগ করেন সেই সকল বিল কংগ্রেসের উভয়কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আবার অনুমোদন করলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়াই তা আইন-এ পরিণত হতে পারে। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি কোন সুপারিশ বা বিলের খসড়া কংগ্রেসে পাঠালে সেই বিল দ্রুত উত্থাপন করা বা-না-করা কংগ্রেসের ওপরে নির্ভর করে। কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি বিলের ঐ খসড়ার যে কোন পরিবর্তন করতে পারে। পটারের ভাষায় বলা যায় যে, রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়নের ক্ষমতার চেয়ে কংগ্রেস কর্তৃক রাষ্ট্রপতির সুপারিশ বাতিল করার ক্ষমতা অনেক বেশী।

আইন প্রণয়নে বাধা

চতুর্থত, রাষ্ট্রপতিকে 'ইমপিচমেন্ট'-এর দ্বারা অপসারণের ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে সংবিধান ন্যস্ত করেছে। সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের চতুর্থ ধারায় রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচ করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের ক্ষমতা প্রতিনিধিসভার ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং ঐ অভিযোগ-প্রস্তাব প্রতিনিধিসভায় অনুমোদিত হলে তা বিচারের জন্য সিনেটে পাঠান হয়। সুতরাং রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের ক্ষমতা কংগ্রেসের দুটি কক্ষের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

ইমপিচমেন্ট

সর্বোপরি কংগ্রেসের বহু কমিটি রয়েছে যেগুলো শাসনবিভাগের বিভিন্ন কাজকর্মের মূল্যায়ন করে। কংগ্রেসের ঐ সকল কমিটির প্রতিবেদন শাসনবিভাগের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতিকে জনসমক্ষে তুলে ধরে শাসনবিভাগ তথা রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণে প্রয়াসী হয়।

কমিটি

উপসংহার

মার্কিন সাংবিধানিক ব্যবস্থা এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং কংগ্রেস উভয় উভয়কে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন সংবিধানের নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির ইহাই ফলশ্রুতি। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস যখন পরস্পরের সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় তখন কোন সমস্যা দেখা দেয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংকট, যুদ্ধ, মন্দা এবং বুর্জোয়া সমস্যার সময়ে দেখা যায় যে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা সুমধুর সম্পর্ক বিরাজ করে—ঐ সময়ে রাষ্ট্রপতি নেতৃত্ব দেন এবং কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে অনুসরণ করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতির জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। তাই অনেক সময়ই মার্কিন কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির সহযোগী হিসেবে না দেখা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা দেয় (Congress most often seems to be a rival rather than an ally of the President)। তবে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে বিরোধ স্থায়ী হয় না। কারণ রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস উভয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়া স্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতির সমর্থক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের সদস্যরাই কংগ্রেসের সদস্য। উভয় দলই মোটামুটিভাবে একই শ্রেণীস্বার্থ ও আদর্শের বাহক এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে যিনিই আসীন হোন তিনিও এর ব্যতিক্রম নন। ফলে, বাস্তবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের মধ্যে মাঝে মাঝে বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও বৃহত্তর শ্রেণীস্বার্থে সহজেই ঐ বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে এবং কংগ্রেস মার্কিন রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বকে স্বীকার করে নেয়।

আট : মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং ব্রিটেনের রানী ও প্রধানমন্ত্রী : তুলনা (American President, British Queen and Prime Minister : Comparison)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে। অন্যদিকে ব্রিটেনে সংসদীয় ব্যবস্থা বা মন্ত্রিসভা চালিত শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্রপতি

চালিত ব্যবস্থায় প্রধান শাসক মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সংসদীয় ব্যবস্থায় ব্রিটেনের আনুষ্ঠানিক প্রধান রাজা বা রানী এবং প্রকৃত শাসক প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদার তুলনা খুবই প্রাসঙ্গিক।

১. মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং ব্রিটেনের রানী

মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ব্রিটেনের রানীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদার তুলনা করার আগে বলা প্রয়োজন যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতির সকল ক্ষমতার প্রধান উৎস হল লিখিত এবং বিধিবদ্ধ মার্কিন সংবিধান। কিন্তু ব্রিটেনে লিখিত ও বিধিবদ্ধ কোন সংবিধান নেই। তাই ব্রিটেনের রানীর ক্ষমতার প্রধান উৎস হ'ল রীতিনীতি ও প্রথা। যুগ যুগ ধরে ব্রিটেনে যে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা গড়ে উঠেছে তাকে কেন্দ্র করেই ব্রিটেনের রাজা বা রানীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা গড়ে উঠেছে। নির্দিষ্ট সাংবিধানিক বিধান (Constitutional provisions) থাকার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা মোটামুটিভাবে অপরিবর্তনশীল, যদিও সংবিধান বহির্ভূত উপায়ে সেখানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, ব্রিটেনে রাজা বা রানীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা কোন নির্দিষ্ট সাংবিধানিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না বলে সেখানে রাজকীয় ক্ষমতা ও পদমর্যাদা পরিবর্তনশীল। বস্তুত সেখানে তাই সহজেই রাজা বা রানীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদার অবনয়ন ঘটেছে। সুতরাং বলা যায়, মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ক্রমবর্ধমান এবং অন্যদিকে ব্রিটেনে রানীর ক্ষমতা ক্রমহ্রাসমান।

উভয়ের ক্ষমতার উৎস

যে কোন শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগীয় ক্ষমতাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে বিচার করা হয়—আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা এবং প্রকৃত ক্ষমতা। মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং ব্রিটেনের রানী উভয়েই প্রধান শাসক এবং রাষ্ট্রপ্রধান। প্রধান শাসক এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিক এবং প্রকৃত ক্ষমতা উভয়ই ভোগ করেন। কিন্তু প্রধানশাসক এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ব্রিটেনের রানীর হাতে কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে প্রথম সাদৃশ্য হল যে উভয়েই প্রধান শাসক, উভয়েই রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদায় অভিসিক্ত এবং উভয়েই আনুষ্ঠানিক প্রধানের (Ceremonial Head) ক্ষমতা ভোগ করেন। আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে দুজনেই বিদেশের রাষ্ট্রদূতদের গ্রহণ করেন, বিদেশী অতিথিদের গ্রহণ ও আপ্যায়ন করেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, বিলে স্বাক্ষর করে তাকে আইনে রূপ দেন। নিজ নিজ দেশে শাসনবিভাগীয় সব ক্ষমতাই এঁদের নামে প্রয়োগ করা হয়।

উভয়েই প্রধান শাসক

রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদ এবং ব্রিটেনের রাজতন্ত্র উভয় দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিপুল মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। উভয় পদই খুব জাঁকজমকপূর্ণ এবং উভয় পক্ষের সঙ্গে জনগণের একটা মানসিক ও আবেগময় সম্পর্ক রয়েছে।

কিন্তু সর্বোচ্চ শাসক হিসেবে উভয়ের মধ্যে উপরোক্ত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও মনে রাখা প্রয়োজন যে এঁদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের পরিধি অনেক ব্যাপক। বস্তুত মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও ব্রিটেনের রানীর ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে দেখান যেতে পারে যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এঁদের মধ্যে অবস্থানগত একটা সাদৃশ্য থাকলেও অন্য সব ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যাপক বৈসাদৃশ্য।

নির্বাচন

প্রথমত, মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন এবং চার বছর ক্ষমতায় আসীন থাকেন। তিনি দ্বিতীয়বার চার বছরের জন্য পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে পারেন এবং ইমপিচ্‌মেণ্ট পদ্ধতির দ্বারা তাঁকে অপসারণ করা যেতে পারে। অন্যদিকে ব্রিটেনের রাজা বা রানীর পদ নির্বাচিত পদ নয়। রাজা বা রানী বংশানুক্রমে রাজত্ব করেন এবং আমৃত্যু সিংহাসনে আসীন থাকেন। ব্রিটেনের রাজা বা রানীকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করা যায় না।

প্রকৃত শাসন ক্ষমতা

দ্বিতীয়ত, ব্রিটেনের রানী আনুষ্ঠানিক প্রধান, প্রকৃত শাসক নয়। ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত শাসন ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন ক্যাবিনেটের হাতে ন্যস্ত। সুতরাং শাসনবিভাগীয় সকল ক্ষমতা রানীর হাতে তত্ত্বগত দিক থেকে ন্যস্ত থাকলেও বাস্তবে ঐ ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করেন না। তাই শাসনবিভাগের কাজের জন্য তাঁকে দায়ী করা হয় না। অন্যদিকে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি আনুষঙ্গিক প্রধানের ক্ষমতাসহ প্রকৃত প্রধানের ক্ষমতা ভোগ করেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে শাসনবিভাগের ক্ষমতা ভোগ করেন এবং সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার দায়িত্ব বহন করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করার জন্য ক্যাবিনেট সদস্য এবং পরামর্শদাতারা রয়েছেন, কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবাহক কর্মচারী মাত্র। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী নীতি নির্ধারিত হয় এবং শাসনকার্য পরিচালিত হয়।

আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে পার্থক্য

তৃতীয়ত, আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ব্রিটেনের রানীর থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে উভয়েই বিদেশ সফর করেন, কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি বৈদেশিক নীতি-নির্ধারণ এবং নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতার অধিকারী হবার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতির বিদেশ সফর অনেক বেশী অর্থবহ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ব্রিটেনের রানীর বিদেশ ভ্রমণ নিছক শুভেচ্ছাসফর মাত্র। রানীর বক্তৃতাতে কখনই সরকারী নীতি প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি সরকারী নীতির প্রধান প্রবক্তা।

চতুর্থত, ব্রিটেনের রানীকে পার্লামেণ্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ (Queen-in-Parliament) হিসেবে ধরা হয়। রানী পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করেন, অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কমন্সসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন,

পার্লামেন্টের গৃহীত বিলে তিনি সম্মতি দিলে তা আইনে পরিণত হয়। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে কংগ্রেসের অঙ্গ মনে করা হয় না। তিনি সাধারণ অবস্থায় কংগ্রেসের সভা আহ্বান করেন না এবং কংগ্রেসকে তিনি ভেঙ্গে দিতে পারেন না। তবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস প্রণীত বিলে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর দিলে তা আইনে পরিণত হয়। ব্রিটেনের রানী এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেউই আইনসভার সদস্য নন।

আইনসভার সঙ্গে সম্পর্ক

পঞ্চমত, ব্রিটেনে রানীর সঙ্গে ক্যাবিনেটের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক থাকে না। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রানী মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। কিন্তু তিনি নিজে ক্যাবিনেটের সদস্য নন এবং ক্যাবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন না বা ঐ সভায় যোগদান করেন না। রানীর সঙ্গে ক্যাবিনেটের যোগসূত্র রক্ষা করেন প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নিজে ক্যাবিনেট গঠন করেন, ক্যাবিনেটকে নেতৃত্ব দেন এবং ক্যাবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি ক্যাবিনেট ভেঙ্গে দিতেও পারেন।

ক্যাবিনেটের সঙ্গে সম্পর্ক

মার্কিন রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীসহ বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োগ করেন এবং ঐ নিয়োগের মাধ্যমে তিনি অনুগ্রহ বণ্টন করেন। ঐ সকল নিয়োগের ব্যাপারে মার্কিন রাষ্ট্রপতির কারও পরামর্শ অনুযায়ী চলার আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ব্রিটেনে যদিও বিচারপতিসহ সকল নিয়োগই ঘটে রানীর নামে, কিন্তু বাস্তবে ঐ সকল নিয়োগের ব্যাপারে রানীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভূমিকা নেই। ব্রিটেনে নিয়োগ ঘটে মন্ত্রিদেব পরামর্শ অনুযায়ী, যদিও তা রানীর নামে কার্যকর করা হয়।

নিয়োগ ক্ষমতা

সপ্তমত, ব্রিটেনের রানী সমাজজীবনে এবং ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেধ মর্যাদার অধিকারী। তিনি কতকগুলো বিশেষাধিকার (Prerogatives) ভোগ করেন। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি ঐ রূপ কোন বিশেষাধিকার ভোগ করেন না। তিনি ব্রিটেনের রানীর মত সমাজজীবনে এবং ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নন।

বিশেষাধিকার

সর্বোপরি বলা প্রয়োজন যে, মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ক্রমবর্ধমান। মার্কিন রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়া স্বার্থের রক্ষক নন, তিনি গোটা দুনিয়ার পুঁজিবাদী স্বার্থরক্ষায় নেতৃত্ব দান করেন। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার তথা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হচ্ছে যাতে রাষ্ট্রপতি অধিকতর ক্ষমতায় সজ্জিত হয়ে পুঁজিবাদী স্বার্থকে যথাযোগ্যভাবে রক্ষা করতে পারেন। সুতরাং একথা বলা অন্যায় নয় যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও পদমর্যাদায় আসীন। অন্যদিকে, ব্রিটেনে যদিও আজও রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে, কিন্তু রাজতন্ত্রকে গণতন্ত্রীকরণের

ফলে সেখানে রাজা বা রানীর ক্ষমতা ক্রমাগত হ্রাস করা হচ্ছে এবং স্বাভাবিকভাবেই সেখানে রানীর পদমর্যাদাও ক্রমহ্রাসমান। সুতরাং বলা যায়, ব্রিটেনের রাজা বা রানী ক্রমহ্রাসমান ক্ষমতা ও মর্যাদা নিয়ে সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আসীন রয়েছেন। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও মর্যাদায় মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভাস্বর হয়ে উঠেছেন।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দিক থেকে মার্কিন রাষ্ট্রপতির স্থান ব্রিটেনের রানী থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। অনেকে মনে করেন যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ব্রিটেনের রানীর আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হবার জন্য তার ক্ষমতাকে ব্রিটেনের রানী ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার যোগফল বলা যেতে পারে। এইজন্য একজন প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি থিয়োডর রুজভেল্ট (Theodore Roosevelt) মন্তব্য করেছেন, *The American President is almost that of a King and Prime Minister.*

২ মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

ক্ষমতা ও পদমর্যাদার দিক থেকে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ব্রিটেনের রানীর তুলনা যতটা প্রাসঙ্গিক তার চেয়ে অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক হল মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এবং পদমর্যাদার তুলনামূলক মূল্যায়ন। দুটি উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। উভয়ে নিজ নিজ দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিপুল ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সাংবিধানিক মর্যাদার অধিকারী। কোন কোন ক্ষেত্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্কিন রাষ্ট্রপতির চেয়ে ক্ষমতাশালী। তাই অধ্যাপক লাস্কি (H. Laski) বলেছেন, *The President of the United States is both more and less than British Prime Minister.*

মার্কিন রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিক শাসকের ক্ষমতা ছাড়াও প্রকৃত শাসকের ক্ষমতা ভোগ করেন। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীও প্রকৃত শাসকের ক্ষমতার অধিকারী উভয়ই প্রকৃত প্রধান শাসক হিসেবে সরকার পরিচালনা, সরকারকে নির্দেশ দান, সরকারী নীতি নির্ধারণ, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সরকারকে নেতৃত্বদানের ব্যাপারে চরম কর্তৃত্ব ভোগ করেন। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক বলতে যেমন রাষ্ট্রপতিকে বোঝায়, তেমনি ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত শাসক বলতে প্রধানমন্ত্রীকে বোঝান হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর শাসনবিভাগীয় কর্তৃত্বের ব্যাপারে এই প্রাধান্য এঁদের দুজনকে সাদৃশ্যমূলক ভূমিকায় আসীন করেছে। কিন্তু সাংবিধানিক ব্যবস্থায় এঁদের অবস্থান এবং বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষমতাকে বিচার করলে দেখা যাবে যে অনেক ক্ষেত্রেই মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা আলাদা।

শাসনবিভাগীয় চরম ক্ষমতা

মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁকে নির্বাচন করে এক নির্বাচকমণ্ডলী। একমাত্র ইমপিচমেণ্ট পদ্ধতি ছাড়া তাঁকে অপসারণ করা যায় না। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারা মনোনীত হয়ে রানীর দ্বারা নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা তাঁদের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের কাছে দায়িত্বশীল থাকেন। পার্লামেণ্ট অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করলে প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। সুতরাং মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদের স্থায়িত্ব কংগ্রেসের আস্থার ওপরে বা অন্য কারও দয়ার ওপরে নির্ভর করে না; কিন্তু ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদের স্থায়িত্ব পার্লামেণ্টের আস্থার ওপরে নির্ভরশীল।

দায়িত্বশীলতা

মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অধীনে একটি করে ক্যাবিনেট আছে। উভয়েই ক্যাবিনেটের নেতা এবং ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যরা আইনসভার সদস্য নন, তাঁরা রাষ্ট্রপতির সহকর্মী নন—ক্যাবিনেটের সদস্যরা হলেন রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনীত এবং নিযুক্ত, তাঁরা রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবাহক কর্মচারী মাত্র। রাষ্ট্রপতি যে কোন ক্যাবিনেট সদস্যকে অপসারণ করতে পারেন। কিন্তু ব্রিটেনে যদিও ক্যাবিনেট সদস্যদের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেন, তাঁদের নিযুক্ত করেন রানী। ক্যাবিনেট সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর কর্মচারী নন, তাঁর সহকর্মী। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সদস্যরা আইনসভার সদস্য। ব্রিটেনে ক্যাবিনেট সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ঐক্যমত না হলে পদত্যাগ করেন। মার্কিন ক্যাবিনেটের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির যে সম্পর্ক এবং ক্যাবিনেটের ওপরে তাঁর যে নিয়ন্ত্রণ তা ব্রিটেনে নেই। ক্যাবিনেটের সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেকে অনেক ক্ষমতা ও সাংবিধানিক মর্যাদার অধিকারী।

ক্যাবিনেটের পরিপ্রেক্ষিতে

আইনসভার সঙ্গে সম্পর্ক এবং আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মার্কিন রাষ্ট্রপতির চেয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অনেক বেশী কার্যকর। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টের সদস্য এবং নেতা। পার্লামেণ্টে প্রধানমন্ত্রীর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে বলে প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টকে দিয়ে প্রয়োজনীয় বিল এবং ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদন করিয়ে নিতে পারেন। বস্তুত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা যে ভাবে পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় পার্লামেণ্ট সেভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের সদস্য নন, তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন না এবং কংগ্রেসকে পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর এবং ক্যাবিনেটের বিশেষ কোন ভূমিকা নেই। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে বাণী পাঠাতে পারেন, এবং কংগ্রেসে গৃহীত বিলে ভিটো প্রয়োগ করতে পারেন, কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যে ভাবে পার্লামেণ্টকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি তা পারেন না। সুতরাং বলা যায় যে, আইনসভাকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মার্কিন রাষ্ট্রপতির চেয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অনেক বেশী ক্ষমতার অধিকারী।

আইনসভার পরিপ্রেক্ষিতে

মার্কিন রাষ্ট্রপতি মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক এবং প্রকৃত শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতাকে দুটি ভাগ করা হয়েছে—আনুষ্ঠানিক ও প্রকৃত। সেখানে রাজা বা রানী আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ভোগ করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রধানের ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করেন, কিন্তু ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঐ ক্ষমতা ভোগ করেন না।

জাতির নেতা

মার্কিন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ভোগ করেন, কিন্তু ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঐ মর্যাদা ভোগ করেন না। ব্রিটেনে রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাজা বা রানী। ফলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক অনন্য সম্মান ও মর্যাদায় আসীন, যা ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রীর পক্ষে সাংবিধানিক দিক থেকে লাভ করা সম্ভব নয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জাতির নেতা হিসাবে স্বীকৃত, কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জাতির নেতার মর্যাদা পান না। তাই মার্কিন রাষ্ট্রপতি জাতির প্রতিনিধিত্ব করেন বলে ধরা হয়, যা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে দাবী করা সম্ভব নয়।

অনুগ্রহ বণ্টন

মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিভিন্নপদে নিয়োগের এবং অনুগ্রহ বণ্টনের (distribution of spoils) ব্যাপক সাংবিধানিক ক্ষমতা ভোগ করেন। এরূপ কোন ক্ষমতা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নেই। অনুগ্রহ বণ্টনের ক্ষমতা প্রয়োগ করে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনজীবনের বিপুল অংশকে প্রভাবিত করতে পারেন।

নিয়োগ ও প্রতিরক্ষা

মার্কিন রাষ্ট্রপতি হলেন সেখানকার প্রতিরক্ষাবাহিনীর প্রধান। প্রতিরক্ষা-বাহিনীর প্রধান হিসাবে তিনি সৈন্য সমাবেশ করতে পারেন। ব্রিটেনে রানী প্রতিরক্ষাবাহিনীর প্রধান, প্রধানমন্ত্রী নন।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্রিটেনে যে সকল ক্ষমতা রানীকে ন্যস্ত করা হয়েছে তা বাস্তবে মন্ত্রিসভার ক্ষমতা এবং মন্ত্রিসভার ইচ্ছানুযায়ী তা প্রয়োগ হয়। আবার মন্ত্রিসভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাই ব্রিটেনে রাজা বা রানীর ক্ষমতা বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় পরিণত হয়েছে।

ব্রিটিশ ও মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদার তুলনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তত্ত্বগত দিক থেকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি অধিকতর ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। তাই অনেকে মনে করেন যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হল ব্রিটেনের রাণী ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার যোগফল। সেজন্য স্বভাবতই মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও সাংবিধানিক মর্যাদা অনেক বেশী। এই বক্তব্য যে অনেকাংশে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, ব্রিটেনে যে সকল ক্ষমতা তত্ত্বগতভাবে রানীর হাতে ন্যস্ত বাস্তবে তা প্রয়োগ করেন মন্ত্রিসভা তথা প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব ক্ষমতা ছাড়াও রাজকীয় ক্ষমতার অধিকাংশই প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়। তাই বলা যায়, তত্ত্বগত দিক থেকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর

ক্ষমতা ও সাংবিধানিক মর্যাদার মধ্যে যতটা গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য আছে বলে মনে হয় বাস্তবে ঘটনা তা নয়।

নয়ঃ মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি (The Vice President of the U. S. A.)

মার্কিন সংবিধানে একটি উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণ ঘটলে যাতে শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য উপরাষ্ট্রপতির পদটির প্রয়োজনীয়তাকে সংবিধান প্রণেতারা উপলব্ধি করেছিলেন। মূল সংবিধানে উপরাষ্ট্রপতির জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা ছিল না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন তিনি রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হতেন এবং দ্বিতীয় স্থানাধিকারী উপরাষ্ট্রপতি পদ লাভ করতেন। ১৮০৪ সালে দ্বাদশ সংশোধনী আইনে উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য আলাদা নির্বাচন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হয় এবং ঐ সংশোধনী আইনে উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন ব্যবস্থাকে রূপ দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি একই নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচন করেন এবং রাষ্ট্রপতির মত উপরাষ্ট্রপতিও চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন। দ্বাদশ সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, উপরাষ্ট্রপতি পদে যিনি সবচেয়ে বেশী ভোট পাবেন তিনি উপরাষ্ট্রপতি পদে আসীন হবেন। উপরাষ্ট্রপতি পদে যদি কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পান তবে তালিকার সবচেয়ে বেশী ভোটপ্রাপ্ত দুজনের মধ্য থেকে সিনেট একজনকে উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করবে। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি একই রাজ্যের অধিবাসী হতে পারবেন না। সাধারণত এঁদের মধ্যে একজন উত্তরাঞ্চলের এবং একজন দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দা হন। সাংবিধানিক কোন নির্দেশ না থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় যে রাষ্ট্রপতি পদের যিনি প্রার্থী মনোনীত হন তিনি তাঁর পছন্দমত একজন প্রার্থীর নাম উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য স্থির করেন। দলই ঐ নাম অনুমোদন করে তাঁকে উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দু'একটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে মার্কিন উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনীত করা হয়েছে। যেমন, রাষ্ট্রপতি নিক্সনের (Nixon) সময়ে উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন অ্যাগ্নিউ। মানসিক অক্ষমতার জন্য তিনি পদত্যাগ করার পরে রাষ্ট্রপতি নিকসন উপরাষ্ট্রপতি পদে জেরাল্ড ফোর্ডকে মনোনীত করেন এবং ফোর্ড উপরাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন। শুধু তাই নয়, ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর জন্য রাষ্ট্রপতি নিকসন পদত্যাগে বাধ্য হলে মনোনীত উপরাষ্ট্রপতি ফোর্ড রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

যোগ্যতা

সংবিধানে বলা হয়েছে যে, মৃত্যু, পদত্যাগ, অক্ষমতা বা অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতির কার্যকালের অবশিষ্ট সময়ের জন্য উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন। এখন পর্যন্ত নয় জন রাষ্ট্রপতির আকস্মিক মৃত্যুতে সংশ্লিষ্ট উপরাষ্ট্রপতিরা রাষ্ট্রপতির কার্যভার এইভাবে গ্রহণ করেছেন। ঐ সময়ে উপরাষ্ট্রপতি 'রাষ্ট্রপতি' উপাধি ব্যবহার করেছেন এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কর্তব্য প্রয়োগ করেছেন। ২৫-তম সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ

যে, রাষ্ট্রপতি যদি তাঁর দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন এবং তিনি যদি অক্ষমতার কথা লিখিতভাবে জানান বা উপরাষ্ট্রপতি সহ মন্ত্রিসভার সদস্যদের যদি প্রতীতি জন্মে যে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অক্ষম তবে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

সাধারণ অবস্থায় উপরাষ্ট্রপতির প্রধান কাজ হ'ল সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করা, যদিও তিনি সিনেট সভার সদস্য নন। উপরাষ্ট্রপতি সিনেটের বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন না বা ভোটদান করেন না। কোন প্রস্তাবে উভয় পক্ষে সমান ভোট পড়লে উপরাষ্ট্রপতি কাস্টিং বা নির্ণায়ক ভোট (casting vote) দেন। সম্প্রতিকালে উপরাষ্ট্রপতিদের কিছু কিছু কার্যভার অর্পণ করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের সময় থেকে উপরাষ্ট্রপতিকে জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির সদস্য করা হয়। আইজেনহাওয়ারের সময়ে তাঁর অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করতেন। বর্তমানে ক্যাবিনেট সভায় উপরাষ্ট্রপতিদের আমন্ত্রণ জানান হয়। উপরাষ্ট্রপতিদের বিদেশে শুভেচ্ছা সফরে পাঠান হয় এবং তাঁরা সেখানে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিত্ব করেন।

কার্যাবলী

মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উপরাষ্ট্রপতির পদটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই উপরাষ্ট্রপতিকে *His Superfluous Highness* নামে অভিহিত করা হয়। বস্তুত সংবিধান প্রণেতারা মার্কিন উপরাষ্ট্রপতির পদকে খুব বেশী ক্ষমতাশালী এবং মর্যাদাকর করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কোন কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে সাময়িকভাবে কাজ চালিয়ে নেবার উপযোগী করে তাঁরা এই পদটিকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই অতীতে সম্ভাবনাময় কোন ব্যক্তিত্ব উপরাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হতে রাজী হতেন না। তবে পরিবর্তিত অবস্থায় কিছুদিন থেকে উপরাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের ক্যাবিনেট সভায় আমন্ত্রণ জানান হয়, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য করা হয় বিদেশে শুভেচ্ছা সফরে পাঠান হয়। তাছাড়া যে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির আদর্শ, দর্শন ও চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁর পূর্ণ আস্থা অর্জন করতে পারেন তিনি মার্কিন রাষ্ট্রীয় জীবনে অধিকতর গুরুত্ব ও মর্যাদায় আসীন হন।

দশ : মার্কিন ক্যাবিনেট (American Cabinet)

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যে সংবিধান বিধিবদ্ধ করা হয় সেই সংবিধানে এবং যে ছাব্বিশটি সংবিধান সংশোধনী আইন গৃহীত হয় তার কোথাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। তাই বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ক্যাবিনেট (Cabinet) দেখা যায় তার উৎপত্তি ঘটেছে সংবিধানের বাইরে (extra constitutional)। মার্কিন রাষ্ট্রপতির বিপুল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগে এবং দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনের তাগিদ থেকে বিভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠেছে। মার্কিন ক্যাবিনেটও এমনিভাবে শাসনবিভাগের অতি প্রয়োজনীয় একটি সংস্থা হিসেবে

উৎপত্তি

আত্মপ্রকাশ করেছে। বস্তুত মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদাধিকারীর পক্ষে তাঁর ব্যাপক প্রশাসনিক ও অন্যান্য ক্ষমতা এবং দায়িত্ব কোন পরামর্শ সংস্থার সাহায্য ছাড়া একক-ভাবে সুষ্ঠু উপায়ে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, তাই প্রয়োজন থেকেই মার্কিন ক্যাবিনেটের উৎপত্তি ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন (George Washington) বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বৈঠক করতেন এবং বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করতেন। পরবর্তী রাষ্ট্রপতিরাও ঐ রীতি মান্য করে চলায় রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে ধীরে ধীরে মার্কিন ক্যাবিনেট গড়ে ওঠে।

ক্যাবিনেটের গঠন

রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবার পরেই রাষ্ট্রপতি 'ক্যাবিনেট' গঠন করেন। রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেট সদস্যদের মনোনীত এবং নিযুক্ত করেন। সাধারণত স্বরাষ্ট্রসচিব, বিদেশ-সচিব ·রাজস্বসচিব, প্রতিরক্ষাসচিব, অ্যাটর্নী জেনারেল, পোষ্টমাস্টার জেনারেল, কৃষিসচিব, বাণিজ্যসচিব, শ্রমসচিব, শক্তিদপ্তরের সচিব প্রভৃতিকে নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয়। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠন করা হয়। অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ এজেন্সীর প্রধানদের মধ্য থেকেও দু-একজনকে ক্যাবিনেটে স্থান দেওয়া হয়। সম্প্রতিকালে উপরাষ্ট্রপতিকে ক্যাবিনেট সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। ক্যাবিনেট সভায় রাষ্ট্রপতি সভাপতিত্ব করেন এবং ইদানীংকালে তাঁর অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন।

গঠনে রাজনৈতিক বিবেচনা

জর্জ ওয়াশিংটন দলমত নিরপেক্ষভাবে পরামর্শ নিয়ে সরকার পরিচালনায় আগ্রহী ছিলেন এবং তিনি অত্যধিক দলীয় মনোভাবকে নিন্দা করতেন। তাই ওয়াশিংটন পরামর্শ করার জন্য যে গোষ্ঠী গঠন করেছিলেন তার মধ্যে টমাস জেফারসন. আলেকজান্ডার, হ্যামিলটন-প্রমুখরা ছিলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের লোক নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হলে সরকারের সংহতি ব্যাহত হয়, আলোচনার গোপনীয়তা থাকে না এবং সরকারের মাধ্যমে দলীয় নীতি রূপায়ণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতির দলের প্রতি যাঁদের সমর্থন রয়েছে তাঁদের নিয়েই মার্কিন ক্যাবিনেট গঠন করার প্রথা গড়ে ওঠে।

অন্যান্য বিবেচনা

যে সকল বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠন করা হয় তাঁদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। সুতরাং রাষ্ট্রপতি ঐ সকল পদে নিয়োগ করার সময়ই তাঁর ক্যাবিনেট কাদের নিয়ে গঠিত হবে তা স্থির হয়ে যায়। তাই ঐ সকল পদে নিয়োগের সময়ে রাষ্ট্রপতিকে খুবই সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়। প্রথমত, রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে যাঁদের সমর্থনের ওপরে রাষ্ট্রপতিকে বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়েছিল তাদের কথা তাঁকে মনে রাখতে হয়। তাই অনেক সময়ে সহযোগী বিরোধী দলের দু-একজন সদস্যকেও ক্যাবিনেটে স্থান দিতে দেখা যায়।

রাষ্ট্রপতি ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট, টাফট (Taft) এবং নিক্সন (Nixon) দু-একজন বিরোধী দলের সদস্যকে ক্যাবিনেটে গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁকে দেখাতে হয় যে ক্যাবিনেটে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল যাতে মোটামুটিভাবে প্রতিনিধিত্ব পায়। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতির নিজের দলের মধ্যে যে সকল উপদল রয়েছে তাদের প্রতিনিধিত্বের কথাও তাঁকে ভাবতে হয়।

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে 'ক্যাবিনেট'-এর প্রথম প্রবর্তন ঘটে এবং এ ব্যাপারে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে পথিকৃত বলা যায়। মার্কিন মন্ত্রিসভাকে 'ক্যাবিনেট' বলা হলেও ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সঙ্গে তার গঠন এবং প্রকৃতিগত কোন সাদৃশ্য নেই। তাই ল্যাস্কি বলেছেন, *The American Cabinet hardly corrersponds to the classic idea of Cabinet to which representative government in Europe has accustomed us.*

ক্যাবিনেটের প্রকৃতি

ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যরা পার্লামেণ্টের সদস্য এবং ক্যাবিনেট সদস্যরা সেখানে তাঁদের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের কাছে দায়িত্বশীল থাকেন। ক্যাবিনেটের প্রতি পার্লমেণ্ট অনাস্থা প্রকাশ করলে ক্যাবিনেটকে পদত্যাগ করতে হয়। কিন্তু মার্কিন ক্যাবিনেটের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যরা কংগ্রেসের সদস্য নন, তাঁদের কংগ্রেসের কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয় না এবং কংগ্রেসে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে ক্যাবিনেট সদস্যদের পদত্যাগ করাবার সুযোগ নেই। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সদস্যদের যৌথ দায়িত্বের নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মার্কিন ক্যাবিনেট হ'ল রাষ্ট্রপতির দ্বারা সৃষ্ট রাষ্ট্রপতির নিজস্ব ক্যাবিনেট—তাই ক্যাবিনেট সদস্যরা ব্যক্তিগত ভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে দায়িত্বশীল থাকেন। লর্ড ব্রাইসের ভাষায় মার্কিন ক্যাবিনেট সম্পর্কে বলা যায়, *It is a group of persons, each individually dependent and answerable to the President, but with no joint policy, no collective responsibility.* অর্থাৎ মার্কিন ক্যাবিনেট হ'ল কয়েকজন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত একটি গোষ্ঠী, যার প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রপতির ওপরে নির্ভরশীল এবং তাঁর কাছে দায়িত্বশীল থাকেন—সেখানে কোন যৌথ নীতি এবং যৌথ দায়িত্ব নেই। মার্কিন ক্যাবিনেট সদস্যরা হলেন রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সাহায্যকারী, এর চেয়ে বেশী কিছু নয়।

সাধারণত সপ্তাহে একদিন মার্কিন ক্যাবিনেটের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাবিনেট সভায় রাষ্ট্রপতি সভাপতিত্ব করেন। সম্প্রতি উপরাষ্ট্রপতিকে ক্যাবিনেট সভায় আহ্বান করার রীতি এবং রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি কর্তৃক সভায় সভাপতিত্ব করার রীতি প্রচলিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের সময় থেকে একজন ক্যাবিনেট সচিব নিয়োগ করা হচ্ছে। ক্যাবিনেট সভার আলোচ্য বিষয় স্থির করা, কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা তাঁর কাজ। ক্যাবিনেট সভায় সরকারী নীতি ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা

পদ্ধতি ও কার্যাবলী

হয় এবং নীতি বিষয়ক প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেট সদস্যদের মতামত ও পরামর্শ শোনেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি।

ক্যাবিনেট সভার মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। কারণ ক্যাবিনেট হল রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা মাত্র এবং পরামর্শদাতারা তাঁর সহকর্মী নন, কর্মচারী মাত্র। ক্যাবিনেটে কোন্ বিষয় আলোচনা হবে তা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করে এবং যা আলোচনা হয় তা কার্যকর করা বা না-করা রাষ্ট্রপতির ওপরে নির্ভর করে। ক্যাবিনেট রাষ্ট্রপতির ছায়া মাত্র—ইহা তাঁরই সৃষ্টি এবং তিনি যে কোন সময়ে এর পরিবর্তন করতে পারেন। ক্যাবিনেটের সভা আহ্বান করা এবং ইহার আলোচনা গ্রহণ করা বা না-করা তাঁর ইচ্ছার ওপরে নির্ভরশীল। এককথায় ক্যাবিনেটের ব্যাপারে একটি ব্যক্তিত্বই কার্যকর ভূমিকা পালন করে এবং সেই ব্যক্তিত্ব হলেন রাষ্ট্রপতি। কোন কোন রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেট সদস্যদের পরামর্শকে গুরুত্ব দিতেন, কেউ কেউ তাঁদের নিছক প্রশাসক বলে বিবেচনা করতেন, কেউ কেউ ক্যাবিনেটকে উপেক্ষা করতেন। কিন্তু কেউই ক্যাবিনেট সদস্যদের সহকর্মীর মর্যাদা দেননি। বস্তুত, ক্যাবিনেটে রাষ্ট্রপতির একক প্রাধান্য হল মার্কিন ক্যাবিনেটের বৈশিষ্ট্য।

রাষ্ট্রপতির প্রাধান্য

ব্রিটেনে ক্যাবিনেট বলতে যা বোঝায় সে ধরনের কোন সংস্থার অস্তিত্ব মার্কিন শাসনব্যবস্থায় নেই এবং রাষ্ট্রপতি চালিত ব্যবস্থায় থাকতেও পারে না। তাই অনেকে মার্কিন ক্যাবিনেটকে 'ক্যাবিনেট' বলা যুক্তিসঙ্গত কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। আবার অনেকে বলেন, যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন দেখতে হবে যে, মার্কিন ক্যাবিনেট সে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে কিনা। অ্যালেন পটার মনে করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ক্যাবিনেট' বিশেষ কোন সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি।· সরকারী নীতি প্রণয়ন, ঐ নীতি রূপায়ণ এবং যৌথ দায়িত্বশীলতার নীতি মার্কিন ক্যাবিনেট পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বীকৃত না হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাবিনেটের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়।

এগার : মার্কিন ও ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তুলনা (Comparison between American and British Cabinet)

মার্কিন ও ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের মধ্যে তুলনা শুরু করার আগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্রিটিশ ও মার্কিন শাসনব্যবস্থার মধ্যে মৌল কাঠামো ও রূপগত পার্থক্য রয়েছে। ব্রিটেনে পার্লামেণ্ট বা ক্যাবিনেট পরিচালিত সরকার প্রবর্তিত হয়েছে, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার প্রচলিত। ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট যে ভূমিকা পালন করে এবং যে গুরুত্বের অধিকারী সেরূপ ভূমিকা পালন করা এবং গুরুত্বের অধিকারী হওয়া রাষ্ট্রপতিচালিত শাসনব্যবস্থায় কোন ক্যাবিনেটের পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুত ক্যাবিনেট বলতে আমরা ব্রিটেনে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্থার কথা জানি তার

সঙ্গে মার্কিন ক্যাবিনেটের অনেকাংশেই সাদৃশ্য নেই। যা হোক নীচে উভয় ক্যাবিনেটের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা উপস্থিত করা হল।

১. ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সঙ্গে মার্কিন ক্যাবিনেটের উৎসগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মার্কিন সংবিধানে বা ব্রিটেনের কোন সাংবিধানিক দলিল ও বিধিবদ্ধ আইনে 'ক্যাবিনেট' শব্দটির উল্লেখ নেই। উভয় ক্যাবিনেটেরই সম্পূর্ণভাবে সংবিধান-বহির্ভূত উপায়ে উদ্ভব ঘটেছে। সাংবিধানিক রীতিনীতির দ্বারা ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে এবং ১৯৩৭ সালের 'রাজমন্ত্রী আইনে' 'ক্যাবিনেট' শব্দটির প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন মার্কিন ক্যাবিনেটের আবিষ্কারক ও প্রবর্তক।

উৎসগত সাদৃশ্য

২. মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যদের নিয়োগ করার সম্পূর্ণ এবং একক ক্ষমতা ভোগ করেন রাষ্ট্রপতি। এ ব্যাপারে তার কারও সঙ্গে পরামর্শ করার কোন আইনগত বা আনুষ্ঠানিক (formal) বাধ্যবাধকতা নেই। ক্যাবিনেট সদস্যদের নিয়োগের ব্যাপারে তিনি শর্তহীন স্বাধীনতা ভোগ করেন। তিনি সাধারণত নিজ দলের এবং প্রয়োজনবোধে অন্য দলের সদস্যদেরও ক্যাবিনেটে গ্রহণ করতে পারেন।

ক্যাবিনেট গঠনে রাষ্ট্রপতির শর্তহীন স্বাধীনতা

আইনের দৃষ্টিতে রাজা বা রানী ক্যাবিনেট সদস্যদের নিয়োগ করলেও প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যদের মনোনীত করেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তাঁদের মনোনয়ন করার সময়ে প্রধানমন্ত্রীকে রানীর সঙ্গে পরামর্শ করতে হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে রানীর পরামর্শ উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সদস্যদের নিয়োগের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতাও রানী ভোগ করেন। ক্যাবিনেট সদস্যদের নিয়োগের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী স্বাধীন হলেও নিজ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রত্যাশা ও দাবী যাতে মেটে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁকে সতর্কভাবে ক্যাবিনেট গঠন করতে হয়।

প্রধানমন্ত্রীর শর্তযুক্ত স্বাধীনতা

৩. ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট সদস্যদের বক্তব্য শুনে নিজের অভিমত স্থির করেন। সাধারণভাবে প্রধানমন্ত্রীর অভিমতকে ক্যাবিনেট গ্রহণ করে এবং প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্যাবিনেটে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ক্যাবিমেট সদস্যদের মতামতকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী উইলসন ১৯৬৭ সালে মিশরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেছিলেন—কিন্তু এই ব্যাপারে ক্যাবিনেট সহকর্মীদের আপত্তির ফলে তিনি ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারেননি।

প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী

কিন্তু মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির সহকর্মী নন, ফাইনারের ভাষায় অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র।[১] রাষ্ট্রপতি এঁদের কর্মচারীদের মত নিয়োগ ও পদচ্যুত

১. "The members of the Cabinet obviously are personal assistants of the President."

করতে পারেন। রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেটকে তাই 'কিচেন ক্যাবিনেট' (kitchen cabinet) বলা হয়—অর্থাৎ এটি একটি ঘরোয়া সংস্থা। ক্যাবিনেট সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির নিছক পরামর্শদাতা। রাষ্ট্রপতি এঁদের পরামর্শ উপেক্ষা করে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিখ্যাত রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন কোন একটি প্রশ্ন ক্যাবিনেটে উত্থাপন করে ভোট গ্রহণ করেন। লিংকন প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দেন, কিন্তু অন্যান্য সকল সদস্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। লিংকন তখন ঘোষণা করেন যে প্রস্তাবটি গৃহীত হল।[২] এই উদাহরণটির মধ্য দিয়ে মার্কিন ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি ও ক্যাবিনেটের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির কর্মচারী

৪. ক্ষমতা বিভাজন নীতি অনুযায়ী মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যগণ আইনসভার (কংগ্রেস) সদস্য নন এবং ক্যাবিনেটের সদস্যরা তাঁদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল নন। আইনসভাও অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে ক্যাবিনেটের সদস্যগণকে অপসারিত করতে পারে না। ক্যাবিনেট সদস্যগণ তাঁদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকেন এবং রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছায় তাঁরা অপসারিত হতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির কাছে দায়িত্বশীল

অন্যদিকে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট গঠিত হয় পার্লামেন্টের সদস্যদের দ্বারা। ক্যাবিনেট সদস্যগণকে পার্লামেন্টের যে কোন একটি কক্ষের সদস্য হতে হয়। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যগণ ব্যক্তিগত এবং যৌথভাবে পার্লামেন্টের কাছে দায়ী থাকেন এবং পার্লামেন্ট অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে তাঁদের অপসারিত করতে পারে—এরূপ অবস্থায় ক্যাবিনেটের পতন ঘটে।

পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল

৫. মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যরা কংগ্রেসের সদস্য নন, তাই আইনসভা পরিচালনা, নেতৃত্ব দান এবং আইন প্রণয়নের ব্যাপারে মার্কিন ক্যাবিনেটের কোন ভূমিকা নেই। এজন্য মার্কিন ক্যাবিনেটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক সময় কংগ্রেসে নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ও আইন পাশ করতে দেখা যায়। এরূপও দেখা গিয়েছে যে, ক্যাবিনেট যে আইন চায়, কংগ্রেস তা প্রণয়ন করা থেকে বিরত থাকছে।

আইনপ্রণয়নে মার্কিন ক্যাবিনেটের কোন ভূমিকা নেই

অন্যদিকে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যরা আইনসভার সদস্যই শুধু নন, ব্রিটিশ ক্যাবিনেটই আইনসভাকে পরিচালনা করে, কোন্ আইন প্রণয়ন করা হবে তা স্থির করে,

২. "Lincoln is reported to have put a question to his cabinet and called for a vote; Lincoln voted "aye", and all the rest "no", whereupon Lincoln declared, the 'ayes' have it"!

—Rodee, Anderson, Christol and Greene, Introduction to Political Science. P. 164

আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং আইনসভাকে নেতৃত্ব দেয়। দলীয় ব্যবস্থার ফলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ক্যাবিনেটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন আইন প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বরং বলা যায়, ক্যাবিনেটের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করার জন্যই যেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অস্তিত্ব। বর্তমানে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পার্লামেণ্টের ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে তা ক্যাবিনেটের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট আইন প্রণয়ন করে

৬. মার্কিন ক্যাবিনেট রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা পরিষদ মাত্র। ইহা ঐক্যবদ্ধ, যৌথ (collective) এবং একই চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ কোন সংস্থা নয়। তাই মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্বের নীতি এখানে অনুপস্থিত। অন্যদিকে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ঐক্যবদ্ধ, যৌথবদ্ধ, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বে সুসংগঠিত এবং একই রাজনৈতিক চিন্তাধারায় পুষ্ট একটি কার্যকর সংস্থা। ফলে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যগণ ব্যক্তিগত ও যৌথ দায়িত্বের নীতির দ্বারা পরিচালিত।

যৌথ সংস্থা নয়

যৌথ সংস্থা

৭. সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের খ্যাতনামা ব্যক্তি ও নেতাদের নিয়ে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট গঠিত হয়—ক্যাবিনেট সদস্যরা জনজীবনেও বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। ব্রিটেনে ক্যাবিনেট সদস্য হওয়া একটা মর্যাদা ও প্রতিপত্তির ব্যাপার। এজন্য জাতীয়জীবনে প্রথিযতশা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য কাবিনেট সদস্য হতে আগ্রহী হন।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার সোপান

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট এতই দুর্বল এবং জাতীয়জীবনে গুরুত্বহীন যে, কোন খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতা বা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি এর সদস্য হবার যৌক্তিকতা খুঁজে পান না। মুনরো যথার্থই মনে করেন যে, রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠার সোপান হিসাবে ক্যাবিনেটকে সেখানে দেখা হয় না।[১] এ কথা ঠিক যে, রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের আমলে বিদেশমন্ত্রী হিসাবে ডালেস বা আরও পরবর্তীকালে হেনরী কিসিংজার ক্যাবিনেট সদস্য পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু সেখানে মার্কিন রাষ্ট্রপতি হবার জন্যে বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার সোপান হিসাবে ক্যাবিনেট সদস্যের পদকে কখনই দেখা হয় না। কিন্তু ব্রিটেনে পার্লামেণ্ট সদস্য হিসাবে অভিজ্ঞতা এবং ক্যাবিনেট সদস্য হিসাবে দক্ষতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনয়নের সময়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। সবকিছু বিবেচনা করে মার্কিন ক্যাবিনেটকে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একটি নিষ্প্রভ ছায়া বলে অভিহিত করা যায়।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দিতে পারে না

---

১. "In the United States……cabinet office is not looked upon as a career.' Munro.

৯

মার্কিন বিচারবিভাগ

American Judiciary

এক: মার্কিন বিচারব্যবস্থার কাঠামো (Judicial Structure in U. S. A.)

মার্কিন বিচারব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সমান্তরালভাবে দুটি আদালত ব্যবস্থার অবস্থিতি। একদিকে জাতীয় স্তরে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সমূহ এবং অন্যদিকে ৫০টি রাজ্যের নিজস্ব বিচারালয় ব্যবস্থা (Court System)। রাজ্য-আদালতগুলো নিজস্ব বিধি অনুসারে পরিচালিত হলেও মার্কিন সংবিধানের নির্দেশকে মান্য করে চলতে হয়, কারণ মার্কিন সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন (supreme law of the land)। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতগুলো প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন সংবিধান দ্বারা এবং কংগ্রেস প্রণীত আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়।

দ্বিস্তর বিচারব্যবস্থা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—সাংবিধানিক আদালত এবং আইনবিষয়ক আদালত। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতগুলো গঠিত হয়েছে মার্কিন সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী। ঐ অনুচ্ছেদের প্রথম ধারায় বলা হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের বিচারক্ষমতা একটি সুপ্রীম কোর্টের ওপর এবং কংগ্রেস কর্তৃক প্রয়োজনমত নিযুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত নিম্নতন আদালতের ওপর ন্যস্ত থাকবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনবিষয়ক আদালতগুলোর বৈশিষ্ট্য হল যে ঐগুলো মোটামুটিভাবে আইন বিষয়ক ও প্রশাসনিক চরিত্রের—এদের বিচারবিষয়ক ক্ষমতা নেই। অন্যদিকে সাংবিধানিক আদালত বিচার করার ক্ষমতা ভোগ করে এবং ঐগুলো যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা ও বিচার করে। সাংবিধানিক আদালতগুলোর মধ্যে আছে কয়েকটি সার্কিট কোর্ট অব্ আপীল (Circuit Courts of Appeal), ৯৩টি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট (District Courts) এবং একটি সুপ্রীম কোর্ট।

শ্রেণীবিভাগ

ডিস্ট্রিক্ট আদালত হ'ল যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থায় নিম্ন আদালত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯৩টি এরূপ আদালত আছে। প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন নিয়ে যে সকল বিবোধ দেখা দেয় তার নিষ্পত্তি হয় এই সকল আদালতে। এখানে জুরীর সাহায্যে বিচারকার্য চালান হয়। ডিস্ট্রিক্ট আদালতের বিচারকেরা রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন এবং তাঁরা যে রাজ্যের অধিবাসী সেই রাজ্যের ডিস্ট্রিক্ট আদালতে বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হন। ডিস্ট্রিক্ট আদালতের সিদ্ধান্তগুলো আপীল আদালতে পুনর্বিচার হতে পারে।

ডিস্ট্রিক্ট আদালত

সার্কিট কোর্ট অব আপীল ডিস্ট্রিক্ট আদালতের উর্ধ্বে অবস্থিত। সমগ্র মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে ঐরূপ ৭টি আদালত আছে। বেশীর ভাগ আপীল মামলার নিষ্পত্তি এখানেই ঘটে, সামান্য কয়েকটি সুপ্রীম কোর্টে আপীল মামলা হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয়। সার্কিট আপীল আদালতে যে কোন মামলার বিচার করে অন্তত তিনজন বিচারক। সার্কিট আদালতে একজন প্রধান বিচারপতি থাকেন। বিচারকরা প্রত্যেকে রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চে অবস্থান সুপ্রীম কোর্টের।

সার্কিট আপীল আদালত

দুই : মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট (The Supreme Court of U. S. A.)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থার শীর্ষে সুপ্রীম কোর্ট অবস্থিত। সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় হিসেবে সুপ্রীম কোর্ট সর্বোচ্চ আপীল আদালত (At the top of the system stands our most august tribunal the Supreme Court)[১] এবং মূল এলাকার (original jurisdiction) দিক থেকেও ইহা সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত হল চরম—ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা যায় না। কংগ্রেসের আইন দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হয়নি, সুপ্রীম কোর্টের উৎস হ'ল সাংবিধানিক বিধান। তবে সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও কাজ সম্পর্কে কংগ্রেস বিল প্রণয়ন করে তাকে কার্যকর করতে পারে।

মার্কিন সংবিধানের ধারা অনুসরণ করে সুপ্রীম কোর্ট প্রথমে যখন স্থাপন করা হয় তখন বোঝা যায়নি যে মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই সংস্থা কি বিপুল ক্ষমতা, প্রভাব এবং প্রতিপত্তি নিয়ে পরবর্তীকালে আত্মপ্রকাশ করবে (In its infancy this tribunal showed little or no promise of becoming the powerful institution it is now)[২]। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ন্যায় বিচারকে সুনিশ্চিত (to establish justice) করার যে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে তাকে সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে রূপদান করা হয়েছে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান প্রণেতারা সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট গঠনের ব্যবস্থা সংবিধানে বিধিবদ্ধ করেছে। কিন্তু প্রথম দিকে সুপ্রীম কোর্টের সম্ভাবনাময় আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে অনেক সংশয় ছিল। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটন ছজন যোগ্য বিচারক দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট গঠন করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রধান বিচারপতি মার্শালের (Chief Justice Marshall) সময় (১৮০১—৩৫) সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও প্রভাব বাড়তে শুরু করে এবং বর্তমানে এই সংস্থা মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসাবে স্বীকৃত।

১. Essentials of American Government, Ogg and Ray, p 297.

২. পূর্বে উদ্ধৃত

মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের গঠন

১৭৮৯ সালে সুপ্রীম কোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি এবং পাঁচজন সহযোগী বিচারপতি নিয়ে প্রথম গঠিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১৮০৭ সালে করা হয় ৭ জন। ১৮৩৭ সালে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৯ জন করা হয়। বর্তমানে ঐ ব্যবস্থাই চলছে, তাই বর্তমানে একজন প্রধান বিচারপতি ও আট জন সহযোগী বিচারপতি অর্থাৎ নয় জন বিচারপতি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি, তবে ঐ নিয়োগ সিনেটের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের ব্যাপারে রাজনৈতিক বিবেচনা (Political consideration) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুরস্কৃত করার জন্য বিচারক পদে নিয়োগ করা হয় এবং এই ব্যাপারে ব্রিটিশ ও মার্কিন বিচারব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর প্রভেদ রয়েছে। যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ না ঘটার জন্য মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের যোগ্যতা সম্পর্কে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন।

সংখ্যা

নিয়োগ

রাজনৈতিক নিয়োগ

সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরা কতদিন ঐ পদে আসীন থাকবেন সে সম্পর্কে মার্কিন সংবিধান বা কংগ্রেস প্রণীত কোন আইনে কিছু বলা হয়নি। বিচারকেরা যতদিন সদাচার করবেন (during good behaviour) ততদিন বিচারকপদে আসীন থাকবেন। দশ বছর বিচারকের দায়িত্ব পালন করে সত্তর বছরে বিচারকেরা অবসর গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ইচ্ছা করলে কোন বিচারক সত্তর বছরের বেশীও বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। বস্তুত অবসর গ্রহণের কোন নির্দিষ্ট নীতি না থাকায় অসুস্থ ও অক্ষম বিচারকেরাও বিচারক পদে আসীন থাকেন।

কার্যকাল

বিচারপতিদের কার্যকাল সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকলেও তাঁদের অপসারণ করার ব্যবস্থা আছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের 'ইমপিচমেণ্ট' পদ্ধতির সাহায্যে অপসারণ করা যায়। অসদাচারণ, দেশদ্রোহীতা, উৎকোচ গ্রহণ বা অন্যান্য নিকৃষ্ট অপরাধের জন্য বিচারকদের 'ইমপিচ' করা যায়। প্রতিনিধিসভা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের 'ইমপিচ' করার প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সিনেটে ঐ প্রস্তাব অনুমোদিত হলে অপসারণ কার্যকর হয়। আজ পর্যন্ত নয় জন বিচারপতির বিরুদ্ধে প্রতিনিধিসভা ইমপিচ করার প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তার মধ্যে চার জনের অপসারণ-প্রস্তাব সিনেটে অনুমোদিত হয়ে কার্যকর হয়।

অপসারণ

মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের বেতন, ভাতা কংগ্রেস প্রণীত আইনের দ্বারা স্থির করা হয়। বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বার্ষিক 40,000 ডলার

এবং সহযোগী বিচারপতিরা প্রত্যেকে বার্ষিক ৩৫,০০০ ডলার বেতন পান। কোন বিচারপতি দশ বছর বিচারকের দায়িত্ব পালন করলে এবং সত্তর বছর বয়স হলে পুরো বেতনসহ অবসর গ্রহণ করতে পারেন। বিচারক হিসেবে কার্য চলাকালীন সময়ে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের বেতন হ্রাস করা যায় না।

বেতন

মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার

দেশের সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ারের মধ্যে মূল এলাকা (original jurisdiction) এবং আপীল এলাকা (appellate jurisdiction) উভয় এলাকাই রয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকা ও আপীল এলাকার এক্তিয়ার আলাদা করে আলোচনা করা হল।

মূল এলাকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকা খুবই সীমিত। সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকায় কোন্ কোন্ বিষয়ের বিচার হবে তা সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদের ২'খ' নম্বর ধারায় বলা হয়েছে। ঐ ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রদূত, অন্যান্য সরকারী দূত ও কনসালদের মামলা এবং যে সকল মামলার একদিকে কোন অঙ্গরাজ্য থাকবে সেই সকল মামলা সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকার অন্তর্গত হবে।

সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার সংবিধানের দ্বারা নির্দিষ্ট, কংগ্রেস আইন করে ঐ এক্তিয়ারকে সম্প্রসারিত বা পরিবর্তিত করতে পারে না। সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকার খুব বেশী মামলা হয় না।

আপীল এলাকা

সুপ্রীম কোর্টের আপীল এলাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিকাংশ মামলা আপীল এলাকাতে অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রীম কোর্ট সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এবং রাজ্য আদালত থেকে আনীত আপীল মামলা বিচার করে। কোন আপীল মামলার আইন সংক্রান্ত বিষয় এবং বিষয়বস্তু (law and fact) উভয়ই সুপ্রীম কোর্ট বিচার করতে পারে।

সুপ্রীম কোর্টের আপীল এলাকা তিনটি ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত। প্রথমত, অধস্তন আদালত কোন মামলার সুপ্রীম কোর্টের কাছে নির্দেশ ভিক্ষা করতে পারে। একে বলা হয় *Certification*. এরূপ মামলার ক্ষেত্রে নির্দেশ না দিয়ে সুপ্রীম কোর্ট আপীল মামলা হিসাবে বিরোধটির বিচার করতে পারে। দ্বিতীয়ত, যে সকল ক্ষেত্রে কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত কোন রাজ্যের আইনকে সংবিধান বহির্ভূত বলে ঘোষণা করে বা কংগ্রেসের কোন আইনের বিরুদ্ধে ইনজাংসন জারী করে বা কোন রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনকে সংবিধান বহির্ভূত বলে ঘোষণা করে বা রাজ্যের

সর্বোচ্চ আদালত সংবিধান বিরোধী রাজ্য আইনকে সংরক্ষণ করে সে সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ সুপ্রীম কোর্টে আপীল করতে পারে।

মার্কিন সুপ্রীম কোর্টে *Certiorari* বা উৎপ্রেষণ পদ্ধতিতে বেশীর ভাগ আপীল মামলা উত্থাপিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সংক্রান্ত মামলা অধস্তন আদালত থেকে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা হয় *Certiorari* Writ বা উৎপ্রেষণ লেখ জারীর জন্য। সুপ্রীম কোর্টে যে সকল আপীল করা হয় তার শতকরা ৮০ ভাগ এই শ্রেণীর মামলা।

মার্কিন কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে সুপ্রীম কোর্টের আপীল এলাকাকে সম্প্রসারিত করতে পারে। আপীল এলাকাই মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ বিচারক্ষেত্র।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের এলাকা বা এক্তিয়ার (jurisdiction) আলোচনার দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের কার্যাবলী ও এক্তিয়ার বিশ্লেষণ করা সম্ভব। মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্টকে বিভিন্ন কাজ করতে হয় এবং বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হয়।

প্রথমত, মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা (Interpreter of the Constitution) হিসাবে কাজ করে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের যে ব্যাখ্যা দেয় তাকেই আইন সিদ্ধ ও যথার্থ সাংবিধানিক ব্যাখ্যা বলে মেনে নেওয়া হয়। এজন্যই প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হিউজ বলেছিলেন, যে 'আমরা একটি সংবিধানের অধীনে বাস করি—কিন্তু সংবিধান হ'ল বিচারকেরা যা বলেন তাই।' অর্থাৎ বিচারকদের ব্যাখ্যা অনুসারে সংবিধানের অর্থ নির্ধারিত হয়।

দ্বিতীয়ত, মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা (Power of Judicial Review) প্রয়োগ করে এবং এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান বিরোধী কোন আইন বা শাসনতান্ত্রিক নির্দেশ জারী করা হলে সুপ্রীম কোর্ট তাকে বাতিল করতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতাকে বলে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা। মার্কিন বিচারালয়কে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতায় সজ্জিত করে বিচারবিভাগের প্রাধান্যকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, মার্কিন নাগরিকদের জন্য যে সকল অধিকার ও স্বাধীনতা অধিকারের দলিলের মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে ঐ সকল অধিকারকে সুপ্রীম কোর্ট সংরক্ষণ করে (protection of Rights), অধিকার কোথাও অস্বীকৃত হলে তার প্রতিবিধান করে, জনগণের স্বীকৃত অধিকার বিরোধী আইন গৃহীত হলে তাকে বাতিল করে।

চতুর্থত, সংবিধানের ব্যাখ্যাদান, সংবিধান বিরোধী আইন ও নির্দেশ বাতিল করা, জনগণের অধিকারকে সংরক্ষিত করা, কেন্দ্র ও রাজ্য যাতে নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাকে সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পাদনের মধ্য দিয়ে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক (Guardian of the Constitution) হিসেবে কাজ করে।

সুপ্রীম কোর্টের উপরোক্ত কার্য ও ভূমিকাকে পরবর্তী স্তরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল।

প্রতিটি দেশের বিচারবিভাগ সে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটা অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে শাসক শ্রেণীর চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং শ্রেণীস্বার্থকে সংরক্ষণ করে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট এর ব্যাতিক্রম নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত শ্রেণী সম্পর্ককে বজায় রেখে সেখানকার বুর্জোয়া স্বার্থকে রক্ষা করাই সুপ্রীম কোর্টের' প্রধান লক্ষ্য। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত শ্রেণী বিভক্ত সমাজে সুপ্রীম কোর্ট ন্যায়নীতির প্রতীক এবং নিরপেক্ষ মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। রবার্ট ডাল (Robert Dahl) মার্কিন সুপ্রীম কোর্টকে সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রাধান্যকারী জাতীয় জোটের একটা অংশ বলে অভিহিত করেছেন।

উপসংহার

তিন : মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের কার্যাবলী ও ভূমিকা (Functions and Role of the Supreme Court)

আগেই বলা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার (jurisdiction) আলোচনা করে এর ক্ষমতা, কার্যাবলী ও ভূমিকাকে তুলে ধরা সম্ভব নয়। সুপ্রীম কোর্টের কার্যাবলী আলোচনা করে মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এর সাংবিধানিক ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের কার্যাবলী ও ভূমিকাকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন :

১. সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট
২. জনগণের অধিকার সংরক্ষণে সুপ্রীম কোর্ট
৩. সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট
৪. সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা

সুপ্রীম কোর্টের কার্যাবলী ও ভূমিকাকে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করা হল।

১. সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট

সংবিধানের কোন ধারা সম্পর্কে বা সামগ্রিকভাবে সংবিধানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সংশয় বা প্রশ্ন দেখা দিলে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দানের সাংবিধানিক ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বা সংস্থার হাতে ন্যস্ত করা অপরিহার্য। এই ব্যবস্থার দ্বারা প্রয়োজনীয় সময়ে সংবিধানের আইনস্বীকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, সাংবিধানিক ব্যবস্থার (provisions) মধ্যে অনুমিত (implied) বক্তব্য তুলে ধরা যায় এবং এই প্রক্রিয়া সংবিধানকে সচল ও পরিবর্তনমুখী রাখতে সাহায্য করে। মার্কিন সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব সেখানকার সুপ্রীম কোর্টের হাতে ন্যস্ত।

সংবিধানের ব্যাখ্যা অপরিহার্য

সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাটি সুপ্রীম কোর্ট নিজে উদ্যোগ নিয়ে প্রয়োগ করে না। অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্ট নিজে উদ্যোগ নিয়ে সংবিধানের ব্যাখ্যা দানের দায়িত্ব গ্রহণ করে না। সুপ্রীম কোর্টে উত্থাপিত কোন মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন জড়িত থাকলে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা বা অংশকে ব্যাখ্যা করে। ঐ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে অনেক সাংবিধানিক প্রয়োজন মেটে এবং সংবিধানে নতুন মাত্রা ও নীতি সংযোজিত হয়। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের যে ব্যাখ্যা দেয় সেই ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত এবং ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করে সেই ব্যাখ্যাই সাংবিধানিক আইন হিসাবে স্বীকৃত হয়।

সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যার ক্ষমতা চূড়ান্ত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা বিধিবদ্ধ সাংবিধানিক আইন দ্বারা বা প্রত্যক্ষভাবে সুপ্রীম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করা হয়নি। সুপ্রীম কোর্টের নিজস্ব উদ্যোগ এবং ঘটনার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি এই ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করেছে। ১৮০৩ সালে *Marbury vs Madison* মামলায় রায় প্রদানকালে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মার্শাল (Chief Justice Marshall) বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন এবং বিচারপতিরা ঐ সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য শপথ গ্রহণ করেন বলে তাঁরা সংবিধানকে সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মার্শালের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মার্কিন সংবিধানকে ব্যাখ্যার ক্ষমতা বিচারপতিদের হাতে ন্যস্ত এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কারণ সংবিধানকে সংরক্ষণের মধ্যেই তাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা নিহিত বলে মনে করা হয়। এরপরে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের আর একজন প্রধান বিচারপতি হিউজ (Charles Evans Hughes) বলেন যে, আমরা একটা সংবিধানের ছত্রছায়ায় বাস করি, কিন্তু সেই সংবিধান বলতে কি বোঝায় তা নির্ভর করে বিচারপতির ব্যাখ্যার ওপরে (We are under a constitution, but the constitution is what the judges say it is)। অর্থাৎ মার্কিন সংবিধানের ব্যাখ্যাদানের ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হাতে ন্যস্ত এবং সুপ্রীম কোর্ট যে ব্যাখ্যা দেয় তাই সাংবিধানিক আইন হিসাবে স্বীকৃত। বিচারপতি হিউজের বিশ্লেষণ স্বীকৃত হয়েছে এবং মার্কিন সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা সাংবিধানিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানকে ব্যাখ্যার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হাতে ন্যস্ত রয়েছে।

ব্যাখ্যার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হাতে এসেছে

বৃহৎ আকারের সংবিধানেও সকল সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে লিখিত ভাবে বিধিবদ্ধ করা সম্ভব হয় না। মার্কিন সংবিধান আকারে খুবই ছোট, তাই সেখানে অল্প কথায় সাংবিধানিক রূপরেখাটি তুলে ধরা হয়েছে। স্বভাবতই মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থার

অনেক বিষয় লিখিত সংবিধানে স্থান পায়নি বা ব্যক্ত হয়নি এবং ঐ বিষয়ে কোন প্রচলিত রীতিনীতিও গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল না। সংবিধানের উদ্দেশ্য, দর্শন এবং বিভিন্ন ধারাকে ব্যাখ্যা করে ঐ অপূর্ণতা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট। এইভাবে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানকে ব্যাখ্যা করে লিখিত সংবিধানের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে।

ব্যাখ্যার দ্বারা অপূর্ণতা দূর

মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থার এমন এক দিক আছে যে সম্পর্কে সংবিধান নীরব। যেমন, মার্কিন সংবিধানের কোথাও বলা হয়নি যে মার্কিন কংগ্রেস বা রাজ্য আইনসভা বা শাসনবিভাগ সংবিধান বিরোধী আইন বা নির্দেশ জারী করলে কি ভাবে তার প্রতিবিধান করা হবে। সংবিধানের এই নীরবতাকে সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রতিবিধান করতে গিয়ে মার্কিন সাংবিধানিক ব্যবস্থার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি 'বিচার-বিভাগীয় সমীক্ষা' স্বীকৃত হয়। মার্কিন সংবিধানের কোথাও বলা হয় না যে, সংবিধান বিরোধী আইন বা শাসনতান্ত্রিক নির্দেশ জারী করা হলে সুপ্রীম কোর্ট তাকে বাতিল করতে পারবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮০৩ সালে মারবারী বনাম ম্যাডিসন মামলায় সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করে যে, সংবিধান বিরোধী আইন বা শাসনতান্ত্রিক নির্দেশকে বাতিল করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের রয়েছে। সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা হিসাবেই সুপ্রীম কোর্ট এরূপ ঘোষণার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার লাভ করে। সুপ্রীম কোর্টের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ফলে ঐ আদালতের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা স্বীকৃত হয়।

ব্যাখ্যার ফলশ্রুতি : বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা

শুধুমাত্র বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা সংক্রান্ত নীতি নয়, সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সংবিধান ব্যাখ্যার দ্বারা মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অনেক নতুন নতুন সাংবিধানিক বিধি গড়ে ওঠেছে এবং লিখিত সংবিধানের অপূর্ণতাকে দূর করা হয়েছে। কোন সংবিধানে সাংবিধানিক সকল নিয়মকে বিধিবদ্ধ করা সম্ভব নয়, মার্কিন সংবিধানের ছোট আয়তনের মধ্যে তো কোন মতেই সম্ভব নয়। তাই সংবিধানের ব্যাখ্যার মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট ঐ অভাবকে পূরণ করে সংবিধানকে গতিশীল করে। বস্তুত সংবিধানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত মার্কিন সংবিধানের সম্প্রসারণে (growth of the constitution) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ব্যাখ্যার ফলে সংবিধানের সম্প্রসারণ

সংবিধানের ব্যাখ্যা দ্বারা মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট নিরবচ্ছিন্নভাবে সংবিধানের নতুন নতুন সাংবিধানিক বিধি গড়ে তুলে মার্কিন সংবিধানকে চলমান, সজীব, বিকশিত ও সম্প্রসারিত করে তুলছে। মূল সাংবিধানিক দলিলে যে মার্কিন সংবিধানকে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল বিগত দুশো বছর ধরে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের সংবিধান ব্যাখ্যাদানের ফলে এবং অন্যান্য আরও অনেক কারণে সেই

সংবিধানের সঙ্গে অনেক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তাই অগ এবং রে (Ogg and Ray) যথার্থই বলেছেন, *Actual Constitution is more than a document.*

সংবিধানে নতুন মাত্রা যাগ

উপরোক্ত দুজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ যথার্থই বলেছেন যে, সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মার্কিন বিচারালয় সাংবিধানিক ধারাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন যার ফলে সংবিধানের অর্থের পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং সংবিধানে নতুন মাত্রা যুক্ত হতে পারে (This opens wide opportunity to make them mean something different from, and probably more than, they previously had been supposed to mean, with the result of giving the institution a new twist or slant)।[১]

নিরবচ্ছিন্নভাবে সংবিধানে নতুন মাত্রা যোগ করার প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন (Widrow Wilson) মার্কিন সুপ্রীম কোর্টকে একটি চলমান সাংবিধানিক সভা (a kind of continuous constitutional convention) নামে অভিহিত করেছেন। সাংবিধানিক সভা যেমন সংবিধান রচনা করে এবং তাকে বিধিবদ্ধ রূপ দান করে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টও তেমনি বিরামহীনভাবে সংবিধানের ব্যাখ্যাদান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংবিধানে নতুন অর্থ, নতুন বিধি সংযোজন করে। অ্যালেন পটারও উপরোক্ত ব্যক্তব্যকে সমর্থন করে বলেছেন যে, কার্যত সুপ্রীম কোর্ট হল একটি নিরবচ্ছিন্ন সাংবিধানিক সভা (The Supreme Court is, in effect, a constitutional convention)।

চলমান সাংবিধান সভা

সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা প্রয়োগ করে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানে শুধুমাত্র নতুন মাত্রই যোগ করে না, সংবিধানিক ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আনতে পারে। সংবিধানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্ট অনেক ক্ষেত্রে অর্থের পরিবর্তন করেছে, নতুন মাত্রা যোগ করেছে, নতুন করে ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, এবং নতুন নতুন সাংবিধানিক নীতিকে তৈরী করেছে। যেমন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে *Mc Culloch vs Maryland* মামলায় অনুমিত ক্ষমতার তত্ত্বকে (Theory of Implied powers), *Marbury vs Madison* মামলায় বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা (Power of Judical Review) সংক্রান্ত নীতিকে গড়ে তুলেছে।

নতুন নতুন সংবিধানিক নীতি গড়া

সুপ্রীম কোর্টের সংবিধানকে ব্যাখ্যার ক্ষমতার সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত। সুপ্রীম কোর্ট কি রাজনীতি নিরপেক্ষ ভাবে সংবিধানকে ব্যাখ্যা করে; অথবা, সুপ্রীম কোর্ট কি রাজনীতি তথা বুর্জোয়া স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সংবিধানের ব্যাখ্যা

১. *Essentials of American Government*, Ogg and Ray, p. 38

উপস্থিত করে? মনে রাখা প্রয়োজন একটা বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিচারকদের পক্ষে শ্রেণীস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে কোন ন্যায়নীতি ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাই মার্কিন বিচারকেরা সংবিধানের ব্যাখ্যাদান সহ যে কোন বিচারবিভাগীয় কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে প্রচলিত রাজনৈতিক প্রবণতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এস. ই. ফাইনার মনে করেন যে, মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট প্রচলিত রাজনৈতিক চিন্তা এবং অনুমানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। অ্যালেন পটার বলেছেন যে, সুপ্রীম কোর্ট সরকারী ক্ষমতার যাঁরা আছেন তাঁদের ক্ষমতার বৈধতা ও যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এবং ঐ কাজ করার দক্ষতার ওপরে সুপ্রীম কোর্টের মর্যাদা হ্রাস বা বৃদ্ধি নির্ভর করে। সুতরাং সুপ্রীম কোর্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন শ্রেণীর ক্ষমতাকে সংরক্ষণ করার তাগিদ থেকেই সংবিধানের ব্যাখ্যা উপস্থিত করে। বস্তুত, সুপ্রীম কোর্ট হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রাধান্যবিস্তারকারী জোটের একটা অংশ। সুতরাং ঐ জোটের মূলনীতিকে সমর্থন করা এবং তার বৈধতা প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রেখেই সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার চেষ্ঠা করে (As an element in the political leadership of the dominant alliance, the Court of course supports the major pilicies of the dominant alliance)।

২. জনগণের অধিকার সংরক্ষণে সুপ্রীম কোর্ট

সংবিধানে যে নাগরিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ঐ অধিকারকে সাংবিধানিক উপায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলে নাগরিক অধিকার অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে না। বেশীরভাগ দেশেই এই দায়িত্ব বিচারালয়ের ওপরে ন্যস্ত করা হয়। মার্কিন শাসনব্যবস্থাতেও নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে সংরক্ষণের দায়িত্ব মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল সংবিধানে কোন নাগরিক অধিকারকে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তাই সেখানে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা তার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়নি। পরবর্তীকালে সংশোধনী আইন পাশ করে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ঐ অধিকার ও স্বাধীনতাকে সংরক্ষণের কথা বলা হয়।

অধিকারের সংরক্ষণ অপরিহার্য

১৭৮৮ সালে গৃহীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল সংবিধানে নাগরিক অধিকার বিধিবদ্ধ না থাকায় ঐ সংবিধান গৃহীত হবার পরেই অধিকারের সনদ বিধিবদ্ধ করার জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। তাই এক বছরের মধ্যেই দশটি সংবিধান সংশোধনী আইন প্রণয়ন করে তাতে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে সংশোধনী 'অধিকারের প্রস্তাব কংগ্রেসে উত্থাপন করা হয়। জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত ঐ প্রথম দশটি সংবিধান সংশোধনীকে বলা হয় সনদ' বা *Bill of Rights.* ১৭৮৯ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর 'অধিকারের সনদ' পাশ হয়

অধিকারকে বিধিবদ্ধ

এবং ১৭৯১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়ে কার্যকর হয়। নবম সংশোধনী আইনে পরিষ্কার ভাবে বলা হয় যে, অধিকারের দলিলে যে সকল অধিকারকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং যে সকল অধিকার জনগণ অনেকদিন ধরে ভোগ করে আসছে সেগুলোকে কোন ক্রমেই খর্ব করা যাবে না। অন্যান্য কয়েকটি সংশোধনী আইনেও নাগরিকদের অধিকার, জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করার কথা বলা হয়।

মার্কিন সংবিধানের সংশোধনী আইনগুলোতে জনগণের জন্য কোন অর্থনৈতিক অধিকারকে স্বীকার করেনি, সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সম্পত্তির অধিকারকে। কারণ কোন বুর্জোয়া ব্যবস্থার জনগণের জন্য অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হতে পারে না এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থার নির্যাস হল সম্পত্তির অধিকার। যাহোক, মার্কিন নাগরিকদের জন্য বিষয়গত অধিকারের (Substantive Rights) মধ্যে, ধর্মের অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার, অস্ত্র রাখার অধিকার, জীবনের অধিকার, আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকার এবং সভা সমিতি গঠনের অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। তাছাড়া কতকগুলো পদ্ধতিগত অধিকারকেও (Procedural Rights) স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে, সংবিধানে উল্লেখিত অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। কোন আইন প্রণয়ন বা প্রয়োগ করে মার্কিন নাগরিকদের অধিকার ক্ষুন্ন করা যাবে না। আইনের দ্বারা প্রতিটি নাগরিকের সমানভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে।

মার্কিন অধিকারের স্বরূপ

মার্কিন সংবিধানকে ব্যাখ্যা করা, তাকে সংরক্ষণ করা, সংবিধান বিরোধী আইনকে বাতিল করার ক্ষমতা মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের হাতে ন্যস্ত। অর্থাৎ মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট হল সংবিধানের অভিভাবক। স্বাভাবিক ভাবেই তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতাকে সংরক্ষণের দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা প্রয়োগ করে সংবিধানে বিধিবদ্ধ জনগণের অধিকারকে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং ঐ ব্যাখ্যার সাহায্যে অধিকারের ওপরে কোন হস্তক্ষেপ ঘটলে তাকে প্রতিবিধান করতে পারে। সংবিধান স্বীকৃত জনগণের অধিকার বিরোধী কোন আইন প্রণীত হলে বা শাসনতান্ত্রিক নির্দেশ জারী হলে সুপ্রীম কোর্ট বিচার-বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঐ আইন বা নির্দেশকে বাতিল করতে পারে। তাছাড়া জনগণের অধিকারের ওপরে কোন হস্তক্ষেপ ঘটলে সুপ্রীম কোর্ট প্রয়োজনীয় লেখ জারী করে তার প্রতিবিধান করতে পারে। কোন আইন বা শাসনবিভাগীয় নির্দেশ যদি সুপ্রীম কোর্টের মতে 'স্বাভাবিক ন্যায় নীতি' বিরোধী বলে মনে হয় এবং তা যদি জনগণের কোন অধিকারকে ক্ষুন্ন করে তবে আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি (Due process of law) অনুসরণ করে সুপ্রীম কোর্ট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এইভাবে

সংরক্ষণের দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের

মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতাকে সংরক্ষণের জন্য ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণের সাংবিধানিক ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এবার দেখা যেতে পারে যে, বিগত দুশো বছর ধরে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সেখানকার জনগণের অধিকার সংরক্ষণে কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা সংবিধানে থাকাই যথেষ্ট নয়, দেখা প্রয়োজন বাস্তবে ঐ অধিকার কতটা পরিমাণে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং সংরক্ষণ করা হলে কার স্বার্থে তা করা হয়েছে।

আদালতের ভূমিকা

অ্যালেন পটার নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে বিচার করেছেন। প্রথমত, আর্থিক ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট সম্পত্তির অধিকারকে রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান থেকেছে। কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা দেশের একাংশে ক্রীতদাস প্রথার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। সুপ্রীম কোর্ট *Dred Scott* মামলায় ঐ নিষেধাজ্ঞা জারীকে আইনের যথাবিহিত পদ্ধতিকে উপেক্ষা করে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা বলে অভিহিত করে এবং সেজন্য তাকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করে। ১৮৮৬ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সরকারী কাজের বিরুদ্ধে আর্থিক অধিকারকে রক্ষা করার জন্য যে সকল মামলায় নিষ্পত্তি করে সেই সকল মামলায় সুপ্রীম কোর্ট বিত্তবান এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের স্বার্থকেই সংরক্ষণ করে। কাউকে জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তির অধিকার থেকে আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি ছাড়া বঞ্চিত করা (To deprive any person of life, liberty or property without due process of law) যাবে না—অধিকারের দলিলের এই ধারার সাহায্য নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট সর্বদাই সম্পত্তি এবং সম্পত্তির স্বাধীনতাকে সংরক্ষণের চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে এই সময়ে সুপ্রীম কোর্ট শ্রমিক শ্রেণীর দাবী দাওয়া ও অধিকারের প্রতি উপেক্ষা দেখিয়েছে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের চেয়ে বিত্তবানদের দিকে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। তাই পটার যথার্থই বলেছেন, *On the whole during the half-century from 1886 to 1936 the court showed a pronounced anti-labour bias.* শ্রমিকশ্রেণীর স্ট্রাইক, পিকেটিং এবং অন্যান্য আন্দোলন করার অধিকারকে সুপ্রীম কোর্ট স্বীকার করেনি, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যাবলীকে বিরোধিতা করেছে এবং জনকল্যাণমূলক আইনের (social legislation) প্রতি সহানুভূতিহীন থেকেছে।

সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা
১. আর্থিক ক্ষেত্রে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের (Civil War) আগে পর্যন্ত নাগরিক স্বাধীনতা সংক্রান্ত খুব কম মামলা সুপ্রীম কোর্ট বিচার করে। গৃহযুদ্ধের সময়ে রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন নাগরিক স্বাধীনতার ওপরে ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করেন। গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ঐ ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক মনে করা হয়। গৃহযুদ্ধের পরে নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা দান সংক্রান্ত আইনকে সুপ্রীম কোর্ট

বিরোধিতা করে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সময়ে সম্পত্তির অধিকার ছাড়া অন্য কোন বিষয়গত অধিকার ও স্বাধীনতাকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করেনি, শুধুমাত্র পদ্ধতিগত অধিকার ও স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করে। আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির নামে জনগণের বিষয়গত অধিকার ও স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করা থেকে বিরত থাকে।

২. নাগরিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে

সোভিয়েত ইউনিয়নে বলশেভিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে এই সময় মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট নিজের দেশের শাসকশ্রেণীর চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ চিন্তাধারাকে দমনের জন্যে অনেকের ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণকে মেনে নেয়। যুদ্ধকে বিরোধিতা করার জন্য সমাজতান্ত্রিক নেতাদের আদালত দণ্ডদান পর্যন্ত করে। পরবর্তীকালেও সম্পত্তির স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ, নিগ্রোদের স্বাধীনতাকে অস্বীকার এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারার স্বাধীনতাকে বিরোধিতা করাই ছিল মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণে ভূমিকা।

নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সুপ্রীম কোর্ট নিগ্রোদের অধিকারকে সংরক্ষণের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বা এ ব্যাপারে সহানুভূতির পরিচয় দেয়নি। ১৮৯৬ সালে এক মামলায় সুপ্রীম কোর্ট নিগ্রো ও শ্বেতকায়দের জন্য রেলে আলাদা স্থানের ব্যবস্থাকে সমর্থন করে, ১৮৯৯ সালে আর একটি মামলায় শ্বেতকায়দের বিদ্যালয়ে নিগ্রোদের ভর্তি হবার অধিকারকে বাতিল করে, ১৯০৩ সালে নিগ্রোদের ভোটাধিকারকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, ১৯০৮ সালে এক মামলায় নিগ্রোদের থেকে আলাদা করে শ্বেতকায়দের পড়ার ব্যবস্থা করার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়কে বাধ্য করাকে সমর্থন করে। এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট বিত্তবানদের নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে যতটা (যেমন সম্পত্তির অধিকার) উৎসাহ দেখিয়েছে বিত্তহীনদের ক্ষেত্রে তা করেনি।

৩. নাগরিক অধিকার

মূল্যায়ন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পীঠস্থান। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার সর্বোচ্চ প্রকাশ এবং ঐ অধিকার ও স্বাধীনতাকে আদালত কর্তৃক নিরপেক্ষভাবে সংরক্ষণকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের নির্যাস বলা হয়। কিন্তু বাস্তব ঘটনা কি তাই?

কোন সমাজব্যবস্থা রাজনৈতিক আদর্শ-নিরপেক্ষ হতে পারে না। সুতরাং মার্কিন সমাজব্যবস্থা পুঁজিবাদী আদর্শ ও স্বার্থকে বাদ দিয়ে গড়ে উঠতে পারে না। তাই মার্কিন গণতন্ত্রে সমানাধিকার হল শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় শাসন ও শোষণের অবস্থিতি এবং সেখানকার মূল বাসিন্দা নিগ্রোদের দীর্ঘদিন ধরে নাগরিক অধিকার

ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত রাখা। আইন কর্তৃক সকলকে সমভাবে সংরক্ষিত (Equal protection of law) করার অর্থ হল শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থকে আইনের নামে পদদলিত করা, স্বাধীনতা বলতে সীমিত ও পক্ষপাতমূলক রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে স্বীকার করা, অধিকার বলতে আর্থিক ও সামাজিক অধিকারের অনুপস্থিত এবং আদালতের নিরপেক্ষতা বলতে পুঁজিবাদী স্বার্থরক্ষায় আদালতের সক্রিয় ভূমিকা পালনকে বোঝায়। সুতরাং মার্কিন গণতন্ত্র হ'ল উদারনীতির আবরণে পুঁজিবাদী স্বার্থ ও শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখার একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট ঐ ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে সমাজে প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোকের জন্য অধিকার ও স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করে।

৩. বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা

মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতার মধ্যে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা (Power of Judicial Review) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা। বস্তুত বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে মার্কিন বিচারালয়ের ভূমিকা সেখানকার বিচারালয় তথা সংবিধানের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। যে কোন শাসনব্যবস্থাতে আইনসভা প্রণীত আইন ও শাসনবিভাগীয় কার্যকলাপের সাংবিধানিক বৈধতার বিচারের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যের জন্য স্বতন্ত্র এক্তিয়ার নির্দিষ্ট থাকে বলে সেখানে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের আইনবিভাগ যে সকল আইন প্রণয়ন করে বা শাসনবিভাগ যে সব নির্দেশ জারি করে বা সরকারী অন্যান্য সংস্থা যে সকল কার্য সম্পাদন করে সেইসকল আইন বা নির্দেশ বা কার্যাবলী সাংবিধানিক গণ্ডীর মধ্যে এবং সাংবিধানিক বিধিকে অনুসরণ করে করা হয়েছে কিনা তা বিচারের ব্যবস্থা না থাকলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সেখানকার কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইন, শাসনবিভাগীয় নির্দেশ এবং সরকারী সংস্থার কার্যকলাপের বৈধতা বিচার করার ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে। সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতাকে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা ক্ষমতা বা *Power of Judicial Review* বলে। এছাড়াও মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' (Due Process of Law) অনুসরণ করে ঐ সকল আইন, নির্দেশ ও কার্যাবলী 'স্বাভাবিক ন্যায়নীতি' সম্মত হয়েছে কিনা তা বিচার করে এবং সংবিধান সম্মত বলে বিবেচিত না হলে তাকে বাতিল করার ক্ষমতা ভোগ করে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সেখানকার আইনসভা প্রণীত আইন এবং শাসনতান্ত্রিক নির্দেশ ও কার্যাবলীকে বাতিল করতে পারে—যদি সুপ্রীম কোর্ট মনে করে যে ওগুলো ন্যায়নীতি বা সংবিধান বিরোধী। বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার মার্কিন সুপ্রীম কোর্টকে অনন্য মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

মার্কিন বিচারালয়ে এই ক্ষমতা আছে কি

পৃথিবীর অন্য কোন দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের মত এত

ব্যাপক বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা ভোগ করে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জনপ্রজাতান্ত্রিক চীন, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের বিচারালয়কে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। তাই সেখানকার বিচারালয় আইন বা শাসনতান্ত্রিক নির্দেশের বৈধতা বিচার করতে পারে না। ব্রিটেনের আইনসভা বা পার্লামেন্ট সার্বভৌম, সেখানে আইনসভা যে আইন প্রণয়ন করে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা তার বৈধতা বিচার করে তাকে বাতিল করতে পারে না। অন্যান্য দেশে আইনসভাকে সার্বভৌম বলা না হলেও সেখানেও আদালতের আইনের বৈধতা বিচারের ব্যবস্থা নেই। ভারতে বিচারালয়কে সীমিত পরিমাণে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বিচারালয়কে ব্যাপক এবং চূড়ান্ত বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য দেশের অবস্থা

মার্কিন বিচারালয়ের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার স্বীকৃতি সেখানকার সংবিধানের কোথাও নেই। বরং বলা যায়, সংবিধানের বাইরে সুপ্রীম কোর্টের নিজের উদ্যোগে বা সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক বলপূর্বক দখলের মধ্য দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতায় পরিণত হয়েছে। ১৮০৩ সালে *Marbury vs Madison* মামলায় প্রধান বিচাপতি জন মার্শাল যে রায় দেন তার মধ্য দিয়ে সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার কথা প্রথম উচ্চারিত হয়। *Marbury vs Madison* মামলা বিচার করে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের মুখপাত্র হিসেবে প্রধান বিচারপতি মার্শাল রায় দিয়ে বলেন যে, মার্কিন কংগ্রেস প্রণীত ১৭৮৯ সালের *Judiciary Act* সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদের (২) নম্বর ধারা বিরোধী এবং এই কারণে সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেস প্রণীত ঐ আইনকে সংবিধান বিরোধী বলে বাতিল করেন। প্রধান বিচারপতি মার্শাল বলেন, *Thus the particular phraseology of the constitution of the United States confirms and strengthens the principle, supported to be essential to all written constitutions, that a law repugnant to the constitutions is void.* তিনি সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতার সপক্ষে যুক্তি হিসেবে বলেন যে, মার্কিন সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন (The Supreme Law of the Land) এবং আদালতের পক্ষে সর্বদাই ঐ সর্বোচ্চ আইনকে মান্য করা বাধ্যতামূলক। সুতরাং সর্বোচ্চ আইন বা সংবিধান বিরোধী কোন আইন বা কাজ বৈধ হতে পারে না। *Marbury vs Madison* মামলার পর থেকে প্রধান বিচারপতি মার্শালের রায়কে অনুসরণ করে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের 'বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা' সাংবিধানিক বিধিতে পরিণত হয়। বিচারপতি মার্শালের প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন দীর্ঘ সময়ে (১৮৩৫ সাল পর্যন্ত) সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা আর প্রয়োগ ঘটে নি, কিন্তু তারপরে সুপ্রীম কোর্ট বহুবার ঐ ক্ষমতার

এই ক্ষমতার উৎস

প্রয়োগ করে। ১৯৩০ সালে সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার প্রয়োগকে কেন্দ্র করে মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থার এক সাংবিধানিক সংকট দেখা দিয়েছিল।

বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেস প্রণীত আইন, রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইন, অঙ্গরাজ্যের সংবিধান, শাসন-বিভাগীয় নির্দেশ ও কার্যাবলী এবং সরকারী সংস্থার কার্যাবলী মার্কিন সংবিধানসম্মত কিনা তা চূড়ান্ত এবং শেষ বিচারের অধিকারী। সুপ্রীম কোর্টের মতে ঐ সকল আইন, নির্দেশ, কার্যাবলী বা তার যে অংশটুকু এবং রাজ্য-সংবিধানের যে অংশ সংবিধান বিরোধী বলে বিবেচিত হবে সুপ্রীম কোর্ট তাকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সুপ্রীম কোর্ট নিজে উদ্যোগ নিয়ে ঐ সকল বিষয়ের বৈধতা বিচার করে না—যখন সুপ্রীম কোর্টের কাছে ঐ সকল বিষয় উত্থাপিত হয় কেবলমাত্র তখনই সুপ্রীম কোর্ট সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বৈধতা বিচার করতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট অবৈধ বিষয়কে নিজে বাতিল বলে ঘোষণা করে না। সুপ্রীম কোর্ট কোন আইন, নির্দেশ বা কার্যাবলীকে বা তার কোন অংশকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং তার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করে। সুপ্রীম কোর্টের এই প্রতিক্রিয়ার ফলে স্বভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট আইন বা নির্দেশটি বাতিল বলে পরিগণিত হয়।

এই ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি

বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতার অস্তিত্ব এবং এই ক্ষমতার প্রয়োগ মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্টকে *Superlegislative Guardian*-এ পরিণত করে। সংখ্যাগত দিক থেকে বিচার করলে একথা বলা যায় না যে 'মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট' বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতার অস্তিত্বই মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্টকে প্রভূত ক্ষমতা ও মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতা মার্কিন কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রপতির মত ক্ষমতাশীল সংস্থা ও ব্যক্তিকে সংবিধান স্বীকৃত নিজ নিজ সীমার মধ্যে থাকতে বাধ্য করছে, এদের নিয়ন্ত্রণ করছে এবং মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করছে। ১৯৩০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ব্যাপক মন্দা দেখা দেয় তাকে মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ক্ষমতাসীন হয়ে ১৯৩৬ সালে নিউ ডিল পরিকল্পনাকে (New Deal Plan) গ্রহণ করেন। সুপ্রীম কোর্ট নিউ ডিল পরিকল্পনাকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করে এবং এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার প্রয়োগে ক্ষুব্ধ হয়ে রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট বলেছিলেন যে, সুপ্রীম কোর্ট জাতীয় আইনসভার তৃতীয় কক্ষে পরিণত হয়েছে। তিনি আদালতের হাত থেকে সংবিধানকে রক্ষা করার প্রয়োজনকে তুলে ধরেন (Supreme court is coming more and more to constitute a Third House of the National Legislature···we must take action

এই ক্ষমতার গুরুত্ব

to save the constitution from the Court)। সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতার প্রয়োগ বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রপতিদের ক্ষুব্ধ করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন সংস্থার ক্ষমতার আধিক্য রোধ করে ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমালোচনা

বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা মনে রেখেও বলা প্রয়োজন যে. সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতাটি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। এই ক্ষমতার প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই জনপ্রিয়তা লাভ না করে কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে। *Dred Scott* মামলায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার প্রয়োগকে রাষ্ট্রপতি অব্রাহাম লিঙ্কন অবিবেচনাপ্রসূত, অযৌক্তিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চালিত বলে অভিযোগ করেছিলেন। অনেক সমালোচক মনে করেন যে. বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার প্রয়োগের সুযোগ নিয়ে বিচারপতিরা অনেক ক্ষেত্রেই ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের ব্যক্তিগত এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে। আরও বলা হয় যে পরিবর্তিত সামাজিক, আর্থনীতিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার পরিবর্তে সুপ্রীম কোর্ট বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে সমাজব্যবস্থাকে স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনীয় রাখার চেষ্টা করে। ফলে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টকে রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করে প্রগতিশীল সমাজ গঠনের প্রয়াসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সুযোগ দিয়েছে। সংবিধানের আক্ষরিক অর্থের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে সুপ্রীম কোর্ট অনেক সময় বিচারবিভাগীয় স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিষ্ঠা করেছে। আইন এবং শাসনবিভাগের কাজকর্মের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতার প্রয়োগ বিশ্লেষণ করে অনেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, এই ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করা, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের বিরোধিতা করা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করা এবং মার্কিন পুঁজিবাদিদের রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রাধান্য রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন সংবিধানকে বিচারপতি দ্বারা প্রণীত সংবিধানে রূপান্তরিত করেছে।

৪. সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট

ভারতে যেমন সুপ্রীম কোর্টকে সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে অভিহিত করা হয়, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টকে সংবিধানের অভিভাবক (Guardian of the Constitution) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মার্কিন সংবিধানের কোথাও

সুপ্রীম কোর্টকে সংবিধানের অভিভাবক বলে চিহ্নিত করা হয়নি। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানকে দেশের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে অভিহিত করে ঐ সর্বোচ্চ আইনকে সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে নিজের উদ্যোগে সংবিধানের অভিভাবকত্ব অর্জন করেছে। সুপ্রীম কোর্টের সংবিধানের অভিভাবকত্ব লাভের সূত্রপাত ঘটে ১৮০৩ সালে *Marbury vs Madison* মামলায় প্রধান বিচারপতি মার্শালের রায়ের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে *McCulloch vs Maryland* (১৮১৯), *Dartmouth College vs Woodward* (১৮১৯), *Gibson vs Ogden* (১৮২৪) প্রভৃতি মামলার মধ্য দিয়ে মার্কিন সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা স্বীকৃতি লাভ করে। মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংবিধানের অভিভাবকত্ব সুপ্রীম কোর্টের হাতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বর্তমান শতকের একজন প্রধান বিচারপতি চার্লস ইভানস্ হিউস (Charles Evans Hughes) বলেছেন যে বিচারকেরা যা বলেন তাই মার্কিন সংবিধান (We are under the Constitution, but the Constitution is what the judges say it is)।

অভিভাবকত্বের উৎস ও স্বীকৃতি

মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট যে সকল ক্ষমতা নিজের উদ্যোগে অর্জন করে সংবিধানের অভিভাবত্ব লাভ করেছে সেগুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রথমত. মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে যে বিপুল ক্ষমতা লাভ করেছে তা সুপ্রীম কোর্টের সংবিধানের অভিভাবকত্ব অর্জনের একটি প্রধান উপাদান। দ্বিতীয়ত, জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতাকে সংরক্ষণের ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সুপ্রীম কোর্টের পক্ষে সংবিধানের অভিভাবকত্ব লাভ সম্ভব হয়েছে। তৃতীয়ত. মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগ করে মার্কিন সংবিধানের অভিভাবকত্বকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিরক্ষা করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সুপ্রীম কোর্টের উপরোক্ত ক্ষমতাগুলো সংবিধান স্বীকৃত পথে সুপ্রীম কোর্ট লাভ করেনি. নিজের উদ্যোগে অর্জন করেছে। সর্বোপরি আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি (Due process of law) সহ বিভিন্ন সাংবিধানিক নীতি অনুসরণ করার ক্ষমতা প্রয়োগ করে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবকত্ব লাভ করেছে। উপরোক্ত উপাদান ও সাহায্যে কি ভাবে মার্কিন সংবিধানের অভিভাবকত্ব সুপ্রীম কোর্ট লাভ করেছে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

অভিভাবকত্ব অর্জনের উপাদান

প্রথমত, মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। সুপ্রীম কোর্টে আনীত কোন মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন জড়িত থাকলে বা সংবিধানের ব্যাখ্যার কোন সুযোগ থাকলে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানকে ব্যাখ্যা করে। সংবিধান সংক্রান্ত সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যা চরম ও চূড়ান্ত। তাই বলা হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি সংবিধান আছে, কিন্তু বিচারকেরা যা বলেন তাই সংবিধান। অর্থাৎ বিচারকেরা সংবিধানের যে ব্যাখ্যা দেন তাই সংবিধান বলে

স্বীকৃত হয়। বিচারপতিরা সংবিধানকে যে ব্যাখ্যা করেন, সংবিধানের যে অর্থ আরোপ করেন সেই ব্যাখ্যা ও অর্থকেই চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সুপ্রীম কোর্টের এই ভূমিকার জন্য বলা হয় যে, মার্কিন সুপ্রীমকোর্টই হল সংবিধান। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাদান করে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংবিধানের নতুন অর্থ যুক্ত করার জন্য এবং সংবিধানে নতুন মাত্রা যোগ করার জন্য মার্কিন সুপ্রীম কোর্টকে একটি বিরামহীন সংবিধান সভা নামে অভিহিত করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির জটিলতার জন্য যখন সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা সম্ভব হয় না তখন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাকে সিদ্ধ করে। সংবিধানকে ব্যাখ্যার নামে এই ব্যাপক ক্ষমতার প্রয়োগ মার্কিন সুপ্রীম কোর্টকে সংবিধানের অভিভাবকে পরিণত করেছে।

অভিভাবকত্ব ঃ
১. সংবিধানের ব্যাখ্যা

দ্বিতীয়ত, মার্কিন সংবিধানের প্রথম দশটি সংশোধনী আইনে জনগণের জন্য যে সকল অধিকার ও স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা হয়েছে ঐ সকল অধিকার ও স্বাধীনতাকে সংরক্ষণের দায়িত্ব মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের হাতে ন্যস্ত রয়েছে। সংবিধান ঐ দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের হাতে প্রত্যক্ষভাবে তুলে দেয়নি। সংবিধানের নবম সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে, সংবিধানে উল্লেখিত অধিকারগুলি এবং জনগণের জন্য সংরক্ষিত অন্যান্য অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। সংবিধানের এই নির্দেশ থেকে অধিকারকে সংরক্ষণের ব্যাপারটা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায় এবং এটা সুপ্রীম কোর্টের অবশ্য পালনীয় দায়িত্বের মধ্যে এসে পড়ে। সুপ্রীম কোর্ট জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য অনেক সময় সংবিধানের ব্যাখ্যায় নতুন মাত্রা যোগ করে। কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভার কোন আইন বা শাসনতান্ত্রিক নির্দেশ ও কার্যাবলী নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতার পরিপন্থী হলে সুপ্রীম কোর্ট বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাকে অবৈধ ঘোষণা করে। বিশেষ করে সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট নিরলস প্রচেষ্টা চালায়। জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টকে মার্কিন সংবিধানের অভিভাবকে পরিণত করেছে।

২. অধিকারের সংরক্ষণ

তৃতীয়ত, মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট ১৮০৩ সালে *Marbury vs Madison* মামলায় বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার প্রয়োগ শুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় এবং অঙ্গরাজ্যের আইনসভা যে সকল আইন প্রণয়ন করে, শাসন কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থা যে সকল নির্দেশ জারী করে ঐগুলো এবং অঙ্গরাজ্যের সংবিধানের কোন অংশ যদি সংবিধান বিরোধী বলে সুপ্রীম কোর্ট মনে করে তবে কোর্ট ঐ আইন, নির্দেশ, কার্য এবং অঙ্গরাজ্যের সংবিধানের বিশেষ অংশকে সংবিধান বিরোধী বা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতাকে 'বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা'-র ক্ষমতা বলা হয়। সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক এরূপ অবৈধ ঘোষণা করার অর্থই হ'ল

সংশ্লিষ্ট আইন, নির্দেশ ইত্যাদি বা তাদের অংশবিশেষ বাতিল বলে পরিগণিত হওয়া। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতার প্রয়োগ মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্টকেসর্বোচ্চ সাংবিধানিক অভিভাবকে পরিণত করেছে এবং প্রভূত মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। এই ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের অভিভাবকত্ব আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণে এনে মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুপ্রীম কোর্টের এই দায়িত্ব পালন নিঃসন্দেহে সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে আদালতের ভূমিকাকে সুদৃঢ় করেছে। বিচার-বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে নিজ নিজ ক্ষমতার এক্তিয়ারের মধ্যে রেখে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে।

৩. বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা

সর্বোপরি মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির (Due process of Law) সাহায্যে সংবিধানের নতুন ব্যাখ্যা, জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা, ন্যায়-নীতির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করে সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাছাড়া সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক 'অনুমিত ক্ষমতার তত্ত্ব' (Theory of Implied powers) প্রয়োগের দ্বারাও সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে হয়। *Mc Culloch vs Maryland* মামলায় সুপ্রীম কোর্ট অনুমিত ক্ষমতার তত্ত্ব প্রয়োগ করে দেখায় যে মার্কিন কংগ্রেসের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত।

৪. সাংবিধানিক নীতি প্রয়োগ

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, মার্কিন সংবিধানে নির্দিষ্ট না থাকলেও বাস্তবে সেখানকার সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেকে মনে করেন যে, মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবকত্ব দ্বারা একদিকে মার্কিন সংবিধানের সম্প্রসারণে এবং বিকাশে সাহায্য করেছে এবং অন্যদিকে সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে কায়েমী স্বার্থ, বুর্জোয়া ব্যবস্থা, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষায় অধিকতর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা সমালোচিত হলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট হল সংবিধানের অভিভাবক।

নমুনা প্রশ্ন

প্রথম অধ্যায়

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচয়িতাগণের সামাজিক দৃষ্টিভংগি আলোচনা কর। [পৃঃ ১৭]

২। মার্কিন শাসনতন্ত্রের সম্প্রসারণের জন্য দায়ী উপাদানগুলি বিশ্লেষণ কর। [পৃঃ ৩১]

৩। "মার্কিন শাসনতন্ত্র ডারউইনবাদী, নিউটনবাদী নয়।" —আলোচনা কর। [পৃঃ ২]

৪। মার্কিন শাসনতন্ত্র রচনার বিভিন্ন স্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [পৃঃ ১২]

৫। ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনের সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা বিবরণ দাও। [পৃঃ ১৫]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। স্বাধীনতার ঘোষণা বলতে কি বোঝ। [পৃঃ ৮]

২। শাসনতন্ত্রের সম্প্রসারণে সংশোধনের ভূমিকা আলোচনা কর। [পৃঃ ৩২]

৩। বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত কিভাবে শাসনতন্ত্রের সম্প্রসারণে সাহায্য করছে? [পৃঃ ৩৩]

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। মার্কিন সংবিধানের উৎস আলোচনা কর। [পৃঃ ৩৬]

২। মার্কিন সংবিধানের শ্রেণী চরিত্র ব্যাখ্যা কর। [পৃঃ ৩৭]

৩। সংক্ষেপে মার্কিন শাসনতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। [পৃঃ ৪০]

৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্বের ব্যবহারিক দিক আলোচনা কর। [পৃঃ ৪৩]

৫। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি বলতে কি বোঝায়? কিভাবে ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকর হয়। [পৃঃ ৪৮]

৬। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমিত ক্ষমতার তত্ত্ব আলোচনা কর। [পৃঃ ৫০]

তৃতীয় অধ্যায়

১। মার্কিন শাসনতন্ত্রের সংশোধনের পদ্ধতি আলোচনা কর। ইহা কি দুষ্পরিবর্তনীয়? [পৃঃ ৫২]

২। মার্কিন ও সোভিয়েত শাসনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতির তুলনা কর। [পৃঃ ৫৯]

৩। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতির তুলনা কর। [পৃঃ ৫৭]

চতুর্থ অধ্যায়

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। [পৃঃ ৭৪]

২। মার্কিন শাসনতন্ত্রকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বলা যায় কিনা আলোচনা কর। [পৃঃ ৮৪]

৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর [পৃঃ ৮০]

৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের কারণ আলোচনা কর [পৃঃ ৮৭]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতার প্রসারে বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তের ভূমিকা আলোচনা কর। [পৃঃ ৮৭]

২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনে গৃহযুদ্ধের ভূমিকা কি? [পৃঃ ৮৭]

৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। [পৃঃ ৮০]

৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন বলিতে কি বোঝায়? [পৃঃ ৮৭]

পঞ্চম অধ্যায়

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর চরিত্র ও কার্যাবলী আলোচনা কর। [পৃঃ ১০৯]

২। মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৩। মার্কিন রাজনৈতিক দলগুলির কার্যাবলী আলোচনা কর। [পৃঃ ৯৮]
৪। মার্কিন রাজনৈতিক দলের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাও। [পৃঃ ৯২]
৫। ব্রিটিশ ও আমেরিকান দলীয় ব্যবস্থার তুলনা কর। [পৃঃ ১০২]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। মার্কিন চাপসৃষ্টি গোষ্ঠীর কার্যাবলী আলোচনা কর। [পৃঃ ১০৯]

২। মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। [পৃঃ ১০৫]

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। মার্কিন গণতন্ত্রের চরিত্র আলোচনা কর। [পৃঃ ১১৮]

২। মার্কিন অধিকারের বিল আলোচনা কর। [পৃঃ ১১৪]

৩। অধিকারের বিল বলতে কি বোঝায়? ইহারা কি প্রকৃত পক্ষে রাজনৈতিক অধিকার? [পৃঃ ১১৪]

৪। মার্কিন নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা আলোচনা কর। [পৃঃ ১২১]

৫। বিষয়গত এবং পদ্ধতিগত অধিকারের মধ্যে পার্থক্য কর। ঐগুলো ব্যাখ্যা কর। [পৃঃ ১২১]

সপ্তম অধ্যায়

১। মার্কিন কংগ্রেসের গঠন আলোচনা কর। [পৃঃ ১২৮]

২। মার্কিন প্রতিনিধিসভার গঠন এবং কার্যাবলী আলোচনা কর। [পৃঃ ১২৯]

৩। মার্কিন প্রতিনিধিসভার অধ্যক্ষের নির্বাচন, কার্যাবলী এবং পদমর্যাদা আলোচনা কর। [পৃঃ ১৩১]

৪। প্রতিনিধিসভার অধ্যক্ষের ক্ষমতা ও মর্যাদার সহিত কমন্সসভার অধ্যক্ষের ক্ষমতা ও মর্যাদার তুলনা কর। [পৃঃ ১৩৪]

৫। মার্কিন সিনেটের গঠন, ক্ষমতা এবং কার্যাবলী আলোচনা কর। [পৃঃ ১৩৫]

৬। মার্কিন সিনেটের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর। [পৃঃ ১৩৫]

৭। সিনেটকে কেন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ বলা হয়, আলোচনা কর। [পৃঃ ১৩৭]

৮। সিনেটের শক্তিশালী হওয়ার কারণ কি? [পৃঃ ১৪১]

৯। মার্কিন কংগ্রেসের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও পদমর্যাদা আলোচনা কর। [পৃঃ ১৪৩]

১০। কংগ্রেসের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। [পৃঃ ১৪৭]

১১। "কংগ্রেস একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ লেভিয়াথান।"—আলোচনা কর। [পৃঃ ১৪৭]

১২। মার্কিন কমিটি ব্যবস্থার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। [পৃঃ ১৫৫]

১৩। মার্কিন কমিটি ব্যবস্থার সহিত ব্রিটিশ কমিটি ব্যবস্থার তুলনা কর। [পৃঃ ১৬১]

১৪। কংগ্রেসে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি আলোচনা কর। [পৃঃ ১৫০]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। প্রতিনিধিসভার ক্ষমতা আলোচনা কর। [পৃঃ ১২৯]

২। প্রতিনিধিসভার স্পীকার কি সম্পূর্ণরূপে অ-রাজনৈতিক? যদি না হন, কেন নন? [পৃঃ ১৩৪]

৩। মার্কিন সিনেটের গঠন আলোচনা কর। [পৃঃ ১৪৩]

৪। মার্কিন কংগ্রেসের শাসনতন্ত্র সংশোধন বিষয়ক ক্ষমতা আলোচনা কর। [পৃঃ ১৫৫]

৫। সমগ্র কক্ষ কমিটির উপর টীকা লিখ [পৃঃ ১৬৭—১৬৮]

৬। মার্কিন কংগ্রেসের কমিটিগুলি আলোচনা কর। [পৃঃ ১৬২]

অষ্টম অধ্যায়

১। মার্কিন রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের পদ্ধতি আলোচনা কর। [পৃঃ ১৭৩]

২। সংক্ষেপে মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আলোচনা কর। [পৃঃ ১৮০]

৩। মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা এবং শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাঁর স্থান আলোচনা কর। [পৃঃ ১৮৮]

৪। রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন ও শাসনবিভাগের কার্যাবলীর মধ্যমণি কিনা আলোচনা কর।] [পৃঃ ১৮০ এবং ১৯৪]

৫। মার্কিন রাষ্ট্রপতির আইন সম্পর্কিত ক্ষমতা আলোচনা কর। [পৃঃ ১৯৪]

৬। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। [পৃঃ ১৯৪]

৭। মার্কিন শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের সম্পর্ক মন্তব্য সহকারে আলোচনা কর। [পৃঃ ১৯৪]

৮। কিভাবে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন? [পৃঃ ১৯৪—]

৯। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বের প্রকৃতি আলোচনা কর। [পৃঃ ১৯০]

১০। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কোন রাজা থেকে একাধারে অধিক ও কম; আবার তিনি কোন প্রধানমন্ত্রীর তুলনায় অধিক এবং কম।" —আলোচনা কর। [পৃঃ ১৯৯]

১১। মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতার সঙ্গে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও ক্ষমতার তুলনা কর। [পৃঃ ২০৩]

১২। মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ব্রিটেনের রানীর তুলনা কর। [পৃঃ ২১০]

১৩। মার্কিন ক্যাবিনেটের গঠন, কার্যাবলী ও পদমর্যাদা আলোচনা কর। [পৃঃ ২০৭]

১৪। মার্কিন ক্যাবিনেটের কার্যাবলী এবং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইহার সম্পর্ক আলোচনা কর। [পৃঃ ২০৭]

১৫। ব্রিটিশ ও মার্কিন ক্যাবিনেটের মধ্যে তুলনা কর। [পৃঃ ২১০]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি আলোচনা কর। [পৃঃ ১৭৬]

২। মার্কিন উপরাষ্ট্রপতির দপ্তরের প্রকৃতি আলোচনা কর। [পৃঃ ২০১]

৩। কখন এবং কিভাবে রাষ্ট্রপতিকে ইম্পিচ করা যায়? [পৃঃ ১৭৭]

৪। মার্কিন রাষ্ট্রপতির শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা আলোচনা কর। [পৃঃ ১৮১]

৫। মার্কিন ক্যাবিনেটের সদস্যগণ কিভাবে নিযুক্ত হন? কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক কি? [পৃঃ ২০৭]

নবম অধ্যায়

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিচার ব্যবস্থার বর্ণনা দাও। [পৃঃ ২১৪]

২। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। [পৃঃ ২১৫]

৩। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা, এক্তিয়ার এবং শাসনতান্ত্রিক গুরুত্ব আলোচনা কর। [পৃঃ ২১৫ এবং ২১৯]

৪। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের শাসনতান্ত্রিক গুরুত্ব কি? ইহার এক্তিয়ার ও ক্ষমতার উপর বিশ্লেষণাত্মক টীকা লিখ।] [পৃঃ ২১৫ এবং ২১৯]

৫। বিচার বিভাগের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা বলতে কি বোঝায়? ইহা কিভাবে সুপ্রীম কোর্টের প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে? [পৃঃ ২২৭]

৬। জনগণের অধিকার সংরক্ষণে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা আলোচনা কর। [পৃঃ ২২৩]

৭। শাসনতন্ত্রের অভিভাবকরূপে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা আলোচনা কর। [পৃঃ ২৩০]

৮। শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা আলোচনা কর। [পৃঃ ২১৯]

৯। "সুপ্রীম কোর্টই হইল শাসনতন্ত্র" ।—আলোচনা কর। [পৃঃ ২১৯]

১০। "সুপ্রীম কোর্ট হল একটা শাসনতান্ত্রিক সম্মেলন যার অধিবেশনের মধ্যে কোন ছেদ নেই।" আলোচনা কর। [পৃঃ ২১৯]

১১। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা আলোচনা কর। [পৃঃ ২২৭]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের গঠন আলোচনা কর। [পৃঃ ২১৬]

২। বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা বলতে কি বোঝায়? [পৃঃ ২২৭]

৩। সুপ্রীম কোর্টের আপীল এলাকা আলোচনা কর। [পৃঃ ২১৭]

॥ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ॥

এক

মহান সোভিয়েত বিপ্লব
Great Soviet Revolution

এক : দেশ ও দেশবাসী (Land and the People)

১৯১৭ সালে মহান্ অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জারকে পরাজিত করে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিকের (The Union of the Soviet Socialist Republic) আবির্ভাব ঘটে। বর্তমান শতকের প্রথমদিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল মহান্ সোভিয়েত বিপ্লবের সফল পরিণতিতে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম এবং দ্বিতীয়ার্ধের চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ঘটনা হল বিশ্বরাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ঐ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের আত্মপ্রকাশ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এক বিশাল দেশ, পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের এক-ষষ্ঠাংশ এলাকা নিয়ে এই দেশ গঠিত। ইউরোপের একাংশ এবং এশিয়ার এক বিরাট অঞ্চল নিয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। আয়তনের দিক থেকে ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র।

দেশ

মধ্য এশিয়ার মরুভূমি, উত্তর মেরুদেশীয় অঞ্চলের পার্বত্য উচ্চভূমি, ক্রান্তীয় অঞ্চল, শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল প্রভৃতি বিভিন্ন এবং বিচিত্র জলবায়ু অঞ্চল সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখতে পাওয়া যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন কোন এলাকা গভীর অরণ্য, কোথাও বা উচ্চ পর্বতমালা, আবার কোন কোন এলাকা সমতল ভূমি। নদী, অরণ্য, পর্বতমালা, মরুভূমি এবং সমভূমি নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসংখ্যা ২৬ কোটির বেশী। এখানে কম করে ১৭৫টি জনগোষ্ঠী (Ethnic Group) আছে। এই জনগোষ্ঠীগুলোর ধর্ম, ভাষা ও কৃষ্টিগত পার্থক্য রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে অর্ধেকের বেশী রুশ ভাষাভাষী জনগণ। রুশ ভাষা জাতীয় ভাষা হলেও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ভাষা ও ঐতিহ্যের বিকাশের

জনগণ

জন্য সেখানে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। একটি বহুভাষা দেশ হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নে বহুজাতিক সমস্যাকে বিপ্লবের পরে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা হয়েছে। তাই সেখানে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির কোন সমস্যা নেই। সোভিয়েত রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ হলেও সেখানকার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ নিজ নিজ ধর্মাচরণের ব্যাপক স্বাধীনতা ভোগ করে।

সোভিয়েত বিপ্লবের আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একটি অনগ্রসর দেশ। সেখানে শিল্প ছিল না বললেই চলে। কৃষিও ছিল প্রাচীন পদ্ধতিতে। কিন্তু বিপ্লবের পরে সোভিয়েত কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে সেখানে এক সর্বাত্মক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। এর ফলে অতি অল্পসময়ের মধ্যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন শিল্প, কৃষি, প্রযুক্তিবিদ্যা, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটিয়ে বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছে। মার্কসবাদ লেনিনবাদের সৃজনশীলতা সোভিয়েত ইউনিয়নকে নতুন নতুন সাফল্যের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে।

দুই ঃ মহান অক্টোবর বিপ্লব, ১৯১৭ (Great October Revolution of 1917)

বর্তমান শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের অক্টোবর বিপ্লব। জারের আমলে রাশিয়া ছিল বহু জাতির এক কয়েদখানা। উনিশ শতকের মধ্যভাগে রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ শুরু হয়। ঐ সময়ে রাশিয়াতে বড় বড় কলকারখানা, কয়লাখনি এবং রেল ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ঐ সময়ে রাশিয়ায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিকাশলাভ করলেও ঐ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ছিল কৃষি নির্ভরশীল এবং কৃষকদের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজিত জার আলেকজাণ্ডার ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথার বিলোপ করতে বাধ্য হন। কিন্তু ভূমিদাস প্রথার বিলোপ কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নতি সাধনে সমর্থ হয় না। বিত্তশালী কৃষক বা 'কুলাক' নামে একটি শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করে এবং এরা গ্রামীণ সমাজজীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে। দরিদ্র চাষীরা এদের কাছে সর্বস্ব বাধা দিয়ে সর্বহারা হয়ে পড়ে।

বিপ্লবের পটভূমিকা

এই সময়ে রাশিয়াতে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে নতুন উৎপাদিকা শক্তির সংঘাত শুরু হয়। সামন্ততান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থার ওপরে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ব্যবস্থা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। উনিশ শতকের অষ্টম দশক থেকেই শ্রমজীবী মানুষের জাগরণ শুরু হয় এবং সংগঠিত হয়ে তারা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। রাশিয়াতে সর্বপ্রথম শ্রমিক সংগঠন 'শ্রমিক মুক্তি' নামে একটি সংস্থা ১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্লেখানভ এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। একদিকে মার্কসবাদ প্রচার এবং অন্যদিকে শ্রমিকদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংগঠিত করার কাজে এই সংস্থা আত্মনিয়োগ করে। রাশিয়ার নারদ্নিকরা মনে করতেন যে, একমাত্র কৃষক বিদ্রোহের দ্বারা জারতন্ত্রকে ধ্বংস করা সম্ভব এবং এই বিশ্বাস নিয়ে তারা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নারদ্নিকদের ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেবার কাজে 'শ্রমিক মুক্তি' সংঘ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১৮৯৫ সালে লেনিন (V. I. Lenin) বিভিন্ন শ্রমিক সংঘকে একত্র করে 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রাম সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই মুক্তি সংগ্রাম সংঘ বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক আন্দোলন শুরু করে। ভীত জার সরকার ১৮৯৫ সালে লেনিনকে গ্রেপ্তার করে। ১৯০০ সালে লেনিন সাইবেরিয়ার নির্বাসন থেকে ফিরে এসে তাঁর পরিচালিত সংবাদপত্র 'ইসক্রা'-এর মাধ্যমে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই সময়ে রাশিয়াতে বিপ্লবী শ্রমিক সংস্থার পাশাপাশি মার্কসবাদী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দল গড়ে ওঠে। এদের ঐক্যবদ্ধ করে ১৯০৩ সালে রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি গড়ে ওঠে। আদর্শগত মতভেদের জন্য এই দল দ্বিধাবিভক্ত হয়। ফলে বলশেভিক ও মেনশেভিক নামে দুটি দল

শ্রমিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা

সৃষ্টি হয় এবং লেনিন বলশেভিক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। লেনিনের নেতৃত্বে মেনশেভিক দলের সুবিধাবাদী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করা হয়। ১৯০৪-০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মেনশেভিকরা পিতৃভূমি রক্ষার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান। অন্যদিকে বলশেভিকরা ঐ যুদ্ধকে জনস্বার্থ বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে চিত্রিত করেন। রুশ-জাপান যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে জারের প্রভাব হ্রাস পায় এবং শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে রাশিয়াতে রাজনৈতিক ধর্মঘট ডাকা হয়। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কল-কারখানা এবং সর্বস্তরে সোভিয়েত গঠন করা হয়। শুধুমাত্র শ্রমিক আন্দোলন নয়, ঐ সময়ে কৃষক আন্দোলনও ব্যাপকভাবে শুরু হয়। ক্রমে সৈন্যবাহিনীর অসন্তোষকে কেন্দ্র করে অবস্থা জটিল হয়ে ওঠে। শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যবাহিনীর আন্দোলন বিদ্রোহের রূপ নেয়। জার, জমিদার ও পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে বলশেভিক দল বিপ্লবের আহ্বান দেয়। দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অত্যাচার করে জার এই বিপ্লবকে দমন করেন। জার আইন প্রণয়নকারী একটি নতুন 'ডুমা' আহ্বান করেন। বলশেভিকরা 'ডুমা' বয়কট করেন। কিন্তু এই 'ডুমা' জারের যথেষ্ট বংশবদ মনে না হওয়ায় তিনি দ্বিতীয় 'ডুমা' আহ্বান করেন।

১৯০৫ সালের বিপ্লব

বিপ্লবের স্বার্থে বলশেভিকরা দ্বিতীয় ডুমার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যে জার দ্বিতীয় ডুমা ভেঙ্গে দেন এবং নতুন নির্বাচন আইন ঘোষণা করেন। শোষণ, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার চালিয়ে জার সরকার প্রথম রুশ বিপ্লবকে দমন করেন।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মেনশেভিকরা দেশে শান্তি বজায় রাখার নামে বিপ্লবী আন্দোলন পরিহার করার জন্য আহ্বান জানান এবং জারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমর্থন জানান। অন্যদিকে বলশেভিক দল ঐ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করে তাকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করার দাবী তোলে। যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার আর্থিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। শ্রমজীবী যুবকদের কারখানা থেকে নিয়ে এসে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করা হয়। ফলে কল-কারখানা বন্ধ হবার অবস্থা সৃষ্টি হয়, শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় হয় এবং জমিদাররা যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে কৃষকদের ওপরে অত্যাচার চালিয়ে তাদের নিঃস্ব করে। ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাদ, মস্কো, বাকু প্রভৃতি শহরে শ্রমিক ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। সৈন্যবাহিনীর একাংশও এই বিপ্লবে সামিল হয়। বিপ্লবীরা এবং সৈন্যবাহিনী জারের

ফেব্রুয়ারী বিপ্লব

মন্ত্রি ও সেনাপতিদের গ্রেপ্তার করে এবং জেল থেকে বিপ্লবীদের মুক্তি দেয়। ফেব্রুয়ারী মাসের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হয় এবং সর্বত্র শ্রমিক ও সৈন্যবাহিনীর সোভিয়েত গড়ে ওঠে। বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য বুর্জোয়া ও জমিদাররা রাজতন্ত্রের সমর্থকদের নিয়ে অস্থায়ী সরকার গঠন করে। এর ফলে এই সময়ে একদিকে বিপ্লবীদের সোভিয়েত এবং অন্যদিকে বিপ্লব বিরোধী শক্তি অস্থায়ী সরকার গঠন করায় দ্বৈত শক্তির অভ্যুদয় এবং পাশাপাশি অবস্থান

দেখা যায়। লেনিন ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিপ্লব পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হলে তিনি আত্মগোপন করেন।

মহান্ অক্টোবর বিপ্লব

লেনিনের আত্মগোপন অবস্থাতেই ১৯১৭ সালের ২৬শে জুলাই পেট্রোগ্রাদে বলশেভিক পার্টির ষষ্ট কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। লেনিন গোপন আশ্রয় থেকে এই সম্মেলন পরিচালনা করেন। এই সম্মেলনে ব্যাপক আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, বুর্জোয়া ও জমিদারদের সহযোগিতায় দমন পীড়ন সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়ায় বিপ্লবের সম্ভাবনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এই সম্মেলনে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে বলশেভিক পার্টিকে তৈরী হতে বলা হয়। উৎপাদন ও উৎপাদিত দ্রব্য বণ্টনে শ্রমিকদের কর্তৃত্ব স্থাপন, কৃষকদের হাতে জমি অর্পণ করা এবং রাষ্ট্রশক্তি বুর্জোয়াদের কাছ থেকে শ্রমিক ও কৃষকদের হাতে ন্যস্ত করাই হল বিপ্লবের আশু লক্ষ্য। বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে এই চূড়ান্ত সংগ্রামে বিজয় লাভের জন্যে শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যবাহিনীকে আহ্বান জানান হয়।

অন্যদিকে বিপ্লবী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্যে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়ারাও তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। শ্রমিক কৃষকদের দলে দলে কারাগারে পাঠান হয় এবং বিপ্লবী সৈনিকদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতে থাকে। ৩রা আগস্ট প্রধান রুশ সেনাপতি কর্নিলভ দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবীদের প্রাণদণ্ড দিয়ে হত্যা করার জন্যে সচেষ্ট হন। ব্যাপক হারে বিপ্লবীদের প্রাণদণ্ড না দিলে অস্থায়ী সরকারকে রক্ষা করা যাবে না মনে করে অস্থায়ী সরকার এই হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে অস্থায়ী সরকার ১২ই আগস্ট মস্কো শহরে একটি সম্মেলন আহ্বান করে এবং বিপ্লবীদের দমন করার কর্মসূচী গ্রহণ করে। অন্যদিকে বলশেভিকদের আহ্বানে প্রতিবিপ্লবী সম্মেলনের বিরুদ্ধে ৪ লক্ষ মানুষ ধর্মঘট পালন করে। সেনাপতি কর্নিলভ বিপ্লবী সোভিয়েতগুলির উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে পেট্রোগ্রাদ অভিযানের জন্যে সৈন্য সমাবেশ করেন। শ্রমিক ও সৈন্যবাহিনীর বিপ্লবী প্রতিরোধের ফলে কর্নিলভের ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পেট্রোগ্রাদের এই সাফল্য বিপ্লবী শক্তির মনোবলকে বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে অস্থায়ী সরকার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

বলশেভিক দলের নেতৃত্বে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি চলতে থাকে। ১৬ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার জন্য স্তালিনের নেতৃত্বে পার্টি কেন্দ্র গঠিত হয়। অস্থায়ী সরকার বৈপ্লবিক সংগঠন ধ্বংস করার

চরম বিক্ত

জন্য সচেষ্ট হয় এবং বলশেভিক দলের মুখপত্র 'শ্রমিকের পথ' বন্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিপ্লবীদের বাধাদানের ফলে, ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ২৪শে অক্টোবর লেনিন নিজে উপস্থিত হয়ে বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ২৫শে অক্টোবর বলশেভিকরা 'রুশ নাগরিকদের প্রতি আহ্বান' নামে এক ইস্তাহার প্রচার

করে বুর্জোয়া সামরিক সরকারকে উৎখাত করে সোভিয়েতের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ন্যস্ত করার জন্য আহ্বান জানায়। ঐ দিনই বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈন্যরা অস্থায়ী সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীকে পরাজিত করে, অস্থায়ী সরকারের সদস্যদের গ্রেপ্তার করে সদর দপ্তর দখল করে এবং বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হয়। লেনিন রচিত ঐতিহাসিক ঘোষণায় বলা হয় "অস্থায়ী সরকারের পতন ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিপ্লবীদের হাতে ন্যস্ত হয়েছে।" ভূমি বিষয়ক নির্দেশনামা জারী করে বলা হয়, এই মুহূর্ত থেকে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিতে জমিদারদের স্বত্ব বিলোপ করা হল, রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে জনগণের সোভিয়েত সরকার গঠন করা হল। এইভাবে পৃথিবীর প্রথম মহান্ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হল। এর ফলে শুরু হল সোভিয়েত রাশিয়ায় এক নতুন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এক বিপুল কর্মযজ্ঞ।

সাফল্যের কারণ

লেনিন এবং স্তালিনের সুযোগ্য নেতৃত্ব, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী ঐক্য, রুশ বুর্জোয়াদের বিপ্লবী শক্তি মোকাবিলা করার মত দক্ষতার অভাব, শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীবন্ধন, শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যবাহিনীর যুক্ত সংগ্রাম, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী দল বলশেভিক পার্টির অস্তিত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে অনৈক্য প্রভৃতি কারণে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বা মহান্ সোভিয়েত বিপ্লব সাফল্য অর্জন করে।

তিন : মহান্ সোভিয়েত বিপ্লবের তাৎপর্য (Significance of Great Soviet Revolution)

পৃথিবীর ইতিহাসে সোভিয়েত বিপ্লব এক যুগান্তকারী ঘটনা। শুধুমাত্র সোভিয়েত জনগণের জীবনে নয়, সমগ্র বিশ্বে সোভিয়েত বিপ্লব বিপুল প্রভাব বিস্তার করে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। এই বিপ্লবের ফলে পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় এবং এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষ সোভিয়েত বিপ্লব থেকে প্রেরণা লাভ করে বিপ্লবী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। তাই মহান সোভিয়েত বিপ্লবকে বর্তমান শতকের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করা হয়।

প্রথমত, মহান্ সোভিয়েত বিপ্লব সফল হওয়ায় পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হয়। এতদিন পর্যন্ত বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের যে কথা মার্কসবাদ প্রচার করছিল তা যে বাস্তবে ঘটা সম্ভব তা এই বিপ্লব প্রমাণ করে। ফলে এই বিপ্লবের সাফল্য পৃথিবীতে মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রসার এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রয়াসকে ছড়িয়ে দেয়।

দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত বিপ্লব শিক্ষা দেয় যে সর্বপ্রকার শোষণকে বন্ধ করে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে শোষণহীন এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এবং সংগ্রামী সংগঠন।

তৃতীয়ত, সোবিয়েত বিপ্লব সোবিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে বিকল্প সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করায় এই ধারণা ব্যাপ্ত হয় যে পুঁজিবাদের সমাধি রচনা করা

সম্ভব। তাই এই বিপ্লব একদিকে শ্রমজীবী মানুষকে উজ্জীবিত করে, অন্যদিকে পুঁজিবাদীদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে।

চতুর্থত, অক্টোবর বিপ্লব শুধুমাত্র বুর্জোয়া সমাজের মুখোসকেই উন্মোচিত করে না, অতি বিপ্লবী এবং প্রতিবিপ্লবীদের চরিত্রকেও উদ্ঘাটন করে। এই বিপ্লব শিক্ষা দেয় যে একমাত্র মার্কস-এঙ্গেলস নির্দেশিত পথে শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত দলই সমাজবিপ্লব সাধন করতে পারে।

পঞ্চমত, এতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে সেগুলো মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থে করা হয়েছিল এবং ঐ বিপ্লবগুলো সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য সমাজব্যবস্থায় কোন গুণগত পরিবর্তন আনতে পারেনি। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লব হ'ল পৃথিবীতে প্রথম বিপ্লব যা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ দ্বারা সাধিত হয় এবং যে বিপ্লব সমাজব্যবস্থায় এক গুণগত এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে।

ষষ্ঠত, সোভিয়েত বিপ্লব বিশ্বের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের সামনে নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করে তাদের আত্মবিশ্বাস এবং সংগ্রামী মানসিকতা গড়ে তুলতে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এই বিপ্লব প্রমাণ করে যে, মানুষকে চিরদিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখে শোষণ করা যায় না এবং মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণকে বিপ্লবী সংগ্রামের দ্বারা অবসান ঘটানো যায়।

সপ্তমত, মহান্ সোভিয়েত বিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে লেনিন বলেন যে, এই বিপ্লবের ফলে বিশ্বে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে—বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সর্বহারার একনায়কত্বের অধ্যায় শুরু হয়েছে। সোভিয়েত বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও শাসকের হাত থেকে কোটি কোটি মানুষকে মুক্ত করেছে এবং মানবজাতির অবশিষ্ট অংশকে মুক্ত করার বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

অষ্টমত, সোভিয়েত বিপ্লবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে স্তালিন (Stalin) বলেছেন যে, এই বিপ্লব মুক্তির বিপুল সম্ভাবনা এবং যথার্থ পথকে তুলে ধরেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মুক্তির পথকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে এবং এদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের একটি সাধারণ ধারায় এনে মিশিয়ে দিয়েছে। মাও সে-তুঙ মনে করেন যে, সোভিয়েত বিপ্লব ইতিহাসের ধারায় পরিবর্তন ঘটিয়ে এক নতুন সমাজব্যবস্থার আবির্ভাবকে সম্ভবপর করে তুলেছে।

নবমত, সোভিয়েত বিপ্লব ঘটার আগে পৃথিবীতে পুঁজিবাদী একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ ঘটছিল। এই বিপ্লব পৃথিবীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে লুপ্ত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে তুলে ধরে। এই বিপ্লবের ফলে পৃথিবী পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক এই দু শিবিরে বিভক্ত হয়ে আগামী দিনে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনের অনিবার্যতাকে প্রতিষ্ঠা করে।

দুই

শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশ
Constitutional Development

এক ঃ সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশ (Soviet Constitutional Development)

১৯১৭ সালের মহান্ অক্টোবর বিপ্লবের পরেই সোভিয়েত রাশিয়ায় এক নতুন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল। এই নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কাজ করত অসংখ্য সোভিয়েত। ঐ সোভিয়েতগুলিতে শ্রমিক কৃষক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিরা একত্রে কাজ করতেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, দেশ শাসন করতেন। বিপ্লবের পর প্রায় আটমাস ধরে লেনিনের নেতৃত্বে জনগণের কমিশনারদের একটি পরিষদ (Council of people's commissioners) ডিক্রী জারি করে দেশ শাসন করতেন। কিন্তু বিপ্লবের নেতারা বুঝেছিলেন যে, এক নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা পত্তন করার জন্য এবং এক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রবর্তন করার জন্য একটি লিখিত সংবিধান অনতিবিলম্বে গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। তাই কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি লেনিনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেছিলেন, যে কমিশন নবজাত রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় একটি সংবিধান রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। এই সংবিধানের খসড়া ১৯১৮ সালের ১০ই জুলাই রাশিয়ান সোস্যালিস্ট ফেডারেটিভ সোভিয়েত রিপাবলিকের শাসনতন্ত্র হিসাবে গৃহীত হয়। অবশ্য এর আগে কমিশনের দ্বারা প্রণীত খসড়া সোভিয়েতগুলির পঞ্চম সর্ব-রুশ কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল। যখন ১৯১৮ সালের সংবিধান গৃহীত হয় তখন সোভিয়েত রাশিয়ার তিন-চতুর্থাংশ আক্রমণকারী, অন্তর্ঘাতক ও প্রতিবিপ্লবীদের হাতে। সারা দেশে তখন গৃহযুদ্ধ চলছে। কিন্তু এই অস্থির অবস্থার মধ্যেও বিপ্লবের শক্তিকে আরো সংহত করার জন্য ১৯১৮ সালের সংবিধান গৃহীত হয়।

১৯১৮ সালের সংবিধান

১৯১৮ সালের ১০ই জুলাই যে সংবিধান গৃহীত হয় সেই সংবিধানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ১৯১৮ সালের সংবিধান বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান হিসেবে স্বীকৃত। এই সংবিধানে মহান্ অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য ও কাজগুলি তুলে ধরা হয়েছিল। এই সংবিধানে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সর্বহারা শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। বিপ্লবের অব্যবহিত পরে শান্তি প্রতিষ্ঠা, কৃষকের হাতে জমি অর্পন, খনি, বনভূমি, কলকারখানা ব্যাংক ও পরিবহণ ব্যবস্থার ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা, সামন্ততন্ত্রের অবসান ইত্যাদি বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থাগুলো সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। রাশিয়ায় নীচ থেকে সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত অসংখ্য সোভিয়েত নিয়ে গঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা একটি পিরামিডের মত

গড়ে উঠেছিল। সব থেকে নীচে ছিল গ্রামের সোভিয়েতগুলো আর সর্বোচ্চ স্তরে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কংগ্রেস। আর মধ্যবর্তী স্তরে ছিল ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলোর সোভিয়েত, আঞ্চলিক সোভিয়েত, জেলা সোভিয়েত ইত্যাদি। সংবিধানে সোভিয়েত রাশিয়াকে একটি যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। অঙ্গরাজ্যগুলিকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অধিকার অর্পণ করে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা এক নতুন ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রবর্তন করেছিল। এই সংবিধানে রাষ্ট্রকে চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষাদান নিষিদ্ধ করা হয়। পুঁজির মালিক, কুলাক, ধর্মযাজক, অন্যান্য শ্রমশোষণকারী এবং জারের পরিবারের সদস্যদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এই সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিগুলি বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। নাগরিকদের কতগুলি মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য নির্যাতিত ও অন্যদেশে থেকে বিতাড়িত ব্যক্তিদের সোভিয়েত রাশিয়ায় আশ্রয় গ্রহণের অধিকার ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ধর্মবিরোধী প্রচারের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল।

১৯১৮ সালের সংবিধানকে ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছিল ; (১) শ্রমজীবী ও শোষিত মানুষের অধিকারের সনদ ; (২) শাসনতন্ত্রের সাধারণ বিধান ; (৩) সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তির শাসনতন্ত্র ; (৪) সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ভোটাধিকার ; (৫) বাজেট পাশের সঙ্গতি ও (৬ পতাকা। এই শাসনতন্ত্রে শোষক ও শাসক শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন একটানা তীব্র ও তিক্ত শ্রেণী সংগ্রাম পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করা হয়েছিল. ঘোষণা করা হয়েছিল জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কমিউনিস্টদের উদাত্ত ঘোষণা।

শহর ও গ্রামের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সারা-রুশীয় কংগ্রেস ছিল সরকারের সর্বোচ্চ সংগঠন। এই সংস্থা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির (Central Executive Committee) সদস্যের নির্বাচন করত। এই দুটি সংস্থা আইন, প্রশাসন, বিচার এবং অর্থসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিল। সারা-রুশীয় কংগ্রেসের দুটি অধিবেশনের অন্তবর্তীকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগীয় কমিটি সারা দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিল। তাছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী প্রশাসন পরিচালন করার জন্য পিপলস্ কমিশনারদের একটি পরিষদ ছিল। ১২ জন পিপলস্ কমিশনের প্রত্যেকে এক একটি দপ্তরের দায়িত্বে থাকতেন। ১৯১৮ সালের শাসনতন্ত্র জনসাধারণের মধ্যে লেনিন শাসনতন্ত্র নামে পরিচিত ছিল।

১৯২৪ সালের সংবিধান

১৯২১ সাল নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনীতিতে অনেক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ে ইউক্রেন, বাইলো রাশিয়া, আজেরবাইজান, আরমেনিয়া এবং জর্জিয়ায় পাঁচটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গড়ে ওঠে। বুখারা ও খোরেজমে জনগণের

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয় এবং দূর প্রাচ্যের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব অঞ্চল ও রাজ্যগুলি ছিল জারের সাম্রাজ্যের অংশ এবং এখন এই সব অঞ্চল বা রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার অনুকরণে গড়ে ওঠে। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এক কংগ্রেসে রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ইউক্রেন, বাইলো রাশিয়া এবং ট্রানস্‌ককেশিয় সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র সমান অধিকার ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে যুক্ত হয়। গঠিত হয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গুলোর যুক্তরাষ্ট্র। ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে সারা রুশ-দেশের কংগ্রেসে এক নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে। প্রতিবিপ্লবী চক্রগুলি ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী পৃষ্ঠপোষকেরা পিছু হটেছে। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো দৃঢ়ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রে আমরা অনেক কিছু নতুন উপাদান ও বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই।

১৯২৪ সালের সংবিধানে সোভিয়েত রাশিয়াকে একটি যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাগুলো বর্ণনা করা হয়। অবশিষ্ট ক্ষমতা সমূহ অঙ্গরাজ্যগুলির কাছে অর্পিত হয়। প্রত্যেক ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র বা অঙ্গরাজ্য সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত হয়। বলা হয়, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হল অঙ্গরাজ্যগুলির সম্মতিক্রমে গঠিত; এর মধ্যে বলপ্রয়োগ বা জোর জবরদস্তির কোন স্থান নেই। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলোর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়। বলা হয়, সব ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সম্মতি ছাড়া সংবিধানের এই ধারা অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার পরিবর্তন বা বর্জন করা যাবে না।

১৯১৮ সালের সংবিধানের মত ১৯২৪ সালের সংবিধানেও পুঁজির মালিক, কুলাক, ধর্মযাজক, অপরাধী এবং জারের আমলের কিছু রাজকর্মচারীদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাছাড়া গ্রামের তুলনায় শহরবাসীদের মধ্যে ভোটাধিকার অধিকতর সম্প্রসারিত করা হয়।

১৯২৪ সালের সংবিধানে নতুন তিনটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা গঠিত হয়। ঐগুলি হল সোভিয়েতগুলির সারা ইউনিয়ন কংগ্রেস (All Union Congress of Soviets), সারা ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটি (All Union Central Committee) এবং সারা ইউনিয়ন সভাপতি মণ্ডলী (All Union Presidium)। সোভিয়েতগুলির সারা ইউনিয়ন কংগ্রেস আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিকারী ছিল। এই সংস্থা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ছিল। সোভিয়েতগুলির সারা ইউনিয়ন কংগ্রেসের দুইটি অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সারা ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি এর যাবতীয় ক্ষমতা ভোগ করত। এই কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট ছিল। দুটি কক্ষের একটির নাম ছিল ইউনিয়নের সোভিয়েত (Soviet of the Union), এবং আর অন্যটির নাম ছিল জাতিপুঞ্জের সোভিয়েত (Soviet of the Nationalities)। ২৭ জন সদস্যবিশিষ্ট সারা ইউনিয়নের সভাপতিমণ্ডলী কেন্দ্রীয় কমিটির দুটি

অধিবেশনের অন্তবর্তীকালীন সময়ে যাবতীয় শাসনবিভাগীয় এবং আইনবিভাগীয় কাজ সম্পন্ন করত।

১৯৩৬ সালের সংবিধান

১৯৩৬ সালের সংবিধানকে স্তালিন সংবিধান বলা হয়। স্তালিন সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর এনেছিল। ১৯২৪ সালের পর সোভিয়েত রাশিয়ায় রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৯২৪ সালের শাসনতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল নয়া অর্থনৈতিক কার্যক্রম। কিন্তু পরে সফল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, যৌথ খামারব্যবস্থা, দ্রুত শিল্পায়ন সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে গভীর পরিবর্তন ঘটায়। উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর পূর্ণ সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকলের জন্য কাজ, সকলের জন্য শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা হয়। প্রতিক্রিয়ার শক্তি সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হয়। শ্রেণী হিসাবে পুঁজিপতি, কুলাক, বণিক ও মুনাফাখোরদের বিলোপ করা হয়। সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায় তখন শুধু শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীরই অস্তিত্ব ছিল। কৃষি ও শিল্পের বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে সোভিয়েত রাশিয়া এক আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জাতিসংঘের সদস্য হিসাবেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার গঠনমূলক ভূমিকা সকলের প্রশংসা অর্জন করে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত শক্তিশালী আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলে। কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও রাশিয়ায় এই সময় এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। ট্রটস্কির চিরস্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্ব পরিত্যক্ত হয়। গৃহীত হয় স্তালিনের এই নীতি যে বিপ্লব বহির্বিশ্বে রপ্তানি করা যায় না এবং একটি মাত্র দেশেই সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব। কামেনভ, বুখারিন প্রভৃতি নেতাদের দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধেও পার্টি সঠিক আইন ও নীতি গ্রহণ করে।

ইতিমধ্যে কয়েকটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯২৫ সালের মে মাসে উইবেক ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র ও তুর্কম্যান ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র এবং ১৯২৯ সালে তাজিক ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৩৩ সালে কাজাক ও কিরঘিজ এলাকাকে দুটি নতুন ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র হিসাবে পুনর্গঠিত করা হয়। ১৯৩৬ সালে ট্রান্স্‌ককেশিয় প্রজাতন্ত্রকে তিনভাগে ভাগ করে তিনটি নতুন ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়, যেমন জর্জিয়ান ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র, আজেরবাইজান ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র এবং আর্মেনিয়ান ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র। ফলে বহুজাতিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ায় জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আরো বেশি স্বীকৃতি লাভ করে। এককথায় বলা যায়, তিরিশের দশকের প্রথমদিকে সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়, সেই সাফল্য ও অগ্রগতিকে সংহত করার জন্য একটি নতুন সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই ১৯৩৫ সালের

ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের সপ্তম কংগ্রেসে শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৭ই ফেব্রুয়ারী জোসেফ স্তালিনকে সভাপতি করে ৩১ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি শাসনতান্ত্রিক কমিশন গঠিত হয়। কমিশন প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের খসড়ার ছয় কোটি কপি জনসাধারণের মধ্যে তাদের মতামত জ্ঞাপনের জন্য বিলি করে। জনসাধারণ খসড়া শাসনতন্ত্রের উপর ১,৫০,০০০ সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করে। ১৯৩৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর অষ্টম সোভিয়েত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ৪০টি সুপারিশ সহ মূল খসড়া শাসনতন্ত্র সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। ১৯৩৭ সালের প্রথম থেকে স্তালিন সংবিধান সোভিয়েত রাশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান হিসেবে চালু হয়।

স্তালিন সংবিধানের (১৯৩৬) প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

(১) ১৯৩৬ সালের স্তালিন সংবিধানে সোভিয়েত রাশিয়ায় দ্রুত নির্মীয়মান সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়। সংবিধানে প্রতিটি নরনারীর কাজের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়। সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়, যে কাজ করবে না, সে খেতেও পাবে না। (He who will not work, neither shall he eat)। আরো বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার যোগ্যতা অনুযায়ী সমাজকে দেবে আর তার কাজ অনুযায়ী বেতন পাবে। (To each according to his ability, and to each according to his work)। কাজ যে একটি সম্মানের এবং গৌরবের বিষয় তা সংবিধানে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। আলস্য, পরগাছাবৃত্তি, বা অন্যের শ্রম শোষণ করাকে যে সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজব্যবস্থা প্রশ্রয় দেবে না, তা সংবিধানে পরিষ্কারভাবেই বলে দেওয়া হয়। উৎপাদনের উপকরণের ওপর পূর্ণ সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা, পরিকল্পিত উৎপাদন পদ্ধতি, জনকল্যাণের জন্য উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা, সমাজতান্ত্রিক বণ্টন, দ্রুত শিল্পায়ন, সমবায় খামার প্রতিষ্ঠা সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রকে এক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল।

(২) অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের মত স্তালিন শাসনতন্ত্রও আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা দুষ্পরিবর্তনীয় ছিল। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে কোন সংশোধন প্রস্তাব সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক গৃহীত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যেহেতু সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি মাত্র রাজনৈতিক দল সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছিল, এবং যেহেতু এই দলের লৌহকঠিন শৃঙ্খলা ছিল, ফলে কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন লাভ এমন কিছু কঠিন বিষয় ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলোর সম্মতির কোন প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য সোভিয়েত সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ এই অভিমত পোষণ করতেন যে, সুপ্রীম সোভিয়েতে যেহেতু জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আসন গ্রহণ করেন, আর যেহেতু সুপ্রীম সোভিয়েতে সার্বভৌম

ক্ষমতায় আধার, অতএব সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিকার আছে দেশের সর্বোচ্চ আইন অর্থাৎ সংবিধান সংশোধন করার।

(৩) স্তালিন শাসনতন্ত্রের ১৩নং ধারায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের এক স্বেচ্ছামূলক যুক্তরাষ্ট্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এইসব ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেকের নিজস্ব সংবিধান, নিজস্ব নির্বাচিত সরকার আছে। সংবিধানের ১৭নং ধারায় কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাগুলি বর্ণনা করা হয়েছিল। অবশ্য কোন ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের আইন কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধী হলে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের আইন বাতিল বলে গণ্য হত। প্রত্যেক ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের নিজস্ব সেনাবাহিনী রাখার অধিকার ছিল। তাছাড়া ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির অধিকার ছিল বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার বা কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময় করার। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সম্মতি ছাড়া তাদের সীমানার কোন পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না।

(৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় আইনসভার নাম ছিল সুপ্রীম সোভিয়েত। রাষ্ট্রক্ষমতায় সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে সুপ্রীম সোভিয়েতকে দেখা হত। শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগ সুপ্রীম সোভিয়েতের অধস্তন বিভাগ বলে পরিগণিত হত। এই সুপ্রীম সোভিয়েত দুটি কক্ষে বিভক্ত ছিল। উভয় কক্ষ সম ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। ইউনিয়নের সোভিয়েতে প্রতি তিন লক্ষ নাগরিকের জন্য একজন করে নির্বাচিত ডেপুটি থাকতেন। আর জাতিপুঞ্জের সোভিয়েতে প্রত্যেক ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র থেকে ৩২ জন, প্রত্যেক স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র থেকে ১১ জন, প্রত্যেক স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল থেকে পাঁচজন, এবং প্রত্যেক জাতীয় এলাকা থেকে একজন করে প্রতিনিধি বা ডেপুটি নির্বাচিত হতেন। অঙ্গরাজ্যগুলি সম-প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত হয়। এই জাতিপুঞ্জের সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল। স্তালিনের মতে একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হতে বাধ্য।

(৫) স্তালিন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সোভিয়েত রাশিয়ায় একজন রাষ্ট্র প্রধানের পরিবর্তে একটি সভাপতিমণ্ডলী যৌথভাবে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্যভার নির্বাহ করতেন। এই সভাপতিমণ্ডলী সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক চার বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন। সভাপতিমণ্ডলীর প্রধান ব্যক্তিগতভাবে খুব বেশি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। সভাপতিমণ্ডলীর কাজকর্ম পরিচালিত হত যৌথ নেতৃত্বের ভিত্তিতে। সভাপতিমণ্ডলী যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে গঠিত হত। একজন সভাপতি প্রত্যেক ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র থেকে একজন করে সহসভাপতি, একজন সম্পাদক এবং কুড়ি জন সাধারণ সদস্য—মোট ৩৭ জন সদস্য নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হত। এই সভাপতিমণ্ডলী গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে কাজ করত। একথা ঠিক যে, সুপ্রীম সোভিয়েতের দুটি অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে এই সভাপতিমণ্ডলী বা

প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েতের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভোগ করত। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, প্রেসিডিয়াম বা সভাপতিমণ্ডলী সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন এবং তাদের যাবতীয় সিদ্ধান্ত সুপ্রীম সোভিয়েতের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল।

(৬) স্তালিন সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন একদল মন্ত্রী যাদের সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষ নির্বাচন করতেন। এই মন্ত্রিপরিষদ সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে তাদের যাবতীয় কাজ ও নীতির জন্য দায়ী থাকত। যখন সুপ্রীম সোভিয়েতের কোন অধিবেশন থাকত না, তখন মন্ত্রিপরিষদ সভাপতিমণ্ডলী বা প্রেসিডিয়ামের কাছে দায়ী থাকত।

(৭) সোভিয়েত রাশিয়ায় বিচারব্যবস্থাকে সরকারের অন্যতম সংগঠন হিসাবেই দেখা হয়। তথাকথিত ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতির কোন আবেদন সোভিয়েত সংবিধান বিশেষজ্ঞদের কাছে ছিল না। সোভিয়েত সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, বিচার ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে সমাজতন্ত্র আরো দৃঢ়মূল ও সংহত হয়, শ্রেণী শত্রু, প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি বা প্রতিবিপ্লবীরা যাতে তাদের অন্তর্ঘাতমূলক কাজের জন্য কঠোর সাজা পায়। সোভিয়েত রাশিয়ায় বিচারকগণ আইনসভা কিংবা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। আদালতের কাজ আঞ্চলিক ভাষায় পরিচালিত হয়। জনগণের অ্যাসেসরগণ বিচারকদের বিচারকার্যে সহায়তা করেন। তাছাড়া প্রোকিউরেটরের দপ্তর সোভিয়েত বিচারব্যবস্থায় এক অভিনব সংযোজন ছিল। আইনের শাসন, অপরাধীদের প্রকৃত বিচার এবং নির্দোষ ব্যক্তিদের যাতে তথা হয়রানি না হয় তার জন্য প্রোকিউরেটরের দপ্তর কাজ করে। এই প্রোকিউরেটরের দপ্তরের শীর্ষে থাকেন প্রোকিউরেটর জেনারেল। তিনি সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে দায়ী থাকেন।

(৮) সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার আর একটি প্রধান নীতি হল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মূল কথা হল এই যে, শাসন ব্যবস্থার সর্বস্তরে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। প্রতিটি সংস্থা তাদের কার্য-বিবরণী জনসাধারণের নিকট পেশ করে। কিন্তু ঊর্ধ্বতন সংস্থার আদেশ বা সুপারিশ অধস্তন সংস্থাগুলি মেনে নিতে বাধ্য। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ধারণা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায় সম্পূর্ণ বিপরীত। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মূলকথা হল যে, শাসনব্যবস্থা বা জনজীবনের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠরা যেন সবসময় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত মেনে নেয়, অধস্তন সংস্থা বা কমিটি যেন ঊর্ধ্বতন সংস্থা বা কমিটির আদেশ বিনা প্রতিবাদে পালন করে। উপদলীয় কোন্দল ও বিশৃঙ্খল মনোভাবকে প্রশ্রয় না দেওয়ার জন্যই কেন্দ্রিকতার উপর জোর দেওয়া হয়।

(৯) ১৯২৪ সালের পর থেকেই সোভিয়েত রাশিয়ায় কার্যত একটি পার্টির অস্তিত্ব দেখা যায়। ১৯৩৬ সালের স্তালিন শাসনতন্ত্রেও তাই কমিউনিস্ট পার্টিকেই

একমাত্র রাজনৈতিক দল বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে মার্কসবাদীদের বক্তব্য এই যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পরস্পর বিরোধী শ্রেণী স্বার্থ তুলে ধরার জন্যই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় ত্রিশের দশকের প্রথমেই পুঁজিপতি, কুলাক, জমিদার, ব্যবসায়ী, মজুতদার প্রভৃতি শ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটে। সোভিয়েত রাশিয়ায় শ্রেণী হিসাবে ছিল শুধু শ্রমিক, কৃষক এবং মেহনতী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। কিন্তু যেহেতু এইসব শ্রেণীর মধ্যে কোন অবৈরীমূলক দ্বন্দ্ব নেই, অতএব শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যথার্থ গণতান্ত্রিক প্রগতি সম্ভব।

(১০) স্তালিন শাসনতন্ত্রের আর একটি উজ্জ্বল দিক নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের তালিকা। সোভিয়েত রাশিয়ায় নাগরিকদের জন্য অন্যান্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মত শুধুমাত্র পৌর অধিকার বা রাজনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়নি। সোভিয়েত রাশিয়ায়ই সর্বপ্রথম নাগরিকদের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়, যেমন কাজের অধিকার ; উপযুক্ত মজুরীর অধিকার ; বিশ্রামের অধিকার ; বার্ধক্যে, অঙ্গহানিজনিত দুর্ঘটনায় কিংবা পীড়িত অবস্থায় ভাতার অধিকার ইত্যাদি। আবার সোভিয়েত রাশিয়ার সংবিধানে নাগরিকদের কতগুলি অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল, যেমন, প্রতিটি নাগরিককে কাজ করতে হবে ; সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করতে হবে ; সংবিধান, আইন এবং সমাজতান্ত্রিক শ্রম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে ; সর্বোপরি মাতৃভূমি রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

(১১) লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে গঠিত পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া নিঃসন্দেহে সারা পৃথিবীতে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আর ১৯৩৬ সালের স্তালিন শাসনতন্ত্র সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং সমাজতান্ত্রিক জীবনদর্শনকে শক্তিশালী হতে সাহায্য করেছিল।

দুই : নতুন সংবিধান, ১৯৭৭ (New Constitution, 1977)

নতুন সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা

১৯৩৬ সালের স্তালিন সংবিধানে সোভিয়েত রাশিয়ায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতির পরিচয় বহন করেছিল। কিন্তু পরে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের বিপুল অগ্রগতি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার আরও শক্তিবৃদ্ধি, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিষ্ঠা, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের অভূতপূর্ব উন্নয়ন, সোভিয়েত রাশিয়ায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা ও মৈত্রী, জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার, শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পার্থক্যের বিলোপ ইত্যাদি ঘটনা ও উপাদান সোভিয়েত রাশিয়াকে একটি অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক

রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের ফলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-গুলির সফল রূপায়নের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় ইতিমধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সমূহের উৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও সোভিয়েত রাশিয়ার অগ্রগতি বিস্ময়কর। নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রতি সরকারের ক্রমবর্ধমান সতর্ক দৃষ্টি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করেছে। এইসব পরিবর্তনের স্রোতকে আরও বেগবতী করার জন্য, নাগরিকদের স্বাধীনতা ও অধিকার আরও সুরক্ষিত করার জন্য, সোভিয়েত শাসনব্যবস্থাকে আরও সমৃদ্ধ ও উন্নত করা এবং সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সংবিধান পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূতি হয়।

১৯৭৭ সালে নতুন সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ

তাই ১৯৬৪ সালে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিকাশের পটভূমিকায় নতুন সংবিধান প্রণয়নের প্রয়াস শুরু হয়। ঐ বছরই সুপ্রীম সোভিয়েত লিওনেদ ব্রেজনভের নেতৃত্বে ৯৬ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি সাংবিধানিক কমিশন গঠন করে। ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে খসড়া সংবিধানের প্রতিবেদন উপস্থিত করে বলা হয়, সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ককে সাম্যবাদী সামাজিক সম্পর্কে পরিণত করার উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন সংবিধান রচিত হয়েছে। এই সময়ে খসড়া সংবিধানের ওপরে ব্যাপক আলোচনা করা হয়। মহান অক্টোবর বিপ্লবের ৬০ বছর পূর্তির সময়ে নতুন সংবিধান কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

খসড়া সংবিধান সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বস্তরের মানুষকে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়। কলকারখানা, যৌথ খামার, সামরিক ইউনিট প্রভৃতি সর্বস্তরের মানুষ এই আলোচনায় যোগ দেন। প্রায় ১৫ কোটি মানুষ লক্ষ লক্ষ সভায় খসড়া সংবিধানের ওপরে আলোচনা করে এবং ৪ লক্ষ সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। ঐ সংশোধনীগুলো বিবেচনা করে কয়েকটি ধারা সংশোধন করা হয়। অবশেষে ১৯৭৭ সালের ৭ই অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নের এই নতুন সংবিধান সুপ্রীম সোভিয়েতে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

তিন

সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৭৭ সালের নতুন সংবিধান
New Constitution of 1977 of U. S. S. R.

এক : সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান (মৌলিক আইন), ১৯৭৭

[১৯৭৭ সালের ৭ই অক্টোবর গৃহীত]

লেনিনের পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ায় শ্রমিক ও কৃষকদের দ্বারা সাধিত অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়েছিল, পীড়নের শৃঙ্খল ভেঙেছিল, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং সৃষ্টি করেছিল এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র—বৈপ্লবিক প্রাপ্তিসমূহ রক্ষার এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের মৌল হাতিয়ার সোভিয়েত রাষ্ট্র। সোভিয়েত মনুষ্যসমাজ এইভাবে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে যুগান্তকারী উত্তরণ শুরু করেছিল।

গৃহযুদ্ধে বিজয় অর্জন করা ও সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপকে পরাস্ত করার পর সোভিয়েত সরকার দূরপ্রসারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরসমূহ কার্যকর করেছিল এবং চিরকালের জন্য মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈরিতার ও বিভিন্ন অধিজাতির মধ্যে শত্রুতার অবসান ঘটিয়েছিল। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের মধ্যে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির একীকরণ সমাজতন্ত্র নির্মাণে দেশের জাতিগুলির শক্তি ও সুযোগ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপর সামাজিক মালিকানা ও শ্রমজীবী জনগণের জন্য প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মনুষ্যজাতির ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল।

সমাজতন্ত্রের শক্তির এক জাজ্জ্বল্যমান প্রকাশ ঘটেছিল দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জনে সোভিয়েত জনগণের ও তাঁদের সশস্ত্র বাহিনীর অমর শৌর্যমণ্ডিত কৃতিত্বের মধ্যে। এই জয় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাভূমিকে সুসংহত করেছিল এবং বিশ্ব জুড়ে সমাজতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র ও শান্তির শক্তিগুলি বৃদ্ধির নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।

তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রয়াস অব্যাহত রেখে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমজীবী জনগণ দেশের দ্রুত সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবিচল উন্নতি সুনিশ্চিত করেছেন। তাঁরা শ্রমিকশ্রেণী, যৌথ খামারের কৃষক ও জনগণের বুদ্ধিজীবীদের মৈত্রী এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জাতি ও অধিজাতির বন্ধুত্ব সুসংহত করেছেন। শ্রমিকশ্রেণী যেখানে নেতৃত্ব প্রদানকারী শক্তি সেই সোভিয়েত সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত ঐক্য অর্জিত হয়েছে। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের লক্ষ্যসমূহ পূরণ হবার পর সোভিয়েত রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে গোটা জনগণের রাষ্ট্র। সমগ্র জনগণের অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃভূমিকা বেড়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্মিত হয়েছে এক বিকাশপ্রাপ্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ। এই স্তরে, সমাজতন্ত্র যখন তার নিজ বনিয়াদের ওপরে বিকাশ লাভ করছে, তখন নতুন ব্যবস্থার সৃষ্টিশীল ও সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার সুবিধাগুলি ক্রমেই বেশি করে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে এবং শ্রমজীবী জনগণ ক্রমেই অধিকতর ব্যাপকভাবে তাঁদের বিরাট বৈপ্লবিক সাফল্যসমূহের সুফলগুলি উপভোগ করছেন।

এটি এমন এক সমাজ যেখানে প্রবল উৎপাদিকা শক্তি এবং অগ্রসর বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে জনগণের হিতব্যবস্থা নিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ব্যষ্টির সর্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে ক্রমশ বেশি পরিমাণে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে।

এটি হল পরিণত সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের সমাজ যেখানে সকল শ্রেণী ও সামাজিক বর্গের পরস্পরের সঙ্গে মিলনের মধ্যে তার সকল জাতি ও অধিজাতির আইনগত ও প্রকৃত সমানাধিকারের ও তাদের ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে এক নতুন ঐতিহাসিক জনগোষ্ঠী—সোভিয়েত জনগোষ্ঠী।

এটি হল শ্রমজীবী জনগণের, যাঁরা দেশভক্ত ও আন্তর্জাতিকতাবাদী, তাঁদের উচ্চ সাংগঠনিক সামর্থ্য, ভাবাদর্শগত দায়বদ্ধতা ও সচেতনতার এক সমাজ।

এটি এমন এক সমাজ যেখানে জীবনেরই নিয়ম হল একের কল্যাণের জন্য সকলের উদ্বেগ ও সকলের কল্যাণের জন্য প্রত্যেকের চিন্তা।

এটি প্রকৃত গণতন্ত্রের এমন এক সমাজ যার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সকল সামাজিক ব্যাপারের কার্যকরী পরিচালনা, রাষ্ট্র পরিচালনায় শ্রমজীবী জনগণের ক্রমেই অধিকতর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নাগরিকদের দায়-দায়িত্ব ও সমাজের প্রতি দায়িত্বের সঙ্গে তাঁদের প্রকৃত অধিকার ও স্বাধীনতার মিলন সুনিশ্চিত হয়েছে।

বিকাশপ্রাপ্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ কমিউনিজমের পথে এক স্বাভাবিক ও যুক্তিসম্মত স্তর।

একটি শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজের নির্মাণ সোভিয়েত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, যেখানে থাকবে সর্বসাধারণের, কমিউনিস্ট স্ব-শাসন। জনগণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্যগুলি হল: কমিউনিজমের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি রচনা করা, সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ককে ত্রুটিহীন করা ও একে কমিউনিস্ট সম্পর্কে রূপান্তরিত করা, কমিউনিস্ট সমাজের নাগরিককে গড়ে তোলা, জনগণের জীবনযাত্রার ও তাদের সাংস্কৃতিক মান উন্নীত করা, দেশের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করা এবং শান্তির সংহতিসাধন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকাশকে প্রবর্ধিত করা।

সোভিয়েত জনগণ,

বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের চিন্তাধারা দ্বারা চালিত হয়ে এবং তাঁদের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে,

সমাজতন্ত্রের বিরাট সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাপ্তিসমূহের উপর নির্ভর করে,

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে অধিকতর বিকশিত করতে চেষ্টিত থেকে,

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাভূমিকে বিবেচনার মধ্যে রেখে এবং তাঁদের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে,

১৯১৮ সালের প্রথম সোভিয়েত সংবিধানের, সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯২৪ সালের সংবিধানের ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৩৬ সালের সংবিধানের চিন্তাধারা ও নীতিসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে,

এতদ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজব্যবস্থা ও কর্মনীতির নীতিগুলিতে আনুগত্য জানাচ্ছে এবং নাগরিকদের অধিকার, স্বাধীনতা ও কর্তব্যসমূহকে এবং সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংগঠনের নীতিসমূহ ও লক্ষ্যসমূহকে সংজ্ঞায়িত করে এই সংবিধানে সেগুলিকে ঘোষণা করছে।

১. সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক কাঠামোর নীতিসমূহ ও কর্মনীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ—রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ধারা ১। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন গোটা জনগণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্র শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকসমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের, দেশের সবগুলি জাতি ও অধিজাতির শ্রমজীবী জনগণের ইচ্ছা ও স্বার্থকে ব্যক্ত করেছে।

ধারা ২। সোভিয়েত ইউনিয়নে সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত।

জনগণ রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন জনগণের ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির মাধ্যমে, যেগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক বনিয়াদ।

অন্য সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থা জনগণের ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তাদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

ধারা ৩। সোভিয়েত রাষ্ট্র সংগঠিত রয়েছে ও কাজ করছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসারে, অর্থাৎ ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতার সমস্ত কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত হবে, এগুলি জনগণের কাছে কৈফিয়ৎদানে বাধ্য থাকবে এবং নিম্নতর সংস্থাগুলি কর্তৃক উচ্চতর সংস্থাগুলির সিদ্ধান্ত পালন আবশ্যিক হবে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা স্থানীয় উদ্যোগ ও সৃষ্টিশীল কার্যকলাপের সঙ্গে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রীয় সংস্থার ও কর্মকর্তার ওপর ন্যস্ত কর্মভারের দায়িত্বের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মিলন ঘটায়।

ধারা ৪। সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং তার সবগুলি সংস্থা সমাজতান্ত্রিক আইনের ভিত্তিতে কাজ করে, আইন ও শৃংখলা সুনিশ্চিত করে এবং সমাজের স্বার্থ ও নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত করে।

রাষ্ট্রীয় ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ও কর্মকর্তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান ও সোভিয়েত আইনসমূহ মেনে চলবে।

ধারা ৫। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি দেশব্যাপী আলোচনার জন্য পেশ করা হবে এবং সমগ্র জনগণের ভোটে (গণভোট) দেওয়া হবে।

ধারা ৬। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত সমাজের নেতৃস্থানীয় ও পরিচালনাকারী শক্তি এবং এই সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সবগুলি রাষ্ট্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিউক্লিয়স। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব জনগণের জন্য এবং এই পার্টি জনগণকে সেবা করছে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার আয়ুধে সজ্জিত কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত সমাজের বিকাশের সাধারণ পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির সাধারণ গতিপথকে নির্ধারণ করে, সোভিয়েত জনগণের বিরাট রচনাত্মক কাজকে পরিচালনা করে এবং কমিউনিজমের জয়ের জন্য তাঁদের সংগ্রামকে এক পরিকল্পিত, প্রণালীবদ্ধ এবং তত্ত্বগতভাবে অটল চরিত্র দান করে।

সকল পার্টি সংগঠন সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে কাজ করবে।

ধারা ৭। ট্রেড ইউনিয়নগুলি, নিখিল-ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগ, সমবায়গুলি এবং অন্যান্য সংগঠনগুলি তাদের সংবিধিবদ্ধ লক্ষ্য অনুসারে রাষ্ট্রীয়, সরকারী ও সামাজিক ব্যাপারের পরিচালনায় এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সরকারি ও সামাজিক ব্যাপারের নিষ্পত্তিতে অংশগ্রহণ করে।

ধারা ৮। কাজের যৌথ সংস্থাগুলি রাষ্ট্রীয় ও সরকারী ব্যাপারের আলোচনা ও নিষ্পত্তিতে, উৎপাদন ও সমাজবিকাশের পরিকল্পনা রচনায়, কর্মীদলের প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত স্থানে নিয়োগে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ব্যবস্থাপনা, কাজের ও জীবনধারণের অবস্থার উন্নতি এবং উৎপাদন বিকশিত করার জন্য ও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য ও আর্থিক প্রণোদনার জন্য বরাদ্দ অর্থ ব্যবহার সম্পর্কিত ব্যাপারের আলোচনা ও নিষ্পত্তিতে অংশগ্রহণ করে।

কাজের যৌথ সংস্থাগুলি সমাজতান্ত্রিক সমকক্ষতার অভিযান, কাজের প্রগতিশীল পদ্ধতির প্রসার ও উৎপাদন শৃঙ্খলার শক্তিবৃদ্ধির আনুকূল্য করে, কমিউনিস্ট নৈতিকতার চেতনায় এদের সদস্যদের শিক্ষিত করে তোলে এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়াতে ও তাদের সাংস্কৃতিক মান, দক্ষতা ও গুণমান উন্নীত করতে চেষ্টা করে।

ধারা ৯। সোভিয়েত সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশে প্রধান গতিমুখ হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ, অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যাপারে পরিচালনায় নাগরিকদের ক্রমেই ব্যাপকতর অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রযন্ত্রের অব্যাহত উন্নতিসাধন, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মের মান ও বেগ বৃদ্ধি, জনগণের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি, রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের কাজের আইনগত ভিত্তির সংহতিসাধন, জনমতকে অধিকতর খোলা মনে গ্রহণ, এর প্রচার ও এর প্রতি নিয়ত সাড়া দেওয়ার মনোভাব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ধারা ১০। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বনিয়াদ হল রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি (সমগ্র জনগণের মালিকানাধীন), যৌথখামার ও অন্যান্য সমবায়মূলক সম্পত্তির আকারে উৎপাদনের উপায়সমূহের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা।

সমাজতান্ত্রিক মালিকানার আওতার মধ্যে আরও রয়েছে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ও অন্যান্য গণসংগঠনগুলির সম্পত্তি। নিজেদের নিয়মাবলী অনুসারে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য এই সংগঠনগুলির ঐ সম্পত্তি দরকার।

রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিকে রক্ষা করে এবং এর বৃদ্ধির অবস্থা সৃষ্টি করে।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক লাভের জন্য কিংবা অন্যবিধ স্বার্থপর উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিকে ব্যবহার করার অধিকার কারো নেই।

ধারা ১১। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি অর্থাৎ সোভিয়েত জনগণের এজমালি সম্পত্তি সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির প্রধান রূপ।

জমি, খনিজ সামগ্রী, জল ও বন রাষ্ট্রের একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি। শ্রমশিল্প, নির্মাণ ও কৃষিতে উৎপাদনের মৌল উপায়সমূহের; পরিবহণ ও যোগাযোগের উপায়গুলির; ব্যাংকগুলির; রাষ্ট্রচালিত বাণিজ্য ও জনকৃত্যকসমূহের ও অন্যান্য রাষ্ট্রচালিত প্রতিষ্ঠানের; শহরাঞ্চলের আবাসনের অধিকাংশের; এবং রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সম্পত্তির মালিক হল রাষ্ট্র।

ধারা ১২। যৌথ খামার ও অন্যান্য সমবায় সংগঠনগুলির এবং তাদের যুক্ত উদ্যোগগুলির সম্পত্তি হল তাদের সংবিধিবদ্ধ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনের উপায় ও অন্যান্য পরিসম্পদ।

যৌথ খামারগুলির জমি তাদের দেওয়া হয় অনির্দিষ্টকালের জন্য তাদের অবাধ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে।

রাষ্ট্র যৌথ খামার ও সমবায়মূলক সম্পত্তির বিকাশ এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানার সঙ্গে এর সন্নিকর্ষকে উৎসাহিত করে।

জমি ব্যবহারকারী অন্যান্যদের মতই যৌথ খামারগুলির কর্তব্য হল জমি কার্যকরভাবে ব্যবহার করা এর যত্ন নেওয়া ও এর উর্বরতা বাড়ানো।

ধারা ১৩। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকগণের ব্যক্তিভোগ্য সম্পত্তির ভিত্তি হল অর্জিত আয়। ব্যক্তিভোগ্য সম্পত্তির মধ্যে আরও থাকতে পারে দৈনন্দিন ব্যবহার্য ও ব্যক্তিগতভাবে ভোগ ও সুবিধার সামগ্রী, একটি ছোট জোতের স্বত্ব একটি বাড়ি ও অর্জিত সঞ্চয়। নাগরিকদের ব্যক্তিভোগ্য, সম্পত্তি এবং এর উত্তরাধিকারী হবার অধিকার রাষ্ট্রের দ্বারা রক্ষিত।

সহায়ক ক্ষুদ্র-জোতের জন্য (গবাদি পশু ও হাসমুরগি পালন সমেত), ফল ও সবজী ফলানোর জন্য অথবা নিজস্ব বসতির উদ্দেশ্যে গৃহনির্মাণের জন্য নাগরিকদের

আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে জমির প্লট ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। তাদের সহায়ক চাষের ব্যাপারে রাষ্ট্র ও যৌথখামার নাগরিকদের সাহায্য যোগায়।

নাগরিকদের মালিকানার বা ব্যবহারের সম্পত্তি অনর্জিত আয় করার উপায় হিসাবে প্রযুক্ত হবে না বা সমাজের স্বার্থের ক্ষতিসাধন করার জন্য নিযুক্ত হবে না।

ধারা ১৪। জনগণের শোষণমুক্ত শ্রম হল সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধির এবং জনগণের, প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিকের কল্যাণের উৎস।

রাষ্ট্র শ্রম ও ভোগের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে "প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে, প্রত্যেক তার কাজ অনুসারে পাবে"—সমাজতন্ত্রের এই নীতি অনুসারে। রাষ্ট্র করযোগ্য আয়ের ওপর করের হার নির্ধারণ করে।

সামাজিকভাবে দরকারী কাজ ও এর ফলাফল সমাজে একজন নাগরিকের মর্যাদা নির্ধারণ করে। বৈষয়িক ও নৈতিক প্রণোদনাকে মিলিয়ে, উদ্ভাবন ও কাজের প্রতি সৃষ্টিশীল মনোভাবকে উৎসাহিত করে রাষ্ট্র শ্রমকে প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিকের জীবনে সর্বপ্রধান প্রয়োজনে রূপান্তরিত করার পথ সুগম করে।

ধারা ১৫। সমাজতন্ত্রের অধীনে সামাজিক উৎপাদনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হল জনগণের ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক প্রয়োজনের সম্ভাব্য পূর্ণতম পরিতৃপ্তি।

শ্রমজীবী জনগণের সৃষ্টিশীল উদ্যোগের সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ও বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রগতির ওপর নির্ভর করে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার রূপ ও পদ্ধতি উন্নত করে রাষ্ট্র শ্রম উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি, উৎপাদনের দক্ষতার বৃদ্ধি ও কাজের গুণমানের উন্নতি এবং আর্থব্যবস্থার গতিময়, পরিকল্পিত ও আনুপাতিক বিকাশ সুনিশ্চিত করে।

ধারা ১৬। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের আর্থব্যবস্থা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডে সামাজিক উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের সবগুলি উপাদানকে নিয়ে একটি অখণ্ড অর্থনৈতিক সমাহার।

আর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয় শাখা ও আঞ্চলিক নীতিগুলিকে যথাযথ বিবেচনার মধ্যে রেখে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে এবং পৃথক ও মিলিত প্রতিষ্ঠানগুলির ও অন্যান্য সংগঠনের পরিচালনাগত স্বাধীনতা ও উদ্যোগের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদানকে মিলিয়ে। এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা-অ্যাকাউন্টিং, মুনাফা, পড়তা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ও প্রণোদনার সক্রিয় ব্যবহার করা হয়।

ধারা ১৭। সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন হস্তশিল্প, কৃষি, জনগণের দৈনন্দিন সেবামূলক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত শ্রম এবং নাগরিকদের ও তাদের পরিবারে সদস্যদের একেবারেই ব্যক্তিগত শ্রমভিত্তিক অন্যান্য ধরনের শ্রমের অনুমতি দেয়। এরূপ কাজ যাতে সমাজের স্বার্থ হাসিল করে রাষ্ট্র সেজন্য নিয়ম প্রণয়ন করে।

ধারা ১৮। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়নে জমি, খনিজ ও জল সম্পদ এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ রক্ষা করার ও যুক্তিযুক্তভাবে এগুলি ব্যবহার করার জন্য, বায়ু ও জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য, প্রাকৃতিক সম্পদের পুনরুৎপাদন সুনিশ্চিত করার জন্য এবং মানুষের পরিবেশ উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সামাজিক বিকাশ ও সংস্কৃতি

ধারা ১৯। সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক ভিত্তি হল শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের অটুট মৈত্রী।

রাষ্ট্র সমাজের সামাজিক সমসত্ত্বতা বাড়াবার, অর্থাৎ শ্রেণীগত পার্থক্য এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যেকার, মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য মুছে ফেলবার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সবগুলি জাতি ও অধিজাতিকে সর্বাঙ্গীনভাবে বিকাশিত করার ও পরস্পরের সঙ্গে মিলিত করার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ধারা ২০। "প্রত্যেকের অবাধ বিকাশ সকলের অবাধ বিকাশের শর্ত"—এই কমিউনিস্ট আদর্শ অনুসারে রাষ্ট্র নাগরিকদের পক্ষে তাদের সৃষ্টিশীল শক্তি সামর্থ্য ও প্রতিভা প্রয়োগ করার, সর্বতোভাবে তাদের ব্যক্তির বিকাশের অধিক থেকে অধিকতর প্রকৃত সম্ভাবনাসমূহ যোগাবার লক্ষ্য অনুসরণ করে।

ধারা ২১। রাষ্ট্র কাজের অবস্থা, নিরাপত্তা ও শ্রমিক-রক্ষা ব্যবস্থা ও কাজের বিজ্ঞানসম্মত সংগঠন উন্নত করার জন্য এবং উৎপাদনের বিশদ যন্ত্রীকরণ ও অটোমেশনের মাধ্যমে আর্থব্যবস্থার সকল শাখায় কষ্টসাধ্য কায়িক শ্রম হ্রাস করার ও শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করার জন্য উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করে।

ধারা ২২। সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষি কাজকে শিল্প শ্রমের একটি রকমফেরে পরিণত করার গ্রামীণ এলাকাগুলিতে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা, সেবামূলক ব্যবস্থা, হোটেল রেস্তোরা প্রভৃতি ও জনকৃত্যক প্রতিষ্ঠানগুলির জাল সম্প্রসারিত করার, এবং ছোট পল্লী ও গ্রামগুলিকে সুপরিকল্পিত ও সুব্যবস্থাযুক্ত উপনগরীতে রূপান্তরিত করার কর্মসূচী সুসঙ্গতভাবে রূপায়িত করা হচ্ছে।

ধারা ২৩। রাষ্ট্র উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের মজুরি স্তর ও প্রকৃত আয় বাড়াবার অবিচল কর্মনীতি অনুসরণ করছে।

সোভিয়েত জনগণের প্রয়োজন পূর্ণতররূপে মেটাবার উদ্দেশ্যে সামাজিক ভোগ তহবিল সৃষ্টি করা হয়। গণপ্রতিষ্ঠানগুলি ও কাজের সমষ্টি সংস্থাগুলির ব্যাপক অংশগ্রহণের সাহায্যে রাষ্ট্র এই তহবিলের বৃদ্ধি ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টন সুনিশ্চিত করে।

ধারা ২৪। সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বাস্থ্যরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, ব্যবসায় ও জনগণকে আহার্য সরবরাহকরণ, পৌরব্যবস্থা ও তার সুবিধাগুলি ও জনকৃত্যকসমূহের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কাজ করছে ও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

রাষ্ট্র জনগণকে সেবা করার ব্যাপারে সমবায় ও অন্যান্য জন-প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করছে। রাষ্ট্র গণ-শরীরচর্চা ও খেলাধুলার বিকাশকে উৎসাহিত করছে।

ধারা ২৫। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমরূপ জনশিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে এবং একে নিয়ত উন্নত করা হচ্ছে। রাষ্ট্র নাগরিকদের সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে, তরুণতরুণীদের কমিউনিস্ট ভাবধারায় শিক্ষা এবং বৌদ্ধিক ও দৈহিক বিকাশের সহায়তা করছে, কাজ ও সামাজিক তৎপরতার জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

ধারা ২৬। সমাজের প্রয়োজন অনুসারে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিকল্পিত বিকাশ ও বিজ্ঞানকর্মীদের প্রশিক্ষণের সংস্থান করছে এবং আর্থব্যবস্থায় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফলের প্রয়োগকে সংগঠিত করছে।

ধারা ২৭। সোভিয়েত জনগণের নৈতিক ও নান্দনিক শিক্ষার জন্য, তাদের সাংস্কৃতিক মান বাড়াবার জন্য রাষ্ট্র সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহ রক্ষা করার, বাড়াবার ও এগুলির ব্যাপক ব্যবহারের কাজে নিজেকে লিপ্ত করছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে পেশাদার, শখের ও লোকশিল্পকলার বিকাশকে সর্বতোভাবে উৎসাহ যোগানো হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—বৈদেশিক নীতি

ধারা ২৮। সোভিয়েত ইউনিয়ন সুসঙ্গতভাবে শান্তির লেনিনবাদী কর্মনীতি অনুসরণ করছে এবং জাতিসমূহের নিরাপত্তার শক্তিবৃদ্ধি ও প্রশস্ত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পক্ষে দাঁড়াচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য হল সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজম নির্মাণ করার অনুকূল আন্তর্জাতিক অবস্থা সুনিশ্চিত করা, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করা, বিশ্ব সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাভূমি শক্তিশালী করা, জাতীয় মুক্তি ও সমাজ প্রগতির জন্য জাতিগুলির সংগ্রামকে সমর্থন করা, আগ্রাসী যুদ্ধ নিবারণ করা, সর্বজনীন ও সামূহিক নিরস্ত্রীকরণ অর্জন করা এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি সুসঙ্গতভাবে রূপায়িত করা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যুদ্ধপ্রচার নিষিদ্ধ।

ধারা ২৯। অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের ভিত্তি নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর স্থাপিত: সার্বভৌম সমানাধিকার; বলপ্রয়োগ বা তার হুমকি পারস্পরিকভাবে পরিহার, সীমান্তসমূহের অলঙ্ঘনীয়তা, রাষ্ট্রসমূহের ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা; বিরোধসমূহের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা; অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে

অ-হস্তক্ষেপ ; মানব অধিকার ও মৌল স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা ; জাতিসমূহের সমানাধিকার ও নিজ ভাগ্য নির্ধারণ করার অধিকার ; রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক আইনের সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত নীতি ও নিয়ম এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি থেকে উদ্ভূত দায়দায়িত্ব অকপট বিশ্বাসে পালন ;

ধারা ৩০। বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার, সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অংশ হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও কমরেডসুলভ পারস্পরিক সহযোগিতা প্রবর্ধিত ও শক্তিশালী করছে এবং অর্থনৈতিক সংহতিতে ও আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি রক্ষা

ধারা ৩১। সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি রক্ষা রাষ্ট্রের এক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং সমগ্র জনগণের চিন্তার বিষয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে এবং সর্বজনীন সামরিক শিক্ষা ও সৈন্যদলে ভর্তিকরণ প্রবর্তিত হয়েছে সমাজতন্ত্রের প্রাপ্তিসমূহ, সোভিয়েত জনগণের শান্তিপূর্ণ শ্রম, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমিকে রক্ষা করার সুনিশ্চয়তা যে কোন আগ্রাসককে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাঘাত হানার গ্যারান্টিযুক্ত নিয়ত যুদ্ধার্থ প্রস্তুতি বজায় রাখা জনগণের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সশস্ত্র বাহিনীর কর্তব্য।

ধারা ৩২। রাষ্ট্র দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সামর্থ্য সুনিশ্চিত করছে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু সোভিয়েত ইউনিয়নের সশস্ত্র বাহিনীকে যোগাচ্ছে।

দেশের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার ও প্রতিরক্ষা সামর্থ্য সুদৃঢ় করার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির, গণ-প্রতিষ্ঠানগুলির, সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিকদের কর্তব্যসমূহ সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন দ্বারা নির্ধারণ করা হয়।

২. রাষ্ট্র ও ব্যক্তি

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকত্ব, নাগরিকদের সমানাধিকার

ধারা ৩৩। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নে সমরূপ ফেডারেল নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক নাগরিক সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক।

সোভিয়েত নাগরিকত্ব অর্জন করার বা হারাবার কারণসমূহ ও পদ্ধতি সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকত্বের আইনের দ্বারা সুনির্দিষ্ট হয়।

বিদেশে থাকাকালীন অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকরা সোভিয়েত রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়তা লাভ করেন।

ধারা ৩৪। জন্ম, সামাজিক ও সম্পত্তিগত মর্যাদা, জাতি বা অধিজাতি, নারী পুরুষ, শিক্ষা, ভাষা, ধর্মের প্রতি মনোভাব, পেশার ধরন বা প্রকৃতি, বাসস্থান বা অন্যান্য বিষয় নির্বিশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের সমান অধিকার সংরক্ষিত।

ধারা ৩৫। সোভিয়েত ইউনিয়নে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার রয়েছে।

এই অধিকারের প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয় শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণে, কর্মসংস্থান, উপার্জন ও পদোন্নতিতে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে নারীদের পুরুষের সমান সুযোগদানের দ্বারা এবং নারীদের শ্রম ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থাদির দ্বারা, মায়েরা যাতে কাজ করতে পারেন তদুপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা, মায়েদের ও গর্ভবতী মায়েদের সবেতন ছুটি ও অন্যান্য সুযোগসুবিধাদি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সহ মায়েদের কাজের ঘণ্টা ক্রমান্বয়ে হ্রাসকরণ প্রভৃতি উপায়ে মাতা ও শিশুদের বৈষয়িক ও নৈতিক সহায়তা প্রদান ও আইনগত সংরক্ষণের দ্বারা।

ধারা ৩৬। বিভিন্ন জাতি-অধিজাতির মানুষ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-সমূহের ইউনিয়নের নাগরিকদের সমানাধিকার রয়েছে।

এই অধিকারের প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সবগুলি জাতি ও অধিজাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও সেই সব জাতি-অধিজাতিকে পারস্পরিকভাবে কাছে নিয়ে আসার নীতির দ্বারা, সোভিয়েত দেশাত্মবোধ ও সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের চেতনায় নাগরিকদের শিক্ষিত করার দ্বারা এবং তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য জাতির ভাষা শিক্ষা ও ব্যবহারের সুযোগদানের দ্বারা।

জাতি বা অধিজাতিগত কারণে নাগরিকদের অধিকারসমূহের যেকোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংকোচন, কিংবা তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিশেষ সুবিধা প্রতিষ্ঠা এবং জাতি বা অধিজাতিগত স্বতন্ত্রতা, বৈরিতা বা অবমাননার পক্ষে যেকোন রকম ওকালতি আইনের দ্বারা শাস্তিযোগ্য।

ধারা ৩৭। সোভিয়েত ইউনিয়নে অন্যান্য দেশের নাগরিক এবং কোন রাষ্ট্রের নাগরিক নয় এমন ব্যক্তিদের আইনের সংস্থান মোতাবেক অধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চিতি রয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে আইনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অন্যান্য যেসব অধিকার দেওয়া আছে সেগুলির রক্ষায় আদালতে ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংস্থায় আবেদন করার অধিকার।

সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকাকালীন অন্যান্য দেশের নাগরিক ও কোন রাষ্ট্রের নাগরিক নয় এমন ব্যক্তিরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানকে সম্মান জানাতে ও সোভিয়েত আইনসমূহ মেনে চলতে বাধ্য।

ধারা ৩৮। শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ ও শান্তির আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য, কিংবা বৈপ্লবিক ও জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য, কিংবা প্রগতিশীল সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন প্রকার সৃষ্টিশীল কাজকর্মের জন্য নির্যাতিত বিদেশী নাগরিকদের সোভিয়েত ইউনিয়ন আশ্রয় লাভের অধিকার দেয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের মৌল অধিকার, স্বাধীনতা ও কর্তব্য

ধারা ৩৯। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকরা, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান ও সোভিয়েত আইনসমূহে ঘোষিত ও গ্যারান্টিকৃত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের পুরোপুরি অধিকারী। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের সম্প্রসারণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের কর্মসূচী পূরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁদের জীবন-যাপনের অবস্থার অবিরাম উন্নতিবিধান সুনিশ্চিত করে।

নাগরিকরা তাঁদের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের প্রয়োগ কোনমতেই এমনভাবে করতে পারবেন না যার দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং অন্যান্য নাগরিকদের অধিকারের ক্ষতি হয়।

ধারা ৪০। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের কাজ পাবার অধিকার রয়েছে (অর্থাৎ তাঁদের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী বেতন ও চাকুরির গ্যারান্টি এবং যা রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম পারিশ্রমিকের কম হবে না)। সমাজের চাহিদাকে হিসাবে ধরে নাগরিকদের প্রবণতা, দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও বিদ্যা অনুযায়ী কাজ বা বৃত্তি বেছে নেবার অধিকার এর অন্তর্ভুক্ত।

এই অধিকার সুনিশ্চিত হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির অবিচল বৃদ্ধি, বিনা ব্যয়ে বৃত্তিগত ও পেশাগত প্রশিক্ষণলাভ, দক্ষতার উন্নতিসাধন, নতুন নতুন বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ এবং বৃত্তিগত পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও যথাযথ কর্মে নিয়োগের দ্বারা।

ধারা ৪১। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের বিশ্রাম ও অবসর যাপনের অধিকার রয়েছে।

এই অধিকার সুনিশ্চিত করা হয় শ্রমশিল্প, অফিস ও বিভিন্ন পেশার কর্মীদের জন্য অনধিক ৪১ ঘণ্টা কাজের সপ্তাহ, একাধিক বৃত্তি ও পেশার জন্য হ্রাসপ্রাপ্ত কাজের দিন এবং রাতে হ্রাসপ্রাপ্ত কাজের ঘণ্টা প্রবর্তন করে ; বার্ষিক সবেতন ছুটি ও সাপ্তাহিক বিশ্রামের দিনের সংস্থান করে এবং সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও স্বাস্থ্যচর্চার প্রতিষ্ঠানগুলির আরও সম্প্রসারণ করে এবং ব্যাপক আকারে খেলা-ধুলা শারীরিক শিক্ষা, পর্যটনের বিকাশ ঘটিয়ে ; আবাসিক নীতির ভিত্তিতে বিশ্রামের অনুকূল সুযোগ ও অবসর সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহারের অন্যান্য ব্যবস্থার সংস্থান করে।

যৌথ খামারীদের কাজের সময় এবং বিশ্রাম ও অবসরের স্থিতিকাল সাব্যস্ত হয় সংশ্লিষ্ট যৌথ খামারগুলির দ্বারা।

ধারা ৪২। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের স্বাস্থ্যনিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

এই অধিকার সুনিশ্চিত করা হয় রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক বিনাব্যয়ে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা, শিল্পে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিধির উন্নতিবিধান, মেডিক্যাল ও স্বাস্থ্য গঠন প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাপক সম্প্রসারণের দ্বারা, ব্যাপক রোগ নিবারণমূলক ব্যবস্থাদি ও পরিবেশের উন্নতিসাধনের ব্যবস্থাদির দ্বারা; উদীয়মান প্রজন্মের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন প্রদর্শন ও শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণের দ্বারা; ব্যাধির প্রকোপ নিবারণ ও হ্রাস করার এবং নাগরিকদের দীর্ঘ সক্রিয় জীবন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যাভিমুখে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরও অগ্রসর করার দ্বারা।

ধারা ৪৩। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের বৃদ্ধ বয়সে; পীড়িত হয়ে পড়লে এবং সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অশক্ত হলে কিংবা প্রধান উপার্জনকারীর মৃত্যু ঘটলে ভরণপোষণ পাবার অধিকার রয়েছে।

এই অধিকারের নিশ্চিতি দেওয়া হয়, শ্রমশিল্প, অফিস ও বিভিন্ন পেশা শ্রমিকদের ও যৌথ খামারীদের সামাজিক বীমার দ্বারা বার্ধক্য ও অশক্ততাজনিত পেনসন, উপার্জনকারীর মৃত্যুর দরুন পেনসন ও সাময়িক অশক্ততার দরুন ভাতা প্রদানের দ্বারা; আংশিকভাবে অশক্ত নাগরিকদের কর্মসংস্থানের দ্বারা; পরিজন-হীন বৃদ্ধ ও অশক্ত নাগরিকদের জন্য যত্নের ব্যবস্থা ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা-বিধানের ব্যবস্থার দ্বারা।

ধারা ৪৪। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের আবাসনের অধিকার রয়েছে।

এই অধিকার সুনিশ্চিত করা হয় রাষ্ট্রীয় ও সর্বসাধারণের আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রক্ষণের, সমবায়মূলক ও ব্যক্তিগত গৃহনির্মাণে সহায়তার, গৃহনির্মাণের কর্মসূচী রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লভ্য বাসগৃহের সরকারী নিয়ন্ত্রণে বণ্টনের এবং অনুরূপভাবে স্বল্প ভাড়ার ও স্বল্পব্যয়ে সেবামূলক সুযোগাদি লাভের ব্যবস্থার দ্বারা। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের অবশ্যই এইসব বিলি-করা বাসগৃহের উপযুক্ত যত্ন নিতে হবে।

ধারা ৪৫। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের শিক্ষা পাবার অধিকার রয়েছে।

এই অধিকার সুনিশ্চিত করা হয় সকল ধরনের অবৈতনিক শিক্ষা, সর্বজনীন আবশ্যিক মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দ্বারা, জীবন ও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত বৃত্তিগত, মাধ্যমিক বিশেষীকৃত ও উচ্চতর শিক্ষার ব্যাপক বিকাশের দ্বারা; ডাকযোগে ও সান্ধ্য শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার বিকাশের দ্বারা; রাষ্ট্র কর্তৃক বিদ্যালয় ও তার ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদানের দ্বারা; বিনামূল্যে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের দ্বারা, বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগের দ্বারা; আত্মশিক্ষা অর্জনের সুযোগ সুবিধাদি প্রদানের ব্যবস্থার দ্বারা।

ধারা ৪৬। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের সাংস্কৃতিক সুযোগসুবিধা ভোগের অধিকার আছে।

রাষ্ট্রীয় ও সাধারণ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত স্বদেশের ও বিশ্বের সাংস্কৃতিক সম্পদ উপভোগের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির দ্বারা, সারা দেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সুষম বণ্টন ও বিকাশের দ্বারা, টেলিভিশন ও রেডিওর বিকাশের দ্বারা, পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকার মুদ্রণের বিকাশের দ্বারা, দেশজোড়া অসংখ্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার দ্বারা এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্প্রসারণের দ্বারা সেই অধিকার ভোগ সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

ধারা ৪৭। কমিউনিজম গড়ে তোলার লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকরা বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও শিল্পকর্মের স্বাধীনতা ভোগ করেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্প্রসারণ, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে উৎসাহ প্রদান এবং সাহিত্য ও শিল্পকলা বিকাশের দ্বারা এই স্বাধীনতা সুনিশ্চিত। তার জন্য রাষ্ট্র যথোপযুক্ত বৈষয়িক অবস্থা সৃষ্টি এবং শিল্পকলার কর্মীদের স্বেচ্ছাব্রতী সমিতিগুলিকে সমর্থন করে এবং উৎপাদন ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আবিষ্কার ও উদ্ভাবন প্রবর্তনের ব্যবস্থা করে।

লেখক, আবিষ্কারক ও উদ্ভাবকদের অধিকারসমূহ রাষ্ট্র কর্তৃক রক্ষিত।

ধারা ৪৮। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকরা রাষ্ট্রীয় ও সর্বসাধারণের বিষয়গুলির ব্যবস্থাপনায় এবং পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার অধিকারী। তাঁরা স্থানীয় এবং সর্ব ইউনিয়ন তাৎপর্যপূর্ণ যে কোন ব্যবস্থা ও আইন প্রণয়ন এবং তৎসংক্রান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণেরও অধিকারী।

জনগণের ডেপুটিদের সোভিয়েত এবং অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থায় নির্বাচিত হবার এবং ভোট প্রদানের সুযোগ, দেশব্যাপী আলোচনা ও গণভোটে, রাষ্ট্রীয় সংস্থা, গণসংগঠন এবং স্থানীয় জনপদ গোষ্ঠীর কাজে এবং কর্মস্থল ও বাসস্থানের সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভের দ্বারা এই অধিকার সুনিশ্চিত।

ধারা ৪৯। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও গণ-প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে তাদের কাজকর্ম উন্নত করার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করার, এগুলির কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করার অধিকার আছে। আইন দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাগরিকদের বিভিন্ন প্রস্তাব ও অনুরোধ পরীক্ষা করে দেখতে, তাদের জবাব পাঠাতে ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারী কর্মকর্তারা বাধ্য।

সমালোচনার জন্য হয়রানি করা নিষিদ্ধ। এই ধরনের হয়রানির জন্য দোষী ব্যক্তিরা জবাবদিহিতে বাধ্য।

ধারা ৫০। জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার এবং তার বিকাশ ঘটাবার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের, সমাবেশের, সভা-সমিতির, রাস্তায় মিছিলের ও ও বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা গ্যারান্টিকৃত। এইসব রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োগ

সুনিশ্চিত করা হয়েছে শ্রমজীবী জনগণের ও তাঁদের গণসংগঠনগুলির হেফাজতে সরকারী ভবন, রাস্তা ও চক ছেড়ে দিয়ে ব্যাপকভাবে তথ্যাদি প্রচার করে, এবং সংবাদ-পত্র, বেতার ও টেলিভিশন ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে।

ধারা ৫১। কমিউনিজম নির্মাণের লক্ষ্য অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও উদ্যোগের বিকাশের ও তাদের নানা বিষয়ে আগ্রহ পূরণের উদ্দেশ্যে গণ-সংগঠন গুলিতে একত্রিত হবার অধিকার রয়েছে।

গণ-সংগঠনগুলির তাদের বিধিবদ্ধ কাজকর্ম সার্থকভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের গ্যারান্টি থাকছে।

ধারা ৫২। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত নাগরিকেরই রয়েছে বিবেকের স্বাধীনতা, অর্থাৎ যে কোনও ধর্ম মানার এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ সম্পাদনের অধিকার, অথবা কোন ধর্ম না মানার এবং নিরীশ্বরবাদী প্রচার চালানোর অধিকারের গ্যারান্টি। ধর্মীয় ভিত্তিতে শত্রুতা ও বিদ্বেষের প্ররোচনা সৃষ্টি সোভিয়েত ইউনিয়নে নিষিদ্ধ।

সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্র থেকে গীর্জা এবং গীর্জা থেকে বিদ্যালয় পৃথকীকৃত।

ধারা ৫৩। পরিবারকে রক্ষা করে রাষ্ট্র।

বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় পাত্র-পাত্রীর স্বাধীন সম্মতির ভিত্তিতে। পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী সম্পূর্ণ সমান অধিকার ভোগী।

একটা ব্যাপক শিশুমঙ্গল ব্যবস্থার প্রবর্তন ও বিকাশ সাধন, সমাজ সেবা ও সর্বজনীন ভোজনাগার সংগঠন ও তার উন্নতিবিধান, সন্তান জন্মের জন্য প্রসূতি-ভাতা ও শিশু ভাতা প্রদান, বৃহৎ পরিবারের জন্য নানা সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য নানা ধরনের পরিবার-ভাতা ও সহায়তার দ্বারা রাষ্ট্র পরিবারকে সাহায্য করে।

ধারা ৫৪। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের ব্যক্তিগত অধিকারের অলঙ্ঘনীয়তার গ্যারান্টি থাকবে। আদালতের সিদ্ধান্ত বা প্রকিউরেটরের হুলিয়া ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না।

ধারা ৫৫। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের বাসগৃহের অলঙ্ঘনীয়তার গ্যারান্টি রয়েছে। আইনসঙ্গত কারণ ছাড়া গৃহস্থের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তার বাসগৃহে প্রবেশ করতে পারে না।

ধারা ৫৬। নাগরিকদের ব্যক্তিক এবং তাদের চিঠিপত্রের, টেলিফোনে কথাবার্তার ও টেলিগ্রাফ বার্তার গোপনীয়তা আইনের সাহায্যে সুরক্ষিত।

ধারা ৫৭। সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থা, সরকারী প্রতিষ্ঠান, এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কর্তব্য হচ্ছে ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা এবং নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।

সোভিয়েত নাগরিকরা তাঁদের সম্মান ও সুনাম, জীবন ও স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে প্রতিকার প্রার্থনার অধিকারী।

ধারা ৫৮। অফিসার, রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও সরকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের অবলম্বিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের নালিশ জানানোর অধিকার রয়েছে। আইনানুগ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগগুলি বিচার করা হবে।

কর্মকর্তারা তাদের ওপর ন্যস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়ে নাগরিকদের অধিকারে হস্তক্ষেপের দ্বারা আইন লঙ্ঘন করে কোনও কাজ করলে আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আদালতে আপীল করা যাবে।

রাষ্ট্রীয় ও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনও বেআইনী কাজের দরুন বা সরকারী কর্মকর্তাদের কর্তব্য সম্পাদনকালে কোন বেআইনী কর্মানুষ্ঠানের দরুন যে ক্ষতি হবে তার জন্য সোভিয়েত নাগরিকরা ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী।

ধারা ৫৯। নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা প্রয়োগ এবং তাঁদের দায়দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদন অবিচ্ছেদ্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান ও সোভিয়েত আইনসমূহ মেনে চলতে, সমাজতান্ত্রিক আচরণের বিধি মেনে চলতে, সোভিয়েত নাগরিকতার সম্মান ও মর্যাদা উর্ধ্বে তুলে ধরতে বাধ্য।

ধারা ৬০। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেক সক্ষম নাগরিকের তাঁর স্বনির্বাচিত সামাজিকভাবে হিতকারী পেশায় বিবেকসম্পন্ন মনোভাব নিয়ে কাজ করা এবং শ্রম শৃঙ্খলা কঠোরভাবে পালন করা কর্তব্য। সামাজিকভাবে হিতকারী কাজ এড়ানো সমাজতান্ত্রিক সমাজের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ধারা ৬১। সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির সুরক্ষণ করতে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকরা বাধ্য। রাষ্ট্রের ও সামাজিক মালিকানার সম্পত্তি আত্মসাৎ ও নষ্ট করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং জনগণের সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের কর্তব্য।

যারা সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির ওপর অনধিকার হস্তক্ষেপ করবে তারা আইন অনুসারে দণ্ডিত হবে।

ধারা ৬২। সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করা, তার শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা সোভিয়েত নাগরিকদের অবশ্য কর্তব্য।

সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমিকে রক্ষা করা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য।

মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা জনগণের বিরুদ্ধে চরমতম অপরাধ।

ধারা ৬৩। সোভিয়েত ইউনিয়নের সশস্ত্র বাহিনীতে সৈনিক হিসাবে যোগদান করে তার সেবা করা সোভিয়েত নাগরিকের সম্মানজনক কর্তব্য।

ধারা ৬৪। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য হচ্ছে অন্যান্য নাগরিকের জাতীয় মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং বহুজাতিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের জাতি ও অধিজাতসমূহের মৈত্রী সুদৃঢ় করা।

ধারা ৬৫। অন্যান্য ব্যক্তির অধিকার ও আইনসম্মত স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, অ-সামাজিক আচরণ সহ্য না করা, জন-শৃংখলা বজায় রাখতে সহায়তা করা সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের অবশ্য কর্তব্য।

ধারা ৬৬। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের অবশ্য করণীয় কাজ হচ্ছে তাদের শিশুদের লালন-পালন করা, শিশুদের সামাজিকভাবে হিতকারী কাজের জন্য তৈরি করে দেওয়া, সমাজতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সদস্য হিসাবে তাদের গড়ে তোলা। পিতামাতার প্রতি যত্নবান হওয়া এবং তাদের সাহায্য করাও শিশুদের অবশ্য কর্তব্য।

ধারা ৬৭। প্রকৃতি সংরক্ষণ করা, তার সম্পদসমূহ রক্ষা করা সোভিয়েত ইউ-নিয়নের নাগরিকদের অবশ্য কর্তব্য।

ধারা ৬৮। ঐতিহাসিক স্মারকসৌধ এবং ঐতিহাসিক মূল্যসমন্বিত অন্যান্য বস্তু সংরক্ষণের আগ্রহ প্রদর্শন সোভিয়েত নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ধারা ৬৯। অন্যান্য দেশের জনসমষ্টির সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা আরো বাড়িয়ে তোলা, বিশ্ব শান্তি অক্ষুণ্ন রাখা ও সংহত করা সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকের আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য।

৩. সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের জাতীয়-রাষ্ট্র কাঠামো

অষ্টম পরিচ্ছেদ—সোভিয়েত ইউনিয়ন—একক ফেডারেল রাষ্ট্র

ধারা ৭০। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন জাতিসমূহের অবাধ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সমানাধিকারসম্পন্ন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের স্বেচ্ছাকৃত সম্মিলনের ফলে সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এক অখণ্ড, ফেডারেল, বহুজাতিক রাষ্ট্র।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সোভিয়েত জনগণের রাষ্ট্রীয় ঐক্য মূর্ত এবং সম্মিলিতভাবে কমিউনিজম নির্মাণের জন্য তা সমস্ত জাতি ও অধিজাতিকে একত্র করছে।

ধারা ৭১। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,
ইউক্রাইনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,
বিয়েলোরুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,
উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,
কাজাখ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,
জর্জীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,
আজেরবাইজানীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,
লিথুয়ানীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,

মোলদাভীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,
লাতভীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,
কিরঘিজ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,
তাজিক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,
আর্মেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,
তুর্কমেন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,
এস্তোনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

ধারা ৭২। প্রত্যেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রেরই অবাধে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার থাকছে।

ধারা ৭৩। চূড়ান্ত প্রাধিকার ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এক্তিয়ার হচ্ছে ঃ

১। সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তি, অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে নতুন স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র এবং নতুন স্বয়ংশাসিত অঞ্চল গঠনের অনুমোদন ;

২। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্ধারণ এবং অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলির সীমানার পরিবর্তন অনুমোদন ;

৩। রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসনের প্রজাতন্ত্রীয় ও স্থানীয় প্রাধিকার সংগঠন ও কর্মপরিচালনার জন্য সাধারণ নীতি প্রতিষ্ঠা ;

৪। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডের সর্বত্র আইন সংক্রান্ত বিধানসমূহের একরূপতা প্রতিষ্ঠা এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের আইন প্রণয়নের মৌল নীতি প্রতিষ্ঠা ;

৫। সমরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মনীতি অনুসরণ করা ; দেশের আর্থব্যবস্থা পরিচালনা ; বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী অগ্রগতির প্রধান গতিমুখগুলি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তসঙ্গত ব্যবহার ও সংরক্ষণের সাধারণ নীতি নির্ধারণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পরিকল্পনাসমূহ রচনা ও অনুমোদন এবং সেগুলির পূরণ সংক্রান্ত রিপোর্ট অনুমোদন।

৬। সোভিয়েত ইউনিয়নের একীকৃত রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা এবং তা কার্যকর করার রিপোর্ট অনুমোদন ; এক অখণ্ড অর্থ ও ক্রেডিট ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা ; কর ও রাজস্ব স্থির করে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাজেট রচনা করা এবং দ্রব্যমূল্য ও বেতন নীতি নির্ধারণ।

৭। সারা-ইউনিয়নের এক্তিয়ারভুক্ত আর্থব্যবস্থার শাখা, সমিতি ও প্রতিষ্ঠানগুলির পথনির্দেশ করা ; অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের এক্তিয়ারভুক্ত শিল্পগুলির সাধারণ পথনির্দেশ করা ;

৮। যুদ্ধ ও শান্তি, সোভিয়েত ইউনিয়নের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রের সীমানা ও ভূখণ্ড রক্ষা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠন ও সশস্ত্র বাহিনী পরিচালনার বিষয়সমূহ ;

৯। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ;

১০। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব ; বিদেশী রাষ্ট্রগুলির ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক ; অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলির সঙ্গে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির সম্পর্কের সাধারণ পদ্ধতি প্রবর্তন এবং সেই সম্পর্কের সমন্বয়সাধন ; রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকারের ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও অন্যান্য বৈদেশিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড পরিচালনা ;

১১। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান পালন সংক্রান্ত বিষয় তত্ত্বাবধান, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের সঙ্গে অঙ্গ প্রজাতন্ত্রসমূহের সংবিধানের সঙ্গতি বিধান ;

১২। সারা ইউনিয়নের পক্ষে গুরুত্বসম্পন্ন অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা।

ধারা ৭৪। সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনসমূহ সমস্ত অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের ভূখণ্ডেই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের আইন ও সারা ইউনিয়ন আইনের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখা গেল সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনই কার্যকর হবে।

ধারা ৭৫। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের ভূখণ্ড এক ও অবিভাজ্য এবং অঙ্গ প্রজাতন্ত্রসমূহের এলাকা তার অন্তর্গত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সার্বভৌমত্ব তার সমগ্র ভূখণ্ড জুড়ে বিরাজ করবে।

নবম পরিচ্ছেদ : অঙ্গ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র

ধারা ৭৬। অঙ্গ প্রজাতন্ত্র হল এমন একটি সার্বভৌম সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যা সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নে অন্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির সঙ্গে একত্রে মিলিত হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনেয়নের সংবিধানের ৭৩ ধারায় নির্ধারিত ক্ষেত্রগুলির বাইরে অঙ্গ প্রজাতন্ত্র তার ভূখণ্ডে স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব খাটায়।

অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের নিজস্ব সংবিধান আছে, তা সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যও তার মধ্যে প্রতিফলিত।

ধারা ৭৭। অঙ্গ প্রজাতন্ত্রসমূহ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারে এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের অন্যান্য সংস্থায় অংশগ্রহণ করছে।

অঙ্গ প্রজাতন্ত্র নিজস্ব এলাকায় সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ সুনিশ্চিত করবে, সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতা প্রয়োগের পথ সুগম

করবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের চূড়ান্ত প্রাধিকার ও প্রশাসনের সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করবে।

নিজস্ব ব্যাপারে অঙ্গ প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের আপন অধীনস্থ উদ্যোগ, সংস্থা ও সংগঠনসমূহের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।

ধারা ৭৮। অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের সম্মতি ছাড়া তার ভৌগলিক এলাকা বদলানো হবে না। সংশ্লিষ্ট প্রজাতন্ত্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে তাদের সীমানা বদলানো যেতে পারে এবং তা সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।

ধারা ৭৯। অঙ্গ প্রজাতন্ত্র তার ভূখণ্ডকে এলাকা, অঞ্চল, জেলা ইত্যাদিতে বিভাগ করবে এবং তার প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক এলাকাগত কাঠামো সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ;

ধারা ৮০। বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার, তাদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, কূটনৈতিক ও কনস্যুলার প্রতিনিধি বিনিময়ের এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের কাজকর্মে অংশগ্রহণের অধিকার অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের থাকছে।

ধারা ৮১। অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলির সার্বভৌম অধিকারসমূহ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন রক্ষা করবে ;

দশম পরিচ্ছেদ : স্বয়ংশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র

ধারা ৮২। স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র (অটোনমাস রিপাবলিক) অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের অংশ।

যে সমস্ত ক্ষেত্র সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের এবং অঙ্গ প্রজাতন্ত্রসমূহের এক্তিয়ারভুক্ত নয়, সেইসব ক্ষেত্রে নিজস্ব এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র তার কাজকর্ম চালাবে।

স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের নিজস্ব সংবিধান থাকবে। সেই সংবিধান হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তাতে স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিফলিত হবে।

ধারা ৮৩। স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলির এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে যথাক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়নের ও অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় প্রাধিকার ও প্রশাসনিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছে।

স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র তার ভৌগোলিক এলাকায় সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ সাধন সুনিশ্চিত করবে এবং তার এলাকা সোভিয়েত ইউনিয়নের ও অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলি কর্তৃত্ব প্রয়োগের ব্যাপারে সহায়ক হবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রক্ষমতার সংস্থা ও প্রশাসনের সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করবে।

নিজস্ব এক্তিয়ারভুক্ত ব্যাপারে স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন অথবা অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের অধীনস্থ উদ্যোগ, সংস্থা ও সংগঠনসমূহের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।

ধারা ৮৪। স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের সম্মতি ছাড়া তার ভৌগোলিক এলাকা বদলানো হবে না।

ধারা ৮৫। রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত থাকছে নিম্নলিখিত স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলি ঃ বাশ্কির, বুরিয়াৎ, দাঘেস্তান, কাবার্দিন-বালকার, কালমিক, কারেলিয়ান, কোমি, মারি, মোর্দোভীয়, উত্তর ওসেতীয়, তাতার, তুভা, উদ্‌মুর্ত, চেচেন-ইনগাশ, চুভাস, এবং ইয়াকুৎ।

উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকছে কার-কালপাক স্বয়ংশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

জর্জীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকছে আবখাজীয় এবং আজারীয় স্বয়ংশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

আজেরবাইজান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকছে নাখিচেভান স্বয়ংশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ স্বয়ংশাসিত অঞ্চল ও স্বয়ংশাসিত এলাকা

ধারা ৮৬। স্বয়ংশাসিত অঞ্চল অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের বা টেরিটোরির অংশ। সংশ্লিষ্ট স্বয়ংশাসিত অঞ্চলের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ডেপুটিদের সোভিয়েত প্রস্তাব পেশ করলে অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েতে স্বয়ংশাসিত অঞ্চল গঠনের আইন পাশ করবে।

ধারা ৮৭। রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে থাকছে নিম্নলিখিত স্বয়ংশাসিত অঞ্চলগুলি ঃ আদিগেই, গোর্ণো-আলতাই, ইহুদী, কারাচাই-চেরকেস ও খাকাস।

জর্জীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে দক্ষিণ ওসেতীয় স্বয়ংশাসিত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত।

আজেরবাইজান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে নাগোর্ণো-কারাবাখ স্বয়ংশাসিত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত।

তাজিক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে গোর্ণো-বাদাখশান স্বয়ংশাসিত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত।

ধারা ৮৮। স্বয়ংশাসিত এলাকা হচ্ছে স্থান বা অঞ্চলের অঙ্গীভূত অংশ। স্বয়ংশাসিত এলাকা সৃষ্টি করার আইন গ্রহণ করবে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েত।

৪. জনগণের ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহ এবং সেগুলি নির্বাচনের পদ্ধতি

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ জনগণের ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহের ব্যবস্থা ও কাজের নীতি

ধারা ৮৯। জনগণের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহ—অর্থাৎ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের সর্বোচ্চ সোভিয়েত, স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রসমূহের সর্বোচ্চ সোভিয়েত, এলাকার ও অঞ্চলের জনগণের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েত, এবং জেলা, নগর, নগর-জেলা, বসতি ও গ্রামের জনগণের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েত—সব মিলিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের এক অ-খণ্ড ব্যবস্থা।

ধারা ৯০। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের সর্বোচ্চ সোভিয়েত, এবং স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রসমূহের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কার্যকালের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর।

জনগণের ডেপুটিবৃন্দের স্থানীয় সোভিয়েতসমূহের কার্যকালের মেয়াদ হবে আড়াই বছর।

সংশ্লিষ্ট সোভিয়েতগুলির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই মাস আগে জনগণের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহের নির্বাচন ডাকতে হবে।

ধারা ৯১। সংশ্লিষ্ট জনগণের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতের এক্তিয়ারভুক্ত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সেই সোভিয়েতের অধিবেশনে বিবেচিত হবে ও নিষ্পত্তি করা হবে।

জনগণের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহ স্থায়ী কমিশন নির্বাচন করবে এবং প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং জনগণের নিয়ন্ত্রণের সমন্বয় ঘটিয়ে জনগণের নিয়ন্ত্রণের সংস্থাসমূহ গঠন করবে।

ধারা ৯২। জনগণের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহ উদ্যোগ, যৌথ খামার, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং জনগণের নিয়ন্ত্রণের সমন্বয় ঘটিয়ে জনগণের নিয়ন্ত্রণের সংস্থাসমূহ গঠন করবে।

জনগণের নিয়ন্ত্রণের সংস্থাসমূহ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা এবং কর্মভার পূরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করবে, রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে, আঞ্চলিকতার ঝোঁক, সংকীর্ণ বিভাগীয় মনোভাব, অব্যবস্থাপনা ও অপচয়, আমলাতান্ত্রিক গড়িমসি ও আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লড়াই চালাবে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রে কাজকর্ম উন্নত করে তুলতে সাহায্য করবে।

ধারা ৯৩। জনগণের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতগুলি সরাসরি বা তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সমস্ত ক্ষেত্র পরিচালনা করবে, সিদ্ধান্ত নেবে ও তা কার্যকর করার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে ও তার রূপায়ণ যাচাই করবে।

ধারা ৯৪। জনগণের ডেপ্রুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহ প্রকাশ্যে কাজ করবে যৌথ, অবাধ, গঠনমূলক আলোচনা ও সিন্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিতে, তাদের কার্যনির্বাহী ও প্রশাসনিক সংস্থাগুলি কর্তৃক ও অন্যান্য এজেন্সি কর্তৃক তাদের কাছে প্রণালীবোধ বিবরণদানের ভিত্তিতে এবং তাদের কাজকর্মে নাগরিকদের ব্যাপকভাবে যুক্ত করার ভিত্তিতে।

জনগণের ডেপ্রুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহ এবং তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্থাসমূহ তাদের কাজ সম্পর্কে এবং গৃহীত সিন্ধান্ত সম্পর্কে নিয়মিতভাবে জনসাধারণকে অবহিত করে চলবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : নির্বাচন ব্যবস্থা

ধারা ৯৫। সমস্ত সোভিয়েতেব ডেপ্রুটিদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে গোপন ব্যালটে সর্বজনীন, সমানাধিকারসম্পন্ন ও প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে।

ধারা ৯৬। নির্বাচন হবে সর্বজনীন : সোভিয়েত ইউনিয়নের যে সমস্ত নাগরিকের বয়স ১৮ বছর হয়েছে তাদের সকলেরই ভোট দেবার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার থাকবে, সেই ব্যক্তিরা বাদে যারা আইনত বিকৃতমস্তিষ্ক বলে সাব্যস্ত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা লাভ করতে হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন নাগরিকের বয়স অবশ্য ২১ হওয়া চাই।

ধারা ৯৬। নির্বাচন হবে সমানাধিকারসম্পন্ন ; প্রত্যেক নাগরিকের একটি করে ভোট থাকবে ; সমস্ত ভোটদাতা সমান অধিকার নিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে।

ধারা ৯৮। নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ ; জনগণের ডেপ্রুটিবৃন্দের সকল সোভিয়েতে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে ডেপ্রুটিরা নির্বাচিত হবেন।

ধারা ৯৯। নির্বাচনে ভোটদান হবে গোপন : ভোটদাতাদের ভোটাধিকার প্রয়োগে কোনরকম নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করা হবে না।

ধারা ১০০। নিম্নোক্তদের প্রার্থী মনোনয়ন করার অধিকার থাকবে : সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির শাখা ও সংস্থাসমূহ, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, সংগঠনসমূহ, এবং কর্মসংক্রান্ত যৌথ সংস্থাগুলির এবং সামরিক ইউনিটে সৈনিকদের সভা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের এবং গণসংগঠনগুলির সুনিশ্চিত অধিকার থাকছে প্রার্থীদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত আলোচনা করার, এবং যোগ্যতা নিয়ে অবাধ সার্বিক আলোচনা করার এবং সভাসমিতিতে, পত্র-পত্রিকায়, টেলিভিশনে ও রেডিওতে প্রার্থীদের পক্ষে প্রচার চালাবার।

জনগণের ডেপ্রুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠানজনিত ব্যয় বহন করবে রাষ্ট্র।

ধারা ১০১। জনগণের ডেপ্রুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহে ডেপ্রুটিরা নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

জনগণের ডেপুটিবৃন্দের দুটি বেশী সোভিয়েতে নির্বাচিত না হওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন নাগরিকের পক্ষে বিধেয়।

গণসংগঠনসমূহ, কর্মসংক্রান্ত যৌথ সংস্থাসমূহ ও সামরিক ইউনিটের সৈনিকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত নির্বাচনী কমিশন সোভিয়েতসমূহের নির্বাচন পরিচালনা করবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অঙ্গ ও স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রসমূহের আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে জনগণের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদ্ধতি।

ধারা ১০২। নির্বাচকরা তাঁদের ডেপুটিদের অবশ্যমান্য নির্দেশ দেন।

জনগণের ডেপুটিগণের সংশ্লিষ্ট সোভিয়েত নির্বাচকদের অবশ্যমান্য নির্দেশ পরীক্ষা করে দেখবেন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করার সময়ে ও বাজেট রচনা করার সময়ে নির্দেশগুলি বিবেচনা করবেন, নির্দেশগুলির রূপায়ণ সংগঠিত করবেন এবং নাগরিকদের এ-বিষয়ে অবহিত করবেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : জনগণের ডেপুটি

ধারা : ১০৪। জনগণের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহে ডেপুটি হবেন জনগণের সর্বক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি।

সোভিয়েতসমূহে ডেপুটিরা বিবেচনা করেন রাষ্ট্র সংক্রান্ত, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সংক্রান্ত বিষয়, সংগঠিত করেন সোভিয়েতসমূহের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যবস্থা এবং প্রয়োগ করেন রাষ্ট্রীয় সংস্থা, শিল্পোদ্যোগ, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন-গুলির কাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ।

নিজেদের কাজে ডেপুটিরা রাষ্ট্রীয় স্বার্থে পরিচালিত হবেন, নিজেদের নির্বাচক-মণ্ডলীর প্রয়োজন বিবেচনা করবেন এবং নির্বাচকদের অবশ্যমান্য নির্দেশ রূপায়িত করার জন্য কাজ করবেন।

ধারা ১০৭। নিজেদের নিয়মিত বৃত্তি ও পেশায় ছেদ না ঘটিয়েই ডেপুটিরা যাতে তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন সে জন্য ডেপুটিরা স্থায়ী কর্মস্থলে তাঁদের গড় আয় অক্ষুণ্ণ রেখে নিয়মিত বৃত্তি বা পেশা থেকে অব্যাহতি পাবেন।

ধারা ১০৫। যথোপযুক্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কোনও কিছু জানতে চাওয়ার অধিকার ডেপুটিদের আছে এবং সোভিয়েতের অধিবেশনে সেই জিজ্ঞাসার জবাব দিতে তাঁরা বাধ্য।

যে কোনও রাষ্ট্রীয় বা গণ সংস্থা, শিল্পোদ্যোগ, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের কাছে ডেপুটি হিসেবে তাঁদের কাজ থেকে উদ্ভূত বিষয়গুলি সম্পর্কে ডেপুটিরা খোঁজখবর নিতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় বা গণ সংস্থা, শিল্পোদ্যোগ, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের প্রধানরা অবিলম্বে ডেপুটিদের বক্তব্য শুনতে এবং তাঁদের সুপারিশগুলি সম্পর্কে আইনে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বিবেচনা করতে বাধ্য।

ধারা ১০৬। ডেপুটিদের অধিকার ও কর্তব্য অবাধে ও কার্যকরভাবে প্রয়োগের পরিবেশ যাতে তাঁরা পান তার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা হবে।

ডেপুটিদের নিরাপত্তা, এবং ডেপুটি হিসেবে তাঁদের কাজের অন্যান্য নিশ্চয়তা ডেপুটিদের পদমর্যাদা সংক্রান্ত আইনে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং অঙ্গ প্রজাতন্ত্র ও স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের বিধানসমূহে নির্দিষ্ট আছে।

ধারা ১০৭। ডেপুটিরা তাঁদের এবং সোভিয়েতের কাজকর্ম সম্পর্কে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে, কর্মসংক্রান্ত যৌথ সংস্থাগুলির কাছে এবং সেখান থেকে তাঁরা মনোনয়ন পেয়েছেন সেই গণসংগঠনগুলির কাছে তাঁদের কাজের বিবরণ দেবেন।

যে সমস্ত ডেপুটি নির্বাচকমণ্ডলীর আস্থার উপযোগী হতে পারেন নি তাঁদের নির্বাচন আইন নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশের সিদ্ধান্তক্রমে যে কোনও সময়ে প্রত্যাহার করে নেওয়া যেতে পারে।

৫. সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের উচ্চতর সংস্থা

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত

ধারা ১০৮। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত।

এই সংবিধানে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের এক্তিয়ারভুক্ত বলে যে সমস্ত বিষয় নির্দেশিত হয়েছে তার সবগুলি সম্পর্কেই ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান গ্রহণ ও সংশোধন করা, সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন প্রজাতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা, নতুন স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র এবং স্বয়ংশাসিত অঞ্চল গঠন অনুমোদন করা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাসমূহ অনুমোদন করা, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় বাজেট ও তা কার্যকর করা সংক্রান্ত রিপোর্ট অনুমোদন করা এবং সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য এমন সোভিয়েত সংস্থাসমূহ গঠন করার ক্ষমতা কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতেরই আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনসমূহ প্রণয়ন করবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সিদ্ধান্তক্রমে অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী ভোট (গণভোট)।

ধারা ১০৯। দুই কক্ষ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত গঠিত হবে : ইউনিয়নের সোভিয়েত এবং জাতিসমূহের সোভিয়েত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের দুই কক্ষেরই সমান অধিকার থাকবে।

ধারা ১১০। ইউনিয়নের সোভিয়েত এবং জাতিসমূহের সোভিয়েতে সমসংখ্যক ডেপুটি থাকবে।

ইউনিয়নের সোভিয়েত নির্বাচিত হবে সমসংখ্যক জনসংখ্যা বিশিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা।

জাতিসমূহের সোভিয়েত নির্বাচিত হবে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ঃ প্রত্যেক অঙ্গ-প্রজাতন্ত্র থেকে ৩২ জন করে ডেপুটি, প্রত্যেক স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র থেকে ১১ জন করে ডেপুটি, প্রত্যেক স্বয়ংশাসিত অঞ্চল থেকে ৫ জন করে ডেপুটি এবং প্রত্যেক স্বয়ংশাসিত এলাকা থেকে একজন করে ডেপুটি।

ইউনিয়নের সোভিয়েত এবং জাতিসমূহের সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত পরিচয়পত্র পরীক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই সোভিয়েতদ্বয় ডেপুটিদের পরিচয়পত্রের বৈধতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে এবং যে ক্ষেত্রে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘিত হয়েছে সেখানে সংশ্লিষ্ট সেই ডেপুটির নির্বাচনকে বাতিল বলে ঘোষণা করবে।

ধারা ১১১। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রত্যেক কক্ষ একজন চেয়ারম্যান এবং চারজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচন করবে।

ইউনিয়নের সোভিয়েত ও জাতিসমূহের সোভিয়েতের চেয়ারম্যানরা সংশ্লিষ্ট কক্ষের অধিবেশনগুলিতে সভাপতিত্ব করবেন এবং সভার কাজ পরিচালনা করবেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কক্ষদ্বয়ের যুক্ত অধিবেশনে ইউনিয়নের সোভিয়েত এবং জাতিসমূহের সোভিয়েতের চেয়ারম্যানদ্বয় পালাক্রমে সভাপতিত্ব করবেন।

ধারা ১১২। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশন বছরে দুবার আহ্বান করা হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী নিজেদের বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী অথবা কোনও একটি অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের অথবা কোনও কক্ষের অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ ডেপুটির প্রস্তাব অনুযায়ী বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করবেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশন হবে কক্ষদ্বয়ের আলাদা ও পূর্ণাঙ্গ সভা, এবং কক্ষদ্বয়ের দুটি অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত কক্ষদ্বয়ের দ্বারা স্থাপিত স্থায়ী কমিশনগুলির কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কমিশনগুলির বৈঠককে মিলিয়ে।

ধারা ১১৩। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে বিল উপস্থিত করার অধিকার থাকছে ইউনিয়নের সোভিয়েত, জাতিসমূহের সোভিয়েত, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ, রাষ্ট্রক্ষমতার উচ্চতর সংস্থাসমূহের মাধ্যমে অঙ্গ প্রজাতন্ত্র; সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কমিশনসমূহ এবং তার কক্ষদ্বয়ের স্থায়ী কমিশনসমূহ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের ডেপুটিবৃন্দ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকিউরেটার-জেনারেলের।

বিল উপস্থিত করার অধিকার সারা ইউনিয়ন সংস্থার মাধ্যমে গণ সংগঠনগুলিরও থাকছে।

ধারা ১১৪। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে পেশ করা বিল বা অন্যান্য বিষয় উভয় কক্ষেক পৃথক বা যুক্ত অধিবেশনে আলোচিত হবে। যেখানে প্রয়োজন, বিল বা অন্যান্য বিষয় প্রাথমিক বা অতিরিক্ত বিবেচনার জন্য এক বা ততোধিক কমিশনের কাছে প্রেরিত হতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের উভয় কক্ষের প্রত্যেকটিতে সেখানকার ডেপুটিদের মোট সংখ্যার গরিষ্ঠতায় কোন আইন পাশ হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই আইন গৃহীত হল বলে গণ্য হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সিদ্ধান্ত বা অন্যান্য বিধান সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের ডেপুটিদের মোট সংখ্যার গরিষ্ঠতায় গৃহীত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত বা তার সভাপতিমণ্ডলীর নিজেদের উদ্যোগে গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে অথবা কোনও অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাবক্রমে বিভিন্ন বিল ও রাষ্ট্রের অন্যান্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেশব্যাপী আলোচনার জন্য করা যেতে পারে।

ধারা ১১৫। ইউনিয়নের সোভিয়েত এবং জাতিসমূহের সোভিয়েতের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটলে বিরোধের বিষয়টি মীমাংসার জন্য সমতার ভিত্তিতে উভয় কক্ষ দ্বারা গঠিত একটি সালিস কমিশনের কাছে পেশ করা হবে, এবং তারপর ইউনিয়নের সোভিয়েত ও জাতিসমূহের সোভিয়েতের যুক্ত সভায় বিষয়টি দ্বিতীয়বার বিবেচিত হবে। আবার যদি মতৈক্য না-ঘটে তাহলে বিষয়টি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের পরবর্তী অধিবেশনে আলোচনার জন্য স্থগিত থাকবে, অথবা সর্বোচ্চ সোভিয়েত কর্তৃক দেশব্যাপী ভোট গ্রহণের (গণভোট) জন্য পেশ করা হবে।

ধারা ১১৬। সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনসমূহ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সিদ্ধান্তসমূহ ও অন্যান্য অবলম্বিত ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি ও সচিবের স্বাক্ষর সম্বলিত অবস্থায় অঙ্গ প্রজাতন্ত্রসমূহের ভাষায় প্রকাশিত হবে।

ধারা ১১৭। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের একজন ডিপুটির সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ ও মন্ত্রী এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত কর্তৃক গঠিত অন্যান্য সংস্থার প্রধানদের কাছে কোনও বিষয়ে জানতে চাওয়ার অধিকার থাকছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদে বা যে কর্মকর্তার কাছে তা জানতে চাওয়া হবে তিনদিনের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সেই অধিবেশনে তার মৌখিক বা লিখিত জবাব দিতে তাঁরা বাধ্য থাকবেন।

১১৮। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অনুমতি ছাড়া, কিংবা তার দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের

সভাপতিমণ্ডলীর অনুমতি ছাড়া কোনও ডেপুটিকে অভিযুক্ত করা, গ্রেপ্তার করা বা আদালতের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া যাবে না।

ধারা ১১৯। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত দুই কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচন করবে; এই সভাপতিমণ্ডলী হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের স্থায়ী সংস্থা; তার সমস্ত কাজকর্মের জন্য তা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে, এবং সংবিধান-নির্ধারিত সীমার মধ্যে, সর্বোচ্চ সোভিয়েতের দুটি অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের কাজ চালাবে।

ধারা ১২০। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত হবে ডেপুটিদের মধ্যে থেকে এবং একজন সভাপতি, প্রথম সহ-সভাপতি, ১৫ জন সহ-সভাপতি (প্রত্যেক অঙ্গ-প্রজাতন্ত্র থেকে একজন করে), একজন সচিব এবং ২১ জন সদস্য নিয়ে তা গঠিত হবে।

ধারা ১২১। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী ঃ

(ক) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে;

(খ) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশন আহ্বান করবে;

(গ) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কক্ষদ্বয়ের স্থায়ী কমিশন-গুলির সমন্বয়সাধন করবে;

(ঘ) সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান মেনে চলা নিশ্চিত করবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান ও আইনকানুনের সঙ্গে অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলির সংবিধান ও আইন-কানুনের সংগতি নিশ্চিত করবে;

(ঙ) সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনসমূহ ব্যাখ্যা করবে;

(চ) সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি চূড়ান্তরূপে অনুমোদন কিংবা বর্জন করবে;

(ছ) সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং অংগ প্রজাতন্ত্রগুলির মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ও আদেশগুলি আইনের সংগে সংগতিপূর্ণ না হলে সেগুলি বাতিল করবে;

(জ) সামরিক খেতাব, কূটনৈতিক পদমর্যাদা ও অন্যান্য বিশেষ খেতাব প্রবর্তন করবে; সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব, কূটনৈতিক পদমর্যাদা ও অন্যান্য বিশেষ খেতাব অর্পণ করবে;

(ঝ) সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ডার ও পদকসমূহ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্মানসূচক খেতাবগুলি প্রবর্তন করবে; সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ডার ও পদকসমূহ প্রদান করবে; সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্মানসূচক খেতাবগুলি অর্পণ করবে;

(ঞ) সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকত্ব প্রদান করবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ বা বঞ্চিত করার প্রশ্নে এবং আশ্রয়দানের প্রশ্নে রায় দেবে;

(ট) রাজক্ষমা সংক্রান্ত সারা-ইউনিয়ন আইন জারী করবে এবং মার্জনা করার অধিকার প্রয়োগ করবে ;

(ঠ) অন্যান্য দেশে এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিয়োগ করবে ও তাদের প্রত্যাহার করে নেবে ;

(ড) পূর্ণক্ষমতা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রেরিত বিদেশী রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের পরিচয়পত্র এবং প্রত্যাহার পত্র গ্রহণ করবে ;

(ঢ) সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা-পরিষদ গঠন করবে এবং তার গঠন-বিন্যাস অনুমোদন করবে ; সোভিয়েত ইউনিয়নের সশস্ত্রবাহিনীর সর্বোচ্চ সামরিক কর্তৃত্ব নিয়োগ ও বরখাস্ত করবে ;

(ণ) সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষার স্বার্থে বিশেষ বিশেষ এলাকায় অথবা দেশের সর্বত্র সামরিক আইন জারী করবে ;

(ত) সাধারণ বা আংশিক সৈন্য সমাবেশের আদেশ দেবে ;

(থ) সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশনসমূহের মধ্যবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ ঘটলে যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করবে ; অথবা প্রয়োজন হলে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পারস্পরিক প্রতিরক্ষার সংস্থান সম্বলিত আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতা পালন করবে ;

(দ) এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান ও আইন-কর্তৃক তার ওপরে ন্যস্ত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

ধারা ১২২। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশনসমূহের মধ্যবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী পরবর্তী অধিবেশনে অনুমোদন সাপেক্ষ :

(১) প্রয়োজন হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচলিত আইনসমূহ সংশোধন করবে ;

(২) অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে সীমানার পরিবর্তন অনুমোদন করবে ;

(৩) সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সুপারিশ অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রক এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় কমিটিগুলি গঠন করবে বা তুলে দেবে ;

(৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যানের সুপারিশক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের স্বতন্ত্র সদস্যদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবে এবং মন্ত্রিপরিষদে ব্যক্তিদের নিয়োগ করবে।

ধারা ১২৩। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী ডিক্রী জারী করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ধারা ১২৪। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ক্ষমতা নব-নির্বাচিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত এক নতুন সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচন না করা পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের নবনির্বাচিত সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশন নির্বাচনের দুই মাসের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের বিদায়ী সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক আহূত হবে।

ধারা ১২৫। ইউনিয়নের সোভিয়েত এবং জাতিসমূহের সোভিয়েত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলির প্রাথমিক পর্যালোচনার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনসমূহ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত ও তার সভাপতিমণ্ডলীর অন্যান্য সিদ্ধান্ত রূপায়ণে সাহায্য করার জন্য এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও সংগঠনগুলির কাজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ খাটানোর জন্য ডেপুটিদের মধ্য থেকে স্থায়ী কমিশনসমূহ নির্বাচন করবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কক্ষদ্বয়ও সমতার ভিত্তিতে যুক্ত কমিশন গঠন করতে পারে।

প্রয়োজন বোধ করলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত তদন্ত ও অডিট কমিশন এবং অন্য যেকোন বিষয়ে কমিশন গঠন করে।

সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও জন-সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও পদস্থ কর্মকর্তা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের ও তার কক্ষদ্বয়ের কমিশনগুলির অনুরোধ পালন করতে বাধ্য।

রাষ্ট্রীয় ও জন-সংস্থাসমূহ, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলি কর্তৃক কমিশনগুলির সুপারিশ বিবেচনা করা বাধ্যতামূলক। তাদের সুপারিশ অধ্যায়নের ফলাফল ও সে-সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থার কথা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কমিশনগুলিকে জানাতে হবে।

ধারা ১২৬। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত তার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থার কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত জনগণের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার শীর্ষ থেকে কাজ করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিটি গঠন করবে।

জনগণের নিয়ন্ত্রণের সংস্থাগুলির সংগঠন ও কর্মপ্রণালী সোভিয়েত ইউনিয়নে জনগণের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনে সংজ্ঞায়িত হয়েছে।

ধারা ১২৭। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের ও তার সংস্থাগুলির কর্মপ্রণালী সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রবিধান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ভিত্তিতে বলবৎ করা সোভিয়েত আইনসমূহে সংজ্ঞায়িত হবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ

ধারা ১২৮। সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ, অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার—সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী ও প্রশাসনিক সংস্থা।

ধারা ১২৯। ইউনিয়নের সোভিয়েত ও জাতিসমূহের সোভিয়েতের যুক্ত অধিবেশন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ গঠন করবে এবং মন্ত্রিপরিষদে থাকবেঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যান, প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানবৃন্দ, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রীরা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় কমিটিসমূহের চেয়ারম্যানগণ।

অঙ্গ প্রজাতন্ত্রসমূহের মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ পদাধিকারবলে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হবেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যানের সুপারিশক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত অন্যান্য সংস্থা বা সংগঠনের প্রধানদের সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

ধারা ১৩০। সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে দায়ী থাকবে এবং তার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশনগুলির মধ্যবর্তী সময়ে মন্ত্রিপরিষদকে জবাবদিহি করতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ তার কাজকর্ম সম্পর্কে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে নিয়মিতভাবে রিপোর্ট দেবে।

ধারা ১৩১। রাষ্ট্র প্রশাসনের যে সব বিষয় সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর অধিকারভুক্ত নয়, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের এক্তিয়ার ভুক্ত এমন সমস্ত বিষয়েই ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের থাকছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ তার ক্ষমতার মধ্যে থেকে:

(১) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পথনির্দেশ করবে, জনসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়ানো ও সাংস্কৃতিক মান উন্নত করার জন্য, বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিকাশের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য, অর্থ ও ক্রেডিট ব্যবস্থাকে সংহত করার জন্য, এক সমরূপ দর, মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তা নীতি অনুসরণ করার জন্য, রাষ্ট্রীয় বীমা ও সমরূপ এক হিসাবরক্ষা ও পরিসংখ্যান ব্যবস্থা সংগঠিত করার জন্য ব্যবস্থা প্রণয়ন ও কার্যকর করবে; এবং শ্রমশিল্প সংক্রান্ত, নির্মাণ সংক্রান্ত ও কৃষি সংক্রান্ত উদ্যোগ ও সমিতি, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক এবং সারা ইউনিয়নের অধীনস্থ অন্যান্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সংগঠিত করবে;

(২) সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ সংক্রান্ত চলতি ও দীর্ঘমেয়াদি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বাজেট রচনা করবে এবং

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে পরিকল্পনা ও বাজেট রূপায়ণের বিবরণ পেশ করবে ;

(৩) রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করবে, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি ও জন-শৃঙ্খলা রক্ষা করবে, এবং নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চিতিবিধান করবে ও সেগুলি রক্ষা করবে ;

(৪) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করবে ;

(৫) সোভিয়েত ইউনিয়নের সশস্ত্রবাহিনীর বিকাশের ব্যাপারে সাধারণভাবে পথনির্দেশের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে এবং সামরিক কাজে যোগদানের জন্য বছরে নাগরিকদের যে অংশকে ডাকা হবে তা স্থির করবে ;

(৬) বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে, বৈদেশিক বাণিজ্য, অন্যান্য দেশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কৃৎকৌশলগত ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সাধারণ পথনির্দেশ করবে ; সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি পূরণের নিশ্চয়তাবিধানের ব্যবস্থা অবলম্বন করবে ; এবং আন্তঃসরকারী আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন ও খারিজ করবে ;

(৭) এবং যখন প্রয়োজন হবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের অধীনে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য কমিটি, মুখ্য পর্ষৎ ও অন্যান্য বিভাগ গঠন করবে।

ধারা ১৩২। সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যান, প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দকে নিয়ে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতিমণ্ডলী অর্থব্যবস্থা পরিচালনা ও রাষ্ট্র প্রশাসনের অন্যান্য বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের স্থায়ী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে।

ধারা ১৩৩। সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনসমূহের এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের ও তার সভাপতিমণ্ডলীর অন্যান্য সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ও তদানুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ অর্ডিন্যান্স ও সিদ্ধান্ত জারী করবে এবং সেগুলি কার্যকর হল কিনা তা যাচাই করে দেখবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের অর্ডিন্যান্স ও সিদ্ধান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র ভূখণ্ডে বাধ্যতামূলক হবে।

ধারা ১৩৪। সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকারভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে অঙ্গ প্রজাতন্ত্রসমূহের মন্ত্রিপরিষদের অর্ডিন্যান্স ও সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়া বন্ধ রাখার অধিকার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রকসমূহের, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় কমিটিগুলির ও তার অধীনস্থ অন্যান্য সংস্থার সিদ্ধান্ত রদ করার অধিকার সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের আছে।

ধারা ১৩৫। সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ সোভিয়েত ইউনিয়নের সারা-ইউনিয়ন ও অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রকগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় কমিটিগুলির এবং তার অধীনস্থ অন্যান্য সংস্থার কাজকর্মের সমন্বয়সাধন ও পরিচালনা করবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সারা ইউনিয়ন মন্ত্রকসমূহ ও রাষ্ট্রীয় কমিটিগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র ভূখণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাদের দ্বারা গঠিত সংস্থার মাধ্যমে তাদের হাতে ন্যস্ত প্রশাসনের শাখাগুলির কাজ পরিচালনা করবে, অথবা আন্তঃশাখা প্রশাসন চালাবে।

ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্রীয় মন্ত্রকগুলি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় কমিটি-গুলি সাধারণভাবে তাদের হাতে ন্যস্ত প্রশাসনের শাখাগুলির কাজ অঙ্গ প্রজাতন্ত্র-গুলির সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ও রাষ্ট্রীয় কমিটির মাধ্যমে পরিচালনা করে অথবা আন্তঃশাখা প্রশাসন চালায় এবং কেন্দ্রের অধীনস্থ পৃথক পৃথক উদ্যোগ ও সমিতিকে সরাসরি পরিচালনা করে। প্রজাতন্ত্রীয় ও স্থানীয় অধীনতা থেকে উদ্যোগ ও সমিতিগুলিকে কেন্দ্রীয় অধীনতায় স্থানান্তরের প্রণালী সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডল স্থির করবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রকগুলি ও রাষ্ট্রীয় কমিটিসমূহ তাদের দায়িত্ব ন্যস্ত প্রশাসনের ক্ষেত্রগুলির অবস্থা ও তাদের উন্নয়নের জন্য দায়ী থাকবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের ও তার সভা-পতিমণ্ডলীর অন্যান্য সিদ্ধান্তের ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের অর্ডিন্যান্স ও সিদ্ধান্তসমূহের ভিত্তিতে ও তদনুযায়ী নিজের নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে আদেশ ও অন্যান্য বিধান জারি করবে এবং সেগুলি কার্যকর করার দিকটা সংগঠন করবে ও সেটা কতটা কার্যকর করা হচ্ছে তা পরীক্ষা করে দেখবে।

ধারা ১৩৬। সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ ও তার সভাপতিমণ্ডলীর ক্ষমতা, তাদের কাজকর্মের ধরন, মন্ত্রিপরিষদ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংস্থার মধ্যেকার সম্পর্ক এবং সারা-ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্রীয় মন্ত্রকসমূহ ও রাষ্ট্রীয় কমিটিসমূহের তালিকা সংবিধানের ভিত্তিতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ সংক্রান্ত আইনে নির্দেশিত।

৬. অঙ্গ প্রজাতন্ত্রসমূহের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও প্রশাসনের সংস্থাগুলির গঠন সংক্রান্ত মৌল নীতি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ সংস্থাসমূহ

ধারা ১৩৭। অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ সংস্থা হবে সেই প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েত।

অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েত ইউনিয়নের ও প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের অধীন প্রজাতন্ত্রের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গ্রহণ ও সংশোধন করার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাসমূহের ও রাষ্ট্রীয় ব্যয়বরাদ্দের এবং সেগুলি পূরণ করা সম্বন্ধে রিপোর্টগুলি অনুমোদন করার; এবং তার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য সংস্থাসমূহ গঠন করার একমাত্র ক্ষমতা থাকবে অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের হাতে।

অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের আইনসমূহ বিধিবদ্ধ হবে অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের দ্বারা অথবা এই প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুষ্ঠিত জনগণের ভোট গ্রহণের (গণভোট) দ্বারা।

ধারা ১৩৮। অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েত তার একটি সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচন করবে—এটি হবে তার সমস্ত কাজকর্মের জন্য সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে দায়ী সর্বোচ্চ সোভিয়েতের স্থায়ী সংস্থা। অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর গঠন ও ক্ষমতা অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে বর্ণিত হবে।

ধারা ১৩৯। অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েত অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের সরকার, অর্থাৎ অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদ গঠন করবে, যা হবে অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ক্ষমতার কার্যনির্বাহী ও প্রশাসনিক সর্বোচ্চ সংস্থা।

অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদ তার কাজের জন্য অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে অথবা সর্বোচ্চ সোভিয়েতের দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তীকালে তার সভাপতিমণ্ডলীর কাছে দায়ী থাকবে ও জবাবদিহি করবে।

ধারা ১৪০। অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদ সোভিয়েত ইউনিয়নের ও অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের আইনের ভিত্তিতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশসমূহের ভিত্তিতে ও তদনুযায়ী, সিদ্ধান্ত ও অর্ডিনান্স জারী করবে এবং সেগুলি কার্যকর করার দিকটা সংগঠন করা ও সেটা কতটা কার্যকর করা হচ্ছে তা পরীক্ষা করে দেখবে।

ধারা ১৪১। স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশসমূহ কার্যকর করা বন্ধ রাখার, স্বয়ংশাসিত অঞ্চলের, আঞ্চলিক, এলাকাগত ও নগরের অর্থাৎ (প্রজাতন্ত্রের এক্তিয়ারভুক্ত নগরগুলির) জনগণের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটির এবং অঞ্চলে বিভক্ত নয় এমন অঙ্গ প্রজাতন্ত্রে জেলা ও সংশ্লিষ্ট শহরের জনগণের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশসমূহ রহিত করার অধিকার অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলি মন্ত্রিপরিষদের থাকছে।

ধারা ১৪২। অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদ ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্রীয় ও প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রকসমূহে এবং অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় কমিটিগুলির ও তার এক্তিয়ারভুক্ত অন্যান্য সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধন ও পরিচালনা করবে।

ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্রীয় মন্ত্রক ও অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় কমিটিগুলি তাদের দায়িত্বে ন্যস্ত প্রশাসনের শাখাগুলি পরিচালনা করবে কিংবা আন্তঃশাখা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করবে এবং অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্রীয় মন্ত্রক উভয়েরই বা সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় কমিটির অধীন থাকবে।

প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রকসমূহ ও রাষ্ট্রীয় কমিটিগুলি তাদের দায়িত্বে ন্যস্ত প্রশাসনের শাখাগুলি পরিচালনা করবে অথবা আন্তঃবিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করবে, এবং অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদের অধীন থাকবে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও প্রশাসনের উচ্চতর সংস্থাসমূহ

ধারা ১৪৩। স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ সংস্থা হবে ওই প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েত।

স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গ্রহণ ও সংশোধন করা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা ও প্রজাতন্ত্রের ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করা ; ও তার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য সংস্থাসমূহ গঠন করার একমাত্র ক্ষমতা থাকবে স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের।

স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের আইন বিধিবদ্ধ হবে স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের দ্বারা।

ধারা ১৪৪। স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েত ওই সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচন করবে এবং এই প্রজাতন্ত্রের সরকার, অর্থাৎ, স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদ গঠন করবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও প্রশাসনের স্থানীয় সংস্থাসমূহ

ধারা ১৪৫। অঞ্চল, এলাকা, স্বয়ংশাসিত এলাকা, স্বয়ংশাসিত অঞ্চল, শহর, জেলা, জেলাশহর, উপনগরী ও গ্রামীণ বসতিগুলিতে সংশ্লিষ্ট জনগণের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহই হবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন সংস্থা।

ধারা ১৪৬। সমগ্র রাষ্ট্রের স্বার্থ ও তাদের এক্তিয়ারের মধ্যে বসবাসকারী নাগরিকদের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জনগণের ডেপুটিবৃন্দের স্থানীয় সোভিয়েতসমূহ স্থানীয় গুরুত্বসম্পন্ন সমস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করবে, উচ্চতর কর্তৃত্বসম্পন্ন সংস্থার সিদ্ধান্ত-সমূহ কার্যকর করবে, জনগণের ডেপুটিদের নিম্নতম সোভিয়েতগুলির কাজকর্ম পরিচালিত করবে এবং সেইভাবে প্রজাতন্ত্রীয় ও নিখিল ইউনিয়নের পক্ষে প্রাসঙ্গিকতা সম্পন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে ও সেগুলি সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করবে।

নিজের নিজের এলাকায় জনগণের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতসমূহ রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কাজ পরিচালনা করবে ; অর্থনৈতিক

ও সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত আইন এবং স্থানীয় ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করবে; সাধারণভাবে তাদের অধীনস্থ রাষ্ট্রীয় সংস্থা, শিল্পোদ্যোগ, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহ পরিচালনা করবে; আইন মেনে চলা, আইন ও শৃঙ্খলা এবং নাগরিকদের অধিকার রক্ষা সুনিশ্চিত করবে; দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা সুদৃঢ় করতে সাহায্য করবে।

ধারা ১৪৭। জনগণের ডেপুটিবৃন্দের স্থানীয় সোভিয়েতসমূহ নিজ নিজ ক্ষমতার মধ্যে এলাকার সর্বাঙ্গীণ, সর্বতোমুখী অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধনকে সুনিশ্চিত করে তুলবে; উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অধীন ও তাদের এলাকার মধ্যে শিল্পোদ্যোগ, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলি কর্তৃক আইন মান্য করাকে নিয়ন্ত্রণ করবে; জমির ব্যবহার, প্রকৃতি সংরক্ষণ, নির্মাণের কাজ, মনুষ্যবল নিয়োগ, ভোগ্যপণ্য উৎপাদন, জনসাধারণকে প্রদত্ত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, গোষ্ঠীগত ও অন্যান্য সেবামূলক কাজের ও সুযোগ-সুবিধাগুলির ব্যাপারে তাদের কাজের সমন্বয় সাধন ও তদারক করবে।

ধারা ১৪৮। জনগণের ডেপুটিবৃন্দের স্থানীয় সোভিয়েতসমূহ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রজাতন্ত্র ও স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার এক্তিয়ারের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। স্থানীয় সোভিয়েতের সিদ্ধান্তসমূহ তার ভূখণ্ডে অবস্থিত সমস্ত শিল্পোদ্যোগ, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের এবং সমস্ত পদস্থ কর্মী ও নাগরিকের পক্ষে মান্য করা বাধ্যতামূলক।

ধারা ১৪৯। জনগণের ডেপুটিবৃন্দের স্থানীয় সোভিয়েতগুলি কর্তৃক তাদের ডেপুটিবৃন্দের মধ্য থেকে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিগুলিই হবে স্থানীয় সোভিয়েত সমূহের কার্যনির্বাহী ও প্রশাসনিক সংস্থা।

কার্যনির্বাহী কমিটিগুলি তাদের নির্বাচনকারী সোভিয়েতগুলির কাছে, কাজের বা বসবাসের স্থানে নাগরিকদের সভার কাছে কমপক্ষে বছরে একবার নিজের নিজের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করবে।

ধারা ১৫০। জনগণের ডেপুটিবৃন্দের স্থানীয় সোভিয়েতগুলির কার্যনির্বাহী কমিটি তাদের কাজকর্মের জন্য প্রত্যক্ষভাবে—তাদের নির্বাচনকারী সোভিয়েত এবং উচ্চতর কার্যনির্বাহী ও প্রশাসনিক সংস্থা—উভয়ের কাছেই জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

৭. বিচার, সালিশ ও প্রকিউরেটরের তদারকি

বিংশতি পরিচ্ছেদ: আদালত ও সালিশ

ধারা ১৫১। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিচারের কাজ চালান হয় শুধুমাত্র আদালতের দ্বারা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকছে এই আদালতগুলি: সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত; অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালত; স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির সর্বোচ্চ আদালত; আঞ্চলিক, এলাকাগত ও নগর আদালত; স্বয়ংশাসিত অঞ্চলগুলির আদালত, স্বয়ংশাসিত এলাকাগুলির আদালত, জনগণের জেলা (নগর) আদালত এবং সশস্ত্রবাহিনীতে সামরিক ট্রাইবুনাল।

ধারা ১৫২। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত আদালত গঠিত হবে বিচারপতি ও জনগণের এসেসরদের নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতার নীতির ভিত্তিতে।

জনগণের জেলা (নগর) আদালতের বিচারপতিগণ গোপন ব্যালট দ্বারা জেলার (নগরের) নাগরিকগণ কর্তৃক সর্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। জনগণের জেলা (নগর) আদালতে জনগণের এসেসরগণ আড়াই বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন নাগরিকদের কর্মস্থলে বা বসতি এলাকায় অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় হাত তুলে ভোটদানের দ্বারা।

উচ্চতর আদালতগুলি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবে সংশ্লিষ্ট জনগণের ডেপুটিবৃন্দের সোভিয়েতগুলি দ্বারা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী সামরিক ট্রাই-ব্যুনালের বিচারপতিকে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচন করবে এবং জনগণের এসেসরগণ আড়াই বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন সৈনিকদের সাধারণ সভায়।

বিচারপতি ও জনগণের এসেসরগণ তাঁদের কাজের জন্য তাঁদের নির্বাচকদের কাছে বা নির্বাচনকারী সংস্থার কাছে দায়ী থাকবেন ও জবাবদিহি করবেন, তাঁদের কাছে নিজেদের কাজকর্মের রিপোর্ট দেবেন এবং সংবিধিবদ্ধ কার্যপ্রণালী অনুযায়ী তাঁরা এদের ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

ধারা ১৫৩। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় সংস্থা এবং তা আইন কর্তৃক নির্দেশিত প্রক্রিয়ারের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের আদালতগুলির ও অংগপ্রজাতন্ত্রের আদালত-গুলির বিচারের কাজের তদারক করবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত নির্বাচিত হবে সোভিয়েত ইউ-নিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের দ্বারা এবং তাতে থাকবে চেয়ারম্যান, ভাইসচেয়ার-ম্যান, সদস্যবৃন্দ ও জনগণের এসেসরবৃন্দ। অংগ প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালত-গুলির চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সদস্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের সংগঠন, কার্যপ্রণালী নির্দেশিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত সংক্রান্ত আইনে।

ধারা ১৫৪। সমস্ত আদালতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার হবে কলেজিয়াম ব্যবস্থায়; আর মামলা যে-আদালতে প্রথম দায়ের করা হয়। (কোর্ট অব ফার্স্ট ইনস্টান্স), সে আদালতের মামলার শুনানী হবে জনগণের এসেসরগণের অংশগ্রহণসহ। বিচারের কাজে বিচারপতির সব অধিকারই থাকছে জনগণের এসেসরদের।

ধারা ১৫৫। বিচারপতি ও জনগণের এসেসরগণ স্বাধীনভাবে কাজ করেন এবং একমাত্র আইনের অধীনতাই তাঁরা স্বীকার করেন।

ধারা ১৫৬। আইন ও আদালতের চোখে নাগরিকদের সমতার নীতির ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারের কাজ চালানো হয়।

ধারা ১৫৭। সমস্ত আদালতের মামলাতেই সর্বসাধারণ উপস্থিত থাকতে পারবেন। গোপন কক্ষে শুনানী চলতে দেওয়া হবে একমাত্র আইন কর্তৃক সেইভাবে নির্দেশিত মামলাগুলিতেই. বিচার-বিভাগীয় কার্যবিধির সমস্ত নিয়ম সে ক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে।

ধারা ১৫৮। ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্তের আইনগত সাহায্য পাবার অধিকার গ্যারাণ্টিযুক্ত।

ধারা ১৫৯। বিচার বিভাগীয় কাজকর্ম পরিচালিত হবে অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের, স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের, স্বয়ংশাসিত অঞ্চলের বা স্বয়ংশাসিত এলাকার কিংবা স্থানীয় অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কথিত ভাষায়। আদালতের কাজকর্মে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের যে-ভাষায় মামলা চালানো হচ্ছে সেই ভাষা না জানলে, মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ রূপে অবহিত হবার অধিকার, দোভাষীর মাধ্যমে আদালতের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার অধিকার এবং আদালতকে উদ্দেশ্য করে নিজের নিজের ভাষায় বলবার অধিকার সুনিশ্চিত থাকবে।

ধারা ১৬০। আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আদালতের রায় ছাড়া কোন ব্যক্তিকে অপরাধী বলে গণ্য করা যাবে না ও শাস্তি দেওয়া যাবে না।

ধারা ১৬১। নাগরিকদের ও সংগঠনসমূহকে আইন সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আইনজীবীদের কলেজিয়াম থাকছে। আইনে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে নাগরিকদের আইন বিষয়ক পরামর্শ দেওয়া হবে নিখরচায়।

ব্যবহারজীবী ('বার') সংগঠন ও এর কার্যপ্রণালী নির্ধারিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের ও অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলির বিধানের দ্বারা।

ধারা ১৬২। গণ সংগঠনের এবং শ্রমিক-যুথগুলির প্রতিনিধিগণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ধারা ১৬৩। সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও শিল্পোদ্যোগসমূহের মধ্য অর্থনৈতিক বিবাদগুলির মীমাংসা করবে তাদের এক্তিয়ারের সীমানার মধ্যে রাষ্ট্রীয় সালিশী আদালতগুলি। রাষ্ট্রীয় সালিশী আদালতগুলির সংগঠন ও কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় সালিশী সংক্রান্ত আইনের দ্বারা।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ: প্রকিউরেটরের দপ্তর

ধারা ১৬৪। সমস্ত মন্ত্রক, রাষ্ট্রীয় কমিটি ও বিভাগ, শিল্পোদ্যোগ, প্রতিষ্ঠান, ও সংগঠন, জনগণের ডেপুটিবৃন্দের স্থানীয় সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী ও নাগরিকবৃন্দ যাতে আইন সুনির্দিষ্ট ও সমানভাবে মেনে চলে, সেটা তদারকির সর্বোচ্চ ক্ষমতা

থাকবে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকিউরেটর জেনারেল-এর এবং তাঁর অধীনস্থ প্রকিউরেটরদের।

ধারা ১৬৫। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকিউরেটর জেনারেল নিযুক্ত হন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত কর্তৃক এবং তিনি তাঁর কাজের জন্য তার কাছে অথবা, সর্বোচ্চ সোভিয়েতের দুটি অধিবেশনের মধ্যবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর কাছে দায়ী হবেন ও জবাবদিহি করবেন।

ধারা ১৬৬। অঙ্গ প্রজাতন্ত্র, স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র, অঞ্চল, এলাকা ও স্বয়ংশাসিত অঞ্চলের প্রকিউরেটরগণ নিযুক্ত হন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকিউরেটর জেনারেল কর্তৃক। স্বয়ংশাসিত এলাকার এবং জেলা ও শহরের প্রকিউরেটরগণ নিযুক্ত হন অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের প্রকিউরেটর কর্তৃক এবং তাদের নিয়োগ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকিউরেটর জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

ধারা ১৬৭। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকিউরেটর জেনারেলের এবং তার অধীনস্থ সমস্ত প্রকিউরেটরের কার্যকালের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর।

ধারা ১৬৮। প্রকিউরেটরের দপ্তরের সংস্থাগুলি যে কোন স্থানীয় সংস্থা থেকে স্বাধীনভাবে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে এবং সেগুলি একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকিউরেটর জেনারেল-এরই অধীন হবে।

প্রকিউরেটরের দপ্তরের সংস্থাগুলির সংগঠন ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকিউরেটরের দপ্তর সংক্রান্ত আইনে।

৮. সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতীক, পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত ও রাজধানী

ধারা ১৬৯। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় প্রতীক হচ্ছে সূর্যালোক-উদ্ভাসিত গমের শীষ বেষ্টিত ভূগোলকের পশ্চাৎপটে কাস্তে হাতুড়ি ; তাতে অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রগুলির ভাষায় লিখিত : "দুনিয়ার মজুর এক হও!" প্রতীকের শিরোদেশে আছে একটি পঞ্চমুখী তারকা।

ধারা ১৭০। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পতাকা হচ্ছে আয়তাকার রক্তবর্ণ বস্ত্র, দণ্ডের কাছে ঊর্ধ্বকোণে স্বর্ণবর্ণের কাস্তে ও হাতুড়ি এবং তার উপর স্বর্ণরেখাঙ্কিত রক্তবর্ণের পঞ্চমুখী তারকা। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ : ১।

ধারা ১৭১। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের জাতীয় সঙ্গীত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত।

ধারা ১৭২। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের রাজধানী মস্কো শহর।

১. সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের আইনগত ক্ষমতা ও তা সংশোধনের কার্যবিধি

ধারা ১৭৩। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের সর্বোচ্চ আইনগত শক্তি থাকবে। রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের সমস্ত আইন ও অন্যান্য বিধি জারী করা হবে এই ভিত্তিতে ও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

ধারা ১৭৪। উভয় কক্ষের প্রত্যেকটির ডেপুটিদের মোট সংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে গৃহীত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সিদ্ধান্তের দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান সংশোধন করা যাবে।

চার

নতুন সোভিয়েত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

Features of the New Constitution of U. S. S. R.

এক : সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধানের বৈশিষ্ট্য (Features of the New Constitution of U. S. S. R.)

সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৭৭ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলোকে নীচে আলোচনা করা হল।

মুখবন্ধ

(১) ১৯৭৭ সালের ৭ই অক্টোবর সোভিয়েত রাশিয়ায় যে নতুন সংবিধান গৃহীত হয় তা ব্রেজনেভ সংবিধান নামে পরিচিত। এই সংবিধানে পূর্বতন সংবিধানগুলির মূল সুর বা দর্শনের ধারাবাহিকতা বজায় আছে। ১৯১৮, ১৯২৪ এবং ১৯৩৬ সালের সংবিধানগুলোর আরও বিকশিত ও উন্নত রূপ হল ১৯৭৭ সালের ব্রেজনেভ সংবিধান। ব্রেজনেভ সংবিধানের মুখবন্ধে কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের মহান্ শপথ ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষণা করা হয় যে, সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজের প্রতিষ্ঠা করা, কমিউনিজমের বৈষয়িক ও কারিগরী ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা, সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ককে কমিউনিস্ট সম্পর্কে রূপান্তরিত করা, কমিউনিস্ট সমাজের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলা, জনগণের জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক মান উন্নত করা, দেশের নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় করা এবং বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য কাজ করাই হবে জনগণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য।

(২) ১৯৩৬ সালের সংবিধানে সোভিয়েত রাশিয়াকে শ্রমিক ও কৃষকদের একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৭ সালের ব্রেজনেভ সংবিধানে সোভিয়েত রাশিয়াকে "সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শাসনতন্ত্রের ১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, এই রাষ্ট্র শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক সমাজ, বুদ্ধিজীবীদের এবং দেশের সকল জাতি ও অধিজাতির শ্রমজীবী জনগণের ইচ্ছা ও স্বার্থকে ব্যক্ত করছে।

সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র

এখন প্রশ্ন হল, সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায়? এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিক শ্রেণী সংখ্যা বা গুণগত উৎকর্ষে আগের তুলনায় বিস্ময়করভাবে বিকাশ লাভ করেছে। এখন সোভিয়েত রাশিয়ায় জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রমিক শ্রেণী সুশিক্ষিত, কারিগরী দক্ষতায় সর্বাধুনিক এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত পরিপক্ব। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা আরও বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ করছে এবং সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারাই অগ্রবর্তী বাহিনীর ভূমিকা গ্রহণ করছে। কৃষকদের মধ্যেও এখন এক বিরাট ও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যে কৃষক যৌথ খামারের পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছে বা বড় হয়েছে তার মানসিক গঠনে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার এক বিরাট প্রভাব পড়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষকও শিক্ষিত এবং সর্বাধুনিক কৃৎকৌশল তার করায়ত্ত। আর কমিউনিজম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীরাও এক ক্রমবর্ধমান ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিক, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এমন এক অচ্ছেদ্য বন্ধন

গড়ে উঠেছে, যে বন্ধনে মৈত্রী বা সহযোগিতা দিনের পর দিন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক সমাজ এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। যেহেতু প্রত্যেক সোভিয়েত শিশু ও কিশোর শিক্ষালাভের ব্যাপক সুযোগ পায়, যেহেতু সকলের জন্যই কাজের অধিকার এবং কাজ বেছে নেবার অধিকার আছে, যেহেতু সকল নাগরিকের উপযুক্ত মজুরীর অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, বার্ধক্য বা অবসর-কালীন ভাতার অধিকার আছে, যেহেতু জাতিগত দম্ভ এবং ভাষাভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ববাদের কোন স্থান সোভিয়েত রাশিয়ায় নেই, ফলে সেখানে সমাজতন্ত্র বিকশিত হওয়ার দরুন শ্রমিক শ্রেণীর জীবনাদর্শ ও তত্ত্ব সমাজের প্রায় সকলশ্রেণীই গ্রহণ করেছে। এর ফলে যে রাষ্ট্র সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র হিসাবে প্রথমে গড়ে উঠেছিল, এখন সেই রাষ্ট্র পরিবর্তিত অবস্থায় সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ব্রেজনেভের ভাষায় বলা যায়, *With the achievement of full-fledged socialism and the adoption of the ideological and political position of the working class by the sections of the population, our state, which came into being as a dictatorship of the proletariat, has also grown into a state of the whole people.*

(৩) নতুন সোভিয়েত সংবিধানের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে একটি নতুন অধ্যায় (চতুর্থ অধ্যায়) সংযোজন। শাসনতন্ত্রের ২৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন অবিচলিত ভাবে লেনিনের শান্তির নীতি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করবে। আরও বলা হয়েছে, সোভিয়েত রাশিয়ায় যাতে কমিউনিজম গড়ে ওঠে তার জন্য প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক শর্তগুলি সুনিশ্চিত করা, বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংহত করা, জনগণের জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামে সমর্থন জ্ঞাপন করা, আক্রমণাত্মক যুদ্ধ বন্ধ করা, সার্বিক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করা এবং বিভিন্ন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তত্ত্ব কার্যকরী করা সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য।

পররাষ্ট্রনীতিকে গুরুত্ব দান

নতুন সংবিধান সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে যুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচার নিষিদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে সোভিয়েত সংবিধানেই প্রথম ঘোষণা করা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অংশ হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে সর্বদাই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সহযোগিতা এবং কমরেড সুলভ পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ককে বিকশিত ও শক্তিশালী করে তোলার চেষ্টা করবে। বিশ্ব-রাজনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান মর্যাদা ও প্রভাবের জন্য বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে এরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে, আক্রমণাত্মক যুদ্ধের বিপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের মনোভাব এখন সারা পৃথিবীর মানুষের দ্বারা প্রশংসিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ককে আরও

গভীর করে তোলা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে কার্যকর করা, জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমর্থন করার আদর্শ ঘোষণা করে ব্রেজনেভ শাসনতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও চেতনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিক উন্মোচন করেছে।

(৪) নতুন সংবিধানেও স্ট্যালিন সংবিধানের মত সোভিয়েত রাশিয়াকে একটি যুক্তরাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকগণ সবসময়ই জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করেন। তাই বহুজাতিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী যাতে নিজস্ব প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ পায়, প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী যাতে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, কিংবা অর্থনৈতিক জীবন সমৃদ্ধ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে নতুন ব্রেজনেভ সংবিধানেও সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির স্বেচ্ছামূলক ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি যুক্তরাষ্ট্র। এই যুক্তরাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আগের মতই সোভিয়েত রাশিয়ায় অঙ্গরাজ্যগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার ভোগ করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন

(৫) ব্রেজনেভ সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (১০নং—১৮নং ধারা) সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল কথা হল এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এখন অনেক বেশী উন্নত ও বিকশিত। উৎপাদনের উপকরণ সমূহের ওপর সামাজিক মালিকানা, পরিকল্পিত অর্থনীতি, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য উৎপাদন সমাজতান্ত্রিক বণ্টন ব্যবস্থা, সকলের জন্য কাজ, কাজের উপযুক্ত মজুরী, সকলের জন্য বার্ধক্য ভাতা বা অবসরকালীন ভাতা সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হল সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিকে রক্ষা করা এবং এর প্রসারের জন্য চেষ্টা করা। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিকে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির প্রধান রূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূলকথা হল নাগরিকদের উপার্জিত আয়। অন্যের শ্রম শোষণ করে মুনাফা অর্জন করা সোভিয়েত রাশিয়ায় নিষিদ্ধ। জমি, কলকারখানা, খনি, বনভূমি, জলাশয়, পরিবহন ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ওপর পূর্ণ সামাজিক মালিকানা সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলা হয়েছে, সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হবে যাতে জনসাধারণের দৈহিক সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিগত প্রয়োজনের সম্ভাব্য পূর্ণতম পরিতৃপ্তি সাধিত হবে। উৎপাদন ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হবে যাতে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে, গাছপালা, জীবজন্তু বা জলসম্পদের কোন হানি না ঘটে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

(৬) সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় 'সোভিয়েত' কথাটির সঠিক সাংবিধানিক তাৎপর্য বোঝা প্রয়োজন। সোভিয়েত কথাটি একটি রাশিয়ান শব্দ—

যার অর্থ হল শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি বা ডেপুটিদের নিয়ে গঠিত একটি সংস্থা। এককথায় বলা যায়, জনগণের বা শ্রমপন্থী মানুষের যথার্থ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সংস্থাকে সোভিয়েত বলা হয়। তাই দেখা যায়, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর বলশেভিক পার্টির জয়ধ্বনি ছিল—"সব ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে সমর্পণ কর"। মহান্ অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী দিনগুলিতে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সোভিয়েত-গুলি বিপ্লবকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিল এবং রাশিয়ায় সমাজব্যবস্থার রূপান্তরে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সংবিধানের ২২ নম্বর ধারা অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নে সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত। কিন্তু জনগণ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে জনগণের নির্বাচিত ডেপুটিদের নিয়ে গঠিত সোভিয়েতগুলির মাধ্যমে। এই সোভিয়েতগুলিই হল সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি বা বনিয়াদ। সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত সর্বস্তরেই তাই আমরা দেখতে পাই সোভিয়েতের প্রাধান্য। সর্বনিম্নে আছে জনগণের ডেপুটিদের সোভিয়েত (Soviets of people's deputies), আর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থা হল সুপ্রীম সোভিয়েত। বিপ্লবের ঝঞ্ঝামুখর দিনগুলিতে এই সোভিয়েতগুলি শ্রমজীবী মানুষের যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করেছে—যে সোভিয়েতগুলিতে জমিদার, পুঁজিপতি, কুলাক, ব্যবসায়ী বা যাজকের কোন স্থান ছিল না।

সোভিয়েত-ব্যবস্থা

(৭) ১৯৭৭ সালের ব্রেজনেভ সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক বিকাশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। শাসনতন্ত্রের ১৯—২৮ নম্বর ধারায় এই বিষয়ের আলোচনা আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক জীবনের ভিত্তি হল "শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের অটুট মৈত্রী"। রাষ্ট্রের কাজ হল শ্রেণীগত পার্থক্য দূর করা, শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য মুছে ফেলা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল জাতি ও অধি-জাতিকে সর্বাঙ্গীণভাবে বিকশিত করা ও পরস্পরের মধ্যে ঐক্য সুনিশ্চিত করা। সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য জাতি গোষ্ঠী বসবাস করে। এইসব জাতিগোষ্ঠী যাতে পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবন বিকশিত করে তুলতে পারে, নতুন সংবিধান তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সকল জাতি ও অধিজাতির বন্ধুত্ব ও মৈত্রীকে শক্তিশালী করা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। কোন জাতি বা অধিজাতির বিরুদ্ধে বৈরিতা প্রচার করা বা অবমাননামূলক কার্যে লিপ্ত হওয়া আদালত কর্তৃক শাস্তিযোগ্য। "প্রত্যেকের অবাধ বিকাশ সকলের অবাধ বিকাশ"—এই মৌলিক নীতি অনুসরণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন নাগরিকদের সৃজনশীলতা, সামর্থ্য ও প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক ভিত্তি

(৮) ১৯৭৭ সালের ব্রেজনেভ সংবিধান বলা বাহুল্য লিখিত। কেননা লিখিত সংবিধান ছাড়া কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সাফল্য লাভ করতে পারে না। সোভিয়েত

সংবিধানে অলিখিত উপাদান খুবই কম। একটি বিশাল বহুজাতিক রাষ্ট্রে যাতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে বিকাশের পথে অগ্রসর হতে পারে, যাতে প্রতিটি নাগরিক জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বাসস্থান, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান অধিকার ও মর্যাদা পায়, যাতে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কর্মসূচী ত্বরান্বিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে সংবিধানে অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্তালিন সংবিধানের মত এই সংবিধান, দুষ্পরিবর্তনীয়। শাসনতন্ত্রের কোন সংশোধন তখনই বৈধ বলে গৃহীত হবে, যখন সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সদস্য উক্ত সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করবে।

লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় এবং সংবিধানের প্রাধান্য

অবশ্য সমালোচকদের মতে যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি মাত্র দল আছে, আর যেহেতু ঐ দল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিতে বিশ্বাস করে, অতএব পার্টি মনে করলে যে কোন সময় সংবিধান সংশোধন করতে পারে। স্তালিন সংবিধানে সংবিধানের প্রাধান্যের কোন উল্লেখ ছিল না, যদিও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধানকেই দেশের সর্বোচ্চ আইন হিসাবে গণ্য করা হয়। কেননা, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধানই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে, নাগরিক অধিকারগুলি সুনিশ্চিত করে এবং রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মূল দর্শন বিবৃত করে। ব্রেজনেভ সংবিধানের ১৭৩ নম্বর ধারায় কিন্তু স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের সর্বোচ্চ আইনগত শক্তি থাকবে। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির সব আইন ও বিধি জারি করা হবে এই সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে। সংবিধানে আরও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি, তাদের কর্মকর্তারা এবং জনসাধারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান ও সোভিয়েত আইনসমূহ মেনে চলবে।

(৯) ব্রেজনেভ সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি রক্ষা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সংবিধানের ৩১ নম্বর ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, "সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির রক্ষা রাষ্ট্রের একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং সমগ্র জনগণের চিন্তার বিষয়।" রাষ্ট্র দেশের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার সামর্থ্য সুনিশ্চিত করে এবং এর জন্য দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সব কিছু সরবরাহ করে। অন্যদিকে সশস্ত্র বাহিনীর কর্তব্য হল সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমিকে রক্ষা করা এবং যে কোন আক্রমণকারীকে প্রত্যাঘাত দেবার মত যুদ্ধপ্রস্তুতি বজায় রাখা। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাতে আরও ত্রুটিহীন ও নিশ্ছিদ্র হয়, প্রতিরক্ষার সামর্থ্য যাতে আরও সুদৃঢ় হয়, তার জন্য রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলির, গণসংগঠনগুলির, সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিকদের কর্তব্যসমূহ সোভিয়েত ইউনিয়নে আইনের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি রক্ষা করার সংকল্প ঘোষিত

(১০) স্তালিন সংবিধানের মত ব্রেজনেভ সংবিধানের সপ্তম অধ্যায়ে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সোভিয়েত

ইউনিয়নের নাগরিকগণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সামাজিক অবস্থান কিংবা স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও অধিকার ভোগ করেন। সংবিধানের ৩৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক—জীবনের সর্বক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের সমান অধিকার সংরক্ষিত। সংবিধানের ৩৬ নম্বর ধারার সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি ও অধিজাতিসমূহের নাগরিকদের সমানাধিকারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারালয়সমূহ "আইনের চোখে নাগরিকদের সমান অধিকার ও মর্যাদার" ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালনা করে। নতুন সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাগ্রসর সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ১৯৩৬ সালের সংবিধানে বর্ণিত অধিকারগুলির উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে। কাজের অধিকার, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ বেছে নেওয়ার অধিকার, বিশ্রাম ও অবসর যাপনের অধিকার, স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার, আবাসনের অধিকার, সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধা ভোগের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বাক্ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ ও মিছিলের অধিকার, ধর্মের অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, অভিযোগ পেশ করার অধিকার, গৃহের অলঙ্ঘনীয়তা, নাগরিক জীবন ও চিঠিপত্রের গোপনীয়তা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের কথা সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সংবিধানের ৩৯ নম্বর ধারায় স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, এই সব অধিকারগুলি কখনই সমাজ বা রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাবে না বা অন্যান্য নাগরিকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না।

অধিকার ও কর্তব্যের তালিকা

ব্রেজনেভ শাসনতন্ত্রের ৫৯—৬৯ নম্বর ধারায় সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের কর্তব্যগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। সোভিয়েত সংবিধান বিশেষজ্ঞরা প্রথম থেকেই এই কথার উপর জোর দিয়ে এসেছেন যে অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের পরিপূরক। স্তালিন সংবিধানে যে কর্তব্যতালিকা ছিল, বর্তমান সংবিধানে বর্ণিত কর্তব্যতালিকা তুলনায় অনেক দীর্ঘ। বর্তমান সংবিধানে বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা-যত্ন করা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বন্যজন্তু রক্ষা করা, ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি রক্ষা করা, জাতি ও অধিজাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী রক্ষা করা, শিশুদের লালন-পালন করা, সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করাকে কর্তব্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এককথায় বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার সম্প্রসারণ ঘটছে। আবার অধিকার ও নাগরিকদের স্বাধীনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকদের কর্তব্য তালিকাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্তালিন সংবিধানের মতই ব্রেজনেভ সংবিধানেও নির্দোষ এবং নির্যাতিত ব্যক্তিদের সোভিয়েত ইউনিয়নে আশ্রয়দানের অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যদি কোন নাগরিক বৈপ্লবিক বা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য, কিংবা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের জন্য, কিংবা প্রগতিশীল মতাদর্শের জন্য

অত্যাচারিত হন কিংবা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হন, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নে তিনি আশ্রয় পাবার অধিকারী। বিদেশী নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কেও ব্রেজনেভ সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক নন, অথচ সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসকারী—এমন সব ব্যক্তিরাও আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করবেন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা অন্যান্য যেসব আইনগত অধিকার সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকেরা ভোগ করেন, সেই অধিকারগুলি বিদেশীরা ভোগ করবেন এবং এই অধিকারগুলি রক্ষার জন্য বিচারালয় বা অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংস্থায় আবেদন করতে পারবেন।

(১১) সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্রেজনেভ সংবিধানের ১৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী নাগরিকরা সীমিত পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ভোগ করেন। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেন কখনো সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের শোষণের ফলে সৃষ্ট না হয়। শোষণ, প্রতারণা, কাঁকি বা অনুপার্জিত আয়ের মাধ্যমে লব্ধ সম্পত্তির অধিকার সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বীকৃত হয়নি। একমাত্র সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রাষ্ট্র স্বীকার করে যে সম্পত্তি নাগরিকদের উপার্জিত আয়ের ফলে সৃষ্টি হয়। দৈনন্দিন ব্যবহার্য ও ব্যক্তিগত ভোগ ও সুবিধার সামগ্রী, একটি ছোট জোতের যন্ত্র, একটি বাড়ি ও অর্জিত সঞ্চয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। এককথায় বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যায় না।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির মর্যাদার স্বীকৃতি

(১২) স্তালিন সংবিধানের মত ব্রেজনেভ সংবিধানেও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি প্রশাসন ব্যবস্থার অন্যতম মূলনীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে। নতুন সংবিধানের ৩ নম্বর ধারায় এই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মূলকথা হল এই যে, ঊর্ধ্বতন স্তর থেকে নিম্নতন স্তর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন সকল সংস্থাকে নির্বাচিত হতে হবে। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি নিজেদের কার্যকলাপের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে দায়ী থাকবে এবং তাদের কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকবে। নিম্নতন সংস্থাগুলি ঊর্ধ্বতন সংস্থাসমূহের সিদ্ধান্ত পালন করতে বাধ্য। তাছাড়া প্রতিটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারীকে নিজেদের কাজের জন্য কৈফিয়ত দিতে হয়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে স্থানীয় উদ্যোগ ও সৃজনশীল কার্যকলাপের সঙ্গে এবং ন্যস্ত কর্মভারের জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও কর্মকর্তার দায়িত্বের সঙ্গে মিলিত করে।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা

(১৩) ১৯৭৭ সালের ব্রেজনেভ সংবিধানের ৬ নম্বর ধারায় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিই মহান অক্টোবর বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ প্রতিহত করে, প্রতিবিপ্লবীদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে কমিউনিস্ট পার্টিই সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রেখেছে এবং সমাজ-

কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

তান্ত্রিক নির্মাণকার্যে গতিবেগ সঞ্চার করেছে। আর যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন বর্তমানে একটি বিকাশপ্রাপ্ত, উন্নত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, ফলে শ্রমজীবী মানুষের অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

নতুন সংবিধানে কমিউনিস্ট পার্টিকে সোভিয়েত সমাজের নেতৃস্থানীয় ও পরিচালনাকারী শক্তি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ও সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও গণসংগঠনের মূলকেন্দ্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির মূল কাজ হল জনগণের সেবা। বলা হয়েছে যে, মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষায় আয়ুধে সজ্জিত কমিউনিস্ট পার্টি—সোভিয়েত সমাজের বিকাশের সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক নীতির সাধারণ গতিপথকে নির্ধারণ করে। কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত জনগণের বিরাট সৃজনশীল গঠনমূলক কাজ পরিচালনা করে এবং কমিউনিজমের জয়ের জন্য তাঁদের সংগ্রামকে এক পরিকল্পিত, প্রণালীবদ্ধ এবং তত্ত্বগতভাবে অটল চরিত্র দান করে। যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটেছে, যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যেক নাগরিক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, ফলে শ্রমজীবী মানুষের দল হিসাবে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই সোভিয়েত রাশিয়ার সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। অন্যান্য বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মত সোভিয়েত রাশিয়ায় একাধিক দল নেই। পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন শ্রেণী থাকার জন্যই বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একাধিক দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

(১৪) স্তালিন সংবিধানের মত ব্রেজনেভ সংবিধানেও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে কোন স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আঠার ও উনিশ শতকেও অনেক বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্যতন প্রধান রক্ষাকবচ বলে মনে করতেন। তাঁদের মতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ না থাকলে সুশাসন কখনোই সম্ভবপর নয়। কিন্তু কমিউনিস্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিতে কোনদিনই আস্থা প্রকাশ করেননি। বরং তাঁরা মনে করেন যে, যেহেতু আইনসভায় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আসন গ্রহণ করেন, যেহেতু আইনসভায় জনসাধারণের ইচ্ছা যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়, অতএব আইনসভাই হল সার্বভৌম ক্ষমতার আধার। শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ আইনসভার অধস্তন বিভাগ হিসাবে কাজ করবে—এটাই স্বাভাবিক। তাই ১৯৭৭ সালের ব্রেজনেভ সংবিধানেও সুপ্রীম সোভিয়েত, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাকে সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা কিংবা বিচার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার তিনটি বিভাগ মোটামুটি স্বাধীনভাবে কাজ করে, কিন্তু তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভার প্রাধান্য সংবিধানে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অস্বীকৃতি

(১৫) ১৯৭৭ সালের সংবিধানেও সোভিয়েত রাশিয়ার কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করা হয়েছে। বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার

আইনসভা দু'টি কক্ষ নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত। একটি কক্ষের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন জনসংখ্যার ভিত্তিতে, অন্য কক্ষের সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন অঙ্গরাজ্যসমূহের সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসারে। বলা হয়, অঙ্গরাজ্যসমূহের সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত দ্বিতীয় কক্ষ রাজ্যগুলির সমান অধিকার ও মর্যাদার তত্ত্বকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে আমরা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা দেখতে পাই। সোভিয়েত আইনসভার বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষই সমান ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে। উভয় কক্ষের প্রতিনিধিরাই প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত। আইন প্রণয়ন, কিংবা সংবিধান সংশোধন কিংবা মন্ত্রিসভাকে নির্দেশ দান—যে কোন বিষয়ে উভয় কক্ষ সমান ক্ষমতার অধিকারী। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ, কিংবা প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশনে নির্বাচিত হন। নতুন সংবিধানে সুপ্রীম সোভিয়েতে নির্বাচন প্রার্থীদের বয়স ২৩ থেকে কমিয়ে ২১-এ আনা হয়েছে। ইউনিয়নের সোভিয়েত এবং জাতিপুঞ্জের সোভিয়েতে এখন সমানসংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হন। জাতিপুঞ্জের সোভিয়েতে এখন প্রত্যেক রিপাবলিক থেকে ৩২ জন, প্রত্যেক স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র থেকে ১১ জন, প্রত্যেক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল থেকে ৫ জন এবং প্রত্যেক জাতীয় এলাকা থেকে ১ জন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। বহুজাতিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতিপুঞ্জের সোভিয়েতে রাশিয়ায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি ও অধিজাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা

(১৬) স্তালিন সংবিধানের মত ব্রেজনেভ সংবিধানে একজন রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে ৩৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী বা প্রেসিডিয়ামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রেসিডিয়াম বা রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী যৌথ নেতৃত্বের ভিত্তিতে কাজ করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় রীতি অনুসারে প্রেসিডিয়ামের ১৫ জন সদস্য প্রতি কয়েকটি ইউনিয়ন রিপাবলিক থেকে নির্বাচিত হন। তাছাড়া এই প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েতের দু'টি অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে চূড়ান্ত রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। কিন্তু যেহেতু প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন, আর যেহেতু প্রেসিডিয়ামের যাবতীয় সিদ্ধান্ত সুপ্রীম সোভিয়েতের পরবর্তী অধিবেশনের অনুমোদন সাপেক্ষ, সুতরাং বলা যায় প্রেসিডিয়ামের মূল ভিত্তি হল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি। যখন সুপ্রীম সোভিয়েতের কোন অধিবেশন থাকে না তখন এই প্রেসিডিয়ামের কাছে মন্ত্রিপরিষদ দায়ী থাকে।

প্রেসিডিয়াম

(১৭) স্তালিন সংবিধানের মত ব্রেজনেভ সংবিধানেও কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-বিভাগ পরিচালনা করার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মন্ত্রি-পরিষদ সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে গঠিত হয়। কিন্তু ব্রিটেন বা ভারতের মত সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক

মনোনীত হন না। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ সুপ্রীম সোভিয়েতের যুগ্ম অধিবেশনে নির্বাচিত হন। প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব মন্ত্রীদের যে প্যানেল বা তালিকা তৈরি করেন, সুপ্রীম সোভিয়েত সেই তালিকা অনুমোদন করে মাত্র। অন্যদিকে আবার সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই সরকার পরিচালিত হয়। তিনি একাধারে মন্ত্রিসভার নেতা, আইনসভার নেতা, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং জাতীয় নেতা। তিনি যেন পূর্ণিমার চাঁদ, যাঁর চারপাশে অন্যান্য মন্ত্রীরা নক্ষত্রের ন্যায় ম্লান ও দীপ্তিহীন। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যান সব সময় দেশের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও গুরুত্বপূর্ণ নেতারূপে বিবেচিত নাও হতে পারেন। মন্ত্রিসভার চেয়ারম্যান কোসিগিন বা টিগোনভের তুলনায় দলের সম্পাদক ব্রেজনেভ বা আন্দ্রোপভ অনেক বেশি মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করতেন। কিন্তু একথা ঠিক যে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রশাসনকে এমন অনেক কাজ সম্পন্ন করতে হয়, যা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রশাসনকে সম্পন্ন করতে হয় না। ফলে প্রশাসনের শীর্ষে অবস্থিত সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদও যথেষ্ট ক্ষমতা ভোগ করে।

মন্ত্রিপরিষদ

(১৮) নতুন ব্রেজনেভ সংবিধানেও স্তালিন সংবিধানের মত নির্বাচিত বিচারপতির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিচারপতিগণ হয় আইনসভা নতুবা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। বিচারকার্যে তাঁদের সহায়তা করেন জনগণের অ্যাসেসর। বিচারকার্য আঞ্চলিক ভাষায় পরিচালিত হয়। কোন পেশাদার আইনজীবীশ্রেণীর অস্তিত্ব সোভিয়েত রাশিয়ায় নেই। আইনের শাসন যাতে বজায় থাকে, অপরাধীদের যাতে ঠিকমত শাস্তি হয়, নির্দোষ ব্যক্তিদের যাতে কোন সাজা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখে প্রোকিউরেটারের দপ্তর। সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রোকিউরেটার জেনারেল সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং তিনি সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে দায়ী থাকেন। সোভিয়েত সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ বিচার বিভাগের তথাকথিত স্বাধীনতা বা নিরপেক্ষতার তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে বিচারগণ প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার স্বার্থেই কাজ করেন। অতএব সোভিয়েত রাশিয়ায় বিচারকদের প্রধান কর্তব্য হল সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা, তাকে শক্তিশালী করা। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বিচারের নামে যে অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়, তা সোভিয়েত বিচারব্যবস্থায় দেখা যায় না। সোভিয়েত রাষ্ট্রে বিচার পদ্ধতি অনেক দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত।

সোভিয়েত বিচার ব্যবস্থা

(১৯) নতুন শাসনব্যবস্থায় সুইজারল্যাণ্ডের মত জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গণভোটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই গণভোট সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে আরও দৃঢ় ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করবে। শাসনতন্ত্রের পাঁচ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সমগ্র জনগণের আলোচনার জন্য পেশ করা হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমগ্র জনগণের ভোটে নেওয়া হবে। শাসনতন্ত্রের ১০৮ নম্বর এবং ১৩৭ নম্বর ধারায় পুনরায় এই গণভোট প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে।

গণভোটের ব্যবস্থা

পাঁচ | আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও নীতি
Socio-Economic Structure and Policy

এক : সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক কাঠামোর নীতিসমূহ এবং কর্মনীতি
(Principles of the Social Structure and Policy of the U. S. S. R.)

ক. রাজনৈতিক ব্যবস্থা (The Political System)

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকেরা জারের স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদ করে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। গড়ে তুলেছিল সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা। সোভিয়েত রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি ও অধিজাতিগোষ্ঠীকে দিয়েছিল স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার। উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর সামাজিক মালিকানা স্থাপন করে, ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার যাবতীয় অবশিষ্টকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা ও আইনের শাসন সুনিশ্চিত করে সোভিয়েত রাশিয়ার জনগণ এখন এক উন্নত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেছে। ব্রেজনেভ সংবিধানে সোভিয়েত জনগণের এই জয় প্রতিফলিত হয়েছে। এই সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।

এই সংবিধানের প্রথম অংশেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক কাঠামোর নীতি-সমূহ ও কর্মনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম অংশ মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং এই অংশে সর্বসমেত মোট ৩২টি ধারা আছে। শাসনতন্ত্রের ১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন হল সমগ্র জনগণের একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র (A Socialist State of the whole people)। আরও বলা হয়েছে যে, এই রাষ্ট্র শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক সমাজ এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর, দেশের সকল জাতি ও অধিজাতির শ্রমজীবী মানুষের ইচ্ছা ও স্বার্থকে ব্যক্ত করে। নতুন সংবিধানে শ্রমিক, কৃষক ছাড়াও বুদ্ধিজীবীদের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। স্তালিন সংবিধানে সোভিয়েত রাশিয়াকে শ্রমিক কৃষকের একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। কিন্তু নতুন সংবিধানে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কেনন, একথা এখন সকলেই স্বীকার করেন যে, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র

শ্রমিক ও কৃষকের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নকে এখন সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু সোভিয়েত রাশিয়ার প্রত্যেক নাগরিক এখন শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, যেহেতু উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা ও কৃৎকৌশলের সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে, যেহেতু শিক্ষার অধিকার সকলেই ভোগ করে, যেহেতু যৌথ খামারের কৃষকেরাও সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে, যেহেতু শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পার্থক্য দ্রুত লোপ পাচ্ছে, তাই এখন ব্রেজনেভ সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নকে

সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রেজনেভের ভাষায়, "পুরোপরি সমাজতন্ত্র অর্জিত হওয়ার পর এবং জনগণের সকল অংশ শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শ ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার পর আমাদের রাষ্ট্র প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র হিসাবে আবির্ভূত হলেও দেশের সকল মানুষের রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে"।

কিন্তু সমালোচকদের মতে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র কথাটি মার্কসীয় তত্ত্বের বিরোধী। তাঁদের মতে রাষ্ট্র কখনই সমগ্র জনগণের হতে পারে না। রাষ্ট্র হল একটি শ্রেণীর দমনযন্ত্র, বল প্রয়োগের হাতিয়ার। তাই রাষ্ট্র কখনোই সমগ্র জনগণের হতে পারে না। একথা ঠিক যে, সোভিয়েত রাশিয়ায় রাষ্ট্র শতকরা ৯৮ জন মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে। যেহেতু সোভিয়েত রাশিয়ায় নাগরিকগণ শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, তাই রাষ্ট্রকে বলা যায় শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু যখন পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ একটি শক্তিশালী উপাদান হিসাবে কাজ করেছে, তখন শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের ওপর জোর না দিয়ে সোভিয়েত নেতৃত্ব কার্যত সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার বিরুদ্ধেই কাজ করছেন বলে সমালোচনা করা হয়।

সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র —সমালোচনা

সংবিধানের ২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, "সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে জনগণের হাতে। জনগণের ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির মাধ্যমে জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। জনগণের ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলিই হল সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ভিত্তি। অন্য সব রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ জনগণের ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তাদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জনগণের ডেপুটিদের এই সোভিয়েতগুলি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আইনসভা থেকে আলাদা। এই সব সোভিয়েতগুলি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি বা ডেপুটিদের নিয়ে গঠিত। আর এই সব সোভিয়েতে বুর্জোয়া জমিদার বা অন্য কোন শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি নেই। সোভিয়েত রাশিয়ায় সুদূর পল্লী অঞ্চল থেকে রাজধানী মস্কো পর্যন্ত অসংখ্য নির্বাচিত সোভিয়েত রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। দেশের সর্বোচ্চ সোভিয়েত হল সোভিয়েত রাশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েত, আর সর্বনিম্নে আছে জনগণের ডেপুটিদের সোভিয়েত। লেনিনের মতে, "সোভিয়েত সরকারের সার মর্ম হল এই যে ধনতন্ত্র দ্বারা নিপীড়িত শ্রেণীগুলির ব্যাপক ভিত্তি সংগঠনই হবে রাষ্ট্র ক্ষমতা ও সমগ্র রাষ্ট্র যন্ত্রের স্থায়ী এবং একমাত্র ভিত্তি।"

৩নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সংগঠিত হবে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অর্থ হল : রাষ্ট্র কর্তৃত্বের সকল সংস্থা—ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত নির্বাচিত হবে। রাষ্ট্র কর্তৃত্বের সকল সংস্থা জনগণের কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকবে। ঊর্ধ্বতন সংস্থার সিদ্ধান্ত বা আদেশ অধস্তন সংস্থাগুলি মানতে বাধ্য থাকবে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে স্থানীয় উদ্যোগ ও সৃষ্টিশীল কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

শুধু তাই নয়, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিয়তার নীতি প্রতিটি রাষ্ট্রীয় সংস্থার ক্ষমতা ও কর্মকর্তাদের দায়িত্বের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে।

সংবিধানের ৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্র ও তার সব সংস্থা সমাজতান্ত্রিক আইনের ভিত্তিতে কাজ করবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সমাজের স্বার্থ সুরক্ষিত করা, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ সুনিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন ও সংবিধান মেনে চলা রাষ্ট্রীয় সংস্থা, সরকারী প্রতিষ্ঠান বা সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। সংবিধানে আইনের শাসনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কেননা আইন, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক আইন ঠিকমত প্রতিপালিত না হলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কখনই দ্রুত গড়ে উঠতে পারে না।

৫ নম্বর ধারায় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গণভোট গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সমগ্র জনগণের আলোচনার জন্য পেশ করা হবে এবং সমগ্র জনগণের কাছে ভোটে দেওয়া হবে। সংবিধানের ১০৮ নম্বর এবং ১৩৭ নম্বর ধারায়ও গণভোটের কথা বলা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী জনসাধারণ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের কাজকর্মের উন্নতির জন্য বা ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য প্রস্তাব পেশ করতে পারে। সমালোচনার জন্য যাতে কোন নাগরিককে হয়রানি না করা হয়, সেজন্য সংবিধানে হয়রানির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তিদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

সংবিধানের ৬ নম্বর ধারায় কমিউনিস্ট পার্টিকে "সোভিয়েত সমাজের নেতৃস্থানীয় ও পরিচালনাকারী শক্তি এবং দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সকল রাষ্ট্রীয় ও গণসংগঠন সমূহের নিউক্লিয়াস" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জনগণের জন্যই কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব, আর জনগণের স্বার্থেই কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিনিয়ত কাজ করে চলে। বলা হয়, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত সমাজ বিকাশের সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির সাধারণ গতিপথকে নির্ধারণ করে। পার্টি সোভিয়েত জনগণের বিরাট গঠনমূলক কাজকে পরিচালনা করে এবং কমিউনিজমের জয়ের জন্য তাদের সংগ্রামকে এক পরিকল্পিত, প্রণালীবদ্ধ ও তত্ত্বগতভাবে অটল চরিত্র দান করে। সব পার্টি সংগঠনকেই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে হয়। বলা হয়, যেহেতু সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রেণী বিরোধের কোন স্থান নেই, সেজন্যই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মত সোভিয়েত ইউনিয়নে একাধিক রাজনৈতিক দলের কোন প্রয়োজন নেই। বিকাশপ্রাপ্ত সমাজতন্ত্রের স্তর থেকে কমিউনিজমের দিকে যে অগ্রগতি, সেই অগ্রগতি একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই সম্ভব বলে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন।

সংবিধানের ৭ নম্বর ধারায় সোভিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন সংগঠনের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর প্রত্যেক সমাজব্যবস্থায় সমাজের

বিকাশে, ব্যক্তি-মানুষের অধিকার রক্ষায় গণসংগঠনগুলি বিরাট ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে এইসব সামাজিক সংস্থা বা সংগঠনের একটা ইতিবাচক ভূমিকা আছে। তাই সংবিধানের ৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী, ট্রেড ইউনিয়নগুলি, সারা ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগ সমবায়গুলি এবং অন্যান্য সংগঠনগুলি তাদের বিধিবদ্ধ লক্ষ্য অনুসারে রাষ্ট্রীয় ও সরকারী বিষয়ের পরিচালনায় এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে।

সংবিধানের ৮ নম্বর ধারায় সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ সংস্থাগুলির ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই যৌথ সংস্থাগুলি সমাজতান্ত্রিক সমকক্ষতার অভিযান, কাজের প্রগতিশীল পদ্ধতির প্রসার এবং উৎপাদন শৃঙ্খলার শক্তিবৃদ্ধির জন্য সাহায্য করে। কমিউনিস্ট নৈতিকতায় নিজেদের সদস্যদের শিক্ষিত করে তোলা, তাদের রাজনৈতিক চেতনার প্রসার, তাদের সাংস্কৃতিক মান, দক্ষতা এবং গুণাবলী উন্নত করার চেষ্টা করে। এই সব যৌথ সংস্থা কাজের ও জীবন ধারণের মান উন্নত করার চেষ্টা করে, সামাজিক অগ্রগতিতে সহায়তা করে, সমাজ বিকাশের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে সাহায্য করে, কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এককথায় সমাজতন্ত্র বিকাশিত করার কাজে, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এই সব যৌথ সংস্থায় যে বিরাট ভূমিকা আছে, তা সংবিধানে স্বীকার করা হয়েছে।

সংবিধানের ৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান গতিমুখ হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ। সমাজ ও রাষ্ট্রের যে কোন বিষয় পরিচালনায় নাগরিকদের ব্যাপক অংশ গ্রহণ, রাষ্ট্রযন্ত্রের অবিরাম উন্নতি, গণসংগঠনগুলির কাজকর্মের সমোন্নয়ন, জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি, প্রশাসন ও সমাজজীবনের সর্বস্তরে আইনের শাসনের মর্যাদা বৃদ্ধি, আরও খোলামেলা ভাবে ও প্রকাশ্যে কাজকর্ম করা এবং জনমত বা জনসাধারণের সমালোচনা মেনে নেওয়া সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে প্রসারিত করার উপায়।

সমালোচনা

সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সমালোচকরা তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে ব্রেজনভ সংবিধানের মূল কথা হল সংশোধনবাদ। এই সংশোধনবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতা থেকে গুরুতর বিচ্যুতি। প্রথমেই তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন এই বলে যে, মার্কসবাদ চিরকাল রাষ্ট্রকে একটি শ্রেণীর দমন যন্ত্র, শোষণের হাতিয়ার হিসাবেই বর্ণনা করে এসেছে। রাষ্ট্রের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও হল শ্রমিক শ্রেণীর হাতে একটি দমনযন্ত্র মাত্র। তাই স্তালিন সংবিধানে সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থাকে সর্বহারার একনায়কত্ব হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। কিন্তু সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র কথাটি সর্বহারার একনায়কত্বের ধারণাকে অস্বীকার করে।

দ্বিতীয়ত, সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র বলে যখনই সোভিয়েত ইউনিয়নকে বর্ণনা করা হয়েছে, তখনই সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে অত্যন্ত সচেতনভাবেই শ্রমিক শ্রেণী তথা কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রগামী ভূমিকাকে অস্বীকার করেছেন।

তৃতীয়ত, কমিউনিস্ট পার্টিকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে হবে, এই নির্দেশ দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাধান্যের পরিবর্তে সংবিধানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের প্রাধান্য একটি বুর্জোয়া তত্ত্ব মাত্র—যে তত্ত্বের আড়ালে বুর্জোয়ারা নিজেদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ট্রেড ইউনিয়ন সহ অন্যান্য গণসংগঠনের ভূমিকাকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরোধী বলে সমালোচনা করা হয়েছে। গণভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, তাও এক হিসাবে মার্কসবাদের বিরোধী। কেন না সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের সময় প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। এই সিদ্ধান্ত নেবে কমিউনিস্ট পার্টি—যে পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিয়ে গঠিত। সুতরাং জনগণের কাছে সব বিষয় পেশ করার অর্থ হল পার্টি নেতৃত্বকে অস্বীকার করা। এক কথায় বলা যায়, "সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র" কথাটি সমালোচকদের মতে এক গুরুতর সংশোধনবাদী বিচ্যুতি।

খ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (The Economic System)

ব্রেজনেভ সংবিধানে বিস্তারিতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সংবিধানের ১০ নম্বর থেকে ১৮ নম্বর ধারায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল সমগ্র জনগণের মালিকানাধীন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, যৌথ খামার ও অন্যান্য সমবায়মূলক সম্পত্তির আকারে অবস্থিত উপাদানের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা। এককথায় বলা যায়, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, যৌথ খামারের সম্পত্তি এবং অন্যান্য সমবায়মূলক সম্পত্তিই হল সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি। ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য গণসংগঠনগুলির সম্পত্তিও সমাজতান্ত্রিক মালিকানার অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রের কাজ হল সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিকে রক্ষা করা এবং এই সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি যাতে বৃদ্ধি পায় তার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বা লাভের জন্য নাগরিকগণ যেন সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিকে ব্যবহার না করে।

ব্রেজনেভ সংবিধানের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির প্রধান রূপ হিসাবে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে। জল, খনিজ সম্পদ, ভূমি এবং বন এককভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। পরিবহন ও যোগাযোগের উপায়গুলি, ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্র পরিচালিত বাণিজ্য ও জনকৃত্যক-সমূহের এবং অন্যান্য রাষ্ট্রচালিত প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শহরাঞ্চলের আবাসন এবং রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিক হল রাষ্ট্র। তাছাড়া রাষ্ট্র শিল্প, নির্মাণকার্য ও কৃষির উৎপাদনের মালিক (১১নং ধারায়), যৌথ খামার এবং সমবায়

সমূহের সম্পত্তি বলতে কি বোঝায় তা সংবিধানের ১২নম্বর ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। যৌথ খামারগুলির ব্যবহৃত জমি রাষ্ট্রীয় জমি হলেও সেগুলি তাদের অবাধ ব্যবহারের জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রদান করা হয়। যৌথ খামারগুলির কর্তব্য হল প্রদত্ত জমিকে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা, তার যত্ন নেওয়া এবং উর্বরতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা। রাষ্ট্র যৌথখামার এবং সমবায়মূলক সংগঠনগুলির সম্পত্তির প্রসারে চেষ্টা করে এবং এইসব সম্পত্তিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানার পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য চেষ্টা করে (১২নং ধারা)।

সংবিধানের ১৩ নম্বর ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নে অর্জিত আয়ই একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি বলে পরিগণিত হবে। দৈনন্দিন ব্যবহার্য ও ব্যক্তিগত ভোগ ও সুবিধার সামগ্রী, ছোট যন্ত্র ও অন্যান্য জিনিস একটি বাড়ী ও অন্যান্য আয় নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি গঠিত। নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত। কিন্তু নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কখনোই অনার্জিত আয় করার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হবে না, কিংবা তাকে সমাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজে লাগান হবে না। আইন অনুযায়ী নাগরিকগণ ছোট বাগান, গবাদি পশুপালন বা হাঁসমুরগীর চাষ, বসতবাড়ি নির্মাণের জন্য জমি ব্যবহার করতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে নাগরিকরা নিজেরাই পরিশ্রম করেন, অনার্জিত আয় বা মুনাফার মাধ্যম হিসাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবহার সেখানে নিষিদ্ধ।

ব্রেজনেভ সংবিধানে নাগরিকদের শ্রমের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সমাজের সম্পদবৃদ্ধির জন্য, সোভিয়েত জনগণের কল্যাণের জন্য এই শ্রম অত্যন্ত জরুরী। শ্রম ও ভোগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক নীতি মেনে চলে। এই নীতি হল: "প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে, প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী পাবে" (১৪নং ধারা)। সোভিয়েত ইউনিয়নে নাগরিকের মর্যাদা নির্ভর করে তার কাজের ওপর এবং সেই কাজের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের ওপর। বৈষয়িক ও নৈতিক প্রেরণাকে (Incentives) একত্র করে এবং কাজের প্রতি উদ্ভাবনমূলক সৃজনশীল মনোভাবকে উৎসাহ দিয়ে রাষ্ট্র শ্রমকে প্রতিটি নাগরিকের জীবনে একটা মর্যাদা ও সম্মানের বিষয় করে তোলার প্রয়াস পায়।

সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার লক্ষ্য বর্ণনা আর্থিক ব্যবস্থার আলোচনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উৎপাদন ব্যবস্থার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, এ নিয়ে নিশ্চয়ই বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য থাকবে। কারণ, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন এবং অপরের শ্রম শোষণ। আর সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল জনকল্যাণ। তাই সংবিধানের ১৫নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার লক্ষ্য হল, "জনগণের ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক প্রয়োজনের সম্ভাব্য পূর্ণতম পরিতৃপ্তি"। শ্রমজীবী মানুষের সৃজনশীল উদ্যোগ সমাজতান্ত্রিক সমক্ষমতার আন্দোলন এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী প্রগতির ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্র

শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন নৈপুণ্য ও দক্ষতা এবং তার কাজের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির চেষ্টা করে। আর এই ভাবেই রাষ্ট্র আর্থিক ব্যবস্থার এক গতিময়, পরিকল্পিত এবং আনুপাতিক উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করে তোলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক ব্যবস্থা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডে সামাজিক উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের সবগুলি উপাদানকে নিয়ে গঠিত এক অখণ্ড অর্থনৈতিক সমাহার। বিভাগীয় ও আঞ্চলিক নীতিগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

আর্থিক ব্যবস্থা পরিচালনাকালে বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাগত স্বাধীনতা ও উদ্যোগ সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বব নির্দেশকে একত্র করা হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনকালে হিসাব-নিকাশ, মুনাফা, ব্যয় ও অন্যান্য আর্থিক প্রেরণাকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা হয়।

সংবিধানের ১৮ নম্বর ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়নে জমি, খনিজ ও জলসম্পদ, প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ রক্ষা করার এবং যুক্তিযুক্তভাবে ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই সব সম্পদ ব্যবহার করার চেষ্টা করা হবে। বায়ু ও জলের বিশুদ্ধতা যাতে বজায় থাকে, প্রাকৃতিক সম্পদের পুনরুৎপাদন যাতে নিশ্চিত করা যায়, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে তার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সমালোচনা ও মূল্যায়ন

ব্রেজনেভ সংবিধানের সমালোচকরা মনে করেন যে, সংবিধানের ১৩ নম্বর ধারা এখনো বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার অবশেষকে রক্ষা করছে। কেন না, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার এবং উত্তরাধিকার প্রথা থেকেই গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও আভিজাত্য। এই অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং আভিজাত্য বংশমর্যাদার সঙ্গে যুক্ত নতুন সামাজিক স্তর বা শ্রেণীর সৃষ্টি করে। সমালোচকদের মতে মহান্ অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর প্রায় সত্তর বছর অতিক্রান্ত হতে চলল, কিন্তু এখনো ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবলোপ সোভিয়েত ইউনিয়নে ঘটেনি। কিন্তু এসব সমালোচনা সত্ত্বেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, যৌথ খামারের সম্পত্তি এবং সমবায়সমূহের সম্পত্তিই প্রধান। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালনা, পরিকল্পিত অর্থনীতি, সকলের জন্য কাজের অধিকার, উপযুক্ত মজুরি ও বিশ্রামের অধিকার সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে দিনের পর দিন দৃঢ় ও সংহত করে তুলেছে। যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান বেকারি, লাগামহীন মুদ্রাস্ফীতি, শিল্পে মন্দা জনজীবন বিপন্ন করে তুলেছে, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের মত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন বেকার বা ভিখারী নেই। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত

সদ্ব্যবহার, প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখা ইত্যাদি দিকেও সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিক প্রগতির দিকে সঠিক দিক নির্দেশ করেছে।

দুই : সামাজিক বিকাশ ও সংস্কৃতি (Social Development and culture)

সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারা থেকে ২৭ নম্বর ধারায় সামাজিক বিকাশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিকাশ একটা নির্দিষ্ট ধরনের সামাজিক বিকাশ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর জোর দিলেই সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা যায় না। সমাজতন্ত্র মানুষের মনে কতগুলি ইতিবাচক ধ্যানধারণা সৃষ্টি করে, তাকে কুসংস্কার, ধর্মীয় উন্মাদনা ও জাতিবিদ্বেষ থেকে মুক্তি দেয়, তাকে সমাজমনস্ক করে তোলে, তার নান্দনিক বোধকে উদ্দীপ্ত করে।

সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি

সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক জীবনের ভিত্তি হল, "শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের অটুট মৈত্রী।" রাষ্ট্রের কাজ হল শ্রেণীগত পার্থক্য দূর করা, শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে, কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য মুছে ফেলা এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় সকল জাতি ও অধিজাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সুনিশ্চিত করে তাদের আরও পরস্পরের কাছে নিয়ে আসা।

সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রত্যেক ব্যক্তি তার আত্মবিকাশের অবাধ সুযোগ পায়। "প্রত্যেকের অবাধ বিকাশ সকলের অবাধ বিকাশের শর্ত"—সমাজ বিকাশের এই কমিউনিস্ট শর্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন শাসনতন্ত্র তুলে ধরেছে (২০নং ধারা)। এই নীতি অনুসরণ করে রাষ্ট্র নাগরিকদের সৃজনশীল ক্ষমতা, সামর্থ্য ও প্রতিভা স্ফুরণে সহায়তা করে এবং তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সবরকম সাহায্য দেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার, কাজের অধিকার, জাতি ও অধিজাতিগুলির স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার, যাবতীয় সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণী দ্বন্দ্বের অবসান ব্যক্তিমানুষের অবাধ বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছে।

ব্যক্তির বিকাশ

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য হল কাজের পরিবেশ উন্নত করা, শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালী করা এবং কাজের বিজ্ঞানসম্মত সংগঠনের ব্যবস্থা করা। উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাপক যন্ত্রীকরণ ও অটোমেশনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সকল শাখায় রাষ্ট্র কায়িক শ্রম হ্রাস করার এবং শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত করার পথ গ্রহণ করবে (২১নং ধারা)।

কায়িক শ্রম হ্রাস করা

সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষি কাজকে শিল্প শ্রমেরই এক বিশেষ পর্যায়ে আনার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চলছে। পল্লী অঞ্চলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা, হোটেল, রেস্তোরা ও অন্যান্য জনসেবামূলক ব্যবস্থার বিপুল সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ক্ষুদ্র পল্লী ও গ্রামগুলিকে সুপরিকল্পিত ও সুব্যবস্থা-যুক্ত উপনগরীতে পরিণত করার চেষ্টা করা হবে। এইভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়নে পল্লীঅঞ্চল ও শহরের মধ্যে পার্থক্য বিলোপ করার চেষ্টা হচ্ছে।

গ্রামীণ জীবনের উন্নয়ন

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হল নাগরিকদের মজুরীর স্তর ও প্রকৃত আয় বৃদ্ধির জন্য অবিরাম চেষ্টা করা। রাষ্ট্র উৎপাদন ক্ষমতা নিরন্তর বৃদ্ধি করে এই লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করে। তাছাড়া জনসাধারণের প্রয়োজন পরিপূর্ণভাবে মেটাবার জন্য সামাজিক ভোগ তহবিল সৃষ্টি করার ব্যবস্থা আছে। গণসংগঠনগুলি ও কাজের যৌথ সংস্থাগুলির ব্যাপক সহায়তায় রাষ্ট্র এই সামাজিক ভোগ তহবিলের বৃদ্ধি ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টন সুনিশ্চিত করে (২৩নং ধারা)।

মজুরী ও প্রকৃত আয়ের স্তর উন্নয়ন করা

সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বাস্থ্য রক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, আহার্য সরবরাহ ব্যবস্থা, পৌর ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় নানাবিধ সেবামূলক কাজ রাষ্ট্র সব সময়ই সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করে চলেছে। রাষ্ট্র সমবায় সমিতি ও অন্যান্য গণসংগঠনগুলিকে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সেবামূলক কাজ সম্প্রসারিত করার জন্য উৎসাহ দেয়। রাষ্ট্র জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শরীর চর্চা ও খেলাধূলায় অংশগ্রহণকে উৎসাহ দান করে (২৪নং ধারা)।

নাগরিক সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণ

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যেক নাগরিক শিক্ষার অধিকার ভোগ করে। সর্বসাধারণের জন্য একই রকম শিক্ষাব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবর্তন করা হয়েছে। এই শিক্ষার মান সমুন্নয়নের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্য সাধারণ ও বৃত্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করে, তরুণদের কমিউনিস্ট ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হওয়ায় শিক্ষা দেয় এবং তাদের বুদ্ধিগত ও দৈহিক বিকাশে সহায়তা করে। তাছাড়া রাষ্ট্র নাগরিকদের কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দেয় এবং সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে (২৫নং ধারা)।

নাগরিকদের জন্য শিক্ষা

সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিকল্পিত ভাবে বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দেয় এবং বৈজ্ঞানিক কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। বিজ্ঞানচর্চার ফল বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ যাতে অর্থনৈতিক জীবন বা সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় তার দিকেও রাষ্ট্র লক্ষ্য রাখে (২৬নং ধারা)। রাষ্ট্র দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ রক্ষা করা এবং সাংস্কৃতিক মান যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করে। জনসাধারণের নান্দনিক ও নৈতিক চেতনা যাতে উন্নত হয়, দেশের সাধারণ মানুষ যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক সম্পদ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সজাগ থাকে, সেদিকে রাষ্ট্র লক্ষ্য রাখে। পেশাদার সৌখীন কিংবা লোকশিল্পীদের রাষ্ট্র সম্ভাব্য সবরকম ভাবে উৎসাহ দিয়ে থাকে (২৭নং ধারা)।

সমালোচনা

সংবিধানে সাধারণ নাগরিকদের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন করার এই চেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য। কুসংস্কার, জাতিদম্ভ যাতে সাধারণ নাগরিকদের চেতনা

আচ্ছন্ন না করে, যাতে তারা প্রয়োজনীয় শিক্ষা পায় এবং মুক্ত বুদ্ধির শরিক হয়, যাতে তাদের জীবনযাত্রার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় সেদিকে সংবিধান প্রণেতারা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। কিন্তু সমালোচকদের মতে মজুরীর হার বৃদ্ধি করে নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ করা যায় না। ২৭ নম্বর ধারায় যে পেশাদার সাংস্কৃতিক সংস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সমালোচকদের মতে এই পেশাদার সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ঠিক খাপ খায় না। বলা হয়েছে যে, এই ধারায় বর্ণিত নৈতিকতা ও নান্দনিক বোধের তত্ত্ব বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সমালোচকদের মতে সংবিধানের ১৩ নম্বর ধারা আর্থিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্য স্বীকার করে নিয়েছে, ২৭ নম্বর ধারায় সেই আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাষ্ট্রে কোন পেশাদার সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তারা মনে করেন না।

তিন : সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি (Foreign Policy of U.S S.R.)

মহান্ অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর থেকেই সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতি নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অপপ্রচারের শেষ ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির ক্রোধের সীমা ছিল না, যখন রাশিয়া একতরফা ভাবে জার্মানীর সঙ্গে ব্রেস্টলিটভস্কের শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। পরে ট্রট্স্কির চিরস্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্ব অগ্রাহ্য করে রাশিয়া গ্রহণ করল স্তালিনের এই নীতি যে সমাজতন্ত্র একটি রাষ্ট্রেই গড়ে তোলা সম্ভব। স্তালিনের নেতৃত্বে রাশিয়া লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করে। কিন্তু বারবার সাম্রাজ্যবাদীরা চেষ্টা করে যাতে সোভিয়েত রাশিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাই তারা রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রতিবিপ্লবীদের, অন্তর্ঘাতকদের সাহায্য করে, গৃহযুদ্ধে উস্কানি দেয়। এমনকি নাৎসী ও ফ্যাশিস্টরা সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্তে ব্রিটেন, ফ্রান্স বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তরিক সমর্থন লাভ করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্ধকার দিনগুলিতে রাশিয়াকে প্রায় একক ও নিঃসঙ্গভাবে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। কিন্তু এত বাধা, ঝড়-ঝঞ্ঝা সত্ত্বেও এখন সোভিয়েত রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তি।

পটভূমিকা

শাসনতন্ত্রের ২৮ নম্বর ধারা থেকে ৩০ নম্বর ধারায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতির আদর্শ ও লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে। ২৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন অটলভাবে শান্তির লেনিনবাদী কর্মনীতি অনুসরণ করছে এবং জাতিসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় শক্তি বৃদ্ধি ও বিস্তৃত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পক্ষে দাঁড়াচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিকনীতির মূল লক্ষ্য হল রাশিয়ার কমিউনিজম নির্মাণের অনুকূল আন্তর্জাতিক অবস্থা সুনিশ্চিত করা, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করা, বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের অবস্থান ভূমিকে শক্তিশালী করা, জাতির মুক্তি ও সামাজিক বিকাশের জন্য

বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য

জাতিসমূহের সংগ্রাম সমর্থন করা, আগ্রাসী যুদ্ধ প্রতিহত করা, সর্বজনীন এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করা এবং বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা সমন্বিত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করাকে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যুদ্ধের স্বপক্ষে কোন রকম প্রচার সোভিয়েত রাশিয়ায় নিষিদ্ধ।

কোন কোন নীতির ভিত্তিতে অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন পররাষ্ট্র সম্পর্ক পরিচালনা করবে, সংবিধানে সে বিষয় বিশদ করে বলা হয়েছে। এই নীতিগুলি হল: সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সমান অধিকার স্বীকার করা, বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের হুমকি পরিহার করা, প্রত্যেক রাষ্ট্রের সীমান্তের অলঙ্ঘনীয়তাকে স্বীকার করা, রাষ্ট্রগুলির ভূমিগত অখণ্ডতা মেনে চলা, সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা এবং অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা। সাধারণ মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, প্রত্যেক জাতির সমান অধিকার ও নিজের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার স্বীকার করা। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক আইনের সর্বজনস্বীকৃত নীতি ও প্রথাসমূহ মেনে চলা এবং সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি, চুক্তি, বা আন্তর্জাতিক দায় দায়িত্বগুলি সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক অকপটে পালন করা। এই নীতিগুলিকে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির মূল ভিত্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে (২নং ধারা)।

পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শরিক হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে গুরুদায়িত্ব রয়েছে, নতুন সংবিধানে তার স্বীকৃতি আছে। বলা হয়েছে, বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অংশ হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং কমরেড সুলভ পারস্পরিক সহযোগিতার নীতিকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করছে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অর্থনৈতিক সংহতি এবং আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন অঙ্গীকারবদ্ধ (৩০নং ধারা)।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক

স্তালিন সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে কোন ঘোষণা ছিল না। সেদিক থেকে বিচার করলে ব্রেজনেভ সংবিধান নিঃসন্দেহে অভিনবত্ব দাবী করতে পারে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি, সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের নীতি, জাতির মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সংহতির জন্য আকাঙ্ক্ষা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু সমালোচকদের মতে, এই পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণার মধ্যেও সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের সংশোধনবাদী ঝোঁক ফুটে উঠেছে। কেন না বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা সমন্বিত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান খুব বেশিদিন অনুসরণ করা সম্ভব নয়। এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নামে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বরাজনীতিতে সংশোধনবাদী লাইন অনুসরণ করছে।

সমালোচকদের মতে, বিশেষ করে চীনের নেতাদের মতে, এই নীতি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে খুব বেশি সহায়ক নয় বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি রক্ষা

গৃহযুদ্ধ, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সারা পৃথিবীব্যাপী ভয়াবহ অস্ত্র প্রতিযোগিতা ব্রেজনেভ সংবিধানের প্রণেতাদের মাতৃভূমি সুরক্ষায় ওপর গুরুত্ব দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। সংবিধানের ৩১ নম্বর ও ৩২ নম্বর ধারা মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর সর্বশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বলা হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির রক্ষা রাষ্ট্রের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং সমগ্র জনগণের চিন্তার বিষয়। বলা হয়েছে, সমাজতন্ত্রের সুফলগুলি রক্ষার জন্য, সোভিয়েত জনগণের শ্রমের ফল রক্ষার জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র সেনাবাহিনী সর্বদাই প্রস্তুত। এই উদ্দেশ্যেই সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা এবং সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদানের কথা বলা হয়েছে। জনগণের প্রতি সশস্ত্র বাহিনীর কর্তব্য হল সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমিকে রক্ষা করা, যে কোন আক্রমণকে প্রতিরোধ করা, তাৎক্ষণিক প্রত্যাঘাত হানার ব্যবস্থা এবং এই উদ্দেশ্য যুদ্ধের প্রস্তুতি বজায় রাখা (৩১ নং ধারা)।

৩২ নম্বর ধারায় সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রের কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুরক্ষিত করার জন্য এবং প্রতিরক্ষা সামর্থ্য সুদৃঢ় করার বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলির, গণসংগঠনগুলির, সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিকদের কর্তব্য সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন দ্বারা স্থিরীকৃত। মাতৃভূমি রক্ষার পবিত্র উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র সশস্ত্র বাহিনীকে সম্ভাব্য সকল রকম সহায়তা প্রদান করবে (৩২ নং ধারা)।

চার: সোভিয়েত সংবিধানের সামাজিক ও আদর্শগত ভিত্তি (Social and Ideological basis of U. S. S. R.)

১৯৭৭ সালে গৃহীত সোভিয়েত সংবিধানের সামাজিক ও আদর্শগত ভিত্তি হল এক বিকশিত ও উন্নত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা—যে ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমজীবী মানুষদের কমিউনিজমের স্তরে দ্রুত উত্তরণে সহায়তা করবে। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জারের স্বৈরতন্ত্র চূর্ণ করে প্রতিষ্ঠা করেছিল বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। শোষণের শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলে, পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষ লেনিনের নেতৃত্বে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সুযোগ্য পরিচালনায় সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থার পত্তন করেছিল। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা পুঁজিবাদের মৃত্যুঘণ্টা ধ্বনিত করেছিল। বিপ্লবের সুফলগুলি রক্ষা করার জন্য,

প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত ধ্বংস করার জন্য, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্যে গতি সঞ্চারের জন্য তারা প্রায় এক ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে এক নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা পত্তন করেছিল।

আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ প্রথম থেকেই চেষ্টা করেছে এই নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য। তাই তারা গৃহযুদ্ধে উস্কানি দিয়েছে, প্রতিবিপ্লবী ও অন্তর্ঘাতকদের অর্থ দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। সারা পৃথিবীতে বিরামহীন কুৎসার বন্যা বইয়ে দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন শ্রেণী শত্রুদের বিরুদ্ধে। আপোষহীন সংগ্রামের পথ ধরে তারা গৃহযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তারা সাম্রাজ্যবাদের অনুচর প্রতিবিপ্লবীদের পরাস্ত করেছিলেন। এই সময় ট্রটস্কি প্রচার করেছিলেন চিরস্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্ব। তাঁর মতে পশ্চিম ইউরোপের শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করলে রাশিয়ার মত একটি পশ্চাদ্‌বর্তী দেশে কখনোই সমাজতন্ত্র দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। কিন্তু স্তালিন বুঝেছিলেন যে, ট্রটস্কির ঐ নীতি অনুসরণ করলে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত শক্তিশালী হবে। দেশ বিপন্ন, জাতি বিপন্ন ধুঁয়ো তুলে সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করার জন্য সুযোগ খুঁজবে। তাই স্তালিন এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, একটি মাত্র দেশেই সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা যায়। তিনি সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে বিপ্লব রপ্তানিযোগ্য পণ্য নয়।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ধ্বংস করার পর, গৃহযুদ্ধের অবসানের পর সোভিয়েত রাশিয়ার বীর জনগণ সমাজতন্ত্র নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে, জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা দেশে এক আমূল পরিবর্তন আনলেন। জারের আমলে যে সব জাতিগোষ্ঠী শোষণ, অবহেলা ও বৈষম্যের শিকার ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নে সেই সব জাতি ও উপজাতি স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ অধিকার পেল। প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা, আইনের চক্ষে সমান, কার. নাগরিকদের জন্য কতগুলি অর্থনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করে সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা দ্রুত সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে এগিয়ে চলেছিল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্র পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের সামনে এক নতুন ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের তীব্র বিরোধিতা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন, নাৎসী ও ফ্যাসিবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ছিল সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির উজ্জ্বল দিক।

ক্ষমতামদমত্ত নাৎসী জার্মানী যখন সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করল, তখন প্রায় একক ও নিঃসঙ্গভাবে সোভিয়েত রাশিয়া সেই ভয়ঙ্কর আক্রমণের মোকাবিলা করেছিল। কিন্তু সোভিয়েত বীরদের সেই রক্তস্রোত বা রুশ মায়েদের সেই অশ্রুধারা বিফল হয়নি। সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিপরীক্ষায় সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী উত্তীর্ণ হয়েছিল। বিশ্বরাজনীতিতে

নতুন এক সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উদ্ভব হল। বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠল। শান্তির জন্য, গণতন্ত্রের জন্য মানুষের আন্দোলনে এক নতুন দিক উন্মোচিত হল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েত জনগণ আরও উৎসাহের সঙ্গে, আরও কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। ফলে সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কাজ বিস্ময়কর গতিতে এগিয়ে চলে। সোভিয়েত রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণী, যৌথ খামারের চাষী এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মৈত্রী দিনের পর দিন আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন জাতি ও অধিজাতির মধ্যেও মৈত্রী বন্ধন আগের চাইতে অনেক শক্তিশালী হয়। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিপুল অগ্রগতি ঘটে। ফলে সোভিয়েত নেতৃত্ব এখন আর শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের কথা বলেন না। তাঁরা এখন ঘোষণা করেছেন যে সোভিয়েত রাশিয়া হল সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র (A state of the whole people), কেন না দেখা গেছে যে, বিপ্লবের ষাট বছর পরের পরিবর্তিত অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিক, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। ক্রমাগত সর্বাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ উৎপাদন ব্যবস্থাকে অনেক গতিশীল করে তুলেছে। ফলে জনসাধারণের শিক্ষা, সংস্কৃতি বা জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নত হচ্ছে। কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে, কিংবা বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে শ্রমিকদের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। জাতি সমস্যার সঠিক সমাধানের ফলেও সাধারণ মানুষের অধিকার অনেক বেড়েছে। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র

যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নে বর্তমানে প্রত্যেকেই শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন শোষক শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই, যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন শ্রেণী দ্বন্দ্ব বা শ্রেণী সংঘর্ষ অনুপস্থিত, তাই সেখানে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল, অর্থাৎ কমিউনিস্ট দল সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত।

একটি মাত্র দলের স্বীকৃতি

সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। উৎপাদিকা শক্তির অভাবনীয় বিকাশ, প্রগতিশীল বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ফলে জনসাধারণের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এখন বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সব নাগরিক স্তর এবং শ্রেণী নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক নতুন সমাজ গড়ে তুলেছে। এই সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায় আমরা শ্রমজীবী মানুষের অত্যন্ত উচ্চস্তরের সাংগঠনিক দক্ষতা, আদর্শগত বিশ্বাস এবং চেতনা লক্ষ্য করি—যে শ্রমজীবী মানুষ একই সঙ্গে স্বদেশ প্রেম ও আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করে। এখানে প্রত্যেক নাগরিক সমাজের মঙ্গলের জন্য আর সমাজ প্রত্যেক নাগরিকের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করে। সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায় যথার্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে সার্বজনীন ভোটাধিকার,

নাগরিকদের কতগুলি মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা, ক্ষুদ্র-বৃহৎ জাতির স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার, আইনের শাসন, প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা ও কাজের অধিকার সংবিধান সুনিশ্চিত করেছে। শুধু তাই নয়। বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সোভিয়েত শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। এই সমাজ ব্যবস্থায় গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়াকে আরও সম্পূর্ণ করা হয়েছে গণভোটের ব্যবস্থা করে। কিন্তু সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে শুধু নাগরিক অধিকারের কথাই বলা হয়নি, সংবিধানে নাগরিকদের একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য-তালিকাও যুক্ত হয়েছে। এই কর্তব্য তালিকা নাগরিকদের প্রকৃত নাগরিক হতে সাহায্য করে এবং সমাজের প্রতি তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনে যত্নবান হন।

এই উন্নত বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হল কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থা।

সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল এক শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থা নির্মাণ—যেখানে জনসাধারণের কমিউনিস্ট স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই সমগ্র জনসাধারণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্যগুলি হল : কমিউনিজমের বৈষয়িক ও কারিগরী ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ককে এমনভাবে উন্নত করা যাতে তা কমিউনিস্ট সামাজিক সম্পর্কে পরিণত হয়, কমিউনিস্ট সমাজের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে ওঠে। জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন, দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি করা।

সোভিয়েত রাশিয়ায় জনগণ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে, সমাজতন্ত্রের মহান্ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুফলগুলির ওপর নির্ভর করে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে আরও ত্রুটিমুক্ত এবং প্রাণবন্ত করার বাসনা নিয়ে, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরে সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থান এবং সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব স্মরণে রেখে ঘোষণা করছে যে, সোভিয়েত রাশিয়ার সংবিধান আগের শাসনতন্ত্রগুলির সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করছে এবং অঙ্গীকার করছে যে, সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা হবে।

ছয়

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি

Nature of the Soviet Federation

এক : সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of the Soviet Federalism)

আঠারোর শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের পর থেকেই বহুজাতিক বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য অনেক সময়ই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ডাইসির মতে যুক্তরাষ্ট্র হল, এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা জাতীয় ঐক্য এবং অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাধিকারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। কে. সি. হুইয়ার বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হল এমন এক শাসন ব্যবস্থা যা সংবিধান অনুযায়ী সমগ্র দেশের সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা বণ্টন করে যাতে উভয় প্রকার সরকারই নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন : (১) দুই শ্রেণীর সরকার, (২) কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, (৩) একটি লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, (৪) সংবিধানের প্রাধান্য, (৫) একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নিরপেক্ষ আদালত, (৬) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা, (৭) দুই শ্রেণীর সরকারের মধ্যে আর্থিক সম্পদ ও ক্ষমতার বণ্টন এবং (৮) দ্বিনাগরিকত্ব।

ভূমিকা

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, মার্কস, এঙ্গেলস বা লেনিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাতে আদৌ অনুরাগী ছিলেন না। মার্কস ও এঙ্গেলস মনে করতেন যে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য এবং বিকাশের জন্য শক্তিশালী এককেন্দ্রিক সরকার অনেক বেশি বাঞ্ছনীয়। তাঁদের মতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার জের টেনে চলে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার শিথিলতা অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে প্রতিকূল। লেনিন তাঁর "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" গ্রন্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিরুদ্ধেই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবের পর বলশেভিকরা সোভিয়েত রাশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাই প্রবর্তন করেন। জার শাসিত রাশিয়া ছিল জাতিসমূহের এক বন্দীশালা। জারের আমলে সরকারের নীতি ছিল—এক জার, এক চার্চ ও এক ভাষা (one Czar, one Church and one Language)। যদিও রাশিয়ায় অসংখ্য জাতি ও অধিজাতি বসবাস করত, কিন্তু জারের আমলে রাশিয়ায় গণতন্ত্রের চিহ্ন মাত্র ছিল না। জার তাঁর গুপ্ত পুলিশ, সৈন্যবাহিনী, মন্ত্রী, আমলা ও অভিজাতদের নিয়েই শাসনব্যবস্থা চালাতেন। চূড়ান্ত স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রশাসন পরিচালিত হত। যদিও রাশিয়ার জনগণ বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু একমাত্র গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ রাজানুকুল্য ভোগ করত। গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ ছিল জারতন্ত্রের অন্যতম শক্তিশালী স্তম্ভ। প্রোটেস্ট্যাণ্ট, রোমান ক্যাথোলিক,

যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টি

ইসলাম ধর্মাবলম্বী বা ইহুদীরা গণ্য হতেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে। আর এই বিশাল রুশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র রুশভাষাই একমাত্র সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃত ছিল। স্কুল কলেজে, অফিসে আদালতে একমাত্র রুশ ভাষাতেই কাজকর্ম হত। যদিও রুশ সাম্রাজ্যে অসংখ্য জাতি ও অধিজাতি বসবাস করত, কিন্তু তাদের কোন স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ছিল না, তাদের ভাষায় কোন মর্যাদা ছিল না। একমাত্র রুশ নাগরিকরাই প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে যাবতীয় অধিকার ভোগ করতেন। জার সরকার প্রাণপণে অনুসরণ করত "রুশীকরণের নীতি "(Principle of Russification)। রাশিয়ায় বসবাসকারী অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী যাতে রুশ ভাষা গ্রহণ করে ও রুশ জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ করে তার জন্য সরকারের সবরকম প্রচেষ্টা ছিল।

বলশেভিকরা বুঝেছিলেন যে, পরস্পরের প্রতি শত্রু মনোভাবাপন্ন কতগুলি জাতিকে নিয়ে একটি শক্তিশালী এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। তাই তাঁরা প্রথমেই বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবী স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, রাশিয়ায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি ও অধিজাতি সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায়। তাই ১৯১৮, ১৯২৪, ১৯৩৬ এবং ১৯৭৭ সালে যে চারটি সংবিধান প্রবর্তিত হয়, ঐ সব সংবিধানের প্রত্যেকটিতে সোভিয়েত রাশিয়ায় এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সংকল্প ঘোষিত হয়েছে। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমেই ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক বিকাশের পথ সুগম করা হয়েছে, তাদের নিজস্ব প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

দুই ঃ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Fed‹ ‹al Features of the Soviet Constitution)

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্রেজনেভ সংবিধানের ৭০ নম্বর ধারায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে জাতিসমূহের অবাধ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সমানাধিকার সম্পন্ন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির স্বেচ্ছাকৃত সম্মেলনের ফলে সৃষ্ট এবং সমাজতান্ত্রিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এক অখণ্ড, যুক্তরাষ্ট্রীয় বহুজাতিক রাষ্ট্র (an integral, federal multi-national State) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার বেশির ভাগ বৈশিষ্ট্যই সোভিয়েত সংবিধানে দেখা যায়।

(১) অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত সোভিয়েত রাশিয়ায়ও দুই শ্রেণীর সরকারের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় সরকার তথা জাতীয় সরকার রাজধানী মস্কো থেকে কাজ করে। আর অন্য দিকে আছে পনেরটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র। এইসব ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র আইনের চক্ষে সমানাধিকার ভোগ করে। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে এইসব ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র গড়ে উঠেছে।

'দু'ধরনের সরকার

এই সব ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের নিজস্ব সংবিধান, নিজস্ব সরকার আছে। এইসব ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সম্মতি ছাড়া এদের আয়তন বা সীমানার কোন পরিবর্তন করা যায় না।

(২) অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত সোভিয়েত রাশিয়ায়ও কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গ রাজ্যের সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সোভিয়েত ইউনিয়নেও সংবিধানের ৭৩ নম্বর ধারায় কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট যাবতীয় ক্ষমতা ভোগ কর অঙ্গরাজ্যের প্রজাতন্ত্রগুলি (৭৬ নং ধারা)।

ক্ষমতা বণ্টন

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান লক্ষণ হল সংবিধানের প্রাধান্য। যেহেতু সংবিধানই কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতার উৎস, যেহেতু সংবিধানই কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেয়, যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলিকে সংবিধানের চার দেওয়ালের মধ্যে কাজ করতে হয়, তাই প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রেই সংবিধানকে দেশের মূল আইন হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ সংবিধান বিরোধী কোন আইন বা সরকারি আদেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্বীকৃতি পায় না। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের ১৭৩ নম্বর ধারায় সোভিয়েত সংবিধানকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনগত শক্তির (supreme legal force) অধিকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান

এই সাংবিধানিক প্রাধান্যের জন্যই পৃথিবীর প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান সাধারণত লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হয়। সংবিধান লিখিত না হলে সংবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি বা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হতে বাধ্য। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সব সময়ই লিখিত হয়, কেন না যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সাধারণত কতগুলি অঞ্চল, রাজ্য বা জাতি গোষ্ঠীর আপোষ রক্ষার ফল।

আবার শুধুই লিখিত সংবিধানই যথেষ্ট নয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান যেন যথেষ্ট দুষ্পরিবর্তনীয় হয়। কেন না যদি সংবিধানের ঘনঘন পরিবর্তন ঘটে, তাহলে রাজ্য সরকারগুলি বিপন্ন বোধ করতে পারে, অন্যদিকে নাগরিকদের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা কমে যায়। এই সব কারণে পৃথিবীর প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধান সাধারণত লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। সোভিয়েত রাশিয়ায়ও আমরা এই নীতির ব্যতিক্রম দেখি না। সোভিয়েত সংবিধান শুধু লিখিতই নয়, দুষ্পরিবর্তনীয়ও বটে। সোভিয়েত সংবিধান সংশোধনের জন্য সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের প্রত্যেকটিতে মোট সদস্য সংখ্যায় অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন। এককথায় বলা যায়, সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে সোভিয়েত সংবিধানকে পরিবর্তন করা যায় না। সংবিধান সংশোধনের জন্য সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয়কক্ষের

মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন (১০৪ নং ধারা)। তবে সোভিয়েত সংবিধান মার্কিন সংবিধানের মত অতটা দুষ্পরিবর্তনীয় নয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল একটি নিরপেক্ষ, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আদালত, যে আদালত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করে, সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে কাজ করে। সোভিয়েত রাশিয়ায় আমরা অনুরূপ একটি সুপ্রীম কোর্ট দেখতে পাই। অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা বা অভিভাবক হিসাবে কাজ করে না। ঐ আদালতের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার কোন ক্ষমতাও নেই। সমালোচকদের মতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্ট আদৌ শক্তিশালী নয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল দ্বিকক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা। বলা হয়, আইনসভার একটি কক্ষ জনসংখ্যা অনুযায়ী গঠিত হয়। অর্থাৎ যে রাজ্যের বেশি লোকসংখ্যা, সেই রাজ্যের বেশী প্রতিনিধি সেই কক্ষে নির্বাচিত হয়। কিন্তু অপর কক্ষটি গঠিত হয় রাজ্যগুলির সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে। আইনের চোখে রাজ্যগুলির সমান অধিকার ও মর্যাদা তুলে ধরার জন্যই এই ব্যবস্থা। সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতও দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত : (১) ইউনিয়নের সোভিয়েত (Soviet of Nationalities) এবং (২) জাতিপুঞ্জের সোভিয়েত। ইউনিয়নের সোভিয়েত (Soviet of the Union) গঠিত হয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে। স্তালিন সংবিধান অনুযায়ী প্রতি তিন লক্ষ অধিবাসী ১ জন করে প্রতিনিধি ইউনিয়নের সোভিয়েতে নির্বাচন করতেন। কিন্তু ব্রেজনেভ সংবিধানের ১১০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, সমসংখ্যক জনসংখ্যাবিশিষ্ট নির্বাচনমণ্ডলীর দ্বারা ইউনিয়নের সোভিয়েত নির্বাচিত হবে। আর জাতিপুঞ্জের সোভিয়েত প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাবলিক বা অঙ্গ প্রজাতন্ত্র ৩২ জন, প্রত্যেক স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র (Autonomous Republic) ১১ জন, প্রত্যেক স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল (Autonomous Region) ৫ জন এবং প্রত্যেক জাতীয় এলাকা (Natinal Area) ১ জন করে সদস্য পাঠাবে। উভয় কক্ষের ক্ষমতা ও মর্যাদা সমান এবং উভয় কক্ষের সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত। সোভিয়েত সংবিধান বিশেষজ্ঞগণের মতে এই দ্বিকক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা সোভিয়েত রাশিয়ায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি ও অধিজাতিসমূহের স্বার্থরক্ষা করতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা

যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল দ্বৈত নাগরিকত্ব। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকত্বের নীতি গৃহীত হয়। অর্থাৎ একজন নাগরিক প্রথমে তিনি যে রাজ্যে বসবাস করেন, সেই রাজ্যের নাগরিক। দ্বিতীয়ত, তিনি সমগ্র রাষ্ট্রের নাগরিক। সোভিয়েত ইউনিয়নেও এই দ্বৈত নাগরিকত্বের নীতি সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

দ্বৈত নাগরিকত্ব

সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলির নিজস্ব সংবিধান প্রণয়নের অধিকার থাকে। আর সেই সংবিধান বা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাজ্যসরকার পরিচালিত হয়। সুইজারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রে আমরা অঙ্গরাজ্যগুলির নিজস্ব সংবিধান দেখতে পাই। বলা হয়, এর ফলে রাজ্যগুলি নিজস্ব ইচ্ছানুযায়ী সরকার পরিচালনা করতে পারে, নিজেদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি অনুযায়ী সংবিধান প্রণয়ন করতে পারে। অবশ্য ভারত এই নীতির ব্যতিক্রম, ভারতে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বতন্ত্র সংবিধান নেই। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে অঙ্গরাজ্যগুলি নিজস্ব শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রচনা করতে পারে। যদিও ঐসব সংবিধান সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

রাজ্যগুলির নিজস্ব সংবিধান

তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যগুলির সম্মতি ছাড়া তাদের ভূখণ্ড, আয়তন বা সীমানার কোন পরিবর্তন করা যায় না। ব্রেজনেভ সংবিধানের ৭৮ নম্বর ধারায় অঙ্গরাজ্যসমূহের এই ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। একমাত্র সংশ্লিষ্ট অঙ্গ রাজ্যগুলির পারস্পরিক সম্মতিক্রমে তাদের সীমানা পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু এই পরিবর্তন আবার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ।

ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা

সোভিয়েত ইউনিয়নের যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আবার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা পৃথিবীর অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রের নেই।

(১) প্রথমেই অঙ্গরাজ্যগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারের কথা উল্লেখ করা যায়। সংবিধানের ৭২ নম্বর ধারা অনুযায়ী যে কোন ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবী জানাতে পারে। স্তালিন সংবিধানে প্রথম এই অধিকার স্বীকার করা হয়। বলা হয়, অঙ্গরাজ্যগুলিকে এই অধিকার না দিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইচ্ছাকৃত সমন্বয়ে গঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্র—এই তত্ত্বকে অস্বীকার করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পৃথিবীর কোন অ-সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গরাজ্যসমূহের এই বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার স্বীকার করে না।

বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার

(২) পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করে, অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময় করে, সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় যোগদান করে। কিন্তু স্তালিন সংবিধানের মত ব্রেজনেভ সংবিধানেও অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলির বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৮০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলি বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিনিধি বিনিময় করতে পারে, চুক্তি সম্পাদন করতে পারে কিংবা

অঙ্গপ্রজাতন্ত্র গুলির অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার

কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাজকর্মে যোগ দিতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ইউক্রেন এবং বিয়েলো রাশিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য।

(৩) আবার দেখা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্ধারণে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলির সরকার বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলোর মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যানরা পদাধিকার বলে সদস্য হিসাবে পরিগণিত হন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টেও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রসমূহের সুপ্রীম কোর্টগুলির সভাপতিগণ পদাধিকার বলে সদস্য হন (১৫৩ নম্বর ধারা)। সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামে ১৫টি অঙ্গ-প্রজাতন্ত্র থেকে পরের জন সহসভাপতি কাজ করেন। সাংবিধানিক এইসব বিধান নিঃসন্দেহে অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। যেহেতু ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের মুখ্যমন্ত্রিরা পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য, যেহেতু ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের প্রধান বিচারপতিগণ পদাধিকার বলে সোভিয়েতইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টের সদস্য এবং যেহেতু প্রেসিডিয়ামে প্রত্যেক অঙ্গপ্রজাতন্ত্র থেকে একজন করে সহসভাপতি নির্বাচিত হন, তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলি ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। শুধু তাই নয়, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলি তাদের উর্ধ্বতন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতে আইন প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে।

বহুজাতিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রধান প্রধান জাতি গোষ্ঠীকে অঙ্গপ্রজাতন্ত্র গঠনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এরকম মোট পনেরটি অঙ্গপ্রজাতন্ত্র আছে। তাছাড়া ক্ষুদ্র ও অপ্রধান জাতিগোষ্ঠীগুলিকে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং জাতীয় এলাকা গঠনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ফলে দেখা যায়, অনেক ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র নিজেরাই যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে কাজ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের বৃহত্তম অঙ্গপ্রজাতন্ত্র রুশ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে বাশকিরীয়, বুরিয়াৎ, দাঘেস্তান, তাতার প্রভৃতি ষোলটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব আছে। স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বা জাতীয় এলাকায় বসবাসকারী প্রধান জাতিগোষ্ঠীসমূহ যাতে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করে, তারা নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবনের দ্রুত বিকাশ ঘটাতে পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েত আইন প্রণয়ন করে নতুন স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বা জাতীয় এলাকা সৃষ্টি করতে পারে। রুশ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে আদিগেই, ইহুদী, প্রভৃতি ৫টি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল আছে। এইভাবে ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর জন্য স্বায়ত্তশাসনের অধিকার সুনিশ্চিত করে, তাদের ভাষা, কৃষ্টি, ও অর্থনৈতিক জীবন বিকাশের ঢালাও সুযোগ দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক অভূতপূর্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। আরও উল্লেখ করা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন জাতি, ভাষা, ধর্ম, বাসস্থান বা স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক

নাগরিক আইনের চক্ষে সমান ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। শিক্ষার অধিকার এবং শিক্ষাশেষে কাজের অধিকার সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতিভিত্তিক শোষণের পথ রুদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, সংবিধানের ৬৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে নাগরিকদের কর্তব্য হ'ল অন্যান্য নাগরিকদের জাতীয় মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং বিভিন্ন জাতি ও অধিজাতিগুলির মধ্যে মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করা।

মূল্যায়ন

সোভিয়েত রাশিয়ায় যদিও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান, তবুও ফাইনার, কে. সি. হুইয়ার প্রমুখ লেখকগণ সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঠিক যুক্তরাষ্ট্র বলে স্বীকার করেন না। কে. সি হুয়ারের মতে সোভিয়েত রাশিয়া প্রকৃত পক্ষে একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র, যদিও শাসনব্যবস্থায় কিছু কিছু যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য আছে। তাই তাঁর মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি *Quasi federal state* বা অসম্পূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। ফাইনারের মতে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বাস্তবে একটি চরম এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র (highly unitary state)। তাঁর মতে আপাতদৃষ্টিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি বহুজাতিক, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলে মনে হলেও, কার্যত সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি শক্তিশালী এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। অগ (Ogg), ফেনসড (Fainsode) প্রভৃতি বুর্জোয়া সংবিধান বিশেষজ্ঞরা সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। এইসব বিশেষজ্ঞদের মতে নিম্নলিখিত কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র বলে অভিহিত করা যায় না।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে, সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত। এই দল হল কমিউনিস্ট পার্টি। যেহেতু একটি মাত্র রাজনৈতিক দল সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বীকৃত দল হিসাবে কাজ করে, ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকার বা ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সরকারগুলি কমিউনিস্ট পার্টিই পরিচালনা করে। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কোন অবকাশ নেই। শুধু তাই নয়, যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায় বিশ্বাস করে এবং এইদল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, তাই দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ নির্দেশ বা পরামর্শ অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের সরকারগুলি মেনে নিতে বাধ্য। এঁদের মতে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সর্বাত্মক ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির পরিপন্থী।

সমালোচকদের মতে অঙ্গরাজ্যগুলির তথাকথিত বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার একটি আনুষ্ঠানিক অধিকার মাত্র। ১৯৩৬ সালে স্তালিন সংবিধানে সর্বপ্রথম এই অধিকার স্বীকার করা হয়। কিন্তু কোন অঙ্গরাজ্য এখন পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ নেয়নি, বরং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতেই লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গীভূত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও অনেক নতুন ভূখণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়।

সমালোচকেরা বলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে বিচ্ছিন্নতার অধিকার তো স্বীকার করাই হয় না, বরং বিচ্ছিন্নতার সামান্যতম দাবীও কঠোর হস্তে দমন করা হয়। বলা হয়, কমিউনিস্ট পার্টির অপ্রতিহত প্রাধান্যের জন্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের নেতারা দলীয় শৃঙ্খলা অমান্য করে কখনোই বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবী তুলে ধরেন না।

এই কারণে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার, প্রতিনিধি বিনিময়ের অধিকার একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছে বলে দাবী করা হয়। তারা আরও বলেন যে মনে রাখতে হবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের সরকারগুলির যে কোন আদেশ বা নির্দেশ নাকচ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির লৌহকঠিন শৃঙ্খলা অমান্য করে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের নেতারা কখনোই এই অধিকার বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করেন না। কথিত আছে যে, একদা ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলোটভের সঙ্গে ইউক্রেন এবং বিয়েলো রাশিয়ায় স্বতন্ত্র দূতাবাস খোলার প্রস্তাব নিয়ে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই সাক্ষাতকার এক মিনিটও স্থায়ী হয়নি। সুতরাং বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার একটি অর্থহীন অধিকার ছাড়া কিছু নয়।

পরিকল্পিত অর্থনীতিও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে অনেকভাবে আঘাত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী। ফলে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য। ব্রেজনেভ শাসনতন্ত্রের ১৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডে সামাজিক উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের সবগুলি উপাদানকে নিয়ে একটি অখণ্ড অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। যদিও পরিকল্পনা রচনার সময় ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সরকার, বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপরেখা স্থির করেন। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের মত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেখানে পরিকল্পিত অর্থনীতির জয়-জয়কার, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকার বিপুল ক্ষমতার অধিকারী।

এমনকি ক্ষমতাবণ্টনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারকেই অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অর্পণ করা হয়েছে। যদিও যাবতীয় অবশিষ্ট ক্ষমতা অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলি ভোগ করে, কিন্তু কার্যত অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাবাহক মাত্র। কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলি কিছু স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়। কিন্তু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃত অর্থ হল এই যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্যগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে কাজ করবে এবং তারা সমান মর্যাদা ভোগ করবে। প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলি কখনোই কেন্দ্রীয় সরকারের অধস্তন হিসাবে কাজ করে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বিপুল ক্ষমতা অর্পণ

সমালোচকদের মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা সুইজারল্যান্ডের মত যথেষ্ট দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান সংশোধনের জন্য তিন-চতুর্থাংশ রাজ্যের সম্মতি প্রয়োজন। সুইজারল্যান্ডে সংবিধানের কোন রকম সংশোধন গণভোটে দিতে হয়। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় সংবিধান সংশোধনের জন্য কোন গণভোটের প্রয়োজন হয় না। কোন অঙ্গরাজ্যের সম্মতি বা অসম্মতির প্রশ্নও সংবিধান সংশোধনের সময় ওঠে না। কেবলমাত্র সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষে মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন থাকলেই সংবিধান সংশোধন করা যায়। বলা হয়, একদলীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশেষ করে যে দল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ও লৌহকঠিন শৃঙ্খলায় বিশ্বাস করে, সেই রাষ্ট্রে আইনসভায় মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন লাভ করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতাহীনতা

আরও বলা হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বা আদেশ নাকচ করে দিতে পারেন। যদি তাঁরা মনে করেন যে, ঐসব সিদ্ধান্ত বা আদেশ কেন্দ্রীয় আইন বা সংবিধানের বিরোধী। এমন কি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদও রাজ্য সরকারের যে কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত কার্যকর না করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে। এককথায় বলা যায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলির ওপরে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য সংবিধান কর্তৃক সুরক্ষিত হয়েছে (১২১ নং ও ১৩৪ নং ধারা)। আবার সংবিধানের ৭৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধ দেখা দিলে, কেন্দ্রীয় আইনকেই বৈধ বলে গণ্য করা হবে। এক কথায় বলা যায়, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের আইনের ওপরে কেন্দ্রীয় আইনকেই সর্বদা মর্যাদা দেওয়া হয় আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম যদি মনে করে যে, কোন অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের আইন বা সরকারী আদেশ কেন্দ্রীয় আইন বা সরকারী সিদ্ধান্তের পরিপন্থী, সেক্ষেত্রেও প্রেসিডিয়াম সেই আইন বা আদেশ বাতিল করতে পারে।

রাজ্য আইন বা আদেশের ওপরে কেন্দ্রীয় আইন বা আদেশের প্রাধান্য

সমালোচকরা একথাও তুলে ধরেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা আদৌ উজ্জ্বল নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক হিসাবে কাজ করে না। যদি সংবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে কোন মতবিরোধ উপস্থিত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে প্রেসিডিয়াম সংবিধানের ব্যাখ্যা করে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে, কিংবা সংবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে কোন মতভেদের উদ্ভব হলে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের মত সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীমকোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা নেই। মার্কিন

দুর্বল যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের মত সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা বলতে পারেন না যে বিচারপতিরা যা বলেন তাই হল সংবিধান। (The constitution is what the judges say it is).

বলা হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকিউরেটর জেনারেলের হাতে যে বিপুল পরিমাণ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে, তা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির পরিপন্থী। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকার মাত্রাতিরিক্ত ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। প্রকিউরেটর জেনারেল সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত হন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সব মন্ত্রণালয়, রাষ্ট্রীয় সংস্থা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, সমিতি ও গণ সংগঠনগুলি যাতে আইন মেনে চলে, সেদিকে প্রকিউরেটর জেনারেলের দপ্তর লক্ষ্য রাখে। নাগরিক অধিকার যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, আইনের শাসন যাতে অব্যাহত থাকে, তার জন্যও প্রকিউরেটরের দপ্তর কাজ করে। সমালোচকদের মতে প্রকিউরেটর জেনারেলের দপ্তরের হাতে এত বিপুল ক্ষমতা পুঞ্জীভূত করা হয়েছে যে তার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

প্রকিউরেটর জেনারেলের অসীম ক্ষমতা

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য এস. ই. ফাইনার মত প্রকাশ করে বলেছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রগুলির অন্যতম। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে, প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং দলীয় নিয়ন্ত্রণের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রচণ্ড শক্তিশালী। তাঁর মতে "... ...*it is one of the most rigorously and extensively centralised states in the world This is due to three spheres of practice : that of legislation, that of administration, and that of party control.*"

কিন্তু এইসব সমালোচনার উত্তরে বলা যায় যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যেহেতু সমাজতন্ত্রের অনুরাগী নন, তাই তাঁরা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে যথার্থ উপলব্ধি করতে পারেননি। কেননা একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়াই অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে জাতি সমস্যার সমাধান করেছে। যে সোভিয়েত রাশিয়া ছিল জাতি সমূহের বন্দীশালা, সেই সোভিয়েত রাশিয়ার এখন ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পেয়েছে। নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক বিকাশের পূর্ণ অধিকার পেয়েছে। বৃহৎ জাতিসুলভ দম্ভ কিংবা ক্ষুদ্রজাতি সুলভ সঙ্কীর্ণতার স্থান সোভিয়েত রাশিয়ায় নেই। তাই সোভিয়েত রাশিয়াকে অনেকে মনে করেন পৃথিবীর সার্থকতম যুক্তরাষ্ট্র।

এই প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একমাত্র মডেল নয়। পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সেই দেশের ইতিহাস, ভূপ্রকৃতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, জনগণের চেতনা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সমালোচনা করার আগে মনে রাখা

প্রয়োজন যে জারের রাশিয়া ছিল স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক চূড়ান্ত নিদর্শন। এই পশ্চাদ্‌পট মেনে নিয়ে একথা স্বীকার করতেই হবে যে সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী যথেষ্ট স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার ভোগ করে।

আবার অত্যধিক কেন্দ্রীকরণের অভিযোগে যদি সোভিয়েত ইউনিয়নকে অভিযুক্ত করা হয়, তাহলে মনে রাখা প্রয়োজন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রেই এখন নানাকারণে এই কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক বাড়ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব প্রসার, দেশরক্ষায় প্রয়োজন, একদলীয় বা দ্বিদলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব, কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের ধারণা, আদালতের রায় প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম নয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সংকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির অর্থ হল একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের স্বীকৃতি। কেননা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় একচেটিয়া পুঁজির মালিক এবং বৃহৎ শিল্পপতিরাই হল জাতীয় ক্ষমতার অধিকারী। সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্র এদেরই সেবা করে। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে উৎপাদনের উপাদানের ওপর পূর্ণ সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাশিয়ায় প্রত্যেক নাগরিকের কাজের অধিকার, উপযুক্ত মজুরীর অধিকার, বিশ্রামের অধিকার বা শিক্ষার অধিকার আছে। ফলে সোভিয়েত রাশিয়ায় কেন্দ্রিকতায় নীতির সঙ্গে গণতন্ত্রীকরণের নীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সোভিয়েত রাশিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিবৃদ্ধিতে জনসাধারণের কোন বিপদ হয় না। কেননা এর ফলে শোষকশ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধির কোন সুযোগ সেখানে নেই।

সোভিয়েত সংবিধানের সমর্থকগণ আরও বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা সংবিধানকে একদিক দিয়ে অত্যন্ত-সুপরিবর্তনীয় করে তুলেছে। সোভিয়েত সুপ্রীম কোর্ট যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, এই অভিযোগের উত্তরে তাঁরা বলেন যে, তথাকথিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয়ের কথা প্রতারণা মাত্র। কারণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় বিচারবিভাগ শাসক শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করে। বিচার বিভাগ কখনোই নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে না, করেও না। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই সোভিয়েত রাশিয়ায় একদলীয় ব্যবস্থায় উদ্ভব হয়েছে। এই দল শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে শোষিত মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে শুধু জারের স্বৈরতন্ত্রই চূর্ণ করেনি, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ প্রতিহত করেছে, দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রেখেছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করেছে, প্রশাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের একদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের বিপক্ষে বা মানুষের অধিকারের বিপক্ষে কাজ করে না। বরং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুযায়ী কাজ করে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের স্বার্থে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্যের স্বাধিকারের দাবীর মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছে।

দুই : মার্কিন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা

(A Comparative study between the American Federation and the Soviet Federation)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই আধুনিক যুগে সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম গণতন্ত্রসম্মতভাবে রাজ্য স্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থের মধ্যে একটি সফল সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়। তাই বুর্জোয়া সংবিধান বিশেষজ্ঞরা সাধারণত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি আদর্শ মডেল হিসাবে প্রচার করে থাকেন। তাই তাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আলোচনা করার সময় প্রায়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা তুলনামূলক আলোচনা করে থাকেন। অন্যদিকে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে একটা তুলনামূলক পর্যালোচনায় চেষ্টা সংবিধান বিশেষজ্ঞরা অনেক সময়ই করে থাকেন।

উভয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য

প্রথমেই বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, উভয় রাষ্ট্রেই আমরা দুই শ্রেণীর সরকারের অস্তিত্ব দেখতে পাই। একদিকে জাতীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যদিকে একাধিক রাজ্যসরকার বা আঞ্চলিক সরকার প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াশিংটনে কাজ করে, আর তাছাড়া ৫০টি অঙ্গরাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় আছে ১৫টি অঙ্গরাজ্য, এই অঙ্গরাজ্যগুলিকে বলা হয় ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির মত সোভিয়েত রাশিয়ার ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলিরও নিজস্ব প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা বা নির্বাচিত সংস্থার আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের যেমন নিজস্ব সংবিধান আছে, তেমনি রাশিয়ায় প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাবলিকের নিজস্ব সংবিধান আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন প্রত্যেক রাজ্যের ভূখণ্ড বা সীমানা অপরিবর্তনীয়, অনুরূপভাবে রাশিয়ায় প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাবলিকের ভূখণ্ড ও সীমানা অপরিবর্তনীয়।

ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রেও সোভিয়েত রাশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক বিধান অনুসরণ করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অবশিষ্ট ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলি ভোগ করে।

সোভিয়েত রাশিয়ার সংবিধানেও কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানেও অবশিষ্ট যাবতীয় ক্ষমতা ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সরকারগুলো ভোগ করে।

আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মত সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানকেও দেশের মূল আইন বলে মনে করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই হল কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির যাবতীয় ক্ষমতার উৎস। সংবিধানই কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতায় সীমা নির্দেশ করে। শুধু তাই নয় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলিকে এই সংবিধানের চার দেওয়ালের মধ্যেই কাজ করতে হয়। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকার এমন কোন আইন পাশ করতে পারে না বা এমন কোন আদেশ জারি করতে পারে না বা সংবিধান বিরোধী। ব্রেজনেভ সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে সংবিধানের বিধান অনুযায়ী কাজ করতে হবে। সংবিধান লঙ্ঘন করার অধিকার কারও নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মত সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানও লিখিত। সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল যে লিখিত সংবিধানের অস্তিত্ব। বর্তমান সোভিয়েত সংবিধানে মোট ২১টি অধ্যায় এবং ১৭৪টি ধারা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল সংবিধানে মাত্র ৭টি ধারা ছিল। কিন্তু ২৬ বার সংশোধনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে কিছু বেশি ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উভয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান হল দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সুপরিবর্তনীয় হলে অঙ্গরাজ্যসমূহ বিপন্ন বোধ করতে পারে। ঘন ঘন পরিবর্তন হলে সংবিধানের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা হ্রাস পায়। অবশ্য তুলনামূলক ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সোভিয়েত সংবিধানের তুলনায় অনেক বেশি দুষ্পরিবর্তনীয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের সংশোধন একমাত্র তখনই করা যায়, যখন সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের মোট সদস্যের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সেই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি সুপ্রীম কোর্ট আছে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের মত সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্ট অতটা ক্ষমতাশালী নয়। সোভিয়েত সুপ্রীম কোর্ট কেবলমাত্র উচ্চতম আদালত হিসাবে কাজ করে। কিন্তু সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা বা অভিভাবক হিসাবে সোভিয়েত সুপ্রীম কোর্টের কোন ভূমিকা নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় আইনসভাও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা কংগ্রেস দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত। প্রথম কক্ষটিকে বলা হয় প্রতিনিধিসভা আর দ্বিতীয় কক্ষকে বলা হয় সিনেট। সিনেট অঙ্গরাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত। পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্য থেকে দুজন করে প্রতিনিধি নিয়ে মোট একশজন সদস্যের কক্ষ হল সিনেট। অনুরূপভাবে সোভিয়েত সংবিধানের কেন্দ্রীয় আইনসভার একটি কক্ষ জনসংখ্যার ভিত্তিতে গঠিত। আর অন্য কক্ষের মূলনীতি হল অঙ্গরাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্ব। তাই সুপ্রীম

সোভিয়েতের একটি কক্ষ অর্থাৎ ইউনিয়নের সোভিয়েত (Soviet of the Union) গঠিত হয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে। আর অপর কক্ষ জাতিপুঞ্জের সোভিয়েত (Soviet of the Nationalities) গঠিত হয় অঙ্গরাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে। তাই জাতিপুঞ্জের সোভিয়েতে প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাবলিক ৩২ জন, প্রত্যেক স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র ১১ জন, প্রত্যেক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ৫ জন এবং প্রত্যেক জাতীয় এলাকা ১ জন করে প্রতিনিধি পাঠায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সোভিয়েত ইউনিয়নেও দ্বৈত নাগরিকত্ব দেখা যায়। একজন নাগরিক প্রথমে তিনি যে অঙ্গরাজ্যে বসবাস করেন সেই অঙ্গরাজ্যের নাগরিক। তাছাড়া তিনি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। এই দ্বৈত নাগরিকত্বের নীতি উভয় দেশের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে বৈসাদৃশ্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও দুটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মূলত পৃথক্। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রশাসনের সুবিধার জন্য মূলত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রণেতারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে দৃঢ়মূল করে, আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানে অধিকতর সহায়তা করে এবং এই ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকে মাত্রাতিরিক্তভাবে শক্তিশালী হতে বাধা দেয়। কিন্তু সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় খুব বেশি আস্থাশীল ছিলেন না। বহুজাতিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ায় বিভিন্ন জাতি ও অধিজাতিসমূহ যাতে স্বাধীনতা ও মর্যাদা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকতে পারে, সেজন্যই নেতৃবৃন্দ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুকূলে মত পরিবর্তন করেছিলেন।

তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির মত সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যগুলি তাই ভৌগোলিক অঞ্চল নয়। ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী যাতে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সোভিয়েত ইউনিয়নে ইউনিয়ন রিপাবলিক, স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং জাতীয় এলাকা গঠন করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে অঙ্গপ্রজাতন্ত্র বা ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে পরিগণিত হয়। তাদের স্বেচ্ছামূলক মিলনের ভিত্তিতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে কোন অঙ্গরাজ্যের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নে ইউনিয়ন রিপাবলিকসমূহ যে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি বা চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির এরকম কোন অধিকার নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নে যে কোন অঙ্গরাজ্য প্রয়োজন বোধ করলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অন্য কোন

অঙ্গরাজ্যের অধিকারে পার্থক্য

যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গরাজ্যসমূহের এই বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার স্বীকার করে না। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে কয়েকটি ইউনিয়ন রিপাবলিক নিজেরাই যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে কাজ করে। কেননা এই সব ইউনিয়ন রিপাবলিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলিকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দান করার ফলে তারা অনেক সময় স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল কিংবা জাতীয় এলাকা গঠন করে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী আরও বাজার দখলের আশায় প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। যতদিন যাচ্ছে ততই এই বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের শ্রেণীশাসনকে শক্তিশালী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। এককথায় বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতায় কেন্দ্রীভবন একচেটিয়া পুঁজির শাসনকেই আরও শক্তিশালী করেছে।

প্রকৃতিগত ভিন্নতা

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে আমরা যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা দেখতে পাই, তাতে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আরও সুরক্ষিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে উৎপাদনের উপকরণ সমূহের সামাজিক মালিকানা, জনকল্যাণের জন্য উৎপাদন, সকলের জন্য শিক্ষা ও কাজের অধিকার উত্তরোত্তর সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করেছে। এক কথায় বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেক্ষেত্রে বুর্জোয়া প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার শ্রমজীবী মানুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনেক বেশি দুষ্পরিবর্তনীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান সংশোধনের

শাসনতন্ত্র সংশোধনের ভিন্ন পদ্ধতি

জন্য কেবলমাত্র কংগ্রেসের সম্মতিই যথেষ্ট নয়, তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের সম্মতি না পেলে কোন সংশোধন প্রস্তাব কার্যকর হয় না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলোর সম্মতির কোন প্রয়োজন নেই। সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষে মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি থাকলেই সংবিধান সংশোধন করা যায়।

তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীমকোর্ট অত্যন্ত উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন আদালত। বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীমকোর্ট সরকারের যে কোন আইন বা আদেশ নাকচ করতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা ও অভিভাবক। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টের সংবিধান ব্যাখ্যা করার কোন ক্ষমতা নেই। এই ক্ষমতা প্রেসিডিয়ামের হাতে ন্যস্ত।

আবার দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিনেট প্রতিনিধি সভা অপেক্ষা অনেক বেশি

শক্তিশালী। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষ সমান ক্ষমতার অধিকারী। বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটের মাধ্যমে একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা সমগ্র শাসন ব্যবস্থার ওপর নিজেদের বজ্রমুষ্টি দিনের পর দিন দৃঢ় করছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতিপুঞ্জের সোভিয়েত এবং ইউনিয়নের সোভিয়েত সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে।

কংগ্রেস ও সুপ্রীম সোভিয়েতের মধ্যে পার্থক্য

মনে রাখতে হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন ও একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিতহওয়ায় সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তার প্রকৃতিগত ভিন্নতা থাকবেই। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নেই প্রথমে জাতি সমস্যার সমাধান হয়েছে। একমাত্র বহুজাতিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়াতেই প্রথম ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পেয়েছে। তাই, ফাইনার, কে. সি. হুইয়ার প্রমুখ সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মার্কিন মডেলকে সামনে রেখে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যে ভাবে কঠোর সমালোচনা করেছেন তাকে পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না।

সাত

অধিকার ও কর্তব্য
Rights and Duties

এক ঃ রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি (The State and the Individual)

ব্রেজনেভ সংবিধানের দ্বিতীয় অংশে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। স্মরণাতীত কাল থেকেই রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক কি হওয়া উচিত, তা নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। এই বিষয়ের ওপর কেন্দ্র করে অনেক তত্ত্বও প্রচারিত হয়েছে। যেমন অনেক মনে করেন যে, রাষ্ট্র একটি জীবদেহের মত, আর ব্যক্তি-মানুষ তার কোষ বা Cell হিসাবে কাজ করে। যেমন কোন কোষ বা Cell জীবদেহের বাইরে বাঁচতে পারে না, তেমনি ব্যক্তিও নিজের বিকাশের জন্য সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখকগণ মনে করতেন যে, রাষ্ট্র অনেকটা চুক্তির ফলে প্রতিষ্ঠিত। ফলে রাষ্ট্র কেবলমাত্র আইন শৃংখলা রক্ষা করবে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা করবে, আর এইসব কাজ ভাল ভাবে করার জন্য কিছু কর আদায় করবে। এইসব কাজ ছাড়া রাষ্ট্র যেন ব্যক্তি মানুষের জীবনে কোনরকম ভাবেই হস্তক্ষেপের চেষ্টা না করে। ব্যক্তি মানুষ যেন তার ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে।

মনে রাখতে হবে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র কখনই সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র হতে পারে না। রাষ্ট্র কোন দেবতার সৃষ্টি নয়, রাষ্ট্র জনসাধারণের মধ্যে সম্পাদিত কোন চুক্তির ফলে তৈরি হয়নি। রাষ্ট্র জনসাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতীক নয়। রাষ্ট্র হল নিছক একটি দমন যন্ত্র, একটি বলপ্রয়োগের হাতিয়ার, যে হাতিয়ার উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকরা নিজেদের রাজনৈতিক একাধিপত্য ও অর্থনৈতিক শোষণ স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। ক্রীতদাস-প্রভুদের রাষ্ট্রে তাই একমাত্র ক্রীতদাস-প্রভুদেরই নাগরিক অধিকার ছিল, শ্রমিক, কৃষক, মেষপালক, কারিগর বা ক্রীতদাসদের কোন নাগরিক অধিকার ছিল না। যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত জমিদার বা সামন্তশ্রেণীর লোকেরা। কিন্তু ভূমিদাস, জমির ছোট মালিক, ব্যবসায়ী বা কারিগরদের কোন অধিকার ছিল না। অবশ্যই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার রণধ্বনি তুলে যে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিল, তারা সাধারণ মানুষকে অনেক বেশি নাগরিক অধিকার প্রদান করেছিল। আইনের চোখে সমান অধিকার ও মর্যাদা, সম্পত্তি ভোগের অধিকার, বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গমনাগমনের স্বাধীনতা, সভাসমিতির অধিকার বুর্জোয়ারা সুনিশ্চিত করেছিল।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি মানুষের অবাধ বিকাশ, সুসঙ্গত বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। কেননা, সেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষা ও কাজের অধিকার সুনিশ্চিত করার ফলে, উপযুক্ত মজুরীর অধিকার, আবাসনের অধিকার সুনিশ্চিত হওয়ার ফলে ব্যক্তি মানুষ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের

আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ থাকে না। সেখানে ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, যথার্থ ধর্ম নিরপেক্ষতা, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার নাগরিক জীবনে এক বিপুল সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। ধর্মীয় বৈষম্য, জাতিগত কিংবা ভাষাগত বৈষম্যের কুৎসিত গ্লানি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অনুপস্থিত। কলকারখানার মালিক, জমির মালিক, মুনাফাখোর, কালোবাজারী বা ফাটকাবাজদের অস্তিত্ব লোপ পাওয়ার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আজ ব্যক্তি মানুষ অনেক বেশি স্বাধীন ও স্ব-নির্ভর।

কিন্তু বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় আপাতদৃষ্টিতে আইনের চোখে নাগরিকদের সমান অধিকার ও মর্যাদা সুনিশ্চিত হলেও বাস্তবে নাগরিকদের মর্যাদা, প্রতিপত্তি বা অধিকার নির্ভর করে তাদের শ্রেণীগত অবস্থান, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইত্যাদির ওপর। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তি মানুষের সামাজিক মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি বলে বিবেচিত হয়। তাই বুর্জোয়া রাষ্ট্রে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তরা শোষিত এবং সেখানে বঞ্চিতের সংখ্যাই বেশী। সেখানে প্রকৃত অধিকার ভোগ করে একমাত্র সম্পত্তির মালিকরা। তাই মার্কসবাদীদের মতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেখানে শতকরা দু'জন লোক অধিকার ভোগ করে, সেখানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শতকরা আটানব্বই জন প্রকৃত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করে।

দুই ঃ সোভিয়েত নাগরিকত্ব (Soviet Citizenship)

ব্রেজনেভ সংবিধানের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সোভিয়েত নাগরিকত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ৩৩নং ধারায় বলা হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমরূপ নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক নাগরিক সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক হলে গণ্য হবেন। অর্থাৎ পৃথিবীর অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মত সোভিয়েত ইউনিয়নেও দ্বৈত নাগরিকত্বের নীতি স্বীকৃত হয়েছে। বলা হয়, এই দ্বৈত নাগরিকত্বের নীতি আঞ্চলিক স্বার্থের সঙ্গে জাতীয় ঐক্যের সঙ্গতি ঘটায়। ব্রেজনেভ সংবিধানে দেশের সমগ্র জনগণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে— (ক) সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক, (খ) সোভিয়েত রাশিয়ায় বসবাসকারী ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক এবং (গ) রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি। মহান্ অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক অধিকার ভোগ করতেন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক নয়, এরকম অসংখ্য ব্যক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাস করলে নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি পেতেন। ১৯৩৮ সালে নাগরিকতা সংক্রান্ত আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন বসবাসকারী বিদেশীদের যারা কোন ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার ভোগ করতেন না, তাদের রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের এরকম কোন ঢালাও স্বীকৃতি পশ্চিমী দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রে দেখা যায় না।

আবার স্তালিন সংবিধানের ন্যায় সোভিয়েত রাশিয়ায় নতুন সংবিধানেও বিদেশী

নাগরিকদের আশ্রয় লাভের অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন সংবিধানের ৮নং ধারায় বলা হয়েছে, "শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ ও শান্তির আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য কিংবা বৈপ্লবিক ও জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য, অথবা প্রগতিশীল সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন প্রকার সৃজনশীল কাজকর্মের জন্য নির্যাতিত বিদেশী নাগরিকদের সোভিয়েত ইউনিয়ন আশ্রয় লাভের অধিকার প্রদান ক'রছে"। এই ভাবে জন্মসূত্রে নাগরিক এবং আশ্রয়প্রাপ্ত নাগরিক ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়নে কর্মরত বিদেশী নাগরিকগণ কিংবা রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং আইন অনুযায়ী অন্যান্য অধিকার ভোগ করতে পারেন। এমনকি নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য তাঁরা আইনের সাহায্যও নিতে পারেন। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসকারী এইসব বিদেশী নাগরিকগণ এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান এবং আইনকানুন মেনে চলতে বাধ্য।

তিন : সোভিয়েত নাগরিকদের অধিকার (Rights of the Soviet Citizens)

সোভিয়েত ইউনিয়নের স্তালিন সংবিধানের মত ব্রেজনেভ সংবিধানেও নাগরিকদের কতগুলি অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে—যে অধিকারগুলি এক সুখী, শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাফল্যের পরিচায়ক। ১৯১৮ বা ১৯২৪ সালের সংবিধানে শ্রমজীবী মানুষের কোন অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেহেতু সময় তখন অনুকূল ছিল না। তখনো প্রতিবিপ্লবী অন্তর্ঘাতকরা, সাম্রাজ্যবাদের ফেরীওয়ালারা সোভিয়েত ইউনিয়নে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। কিন্তু ১৯৩৬ সালে যখন স্তালিন সংবিধান গ্রহণ করা হয়েছিল, তখন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সোভিয়েত ইউনিয়নে খুব প্রতিকূলে ছিল না। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ ব্যবস্থা তখন বেশ একটা শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে সোভিয়েত সংবিধানের প্রণেতাগণ জনগণের অধিকার বা স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করার জন্য সংবিধানে মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি অধ্যায় সংযোজন করেছিলেন। কিন্তু ব্রেজনেভ সংবিধানে নাগরিকদের এই অধিকার ও কর্তব্যের কথা আরও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। স্তালিন সংবিধানে যেখানে মাত্র ১২টি অনুচ্ছেদ এই নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছিল, ব্রেজনেভ সংবিধানে সেখানে ২০টি অনুচ্ছেদে নাগরিকদের অধিকার তথা স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে (৩৯-৫৮নং ধারা)।

সোভিয়েত সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য

যেহেতু সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ সবসময়ই এই অভিমত পোষণ করতেন যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র একটি প্রহসনে পরিণত হয়, তাই তাঁরা পৌর অধিকারের তুলনায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। স্তালিন একসময় এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, "প্রকৃত স্বাধীনতা একমাত্র তখনই সম্ভব, যখন শোষণের অবসান ঘটেছে, যখন কিছুলোক অধিকাংশ

লোককে শোষণের সুযোগ পায় না,' যখন বেকারি ও দারিদ্র্যের অবসান ঘটে, যখন মানুষ বেকার হবার আতঙ্কে ম্রিয়মাণ হয় না, যখন মানুষ রুটি, রুজি বা বাড়ী ঘরের দুশ্চিন্তার কাল কাটায় না। একমাত্র এই রকম সমাজব্যবস্থায় মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে।

তাই সোভিয়েত সংবিধানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারকে পৌর বা রাজনৈতিক অধিকারের তুলনায় বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই সোভিয়েত সংবিধানে প্রথমেই কাজের অধিকার, উপযুক্ত মজুরীর অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, দুর্ঘটনায়, পীড়িত অবস্থায় বা বার্ধক্যে ভাতার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সোভিয়েত সংবিধানে যে পৌর অধিকারগুলি সুনিশ্চিত করা হয়েছে সেই অধিকারগুলি অসীম নয়। এই অধিকারগুলি শর্তাধীন। বলা হয়েছে, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থে এই অধিকারগুলি প্রয়োগ করা হবে। অতএব যারা সমাজতন্ত্রের শত্রু তারা কখনোই বাক্‌স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা অন্যান্য অধিকারগুলি দাবী করতে পারে না।

ব্যক্তিস্বার্থ ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের তত্ত্বে সোভিয়েত সংবিধান প্রণেতারা বিশ্বাস করেন না। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই ব্যক্তির অধিকার, স্বাধীনতা ও মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে রক্ষিত হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বাসস্থান বা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিক সমান সুযোগ ভোগ করে। এখানে নাগরিকদের মধ্যে কোন রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় না। সুতরাং নাগরিক অধিকার বনাম রাষ্ট্র—এই দ্বন্দ্বের কোন স্থান সোভিয়েত রাশিয়ায় নেই।

আবার সোভিয়েত সংবিধানেই প্রথম নাগরিকদের অবশ্য পালনীয় একটি কর্তব্যের তালিকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখন অবশ্য পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রের সংবিধানে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সংবিধানে আমরা নাগরিকদের জন্য একটি কর্তব্য তালিকা সংযোজিত হয়েছে দেখতে পাই। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত সঠিকভাবেই এই অভিমত পোষণ করতেন যে নাগরিকরা যদি কর্তব্য সচেতন না হয়, তাহলে তারা তাদের অধিকারগুলিও পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারবে না। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের পরিপূরক। তাই সোভিয়েত সংবিধানে শুধু নাগরিক অধিকারই সুনিশ্চিত করা হয়নি, নাগরিকদের কর্তব্য পালনের ওপরেও জোর দেওয়া হয়েছে।

সোভিয়েত সংবিধান প্রণেতাগণ তথাকথিত স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে মানুষের অধিকারগুলি প্রকৃত পক্ষে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকগণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার জন্যই কতগুলি অধিকার ভোগ করার সুযোগ পেয়েছে; সুতরাং তারা এমন কোন অধিকার দাবী করতে পারে না যা রাষ্ট্রের স্বার্থ, অস্তিত্ব বা নিরাপত্তা বিপন্ন করে। পরিশেষে বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নে নাগরিক অধিকার জাতি, ধর্ম, বাসস্থান, কিংবা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমান ভাবে ভোগ করার অধিকারী। এখানে নাগরিকদের মধ্যে কোন রকম বৈষম্যমূলক আচরণের

অবকাশ নেই। স্ত্রীলোকদের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধা ও অধিকার সংবিধানে সুনিশ্চিত করা হয়েছে যাতে তারা দ্রুত জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের সমকক্ষ হতে পারে।

সোভিয়েত সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিক অধিকার

সংবিধানের ৩৯নং থেকে ৫৮নং ধারায় সোভিয়েত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার-গুলি বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে কতগুলি অধিকার আছে, যে অধিকারগুলি আমরা পৃথিবীর অন্যান্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সংবিধানেও দেখতে পাই। কিন্তু সোভিয়েত সংবিধানে আবার এমন অনেক অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে যা কোন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে নেই। ৪০ থেকে ৪৫নং ধারা সোভিয়েত নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকারগুলি সুনিশ্চিত করেছে সোভিয়েত সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে ব্যক্তিমানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা নির্ভর করে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর। তাই সংবিধান প্রণেতারা অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে পৌর বা রাজনৈতিক অধিকারের তুলনায় বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

নীচে সোভিয়েত সংবিধানে স্বীকৃত অধিকারগুলি আলোচনা করা হ'ল।

১. কাজের অধিকার

স্তালিন সংবিধানের ১১৮নং ধারার মতই ব্রেজনেভ সংবিধানের ৪০নং ধারায় সোভিয়েত নাগরিকদের কাজের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বলা হয়েছে নাগরিকরা তাদের কাজের পরিমাণ ও গুণগত উৎকর্ষ অনুযায়ী বেতন পাবে। এককথায় বলা যায় সোভিয়েত রাশিয়ায় কোন বেকার নেই। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্যতম প্রধান সাফল্য হল বেকারির অবসান। এই সাফল্য সম্ভবপর হয়েছে জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার জন্য, ক্রমাগত উপাদান বৃদ্ধির জন্য, অর্থনৈতিক সংকটের কারণগুলি দূর করার জন্য এবং উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার পূর্ণ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য। যেহেতু সেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান হয়েছে, যেহেতু উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর সামাজিক মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যেহেতু সোভিয়েত রাশিয়ায় উৎপাদন পরিচালিত হয় একমাত্র সাধারণ মানুষের স্বার্থে, তাই সোভিয়েত রাশিয়ায় সাধারণ মানুষের বিপুল বৈষয়িক সমৃদ্ধি সম্ভবপর হয়েছে।

অবশ্য ডঃ ফাইনারের মত সমালোচকগণ মনে করেন যে, এই কাজের অধিকার কথাটি আপাতদৃষ্টিতে খুব চটকদার মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ মানুষই সেখানে ক্রীতদাসের ন্যায় কাজ করে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনির বিনিময়ে তারা মজুরী বেশি পায় না। আর পরিচালনগত ত্রুটির জন্য উৎপাদনও অনেক সময় আশানুরূপ হয় না। কিন্তু এইসব সমালোচনার উত্তরে একথা বলা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ক্রমবর্ধমান বিশাল বেকার বাহিনী দেখা যায় না। তাছাড়া ব্রেজনেভ সংবিধানে নাগরিকদের

ইচ্ছামত কাজ পছন্দ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, নাগরিকগণ তাদের শিক্ষাদীক্ষা, রুচি বা পছন্দ অনুযায়ী কাজ বেছে নিতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিচালকমণ্ডলী ইচ্ছামত কোন শ্রমিক বা নাগরিককে কর্মচ্যুত করতে পারেন না। এবিষয়ে আগে সংশ্লিষ্ট ট্রেডইউনিয়নের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়।

২. বিশ্রামের অধিকার

ব্রেজনেভ সংবিধানের ৪১নং ধারায় নাগরিকদের বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। এক সময় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করেছিল শ্রমিকদের নির্মম বঞ্চনা ও শোষণের ওপর। পুঁজির মালিকরা তাদের মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে শ্রমিকদের অবিরাম বঞ্চিত করে এবং তাদের ওপর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির বোঝা চাপিয়ে। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় একদিকে যেমন নাগরিকদের কাজের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং ইচ্ছামত কাজ বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে ; অন্যদিকে তেমনি তাদের কাজের সময় কমিয়ে বছরে একবার সবেতন ছুটির ব্যবস্থা করে, দেশব্যাপী অসংখ্য শৈলাবাস, স্বাস্থ্যনিবাস, বিশ্রামাগার, ক্লাব, লাইব্রেরী ইত্যাদি স্থাপন করে শ্রমিকদের বিশ্রাম ও অবসর ভোগ করার এক সুন্দর ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় কাজের ঘণ্টা কমানোর জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে তিক্ত ও তীব্র সংগ্রাম করতে হয়েছিল। কিন্তু বল্গাহীন মুদ্রাস্ফীতির জন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিকদের অনেক সময়ই বেশি খাটতে হয়। বিশ্রামের অধিকার, অবসরের অধিকার তারা অনেক সময়ই পায় না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিকদের বিশ্রাম ও অবসর যাতে তাদের দৈহিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের অনুকূল হয় তারজন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়।

সংবিধানের ৪৩নং ধারায় নাগরিকদের বার্ধক্যে, পীড়িত অবস্থায় কিংবা অঙ্গহানি জনিত দুর্ঘটনার ভরণপোষণের অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে। গুরুতর দুর্ঘটনার জন্য যদি কোন শ্রমিক অক্ষম হয়ে পড়ে তাহলে রাষ্ট্র তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে। সমাজের বৃদ্ধ নাগরিকদের অবসর জীবন যাতে দুর্বিষহ হয়ে না ওঠে, তার জন্য তাঁরা প্রচুর অবসরকালীন ভাতা পান। অনুরূপভাবে পীড়িত মানুষেরা যাতে নিজেদের অপরের বোঝা বলে না মনে করে তারজন্য ভাতার ব্যবস্থা আছে। সামাজিক বীমা, বিভিন্ন প্রকারের পেনসন, ভাতা ইত্যাদি চালু করে, আংশিকভাবে অক্ষম নাগরিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে, পরিজনহীন বৃদ্ধ ও অক্ষমদের যথাযোগ্য চিকিৎসা ও সেবার বন্দোবস্ত করে এই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে।

সংবিধানের ৪২নং ধারায় নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সুস্থ ও নীরোগ দেহের অধিকারী নাগরিকরা রাষ্ট্রের সম্পদ। তাই নাগরিকদের স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে তার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে চিকিৎসা খাতে বিপুল ব্যয় করা হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে নতুন গবেষণাকে উৎসাহ দিয়ে, বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেশব্যাপী অসংখ্য হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করে, শিল্প প্রতিষ্ঠান-

গুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর জোর দিয়ে, পরিবেশন দূষণ রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে, সোভিয়েত নাগরিকদের স্বাস্থ্যের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। স্তালিন সংবিধানে এই অধিকারটির কোন উল্লেখ ছিল না। ব্রেজনেভ সংবিধানেই প্রথম এই অধিকার স্বীকৃত হয়।

৩. **আবাসনের অধিকার**

সারা বিশ্বে প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নে নাগরিকদের এই আবাসনের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ব্রেজনেভ সংবিধানের ৪৪নং ধারায় এই গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সুনিশ্চিত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নে নাগরিকদের জীবন আরো ভালভাবে বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। সেখানে সরকার নাগরিকদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্পগুলিতে বিপুল ব্যয় করেন। তাছাড়া নাগরিকগণ অত্যন্ত কম সুদে বাড়ী তৈরি করার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে পারে। খুব কম ভাড়ায় নাগরিকদের মধ্যে সরকারি ফ্ল্যাট বণ্টন করা হয়। তাছাড়া গৃহনির্মাণের জন্য ব্যক্তিগত বা সমবায়মূলক প্রচেষ্টাকে সরকার সবসময়ই সাহায্য করেন।

৪. **শিক্ষার অধিকার**

ব্রেজনেভ সংবিধানের ৪৫নং ধারায় সোভিয়েত নাগরিকদের শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যেক নাগরিক অবৈতনিক সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ ভোগ করে। তাছাড়া বিশেষ ধরনের পলিটেকনিক ও উচ্চশিক্ষায়তন সারা দেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ডাকযোগে শিক্ষা, সান্ধ্য শিক্ষাক্রম, ইত্যাদির মাধ্যমেও উচ্চতর শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রচুর বৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন গণশিক্ষা বিস্তারের এক পরিকল্পিত কর্মসূচী অনুসরণ করে চলেছে। ফলে সোভিয়েত রাশিয়ায় শিক্ষার অগ্রগতি, প্রযুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিকাশে সহায়তা করেছে এবং নাগরিকদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে উন্নত করেছে।

৫. **সংস্কৃতির অধিকার**

ব্রেজনেভ সংবিধানের ৪৬নং ধারায় নাগরিকদের সংস্কৃতির অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নাগরিকরা মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালাগুলিতে অবাধ প্রবেশের সুযোগ লাভ করবে যাতে তারা স্বদেশ ও বিদেশের সাংস্কৃতিক সম্পদগুলি দেখার বা উপভোগের সুযোগ পায়। রাষ্ট্র সারা দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এমনভাবে স্থাপন করবে যাতে আঞ্চলিক ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ থাকে। বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করে, রেডিও ও টেলিভিশনের ব্যাপক বিকাশ সাধন করে, সারা দেশে অসংখ্য পাঠাগার স্থাপন করে

এই অধিকারকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, স্তালিন সংবিধানে এই অধিকারের কোন উল্লেখ ছিল না। বর্তমান সংবিধানের ৪৭নং ধারায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রযুক্তিবিদ্যা কিংবা চারুকলা বিকাশের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ বৈজ্ঞানিক এবং গবেষণাকে উৎসাহ দিয়ে, সাহিত্য ও চারুকলা অগ্রগতিতে কোন রকম বাধা না দিয়ে সরকার জনগণের সৃজনশীল বৃত্তিকে উৎসাহদানের চেষ্টা করবে।

৬. স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সমান অধিকার

নতুন সংবিধানের ৩৫নং ধারায় স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্ত্রীলোকদের শোষণ ও তাদের প্রতি নির্মম বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান ঘটেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করে যা পৃথিবীর কোন ধনসমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্ত্রীলোকেরা কল্পনাও করতে পারে না। প্রশাসনে, কলকারখানায় খেতে খামারে অফিস আদালতে বা আইনসভায়—সর্বত্র স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। বেতন, বিশ্রাম, ছুটি বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার পেয়ে থাকেন। আগে যে সব বৃত্তি বা চাকরি কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত থাকত, এখন সেই সব বৃত্তি বা চাকরি স্ত্রীলোকদের জন্যও উন্মুক্ত। সোভিয়েত সরকার নারী জাতির সুযোগ সুবিধা, তাঁদের স্বাস্থ্য বা কল্যাণ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন সাধারণত কঠোর শ্রমসাধ্য কাজে স্ত্রীলোকদের নিয়োগ করা হয় না। সন্তান প্রসবের আগে ও পরে তাদের ছুটির ব্যবস্থা আছে। মাতা ও সন্তানের যাতে স্বাস্থ্যহানি না হয়, সেদিকে সরকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। এমন কি অবিবাহিতা মায়েদের সন্তানদের প্রতিও রাষ্ট্র সমান নজর দেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এমন একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র যেখানে অসংখ্য জাতি ও গোষ্ঠী বসবাস করে। এই সব জাতি-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব বাসভূমি এবং নিজস্ব জীবনযাত্রা পদ্ধতি আছে। লেনিনের মতে, জারের রাশিয়া ছিল জাতিসমূহের বন্দীশালা, কেননা জারের রাশিয়ায় সরকারি নীতি ছিল অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর রুশীকরণ। তাই জারের রাশিয়ায় একমাত্র রুশরাই যাবতীয় অধিকার ভোগ করত, আর অন্যান্য জাতীয় জনগোষ্ঠী দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হত। জারের রাশিয়ায় সরকারি নীতি ছিল, "এক জার, এক চার্চ এবং এক ভাষা"। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করে। আর নাগরিকরা জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সমান সুযোগ ও অধিকার ভোগ করে। সংবিধানের ৩৪নং ধারায় স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, জাতিগত বৈষম্য বা জাতিদম্ভের কোন স্থান সোভিয়েত রাশিয়ায় নেই। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সোভিয়েত নাগরিকগণ জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সমান সুযোগ ও অধিকার ভোগ

করে। দক্ষিণ আফ্রিকা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বর্ণবিদ্বেষ, জাতিগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা (race riots) সোভিয়েত রাশিয়ায় দেখা যায় না।

৭. **ধর্মের অধিকার**

ব্রেজনেভ সংবিধানের ৫২নং ধারায় ধর্মের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকগণ বিবেকের স্বাধীনতা ভোগ করবে। তারা যে কোন ধর্ম মানতে পারে, ধর্মীয় আচার-আচরণ সম্পাদন করতে পারে। আবার তারা কোন ধর্ম না ও মানতে পারে কিংবা নিরীশ্বরবাদ প্রচার করতে পারে। রাষ্ট্রকে চার্চ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে সোভিয়েত রাশিয়ায় কিছু নেই। কেবলমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অনুগ্রহ, আবার অন্যদিকে কোন সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন—সোভিয়েত ইউনিয়নে এসব নেই। জারের রাশিয়ায় গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য ভোগ করত এবং চার্চ ছিল জারের স্বৈরশাসনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার স্কুলে-কলেজে ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে কুসংস্কার মুক্ত হয়, যাতে তারা মুক্তি বুদ্ধির অনুসারী হয় তার জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য চালান হয়। নিরীশ্বরবাদী চিন্তাধারা প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে ধর্মীয় উন্মত্ততা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়।

৮. **রাজনৈতিক অধিকার**

সোভিয়েত জনগণের জন্য সংবিধানে যে রাজনৈতিক অধিকারগুলোকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে সেগুলো নীচে আলাদা করে আলোচনা করা হল।

(ক) **বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা :** সংবিধানের ৫০ নং ধারায় নাগরিকদের বাক্ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু এই বাক্ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এমনভাবে ব্যবহৃত হতে পারবে না যার ফলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। কারপিনস্কির মতে, একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের মত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই নাগরিকগণ প্রকৃত বাক্ ও মতবিনিময়ের স্বাধীনতা ভোগ করে। বাক্ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতি অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা, মিছিল করা বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের স্বাধীনতা সংবিধানে স্বীকার করা হয়েছে। এই অধিকারগুলি যাতে নাগরিকগণ ভোগ করতে পারে সেইজন্য রাষ্ট্র শ্রমিকশ্রেণী, তার দল ও সংস্থাগুলির হাতে মুদ্রাযন্ত্র, প্রয়োজনীয় উপকরণ বা সাজসরঞ্জাম, বাড়ীঘর, পথঘাট, সংবাদপত্র ইত্যাদি ব্যবহার করার ঢালাও সুযোগ দেয়। কিন্তু এই অধিকারগুলি যেন এমনভাবে প্রয়োগ না করা হয় যাতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে।

অবশ্য পশ্চিমী সমালোচকদের মতে একদলীয় শাসন-ব্যবস্থা, সংবাদপত্র ইত্যাদির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ এই সব রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে প্রহসনে পরিণত করেছে। এর উত্তরে সোভিয়েত রাশিয়ায় সমর্থকগণ বলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে শোষণমুক্ত

শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য একটি দলই যথেষ্ট, একাধিক দলের সেখানে কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। শুধু তাই নয়, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্র প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ পুঁজির মালিকদের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। তাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে বাগাড়ম্বর করা বুর্জোয়াদের শোভা পায় না।

(খ) **গণসংগঠনগুলিতে একত্রিত হওয়ার অধিকার:** সংবিধানের ৫১নং ধারায় নাগরিকদের বিভিন্ন রকম গণসংগঠন গড়ার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। গণসংগঠনগুলি যাতে ভালভাবে কাজ করার সুযোগ পায়, তার জন্য সংবিধানে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই অধিকার যেন কখনোই সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে বিপন্ন করার কাজে ব্যবহৃত না হয়।

(গ) **নাগরিকদের ব্যক্তিগত অধিকার:** সোভিয়েত ইউনিয়নে নাগরিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার, বাসস্থানের নিরাপত্তার অধিকার এবং গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সংবিধানের ৫৪নং ধারায় বলা হয়েছে যে, নাগরিকদের আদালতের সিদ্ধান্ত বা প্রোকিউরেটরের আদেশ ছাড়া গ্রেপ্তার করা যায় না। সংবিধানের ৫৫নং ধারায় বলা হয়েছে যে, আইনসঙ্গত কারণ ছাড়া গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তার বাসগৃহে প্রবেশ করতে পারে না। সংবিধানের ৫৬নং ধারায় বলা হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের জীবনের, চিঠিপত্রের, টেলিফোন বা টেলিগ্রাফের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। নাগরিক জীবনের একান্ত, ব্যক্তিগত বিষয়কে যাতে প্রকাশ্য দিবালোকে টেনে না আনা হয়, তার জন্য সংবিধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঘ) **আদালত কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার:** ব্রেজনেভ সংবিধানের ৫৭নং ধারা অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকগণ নিজেদের সুনাম, খ্যাতি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনরক্ষার জন্য যে কোন অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে এবং প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারে। সংবিধানে সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থা, সরকারি কর্মচারী বা গণসংগঠনগুলির কর্তব্য হল নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহকে রক্ষা করা।

(ঙ) **অভিযোগ করার অধিকার:** ব্রেজনেভ সংবিধানের ৫৮নং ধারা অনুযায়ী নাগরিকেরা প্রশাসন, সরকারি কর্মচারী বা কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। যদি অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে নাগরিকদের ক্ষতি-পূরণ পাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু সমালোচকগণ মনে করেন যে, যেহেতু সোভিয়েত রাশিয়ার বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার কোন ব্যবস্থা নেই, যেহেতু সেখানে বিচারকগণ দীর্ঘদিনের জন্য নিযুক্ত হন না এবং যেহেতু তাঁদের প্রত্যাহার করে নেওয়া যায়, ফলে অভিযোগ করার অধিকার অনেকাংশে অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

৯. **অন্যান্য অধিকার**

উপরোক্ত অধিকারগুলো ছাড়াও সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় সোভিয়েত নাগরিকদের কতগুলি অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

ক. ভোটাধিকার: বলা যায় সংবিধানের ৯৬নং ধারায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বাসস্থান, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৮ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক সোভিয়েত নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে। একমাত্র উম্মাদরা এই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা ছাড়াও সোভিয়েত নাগরিকদের নির্বাচিত হওয়ার অধিকার আছে। অবশ্য কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থার নির্বাচন প্রার্থীর কমপক্ষে ২১ বছর বয়স্ক হওয়া প্রয়োজন। একমাত্র উম্মাদদের নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার কোন অধিকার নেই।

খ. সীমিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার: সংবিধানের ১৩নং ধারায় নাগরিকদের সীমিত পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, যদিও এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি হল অর্জিত আয়। নাগরিকরা নিজেদের আয় থেকে সঞ্চয় করতে পারে, বাসগৃহ নির্মাণ করতে পারে, দৈনন্দিন জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দের জন্য মোটর গাড়ি, টেলিভিশন, কাপড় কাচার যন্ত্র ইত্যাদি কিনতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির মাধ্যমে অন্যকে শোষণ করা সোভিয়েত ইউনিয়নে নিষিদ্ধ।

গ. আশ্রয়ের অধিকার: সংবিধানের ৩৮নং ধারায় সেইসব বৈদেশিক নাগরিকদের সোভিয়েত রাশিয়ায় আশ্রয় পাওয়ার অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে যাঁরা, স্বদেশে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অগ্রণী অংশগ্রহণের জন্য, কিংবা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য, কিংবা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালনের জন্য নির্যাতিত হয়েছেন। একথা সঠিক যে, সারা বিশ্বের অসংখ্য বিপ্লবী নেতা ও কর্মী সোভিয়েত রাশিয়ায় নিরাপদ আশ্রয় ও নাগরিক অধিকার লাভ করেছেন।

ঘ পরিবার গঠনের অধিকার: সংবিধানের ৫৩নং ধারায় নাগরিকদের পরিবার গঠনের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। বলা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহের ভিত্তিতে এই পরিবার গড়ে উঠবে এবং এই পরিবারে স্বামী-স্ত্রী সম্পূর্ণ সমান অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করবে। রাষ্ট্র শিশুনিকেতন, জনসাধারণের জন্য ভোজনালয় ইত্যাদি স্থাপন করে, শিশুর জন্মের পর বৃত্তি প্রদান করে, বড় পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে পরিবার ব্যবস্থাকে সহায়তা করবে।

সমালোচনা

সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার সমালোচকগণ সোভিয়েত ইউনিয়নে বাস্তবে জনগণের কোন অধিকার ও স্বাধীনতা আছে কিনা সে বিষয়ে গভীর সংশয় প্রকাশ করেন।

তাঁরা বলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে নাগরিকরা মৃত আত্মায় পরিণত হয়েছে। তারা কোন মানসিক, আত্মিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে না। তাঁদের মতে, সোভিয়েত রাশিয়া এক অভিনব একদলীয় ব্যবস্থা—যে দানবীয় একদলীয় ব্যবস্থা পৌর ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এখানে ব্যক্তি মানুষ কখনোই সেই পরিবেশ পায় না, যে পরিবেশে সে নিজের সর্বোত্তম বিকাশের জন্য কাজ করতে পারে। এখানে পাতালে কেবলমাত্র একটি ঋতুই আছে—সেই ঋতু হল শীত ঋতু—যার তীব্র তীক্ষ্ম নখরাঘাতে ব্যক্তি মানুষ সবসময়ই সন্ত্রস্ত, সংকুচিত থাকে।

সোভিয়েত জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আছে একথা স্বীকার করে তাঁরা বলেন যে মানুষ কেবলমাত্র রুটি খেয়েই বাঁচতে পারে না। তার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন আত্মিক স্বাধীনতা। গণমাধ্যমগুলি যেহেতু সরকারী মতের ধারক ও বাহক তাই সেখানে ভিন্নমত পোষণ করা নাগরিকদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সমালোচকদের মতে, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নামে কমিউনিস্ট পার্টি প্রশাসন তথা সমাজজীবনের সর্বত্র এমন এক অমোঘ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে যার বিরুদ্ধে ব্যক্তি মানুষের বিদ্রোহ কখনোই সফল হয় না।

আরো বলা হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে বিচারকগণ হয় আইনসভা, না নয়তো জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত। অধ্যাপক লাস্কি এই নির্বাচিত বিচারকদের বিরুদ্ধে মতবিরোধ পোষণ করতেন। তাছাড়া এই বিচারকগণ যেহেতু স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন না, ফলে তারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য নাও এগিয়ে আসতে পারেন। আরও সমালোচনা করে বলা হয় যে সোভিয়েত বিচারালয় জনসাধারণের অধিকারের রক্ষক হিসাবে কাজ করে না। সমালোচকদের মতে সোভিয়েত রাশিয়া এখন এক বিরাট বন্দীশালায় পরিণত হয়েছে। গুপ্তপুলিশ, অনুগত সংবাদপত্র, অতিকায় প্রশাসন কখনোই ভিন্নমতাবলম্বীদের সহ্য করে না।

কিন্তু এই বিরূপ সমালোচনার উত্তরে বলা যায় যে, সোভিয়েত রাশিয়া সহ একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেই স্ত্রীলোকেরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে, যে স্বাধীনতা কোন অ-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্ত্রীলোকেরা কল্পনাও করতে পারে না। সোভিয়েত সংবিধানে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষেরা সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করবে। পুরুষদের মতো নারীরাও কাজের অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, বার্ধক্যে ও অঙ্গহানিজনিত দুর্ঘটনায় ভাতার অধিকার পাবে। নারী ও পুরুষের পারস্পারিক সম্মতির ওপর ভিত্তি করে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। আর এই বিবাহের ফলে যে পরিবার গড়ে উঠবে সেই পরিবারে স্বামী ও স্ত্রী সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করবে। পুরুষদের মতো স্ত্রীলোকেরাও শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ ভোগ করে। তারা একই কাজের জন্য একই রকম মজুরী পেয়ে থাকে। নারী শ্রমিকদের সন্তান প্রসবের আগে ও পরে অনেক সুযোগ সুবিধা ও ছুটি দেওয়া

হয়। শিশুদের জন্য কিণ্ডারগার্টেন, শিশু পালনাগার ইত্যাদি স্থাপন করে মায়েদের কাজের বোঝা হালকা করা হয়েছে। কিন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে স্ত্রীলোকেরা অনেক সময়ই পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করে না, একই কাজের জন্য একই রকম মজুরী পায় না। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক সমাজেই স্ত্রীলোকেরা মোট জনসংখ্যার অর্ধেক।

অতএব কোন সমাজে স্ত্রীলোকেরা যদি পুরুষের সমান সুযোগ সুবিধা, মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে, তাহলে সেই সমাজ নিশ্চয়ই অনেক বেশি প্রগতিশীল ও স্বাধীন। দেখা যায় সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন শতকরা সত্তর ভাগ চিকিৎসক মহিলা, শতকরা বাত্রিশ ভাগ বিচারক মহিলা, শতকরা একত্রিশ ভাগ সুপ্রীম সোভিয়েতের ডেপুটি মহিলা এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সুপ্রীম সোভিয়েতের ডেপুটিদের শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ মহিলা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে পারিবারিক ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী সম্পূর্ণ সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে। পুরুষ প্রাধান্য, স্ত্রীলোকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, বধূ হত্যা ইত্যাদি ঘটনা সোভিয়েত ইউনিয়নে নেই।

আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিটি নরনারী কাজের অধিকার, ইচ্ছামত কাজ বেছে নেওয়ার অধিকার, উপযুক্ত মজুরীর অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, বিশ্রামের অধিকার ইত্যাদি ভোগ করে। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন লোক নিরন্ন থাকে না, বেকার বা ভিখারীর জীবন কাটায় না। অথচ তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে কোটি কোটি লোক অর্ধাশনে, অনশনে দিন কাটায়। কেননা পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যই হল এই যে, শ্রমিকদের শোষণ ও বঞ্চনাকে তীব্রতর করার জন্য সেখানে বেকারদের এক সংরক্ষিত বাহিনী থাকবেই। এই ক্ষুধা থেকে মুক্তি, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাত থেকে মুক্তি নিশ্চয়ই সোভিয়েত ইউনিয়নের সাধারণ নাগরিকদের অনেক বেশি সুখী ও স্বাধীন মানুষে পরিণত করেছে। পুঁজির শোষণ সোভিয়েত রাশিয়ায় নেই। মুদ্রাস্ফীতি, বল্গাহীন মূল্য-বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত অর্থনীতির শিকার সোভিয়েত নাগরিকদের হতে হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিটি নাগরিক শিক্ষার অধিকার ভোগ করে। এই অধিকারকে কার্যকরী করার জন্য সারা দেশে অসংখ্য স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক, গ্রন্থাগার ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। ডাকযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নে অত্যন্ত সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শিক্ষার এই ঢালাও সুযোগ নিশ্চয়ই নাগরিক জীবনকে আরও বেশি সমৃদ্ধ ও অর্থবহ করে তুলেছে। আর শিক্ষান্তে চাকরির ব্যবস্থা, ইচ্ছামত কাজ বেছে নেওয়ার অধিকার, উপযুক্ত মজুরীর অধিকার যে কোন অ-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের অনেক বেশি সামাজিক নিরাপত্তা এনে দিয়েছে।

সাধারণত বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা লেগেই থাকে। কেননা শাসক শ্রেণী এই দ্বন্দ্ব ও ঘৃণার সুযোগ

নিয়ে নিজেদের শ্রেণীশাসন অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীকে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দিয়ে, তাদের ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দিয়ে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বা জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নাগরিকদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী করা হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন জাতি অন্য জাতি কর্তৃক শোষিত হয় না, যেহেতু উৎপাদনের উপকরণগুলির ওপর পূর্ণ সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৃহৎজাতি সুলভ দম্ভ কিংবা ক্ষুদ্র জাতি সুলভ সংকীর্ণতা পরিহারের জন্য নাগরিকদের সচেতন থাকতে বলা হয়েছে। বর্ণবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা, ভাষার লড়াই, জাতপাতের বিচার সোভিয়েত রাশিয়ায় নেই। নিশ্চয়ই এতে সোভিয়েত রাশিয়ার নাগরিকদের আরও বেশি সাংস্কৃতিক, মানসিক বা আত্মিক বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে বিচারব্যবস্থা অনেক বেশি দ্রুত, সহজ ও সংক্ষিপ্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নে পেশাদার আইনজীবীরা বিচার প্রার্থীদের শোষণের সুযোগ পায় না। কিন্তু যে কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্রে সুবিচার সাধারণ নাগরিকদের নাগালের বাইরে। এইসব বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বিচার পদ্ধতি দিনের পর দিন যেভাবে মহার্ঘ ও বিলম্বিত হয়ে পড়েছে, তার ফলে সাধারণ মানুষ অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী লোকদের বিরুদ্ধে বিচারালয়ের দ্বারস্থ হতে ভয় পায়। আর একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, প্রোকিউরেটরের দপ্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের অধিকার, স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য অত্যন্ত তৎপর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র, রাজনৈতিক দল বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা কতখানি জনগণের অধিকার রক্ষা করে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। আপাত দৃষ্টিতে হয়তো ঐসব রাষ্ট্রে অনেক বেশি বাক্ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে, কিন্তু ঐসব রাষ্ট্রের নাগরিকরা সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের মতো অর্থনৈতিক অধিকার, শিক্ষার অধিকার ভোগ করে না। যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের এত অধিকার সুনিশ্চিত করেছে, সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিপন্ন করার অধিকার নাগরিকরা ভোগ করে না।

চার: সোভিয়েত নাগরিকদের কর্তব্যসমূহ (Duties of the Soviet People).

স্তালিন সংবিধানের মত ব্রেজনেভ সংবিধানেও নাগরিকদের অবশ্য পালনীয় কতগুলি মৌলিক কর্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে। সোভিয়েত সংবিধানের প্রণেতাগণ মনে করেন যে, অধিকার কখনো একতরফা হতে পারে না। অধিকার তখনই সফল হয় যখন নাগরিকেরা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের পরিপূরক।

তাই সংবিধানের ৫৯নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকরা দেশের সংবিধান ও আইনকানুন মেনে চলতে, সমাজতান্ত্রিক আচরণবিধি মেনে চলতে, এবং সোভিয়েত নাগরিকত্বের সম্মান ও মর্যাদা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে বাধ্য। এক কথায় বলা যায়, নাগরিকদের আইন ও সংবিধান মেনে চলতে হবে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রত্যাশিত আচরণবিধি মেনে চলতে হবে। যেহেতু সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে, তাইআইন ও সংবিধানের প্রতি আনুগত্য শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থানকে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলে। কারাপেনস্কির মতে "সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্বার্থ, সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার স্বার্থ এবং সোভিয়েত জনগণের স্বার্থ এক ও অভিন্ন।" অতএব কোন নাগরিক যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন অমান্য করে, তাহলে সেই ব্যক্তি শুধু সোভিয়েত রাষ্ট্র বা সমাজকেই বিপন্ন করে না, সেই ব্যক্তি সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধেও কাজ করে।

আইন ও সংবিধান মান্য করা

সংবিধানের ৬০নং ধারায় বলা হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেক সক্ষম নাগরিক যেন নিজের কাজ বেছে নেয়, সামাজিকভাবে হিতকারী পেশায় বিবেকসম্পন্ন মনোভাব নিয়ে কাজ করে এবং শ্রমশৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলে। সংবিধানে যেমন কাজের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে, তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়নে এই নীতিও মেনে চলা হয় যে কোন নাগরিক যদি কাজ না করে, তাহলে সে খেতেও পারে না (He who shall not work, neither shall he eat his bread)।

কাজ করা

এক কথায় বলা যায়, অলস-শ্রমবিমুখ জীবন যাপন করা, পরগাছাবৃত্তি, কাজে ফাঁকি দেওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমশৃঙ্খলার আদর্শের পরিপন্থী। তাই নাগরিকদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল কাজ করা এবং নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সাহায্যে সেই কাজ সম্পন্ন করা। নাগরিকদের সবসময়ই একথা মনে রাখতে হয় যে, কাজের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও বিশৃঙ্খলা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে সুদূরপরাহত করে তুলবে।

সংবিধানের ৬১ নং ধারা অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করা নাগরিকদের পবিত্র কর্তব্য। কেন না সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারলে সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তিবৃদ্ধি ঘটবে, সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে। তাই সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি যারা ধ্বংস করে বা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে তারা রাষ্ট্রের শত্রু, জনগণের শত্রু।

সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করা

সংবিধানের ৬২নং ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষা করা, তার শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা প্রত্যেক সোভিয়েত নাগরিকের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এর অর্থ হল মাতৃভূমি আক্রান্ত হলে প্রত্যেক সোভিয়েত নাগরিকের কর্তব্য হল অস্ত্রধারণ করা এবং মাতৃভূমি রক্ষার জন্য এগিয়ে আসা। সোভিয়েত ইউনিয়নে মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকে জঘন্যতম অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

মাতৃভূমিকে রক্ষা করা

সংবিধানের ৬৩ নম্বর ধারায় নাগরিকদের সোভিয়েত ইউনিয়নের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান করাকে এক মহান্ কর্তব্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যেক যুবককে দু, থেকে চার বছর বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত একজন পুরুষ নাগরিককে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হয়। যে সব স্ত্রীলোক চিকিৎসা বিদ্যায় ডিগ্রী অর্জন করেন বা যারা নার্স হিসাবে কাজ করেন, তারাও ইচ্ছা করলে সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। কারপিনস্কির ভাষায় বলা যায়, "আমাদের মহান্ সোভিয়েত দেশকে, বিশ্বের শ্রমিক কৃষকের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে, আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক মহান্ মাতৃ-ভূমিকে রক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার থেকে আর সম্মানজনক কর্তব্য কি হতে পারে?" ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নে যুবকদের সামরিক শিক্ষা গ্রহণ এবং সৈন্য বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়।

সামরিক শিক্ষাগ্রহণ

সংবিধানের ৬৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হল অন্যান্য নাগরিকদের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং বহুজাতিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতি ও অধিজাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় করা। মনে রাখতে হবে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকটি প্রধান ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, বাসস্থান কিংবা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিককে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই নাগরিকরা যাতে বৃহৎ জাতিসুলভ দম্ভ কিংবা ক্ষুদ্র জাতিসুলভ সংকীর্ণতার শিকার না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নাগরিকদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা

সংবিধানের ৬৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত নাগরিকদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হল অন্যান্য ব্যক্তির অধিকার ও আইনসম্মত স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, অসামাজিক আচরণ সহ্য না করা এবং জনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করা। এককথায় বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের কর্তব্য হল অন্যান্য নাগরিকদের অধিকার স্বীকার করা, তাদের ন্যায্য দাবী মেনে নেওয়া।

অন্যের অধিকার স্বীকার করা

সংবিধানের ৬৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, পিতামাতার কর্তব্য হল শিশুসন্তানদের লালন পালন করা, তারা যাতে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা, তারা যাতে সমাজের মঙ্গলজনক কাজে আত্মনিয়োগ করে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সন্তানসন্ততিরা যে পর্যন্ত না ১৮ বছর উত্তীর্ণ হয়, ততদিন পর্যন্ত তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অভ্যাস ইত্যাদি গঠনের জন্য পিতামাতাকেই দায়ী থাকতে হয়। তেমনি বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণ করা, তাদের সেবাযত্ন করা সন্তানদের পবিত্র কর্তব্য বলে

পিতামাতা এবং সন্তানের কর্তব্য

বিবেচিত হয়। এক কথায় বলা যায়, সন্তানদের সঠিকভাবে লালনপালন করা এবং বৃদ্ধ পিতামাতার সেবাযত্ন করা সোভিয়েত নাগরিকদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

সংবিধানের ৬৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা নাগরিকদের অন্যতম কর্তব্য। নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করা, পরিবেশ দূষিত করার বিরুদ্ধে এখন বিশ্বমত অত্যন্ত সোচ্চার। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন যে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য যেন নষ্ট না করা হয়। সুখের বিষয়, সোভিয়েত সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে অবহিত হয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ কর্তব্য

সংবিধানের ৬৮নং ধারায় সোভিয়েত নাগরিকদের ঐতিহাসিক স্মারক সৌধ, স্তম্ভ বা নিদর্শনসমূহ শ্রদ্ধার সঙ্গে সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। দেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে, নিজেদের অতীত ভাল করে না জানলে কোন জাতি এগোতে পারে না। তাই সংবিধানে ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ রক্ষা করার জন্য নাগরিকদের আগ্রহের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ঐতিহাসিক নিদর্শন, স্মারকসৌধ ইত্যাদি সংরক্ষণ

তাছাড়া সংবিধানের ২৮ নম্বর ধারায় নাগরিকদের আন্তর্জাতিক সচেতনতা, আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে আগ্রহের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকগণ যেন বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তা, অন্যান্য দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত থাকে। এক কথায় বলা যায়, সোভিয়েত নাগরিকগণ যেমন মাতৃভূমিকে রক্ষা করবে এবং মাতৃভূমিকে শক্তিশালী করবে, তেমনি তারা যেন তাদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালন থেকেও বিরত না হয়। এই আন্তর্জাতিক কর্তব্য হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিকে সমর্থন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে তোলা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে আরো বেশি সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের মনোভাবকে প্রসারিত করা।

আন্তর্জাতিক কর্তব্য

আট

সুপ্রীম সোভিয়েত এবং প্রেসিডিয়াম
Supreme Soviet and Presidium

এক ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েত (**Supreme Soviet of the U.S.S R.**)

সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ প্রত্যেক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই আইনসভাকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবিধান প্রণেতারা ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতিতে আস্থা বা বিশ্বাস প্রদর্শন করেননি। মার্কসবাদীরা মনে করেন, যেহেতু আইনসভা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত, যেহেতু আইনসভায় জনমত সঠিক ভাবে প্রতিফলিত হয়, তাই আইনসভাই হল রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আধার।

তাই সোভিয়েত জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েতকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ সংগঠন রূপে স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ আইনসভার অধস্তন বিভাগ। তাই দেখা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন এবং তাঁরা সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে তাঁদের যাবতীয় কাজ ও নীতির জন্য দায়ী থাকেন। তেমনি সোভিয়েত রাশিয়ায় বিচারপতিগণ সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রোকিউরেটর জেনারেলও সুপ্রীম সোভিয়েতের দ্বারা নির্বাচিত হন এবং সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে দায়ী থাকেন।

সুপ্রীম সোভিয়েত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা। তাই অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার মত সুপ্রীম সোভিয়েতেরও দুটি কক্ষ আছে। একটি কক্ষ ইউনিয়নের সোভিয়েত (Soviet of the Union)। ইহা জনসংখ্যার ভিত্তিতে গঠিত। অর্থাৎ যে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রে লোকসংখ্যা বেশি, সেই অঙ্গপ্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের সোভিয়েত বেশি প্রতিনিধি পাঠায়। আবার যে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের লোকসংখ্যা কম, সেই অঙ্গপ্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের সোভিয়েতে কম প্রতিনিধি পাঠায়। অন্য দিকে, অপরকক্ষ জাতিপুঞ্জের সোভিয়েত (Soviet of the Nationalities) অঙ্গরাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত।

গঠন

বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলি যেন সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে। অঙ্গরাজ্যগুলির এই সমান অধিকার ও মর্যাদা তুলে ধরার জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিনেট, সুইজারল্যাণ্ডে কাউনসিল অব স্টেটস গঠন করা হয়েছে। একই কারণে স্তালিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা এককক্ষবিশিষ্ট হবে না। বরং সোভিয়েত রাশিয়াকে একটি সার্থক যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য অঙ্গরাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে

আর একটি কক্ষ থাকা প্রয়োজন। ব্রেজনেভ সংবিধান অনুযায়ী জাতিপুঞ্জের সোভিয়েতে প্রত্যেক অঙ্গপ্রজাতন্ত্র ৩২ জন, প্রত্যেক স্বায়ত্ত শাসিত প্রজাতন্ত্র (Autonomous Republic) ১১ জন, প্রত্যেক স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল (Autonomous Region) ৫ জন এবং প্রত্যেক জাতীয় এলাকা (National Area) একজন করে প্রতিনিধি পাঠায়।

সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষ একজন করে চেয়ারম্যান এবং চারজন করে ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্বাচন করে। উভয় কক্ষের চেয়ারম্যানরা নিজ নিজ কক্ষের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। উভয় কক্ষে যৌথ অধিবেশনে পালা করে উভয় কক্ষের চেয়ারম্যানরা সভাপতিত্ব করেন। সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন বছরে দুবার করে অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়োজনে প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েতের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারে। সুপ্রীম সোভিয়েতের কার্যকাল পাঁচ বছর।

সুপ্রীম সোভিয়েত সম্পর্কে আলোচনা করার সময় আরো মনে রাখা প্রয়োজন যে, সোভিয়েত সংবিধানে সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের ক্ষমতা ও মর্যাদা সমান। উভয়ে কক্ষের সদস্যগণই নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। উভয় কক্ষেরই আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর এবং কোন বিল উভয়কক্ষ কর্তৃক গৃহীত না হলে তা আইনে পরিণত হয় না। উভয় কক্ষই প্রশাসনিক বা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক কমিটি নিয়োগ করে। সোভিয়েত সংবিধান অনুযায়ী এই দুটি কক্ষ সমান মর্যাদার অধিকারী। কোন উচ্চকক্ষ বা নিম্নকক্ষ সোভিয়েত রাশিয়ায় নেই। আবার সুপ্রীম সোভিয়েতের কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির সার্থক প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়।

উভয় কক্ষের সমক্ষমতা

যখন সুপ্রীম সোভিয়েতের কোন অধিবেশন থাকে না, তখন সুপ্রীম সোভিয়েতের যাবতীয় ক্ষমতা ও অধিকার প্রেসিডিয়াম প্রয়োগ করে। এই প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। তাঁরা যৌথভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশ্য প্রেসিডিয়ামের যাবতীয় সিদ্ধান্ত সুপ্রীম সোভিয়েতের পরবর্তী অধিবেশনে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। সুপ্রীম সোভিয়েতের বছরে সাধারণত দুবার অধিবেশন হয় এবং এক একটি অধিবেশন দশ থেকে বারো দিনের বেশি স্থায়ী হয় না। তাই বছরের প্রায় ৩৪০ দিন প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েতের ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। পাশ্চমী সমালোচকদের মতে, এই প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েতের যাবতীয় ক্ষমতা আত্মসাৎ করেছে।

প্রেসিডিয়াম

কিন্তু এই সমালোচনার উত্তরে সোভিয়েত সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যগণের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হন। সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যগণ যৌথভাবে তাঁদের নির্বাচন করেন, আর তাঁদের যাবতীয় সিদ্ধান্ত সুপ্রীম সোভিয়েতের অনুমোদন সাপেক্ষ। সুতরাং প্রেসিডিয়ামের স্বৈরাচারী হওয়ার কোন অবকাশ নেই।

সোভিয়েত রাশিয়ায় সুপ্রীম সোভিয়েতের নির্বাচনে ১৮ বছর বা তার বেশী যে কোন নাগরিক ভোটদানের অধিকারী। কিন্তু ডেপুটি হিসাবে যারা নির্বাচন প্রার্থী হন, তাদের অবশ্যই ২১ বৎসর বয়স্ক হতে হবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক হতে হবে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সাধারণত সরকারী কর্মচারীদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। বলা হয় সরকারের সঙ্গে লাভজনক সম্পর্কে আবদ্ধ ব্যক্তিরা যেন আইনসভায় প্রার্থী না হন। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় এরকম কোন বিধিনিষেধ নেই। বরং সুপ্রীম সোভিয়েতে যারা ডেপুটি হিসাবে নির্বাচিত হন, তাঁরা অধিবেশনের সময় ছাড়া, কিংবা কমিটি মিটিং এর সময় বাদ দিয়ে, অন্য সময় নিজের কাজ বা পেশায় নিযুক্ত থাকতে পারেন। যখন সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন হয়, কিংবা কোন সংসদীয় কমিটির মিটিং থাকে তখন ডেপুটিরা সবেতন ছুটি ভোগ করেন।

সাধারণত নির্বাচনের সময় কমিউনিস্ট পার্টি ও তার শাখাসমূহ, ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা, যুবসংগঠন, সামরিক বাহিনীর ইউনিটসমূহ, সমবায় সমিতিগুলি সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রার্থী হিসাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয়। কোন সংস্থা কর্তৃক মনোনীত না হলে কোন ব্যক্তির নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যগণ পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। কিন্তু যদি কোন সদস্য নির্বাচকমণ্ডলীর বিরাগভাজন হন, যদি তিনি নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারেন, তাহলে নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশের সিদ্ধান্তক্রমে তাঁকে প্রত্যাহার করে নেওয়া যায় (right to recall)। ডেপুটিদের অধিকার

ডেপুটি

আছে মন্ত্রী, সরকারী সংস্থা বা উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তিদের কাছে প্রশ্ন করা বা সংবাদ সংগ্রহ করা। যখন সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন আহূত হয়, তখন সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিগণ তিনদিনের মধ্যে ডেপুটিদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। যে কোন ডেপুটি সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হওয়ার অধিকারী। সুপ্রীম সোভিয়েত বা প্রেসিডিয়ামের অনুমতি ছাড়া কোন ডেপুটিকে অভিযুক্ত করা, গ্রেপ্তার করা বা বিচারালয়ের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া যায় না। ডেপুটিগণ যে কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে পারেন, পরামর্শ দিতে পারেন, সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন। আগেই বলা হয়েছে যে, সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশনের সময় বা কোন কমিটির মিটিংএর সময় সদস্যগণ সবেতন ছুটি ভোগ করেন। এই সময় সাধারণত তাঁদের গড় বেতন দেওয়া হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র ডেপুটিগণ যানবাহনের সুবিধা ভোগ করেন। সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্য হিসাবে ডেপুটিরা বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করেন।

স্বাভাবিক ভাবেই আশাকরা হয় যে, ডেপুটিরা নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন। প্রতিনিধি হিসাবে তাঁরা নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে নিজেদের কাজের হিসাব দেন, জনগণের পাশে দাঁড়ান। তাঁদের মতামত শোনা, তাঁদের

অভিযোগগুলির প্রতীকার করা ডেপুটিদের কাজ। যদি কোন ডেপুটি তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হন, তাহলে নির্বাচকমণ্ডলী সেই ডেপুটিকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সুপ্রীম সোভিয়েত সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সংস্থা রূপে পরিগণিত। ইউনিয়নের সোভিয়েত এবং জাতিপুঞ্জের সোভিয়েত—এই দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত সুপ্রীম সোভিয়েত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করে। সংবিধানের ৭৩নং ধারায় কেন্দ্রীয় সরকারকে যে সব ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, সেই সব বিষয়গুলির ওপর সুপ্রীম সোভিয়েত আইন প্রণয়ন করার অধিকারী। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র যাতে একই আর্থিক নীতি অনুসৃত হয়, যাতে পরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা যায়, যাতে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্য আরো ত্বরান্বিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সুপ্রীম সোভিয়েত আইন প্রণয়ন করে। জনস্বাস্থ্য ও জনশিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলি যাতে অগ্রাধিকার পায়, দেশের সর্বত্র যাতে একই রকম শ্রমনীতি বা বিচার পদ্ধতি অনুসৃত হয়, সেদিকের ওপর জোর দিয়ে সুপ্রীম সোভিয়েত আইন প্রণয়ন করে। উভয়কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ যখন কোন বিল পাশ করেন, তখন সেই বিল আইনে পরিণত হয়।

সুপ্রীম সোভিয়েত এবং আইন প্রণয়ন

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক গৃহীত কোন বিল প্রেসিডিয়াম নাকচ করতে পারেন না, যে অধিকার অধিকাংশ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানেরা ভোগ করেন। সোভিয়েত সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে যেহেতু সুপ্রীম সোভিয়েত একটি সার্বভৌম সংস্থা, যেহেতু সুপ্রীম সোভিয়েতে জনমতের সঠিক প্রতিফলন ঘটে, তাই সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক গৃহীত বিলকে নাকচ করার কোন অধিকার অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থার থাকতে পারে না। সাধারণত সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক গৃহীত বিলগুলি সভাপতি ও সম্পাদকের স্বাক্ষরে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হয়।

ব্রেজনেভ সংবিধানে বলা হয়েছে যে, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা বিল সুপ্রীম সোভিয়েত জনসাধারণের মধ্যে আলোচনার জন্য পেশ করতে পারে বা গণভোটে দিতে পারে (৫নং ধারা)। সংবিধানের ১০৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, একমাত্র সুপ্রীম সোভিয়েতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন বিল বা বিষয়ের ওপর গণভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে। অবশ্য যদি সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যগণ কিংবা প্রেসিডিয়াম দাবী করেন, বা, যদি কোন অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের তরফে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব বা বিষয় জনসাধারণের মতামতের জন্য পেশ করা হোক, তাহলে সেই বিষয়ের ওপর জনমত যাচাই করা যেতে পারে। কিন্তু কোন বিল একমাত্র সুপ্রীম সোভিয়েতই গণভোটে দিতে পারে।

আর্থিক বিষয়ে সুপ্রীম সোভিয়েতকে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। পরিকল্পিত অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজ যাতে দ্রুত সাফল্যমণ্ডিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী এক অভিন্ন আর্থিক নীতি সুপ্রীম সোভিয়েতই প্রণয়ন করে। সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য বাজেট অনুমোদন করা সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রধান কাজ। সুপ্রীম সোভিয়েতের অনুমোদন ছাড়া কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থা সরকারী তহবিল থেকে ব্যয় করতে পারে না।

আর্থিক ক্ষমতা

আবার বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যাতে রাষ্ট্র সঠিক নীতি অনুসরণ করে সেদিকে সুপ্রীম সোভিয়েত লক্ষ্য রাখে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, যুদ্ধ ও শান্তি, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সুপ্রীম সোভিয়েত মূলনীতি প্রণয়ন করে (৭৩নং ধারায়)। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব, অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলির সঙ্গে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সম্পর্ক, বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সমন্বয় সাধন ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রেও সুপ্রীম সোভিয়েত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ নীতি

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধনের ক্ষমতা একমাত্র সুপ্রীম সোভিয়েতের হাতেই অর্পণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের প্রত্যেকটিতে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সদস্য কোন সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করেন, একমাত্র তাহলেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করা সম্ভব (১৭৪ নং ধারা)। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কোন গণভোটের ব্যবস্থা সোভিয়েত সংবিধানে করা হয়নি। আবার অঙ্গরাজ্যগুলির মতামতের কোন প্রশ্নও সেখানে রাখা হয়নি। বলা হয়েছে, সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তনের ক্ষমতা একমাত্র সুপ্রীম সোভিয়েতেরই আছে। পশ্চিমী সমালোচকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যসমূহের অভিমত জানা একান্ত প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে তাই কিছু কিছু বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ রাজ্যের সমর্থন প্রয়োজন। সুইজারল্যাণ্ডে সংশোধনী প্রস্তাব গণভোটের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রতিটি কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সদস্য যদি সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করেন তাহলেই সংবিধান সংশোধন করা যায়। পশ্চিমী সমালোচকদের মতে, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিতে বিশ্বাসী একদলীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান অত্যন্ত সহজেই পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান তাদের মতে, আরো বেশি অনমনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া উচিত।

সংবিধান সংশোধন

সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন অঙ্গপ্রজাতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র বা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠন করতে হলে সুপ্রীম সোভিয়েতের অনুমোদন প্রয়োজন। অবশ্য

অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলির সীমানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যগুলির সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু সুপ্রীম সোভিয়েতের অনুমোদন ছাড়া কোন সীমানা পরিবর্তন করা যায় না। সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন যখন হয় না, তখন প্রেসিডিয়াম নতুন অঙ্গপ্রজাতন্ত্র গঠন বা সীমানা পরিবর্তন ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনুমোদন করতে পারেন। কিন্তু এই অনুমোদন পরবর্তীকালে সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন।

নতুন প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি গঠন

সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশনে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যরা নির্বাচিত হন। তাঁরা তাদের কাজের জন্য সুপ্রীম সোভিয়েতের নিকট দায়ী থাকেন। সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন চলাকালীন অবস্থায় মন্ত্রীরা সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর তিনদিনের মধ্যে দিতে বাধ্য। প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য যে, সোভিয়েত রাশিয়ায় মন্ত্রিসভা উভয় কক্ষের কাছেই দায়ী কিন্তু ভারত বা ব্রিটেনের মত পরিষদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা নিম্নকক্ষের নিকট দায়ী থাকে। যখন সুপ্রীম সোভিয়েতের কোন অধিবেশন থাকে না তখন মন্ত্রিসভা প্রেসিডিয়ামের কাছে দায়ী থাকে। প্রেসিডিয়াম মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির পরামর্শ অনুযায়ী কোন নতুন মন্ত্রীকে নিয়োগ করতে পারেন বা কোন পুরাতন মন্ত্রীকে অব্যাহতি দিতে পারেন। কিন্তু এইসব নিয়োগ বা অব্যাহতি দান সুপ্রীম সোভিয়েতের পরবর্তী অধিবেশনে অনুমোদিত হতে হয়।

সুপ্রীম সোভিয়েত ও মন্ত্রিসভা

সুপ্রীম সোভিয়েত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বা প্রশাসনিক কাজে গতি সঞ্চারের জন্য অসংখ্য কমিটি নিয়োগ করে। এইসব কমিটি বা কমিশন নিয়মিত মিলিত হয় এবং তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বভার যথাযথভাবে সম্পাদনের চেষ্টা করে। যেহেতু সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন বছরে মাত্র ২০ থেকে ২৪ দিন হয়, তাই এইসব কমিটি বা কমিশনগুলির গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। উভয় কক্ষ থেকে সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে অনেক সময় যুক্ত কমিটি গঠন করা হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থার কাজ পর্যালোচনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপ্রীম সোভিয়েত স্থায়ী কমিশন নিয়োগ করে।

কমিটি নিয়োগ

সুপ্রীম সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের নির্বাচন করে। প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং এই প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে দায়ী থাকে। তাছাড়া মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রোকিউরেটর জেনারেল সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। সুপ্রীম কোর্টে জনগণের অ্যাসেসর (People's assessors) হিসাবে যারা কাজ করেন তাঁরাও সুপ্রীম সোভিয়েতের দ্বারা নির্বাচিত হন।

বিভিন্ন পদে নির্বাচন

সমালোচনা

সুপ্রীম সোভিয়েত সম্পর্কে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অনুরাগী সংবিধান বিশেষজ্ঞদের সমালোচনার শেষ নেই। তাঁদের মতে, সুপ্রীম সোভিয়েতকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বপূর্ণ সংস্থা বলে অভিহিত করা হলেও কার্যত সুপ্রীম সোভিয়েত একটি অনুমোদনকারী সংস্থায় পরিণত হয়েছে। সুপ্রীম সোভিয়েতের যাবতীয় ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডিয়াম ভোগ করেন। সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন বছরে সাধারণত দুবার আহূত হয় এবং এক একটি অধিবেশন দশ দিনের বেশি স্থায়ী হয় না। ফলে সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যগণ শুধু হর্ষধ্বনি আর অনুমোদনই করেন, বিতর্ক বা আলাপ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন না। আরো বলা হয় যে, প্রেসিডিয়াম কার্যত সুপ্রীম সোভিয়েতের সব ক্ষমতা আত্মসাৎ করেছে। এর উত্তরে সোভিয়েত সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। আবার যদিও সুপ্রীম সোভিয়েত বছরে খুব কম সময়ের জন্যই মিলিত হয়, তবুও মনে রাখতে হবে যে অসংখ্য কমিটি গঠন করে সুপ্রীম সোভিয়েত আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজকর্মে বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গঠনমূলক প্রস্তাব রাখে। তৃতীয়ত, সোভিয়েতে যেহেতু একটি মাত্র দলের সদস্যরা আসন গ্রহণ করেন, তাই অনর্থক বিতর্ক বা আলোচনায় সময়ক্ষেপ হয় না। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পার্লামেন্টে অসংখ্য দল থাকায় বিভিন্ন দলের সদস্যরা অনেক সময় অনর্থক বিতর্কে সময় নষ্ট করেন। কিন্তু সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যগণ নাটকীয়ভাবে কক্ষ ত্যাগ, বা উত্তেজক বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে কখনো সুপ্রীম সোভিয়েতের আলোচ্য বিষয়সূচীর নির্দিষ্ট সময়ক্রম নষ্ট করেন না। তাছাড়া সোভিয়েত রাশিয়ায় সুপ্রীম সোভিয়েতের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বা সংবিধান সংশোধন বিষয়ে যে চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে তা কোন বুর্জোয়া পার্লামেন্টের নেই।

একথা ঠিক যে, সুপ্রীম সোভিয়েত ক্ষমতা অনেক সময় প্রেসিডিয়াম প্রয়োগ করে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রেসিডিয়ামে সদস্যগণ সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যদের দ্বারাই নির্বাচিত এবং সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে দায়ী। অন্যান্য বুর্জোয়া পার্লামেন্টের তুলনায় সুপ্রীম সোভিয়েতে অনেক বেশি মহিলা সদস্য আছেন। অধিকাংশ ডেপুটি শ্রমিক-কৃষক পরিবারের সন্তান এবং দেশের অনেক জ্ঞানী, গুণী ও মনীষী সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। বলা হয় যে, সুপ্রীম সোভিয়েতে একটি মাত্র দল আছে এবং এই একদলীয় শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। এর উত্তরে বলা হয় যে, সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি মাত্র দল কমিউনিস্ট পার্টি'ই শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবিদের সার্থক প্রতিনিধিত্ব করে। কেন না, এইসব শ্রেণীগুলির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের প্রতিকূল নয়—বরং গণতন্ত্রকে অনেক বেশী অর্থবহ করে তোলে।

দুই: সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম (Presidium of the Supreme Soviet of the U. S S. R.)

সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। যৌথ নেতৃত্ব, যৌথ পরিচালনা, যৌথ জীবনযাত্রার নীতি যাতে সংবিধানের ক্ষেত্রে মানা হয়, সেই উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে একজন সভাপতি বা রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে সভাপতিমণ্ডলী (Collegium Executive) বা প্রেসিডিয়ামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই প্রেসিডিয়াম বা সভাপতিমণ্ডলী যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য যাতে সমান মর্যাদার অধিকারী হয় তার জন্য প্রেসিডিয়াম বা সভাপতিমণ্ডলীতে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য থেকে একজন সহ-সভাপতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার এই প্রেসিডিয়াম গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মূল কথা হল গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার এক সুষ্ঠু সহাবস্থান। প্রেসিডিয়াম একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, কারণ প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ সুপ্রীম সোভিয়েতের ডেপুটিদের দ্বারা নির্বাচিত হন। ব্রেজনেভ সংবিধান অনুযায়ী একমাত্র সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যরাই প্রেসিডিয়ামের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হতে পারেন। আবার কেন্দ্রিকতার নীতি অনুযায়ী সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত প্রেসিডিয়াম সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থার ওপর চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী।

ভূমিকা

ব্রেজনেভ সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডিয়াম নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়। একজন সভাপতি, একজন প্রথম সহসভাপতি, পনেরটি অঙ্গরাজ্য থেকে পনের জন সহসভাপতি, একজন সম্পাদক এবং একুশজন সাধারণ সদস্য— মোট ৩৯ জন সদস্য নিয়ে প্রেসিডিয়াম গঠিত হয়। সাধারণত সুপ্রীম সোভিয়েতের আয়ুষ্কালের ওপর প্রেসিডিয়ামের মেয়াদ নির্ভর করে। যেহেতু সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যগণ পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন, প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণও তাই পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। যদি সুপ্রীম সোভিয়েতের নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়, তাহলে নির্বাচনের দু'মাসের মধ্যে সুপ্রীম সোভিয়েতের নব নির্বাচিত সদস্যগণ নতুন করে প্রেসিডিয়ামের সদস্য নির্বাচন করেন।

গঠন

সোভিয়েত সংবিধানে প্রেসিডিয়ামের সভাপতির বিশেষ কোন মর্যাদা বা ক্ষমতার উল্লেখ নেই। তিনি সভাপতিমণ্ডলী বা প্রেসিডিয়ামের অন্যতম সদস্য হিসাবেই কাজ করেন। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে কখনই রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মান দেওয়া হয় না। সোভিয়েত সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বার বার এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, প্রেসিডিয়ামের সভাপতিকে যেন কখনোই বুর্জোয়া রাষ্ট্রপ্রধানদের মত বিশেষ ব্যক্তিগত ক্ষমতা বা মর্যাদার অধিকারী বলে না মনে করা হয়। অবশ্য প্রেসিডিয়ামের সভাপতির স্বাক্ষরের ওপরেই সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক গৃহীত বিলগুলি আইন হিসাবে জারি করা হয়। সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাপতি

প্রেসিডিয়ামের সভাপতি

বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতদের পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন। তিনি আইনের ওপর ভিত্তি করে ডিক্রি জারি করে থাকেন। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, একমাত্র প্রেসিডিয়ামের নির্দেশেই তিনি এই সব কাজ সম্পাদন করেন বা ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

বৃটিশ সংবিধানেই কেবলমাত্র শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উদ্ভব ঘটেনি, পৃথিবীর সব সংবিধানেই কালক্রমে কিছু কিছু সাংবিধানিক রীতিনীতি গড়ে ওঠে। আর সোভিয়েত ইউনিয়নও এই সাধারণ ধারার ব্যতিক্রম নয়। তাই দেখা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নেও কালক্রমে ইচ্ছায় হোক, তা অনিচ্ছায় হোক প্রেসিডিয়ামের সভাপতির বিশেষ মর্যাদা বা গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এর কারণ হল, প্রথম থেকেই সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রেসিডিয়ামের সভাপতি হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির প্রবীণ ও বিচক্ষণ নেতারা নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে সংবিধানে উল্লেখ না থাকলেও প্রেসিডিয়ামের সভাপতি সবসময়ই জনগণের চোখে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী বলে চিহ্নিত হয়েছেন।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় লেনিন ও স্তালিনের সহকর্মী প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা কালিনিন প্রথম প্রেসিডিয়ামের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হয়ে তিনি সভাপতি পদের মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছিলেন। আবার পঞ্চাশের দশকে মার্শাল ভরোশিলভ যখন প্রেসিডিয়ামের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন, তখন লাল ফৌজের অন্যতম স্রষ্টা, গৃহযুদ্ধের বীর এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল হিসাবে ভরোশিলভ লোককথায় নায়কে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই সভাপতি পদের মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। পরবর্তীকালে ব্রেজনেভ, আন্দ্রোপভ কিংবা চেরনেনকো-এর সময় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও প্রেসিডিয়ামের সভাপতি হিসাবে একই ব্যক্তি কাজ করেন। ফলে প্রেসিডিয়ামের সভাপতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হন। কিন্তু সম্প্রতি কমিউনিস্টদলের সাধারণ সম্পাদক গর্বাচভ প্রেসিডিয়ামের সভাপতির পদ গ্রহণ না করে ঐ পদে আন্দ্রে গ্রেমিকোকে নির্বাচিত করেছেন।

প্রেসিডিয়ামের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

ব্রেজনেভ সংবিধানের ১২১ নম্বর ধারায় প্রেসিডিয়ামের ক্ষমতা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া সংবিধানের অন্যান্য ধারায়ও প্রেসিডিয়ামের ক্ষমতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন স্থগিত করতে পারে। সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের মধ্যে যদি প্রচণ্ড মতানৈক্য দেখা দেয়, তাহলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রেসিডিয়াম সেই মতবিরোধ দূর করার চেষ্টা করে এবং সেই মতানৈক্য যদি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা না করা যায়, তাহলে প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েত ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। সুপ্রীম সোভিয়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার দুমাসের মধ্যেই নতুন প্রেসিডিয়াম নির্বাচন করবে। তাই বলা হয়েছে যে, সুপ্রীম সোভিয়েত ভেঙ্গে দিয়ে

নতুন নির্বাচনের আদেশ দিলে, প্রেসিডিয়াম নিজেই নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেন।

প্রথমেই প্রেসিডিয়ামের আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত ক্ষমতার উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রেসিডিয়াম সংবিধানের ১১৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী নতুন আইনের খসড়া সুপ্রীম সোভিয়েতে উপস্থাপিত করতে পারে। প্রয়োজন মনে করলে প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে যে কোন প্রচলিত আইন সংশোধন করতে পারে। অবশ্য পরবর্তী অধিবেশনে সুপ্রীম সোভিয়েতের সামনে উপরোক্ত সংশোধন অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। প্রচলিত আইনের ওপর ভিত্তি করে সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে প্রেসিডিয়াম ডিক্রী জারি করতে পারে। এই সব ডিক্রী আইনের মতই মর্যাদা ভোগ করে এবং সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে এই ডিক্রীগুলি প্রয়োগ করা হয়। এই ডিক্রীগুলি অবশ্যই সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষ। সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক গৃহীত বিল প্রেসিডিয়ামের সভাপতির স্বাক্ষর যুক্ত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়।

আইন বিষয়ক ক্ষমতা

প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক গৃহীত আইনগুলি ব্যাখ্যা করে। যদি কোন অঙ্গপ্রজাতন্ত্র দাবী করে, কিংবা প্রেসিডিয়াম যদি প্রয়োজন অনুভব করে, তাহলে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিল বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রেসিডিয়াম জনমত যাচাই করতে পারে। বলা হয়েছে, যেহেতু সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন বছরে মাত্র দুবার হয় এবং যেহেতু এক একটি অধিবেশন দশ থেকে বারো দিন মাত্র চলে, ফলে প্রেসিডিয়াম প্রকৃতপক্ষে সুপ্রীম সোভিয়েতের যাবতীয় ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করে। ডিক্রী জারি করে, সুপ্রীম সোভিয়েতের বিভিন্ন কমিটির মধ্যে সংহতি সাধন করে, সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন আহ্বান করে বা মুলতুবি রেখে প্রেসিডিয়াম বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে।

প্রেসিডিয়ামের হাতে গুরুত্বপূর্ণ শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। সুপ্রীম সোভিয়েতের যখন কোন অধিবেশন হয় না, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ প্রেসিডিয়ামের কাছে দায়ী থাকেন। মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যানের পরামর্শক্রমে প্রেসিডিয়াম নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারে কিংবা কোন পুরাতন মন্ত্রীকে অব্যাহতি দিতে পারে। এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই পরবর্তীকালে সুপ্রীম সোভিয়েতে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রেসিডিয়াম যেকোন মন্ত্রিদপ্তর বা রাষ্ট্রীয় কমিটি বিলোপ করতে পারেন বা নতুন মন্ত্রণালয় বা রাষ্ট্রীয় কমিটি গঠন করতে পারেন। অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলির সীমানা পরিবর্তন প্রেসিডিয়ামের অনুমোদন সাপেক্ষ। সুপ্রীম সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকিউরেটর জেনারেল প্রেসিডিয়ামের কাছে দায়ী থাকেন। তাছাড়া প্রেসিডিয়াম সামরিক ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ করেন।

শাসনবিষয়ক ক্ষমতা

প্রেসিডিয়ামের মাধ্যমেই সোভিয়েত ইউনিয়ন বহির্বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে বা রক্ষা করে। প্রেসিডিয়াম সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতদের নিয়োগ করে। বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতগণ প্রেসিডিয়ামের কাছে নিজেদের পরিচয়পত্র পেশ করেন। প্রয়োজন বোধ করলে প্রেসিডিয়াম যে কোন সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে পারে বা কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের প্রত্যাহার দাবী করতে পারে। কোন আন্তর্জাতিক সন্ধি চুক্তি বা বাধ্যবাধকতায় প্রেসিডিয়াম সম্মতি না দিলে সেগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। বৈদেশিক রাষ্ট্রপ্রধানদের অভ্যর্থনা করা, অন্য দেশের পার্লামেণ্টারি প্রতিনিধিমণ্ডলীকে স্বাগত জানানোও প্রেসিডিয়ামের কাজের মধ্যে পড়ে।

প্রেসিডিয়াম বিপুল সামরিক ক্ষমতার অধিকারী। যদি প্রেসিডিয়াম মনে করে যে, দেশ আক্রান্ত হয়েছে বা হতে পারে, কিংবা যদি কোন আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রেসিডিয়াম মনে করেন যে যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করা একান্ত জরুরী, তাহলে প্রেসিডিয়াম যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। প্রেসিডিয়াম সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেনাপতিদের পদোন্নতি বা পদাবনতি সম্পর্কে প্রেসিডিয়ামের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। দেশের সর্বত্র বা কোন অংশে প্রেসিডিয়াম সামরিক আইন জারি করতে পারেন। প্রয়োজন মনে করলে প্রেসিডিয়াম সাধারণ বা আংশিক সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিতে পারেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন করা বা তার গঠনতন্ত্র অনুমোদন করা প্রেসিডিয়ামের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সামরিক ক্ষমতা

সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিকদের বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য নানাবিধ সামরিক খেতাব ও সম্মান প্রদান করা প্রেসিডিয়ামের কাজের মধ্যে পড়ে।

তাছাড়া অন্যান্য দেশে রাষ্ট্রপ্রধানেরা যেমন সম্মান, [illegible] ও ক্ষমার উৎস হিসেবে বিবেচিত হন, সোভিয়েত ইউনিয়নেও তেমনি প্রেসিডিয়াম। জনজীবনের প্রথম সারির অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত করেন, পদক বা খেতাব দান করেন। দণ্ডিত ব্যক্তিদের দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখা বা হ্রাস করা, কিংবা মার্জনা করা বা পুনর্বিচারের আদেশ দেওয়া প্রেসিডিয়ামের কাজ। কোন ব্যক্তির নাগরিকত্বের অধিকার নিয়ে যদি কোন বিতর্ক বা প্রশ্ন ওঠে, তাহলে প্রেসিডিয়াম সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। আগেই বলা হয়েছে যে, আইনের ব্যাখ্যা করা প্রেসিডিয়ামের অন্যতম প্রধান কাজ। অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের আইনগুলি যাতে সোভিয়েত রাশিয়ার সংবিধানের বিরোধী না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখাও প্রেসিডিয়ামের অন্যতম কাজ। অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের আইন প্রেসিডিয়াম বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারে, যদি সেই আইন সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়। পরিশেষে বলা যায়, অধিবেশনের আগে সুপ্রীম সোভিয়েতের আলোচ্য বিষয়বস্তু স্থির করা, ডেপুটিদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া, নাগরিকদের আবেদনপত্র গ্রহণ করা প্রভৃতি প্রেসিডিয়ামের কাজের অঙ্গীভূত।

অন্যান্য ক্ষমতা

পশ্চিমী সমালোচকদের মতে প্রেসিডিয়াম প্রকৃতপক্ষে সুপ্রীম সোভিয়েতের যাবতীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে সুপ্রীম সোভিয়েতকে একটি প্রহসনমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন যেহেতু বছরে মাত্র কুড়ি দিন থেকে চব্বিশ দিন স্থায়ী হয়, অবশিষ্ট ৩৪০ দিন প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েতের যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে। কিন্তু এইসব সমালোচক ভুলে যান যে, প্রেসিডিয়াম একটি নির্বাচিত সংস্থা এবং প্রেসিডিয়ামের যাবতীয় সিদ্ধান্ত সুপ্রীম সোভিয়েতের অনুমোদন সাপেক্ষ।

সমালোচনা

এই প্রসঙ্গে আরো মনে রাখা উচিত যে, প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ যৌথভাবে তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন। একথা ঠিক যে, প্রেসিডিয়ামের ক্ষমতা বা কাজের পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সোভিয়েত সংবিধান বিশেষজ্ঞগণের তথাকথিত ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পর্কে কোন আস্থা বা মোহ নেই। কারণ প্রেসিডিয়াম একই সঙ্গে আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত ক্ষমতা, শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ভোগ করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির তথাকথিত আদর্শে বিশ্বাস করে না। বলা হয়, প্রেসিডিয়াম গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হলেও প্রেসিডিয়ামকে সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে দায়ী থাকতে হয়। বলা যায়, প্রেসিডিয়াম দল ও সরকারের মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করে। দল ও সরকারের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মিলনস্থল হল এই প্রেসিডিয়াম। এখন গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনসহ পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই আমরা এই রকম সভাপতিমণ্ডলীর অস্তিত্ব দেখতে পাই।

নয়

মন্ত্রিপরিষদ
Council of Ministers

এক : সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ (**Council of Ministers of U S.S. R.**)

ব্রেজনেভ সংবিধানের ১২৮ থেকে ১৩৬ নম্বর ধারাগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪৬ সালের মার্চমাসের আগে পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিগণ জনগণের কমিশার (Peoples' Commissars) নামে অভিহিত হতেন এবং তাঁদের দপ্তরকে বলা হত কমিশারিয়েট।

ভূমিকা

কিন্তু ১৯৪৬ সালে অর্থাৎ যুদ্ধের পরেই জনগণের কমিশারদের মন্ত্রী এবং কমিশারিয়েটকে মন্ত্রিদপ্তর নামে অভিহিত করা শুরু হয়। আর সমগ্র মন্ত্রিসভাকে মন্ত্রিপরিষদ নামে অভিহিত করা হয়। সংবিধান অনুযায়ী এই মন্ত্রিপরিষদ সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী ও প্রশাসনিক সংস্থা। সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশনে এই মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন (১২৭নং ধারা)।

সাধারণত ভারত, ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পরিষদীয় গণতন্ত্রে সাধারণ নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই নিম্নকক্ষের অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপ্রধান মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করাও হয় মূলত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের ওপর ভিত্তি করেই। এইজন্যই ব্রিটেনের পরিষদীয় গণতন্ত্রে সেখানকার মন্ত্রিপরিষদ চালিত শাসনব্যবস্থাকে অনেকে প্রধানমন্ত্রীর সরকার বা *Prime Ministerial form of Government* বলে অভিহিত করেন। বলা হয়, ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন হল প্রকৃত পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন। জনসাধারণ কোন ব্যক্তি বা নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচনে আগ্রহী হলে তাঁর দলকে জয়যুক্ত করে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যগণ একই সময়ে নির্বাচিত হন। ফলে সহকর্মীদের মনোনয়নে বা তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টনে তাঁর বিশেষ কোন ভূমিকা থাকে না। অবশ্য গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনে প্রধানমন্ত্রী কমিউনিস্ট পার্টির সুপারিশে প্রথমে জাতীয় গণকংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত হন। পরে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ বা সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় গণকংগ্রেস অন্যান্য মন্ত্রীদের নির্বাচিত করে।

মন্ত্রিসভার গঠন

সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত : (১) সভাপতি, (২) প্রথম সহসভাপতি, (৩) সহসভাপতিবৃন্দ (৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিগণ, (৫) সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থা বা কমিটির

সভাপতিগণ। তাছাড়া অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলির মন্ত্রিপরিষদের সভাপতিগণ পদাধিকার বলে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রী হিসাবে স্বীকৃত হন। আবার মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির সুপারিশক্রমে সুপ্রীম সোভিয়েত অন্যান্য সংস্থা বা সংগঠনের প্রধানদের মন্ত্রিপরিষদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিসভা একটি বৃহদায়তন মন্ত্রিসভা, তাই কাজের সুবিধার জন্য ব্রেজনেভ সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদের একটি প্রেসিডিয়ামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রেসিডিয়ামে থাকেন মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি, প্রথম সহসভাপতি এবং সহসভাপতিবৃন্দ। প্রকৃতপক্ষে ভারত বা ব্রিটেনে ক্যাবিনেট যে ভূমিকা পালন করে সোভিয়েত ইউনিয়নে মন্ত্রিপরিষদের প্রেসিডিয়াম সেই ভূমিকা পালন করে। প্রেসিডিয়াম নীতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মন্ত্রীদের শ্রেণীবিভাগ

সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদে দু'ধরনের মন্ত্রিদপ্তর বা মন্ত্রণালয় আছে। যেমন, (১) সমগ্র ইউনিয়নের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ (All Union Ministries), এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিদপ্তরসমূহ (Union Republican Ministries)। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা সমগ্র ইউনিয়নের মন্ত্রী হিসাবে অভিহিত হন। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারকে যে সব বিষয় অর্পণ করা হয়েছে সেই বিষয়গুলির তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিদপ্তরগুলির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাজ হল নিজ নিজ বিষয়ের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন রিপাবলিক বা অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের সরকারগুলির মধ্যে সংহতি বিধান করা। এই সব মন্ত্রীরা রাজ্যতালিকার বিষয়গুলি সম্পর্কে অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে সংহতি সাধন করে। এক কথায় বলা যায় যে, সমগ্র ইউনিয়নের মন্ত্রিদপ্তরগুলি সেইসব বিষয়গুলি পরিচালনা করে এবং সেই সব ক্ষমতা প্রয়োগ করে যে সব ক্ষমতা সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। আর ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরগুলির কাজ হল রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে তত্ত্বাবধান করা, সংহতি সাধন করা বা মতৈক্যের সৃষ্টি করা।

মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি

আগেই বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি তাঁর সহ-কর্মীদের নাম সুপারিশ করেন না বা তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন না। যদিও বাইরের জগতে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী বলেই অভিহিত করা হয়, কিন্তু সংবিধানে কোন প্রধান মন্ত্রীর পদ রাখা হয়নি। সুপ্রীম সোভিয়েতের যুগ্ম অধিবেশনে তিনি মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। তিনি মন্ত্রিপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁর স্বাক্ষরে মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বা অর্ডিন্যান্সগুলি কার্যকর হয়। তাঁর সুপারিশক্রমে সুপ্রীম সোভিয়েত কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থা বা কমিটির প্রধানকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। আবার তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী প্রেসিডিয়াম কোন নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন বা কোন পুরাতন মন্ত্রীকে অব্যাহতি দিতে পারেন। স্তালিন

বা ক্রুশ্চেভের পর মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির ক্ষমতার অনেক অবমূল্যায়ন ঘটেছে। স্তালিন কিংবা ক্রুশ্চেভ ছিলেন একাধারে মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি এবং কমিউনিস্ট পার্টি'র সাধারণ সম্পাদক। ফলে তাঁরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির ক্ষমতা বা পদমর্যাদা তখন অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রেজনেভ, আন্দ্রোপভ বা চেরনেনকে ছিলেন একদিকে কমিউনিস্ট পার্টি'র সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যদিকে প্রেসিডিয়ামের সভাপতি। ফলে বিগত দু' দশকে মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির ক্ষমতা বা পদমর্যাদা অনেক কমে গিয়েছে। তাই বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদের সভাপতিকে কেউ প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করেন না।

মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব

সংবিধানের ১৩০ নম্বর ধারা অনুযায়ী সোভিয়েত মন্ত্রিসভা তার যাবতীয় কাজ ও নীতির জন্য সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে দায়ী থাকে। যখন সুপ্রীম সোভিয়েতের কোন অধিবেশন হয় না, তখন মন্ত্রিপরিষদ প্রেসিডিয়ামের কাছে দায়ী থাকে। মন্ত্রিপরিষদ নিজেদের কাজকর্ম সম্পর্কে নিয়মিত সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। প্রেসিডিয়াম যদি এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মন্ত্রিপরিষদের কোন সিদ্ধান্ত বা কাজ সংবিধান বিরোধী বা আইন বিরোধী, তাহলে সেই সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রেসিডিয়াম বাতিল করতে পারে। মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির পরামর্শে প্রেসিডিয়াম যে কোন নতুন মন্ত্রীকে নিয়োগ করতে পারেন বা কোন পুরাতন মন্ত্রীকে অব্যাহতি দিতে পারেন। তবে প্রেসিডিয়ামের এই সব সিদ্ধান্ত সুপ্রীম সোভিয়েতের পরবর্তী অধিবেশনে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। যখন সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন চলে, তখন ডেপুটিরা যদি মন্ত্রীদের কোন প্রশ্ন করেন তাহলে মন্ত্রীরা তিনদিনের মধ্যে লিখিত বা মৌখিক ভাবে তার উত্তর দিতে বাধ্য। কিন্তু যে- হয়, যেহেতু সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন সাধারণত বছরে কুড়ি দিনের বেশি হয় না, তাই মন্ত্রিপরিষদ কার্যত প্রেসিডিয়ামের কাছেই দায়ী থাকে। মন্ত্রিসভার আয়ু বা কার্যকালের মেয়াদ সম্পর্কে সংবিধানে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে যে, মন্ত্রিপরিষদ নবনির্বাচিত সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করবে। অর্থাৎ নবনির্বাচিত সুপ্রীম সোভিয়েত নতুন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নির্বাচন করবে। যেহেতু সুপ্রীম সোভিয়েতের মেয়াদ পাঁচ বছর, সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে, মন্ত্রিপরিষদের কার্যকালও পাঁচ বছর।

মন্ত্রিপরিষদের কার্যাবলী

বৃটিশ সংবিধানে কিংবা ভারতের সংবিধানে মন্ত্রিসভার স্বতন্ত্র কোন ক্ষমতার উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু স্তালিন সংবিধানের মত ব্রেজনেভ সংবিধানেও মন্ত্রি-পরিষদের হাতে কতগুলি সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। সংবিধানের ১৩১নং ধারা অনুযায়ী যে সকল বিষয় বা ক্ষমতা সুপ্রীম সোভিয়েত বা প্রেসিডিয়ামের

এক্তিয়ারভুক্ত নয়, সেই সব বিষয় ও ক্ষমতা পরিচালনা বা প্রয়োগ করবে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিসভা। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব সম্পন্ন কার্যনির্বাহী বা প্রশাসনিক সংস্থা হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পাদন করে ঃ

(১) বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে, বৈদেশিক বাণিজ্য, পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র গুলির সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক বা সাংস্কৃতিক সহযোগিতার পথ নির্দেশ করে মন্ত্রিপরিষদ।

(২) সোভিয়েত ইউনিয়ন যাতে আন্তর্জাতিক সন্ধি, চুক্তি বা বাধ্যতাগুলি মেনে চলে তার নিশ্চয়তা প্রদান করে মন্ত্রিপরিষদ।

(৩) আন্তঃসরকারী আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন বা বাতিল করে মন্ত্রিপরিষদ।

(৪) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

(৫) সোভিয়েত ইউনিয়নের সশস্ত্র বাহিনীর বিকাশ সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ করে। নাগরিকদের কত অংশ প্রতি বছর সামরিক কাজে যোগদান করবে তা স্থির করার ভার মন্ত্রিপরিষদের ওপর ন্যস্ত।

(৬) মন্ত্রিপরিষদ সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির রূপরেখা নির্ধারণ করে।

(৭) জনসাধারণের সুখসমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক মান বিকাশের জন্য, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞানের অগ্রগতির জন্য, প্রাকৃতিক সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য, দেশের অর্থ ও ক্রেডিট ব্যবস্থাকে সংহত ও শক্তিশালী করার জন্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র একই রকম দাম, মজুরী ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুসরণের জন্য, রাষ্ট্রীয় বীমা এবং একই রকম হিসাবব্যবস্থা ও পরিসংখ্যান ব্যবস্থা অনুসরণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ নীতি নির্ধারণ করে এবং এই নীতিগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করে।

(৮) মন্ত্রিপরিষদ শ্রমশিল্প বা কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করে এবং তাকে প্রয়োগ করে।

(৯) পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি যথাযথভাবে পরিচালনা করাও মন্ত্রিসভার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

(১০) সোভিয়েত ইউনিয়নের বাজেট রচনা করা এবং সেই বাজেট সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে পেশ করার দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মন্ত্রিপরিষদ।

(১১) মন্ত্রিপরিষদ সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি ও জনশৃংখলা রক্ষা করে।

(১২) নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিসভার কাজের অন্তর্ভুক্ত।

(১৩) প্রয়োজন অনুভব করলে সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য মন্ত্রিপরিষদ নতুন বিভাগ, কমিটি বা পর্ষদ গঠন করতে পারে।

(১৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনসমূহ কিংবা সুপ্রীম সোভিয়েত ও প্রেসিডিয়ামের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে কিংবা অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারে (১৩৩নং ধারা)।

(১৫) মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে কোন একটি মন্ত্রিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বা কোন রাষ্ট্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে (১৩৪নং ধারা)।

(১৬) সমগ্র ইউনিয়নের মন্ত্রিদপ্তরসমূহের মধ্যে সংহতি সাধন করা, ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তরসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংহতি সাধন করা, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কমিটি ও সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা মন্ত্রিপরিষদের কাজের অন্তর্ভুক্ত (১৩৫নং ধারা)।

(১৭) তাছাড়া মন্ত্রিপরিষদ সুপ্রীম সোভিয়েতে বিল উপস্থাপিত করতে পারে (১১৩নং ধারা)।

সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের মূল্যায়ন

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অনুরাগী সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকৃত পক্ষে কোন পরিষদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যদিও বলা হয়েছে যে, মন্ত্রি-পরিষদ সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে দায়ী থাকবে, কিন্তু কার্যত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিতে বিশ্বাসী, লৌহকঠিন শৃঙ্খলায় আবদ্ধ, একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট দলই জনজীবনে বা প্রশাসনের সর্বত্র কর্তৃত্ব করে। যেহেতু সুপ্রীম সোভিয়েতে কমিউনিস্ট দল ছাড়া অন্য কোন বিরোধী দল নেই, ফলে মন্ত্রিপরিষদ কার্যত কোন সমালোচনার সম্মুখীন হয় না। আরো বলা হয় যে, সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রতি বছরে মাত্র দুবার অধিবেশন হয় এবং কোন অধিবেশনই সাধারণত দশদিনের বেশি স্থায়ী হয় না। ফলে সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যদের কাজ হল প্রধানত মন্ত্রিপরিষদের কাজ অনুমোদন করা ও হর্ষধ্বনি করা। তাই পশ্চিমী সমালোচকগণ বলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট পার্টি'র কাছে দায়ী থাকে। আর যেহেতু মন্ত্রিসভায় কমিউনিস্ট পার্টি'র বিশিষ্ট নেতারা আসন গ্রহণ করেন, ফলে মন্ত্রিসভা মোটামুটি স্বাধীনভাবেই কাজ চালায়।

এই সব সমালোচনার উত্তরে সোভিয়েত সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বলেন যে যেহেতু সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেহেতু উৎপাদনের উপকরণগুলির ওপর সামাজিক মালিকানা কায়েম করা হয়েছে, যেহেতু উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ওপর পূর্ণ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত, অতএব সোভিয়েত রাশিয়ায় শ্রমিক, কৃষক বা বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে কোন রকম অবৈরীমূলক সম্পর্ক নেই। তাই একটি মাত্র দল কমিউনিস্ট পার্টি'ই শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের

প্রত্যেকটি শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে। শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব বা কেবলমাত্র একটি দলের সাংবিধানিক স্বীকৃতি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরোধী নয়।

আরো মনে রাখতে হবে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিসভায় বহু বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত হন। এই সব বিশেষজ্ঞগণ, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় কমিটি বা সংস্থার সভাপতিগণ, নিজ নিজ ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী। ফলে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হিসাবে তাঁরা প্রশাসনব্যবস্থায় গতি সঞ্চার করতে পারেন। কিন্তু ভারত বা ব্রিটেনে অনেকসময় এমন সব রাজনৈতিক নেতাকে মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হয় যাঁদের প্রশাসনিক কোন অভিজ্ঞতা থাকে না। ইচ্ছামত তাঁদের দপ্তর অদল বদল করা হয়, ফলে তাঁরা অনেক সময় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের অঙ্গুলী হেলনে চলেন। আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলির মন্ত্রিপরিষদের সভাপতিগণ পদাধিকার বলে আসন গ্রহণ করেন। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ইউনিয়ন রিপাবলিকের সরকারগুলির সংঘর্ষের সম্ভাবনা কম। সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদে ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতিরা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন বলে সেখানে রাজ্যের বক্তব্য কেন্দ্রীয় সরকার উপেক্ষা করতে পারে না। শুধু তাই নয়, এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিসভা অনেক বেশি প্রতিনিধিত্ব-মূলক হয়।

দশ

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারব্যবস্থা

Soviet Judiciary

এক : সোভিয়েত বিচারব্যবস্থা (Soviet Judical System)

প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সরকারের তিনটি বিভাগ থাকে—আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ। সোভিয়েত ইউনিয়নেও তাই আইনের শাসন সুনিশ্চিত করার জন্য, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্য ত্বরান্বিত করার জন্য, অপরাধীদের বিচারের জন্য একটি বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। সোভিয়েত বিচারব্যবস্থাকে বুঝতে হলে প্রথমেই তার বৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন।

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

(১) প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ বিচারবিভাগের তথাকথিত স্বাধীনতার বা নিরপেক্ষতার বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে, বিচারবিভাগের প্রধান কাজ হলে মার্কসীয় ধ্যান ধারণার ওপর ভিত্তি করে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রবর্তিত হয়েছে, সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত, অন্তর্ঘাত প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরতিহীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকে থাকে এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই সোভিয়েত বিচারব্যবস্থা কাজ করে।

সোভিয়েত সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে আইনবিভাগ বা শাসনবিভাগের মত বিচারবিভাগও শাসক শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করে। সুতরাং বিচারবিভাগ কখনোই নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতে বিচারব্যবস্থার কাজই হল পুঁজির মালিকদের স্বার্থরক্ষা করা এবং পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা। অতএব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের প্রধান কাজ হওয়া উচিত শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষা করা। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

তাই রেণী, কার্টার ও হার্জ মনে করেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ায় বিচারকগণ নাগরিকদের সাধারণ অপরাধের জন্য অপেক্ষাকৃত লঘুদণ্ড দিয়ে তাদের সংশোধনের সুযোগ দেন। কিন্তু যে সব অপরাধ সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে, যে সব অপরাধ সোভিয়েত ইউনিয়নের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হয় সেইসব অপরাধীদের কঠোর দণ্ড দেওয়া হয়। এক কথায় বলা যায়, সোভিয়েত বিচারব্যবস্থা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে কাজ করে।

(২) যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি যুক্তরাষ্ট্র, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারব্যবস্থা সাংগঠনিক ক্ষেত্রে অনেকটা আলাদা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থা এবং রাজ্য বিচারব্যবস্থা

সম্পূর্ণ পৃথক্ ও সমান্তরাল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারব্যবস্থা অনেকটা পিরামিডের মত। তাই নীচে দেখা যায় জনগণের আদালত, নগর ও শহর আদালত। তার ওপরে আছে জাতীয় এলাকা, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, ইউনিয়ন রিপাবলিকসমূহের সুপ্রীম কোর্ট ও অন্যান্য আদালতগুলি। আর সমগ্র বিচারব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্ট। এই সুপ্রীম কোর্ট অধস্তন যে কোন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ করতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য বিচারালয়গুলি তদারকির ভার সুপ্রীম কোর্টের ওপর ন্যস্ত (১৫৫নং ধারা) থাকে।

(৩) পৃথিবীর অধিকাংশ অ-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিচারপতিরা রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসনবিভাগ কর্তৃক মোটামুটি স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় জনগণের আদালতের বিচারপতিগণ পাঁচ বছরের জন্য সাধারণ নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর উচ্চতর আদালতগুলির বিচারপতিরা (যেমন, ইউনিয়ন রিপাবলিকের সুপ্রীম কোর্ট সমূহের বিচারপতিগণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ) জনগণের ডেপুটিদের দ্বারা অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। এইসব উচ্চতর আদালতগুলির বিচারপতিরাও পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। বিচারপতিদের আইনসভা কর্তৃক নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রথম সুইজারল্যান্ডে প্রবর্তিত হয়।

(৪) সংবিধানে বিচারপতিদের কোন যোগ্যতার উল্লেখ করা হয়নি। এর অর্থ, যে কোন সোভিয়েত নাগরিক বিচারপতি হিসাবে নির্বাচিত হতে পারেন। কিন্তু সাধারণত বিচারপতি হিসাবে যাঁরা নির্বাচিত হন, তাঁদের সোভিয়েত আইন-কানুন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদে ব্যুৎপত্তি থাকে। এজন্য যাদের আইনে ডিগ্রী আছে, সাধারণত তাদের মধ্য থেকেই বিচারপতিরা নির্বাচিত হন।

(৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারব্যবস্থার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বিচারব্যবস্থায় জনগণের অ্যাসেসরদের (People's Assessors) ভূমিকা। এইসব অ্যাসেসরগণ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে জনগণের আদালতে নির্বাচিত হন। উচ্চতর আদালতগুলিতে তাঁরা সংশ্লিষ্ট আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। অ্যাসেসরদের কার্যকাল আড়াই বছর। সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁরা বিচারকার্যে অংশ গ্রহণ করেন। আদালতে বিচারপতিদের যে ভূমিকা, অ্যাসেসরদেরও সেই ভূমিকা। বলা হয়, অ্যাসেসরগণ আইনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ঊর্ধ্বে উঠে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সমস্যার বিচার করেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, অ্যাসেসরদের দীর্ঘ তালিকা থাকে। এই তালিকা থেকে অল্পদিনের জন্য তাঁদের বিচারকার্যে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান হয়।

(৫) বিচারপতি ও জনগণের অ্যাসেসরগণ তাঁদের কাজের জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়ী থাকেন। নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট তাঁদের নিয়মিত কাজের রিপোর্ট পেশ

করতে হয়। যদি নির্বাচকমণ্ডলী বিচারপতি বা অ্যাসেসরদের কাজে অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে তাঁদের প্রত্যাহার করে নেওয়া যায় (১৫২নং ধারা)। অযোগ্য বিচারপতি বা জনগণের অ্যাসেসরদের সরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা সোভিয়েত রাশিয়ায় নির্বাচকদের আছে।

(৬) সোভিয়েত ইউনিয়নের আদালতগুলিতে প্রকাশ্যে শুনানী হয়। কারণ মনে করা হয়, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রকাশ্যে শুনানী। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, সমস্ত আদালতের মামলাতেই জনসাধারণ উপস্থিত থাকতে পারে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের ধারা অনুযায়ী গোপন বিচারের ব্যবস্থা আছে (১৫৭নং ধারা)। যেমন, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের বিচার আইন অনুযায়ী গোপনে করা যায়।

(৭) সোভিয়েত ইউনিয়নে স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষার যাবতীয় বিচারকার্য পরিচালিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল কিংবা জাতীয় এলাকায় অধিকাংশ মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাই আদালতে ব্যবহৃত হয়। তবে কোন আসামী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি স্থানীয় ভাষা না জানে সেক্ষেত্রে দোভাষীর ব্যবস্থা করা হয়। মোটকথা অভিযুক্তরা যাতে শুনানী বা বিচারের সব কিছুই বুঝতে পারে, তার জন্য আঞ্চলিক ভাষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

(৮) সোভিয়েত ইউনিয়নে আইনের চোখে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বাসস্থান কিংবা স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি নরনারী সমান ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। এই সমতা বা সাম্যের আদর্শ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচার ব্যবস্থা সযত্নে মেনে চলে (১৫৬নং ধারা)। সোভিয়েত বিচারব্যবস্থায় আইনজীবীদের ভূমিকা খুব বেশি নেই। কেননা কোন মামলা শুনানীর সময় বিচারপতিগণ নিজেরাই অনেক সময় সাক্ষী বা আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তবে সংবিধান অনুযায়ী ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আইনগত সাহায্য পাওয়ার অধিকার আছে (১৫৮নং ধারা)। আইন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিনাখরচে নাগরিকদের আইনগত পরামর্শ বা সাহায্য দেওয়া হয়। আইনজীবীরা আদালতের তত্ত্বাবধানে কাজ করেন এবং তাঁদের মজুরী মন্ত্রিদপ্তর ঠিক করে দেয়। মোট কথা, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতে বিচারব্যবস্থা যে রকম ব্যয়বহুল, সোভিয়েত ইউনিয়নে তা কল্পনা করা যায় না।

(৯) সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার প্রোকিউরেটর জেনারেল বা তাঁর দপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রোকিউরেটর জেনারেলের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা ভারতের এ্যাটর্নী জেনারেল তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। সমাজতান্ত্রিক আইন ঠিকমত প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা, কোন বিচার বিভ্রাট ঘটেছে কিনা, কিংবা কোন অপরাধী পলাতক কিনা—এই সব বিষয়ে প্রোকিউরেটর জেনারেলকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তিনি সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশনে পাঁচ বছরের জন্য

নির্বাচিত হন। তার অধীনে ইউনিয়ন রিপাবলিক, স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল কিংবা জাতীয় এলাকার প্রোকিউরেটররা কাজ করেন। তিনি সুপ্রীম কোর্টের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে একই সঙ্গে অভিযোক্তা ও বিচারকের কাজ করেন। স্তালিন সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর প্রথম প্রোকিউরেটর জেনারেল হয়েছিলেন কমিউনিষ্ট নেতা আন্দ্রে ভিশনিকি। প্রোকিউরেটর জেনারেল যে কোন মামলা যে কোন আদালত থেকে তুলে নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের কাছে বিচারের জন্য উপস্থিত করতে পারেন। কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে বে-আইনী কাজের অভিযোগ পেলে তিনি সে বিষয়ে তদন্ত করেন এবং যদি তিনি মনে করেন যে, অভিযোগের সত্যতা আছে তাহলে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

(১০) সোভিয়েত ইউনিয়নে বিচারপতিরা চেষ্টা করেন যাতে দণ্ডিত অপরাধীরা দণ্ড ভোগের পর আবার সুস্থজীবন যাপনের সুযোগ পায়। তাই অনেক সময় দণ্ডিত ব্যক্তিদের সংশোধনের জন্য শ্রমশিবিরে পাঠান হয়। সেখানে তারা যে পরিশ্রম করে, তার জন্য তারা বেতন পায়। অনেক সময় জরিমানা আদায় করে বা সতর্ক করে বিচারপতিরা অভিযুক্তদের ছেড়ে দেন। কিন্তু গুরুতর অপরাধ, রাষ্ট্রদ্রোহ, গুপ্তচরবৃত্তি বা অন্তর্ঘাত ইত্যাদির জন্য অনেক সময় মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হয়। তবে যাদের বয়স ১৮ বছরের কম তাদের এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে আদালতের রায় দ্রুত প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত দেওয়ানী মামলার রায় দশ দিনের মধ্যে এবং ফৌজদারী মামলার রায় সাত দিনের মধ্যে কার্যকর করা হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে অধস্তন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীল করা যায়। নিম্নতম আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হলে বিচারালয়ের রায় তখনকার মত স্থগিত থাকে।

(১১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের মত সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা বা পর্যালোচনার অধিকার নেই। সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক গৃহীত কোন বিলকে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান বিরোধী বলে নাকচ করতে পারে না। এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়নে সুপ্রীম কোর্ট আইনের ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে কাজ করে না। এই অধিকার একমাত্র প্রেসিডিয়ামের হাতে ন্যস্ত। অতএব অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত যেমন সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা ও অভিভাবক হিসাবে কাজ করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টের তেমন ভূমিকা নেই। নাগরিক অধিকারের রক্ষাকর্তা হিসাবেও সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্ট কাজ করে না।

দুই ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারব্যবস্থার সংগঠন (Organization of Soviet Judiciary)

সোভিয়েত ইউনিয়নে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থা এবং ইউনিয়ন রিপাবলিকের বিচারব্যবস্থা স্বতন্ত্র বা সমান্তরাল ভাবে গড়ে ওঠেনি। বরং বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারব্যবস্থা অনেকটা পিরামিডের ধাঁচে গড়ে উঠেছে। এই বিচার

ব্যবস্থার শীর্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্ট। এই সুপ্রীম কোর্ট নিম্নতম আদালতগুলির ওপর কর্তৃত্ব করে, তাদের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ করতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্ট ছাড়া প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাবলিক ও স্বায়ত্ত-শাসিত প্রজাতন্ত্রে সুপ্রীম কোর্ট আছে। তাছাড়া স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও জাতীয় এলাকায় নিজস্ব আদালত, শহর ও জেলায় আদালত এবং সর্বনিম্নে জনগণের আদালত আছে। আবার সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বিচারের জন্য সামরিক ট্রাইব্যুনালও আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্ট

ব্রেজনেভ সংবিধানের ১৫৩ নম্বর ধারায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণ সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

গঠন

অবশ্য কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই সুপ্রীম সোভিয়েত তাঁদের প্রত্যাহার করে নিতে পারে। বিচারকদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সংবিধানে বিশেষ কিছু বলা হয়নি। তবে সাধারণত সেই সব ব্যক্তিদেরই বিচারপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হয় যাঁদের সমাজতান্ত্রিক আইন, সোভিয়েত সংবিধান এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশেষ জ্ঞান আছে।

সোভিয়েত সুপ্রীম কোর্ট একজন সভাপতি, কয়েকজন সহ-সভাপতি, সদস্যবৃন্দ এবং জনগণের অ্যাসেসরদের নিয়ে গঠিত হয়। ইউনিয়ন রিপাবলিকের সুপ্রীম কোর্টের সভাপতিগণ পদাধিকার বলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টের সদস্য। সুপ্রীম কোর্টে যাঁরা জনগণের অ্যাসেসর হিসাবে কাজ করেন. তাঁরাও সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ও অ্যাসেসরদের নিজেদের কাজকর্ম সম্পর্কে সুপ্রীম সোভিয়েতে নিয়মিত রিপোর্ট পেশ করতে হয় (১৫২ নম্বর ধারা)। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ এক একটি কলেজিয়াম গঠন করে দেওয়ানী, ফৌজদারী বা সামরিক মামলায় বিচার করেন। তাছাড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাঝে মাঝে সুপ্রীম কোর্টের প্লেনাম বা পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কাছে পেশ করা হয়।

সুপ্রীম সোভিয়েতের দেওয়ানী মামলা বিষয়ক কলেজিয়াম বা ফৌজদারী মামলা বিষয়ক কলেজিয়ামগুলি অনেক সময় মূল আদালত হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ বিষয়গুলি প্রথমে কলেজিয়ামের সামনেই বিচারের জন্য আসে। এই সব ক্ষেত্রে একজন বিচারপতি ও দুজন জনগণের অ্যাসেসর বিচারকার্য পরিচালনা করেন ও রায় দেন। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট যখন আপীল আদালত হিসাবে কাজ করে, তখন তিনজন বিচারপতি নিয়ে কলেজিয়াম গঠিত হয়। তখন আর কোন জনগণের অ্যাসেসর থাকেন না। সুপ্রীম কোর্টের সামরিক কলেজিয়াম কিন্তু সবসময়ই আপীল আদালত হিসাবে কাজ করে। নিম্নতন সামরিক আদালত বা ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম

কোর্টের সামরিক বিষয়সংক্রান্ত কলেজিয়াম আপীল গ্রহণ করে এবং রায় দেয়। দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা যে সব কলেজিয়াম বিচার করে তারা ইউনিয়ন রিপাবলিকের সুপ্রীম কোর্টের রায় নাকচ করতে পারে।

বিচার বিভ্রাট যাতে না হয়, যাতে জনসাধারণ সুবিচার পায়, তার জন্য সুপ্রীম কোর্টের সভাপতি, সহসভাপতিগণ বা প্রোকিউরেটর জেনারেল সুপ্রীমকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারেন বা কোন রায় পুনর্বিবেচনার কথা বলতে পারেন। তাছাড়া প্রতি তিন মাস অন্তর সুপ্রীম কোর্টের প্লেনাম বা পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সুপ্রীম কোর্টের সব বিচারপতি উপস্থিত থাকেন। সুপ্রীম কোর্টের সভাপতি বা প্রোকিউরেটর জেনারেলের অনুরোধ ক্রমে সুপ্রীম কোর্টের প্লেনাম বিভিন্ন কলেজিয়াম প্রদত্ত রায়ের পর্যালোচনা করে এবং প্রয়োজন বোধ করলে আগের রায় বাতিল করে নতুন রায় দিতে পারে। কোন নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হলে বা আইন সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যার দরকার হলে সুপ্রীম কোর্ট সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামকে অনুরোধ করতে পারে। এক কথায় বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা তোলা যায়। আপীল এলাকায় সামরিক বিষয় সংক্রান্ত মামলা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা তোলা যায়। তাছাড়া সুপ্রীম কোর্ট নিম্নতন আদালতের রায় পুনর্বিবেচনা করতে পারে, তাকে বাতিল করতে পারে। প্রেসিডিয়াম বা সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে সোভিয়েত সুপ্রীম কোর্ট নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বা কোন আইনের নতুন করে ব্যাখ্যার দাবী জানাতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইউনিয়ন রিপাবলিকের সরকারের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বা বিভিন্ন ইউনিয়ন রিপাবলিকের সরকারের মধ্যে বিরোধের উপস্থিত হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্ট সেই বিরোধের মীমাংসা করে।

সমালোচকদের মতে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা যেহেতু আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত এবং আইনসভার নিকট দায়ী, ফলে তাঁদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হয়। পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত বা ব্রিটেনের বিচারপতিগণ শাসন বিভাগের প্রধানদের দ্বারা নিযুক্ত হন এবং তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ফলে তাঁরা অনেক বেশি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে পারেন। আরো বলা হয় যে, সোভিয়েত সুপ্রীম কোর্টের সংবিধান পর্যালোচনার কোন অধিকার নেই, আইনের ব্যাখ্যাও সুপ্রীম কোর্ট করে না, কোন কেন্দ্রীয় আইন বাতিল করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের নেই। এই সব কারণে পশ্চিমী সমালোচকদের মতে সোভিয়েত সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সোভিয়েত সুপ্রীম কোর্ট আদৌ সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা বা অভিভাবক নয়।

সমালোচনা

এর উত্তরে সোভিয়েত সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোতে আদালতের কাজ হল সম্পত্তির মালিকদের এবং পুঁজির মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করা।

কিন্তু সোভিয়েত সুপ্রীম কোর্ট শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে। ফলে আইনসভা বা শাসন বিভাগের সঙ্গে সেখানে আদালতের বিরোধের অবকাশ খুব কমই থাকে।

ইউনিয়ন রিপাবলিকের বিচারালয়

প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাবলিকে একটা করে সুপ্রীম কোর্ট আছে। এই সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন রিপাবলিকের সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। অবশ্য কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই বিচারপতিদের প্রত্যাহার করে নেওয়া যায়। এই সুপ্রীম কোর্ট দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত বিচার বিভাগীয় কলেজিয়াম, ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত বিচার বিভাগীয় কলেজিয়াম, প্রেসিডিয়াম, এবং প্লেনাম বা পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় কাজ সম্পাদন করে। দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত বিচার বিভাগীয় কলেজিয়াম দেওয়ানী মামলার বিচার করে, ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত বিচার বিভাগীয় কলেজিয়াম ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার করে। সাধারণত কোন ইউনিয়ন রিপাবলিকের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বা জাতীয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত সব বিচারালয়ের ওপর ইউনিয়ন রিপাবলিকের সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃত্ব করে। এই সুপ্রীম কোর্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রোকিউরেটর জেনারেল, সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টের সভাপতি, ইউনিয়ন রিপাবলিকের সুপ্রীম কোর্টের সভাপতি বা ইউনিয়ন রিপাবলিকের প্রোকিউরেটরের প্রতিবাদক্রমে কোন মামলার রায় পুনর্বিচার করতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের প্লেনাম বা পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে অধস্তন সব আদালতের কাজের মূল্যায়ন করা হয়।

ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলিতে সুপ্রীম কোর্টের নীচে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, জাতীয় এলাকাগুলির আদালত আছে। তাছাড়া জেলা আদালত, শহর আদালত ও সর্বনিম্নে জনগণের আদালত আছে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম কোর্টের নীচের আদালতগুলির কাজ তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা আছে। এইসব আদালতে বিচারপতিরা সংশ্লিষ্ট সোভিয়েত কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রতিবিপ্লবী অপরাধ, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্যে বাধাদান, অন্তর্ঘাত প্রভৃতি অপরাধ এই সব আদালতের বিচার্য বিষয়। সর্বনিম্নে অবস্থিত জনগণের আদালতসমূহ সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। এই সব আদালতের বিচারপতিগণ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নাগরিকদের দ্বারা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। আর জনগণের অ্যাসেসররা নির্বাচিত হন আড়াই বছরের জন্য। এক একটি এলাকায় বা জেলায় কতগুলি আদালত হবে, তা স্থির করে ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রিপরিষদ বা স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদ। এইসব জনগণের আদালতে শতকরা ৯৫ ভাগ মামলা দায়ের করা হয়। দেওয়ানী বা ফৌজদারী সাধারণত সম্পত্তি, বিবাহবিচ্ছেদ, নাগরিক অধিকার প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত মামলা জনগণের আদালতগুলিতে বিচার করা হয়। তাছাড়া সামরিক অপরাধ বিচারের জন্য

সোভিয়েত ইউনিয়নে সামরিক ট্রাইব্যুনাল আছে। সামরিক ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিগণ সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম কর্তৃক নির্বাচিত হন। তাঁরা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। আর সামরিক ট্রাইব্যুনালের অ্যাসেসরগণ সৈনিকদের সাধারণ সভা কর্তৃক আড়াই বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

তিন : প্রোকিউরেটরের দপ্তর (The Procurator's Office)

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হল প্রোকিউরেটের দপ্তর। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রোকিউরেটর জেনারেল সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। স্তালিন সংবিধানে প্রোকিউরেটর জেনারেলকে সাত বছরের জন্য নির্বাচিত করার ব্যবস্থা ছিল। প্রোকিউরেটর জেনারেল সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে তাঁর যাবতীয় কাজ বা সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী থাকেন। সুপ্রীম সোভিয়েতের যখন কোন অধিবেশন থাকে না, তখন প্রোকিউরেটর জেনারেল প্রেসিডিয়ামের কাজে দায়ী থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্ণী জেনারেল বা ভারতের অ্যাটর্ণী জেনারেলের তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রোকিউরেটর জেনারেলের ক্ষমতা বা মর্যাদা অনেক বেশি।

সাধারণত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির একজন প্রথম সারির নেতাকে এই পদে নিয়োগ করা হয়। তাঁর প্রধান দায়িত্ব হল সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করা, অপরাধীরা যাতে যথোপযুক্ত শাস্তি পায় সেইদিকে লক্ষ্য রাখা, নির্দোষ ব্যক্তিরা যাতে কোন রকম ভাবে বিপন্ন না হয়, তার জন্য চেষ্টা করা। ইউনিয়ন রিপাবলিকের প্রোকিউরেটররা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রোকিউরেটর জেনারেল কর্তৃক নির্বাচিত হন। স্বায়ত্ত শাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল, জাতীয় এলাকার শহর ও জেলার প্রোকিউরেটরগণও প্রোকিউরেটর জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হন। জেলা, শহর বা এলাকার প্রোকিউরেটরগণ ইউনিয়ন রিপাবলিকের প্রোকিউরেটর কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। তবে এই সব নিয়োগ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রোকিউরেটর জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। এক কথায় বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রোকিউরেটর জেনারেলের নেতৃত্বে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রোকিউরেটরের দপ্তরগুলি যাতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করে তারজন্যই সংবিধানে প্রোকিউরেটর জেনারেলের ব্যাপক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

প্রোকিউরেটর জেনারেলের কাজ

প্রোকিউরেটর জেনারেল সুপ্রীম সোভিয়েতে যে কোন আইনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ভারতে একথা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রোকিউরেটর জেনারেল প্রয়োজন বোধে সুপ্রীম সোভিয়েতে যে কোন আইনের খসড়া উপস্থাপিত করতে পারেন। তিনি সুপ্রীমকোর্টের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বা প্লেনামে উপস্থিত থাকেন। এইসব দায়িত্ব তিনি অভিযোক্তা এবং

বিচারপতি—দুই হিসাবেই পালন করেন। আগেই বলা হয়েছে যে, অন্যান্য প্রোকিউরেটদের নিয়োগের ব্যাপারে হয় তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, নতুবা তাঁর অনুমোদন প্রয়োজন হয়। মন্ত্রিদপ্তরসমূহ, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থা, কলকারখানা বা যৌথখামারে যাতে আইনের শাসন যেন চলে, সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখেন এবং সে ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করেন।

যদি কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে অপরাধীদের যাতে দ্রুত বিচার হয়, সেই দিকে প্রোকিউরেটরের দপ্তর নজর রাখে। লঘু অপরাধে যাতে গুরুদণ্ড না হয়, কিংবা গুরুতর অপরাধে যাতে সামান্য শাস্তি না হয় সেই দিকে প্রোকিউরেটর দপ্তরের বিশেষ মনোযোগ থাকে।

আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা, তাদের দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করা প্রোকিউরেটরের দপ্তরের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। যদি বিচারালয়ের রায় প্রোকিউরেটরের দপ্তরের মনঃপূত না হয় তাহলে সেই রায়ের বিরুদ্ধে প্রোকিউরেটরের দপ্তর আপীলের ব্যবস্থা করতে পারে।

আদালতের নির্দেশ কিংবা প্রোকিউরেটরের দপ্তরের অনুমতি ছাড়া পুলিশ কোন লোককে গ্রেপ্তার করতে পারে না। কোন নাগরিককে অন্যায়ভাবে আটক করা হলে বা তার ব্যক্তিস্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করা হলে প্রোকিউরেটরের দপ্তর সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রোকিউরেটরের দপ্তর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের ব্যক্তিগত অধিকার, মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করা প্রোকিউরেটরদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি
Communist Party of Soviet Union

এক : সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠন ও সদস্যপদ (Organization of the Communist Party)

বর্তমান শতকের প্রথম থেকেই সোভিয়েত রাশিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি এক অনন্য ভূমিকা পালন করে। মহান্ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরণ ঘটছে সেখানকার কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে।

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠনের সর্বনিম্ন স্তরে আছে প্রাথমিক সংস্থাসমূহ। কলে-কারখানায়, যৌথ খামারগুলিতে, অফিসে, সেনাবাহিনীতে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে কিংবা প্রশাসনিক দপ্তরসমূহে পার্টির প্রাথমিক সংস্থাগুলি কাজ করে। এইসব প্রাথমিক সংস্থার মূল কাজ হল পার্টি নীতি যথাযথরূপে প্রয়োগ করা, উৎপাদন বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা, জনজীবনে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার সহায়তা করা এবং কমিউনিষ্ট মূল্যবোধ ঊর্ধ্বে তুলে ধরা।

সংগঠন

কমপক্ষে তিন জন সদস্য থাকলেই একটি প্রাথমিক সংস্থা গঠন করা যায়। অবশ্য পার্টির ঊর্ধ্বতন কমিটির অনুমোদন না থাকলে প্রাথমিক সংস্থা গঠন করা যায় না। প্রত্যেক প্রাথমিক সংস্থার সর্বোচ্চ পরিচালক সংস্থা হল সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত "সাধারণ সভা"। সাধারণত দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য প্রত্যেক প্রাথমিক সংস্থা একজন সম্পাদক ও একজন সহসম্পাদক নির্বাচন করে। যদি প্রাথমিক সংস্থার পনের জনের ওপর সদস্য থাকেন, তাহলে তাঁরা একটি ব্যুরো নির্বাচন করতে পারেন। আর যদি প্রাথমিক সংস্থার সদস্য সংখ্যা ৩০০-র বেশি হয়, তাহলে কাজের সুবিধার জন্য তাঁরা একটি পার্টি কমিটি নির্বাচিত করতে পারেন। এই ব্যুরো বা কমিটি দৈনন্দিন কাজকর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখে। ব্যুরো এক বছরের জন্য এবং পার্টি কমিটি দুই বা তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। এই প্রাথমিক সংস্থাগুলির মাধ্যমেই কমিউনিষ্ট পার্টি সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ স্থাপন করে। কমিউনিষ্ট পার্টিকে যদি এক বিশাল বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে প্রাথমিক সংস্থাগুলিকে সেই বনস্পতির অসংখ্য মূল হিসাবে দেখা যেতে পারে।

পার্টির প্রাথমিক সংস্থাগুলির ঊর্ধ্বে আছে শহর ও জেলা সম্মেলনগুলি। শহর বা জেলা সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দ প্রাথমিক সংস্থা সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

শহর বা জেলা সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ জেলাকমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করেন। বছরে চারবার অর্থাৎ প্রতি তিনমাস অন্তর জেলা কমিটির অধিবেশন হয়। জেলা কমিটির কাজ যাতে ভালভাবে হয়, তার জন্য কয়েকজন সম্পাদক সহ একটি ব্যুরো জেলা কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত করেন।

নিম্নস্তরের সংগঠন : জেলা কমিটি, শহর কমিটি

সাধারণত জেলাকমিটির পক্ষে এই ব্যুরো প্রাথমিক সংস্থা বা শহর কমিটিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, নির্দেশ দেয়, শৃঙ্খলা আরোপ করে, পার্টির পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে, ট্রেড ইউনিয়ন কিংবা যৌথখামারের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করে।

শহর ও জেলা সম্মেলনগুলির উর্ধ্বে কাজ করে জাতীয় এলাকা, স্বয়ংশাসিত অঞ্চল, স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র এবং ইউনিয়ন রিপাবলিকসমূহের পার্টি সংস্থাগুলি। এই সব পার্টি সংস্থার যে সব প্রতিনিধি আসন গ্রহণ করেন, তারা শহর ও জেলা সম্মেলন গুলির সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। সাধারণত ইউনিয়ন রিপাবলিকের সর্বোচ্চ পার্টি সম্মেলনকে পার্টি কংগ্রেস নামে অভিহিত করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রুশ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কোন আলাদা পার্টি সংগঠন নেই। এই অঙ্গরাজ্যের যাবতীয় দলীয় কার্যকলাপ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী এবং পলিটব্যুরো যৌথভাবে পরিচালনা করেন। সাধারণত একটি জাতীয় এলাকায় বা স্বয়ংশাসিত অঞ্চল বা প্রজাতন্ত্র পার্টি সম্মেলন দেড়বছর অন্তর ডাকা হয়। আর ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলিতে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একবার পার্টি কংগ্রেসে ডাকা হয়। পার্টি কংগ্রেসের সদস্যগণ কংগ্রেসের দুটি অধিবেশনের অন্তর্বর্তী সময়ে দলের কাজ পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়োগ করে এবং অডিট কমিশনসমূহ নির্বাচিত করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সর্বোচ্চ সংস্থা হল পার্টি কংগ্রেস (All Union Party Congress)। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক পার্টি কংগ্রেস আহূত হয়। অবশ্য বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটি অধিবেশন আহ্বান করতে পারে। এই পার্টি কংগ্রেসেই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করে নীতি নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়, কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটব্যুরোর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সদস্যদের নির্বাচন করা হয়। পার্টি কংগ্রেসেই যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি বা সংগঠন সংক্রান্ত প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। এইজন্য পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন সোভিয়েত ইউনিয়নের জনজীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেস এক বিরাট ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে। যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বের পদে অভিষিক্ত, ফলে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত নীতি বা আইন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত বিংশতিতম কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি

পার্টি কংগ্রেস

স্তালিন সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত এবং মূল্যায়ন গ্রহণ করেছিল, তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।

দুই কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে পার্টির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি আছে। এই কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থায়ী সদস্য এবং সহযোগী সদস্য—দুরকম সদস্য নির্বাচিত হন। সহযোগী সদস্যদের কোন ভোটাধিকার নেই। সাধারণত প্রতি ছয় মাস অন্তর কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বা প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা সমগ্র পার্টির পক্ষে বাধ্যতামূলক। এই কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির প্রবীণ, অভিজ্ঞ ও প্রথম সারির নেতাদের নিয়ে গঠিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ পার্টির সেনাপতিমণ্ডলী হিসাবে কাজ করেন।

কেন্দ্রীয় কমিটি

কেন্দ্রীয় কমিটির যখন কোন অধিবেশন হয় না, তখন পার্টির যাবতীয় কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করে পলিটব্যুরো (Politbureau)। পলিটব্যুরোর সদস্যগণ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং তারা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছেই দায়ী থাকেন। পলিটব্যুরোর সদস্যদের মধ্যে আবার কিছু পূর্ণ সদস্য থাকেন। পূর্ণ সদস্যদের ভোটাধিকার আছে, কিন্তু পলিটব্যুরোর সহযোগী সদস্যদের ভোটাধিকার নেই। ১৯৫২ সালে পার্টির নবম কংগ্রেসে পলিটব্যুরোর পরিবর্তে প্রেসিডিয়াম গঠন করা হয়। এই প্রেসিডিয়ামে ২৫ জন পূর্ণ সদস্য এবং ১১ জন সহযোগী সদস্য ছিলেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে পলিটব্যুরো কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট দায়ী, কিন্তু কার্যত পলিটব্যুরো চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। কারণ পলিটব্যুরোতে একমাত্র সেইসব নেতাই স্থান পান, যাঁরা পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতা বলে স্বীকৃত।

পলিটব্যুরো

১৯১৯ সালে পলিটব্যুরো প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি সম্পাদকমণ্ডলী বা Secretariat নির্বাচন করা হয়। এই সম্পাদকমণ্ডলীতে একজন সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য সম্পাদকগণ থাকেন। সাধারণত রুশ কমিউনিস্ট পার্টিতে সাধারণ সম্পাদককে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নেতা বলে স্বীকার করা হয়। সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য সংখ্যা কখনোই খুব বেশি থাকে না। এই সম্পাদকমণ্ডলী পার্টি পরিচালনার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সম্পাদক মণ্ডলী

কেন্দ্রীয় কমিটি পলিটব্যুরো কিংবা সম্পাদকমণ্ডলী ছাড়াও পার্টি নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্যদেরও নির্বাচন করে। এই নিয়ন্ত্রণ কমিটি বা কন্ট্রোল কমিটির প্রধান কাজ হল দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এই কমিটি পার্টির সদস্যগণ যাতে পার্টি শৃঙ্খলা মেনে চলেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখে। পার্টির শৃঙ্খলাভঙ্গকারী সদস্যদের বহিষ্কার করা বা তাঁদের সতর্ক করে দেওয়া কন্ট্রোল কমিটির প্রধান কাজ। যদি কোন সদস্য গুরুতর অপরাধ করেন, যদি তাঁর নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটে, কিংবা যদি তিনি মাতৃভূমির বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী বলে প্রমাণিত হন, কিংবা যদি তিনি দলের মধ্যে উপদলীয় কোন্দলে লিপ্ত হন, তাহলে কন্ট্রোল

দলীয় নিয়ন্ত্রণ কমিটি

কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কোন নিম্নতন কমিটি যদি কোন সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে সেই সব শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পর্যালোচনা করার অধিকার পার্টির কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনের আছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব রাখার জন্য একটি হিসাব পরীক্ষক কমিশন নির্বাচিত করে। এই কমিশনের সদস্যগণ পার্টির সকল কেন্দ্রীয় সংস্থার আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করে। এই কমিশনের কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই। কিন্তু এই কমিটি পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির আয়-ব্যয়ের সঠিক তথ্য রাখতে চেষ্টা করে। যাতে কোন রকম আর্থিক ত্রুটি-বিচ্যুতি না ঘটে, যাতে কোন রকম তহবিল তছরূপের ঘটনা না ঘটে, যাতে সঠিক পদ্ধতিতে ব্যয় নির্বাহ করা হয়, সেই দিকে এই হিসাব পরীক্ষক কমিটি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে।

কেন্দ্রীয় হিসাব পরীক্ষক কমিটি

কমিউনিস্ট পার্টির শাখা সংগঠন

সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির কাজে সহায়তা করার জন্য, অল্পবয়স্ক শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের চেতনায় কমিউনিস্ট মনোভাব সঞ্চারের জন্য কতকগুলি সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। এদের মধ্যে সর্বনিম্নে আছে লিটল্ অক্টোব্রিস্টস। ৮ থেকে ১১ বছরের বালক-বালিকাদের নিয়ে লিট্ল অক্টোব্রিস্টসদের সংগঠিত করা হয়। এই অক্টোব্রিস্ট্স্ পরিচালনা করার দায়িত্বে থাকে ইয়ং পায়োনীয়ার্সরা (Young Pioneers)। এক-এক জন ইয়ং পায়োনীয়ারের অধীনে থাকে পাঁচজনের একটি ছোট দল। এই ছোট ছোট দলগুলিকে লিঙ্ক্স (Links) বলা হয়। এই রকম পাঁচটি লিঙ্কের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় একজন কমসোমলের (Kamsomol) ওপর।

দশ থেকে পনের বছরের শিশু ও কিশোরদের জন্য আছে সারা ইউনিয়ন ইয়ং পায়োনীয়ার্স সংগঠন। ১৯২২ সালের ১৯শে মে প্রথম এই সংগঠনটি গড়ে ওঠে। স্কুলে, যৌথখামারে, শিশুনিকেতন কিংবা হস্টেলগুলিতে এই ইয়ং পায়োনীয়ার্সদের শাখা সংগঠন গড়ে তোলা হয়। প্রতিটি টিমের নিজস্ব লাল ব্যানার ও পতাকা থাকে। ইয়ং পায়োনীয়ার্সের সভ্যরা কতগুলি ব্রিগেডে বিভক্ত থাকে। ইয়ং পায়োনীয়ার্সরা যাতে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে, উৎপাদনের কাজে সহায়তা করে, দেশভক্ত হয়, শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, নিয়মিত পড়াশুনা ও খেলাধুলার চর্চা করে, সমাজতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন হয়—সেদিকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব লক্ষ্য রাখে। এই ইয়ং পায়োনীয়ার্সদের পরিচালনা করে কমিউনিস্ট লীগ বা সংক্ষেপে কমসোমল। সাধারণত ১৪-১৫ বছর বয়স থেকে ২৬ বছর বয়স্ক কিশোর ও যুবক-যুবতীরা এই কমসোমলের সদস্য হয়। কমসোমলের সদস্যদের মধ্য থেকেই সাধারণত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের গ্রহণ করা হয়। কমসোমলের মূল কাজ হল সোভিয়েত ইউনিয়নের যুবক-যুবতীদের মনে কমিউনিস্ট ভাবধারা সঞ্চার করা, তাদের সাংস্কৃতিক মান উন্নত করা,

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্যে যাতে যুবক-যুবতীরা উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে আসে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। অসংখ্য পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে, শিক্ষা শিবির সংগঠিত করে, শরীর চর্চায় উৎসাহ দিয়ে কমসোমল সোভিয়েত ইউনিয়নের যুবক-যুবতীদের একটি অগ্রসর এবং বিকাশপ্রাপ্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কমসোমলের তরুণ সদস্যগণ যাতে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কাজে উৎসাহের সাথে অংশ গ্রহণ করে, যাতে তারা যৌথজীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়, যাতে তাদের দৈনন্দিন জীবন কমিউনিজমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, সেদিকেই নেতৃত্ব লক্ষ্য রাখে। প্রকৃত-পক্ষে কমসোমল সোভিয়েত ইউনিয়নের জনজীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ সদর্থক ভূমিকা পালন করে।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি

কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে হ'লে গণতান্ত্রিক 'কেন্দ্রিকতার নীতি' (Democratic Centralism) সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কথা প্রথম উল্লেখ করেন লেনিন তাঁর বিখ্যাত *What is to be Done* পুস্তিকাতে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি একই সময়ে গণতন্ত্র এবং কেন্দ্রিকতার নীতির ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে। এই নীতির অর্থ হল পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র কোন ভাবেই ক্ষুন্ন করা চলবে না। সুতরাং পার্টির প্রতিটি উর্ধ্বতন কমিটি নিম্নতন কমিটির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবে। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বা কৌশল সাধারণ পার্টি সদস্যদের কাছে পেশ করতে হয় যাতে তাঁরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন এবং মতামত দিতে পারেন। তাছাড়া উর্ধ্বতন কমিটি মাঝে মাঝেই অধস্তন কমিটিগুলির কাছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর নিজেদের মূল্যায়ন উপস্থাপিত করে। কিন্তু কেবল গণতন্ত্রের ওপর জোর দিলে পার্টি বিতর্কসভায় পরিণত হতে পারে, পার্টির মধ্যে উপদলীয় কোঁদল দেখা দিতে পারে। তাই গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কাজে পরিণত করার জন্য পার্টির ঐক্যকে চোখের মণির মত রক্ষা করার জন্য, সমগ্র পার্টিকে একটি কেন্দ্র থেকে পরিচালনা করার জন্য কেন্দ্রিকতার ওপর জোর দেওয়া হয়—যার অর্থ হ'ল পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘুরা মানতে বাধ্য থাকবেন এবং উর্ধ্বতন কমিটির সিদ্ধান্ত নিম্নতন কমিটিগুলি অবশ্যই মেনে চলবে। ফলে পার্টির সর্বোচ্চ কমিটি পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত সমগ্র দল মানতে বাধ্য। বলা হয়, এই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ফলে সমগ্র পার্টি একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে পরিচালিত করা যায়। কমিউনিস্ট পার্টির কাঠামো অনেকটা পিরামিডের মত গড়ে ওঠে।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক দল প্রতিষ্ঠার পরেই দলের সভ্যপদ কাদের দেওয়া উচিত এই নিয়ে দলের মধ্যে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে তখন অনেক সমাজতান্ত্রিক দল বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু ঐ দলগুলি ছিল অনেকটা ঢিলেঢালা এবং তাদের সভ্যপদ সম্পর্কে খুব কড়াকাড়ি ছিল না। কিন্তু

লেনিন তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা, 'কি করতে হবে'-তে (What is to be done) পার্টির সংগঠন ও সদস্যপদ সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখেন, সেই বক্তব্যই এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি মেনে চলেছে।

লেনিন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেন, বিপ্লবী পার্টির সদস্যপদের মান যেন কোনক্রমেই সহজ না করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী। এই বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বেই একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব। তাই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য একমাত্র তারাই হবেন, যারা শ্রমিক শ্রেণীর গুণাবলী অর্জন করেছেন। যারা পেশাদার বিপ্লবী, যারা গোপন কাজের সঙ্গে প্রকাশ্য কাজের মিলন ঘটাতে পারেন, যারা পার্টির শৃঙ্খলা গভীরভাবে মেনে চলেন, যারা মার্কসবাদ আয়ত্ত করেছেন, এই সব ব্যক্তিদেরই একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য করা হবে। বিশেষ করে জারের রাশিয়ায় যেখানে পুলিশ ও গুপ্তচররা সব সময়ই যে কোন রকম ক্ষোভ বা অসন্তোষের আভাস পাওয়ামাত্র নিষ্ঠুর দমনপীড়নের মাধ্যমে বিপ্লবীদের শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করত, সেই রাশিয়ায় লেনিন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের বিপ্লবী শৃঙ্খলা, বিপ্লবী মতাদর্শ এবং সর্বোপরি বিপ্লবের জন্য আত্মোৎসর্গের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই দেখিয়েছিলেন যে, শ্রমিক শ্রেণী আর কমিউনিস্ট পার্টি এক নয়। কমিউনিস্ট পার্টি হল শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবর্তী বাহিনী—যা শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিয়ে গঠিত।

এইসব কারণেই ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর বলশেভিক পার্টি যখন আইনগত স্বীকৃতি পেল, তখন তার সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪ হাজার। কিন্তু ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের আগে পার্টির সদস্য সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে পার্টির সদস্য সংখ্যা হয় ৩ লক্ষ ৯০ হাজার। এখনো ২৬ কোটি অধিবাসীর দেশ রাশিয়ায় পার্টির সদস্য সংখ্যা ২ কোটির মত। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ প্রাপ্তিকে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় বলে মনে করা হয়। পার্টির গঠনতন্ত্র অনুসারে এখন সে সব ব্যক্তি পার্টির সদস্যপদ পেতে পারেন যাঁরা পার্টির কর্মসূচী ও গঠনতন্ত্র মেনে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ, পার্টি পরিচালিত যে কোন গণসংগঠনে সক্রিয় ভাবে কাজকর্ম করেন, পার্টি তহবিলে নিয়মিত চাঁদা দিয়ে থাকেন এবং পার্টির সিদ্ধান্ত ও শৃঙ্খলা দ্বিধাহীন ভাবে মেনে চলেন।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হবার পদ্ধতি

১৮ বৎসর বয়স্ক যে কোন সোভিয়েত নাগরিক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে পারেন। সদস্যপদের জন্য আবেদনপত্রে অন্তত তিন বছর সদস্য আছেন এরকম তিনজন পার্টির সদস্যের সুপারিশ থাকা চাই। পূর্ণ সদস্যপদ পাওয়ার আগে এক বছর প্রার্থী-সদস্যহিসাবে থাকতে হয়। এই এক বছরের মধ্যে প্রার্থীসভ্যকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, পার্টির কর্মসূচী, কর্মনীতি ইত্যাদি আয়ত্ত করতে হয়। একজন কমিউনিস্ট কিভাবে জনসাধারণের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করেন, কিভাবে তিনি কর্মক্ষেত্রে উচ্চ নৈতিক মান ও কমিউনিস্ট সুলভ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত

করবেন, সে বিষয়ে তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাঁর জীবনযাত্রা, আচরণ ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখা হয় এবং পরে তাকে পূর্ণ সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। অবশ্য এই সদস্যপদ উচ্চতর কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

যদি কোন সদস্য পার্টি শৃঙ্খলা মেনে চলতে অস্বীকার করে, কিংবা উপদলীয় চক্রান্তে লিপ্ত হয়, কিংবা দুর্নীতিপরায়ণ বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে সেই ব্যক্তিকে দল থেকে বিতাড়ণ করা যায়। কিন্তু তার আগে তার কাছে অভিযোগগুলি পাঠাতে হবে এবং সেই ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, পার্টি তার ক্যাডারদের মজুত সোনার ন্যায় ব্যবহার করে। ক্যাডারদের কাজকর্মের দিকে তীক্ষ্ন লক্ষ্য রাখা, তাদের কাজকর্মের ত্রুটি সংশোধন করা, তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া, যোগ্য ক্যাডারদের সময়ে উপযুক্ত পদোন্নতির ব্যবস্থা করা পার্টি নেতৃত্বের কাজ এবং এই কাজ তাঁরা ভাল ভাবেই করেন।

পার্টি সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য

কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যগণ ফ্যাসিষ্টদের মত প্রভুর মত আচরণ করেন না। তাঁরা কখনোই ক্ষমতামদমত্ত হয়ে সমাজ বা প্রশাসনের কাছে বিশেষ অধিকার দাবী করেন না। বরং আচার আচরণে এবং দৈনন্দিন জীবনচর্যায় তাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপরে সামাজিক স্বার্থকে স্থান দেন। যে সদস্য নিজের বিশেষ অবস্থানের সুযোগ নিয়ে নিজের বা পারিবারিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করেন, তাঁকে পার্টি আজ হোক বা কাল হোক দল থেকে তাড়িয়ে দেয়। কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যের অধিকার বলতে নিম্নলিখিত অধিকারগুলি বোঝায়, বা তাঁরা পার্টি জীবনে ভোগ করে।

(১) পার্টির সভায়, কিংবা পার্টির সংবাদপত্রে নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে খোলাখুলি ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণের অধিকার।

(২) পার্টির সভায় পার্টির পদাধিকারী ব্যক্তিদের সমালোচনা করার অধিকার।

(৩) পার্টির সংস্থাগুলিতে নির্বাচন করার এবং নির্বাচিত হওয়ার অধিকার।

(৪) যে সভায় কোন পার্টিসদস্য সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, সেই সভায় উপস্থিত থাকার অধিকার।

(৫) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত যে কোন স্তরে প্রশ্ন করার বা বক্তব্য পেশের অধিকার।

প্রত্যেক পার্টিসদস্যকে পার্টির প্রতি, সমাজের প্রতি কতগুলি কর্তব্য পালন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রত্যেক পার্টিসদস্যকে পার্টির তহবিলে নিয়মিত চাঁদা দিতে হয়, পার্টির সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করতে হয়, পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা আন্তরিকতার সঙ্গে মেনে চলতে হয়, রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়, উৎপাদন ও শ্রমের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়। সক্রিয়ভাবে পার্টির কাজ করা, সামাজিক সম্পদ রক্ষণে যত্নবান হওয়া, ভদ্র ও বিনয়ী হওয়া প্রতিটি কমিউনিষ্টের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। মনে রাখতে হবে যে, কমিউনিষ্টরা এমন এক সমাজ নির্মাণের জন্য কাজ

করে যেখানে কোন শ্রেণীদ্বন্দ্ব, জাতিগত বৈষম্য, ধর্মীয় উন্মাদনা থাকবে না। কমিউনিস্ট সমাজে প্রতিটি মানুষ কাজ করে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সমাজ থেকে নেয়। কমিউনিস্টরাও চেষ্টা করেন যাতে তাঁরা সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, জাতিগত বিদ্বেষ কিংবা কর্তৃত্বপরায়ণতার শিকার না হন।

দুই : সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি'র ভূমিকা এবং গুরুত্ব (Role and Importance of the Soviet Communist Party)

জারের রাশিয়ায় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক দলের প্রথম সূত্রপাত হয় ১৮৯৮ সালে। প্লেখানভ, মার্তভ, লেনিন, স্তালিন, জাসুলিচ প্রভৃতি নেতাদের প্রচেষ্টায় অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দল প্রথমে শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করে। এই সমাজতান্ত্রিক দলই প্রথমে জারের রাশিয়ায় মার্কসবাদ তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা প্রচার করে, শ্রমিকদের সংগঠিত করে এবং এক দুঃসহ অবস্থার ভেতরে অশেষ দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করে জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করার চেষ্টা করে।

পার্টির গঠন

তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে প্রবল মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায় বিশের শতকের প্রথম দশকেই সমাজতান্ত্রিক দল দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত দলের নাম হয় বলশেভিক পার্টি' এবং লেনিনের নেতৃত্বের যারা বিরোধী ছিলেন, তাঁদের বলা হত মেনশেভিক। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষদিকে লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে এই বলশেভিকরাই অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

এই অক্টোবর বিপ্লব পুঁজির মালিক ও জমিদারদের উচ্ছেদ করে প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত চূর্ণ করে, গৃহযুদ্ধের অ[illegible] পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই কমিউনিস্টরাই সোভিয়েত ইউনিয়নের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বজায় রাখে। বিভিন্ন জাতি ও অধিজাতিগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়ে, তাদের ভাষা সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবন বিকাশের অবাধ সুযোগ দিয়ে, উৎপাদনের উপকরণগুলির ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে, পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবর্তন করে, প্রতিটি মানুষের জন্য শিক্ষা ও কাজের অধিকার সুনিশ্চিত করে কমিউনিস্ট পার্টি'ই পৃথিবীর একটিমাত্র দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সংহত করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। যে জারের রাশিয়া ছিল ইউরোপের একটি পশ্চাদ্‌বর্তী রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্রে এখন সমাজতন্ত্র যথেষ্ট প্রাগ্রসর। অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সর্বাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা, প্রতিটি মানুষের শিক্ষা ও কাজের অধিকার, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, উপনিবেশবাদ বিরোধী ভূমিকা সোভিয়েত রাশিয়াকে এক অনন্য মর্যাদা দান করেছে। আর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

বিপ্লবের যুগে কমিউনিষ্ট পার্টি'র ভূমিকা

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই বিস্ময়কর সাফল্য কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের জন্য সম্ভব হয়েছে।

তাই স্তালিন শাসনতন্ত্রের মত ব্রেজনেভ শাসনতন্ত্রেও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ও গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। স্তালিন সংবিধানে (১২৬ নম্বর ধারা) কমিউনিস্ট পার্টিকে সংগ্রামী মেহনতী জনগণের অগ্রণী অংশ এবং মেহনতী জনগণের সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনগুলির পরিচালনার কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। আর ১৯৭৭ সালের ব্রেজনেভ সংবিধানের ৬ নম্বর ধারায় কমিউনিস্ট পার্টিকে সোভিয়েত সমাজের নেতৃস্থানীয় ও পরিচালনকারী শক্তি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার এবং সব রাষ্ট্রীয় ও গণসংগঠনের মূলকেন্দ্ররূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় এই কমিউনিস্ট পার্টিই একমাত্র স্বীকৃত দল। পৃথিবীর কোন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত এই রকম একদলীয় ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় না।

সংবিধানে দলের ভূমিকা

পশ্চিমী দুনিয়ার বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই একদলীয় ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, এই একদলীয় শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা ও মূল্যবোধের পরিপন্থী। তাঁদের মতে, বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব এমন এক উদার বাতাবরণ সৃষ্টি করে যাতে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী নাগরিকগণ স্বাভাবিকভাবেই পরমতসহিষ্ণু ও উদার হন। সমালোচকদের মতে কমিউনিস্ট একদলীয় ব্যবস্থা এবং ফ্যাসিস্ট শাসন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। একদলীয় ব্যবস্থায় কখনো গণতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে না। কেন না একদলীয় ব্যবস্থায় জনসাধারণের স্বাধীনভাবে কোন পছন্দ করার অবকাশ থাকে না। বিরোধী দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, বিরোধী সমালোচনার কণ্ঠরোধ করে শাসকদল এমন এক শ্বাসরোধকারী পরিবেশের সৃষ্টি করে যার ফলে নাগরিকদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

পশ্চিমী সমালোচনা

একথা অনস্বীকার্য যে, ফ্যাসিস্ট বা নাৎসী দলের শাসনে গণতন্ত্র কখনোই টিকে থাকতে পারে না। ফ্যাসিস্ট বা নাৎসীদের গণতন্ত্রের জন্য কোন দুর্বলতা নেই। তারা নির্মমভাবে যাবতীয় বিরোধীদলের উচ্ছেদ করে। বিরোধী নেতারা যান হয় কারাগারে, নয়তো বধ্যভূমিতে। আইনের শাসন, নাগরিকদের জন্য কতগুলি মৌলিক অধিকার, স্বাধীন নির্বাচন, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গমনাগমনের স্বাধীনতার কোন অস্তিত্ব ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে থাকে না। যেখানে সম্মতি ও পরমতসহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের মূলভিত্তি, সেখানে ফ্যাসিবাদের মূলভিত্তি হল সন্ত্রাস। সন্ত্রাস কবলিত সমাজে নাগরিকরা স্বাধীনভাবে কথা বলতে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে, এমনকি স্বাধীনভাবে ঘুমোতে পর্যন্ত ভয় পায়। মার্কসবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে ফ্যাসিবাদ হল একচেটিয়া পুঁজির শেষ লড়াই। পুঁজিবাদের শেষ যখন প্রায় ঘনিয়ে আসে, তখন আতঙ্কগ্রস্ত বুর্জোয়ারা গণতন্ত্রের মুখোস ছিঁড়ে ফেলে প্রতিবিপ্লবের জোয়ারে গা ভাষায়। আর

মার্কসবাদী মত

এর ফলেই দেখা দেয় ফ্যাসিবাদ—যা সভ্যতার শত্রু, মানবতার শত্রু। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদ, পররাজ্য গ্রাস ও যুদ্ধে বিশ্বাস করে।

কিন্তু কমিউনিস্ট একদলীয় ব্যবস্থায় কখনো গণতন্ত্রকে অস্বীকার করা হয় না। বরং কমিউনিস্ট নেতারা দাবী করেন যে, সমাজতন্ত্র হল গণতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতি। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের দুর্বলতাগুলি সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরিহার করা হয়। গণতন্ত্রের মূলকথা হল নাগরিকদের আইনের চোখে সমান অধিকার ও মর্যাদা। সোভিয়েত ইউনিয়নে নাগরিকদের এই অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি মানুষের জন্য শিক্ষার অধিকার, শিক্ষা শেষে কাজের অধিকার, উপযুক্ত মজুরীর অধিকার, বিশ্রামের অধিকার সোভিয়েত নাগরিকগণ ভোগ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন জাতি ও অধিজাতিগুলি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করে। জারের আমলে যে রাশিয়া ছিল জাতিগুলির বন্দীশালা, সেই রাশিয়া এখন জাতিগুলির মৈত্রী ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত একটি সার্থক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। নিয়মিত নির্বাচন, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা, নারী-পুরুষের সমান অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার উজ্জ্বল দিক।

কমিউনিষ্ট একদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের বিরোধী নয়

তাছাড়া মার্কসবাদীদের মতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় একাধিক দল থাকে, কেন না শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন দল বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের স্বার্থরক্ষা করে। যদিও বুর্জোয়া গণতন্ত্রে রাষ্ট্র পুঁজির মালিক এবং কলকারখানার মালিকদের হাতে দমনযন্ত্র হিসাবে কাজ করে, কিন্তু সেখানে একাধিক দলের অস্তিত্ব, বাক্ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, অবাধ ও ভয়মুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা ইত্যাদির দ্বারা রাষ্ট্রের একটি আপাত নিরপেক্ষতা বজায় থাকে। কিন্তু লেনিন যথার্থই বলেছেন যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্র হল শতকরা দুভাগ লোকের গণতন্ত্র। আর সমাজতন্ত্র হল শতকরা ৯৮ জন লোকের গণতন্ত্র।

যথার্থ গণতন্ত্র

সমাজতন্ত্রে জমিদার, কলকারখানার মালিক, পুঁজির মালিক, ফাটকাবাজ, চোরাকারবারী প্রভৃতি শ্রেণীর অস্তিত্ব লোপ পায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদনের উপকরণের ওপর সামাজিক মালিকানা, পরিকল্পিত অর্থনীতি, সকলের জন্য কাজের অধিকার, জনকল্যাণের জন্য উৎপাদন, সমাজতান্ত্রিক বণ্টন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ লুপ্ত করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক সমাজ কিংবা বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কোনরকম বৈরীমূলক দ্বন্দ্ব না থাকায় সেখানে একটি মাত্র পার্টি কমিউনিস্ট পার্টিই সমগ্র জনসাধারণের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। আরও মনে রাখতে হবে যে, কমিউনিস্ট পার্টি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার নীতিতে বিশ্বাস করে। এই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি পার্টি জীবনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। তাই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি মাত্র দল থাকলেও তা গণতন্ত্রের পরিপন্থী নয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বিপ্লবের আগেও রাশিয়াতে একাধিক দল ছিল। উদাহরণ, যেমন সংবিধানপন্থী গণতন্ত্রী দল (Constitutional democrats) বা ক্যাডেটস্, সোস্যাল রিভোলিউশানারীস্, মেনশেভিক প্রভৃতি দলের উল্লেখ করা যায়। এই সব দলের নিজস্ব তত্ত্ব ও কর্মসূচী জনগণের মধ্যে কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু দেখা গেল বিপ্লবের পরে কমিউনিস্ট পার্টিই জনগণের প্রকৃত দাবী দাওয়াগুলি তুলে ধরে এবং জনসাধারণের সামনে সঠিক পথ নির্দেশ করে। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর একমাত্র বলশেভিক বা কমিউনিস্টরা ছাড়া অন্যান্য দলগুলি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার স্বপক্ষে ছিল। একমাত্র বলশেভিকরাই "শান্তি, রুটি এবং সোভিয়েতের হাতে সকল ক্ষমতা" এই রণধ্বনি তুলে বিপ্লবের আবশ্যকতার কথা প্রচার করেন। একমাত্র বলশেভিকরাই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপক্ষে, পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিপক্ষে ছিলেন। একমাত্র তাঁরাই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ও আক্রমণের বিরুদ্ধে সার্থকভাবে দেশের মানুষকে এক করে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ ও অন্তর্ঘাতের মুখে দাঁড়িয়েও দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রেখেছিলেন। ফলে কালক্রমে অন্যান্য দল জনজীবন থেকে বিলুপ্ত হয় এবং একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বীকৃত দল হিসাবে টিকে থাকে।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয় ইউরোপের একটি পিছিয়ে পরা, শিল্পে অনগ্রসর দেশে। এই বিপ্লব সফল হয় মূলত কমিউনিস্ট পার্টির সফল ও সাহসী নেতৃত্বের জন্য। আর এই কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় ছিলেন লেনিন ও স্তালিনের মত মহান্ ক্রান্তিকারী নেতাগণ। বিপ্লবের পরে সোভিয়েত রাশিয়ার পথ আদৌ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। এক তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়াকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। প্রচণ্ড খাদ্যের অভাব, ভোগ্যপণ্যের অপ্রতুলতা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নকে একঘরে করার চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীদের চোরাগোপ্তা আক্রমণ, অন্তর্ঘাত। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে শুরু হয়েছিল এক ভয়ংকর রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ। এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিগত অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের অসীম মনোবল, ত্যাগ ও দুঃখবরণ বিফল হয়নি। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা নবজাত শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রকে শুধু রক্ষাই করেননি, তাকে লালন-পালন করেছেন, তার আর্থ-সামাজিক কাঠামো দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বিপ্লবে কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই বহুজাতিক সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি সার্থক যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দান করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি জাতি সমস্যা সমাধানে এক নতুন

পথ নির্দেশ করে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিকল্পিত অর্থনীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করা হয়। কেবলমাত্র মুনাফার জন্য উৎপাদন না করে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত করে, উৎপাদনের উপকরণগুলির ওপর সামাজিক মালিকানা স্থাপন করে, সকলের জন্য শিক্ষা ও কাজের ব্যবস্থা করে কমিউনিস্ট পার্টিই প্রথম সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কর্মসূচী গ্রহণ করে।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ

এই লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার পথে কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে জমির মালিকরা, সম্পন্ন চাষীরা যৌথখামার ব্যবস্থার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু এই সব বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীরা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে, অশেষ ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলেন। তাই স্তালিন সংবিধানে কমিউনিস্ট পার্টির এই ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

১৯৩৬ সালে গৃহীত স্তালিন সংবিধান সোভিয়েত রাশিয়ার ইতিহাসে এক নতুন দিক নির্দেশ করে। এই সংবিধানে কতগুলি মৌলিক মানবিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করা হয়, সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করা হয়, রাষ্ট্রের সর্বস্তরে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সময়েই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্যে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। ত্রিশের দশকে যদিও সোভিয়েত ইউনিয়নের চার পাশে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি ঘিরে ছিল, তবুও কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক নেতৃত্বের জন্য সেখানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্রুত গড়ে উঠেছিল। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি শুধু তার জাতীয় কর্তব্যই পালন করেনি, বিশ্বের সর্বত্র জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি, নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের প্রতি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি তার সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছে।

জাতীয় কর্তব্য পালন ও মুক্তি আন্দোলন সমর্থন

নাৎসী আক্রমণের অন্ধকার দিনগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই কোটি কোটি মানুষ দেশরক্ষার কাজে এগিয়ে এসেছিল। প্রায় নিঃসঙ্গ ও একক ভাবেই সোভিয়েত রাশিয়াকে তখন ক্ষমতামদমত্ত, পররাজ্যগ্রাসী নাৎসী দস্যুদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাশিয়া শুধু নাৎসী হানাদারদের পর্যুদস্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি, পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে রাশিয়ার সহায়তায় সমাজতন্ত্রের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ের প্রধান ঘটনা হল একটি প্রাগ্রসর সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে রাশিয়ার আত্মপ্রকাশ। এখন রাশিয়ার মানুষের অধিকার অনেক বেশি সুরক্ষিত, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক বেশি উন্নত। বৈরীমূলক শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান ঘটায় রাশিয়া এখন সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

নাৎসী আক্রমণ প্রতিরোধ

সোভিয়েত ইউনিয়নে একদলীয় ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সেখানে পার্টি ও সরকারকে একাকার করা হয়নি। যদিও পার্টি সরকার ও অন্যান্য গণসংগঠনগুলিকে নেতৃত্ব দান করে, তবুও রাজধানী মস্কো থেকে সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত পার্টি ও সরকারের পৃথক্ অস্তিত্ব রাখা হয়েছে। ব্রেজনেভ সংবিধানে সুস্পষ্ট ভাবেই বলা হয়েছে যে, পার্টি সংবিধান অনুযায়ী কাজ করবে। অর্থাৎ পার্টিকে সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতার উৎস হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়ায় দেখা হয় না। কিন্তু যেহেতু সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি মাত্র দল আছে, এবং যেহেতু এই দল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিতে বিশ্বাস করে, ফলে কার্যত কমিউনিস্ট পার্টিই জনজীবন ও প্রশাসনের সর্বস্তরে নেতৃত্ব দান করে। প্রেসিডিয়াম, সুপ্রীম সোভিয়েত, মন্ত্রিসভা কিংবা বিচার ব্যবস্থার সর্বত্রই কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীরা নির্বাচিত হন এবং তাঁরা পরিচালনা করেন। কারণ এরাই হলেন শ্রমজীবী মানুষের অগ্রণী অংশ—যাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সমাজকে প্রতিষ্ঠা ও তাকে বিকশিত করার কাজে আত্মনিবেদিত। কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রকে বিকশিত করে, কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনা করে, সেখানে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পূর্ণ করেছে। কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বৈদেশিক নীতির নির্ধারক ও পরিচালক। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সেখানকার রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনার হাতিয়ার।

রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনার হাতিয়ার

কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের মহান্ শিক্ষক ও পথ প্রদর্শক। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রচার করে কমিউনিস্ট সমাজকে আরও শক্তিশালী ও সৃজনশীল করে গড়ে তোলার মহান্ দায়িত্ব পালন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি। সর্বহারা শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার দায়িত্ব গ্রহণ করে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট দলের ব্যাপক ও সর্বাত্মক ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করে সমালোচকেরা বলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের একদলীয় ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট দলের ভূমিকা সেখানে গণতন্ত্রের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করেছে। সরকারের ব-কলমে সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি সব ক্ষমতা আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ করা হয় এবং সেখানে সরকার ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বলে সমালোচনা করা হয়।

সমালোচনা

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন শ্রেণী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রেণীহীন সমাজে পরস্পর বিরোধী শ্রেণীস্বার্থ না থাকায় সেখানে একাধিক রাজনৈতিক দলেরও অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই সোভিয়েত সমাজে একদলীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্র বিপন্ন বলার কোন অর্থ হয় না। প্রতিটি রাষ্ট্রেই পরোক্ষ

ভাবে রাজনৈতিক দল সরকার পরিচালনা করে—যদিও সেখানে উভয়ের মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান রাখা হয় শোষণ ব্যবস্থাকে আড়াল করার জন্য। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে 'শোষণ করা' এবং 'শোষিত হওয়া'র কোন সুযোগ নেই। তাই সেখানে কমিউনিষ্ট পার্টি ও সরকারের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান রাখার কৌশল অবলম্বন করা হয় না। বরং সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের অগ্রণী বাহিনী কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকাকে প্রকাশ্যে এবং গর্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়—বুর্জোয়া দেশের মত শোষণ ও শ্রেণীস্বার্থকে আড়াল করার জন্য কৃত্রিম পার্থক্যের কথা প্রচার করা হয় না।

নতুন সংবিধানে সঠিকভাবেই কমিউনিস্ট পার্টিকে সোভিয়েত সমাজের নেতৃস্থানীয় ও পরিচালনাকারী শক্তি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ও সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও গণসংগঠনের মূলকেন্দ্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির মূল কাজ হল জনগণের সেবা করা। বলা হয়েছে যে, মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার আয়ুধে সজ্জিত কমিউনিস্ট পার্টি—সোভিয়েত সমাজের বিকাশের সাধারণ পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক নীতির সাধারণ গতিপথকে নির্ধারণ করে। কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত জনগণের বিরাট সৃজনশীল গঠনমূলক কাজ পরিচালনা করে এবং কমিউনিজমের জয়ের জন্য তাঁদের সংগ্রামকে এক পরিকল্পিত, প্রণালীবদ্ধ এবং তত্ত্বগতভাবে অটল চরিত্র দান করে।

নমুনা প্রশ্ন

প্রথম অধ্যায়

1. মহান্ অক্টোবর বিপ্লবের পটভূমিকা আলোচনা কর। (পৃঃ ৪)
2. মহান্ অক্টোবর বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর। (পৃঃ ৫)
3. অক্টোবর বিপ্লবের গুরুত্ব কি ? (পৃঃ ৭)

দ্বিতীয় অধ্যায়

1. ১৯১৮ সাল হইতে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে শাসনতান্ত্রিক বিকাশের বিবরণ দাও। (পৃঃ ৯)
2. ১৯৩৬ সালের স্তালিন সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। (পৃঃ ১৩)
3. ১৯৭৭ সালের সংবিধান রচনা এবং গ্রহণ করিবার পটভূমিকা আলোচনা কর। (পৃঃ ১৬)

তৃতীয় অধ্যায়

1. সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক ব্যবস্থার বিধি আলোচনা কর। (পৃঃ ১৮)

চতুর্থ অধ্যায়

1. সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। (পৃঃ ৫৭)
2. সোভিয়েত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হিসেবে 'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র' সম্পর্কে টীকা লিখ। (পৃঃ ৫৭)

পঞ্চম অধ্যায়

1. সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক ব্যবস্থায় নীতি ও কর্মনীতি আলোচনা কর। (পৃঃ ৬৭)
2. সমালোচনা সহকারে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি আলোচনা কর। (পৃঃ ৭১)
3. নতুন সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে সামাজিক বিকাশ এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে সংবিধানে কি বলা হয়েছে আলোচনা কর। (পৃঃ ৭৪)
4. সংবিধানে সংযোজিত সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির ভিত্তি আলোচনা কর।
5. সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ব্যবস্থা আলোচনা কর। (পৃঃ ৬৭)
6. সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক ও আদর্শগত ভিত্তি আলোচনা কর। (পৃঃ ৭৮)

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

1. 'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র' বলতে কি বোঝায় ? (পৃঃ ৬৮)
2. সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক ব্যবস্থার ভিত্তি কি ? (পৃঃ ৭১)
3. সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি কি ? (পৃঃ ৭২)
4. গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা কি ? (পৃঃ ৬৩)

ষষ্ঠ অধ্যায়

1. সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। (পৃঃ ৮৩)
2. সোভিয়েত ইউনিয়নে কেন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ? ইহা কি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ? (পৃঃ ৮২)
3. সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। সোভিয়েত ইউনিয়ন কি প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ? (পৃঃ ৮২)
4. সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কর। (পৃঃ ৯৩)

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

সোভিয়েত ইউনিয়নের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। (পৃঃ ৮৬)

সপ্তম অধ্যায়

1. সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। (পৃঃ ৯৮)
2. সংক্ষেপে সোভিয়েত নাগরিকদের অধিকারসমূহ আলোচনা কর। (পৃঃ ১০০)
3. সোভিয়েত নাগরিকদের অধিকারসমূহের প্রকৃতি আলোচনা কর। (পৃঃ ১০০)
4. সোভিয়েত নাগরিকদের কর্তব্যসমূহ আলোচনা কর। (পৃঃ ১১১)

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

1. সোভিয়েত ব্যবস্থায় নাগরিক অধিকারের সমতা কিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে ? (পৃঃ ১০৫)
2. সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে কিভাবে কাজের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে ? (পৃঃ ১০২)
3. সোভিয়েত নাগরিকদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কিত অধিকার আলোচনা কর। (পৃঃ ১০৪)
4. সোভিয়েত ব্যবস্থায় কি ভাবে পরিবার গঠনের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে ? (পৃঃ ১০৮)

5. সোভিয়েত নাগরিকদের বাক্ স্বাধীনতা এবং বিবেকের স্বাধীনতা আলোচনা কর। (পৃঃ ১০৬)
6. সোভিয়েত নাগরিকদের ব্যক্তিগত অধিকার আলোচনা কর। (পৃঃ ১০৪)
7. সোভিয়েত নাগরিকদের প্রধান দায়িত্বগুলি আলোচনা কর। (পৃঃ ১১২)
8. সোভিয়েত নাগরিকদের ধর্মের অধিকার আলোচনা কর। (পৃঃ ১০৬)

অষ্টম অধ্যায়

1. সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির কার্যাবলী আলোচনা কর। ডেপুটিদের বিশেষাধিকার ও দায়িত্ব আলোচনা কর। (পৃঃ ১১৭)
2. সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের গঠন, কার্যাবলী এবং পদমর্যাদা আলোচনা কর (পৃঃ ১১৫)
3. সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা কর। এর কি কোন প্রকৃত ক্ষমতা আছে? (পৃঃ ১১৫)
4. সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের অভিনব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (পৃঃ ১২২)
5. সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের গঠন, কার্যাবলী ও পদমর্যাদা আলোচনা কর। (পৃঃ ১১২)
6. সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা আলোচনা কর। (পৃঃ ১২২)

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

1. সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের মেয়াদ কত? কার্যকাল শেষ হবার আগেই কি একে ভেঙ্গে দেওয়া যায়?] (পৃঃ ১১৫)
2. সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের আইন-বিষয়ক ক্ষমতা আলোচনা কর। (পৃঃ ১১৮)
3. সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ কিভাবে নির্বাচিত হন? তাঁরা কার নিকট দায়িত্বশীল? তাঁদের কার্যকালের মেয়াদ কত? (পৃঃ ১২২)
4. সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিপুঞ্জের সোভিয়েতের গঠনের ভিত্তি কি? (পৃঃ ১১৫)
5. সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন কে আহ্বান করে? এর বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা যায় কি?] (পৃঃ ১১৬)
6. সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের গঠন আলোচনা কর। (পৃঃ ১১৫)
7. সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিপুঞ্জের সোভিয়েতের গঠন আলোচনা কর। (পৃঃ ১১৫)

নবম অধ্যায়

1. সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের গঠন, কার্যাবলী ও পদমর্যাদা আলোচনা কর। (পৃঃ ১২৭)
2. "সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী ও প্রশাসনিক সংস্থা হইল সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ"—আলোচনা কর। (পৃঃ ১২৭)
3. সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ কিভাবে নির্বাচিত হন? তাঁদের কার্যকাল কত? তাঁরা কার নিকট দায়িত্বশীল? (পৃঃ ১২৭)
4. সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের গঠন আলোচনা কর। (পৃঃ ১২৭)

দশম অধ্যায়

1. সোভিয়েত বিচার ব্যবস্থার মৌলিক নীতি আলোচনা কর। (পৃঃ ১৩৩)
2. সোভিয়েত বিচার ব্যবস্থার কাঠামো আলোচনা কর। (পৃঃ ১৩৭)
3. সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টের কার্যাবলীর বিবরণ দাও। (পৃঃ ১৩৭)
4. "প্রকিউরেটর জেনারেল সমাজতান্ত্রিক আইনের রক্ষক।" আলোচনা কর। (পৃঃ ১৪০)
5. প্রকিউরেটরের দপ্তরের ভূমিকা আলোচনা কর। (পৃঃ ১৪০)

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

1. সোভিয়েত ইউনিয়নে বিচারপতিদের নির্বাচন পদ্ধতি কি গণতন্ত্রসম্মত? (পৃঃ ১৩৪)
2. প্রকিউরেটর জেনারেল কিভাবে নির্বাচিত হন? (পৃঃ)
3. সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ কিভাবে নির্বাচিত হন? তাঁরা কার নিকট দায়িত্বশীল? (পৃঃ ১৩৭)

একাদশ অধ্যায়

1. সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন আলোচনা কর। (পৃঃ ১৪২)
2. সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ সম্পর্কে টীকা লিখ। (পৃঃ ১৪৬)
3. সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো আলোচনা কর। (পৃঃ ১৪২)
4. সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্ব আলোচনা কর। (পৃঃ ১৪৯)
5. সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা আলোচনা কর। (পৃঃ ১৪৯)

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

1. সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস সম্পর্কে টীকা লিখ। (পৃঃ ১৪৩)
2. সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির যুব সংগঠনের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। (পৃঃ ১৪৫)
3. কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটি সম্পর্কে আলোচনা কর। (পৃঃ ১৪৪)
4. সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা সম্পর্কে টীকা লিখ। (পৃঃ ১৪৬)
5. সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য আলোচনা কর। (পৃঃ ১৪৮)

গণ-সাধারণতন্ত্রী চীনের
শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি

১ ঐতিহাসিক পটভূমিকা
Historical Background

পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৪৯ সাল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ—১৯৪৯ সালে চীনের কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে গণমুক্তি ফৌজ মার্কিন সাহায্যপুষ্ট চিয়াং কাই-শেকের বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ থেকে চীনের মূল ভূখণ্ডের অবশিষ্টাংশ উদ্ধার করে এবং ঐ বছর ১লা অক্টোবর পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং সবচেয়ে জনবহুল রাষ্ট্র চীন গণসাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ইউরোপের বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের পথ অনুসরণ করে এশিয়ার বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা জনবহুল চীন সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কর্মযজ্ঞে ব্রতী হয়। চীন গণসাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র পৃথিবীর মানচিত্রকেই পরিবর্তিত করেনি—এঘটনা পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করে এবং পৃথিবীর রাজনীতি ও রাজনৈতিক শক্তিবিন্যাসকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে।

ঐ দীর্ঘস্থায়ী ও সফল বিপ্লবের পরিণতি চীনে নতুন সৃষ্টিযজ্ঞের সূচনা করে। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে চীন নিজের বিধ্বস্ত অবস্থা কাটিয়ে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এতদিন পর্যন্ত দেশে দেশে চীন ছিল অপাংক্তেয়, কিন্তু চীনের মত একটি শক্তিশালী দেশ এবং বিশ্ব রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র সম্পর্কে বিশ্ববাসীর পক্ষে বেশীদিন নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি চীনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক জীবনধারা সম্পর্কে জানার স্পৃহা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে চীনের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির আকর্ষণ খুব বেশি।

কোন দেশের শাসনব্যবস্থা রাজনীতি-নিরপেক্ষ হয় না, হতে পারে না। চীন গণসাধারণতন্ত্র সম্পর্কে একথা আরও বেশি করে প্রযোজ্য। চীনের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির ভিত্তি হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে-তুং এর চিন্তাধারা। সেখানকার শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির চালিকাশক্তি হল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও সামরিক বাহিনী। সুতরাং চীনের সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে হলে মাও-এর রাজনৈতিক দর্শন এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও সামরিক বাহিনীর ভূমিকাকে উপেক্ষা করে বা বাদ দিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এ কারণে মাও-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, চীনের রাষ্ট্র কাঠামো, কমিউনিস্ট পার্টি, সামরিক বাহিনী এবং এমনকি সাংস্কৃতিক বিপ্লব পর্যন্ত চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একাকার হয়ে গিয়েছে—একটি থেকে অন্যটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এ বাস্তব ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না যে কেবলমাত্র আইনগত ব্যাখ্যা (legal interpretation) ও সাংবিধানিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা যায় না। এ বাস্তব অবস্থার কথা মনে রেখে চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনা শুরু করা হল।

১-১. দেশ ও দেশবাসী

Land and the People

পৃথিবীর যে সব দেশে প্রথমে সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল চীন তাদের মধ্যে অন্যতম। চীনের সভ্যতা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হাজার হাজার বছরের প্রাচীন। একদা হোয়াংহো নদীর দু তীরকে কেন্দ্র করে চীনের প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে চীনের সভ্যতাকে হোয়াংহো সভ্যতা নামে অভিহিত করা হয়। যে সব দেশ পৃথিবীতে প্রথমে কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির বার্তা বহন করে আনে চীন তাদের মধ্যে অন্যতম। কাগজ, বারুদ, ভূমিকম্প বোঝার যন্ত্র, জলপথে চলাচলের জন্য কম্পাস চীনেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়। মুদ্রা-ব্যবস্থারও প্রথম প্রচলন ঘটে চীনদেশে।

একদা চীনদেশে (China proper) এবং বৃহত্তর চীনের (মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, সিকিয়াং ও তিব্বত) সমন্বয়ে বিশাল চীন সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে অবশ্য চীন এবং বৃহত্তর চীনের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। কারণ উভয় অঞ্চল নিয়েই গণপ্রজাতান্ত্রিক চীন গঠিত। গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের আয়তন হল ৩৬,৯১,০০০ বর্গমাইল—পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের এক-দশমাংশ অংশ নিয়ে বিশাল চীন রাষ্ট্র গঠিত। আয়তনের দিক থেকে গণপ্রজাতান্ত্রিক চীন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। চীনের অবস্থান এশিয়া মহাদেশের মধ্য-পূর্ব অংশে। চীনের উত্তরে সোভিয়েত রাশিয়া ও গণপ্রজাতান্ত্রিক মঙ্গোলিয়া, দক্ষিণে ও পশ্চিমে ভারত, নেপাল, বার্মাদেশ, লাওস এবং উত্তর-ভিয়েতনাম, পূর্বে উত্তর কোরিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর।

চীনের চারটি বড় এবং বহু ছোট নদ নদী আছে। চীনের নদ-নদীর মধ্যে ইয়াংসি ও হোয়াংহো বিখ্যাত। ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড়-পর্বতসহ চীনের ভূখণ্ডের শতকরা ৪০ ভাগ পার্বত্য অঞ্চল। এ সব এলাকায় প্রচুর খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। লোহা ও কয়লা সম্পদের দিক থেকে বিশ্বে চীনের স্থান তৃতীয়। চীনের নিজস্ব প্রয়োজনের শতকরা ৭৫ ভাগ তৈল সম্পদ এখানে পাওয়া যায়। চীনে প্রচুর বনজ সম্পদও পাওয়া যায়। তবে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ চীনে খুবই কম।

সম্পদ

চীনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল জনসম্পদ। ১৯৭৪ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী চীনের লোকসংখ্যা ৮০ কোটি, বর্তমানে ঐ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ চীনে বাস করে। চীনে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ১২১ জন লোক বাস করে। জনসমষ্টির শতকরা ৭০ থেকে ৮০ জন লোক কৃষিকাজে নিযুক্ত এবং এরা গ্রামে বাস করে।

জনসম্পদ

বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের সমন্বয়ে চীনের জনসমষ্টি গঠিত। দেশের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৯৪ জন হান জাতিভুক্ত (Hans)। বাকী ছয় শতাংশ হল চুয়াং, হুই, উইঘুর, তিব্বতী, কোরিয়ান, থাই, মঙ্গোলিয়ান, মাঞ্চু ইত্যাদি উপজাতি। চীনের জনগণের প্রধান ভাষা হল চীনা ভাষা এবং চীনা ভাষা চীনের সরকারী ভাষা। চীনে জাতি ও ভাষার ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও জনসমাজের বেশির ভাগ (৯৪%) একই জাতীয় সত্তা ও ভাষার অধীন। কৃষ্টি ও ঐতিহ্যগত বন্ধন সেখানে খুব দৃঢ়। ফলে ভৌগোলিক

ও অন্যান্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও চীনের জনগণ মোটামুটিভাবে একটা সাধারণ সমধর্মিতা ও সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ। জনগণের আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ও দর্শন সেখানে জনগণের মধ্যে ঐক্যের একটা মৌল ভিত্তি রচনা করেছে।

জনগণ সামন্তবাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ

প্রাচীন চীনের অন্যতম বিখ্যাত সম্রাট চিন সী-হুয়াং (Chin Shiw Huang) খ্রীষ্টের জন্মের দুশো বছর আগে চীনকে ঐক্যবদ্ধ করেন। বহিরাক্রমণ থেকে চীনকে রক্ষা করার জন্য তিনি চীনের উত্তরাংশে ১৫০০ মাইল লম্বা একটি বিখ্যাত দেয়াল (great wall) নির্মাণ করেন। একদিকে যখন চীনের উত্তরদিকে দেয়াল তোলা হয় প্রায় ঐ সময় থেকেই চীনের জনগণকেও সামন্তবাদের চার দেয়ালের মাঝে বন্দী করা হয়। এ জন্যই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্তির জন্য বিগত দু হাজার বছরে চীনে ছোট বড় অনেক কৃষক বিপ্লব সংগঠিত হয়। পুঁজিবাদী দেশের বৈদেশিক বণিকেরাই নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে চীনের সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলকে অবশেষে অপসারণ করে।

আত্মনির্ভর চীন

বৈদেশিক আক্রমণের আগে পর্যন্ত চীন ছিল আত্মনির্ভর—বিদেশ থেকে চীনকে বিশেষ কিছু আমদানি করতে হত না। বরং বলা যায় চা, সিল্ক, তুলা ইত্যাদি চীন বিদেশে রপ্তানি করতো। তবে চীনের ওপর তলার মানুষের বিলাস-বহুল জীবনের চাহিদা মেটাবার জন্য চীন কিছু কিছু জিনিসপত্র আমদানি করত। এ জনাই চীনের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির এক প্রস্তাব সম্পর্কে ১৯৭৬ সালে চীনা সম্রাট চিয়েন লাং-সেনত (Chien Lund Sent) ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় জর্জকে লিখেছিলেন ঃ We possess all things. I set no value on things strange or ingenious and have no use for your country's manufactures." প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বহির্বিশ্বের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা যাতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা বিপদগ্রস্ত না হয় সেজন্য চীনের সামন্তপ্রভুরা সব রকম বৈদেশিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। এজন্য চীনের জনগণ বহুদিন পর্যন্ত বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এর ফলে তারা কিছুটা নিঃসঙ্গ, আত্মকেন্দ্রিক ও সামাজিক দিক থেকে বন্ধ্যা হয়ে পড়ে।

১-২. চীন ও চীনের জনগণের ইতিহাস

History of China and Chinese People

চীন এবং চীনের জণগণের অতীত এবং অতীত থেকে বর্তমানে উত্তরণের কাহিনী না জানলে চীনের শাসন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কোন দেশের ইতিহাস বলতে সেখানকার রাজ-কাহিনীকে বোঝায় না—প্রকৃত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে সে দেশের মৃন্ময় ও চিন্ময় উভয় সত্তা মূর্ত হয়ে ওঠে। জনগণই ইতিহাসের প্রধান চালিকাশক্তি, তাই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, জীবন-যাত্রা প্রণালী এবং সংঘাত ও সংগ্রামের কাহিনীর অপর নাম ইতিহাস।

আমরা আগেই বলেছি যে, চীন একটি প্রাচীন সভ্য দেশ। খ্রীষ্টের জন্মের আড়াই শ' বছর আগে সাঙ হুয়াং (Sun Huang) রাজবংশ চীনের শাসন-ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত ছিল। ঐ সময় থেকে মাঞ্চু (Manchu) বংশের রাজত্বকাল পর্যন্ত চীনে বাইশটি রাজবংশ রাজত্ব করেছে। এদের মধ্যে চৌ (Chou) রাজবংশ চীনে দীর্ঘ ন'শো বছর রাজত্ব করে। চিন (Chin) বংশের বিখ্যাত রাজা ছিলেন চিন সী হুয়াং (221-209 B. C.)। আগেই বলা হয়েছে যে, তিনিই চীন দেশকে ঐক্যবন্ধ করেছিলেন এবং এজন্য তাঁকে চীনের প্রথম সম্রাট (the first emperor) নামে অভিহিত করা হয়। এর পরের চীনের ইতিহাস হল প্রাচীন ও মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণের ইতিহাস।

ক. সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণের ইতিহাস

আগেই বলা হয়েছে যে, দীর্ঘ দু হাজার বছরের বেশি সময় ধরে চীনের জনগণ সামন্তবাদের নাগপাশে আবদ্ধ ছিল। চীনের জনগণের বেশির ভাগই ছিল কৃষিজীবী। ঐ শোষিত কৃষিজীবী মানুষ সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে বার বার সংগ্রামের গৌরবজনক ইতিহাস রচনা করে। মাও সে-তুং তাঁর *The Chinese Revolution and the Chinese Communist Party* বই-এ বিগত দু হাজার বছরে চীনে সংগঠিত বিশটি কৃষক অভ্যুত্থানের উল্লেখ করেছেন। তিনি যথার্থই বলেছেন যে, চীনের মত এতগুলি এবং এত ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ ও কৃষক অভ্যুত্থানের কোন নজীর পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না (the gigantic scale of peasant uprisings and peasant wars in China is without parallel in the world)।

চীনের চিন (Chin) রাজবংশের সময় থেকে মাঞ্চু (Marchu) রাজবংশের রাজত্ব-কাল পর্যন্ত প্রতিটি রাজবংশের আমলেই কৃষক বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়। চিন বংশের রাজা 'চীনের প্রথম সম্রাট' চীন সী-হুয়াং-এর রাজত্বকালের পরেই চীনে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ঐ বিদ্রোহ দমিত হবার সাথে সাথে চিন বংশের রাজত্ব শেষ হয় এবং হান (Han) রাজবংশ ক্ষমতাসীন হয়। হান বংশের রাজত্বকালেও চীনে কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। সুই (Sui) রাজবংশের রাজত্বকালে ৬১৩ সালে এক ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে। তাং (Tang) বংশের আমলেও চীন কৃষক বিদ্রোহ থেকে মুক্তি পায়নি। সুং (Sung) রাজবংশের আমলেও চীনে ছ বছর ধরে কৃষক বিদ্রোহ চলে। ইউ আন (Yuan) বা মোঙ্গল রাজবংশের রাজত্বকালে বিদ্রোহের ফলে ঐ রাজবংশের অবসান ঘটে এবং মিং (Ming) রাজবংশের শাসন শুরু হয়। মিং রাজবংশের সময়েও কৃষক অভ্যুত্থানের বিরতি ছিল না। চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ কৃষক বিদ্রোহ ঘটে মাঞ্চু রাজবংশের রাজত্বকালে। ঐ কৃষক বিদ্রোহের নাম তাইপিং বিদ্রোহ (১৮৫০-১৮৬৪)। ঐ বিদ্রোহকে বস্তুত চীনের বিগত একশ বছর ব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত বলা যেতে পারে। তাই-পিং বিদ্রোহ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ

চীনের ঐ সব কৃষক বিদ্রোহ কৃষিজীবী মানুষের ব্যাপক সমর্থন লাভ করা সত্ত্বেও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কারণ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের

জন্য উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদন সম্পর্কের যে পরিবর্তন প্রয়োজন তা চীনে ঘটেনি। ঐ সময়ে চীনে কোন সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না—যারা শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে। চীনের সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পটভূমিকায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিশাল বিশাল কৃষক অভ্যুত্থানগুলি এ কথাই প্রমাণ কর যে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব না থাকলে কৃষকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়িভাবে নিজেদের হাতে রাখতে পারে না।

বিদ্রোহের মূল্যায়ন

খ. সামন্ততান্ত্রিক-ঔপনিবেশিক শোষণ এবং বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিকা

বিদেশী বণিকেরা চীন থেকে যে সব দ্রব্য আমদানী করতো রুপো দিয়ে তার মূল্য তাদের শোধ করতে হত। বিদেশী বণিকেরা, বিশেষ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রুপো বাঁচাবার একটি উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হয়। কোম্পানী ভারত থেকে চীনে আফিং রপ্তানী করে চীনের জনগণকে আফিংয়ের প্রতি আসক্ত করে তোলে। আফিংয়ের ব্যবসা বিছুদিনের মধ্যে চীন এরূপ ফেঁপে ফুলে ওঠে যে, আমদানীকৃত আফিংয়ের বদলে চীনকে চা, সিল্ক ও অন্যান্য দ্রব্য এবং রুপো রপ্তানী করতে হত। একদা যেখানে বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তানী করে চীন রুপো আমদানী করত, সেখানে পরিবর্তিত অবস্থায় আফিং আমদানী করার জন্য চীনকে বিদেশে রুপো পাঠাতে হত। ১৮৩২ সাল থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত চীন থেকে ১০ মিলিয়ন আউন্স রুপো বিদেশে চলে যায়। জনগণের মধ্যে আফিংয়ের নেশা এমন চরমে ওঠে যে ১৮০০ সালে চীন সম্রাট চিয়া চিং (Chia Ching)-এর আফিং নিষিদ্ধ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বরং ব্রিটিশ বণিকদের আফিং ব্যবসায়ে উৎসাহিত হয়ে মার্কিন ব্যবসায়িগণও চীনে আফিং রপ্তানী শুরু করে। ফলে চীন থেকে বিদেশে রুপো রপ্তানী দিন দিন বাড়তে থাকে।

আফিং আমদানী ও রুপো বিদেশে পাচার

এভাবে ব্যাপকভাবে বিদেশে রুপো রপ্তানী করার জন্য চীনে রুপোর দাম বেড়ে যায়। এর ফলে চাপ প্রত্যক্ষভাবে এসে পড়ে কৃষকদের উপর। কারণ জমিদার শ্রেণী তাদের প্রাপ্য শস্যের অংশ পূর্ব নির্দিষ্ট পরিমাণ রুপোতে বুঝে নেন, কিন্তু ঐ পরিমাণ রুপো সংগ্রহ করার জন্য কৃষকদের শস্যের গোটা অংশটাই বিক্রি করতে হত। এর ফলে আঠারো শতকের মধ্যভাগে চীনে ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে।

এর চাপ পড়ে কৃষকদের উপরে

আফিং ব্যবসায়ীদের প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে মাঞ্চু বংশের রাজারা ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়ে এবং লিন শে স্যু (Lin tse hsu) নামে একজন দেশপ্রেমিক সরকারী কর্মচারীকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠান হয়। তিনি বিশ হাজার বাক্স আফিং আটক করেন এবং মার্কিন ব্যবসায়ীদের ঐ আফিং প্রকাশ্যে নষ্ট করে ফেলেন। এর পরিণতিতে প্রথম আফিং যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ব্রিটেন থেকে বহু সৈন্য আমদানী করা হয় এবং এদের হাতে বহু চীনা সৈন্য ও নাগরিক প্রাণ হারায়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে মাঞ্চু সম্রাট আক্রমণকারীদের সাথে বোঝাপড়ায় আসার সম্ভাবনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেশপ্রেমিক লিনকে বরখাস্ত করে এবং তাকে নির্বাসিত করা হয়।

প্রথম অহিফেন যুদ্ধ

চীনের সামন্তবাদী শাসক ইংরেজদের সাথে এক অসম ও অসম্মানজনক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এটাই নানকিং চুক্তি (the treaty of Nunking) নামে খ্যাত। ঐ চুক্তির ফলে হংকং-এর উপর ব্রিটিশ অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়। চীনের উপর সামরিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক খবরদারীর জন্য ব্রিটিশ ঘাঁটি হয়ে ওঠে হংকং। ঐ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী চীনের প্রধান পাঁচটি বন্দরকে ব্রিটিশ ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করা হয়, ব্রিটিশ নাগরিকদের চীনের আইনের এক্তিয়ারের বাইরে রাখা হয় এবং বিদেশী উৎপাদকের স্বার্থে বিদেশী দ্রব্যের উপর চীন পাঁচ শতাংশের বেশী রপ্তানী শুল্ক ধার্য করবে না বলে অঙ্গীকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ওয়াংশিয়া চুক্তির (the treaty Wanghsia) মাধ্যমে ১৮৪৪ সালে চীনের কাছ থেকে একই ধরনের বিশেষ সুবিধাগুলি আদায় করে নেয়। ঐ দুটি চুক্তিকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ ও মার্কিন ধর্মপ্রচারকদের (Missionaries) কর্মতৎপরতাও চীনে ভীষণভাবে বেড়ে যায়।

নানকিং চুক্তি

নানকিং চুক্তির পরে চীনে আফিং ব্যবসা দ্রুত বেড়ে যায়। চীনে ১৮০০, ১৮৩৮, ১৮৫০ এবং ১৮৫৩ সালে যথাক্রমে ২০০০ বাক্স (chest), ৪০,০০০ বাক্স, ৫২,০০০ বাক্স এবং ৮০,০০০ বাক্স আফিং আমদানী করা হয়। এতদিন পর্যন্ত চীন বিদেশে কাপড় রপ্তানী করত, কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় চীনে ব্রিটেন ও আমেরিকা থেকে কোটি কোটি টাকার কাপড় রপ্তানী শুরু হয়। ফলে চীনের বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হয়, বস্ত্রশিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকেরা বেকার হয়ে পড়ে। চীনের আরও পাঁচটি বন্দর ব্রিটিশ বণিকেরা ব্যবহারের অনুমতি লাভ করায় ক্যান্টন বন্দরের কর্মচাঞ্চল্য বন্ধ হয় এবং হাজার হাজার কুলি ও নৌ-কর্মী চাকরি হারায়। চীনা সম্রাট এবং বিদেশী বণিকদের বিরুদ্ধে জনগণের দেশপ্রেমিক চেতনা ও ক্রোধ সঞ্চারিত হতে থাকে। এককথায় নানকিং ও ওয়াংশিয়া-চুক্তির ফলে চীনের সামন্তবাদী সমাজে ব্যাপক সংকট দেখা দেয়। ফলে উপরোক্ত চুক্তি দুটি স্বাক্ষরের মাত্র সাত বছরের মধ্যে চীনে তাইপিং বিদ্রোহ নামে বৃহত্তম কৃষক অভ্যুত্থান আত্মপ্রকাশ করে।

গ. চীনের বৈপ্লবিক আন্দোলন

চীনের একশ বছরব্যাপী বৈপ্লবিক আন্দোলনকে দুটি স্তরে ভাগ করা যায়:

১. তাইপিং বিদ্রোহ থেকে চীনের কমিউনিস্ট দলের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী বৈপ্লবিক আন্দোলন।

২. চীনের কমিউনিস্ট দল পরিচালিত বৈপ্লবিক আন্দোলন বা চীনের বিপ্লব।

নীচে ঐ স্তর দুটিকে নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করা হ'ল।

১. বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রথম স্তর

চীন গণসাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঠিক একশ বছর আগে তাই-পিং বিদ্রোহ (১৮৫০-৬৫) নামে পৃথিবীর বৃহত্তম কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল। পনের বছর স্থায়ী ঐ বিদ্রোহে দু কোটি থেকে তিন কোটি কৃষক মারা যায়। তাইপিং-এর কৃষক অভ্যুত্থানকেই চীনের একশ বছর স্থায়ী বিপ্লবের সূত্রপাত বলে মনে করা হয়। তাইপিং বিদ্রোহের আগে ও পরে চীনে আরও অনেক কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে; কিন্তু ব্যাপকতা, পরিণত অবস্থা (Maturity), কৃষকদের সর্বজনীন

তাই-পিং বিদ্রোহ

অংশগ্রহণ এবং চীনা সমাজে বৈপ্লবিক মানসিকতা সৃষ্টির ব্যাপারে ঐ কৃষক অভ্যুত্থানটির অবদান অনস্বীকার্য। তাইপিং বিদ্রোহকে তাই একটি কৃষক বিদ্রোহ হিসাবে দেখা ঠিক নয়, একে চীনের বৈপ্লবিক আন্দোলন ও বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত বলে ধরা যেতে পারে।

তাইপিং অভ্যুত্থানের বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রথমে ভিয়েতনামের সীমানা সংলগ্ন কোয়াংশি (Kwangsi) নামক প্রদেশে শুরু হয়। চীনের শোষিত, অপমানিত জনগণ এবং এমন কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও কাতারে কাতারে এ আন্দোলনে সামিল হয়। পিকিং থেকে সাংহাই পর্যন্ত সর্বত্র এ বিদ্রোহী বহ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ে। তাইপিং বিদ্রোহের মাধ্যমে 'শান্তির স্বর্গীয় রাজ্য' (Taiping Tien Kuo) নামে একটি বিপ্লবী রাষ্ট্র গঠন করা হয়। নানকিং শহরে এর রাজধানী স্থাপন করা হয় এবং এ বিপ্লবী রাষ্ট্রটি পনের বছর টিকে থাকে। ঐ বিপ্লবী রাষ্ট্র নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গঠন করে এবং স্বাধীন জাতীয় নীতি অনুসরণ করে। স্বল্পকালের জন্য হলেও ঐ নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা সামন্তবাদের মূলে শিকড় ধরে টান মারে।

তাইপিং বিদ্রোহের নেতা ও প্রেরণাদাতা ছিলেন হুং সিউ চোয়ান (Hung Hsiu Chuan)। হুং ছিলেন একজন গরীব শিক্ষক, ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সামন্ততান্ত্রিক শোষণের জ্বালা অনুভব করেছিলেন। তিনি নিজেকে 'যীশুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা' বলে অভিহিত করতেন, যদিও খ্রীষ্ট ধর্মীয় আচার আচরণের প্রতি তার বিশেষ কোন আসক্তি ছিল না। হুং ছাড়াও তাইপিং আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে ছিলেন একজন গরীব কৃষক এবং কাঠুরিয়া সিয়াও চাও-কুয়েই (Hsiao Chao Kuei) এবং একজন গ্রামের শিক্ষক ফেং য়ুয়ান-শান (Fen Yan-Shan)।

তাইপিং বিদ্রোহের নেতা

বিদেশী ধর্ম প্রচারকেরা (এদের আফিং প্রচারকও বলা যায়) তাইপিং বিদ্রোহের রাজনৈতিক বক্তব্য, ব্যাপকতা এবং সাফল্যে ভীত হয়ে পড়ে। তারা আর্তনাদ করে বলে যে, এই আন্দোলনের শ্লোগানের মধ্য দিয়ে ইওরোপে শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বস্তুত প্রাথমিক পর্যায়ে তাইপিং বিদ্রোহ ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করায় প্রথমদিকে ইহা সাফল্য অর্জন করে। তাইপিং বিদ্রোহীরা বিভিন্ন স্থানে ঘৃণিত মাঞ্চু বংশের শাসনের অবসান ঘটায় এবং সরকারী কোষাগারের অর্থ জনগণের মধ্যে বিলি করে। বিদ্রোহীরা প্রচার করে যে পৃথিবীর সমস্ত জমি পৃথিবীর সকলের জন্য (All the land under heaven should be cultivated by all the people under heaven) এবং এভাবে তারা সামন্তবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। শুধুমাত্র দেশীয় সামন্তপ্রভু এবং এর প্রতিনিধি মাঞ্চু সম্রাটের বিরুদ্ধেই নয়, তাইপিং বিদ্রোহীরা বিদেশী বণিকদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলিও রদ করে।

চীনের ইতিহাসের ঐ বৃহত্তম বিদ্রোহকে ১৫ বছর ধরে নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ নিজেদের 'বাণিজ্যিক স্বার্থে' ঐ বিদ্রোহ দমনে মাঞ্চু সম্রাটকে সাহায্য করে। ঐ সকল বাণিজ্যিক স্বার্থ চীনের জনগণকে শোষণের ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য চীনের উপর আরও প্রভাব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। এ উদ্দেশ্যে ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্যবাহিনী পিকিং অধিকার করে নেয়। এ ঘটনাই ইতিহাসে দ্বিতীয় আহিফেন যুদ্ধ (১৮৫৮-৬০) নামে খ্যাত।

দ্বিতীয় আহিফেন যুদ্ধ

একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের আক্রমণ এবং অন্যদিকে তাইপিং বিদ্রোহে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে চীনের তৎকালীন সম্রাট ১৮৫৮ সালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের সাথে তিয়েনসেন চুক্তি (Treaties of Tiensin) সম্পাদন করে। ঐ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স চীনের উপর অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে, আফিং ব্যবসা এবং ধর্মপ্রচারের কাজকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধার্থে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ চীনে আরও বেশিসংখ্যক বন্দর ব্যবহারের সুযোগ লাভ করে এবং কূটনৈতিক আবাস স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। এক কথায় দেশের ভূখণ্ড ও সম্মানকে বৈদেশিক শক্তির কাছে বন্ধক রেখে চীন সম্রাট দেশের বৃহত্তম কৃষক অভ্যুত্থানকে দমন করেন।

তিয়েনসেন চুক্তি

চীনের আগেকার কৃষক বিদ্রোহগুলি যে কারণে ব্যর্থ হয় সে কারণেই শেষ পর্যন্ত তাইপিং বিদ্রোহও ব্যর্থ হয়। চীনের উৎপাদন ব্যবস্থা ও সামাজিক শক্তি বিন্যাস তখন পর্যন্ত নতুন বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে গ্রহণ করার উপযুক্ত হয়নি। তবে তাইপিং বিদ্রোহ শুধুমাত্র নিজ দেশে নয়, বিদেশেও এবং এমনকি ইউরোপেও বিপুলভাবে বন্দিত হয়। তাইপিং বিদ্রোহের গৌরবজনক ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। চীনের হাজার হাজার তরুণকে ঐ বিদ্রোহ শোষণের শৃংখল থেকে মুক্তি অর্জনের দুর্জয় সঙ্কল্পে অনুপ্রাণিত করে। পরবর্তীকালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং লাল ফৌজও তাইপিং বিদ্রোহ থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করে।

তাইপিং বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার কারণ

১৮৬৫ সালে তাইপিং বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর থেকে ১৯১১ সালে মাঞ্চু রাজবংশ ক্ষমতাচ্যুত হওয়া পর্যন্ত সময়ে চীনে একটি পশ্চিমীকরণের (Westernization) ব্যর্থ প্রবণতা দেখা যায়। বাণিজ্যিক পুঁজির পরিবর্তে চীনে শিল্প পুঁজির অনুপ্রবেশ শুরু হয় এবং কিছু কিছু কল-কারখানা গড়ে ওঠে। চীন কিছু কিছু অপেক্ষাকৃত আধুনিক অস্ত্র-সম্ভারও সংগ্রহ করে। কিন্তু পশ্চিমীকরণের ঐ সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৮৮৪-৮৫ সালে চীন ফরাসীদের হাতে পরাজিত হয়। চীন নিজের অস্ত্রসম্ভার এবং যুদ্ধ জাহাজের শক্তি আরও বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু ১৮৯৪-৯৫ সালে প্রথম চীন জাপান যুদ্ধে এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র দেশের কাছে চীন শোচনীয় ভাবে পরাজিত হওয়ায় পশ্চিমীকরণের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সিমোনোসেকি-র (Shemonoseki) অসম্মানজনক চুক্তির দ্বারা চীন-জাপান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। ঐ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মাঞ্চু সম্রাট তাইওয়ানকে জাপানের হাতে সমর্পণ করে, জাপানকে ২০০,০০০,০০০ আউন্স রুপো উপঢৌকন দেয়, বিদেশীদের ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য আরও সাতটি বন্দর উন্মুক্ত করে এবং চীনে জাপান কর্তৃক কল-কারখানা স্থাপনের অধিকার স্বীকার করে নেয়।

পশ্চিমীকরণ

চীন-জাপান যুদ্ধ

বৈদেশিক আক্রমণকারীকে কল-কারখানা স্থাপনের অনুমতি দানের ফলে চীনে বৈদেশিক দ্রব্যের পরিবর্তে বৈদেশিক পুঁজির আমদানী শুরু হয়। ফলে ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান থেকে চীনে একচেটিয়া শিল্প-পুঁজির অনুপ্রবেশ শুরু হয় এবং অচিরেই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নির্মম পরিণতির জন্য চীনকে প্রস্তুত হতে হয়।

জাপানের হাতে শোচনীয় পরাজয়ের ফলে চীনের শিক্ষিত ও দেশপ্রেমিক জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একদিকে যখন সামন্তপ্রভুরা পশ্চিমীকরণের নামে কিছু কিছু কারিগরী জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি আমদানি করে তথাকথিত পরিবর্তনের অন্তরালে নিজেদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন, অন্যদিকে তখন বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক দেশপ্রেমিক যুবক ডঃ সান ইয়াত সেনের (Dr Sun Yat Sen) নেতৃত্বে একদল ছাত্র-যুবক তাইপিং বিদ্রোহের গৌরবজনক স্মৃতিকে সামনে রেখে পরিচালিত হতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁরা মাঞ্চু বংশের উচ্ছেদ সাধন করে চীনের মুক্তি চেয়েছিলেন। এর পাশাপাশি কাং ইউ-উয়ে (Kang Yu Wei) এবং তাঁর অনুগামীরা তাইপিং বিদ্রোহের ভয়াবহতার পুনরাবৃত্তি যাতে আর না ঘটে তার জন্য কিছু কিছু সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টায় সংস্কার আন্দোলনের সামিল হয়। জাতীয় সমস্যাগুলি সমাধানে উদ্যোগী হবার জন্য তারা সম্রাটের কাছে এক আবেদনে অনেকগুলি সংস্কার প্রস্তাব উপস্থিত করে। সম্রাট কোয়াং সু (Kwang Hsu) সাবালক হলেও তখনও রানী ডোয়েজারের (Dowagar) অধীন ছিলেন। সম্রাট অনেকগুলি সংস্কার প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং ঐগুলি কার্যকর করার জন্য নির্দেশ জারী করেন। কিন্তু পরিণতিতে দেখা যায় যে, রাজপরিষদ ও সামন্ত স্বার্থের প্ররোচনায় এক প্রতিক্রিয়াশীল প্রাসাদ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যুবক রাজাকে বন্দী করা হয়, সংস্কার আন্দোলনকারী বহু ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং সংস্কার আন্দোলনের নেতা কাং ও তাঁর অনেক অনুগামী পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন।

সংস্কার আন্দোলন

ইতিমধ্যে চীনের কৃষক সমাজকে সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। ইতিহাসে এটা বক্সার অভ্যুত্থান নামে বিখ্যাত। মাঞ্চু শাসনের বিরুদ্ধে একটি গোপন গোষ্ঠী ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি দ্বারা নিজেদের প্রস্তুত করতে থাকে। বিদেশীরা এদের বক্সার (বক্সিং হইতে) নামে অভিহিত করে। বিদেশী জার্মানরা চীনের সানটাং (Shantang) প্রদেশে ঔপনিবেশিক শোষণ শুরু করে এবং গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে দেয়। ফলে ১৮৯৮ সালে বক্সারেরা এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসে। অল্পদিনের মধ্যে তাদের আন্দোলন বিদেশী এবং ধর্মপ্রচারকের বিরোধিতার রূপ নেয়। চীনের সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে চীনের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার ঐ আন্দোলনে সামিল হয়। ১৯০০ সালে বক্সার আন্দোলন চীনের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক আকার ধারণ করে। আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে প্রথমে মাঞ্চু সম্রাটও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় বাধ্য হয়। কিন্তু পরে বিদেশী শক্তিবর্গকে আকার ইঙ্গিতে জানায় যে তাদের কাছ থেকে কিছু ঘুষ পেলে তিনি দেশপ্রেমিক আন্দোলনকারীদের শায়েস্তা করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে প্রয়োগ করবেন। যাহোক, ব্রিটিশ, জার্মান, মার্কিন, ফরাসী, জাপানী এবং অন্যান্য সকল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ ঐক্যবদ্ধভাবে এ যুদ্ধে সামিল হয়। একদিকে মাঞ্চু শাসকের বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের নৃশংসতার দ্বারা বক্সার আন্দোলনকে দমন করা হয়। মাঞ্চু শাসকেরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে আঁতাত করতে বাধ্য হয়, কারণ জনগণের বিরুদ্ধে

বক্সার অভ্যুত্থান

সংগ্রামে এদের সাহায্য তাদের একান্ত প্রয়োজন। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গও মাঞ্চু শাসকদের ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে, কারণ সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য চীনের প্রতিক্রিয়াশীল মাঞ্চু শাসকরা ছিল তাদের অপরিহার্য। মাঞ্চু শাসকেরা সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে অসম্মানজনক চুক্তি করে চীনের ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব ও শোষণ বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, বক্সার আন্দোলনকারীদের স্বচ্ছ নীতি ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, চীনের অন্যান্য বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলি থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতা এবং দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণার জন্য তাদের মাঞ্চু শাসকদের ছলনার শিকার হয়ে অবশেষে পরাজিত হতে হয়েছিল।

বিদেশীদের উপর আর্থনীতিক নির্ভরশীলতার সুযোগে তারা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক প্রভুতে পরিণত হয়। সান-ইয়াত-সেন যথার্থই বলেছেন যে, ঐ অবস্থা চীনকে একটি 'hypo-colony'তে পরিণত করে। চীনের মত একটি দুর্বল গাইকে সকল বিদেশী-শক্তিই সাধ্যমত দোহনের জন্য সচেষ্ট হয়। ইতিমধ্যে চীনে ১৫00 মিলিয়ন ডলার বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ ঘটে। চীনের প্রাকৃতিক সম্পদকে রপ্তানী করে বিদেশে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী দ্রুত পরিবহনের জন্য রেলপথের বিস্তার ঘটে। দেশের বৃহৎ শিল্প, কল-কারখানা, খনি এবং ব্যাঙ্কিং ও পরিবহন ব্যবস্থা বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানায় চলে আসে এবং বিদেশী ব্যবসায় বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। বিদেশী ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উদ্যোগ এবং রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের সহায়ক শক্তি হিসাবে চীনে একশ্রেণীর বুর্জোয়া এজেন্ট সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে ছোট ছোট শিল্প ও কারখানার মালিক জাতীয় বুর্জোয়ারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতীয় অর্থনীতির প্রবক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। শিল্প-প্রসারের সাথে সাথে চীনে দ্রুত শ্রমিক-শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। এ সকল ঘটনার ফলশ্রুতি হিসাবে চীনে ব্যাপক রাজনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়। একদিকে শোষিত শ্রমিক ও কৃষকদের রাজনৈতিক শ্রেণী-চেতনার উন্মেষ ঘটে, অন্যদিকে সান ইয়াত সেন, হুয়াং শি (Huang Hshi) ইত্যাদি দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। ১৯০৫ সালে সান ইয়াত সেন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা বৈপ্লবিক সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি বিপ্লবী সংঘ (Tung Meng Hui) গঠন করেন। তিনি বিদেশে অবস্থানকারী চীনাদের সমর্থন আদায়ের জন্যও সচেষ্ট হন। মাঞ্চু রাজবংশকে এবার সংস্কারপন্থী আন্দোলন নয়, বৈপ্লবিক আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হয়।

বিদেশী ব্যবসায়-বাণিজ্য ও প্রভুত্বের প্রসার

বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রস্তুতি

১৯১১ সালের ১০ই অক্টোবর বিপ্লবী সংঘের নেতৃত্বে হ্যাংকাউ-এ অবস্থিত মাঞ্চু-রাজের সৈন্যরা একটি ইস্তাহারে মাঞ্চু শাসকদের উচ্ছেদ সাধন করে প্রজাতন্ত্র স্থাপনের আহ্বান জানায় এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ছাত্র এবং শ্রমিকদের সহায়তায় এরা হ্যাংকাউ শহর দখল করে নেয় এবং অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করে। এরপরে তারা ত্রিশ দিনের মধ্যে চীনের দক্ষিণাংশ হতে মাঞ্চু রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। ইতিমধ্যে সম্রাজ্ঞী ডেয়োজারের মৃত্যু ঘটে এবং তার আগেই বন্দী রাজা কোয়াং-সুকে (সম্ভবত)

রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও প্রজাতন্ত্র গঠন

সম্রাজ্ঞী হত্যা করান। নাবালক পুই (Pu Yi) রাজা হন। সামন্তপ্রভু ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং বিদেশী শক্তিবর্গ বুঝতে পারে যে, রাজতন্ত্রকে বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই। তাই তারা উয়ান শি-কাই (Yuan Shih Kai) নামে একজন সামরিক পদস্থ কর্মচারীকে রাজকীয় সৈন্যের পরিচালক ও প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করে। উয়ান চীনের উত্তরাংশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে দক্ষিণের প্রজাতন্ত্রের সাথে শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হতে সচেষ্ট হন। উভয় শক্তির মধ্যে ঐকমত প্রতিষ্ঠিত হবার পরে দীর্ঘ বাইশ বছর বিদেশে নির্বাসিত থাকার পরে সান ইয়াত সেন বিজয়ী বীরের মত চীনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯১২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তাঁকে সাময়িকভাবে চীন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি করা হয়। তাইপিং বিদ্রোহের রাজধানী নানকিং-এ চীন প্রজাতন্ত্রের রাজধানী করা হয়। এইভাবে মাঞ্চু বংশের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা রুদ্ধ করে চীন প্রজাতন্ত্র আত্মপ্রকাশ করে।

রাজতন্ত্রের অবসান এবং প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটলেও চীনের সামন্তপ্রভু ও সাম্রাজ্যবাদীশক্তি এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে যার ফলে চীনে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। তাই সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের ফলে যাতে প্রজাতন্ত্রের ঐক্য ব্যাহত না হয় এবং দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু না হয় সেজন্য সান ইয়াত সেন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিশ্বাসভাজন এক সামরিক নেতা ইয়াং শি সাই-এর অনুকূলে রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করেন। ইয়াং শি সাই-এর নেতৃত্বাধীন প্রজাতন্ত্রের নতুন সংবিধানে সম্পত্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ফলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে কৃষকদের ভূমি সংস্কারের দাবীকে বন্দুক দ্বারা স্তব্ধ করে দেয়া হয়। ইয়াং শি সাই সকল গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিসর্জন দিয়ে দ্রুত সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়ে উঠেন।

সান-ইয়াত সেনের পদত্যাগ ও ইয়ং-শি-সাইর ক্ষমতা লাভ

সান ইয়াত-সেন নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী সংঘ (Tung Men Hui) কোয়েমিংটাং এ রূপান্তরিত হয়। চীন প্রজাতন্ত্রের প্রথম পার্লামেন্টে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও এদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ইতিমধ্যে ইয়াং শি কাই-এর বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সান-ইয়াত সেন নিশ্চিত হন এবং দক্ষিণ চীনের সামরিক বাহিনীর সহায়তায় তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের সূত্রপাত করেন। কিন্তু কৃষিজীবী জনসাধারণ ঐ বিপ্লবে সামিল না হওয়াতে ইয়াং সহজেই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে উহা দমন করেন। তিনি কোয়েমিংটাংকে বে-আইনী করেন এবং সান ইয়াত-সেনকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। ইতিমধ্যে ইয়াং প্রজাতন্ত্র বিলোপ করে ১৯১৬ সালের ১লা জানুয়ারী নিজেই চীনের সম্রাট হবার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। তার এ প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না এবং ঐ বছর জুন মাসে তিনি মারা যান। এ অবস্থায় কখনও জাপানের আশীর্বাদপুষ্ট এক সামন্তবাদী সামরিকচক্র (Anhwei) এবং কখনও ব্রিটিশ ও মার্কিন সমর্থনপুষ্ট চক্র (Hopei) চীনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ভোগ করতে থাকে।

কোয়েমিংটাং গঠন

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে চীনের উপর পশ্চিমী শক্তিবর্গের রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক চাপ কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। এ অবস্থায় একদিকে চীনে জাপানী

প্রভাবের সম্প্রসারণ ঘটে এবং অন্যদিকে চীনে ক্ষুদ্র শিল্প এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবসার প্রসার ঘটে। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে চীনে শ্রমিকের সংখ্যা ১,০০০,০০০ থেকে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,০০০,০০০ হয়। কিন্তু ভারী ও মূল শিল্পের কোন প্রসার ঘটে না। ফলে চীনের উদীয়মান বুর্জোয়ারা এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ঔপনিবেশিক শোষণের হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে থাকে। চীনের সার্বভৌমিকতা ও অখণ্ডতা বজায় রাখা হবে এ প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ চীনকে প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তিবর্গকে সাহায্য করার প্রস্তাবে সম্মত করে। দ্বিতীয়বার নির্বাসন হতে ফিরে সান-ইয়াত-সেন ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ঘোষণা করেন যে, একমাত্র সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব হতে মুক্ত হবার যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে চীনের জড়িত হবার কোন কারণ নেই। যা হোক, যুদ্ধের পরে পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ চীনের উপর জাপানের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। এই বিশ্বাসঘাতকতায় চীনের জাতীয়তাবাদী মানসিকতা ভীষণভাবে আঘাত পায় এবং বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ ও চীন

চীনে ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুদিন আগে থেকে নব জাগরণ এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার প্লাবন ঘটে। ১৯১৫ সালে চীনে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা পালাবদলের ঝড় ওঠে। কনফুসিয়ান নৈতিকতা, প্রাচীন পরিবার প্রথা, সামন্তবাদীয় দর্শন ইত্যাদি ব্যাপারে তীব্র সমালোচনা দানা বেঁধে ওঠে এবং গণতান্ত্রিক চেতনা সমৃদ্ধ ও বিপ্লবী সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। ঐ সময়ে নতুন দৃষ্টিভংগী ও চেতনা সমৃদ্ধ বহু যুব সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এদের মধ্যে মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বাধীন *New P ople's Study Society* এবং চু-এন-লাই'র নেতৃত্বে *Awakening Society*-র নাম উল্লেখ করা যায়। বিশেষ করে ঐ সময়ে সোভিয়েত বিপ্লবের ঢেউ চীনের জনজীবনে আলোড়ন আনে এবং আগামী দিনে চীনের রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান

১৯১৯ সালের ৪ঠা মার্চ পিকিং-এর ছাত্র-ছাত্রীরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়ে ধর্মঘট করে এবং প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করা হয় এবং কিছু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। ফলে দাবানলের মত ঐ আন্দোলন চীনের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। শুধুমাত্র ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীরাই নয়, ক্রমে শ্রমিক, জাতীয় বুর্জোয়ারা এবং সমাজের সকল শ্রেণীর লোক আন্দোলনে যোগদান করে এবং এটি একটি সর্বাত্মক আন্দোলনে পরিণত হয়।

৪ঠা মের আন্দোলন

চীনের বিপ্লবী ইতিহাসে ৪ঠা মের আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চারিত্রিক দিক থেকে ঐ আন্দোলন একটা সার্বজনীনতা লাভ করে। ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, জাতীয় বুর্জোয়া সকলেই ঐ আন্দোলনে সামিল হয়। রাজনৈতিক কারণে সংঘবদ্ধ এরূপ সর্বাত্মক রাজনৈতিক আন্দোলন চীনে এই প্রথম। ৪ঠা মের আন্দোলনকে চীনের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা এবং পথ নির্দেশক বলা যেতে পারে। ১৯১১ সালের রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন ছিল বুর্জোয়া

৪ঠা মের আন্দোলনের তাৎপর্য

বিপ্লবের অংশ, যদিও বুর্জোয়া নেতৃত্বের অক্ষমতার জন্য বুর্জোয়া বিপ্লব অসমাপ্ত থাকে। কিন্তু ৪ঠা মের আন্দোলকে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের (New Democratic Revolution) সূত্রপাত বলে অভিহিত করা হয়। এই আন্দোলনেই সর্বপ্রথম 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' স্লোগান উচ্চারিত হয়। ৪ঠা মের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর পরিবর্তে শ্রমিক শ্রেণী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্বে আসীন হয়।

৪ঠা মের আন্দোলনের ফলে ক্রমশ অধিক সংখ্যায় শ্রমজীবী জনসাধারণ রাজনৈতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হতে থাকে। স্বদেশপ্রেমী বুদ্ধিজীবীরা মার্কসবাদী চিন্তাধারাকে দিকে দিকে প্রসারিত করায় ব্রতী হয়। বিশেষ করে ১৯১৭ সালে বলশেভিক দলের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়ার সফল অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব চীনে আলোড়ন সৃষ্টি করে, চীনের রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে অগ্রবর্তী জনসমাজকে জাতীয় সমস্যা সমাধানে অক্টোবর বিপ্লবই সর্বহারার আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। মাও সে-তুং-এর ভাষায় বলা যায়, "The salvoes of the October Revolution brought us Marxism-Leninism. The October Revolution helped the advanced people of China and of the whole world to adopt the proletarian world outlook as an instrument for looking into a nation's future or for reconsidering their own problems".[১] চারিদিকে 'সোভিয়েত বিপ্লবের পথ অনুসরণ কর' এই চিন্তা ছড়িয়ে পড়ে। চীনের সীমান্ত দেশের এই সফল বিপ্লবের ফলে চীনেও ছাত্র-যুব ও বুদ্ধিজীবী মহলে মার্কসীয় নীতির সমর্থকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সোভিয়েত বিপ্লবের প্রভাব

কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম

সোভিয়েত অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে ৪ঠা মের আন্দোলনের পরে চীনের সর্বত্র কমিউনিস্ট গোষ্ঠী সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। এ সময়ে মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে চাংসাতে (Changsha), লি তা চাও-এর নেতৃত্বে পিকিং-এ, তুং পি উ-এর নেতৃত্বে হানকাও এবং সাংহাই, শিনান (Tsinan), হাংচাউ (Hangchow) ইত্যাদি অঞ্চলে মার্কসীয় চিন্তাধারায় বিশ্বাসী কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। বিদেশে পাঠরত চীনা ছাত্রদের মধ্যেও মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রসার ঘটে। প্যারিসে অধ্যায়নরত চৌ এন-লাই-এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ঐ সকল গোষ্ঠী ও ছাত্রদের মধ্যে এ উপলব্ধি ঘটে যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ সামনে রেখে শ্রমজীবী জনসাধারণের নেতৃত্ব কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত বিপ্লব সংগঠিত করতে না পারলে চীনের সকল আন্দোলন ও অভ্যুত্থান তাইপিং থেকে বক্সার পর্যন্ত সমস্ত আন্দোলনের মত ব্যর্থ হতে বাধ্য। এদিকে ১৯১৯ সালে বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে 'কমিনটান" নামে একটি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থা গঠন করা হয়। এই সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে ভয়টিস্কি (Voitiusky) চীনে আসেন এবং বিভিন্ন কমিউনিষ্ট গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করেন। ১৯২১ সালে ১লা জুলাই

প্রথম পার্টি কংগ্রেস

১. On People's Democratic Dictatopship

সাংহাই-তে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ সম্মেলনে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। চেন তু-সিউ (Chen-Tu-hsiu)কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত হবার আগেই ঐ সম্মেলন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৯২২ সালে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে এই নীতির সমালোচনা হয় এবং সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সহযোগিতায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২. দ্বিতীয় স্তর : কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলন

৪ঠা মের (১৯১৯) পরে শ্রমজীবী মানুষের এক ব্যাপক আন্দোলন ১৯২৩ সালের প্রথমদিকে শুরু হয়। ৭ই ফেব্রুয়ারী ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর সৈন্যবাহিনী গুলি চালায়। গুলি চালনার ফলে চারজন শ্রমিক মারা যায়, বহু ব্যক্তি আহত হয় এবং কমিউনিস্ট নেতাসহ বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ আন্দোলন শ্রমিকদের ঐক্য এবং বীরত্ব তুলে ধরে এবং জনগণের ভিতর কমিউনিস্ট পার্টির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।[১] ৭ই ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের কিছুদিন পরে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় এবং ৮ই ফেব্রুয়ারীর আন্দোলন পর্যালোচনা করে তৃতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সাথে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণীর ব্যাপক বৈপ্লবিক আঁতাতের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৭ই ফেব্রুয়ারী আন্দোলন

কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বাধীন কুয়োমিনটাং এর সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সান ইয়াৎ-সেন ছিলেন সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। সোভিয়েত বিপ্লব তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি কুয়োমিনটাং-এর জন্য তিনটি নীতি গ্রহণ করেছিলেন : সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে আঁতাত, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে আঁতাত এবং শ্রমিক ও কৃষকের আন্দোলনকে সমর্থন। ফলে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও সান ইয়াৎ-সেনের কুয়োমিনটাং-এর মধ্যে সহজেই যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। কুয়োমিনটাং কেন্দ্রীয় পরিষদে কয়েকজন কমিউনিস্টকে নির্বাচিত করা হয় এবং সোভিয়েত ধাঁচের লালফৌজ গঠনের উদ্দেশ্যে একটি সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র (Whampoa Military Academy) গঠন করা হয়। কোয়েমিনটাং-দলের চিয়াং কাইশেক এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং কমিউনিস্ট পার্টির চৌ-এন লাইকে ঐ সংস্থার রাজনৈতিক পরিচালক নিয়োগ করা হয়। ক্যান্টনে একটি বৈপ্লবিক সরকার গঠন করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টি ও কোয়েমিনটাং-এর প্রভাব শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট গঠন

---

১. "It showed the rapid development of the organized strength and revolutionary initiative of the working class, enhancing its prestige and that of the Communist Party among the whole people".

—Thirty Years of the Communist Party of China, Hu Chiao-mu.

এ সময়ে উ পে-ফু-র (Wu Pei Fu) হাত থেকে ফেং-য়ু-শিয়াং (Feng Yu Shiang) পিকিং দখল করে নেয় এবং ১৯১১ সালের রাজতন্ত্র উচ্ছেদ আন্দোলনের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করে। পিকিং সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য সান ইয়াত সেন পিকিং যান এবং সেখানেই ১৯২৫ সালের ১২ই মার্চ যকৃতের ক্যান্সারে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

১৯২৫ সালের ২৫শে মে চীনের গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে আর একটি উজ্জ্বল দিন। কাপড়ের মিলের এক বিরাট শ্রমিক সংঘটকে কেন্দ্র করে চীনে এক ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠে। বন্দুকের সাহায্যে এই আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়। ফলে আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপকতা অর্জন করে এবং চীনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত চীনে প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে ব্রিটিশ কলোনী হংকং-এ ১৬ মাস ধরে ধর্মঘট চলে, হুনানে মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে ৫,০০০,০০০ কৃষক সংগঠিত হয়, হানকাউ-এ বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ থেকে লিউ সাও-চি'র নেতৃত্বাধীন শ্রমিকদের গুলি করা হয়। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা উত্তাল হয়ে ওঠে। ফেং যু শিয়াং আগেই পিকিং অধিকার করে নিয়েছিলেন। এবার তিনি চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রাধান্য বিস্তার করেন। বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী সরকার ক্যাণ্টন থেকে য়ুয়ানের দিকে অগ্রসর হয়। বিপ্লবী শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯২৫ সালের মে মাসে কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৯০০ জন, ১৯২৭ সালে তা বেড়ে ৫৭,০০০ হয়।

২৫শে মের আন্দোলন প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ

এদিকে সান ইয়াত-সেনের মৃত্যুর পরে কোয়েমিনটাং বাহিনী দ্বিধা বিভক্ত হয় এবং দক্ষিণপন্থীদের নেতা চিয়াং কাইশেক দলের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী শক্তি বৃদ্ধিতে চিয়াং চিন্তিত হন, কমিউনিস্টদের সাথে মোকাবিলার জন্য তিনি বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এসময়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি'র সম্পাদক চেন তু-সিউ-এর দুর্বল ও আপোশপন্থী মনোভাবের জন্য শ্রমিক-কৃষকের ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিশালী ফ্রণ্ট গড়ে উঠতে পারেনি। ১৯২৭ সালের ১২ই এপ্রিল কোয়েমিনটাং-এর দক্ষিণপন্থী সেনানায়কদের নেতৃত্বে চিয়াং কাইশেকের বাহিনী অতর্কিতভাবে নানকিং, ক্যাণ্টন ইত্যাদি স্থান আক্রমণ করে কয়েক হাজার কমিউনিস্ট সহ ব্যাপক সংখ্যক কৃষককে হত্যা করে। এর ফলে চিয়াং কাইশেক জনগণের নিকট বিশ্বাসঘাতক ও জল্লাদ হিসাবে পরিগণিত হন, যদিও পুঁজিবাদী কাগজগুলি তাকে বীর বলে অভিহিত করে। ১৮ই এপ্রিল চিয়াং কোয়েমিনটাং-এর দক্ষিণপন্থী রাজনীতিবিদ ও সামরিক নেতাদের নিয়ে নানকিং-এ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিনের মধ্যে কমিউনিস্টদের সহযোগিতায় গঠিত যুয়ান (Wuhan) সরকারের প্রধান এবং কোয়েমিনটাং-এর বামপন্থীদের নেতা ওয়াং চেং-উই (Wang Change Wei) ব্যাপক কমিউনিস্ট নিধন শুরু করে। বস্তুত চিয়াং অপেক্ষাও ওয়াং অনেক বেশি রক্তপাত ঘটায়। কিন্তু এত করেও যুয়ান সরকারকে ওয়াং বাঁচাতে পারে না—যুয়ান সরকারে সব ক্ষমতা চিয়াং সরকারের হাতে চলে যায়। এইভাবে কোয়েমিনটাং থেকে কমিউনিস্ট ও তথাকথিত

চিয়াং কাইশেকের বিশ্বাসঘাতকতা

বামপন্থী গোষ্ঠী ওয়ুংকে হটিয়ে চিয়াং কোয়েমিনটাং-এর একমাত্র নায়কে পরিণত হয়ে ফ্যাসী নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রথম যুক্তফ্রণ্ট ভেঙ্গে যায়। চীনে শুরু হয় অত্যাচার, পীড়ন ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ড। ১৯২৭-২৯ সালের মধ্যে চিয়াং ৪৫,০০০ কমিউনিস্ট, শ্রমিক কৃষক, ছাত্র এবং গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে।

অন্যদিকে ১৯২৭ সালের আগস্ট মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এক জরুরী সভায় যুক্তফ্রণ্ট ভাঙ্গা এবং পার্টির বিপর্যয় সম্পর্কে আলোচনা করে। পার্টির দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির জন্য নেতৃত্বকে সমালোচনা করা হয় এবং পার্টির সম্পাদক পদ থেকে চেনকে অপসারণ করে চু চিউ পাইকে (Chu Chiu Pai) নিযুক্ত করা হয়। শ্রমিক শ্রেণী এবং এর অগ্রবর্তী বাহিনী কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। মাও সে তুং-এর ভাষায় বলা যায়, এতবড় বিপর্যয়ও কমিউনিস্টদের ভীত, জয় এবং নিঃশেষ করতে পারল না, বরং তারা শহীদ কমরেডদের কবর দিয়ে নতুন উদ্যমে আন্দোলনে সামিল হল।[১] এ সময়ে (১৯২৭-৩৬) চীনে দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে হুনান ও কিয়াংশি প্রদেশে শরৎকালীন শস্যকাটা অভ্যুত্থান (Autumn Harvest Uprisings) শুরু হয়। চৌ এন-লাই, চু তে, ইয়ে-তিং, হো-লাং প্রমুখ নেতারা ৩০,০০০ সৈন্য নিয়ে প্রতি বিপ্লবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ঐ সৈন্যদের নিয়ে চীনের লালফৌজকে সংগঠিত করা হয়। পরবর্তীকালে ঐ ফৌজই চীনের মুক্তিফৌজে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ক্যাণ্টন শহর দখল করা হয়। চিয়াং কাইশেকের বাহিনীর বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমজীবী মানুষের ন' বছর ধরে বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। ঐ সময়ে চীনের পার্টির কিছুটা বামপন্থী বিচ্যুতি ঘটে। গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার আগেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মায়াজাল তাদের আচ্ছন্ন করে। এ প্রসঙ্গে মাও সে-তুং-এর বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ("...two revolutionary processes differing in character, and that the socialist stage can be reached only after the democratic stage is completed)"[২]

দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ

যাহোক চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ষষ্ঠ কংগ্রেসে বামপন্থী বিচ্যুতির জন্য চু চিউ পাইকে অপসরণ করে সিয়াং চুং-ফা'কে (Siang Chung-fa) সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। চীনের পার্টি একদিকে চিয়াং কাইশেকের কোয়েমিনটাং বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং অন্যদিকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পটভূমিকায় সব সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের সহযোগিতা লাভে নতুন করে প্রয়াস শুরু করে।

১. "The Communists were not frightened, not conquered and not annihilated. They stood up again, wiped off the blood stains, buried their fallen comrades, and went on fighting."

২. The Chinese Revolution and Chinese Communist Party, Mao-Tse-Tung.

কিন্তু চিয়াং কাইশেক দেশের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট ও লালফৌজকে নিঃশেষ করার জন্য সুবিধাবাদী ও বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অনুসরণ করেন। অন্যদিকে চীনের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে তিনি লাল ফৌজের দ্বারা চীনে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধে কাজকর্ম চালাতে থাকেন। এ অবস্থায় ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে এবং ১৯৩২ সালে সাংহাই আক্রমণ করে। চিয়াং কাইশেক জাপানী সৈন্যদের বাধাদানের জন্য কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না, এবং তিনি ফ্যাসী, নাৎসী ও মার্কিন উপদেষ্টা ও সামরিক ব্যক্তিদের সাহায্য ও পরামর্শ নিয়ে লালফৌজ ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তিকে সংহত করেন। চিয়াং-এর বিরাট বাহিনী চীন কমিউনিস্ট ও লাল ফৌজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েতগুলি আক্রমণ করে এবং পার্টির শক্ত ঘাঁটিগুলি হাতছাড়া হওয়ায় লালফৌজ ব্যাপক সংখ্যক স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু নিয়ে ১৯৩৩ সালের আক্টোবর মাসে চীনের উত্তর-পশ্চিমে নিরাপদ স্থানের আশায় অভিযান শুরু করে। এটাই ঐতিহাসিক লং মার্চ অভিযান। এরা এক বছর ধরে ৮০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে ইয়েনানে এসে উপস্থিত হয়। লং মার্চ শুরু হবার আগে লাল ফৌজের সদস্যসংখ্যা ছিল তিন লক্ষ, কিন্তু লং মার্চের পর তা কমে দাঁড়ায় ত্রিশ হাজার মাত্র। কী নিদারুণ যুদ্ধ, কষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতির মধ্য দিয়ে লং মার্চ সম্পন্ন হয় তা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এই লং মার্চের কোন তুলনা নেই।

ঐতিহাসিক লং মার্চ

ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে লং মার্চের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমত, যে বিরাট অঞ্চল ও বিপুল জনগণকে অতিক্রম করে লং মার্চ অগ্রসর হয়েছিল সে সকল অঞ্চলের সাধারণ মানুষ দেশের জন্য লালফৌজের আত্মত্যাগ দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়। দ্বিতীয়ত, আদর্শের জন্য আত্মত্যাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লালফৌজের সদস্যরা যে আগামী দিনের বৃহত্তর সংগ্রামের যোগ্য এ বিষয়ে নিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত, মাও সে-তুং পরিকল্পিত লং মার্চ প্রমাণ করে যে মাও নির্দেশিত পথ ও নীতি সঠিক এবং এর ফলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে মাওয়ের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করে। চতুর্থত, জনগণের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় দেখা দেয় যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে লালফৌজের বাধা দিবার সামর্থ্য আছে। অন্যদিকে এ সময়ে চীনের বুর্জোয়া শ্রেণী পুরাপুরি প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত হয়। অন্যদিকে বিপ্লবী সংস্কৃতি জনসাধারণের শক্তিশালী বিপ্লবী হাতিয়ারে পরিণত হয়।

লং মার্চের শিক্ষা

১৯৩৫ সালে নতুন করে জাপানী আক্রমণের সময়ে ছাত্ররা স্লোগান তোলে: 'গৃহ-যুদ্ধ বন্ধ কর', 'চীনারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ কর' এবং 'জাপানকে বাধা দাও'। ঐ স্লোগানগুলি গোটা দেশে আলোড়িত হতে থাকে। ফলে সর্বস্তরের মানুষ জাপানের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনের দাবীতে সোচ্চার হয়। এমন কি চিয়াং-এর কোয়েমিনটাং দলের মধ্য থেকেও কমিউনিস্টদের সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য চিয়াং-এর উপর চাপ আসে এবং অবশেষে এদের হাতে চিয়াং বন্দী হন। কোয়েমিনটাং দল এবং কমিউনিস্ট পার্টি মিলে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন করে এবং কমিউনিস্টদের হস্তক্ষেপে চিয়াং মুক্তি পায়। স্থির হয় যে, জাপানের বিরুদ্ধে লাল ফৌজ ও কোয়েমিনটাং বাহিনী মিলিতভাবে যুদ্ধ করবে এবং চীনের রাষ্ট্রপ্রধান পদে চিয়াং আসীন থাকবেন।

জাপ আক্রমণ ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন

চীনকে একটি উপনিবেশে পরিণত করার বাসনায় জাপান চীন অধিকারের জন্য ১৯৩৭ সালে নতুন করে আসরে নেমে পড়ে। জাপান সমুদ্র উপকূলবর্তী শহরগুলি দখল করে নেয়। কৃষকদের সংগঠিত করে কমিউনিস্টরা গেরিলা অভিযানে জাপানী সৈন্যদের বাধা দিতে থাকে। জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ না করে চিয়াং একটা নির্লিপ্ত সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করে। এমনকি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পর্যন্ত ঘোষণা করে না। ১৯৪১ সালে জাপানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন আক্রমণ করার পরে চিয়াং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অন্যদিকে চিয়াং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জাপানের সাথে একটা বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা করেন।

যুক্তফ্রণ্টের ভাঙ্গন

১৯৪১ সালে নাৎসী জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করলে চিয়াং এবং তার কোয়েমিনটাং দল কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণ চালায় এবং যুক্তফ্রণ্ট ভেঙ্গে যায়।

যুক্তফ্রণ্ট ভেঙ্গে গেলেও জাপ বিরোধী আন্দোলনের ফলে কমিউনিস্টদের শক্তি ভীষণভাবে বাড়তে থাকে। ১৯৩৭ সালের চল্লিশ হাজার সদস্য থেকে ১৯৪৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় বার লক্ষ। লং মার্চের শেষে ১৯৩৫ সালে লালফৌজের সংখ্যা ছিল মাত্র ত্রিশ হাজার। ১৯৪৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় নয় লক্ষাধিক। লালফৌজ চীনের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল মুক্ত করতে থাকে এবং ঐ মুক্তাঞ্চলগুলি জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কৃষ্টির কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়।

কমিউনিস্ট শক্তিবৃদ্ধি

একদিকে কমিউনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধি এবং অন্যদিকে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে জাপানের আত্মসমর্পণের ফলে চিয়াং কাইশেক খুবই বিপন্ন বোধ করেন। সুযোগ বুঝে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরাজিত জাপানের পরিত্যক্ত জুতো পায়ে দিয়ে আসরে অবতীর্ণ হয়। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের জনগণ যাতে চিয়াং কাইশেককে আবর্জনায় নিক্ষেপ করে গোটা চীনকে মুক্ত করতে না পারে তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং-এর দিকে সামরিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে, যদিও বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোয়েমিনটাং এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মধ্যস্থতার অভিনয় চালাতে থাকে। চিয়াং-এর প্রতিরক্ষা বাজেট এত স্ফীত হয়ে ওঠে যে আর্থনীতিক ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। বিপুল মার্কিন সামরিক সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও চিয়াং বাহিনী দ্রুত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে থাকে এবং মুক্তিফৌজের কর্তৃত্বাধীন মুক্ত এলাকার পরিমাণ বাড়তে থাকে।

জাপানের আত্মসমর্পণ ও মার্কিন অনুপ্রবেশ

মুক্তিফৌজ গ্রামাঞ্চলে নিজেদের শক্তি ও ভিতকে সংহত করতে শুরু করে। মুক্ত এলাকায় কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করা হয় এবং কৃষকদের সমস্ত বকেয়া ঋণ বাতিল করে দেয়া হয়। গ্রামাঞ্চলে সমস্ত শক্তি সংঘবদ্ধ করার ফলে শহরে কিছুটা শিথিলতা দেখা যায় এবং ঐ সুযোগে চিয়াং বাহিনী কয়েকটি বড় শহর দখল করে নেয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মুক্তিফৌজ গ্রাম দিয়ে শহরগুলি ঘিরে ফেলে। সামরিক ও আর্থিক দিক থেকে শহরগুলি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঐ জুলাই মাসেই জনগণের মুক্তিফৌজ হোয়াংহো বা পীত নদী পার হয়ে চীনের দক্ষিণাংশ মুক্ত করার জন্য অগ্রসর হয়।

গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা

গণসাধারণতন্ত্রী চীনের জন্ম

১৯৪৮ সালের শেষের দিকে গণমুক্তি ফৌজ চীনের গোটা উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে মুক্ত করে এবং চার লক্ষ বাহাত্তর হাজার কোয়েমিনটাং সৈন্যকে ধ্বংস বা বন্দী করে। গণমুক্তি ফৌজের অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ফলে চিয়াং এবং তার সাম্রাজ্যবাদী বন্ধুদের সকল বাধা তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে কোয়েমিনটাং সৈন্যবাহিনী সহ পিকিং আত্মসমর্পণ করে। এপ্রিল মাসে মুক্তিফৌজ ইয়াংসি নদী অতিক্রম করতে শুরু করে। কোন উপায় না দেখে চিয়াং রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দিয়ে কমিউনিস্টদের কাছে দেশ বিভক্ত করার প্রস্তাব উত্থাপন করে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং তারা সাম্রাজ্যবাদ ও চিয়াং-এর সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাটিতে প্রবেশ করে এবং কুয়েমিনটাং রাজধানী নানকিং অধিকার করে। এর পর মুক্তিফৌজ দ্রুত চীনের অন্যান্য বৃহৎ নগরগুলি মুক্ত করে। চিয়াং ছোট একটি কোয়েমিনটাং বাহিনী নিয়ে চীনের মূল ভূখণ্ড ত্যাগ করে মার্কিন সাহায্যে তাইওয়ানে (ফরমোজা) পালিয়ে যায় এবং আমৃত্যু সেখানে মার্কিন-আশ্রিত জীবন যাপন করে। একশ বছরের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানান্তে ঐ বছরই ১লা নভেম্বর শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে গণসাধারণতন্ত্রী চীনের আবির্ভাব ঘটে। এভাবে চিয়াং কাইশেক নয়, জাপানী সামরিক চক্র নয়, মার্কিন সামরিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব নয়, চীনের নতুন ইতিহাস রচনা করে চীনের সংগ্রামী জনগণ ও তাদের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব।

১৩. চীনের বিপ্লবের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য

Significance and Features of the Chinese Revolution

মানুষের ইতিহাসে চীনের মহান্ বিপ্লব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ বিপ্লব পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ জনসাধারণকে সামন্তবাদী শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী পীড়নের হাত থেকে মুক্ত করে তাদের সামনে নতুন জীবনের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনবহুল রাষ্ট্র মহান্ চীন বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া, সামরিক প্রভুত্ব ও সামন্তবাদের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে। এক কথায় এ বিপ্লব পৃথিবীর আশি কোটি লোককে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত করে স্বাধীন, মুক্ত ও সম্মানজনক জীবন যাপনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

আশি কোটি মানুষকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে

চীনের মহান্ বিপ্লব পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতিকে নিশ্চিত করে। চীনা বিপ্লবের মাধ্যমে এশিয়াতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হয়। ফলে ইউরোপে বৃহত্তম রাষ্ট্রের (সোভিয়েত রাশিয়া) পাশাপাশি এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শের এই জয়যাত্রা পৃথিবীর সমস্ত শোষিত মানুষের সামনে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের সম্ভাবনার ব্যাপারে আস্থা সৃষ্টি করে এবং তাদের অনুপ্রাণিত করে। ফলে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণ সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনে চীনা বিপ্লবের শিক্ষাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। চীনের সংলগ্ন কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস ইত্যাদি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শিখা দ্রুত প্রজ্বলিত হয়।

সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি প্রেরণা সৃষ্টি করে

চীনের মত একটা বিশাল দেশকে কিভাবে সামন্তবাদী শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ ও ঔপনিবেশিক শোষণ এবং প্রতিক্রিয়াশীল উৎপীড়নের হাত থেকে মুক্ত করতে হয় তার এক জ্বলন্ত আদর্শ চীনা বিপ্লব উপস্থিত করে। কৃষি বিপ্লব তথা গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার অভিনব কৌশল প্রয়োগ করে চীনা বিপ্লব আধা সামন্তবাদী, আধা ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় বিপ্লবের নতুন পথ নির্দেশ করে। একই সময়ে একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে ফ্যাসীবাদী শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ সাহায্যপুষ্ট চিয়াং চক্রের পতন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আদর্শ ও নীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত

চীনের বিপ্লব কেবলমাত্র ৮০ কোটি লোককেই মুক্ত করে না- ঐ বিপ্লব ক্ষুধা ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে কৃষিজীবী মানুষকে মুক্ত করে, কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করে জনগণের উৎপাদন সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করে, দেশ থেকে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার অভিশাপকে উৎপাটিত করে, নারীকে তার মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করে এবং মানুষকে মাথা উঁচু করে সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের প্রেরণা সৃষ্টি করে। এর পাশাপাশি 'শোষণের স্বাধীনতাকে' বাতিল করে এবং কৃষকদের বঞ্চিত করে ভূ-স্বামীদের বিলাসবহুল জীবন যাপনের সম্ভাবনা চিরতরে রুদ্ধ করে। ফলে চীনের সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

জীবনের সর্বদিকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

মুক্তি আন্দোলনকে দমন ও ধ্বংস করার জন্য কোয়েমিনটাং বাহিনী লালফৌজের দ্বিগুণ সংখ্যক সৈন্য নিয়োজিত করে। প্রথমে কোটি কোটি টাকার জাপানী অস্ত্র এবং পরে ছয় হাজার মিলিয়ন ডলার মূল্যের মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ লালফৌজের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। শত শত মার্কিন বিশেষজ্ঞ কমিউনিস্ট-দের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। কিন্তু এতসব আয়োজন সত্ত্বেও আদর্শের প্রতি লালফৌজের অবিচল বৈপ্লবিক নিষ্ঠা সমস্ত মার্কিন প্রতিরোধকে ভেঙ্গে ফেলে। চীনা বিপ্লব এ কথাই প্রমাণ করে যে, শত্রু যতই শক্তিশালী হোক আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে সঠিক কৌশলে ও নেতৃত্বে পরিচালিত হলে সাফল্য অনিবার্য।

বৈপ্লবিক নিষ্ঠা ও সঠিক নেতৃত্বের জয় অনিবার্য

মাও সে-তুং চীনের বিপ্লবের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে বলিয়াছেন যে, চীনের বিপ্লব দুটি স্তরে বিভক্ত: ১. ঔপনিবেশিক, আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক চীনা সমাজকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে একটা গণতান্ত্রিক সমাজে পরিণত করা এবং ২ দ্বিতীয় স্তরে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা। ১৯৪৯ সালে সকল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে চীনে নয়া গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরের স্তরে এ বিপ্লবকে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কর্মধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

চীনের বিপ্লবের দুটি স্তর

মাও সে-তুং আরও বলেছেন যে, চীনের বিপ্লব বিশ্ব বিপ্লবেরই একটি মহান্ অংশ (a magnificient part of the world revolution)। মহান্ অক্টোবর বিপ্লবকে

কেন্দ্র করে বিশ্ব বিপ্লবের অর্থাৎ বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়যাত্রা শুরু হয়—চীনের বিপ্লব তারই একটা অংশবিশেষ। জোসেফ স্টালিন বলেন যে, রুশ বিপ্লবের বিজয় কেবল সাম্রাজ্যবাদের অবসান ও ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের ফলমাত্র নয়—সাথে সাথে এটা বিশ্ববিপ্লবের সূচনা ও পত্তনও বটে। অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে বিশ্ববিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে, ঐ বিপ্লবের অংশ হিসেবে চীনের বিপ্লব বিশ্ববিপ্লবকে আরও প্রসারিত করে। চীনের বিপ্লবের এ আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ভুলে গিয়ে একে নিছক একটি জাতিগত ঘটনা মনে করা ঠিক হবে না।

ইহা বিশ্ববিপ্লবের অংশ

দেশের অবস্থার যথার্থ মূল্যায়নের ভিত্তিতে মাও সে-তুং কর্তৃক জনযুদ্ধের তত্ত্বের প্রয়োগ চীনের বিপ্লবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

১'৪. অক্টোবর বিপ্লবের সাথে চীনের বিপ্লবের তুলনা

A Comparative Study of the October Revolution and Chinese Revolution

সোভিয়েত রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের শেকল ভেঙ্গে বুর্জোয়া শাসনের উচ্ছেদ সাধন করে বিশ্বে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। অক্টোবর বিপ্লব চীনের মুক্তি আন্দোলন তথা চীনের বিপ্লবেই শুধু প্রেরণা সৃষ্টি করেনি—চীনের পুরানো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিশ্বের সর্বহারা বিপ্লবের অংশ হিসেবে নতুন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করে। সুতরাং চীনের বিপ্লবকে অক্টোবর বিপ্লবেরই ধারাবাহিক সম্প্রসারণ এবং বিশ্ববিপ্লবের অংশ হিসেবে দেখা উচিত। স্বাভাবিক কারণেই সোভিয়েত রাশিয়ার মহান অক্টোবর বিপ্লবের সাথে চীনের বিপ্লবের বহু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

উভয় বিপ্লবের মধ্যে সাদৃশ্য

প্রথমত, উভয় বিপ্লবই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ও সামন্তবাদকে চরম আঘাত হানে। অক্টোবর বিপ্লব এ ব্যাপারে পথপ্রদর্শক হলেও চীনের বিপ্লব সে ধারাকেই অনুসরণ করে।

দ্বিতীয়ত, উভয় বিপ্লবই মার্কসবাদ-লেনিনবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং সর্বহারা শ্রেণী ও তার অগ্রবর্তী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত।

তৃতীয়ত, সাধারণভাবে উভয় বিপ্লবই মূলত শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মৈত্রী ও সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে সংগঠিত। তবে অক্টোবর বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা ছিল বেশি। অন্যদিকে চীনের বিপ্লব দীর্ঘদিনের কৃষক বিপ্লবের ঐতিহ্যে লালিত এবং তারই পরিণতি বলে সেখানে কৃষকের বৈপ্লবিক ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থত, উভয় ক্ষেত্রেই বিপ্লবের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা সর্বহারা শ্রেণী দখল করে। রাশিয়ায় সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হয় এবং চীনে জনগণের নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সর্বহারার একনায়কত্বে উত্তরণ ঘটে।

পঞ্চমত, উভয় বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন। সোভিয়েত ইউনিয়ন গণপ্রজাতন্ত্রী চীন উভয় রাষ্ট্রই নিজেদের শ্রমিক ও কৃষকের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছে।

উভয় বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য

এ সকল সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও অক্টোবর বিপ্লবের সাথে চীনের বিপ্লবের কতকগুলো পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমত, স্তালিন যথার্থই বলেছেন যে, রুশ দেশে সর্বহারা বিপ্লব অপেক্ষাকৃত সহজে সাম্রাজ্যবাদী শিকল ভেঙ্গে বুর্জোয়া শাসনকে উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়। এর কারণ হিসেবে তিনি অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বুর্জোয়া শাসন উচ্ছেদের জন্য চীনে দীর্ঘস্থায়ী মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হ'তে হয়েছিল। সুতরাং বলা যায়, তুলনামূলকভাবে চীনের বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন মরণপণ সংগ্রামের ফসল।

দ্বিতীয়ত, রুশ বিপ্লব ঘটেছিল সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ায় নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে। পৃথিবীর বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ঐ সময় পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল বলে তারা অক্টোবর বিপ্লবকে বিধ্বস্ত করার লড়াইতে যোগ দিতে পারেনি। কিন্তু চীনের আধা-ঔপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক পটভূমিকায় ঐ বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, দেশীয় সামন্ততন্ত্র এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে।

তৃতীয়ত, অক্টোবর বিপ্লব হল সর্বহারা শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু চীনের বিপ্লবের প্রথম স্তরে শ্রমিক-কৃষক জনগণের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী অংশ, গণতান্ত্রিক ও পাতিবুর্জোয়ারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সামিল হয়। মাও সে-তুং *On New Democracy* গ্রন্থে বলেছেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও মহান্ অক্টোবর বিপ্লবের আগে চীনের বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও এর অংশ। কিন্তু ঐ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা দুটির পরে চীনের বিপ্লবের চরিত্র পরিবর্তিত হয় এবং তা নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হয় যা সর্বহারা শ্রেণীর বিশ্ব বিপ্লবের একটা অংশ। নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ ঘটে।

চতুর্থত, প্রকৃতি ও কৌশলের দিক থেকে অক্টোবর বিপ্লবের সাথে চীনের বিপ্লবের মৌল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রুশ বিপ্লবে শহরের ভূমিকাই ছিল প্রধান। সর্বহারা শ্রেণী সেখানে শহরগুলিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা কেড়ে নেয় এবং পরে গ্রামের দিকে প্রাধান্য বিস্তার করে। অন্যদিকে চীনের বিপ্লব প্রথমে শহরগুলিকে উন্মুক্ত রেখে গ্রামে শক্তিশালী ভিত্ তৈরী করে এবং পরে গ্রাম দিয়ে শহরকে ঘিরে ফেলে এবং ঐগুলি অধিকার করে।

পঞ্চমত, অক্টোবর বিপ্লবের আগে পৃথিবীতে কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। তাই অক্টোবর বিপ্লবে সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে কোন সাহায্য, সহযোগিতা বা প্রেরণা পাবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু চীনা বিপ্লব অক্টোবর বিপ্লব থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা পায় এবং পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সহযোগিতা ও সদিচ্ছা লাভ করে। মাও সে-তুং *On People's Democratic Dictatorship* গ্রন্থে বলেছেন যে, দেশের সমস্যা সমাধানে অক্টোবর বিপ্লব আমাদের সর্বহারার আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে সাহায্য করে এবং আমাদের সিদ্ধান্ত হল : রাশিয়ার পথ অনুসরণ কর।

২ চীনে শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ
Constitutional Development in China

২-১. গণসাধারণতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার আগে সাংবিধানিক বিকাশ
Constitutional Development Prior to the Emergence of PRC

চীনের জন্য একটি শাসনব্যবস্থা বা সংবিধান রচনার প্রচেষ্টা শুরু হয় মাঞ্চু রাজবংশের পতনের পরে ১৯১২ সালে সান ইয়াত-সেনের রাষ্ট্রপতিত্বে নানকিং-এ চীন সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে। ১৯১২ সালের ১০ই মার্চ নবগঠিত সাধারণতন্ত্রের সংবিধান প্রকাশ করা হয়, যদিও ঐ সংবিধানকে কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

১৯১২ সালের সংবিধান

১৯২৩ সালে কোয়েমিনটাং দলের সামরিক সামন্তপ্রভুরা চীন সাধারণতন্ত্রের জন্য একটি স্থায়ী সংবিধান রচনা করে। জাতীয় মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করা, জাতীয় ভূ-খণ্ডকে রক্ষা করা, জনগণের কল্যাণ ও সুযোগ-সুবিধাকে প্রসারিত করা এবং মানবতার নীতিকে তুলে ধরা—এগুলিকে সংবিধানের আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ঐ সংবিধানে বলা হয় যে, চীন একটি ঐক্যবদ্ধ সাধারণতন্ত্র এবং দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হস্তে ন্যস্ত। আইনবিভাগীয় ক্ষমতাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার হাতে ন্যস্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতি ও তাঁর মন্ত্রিসভার উপর শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। ১৯২৫ সালে সান ইয়াত-সেনের মৃত্যুর পরে কোয়েমিনটাং নেতা চিয়াং কাইশেক কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সংহত করে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা লাভে সচেষ্ট হন। ১৯২৮ সালে তিনি অরগ্যানিক আইন (Organic Law) প্রয়োগ করেন।

১৯২৩ সালের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা

নিজের পতন আসন্ন জেনেও ১৯৪৬ সালে চিয়াং সংবিধান রচনার জন্য একটি গণপরিষদ গঠন করেন এবং ঐ সংস্থার উপর সংবিধান রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারী একটি নতুন সংবিধান ঘোষণা করা হয়। নতুন সংবিধান অনুযায়ী গঠিত জাতীয় সভা চিয়াংকে সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করে। কিন্তু এই সাংবিধানিক ব্যবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ঐ সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত লালফৌজ দ্রুতগতিতে মুক্তাঞ্চলের এলাকাকে সম্প্রসারণ করতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর গণ-সাধারণতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৪৭ সালের সংবিধান

গণ-সাধারণতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠার পরেই একটি প্রয়োজনীয় শাসনতন্ত্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং ১৯৫৪ সালে গণ-সাধারণতন্ত্রী চীনের শাসনতন্ত্র কার্যকর হয়। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর গণ-সাধারণতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫৪ সালে নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার আগে পর্যন্ত চীনের শাসনব্যবস্থা কী ছিল তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

২-২. ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত চীন সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রকাঠামো ও কর্মসূচী

State Structure and Programme of PRC Between 1949 and 1954.

১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর গণসাধারণতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা হলেও ১৯৫৪ সালের আগে সেখানে কোন সংবিধান প্রণয়ন ও তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। বস্তুত ঐ ছয় বছর সময় চীনের রাষ্ট্রব্যবস্থা কোন বিধিবদ্ধ শাসনতন্ত্রকে অনুসরণ করে চলেনি।

নয়া সংবিধান রচনার প্রয়াস

বিপ্লবোত্তর চীনের দ্রুত পুনর্গঠন এবং সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করার জন্য একটি সংবিধান রচনার প্রয়াস শুরু হয় ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে। চীনের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে কোয়েমিনটাং দল কর্তৃক প্রবর্তিত শাসনতান্ত্রিক কাঠামো, কিয়াংসি ও অন্যান্য মুক্ত অঞ্চলে মুক্তি আন্দোলনের সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক অর্জিত শাসনের অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি সোভিয়েত রাশিয়ার শাসন-ব্যবস্থা চীনের গণ-সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের উৎস হিসেবে কাজ করেছে। এর সাথে মাও সে-তুং-এর রাজনৈতিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতা তো আছেই।

চীনের জনগণের রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভা

গঠন

গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের জন্য সংবিধান রচনার প্রথম পর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গণ-সংগঠন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে "চীনের জনগণের রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভা" (Chinese People's Political Consultative Conference—সংক্ষেপে CPPCC) গঠন করা হয়। যে সকল দল, গোষ্ঠী ও গণসংগঠন ঐ মন্ত্রণাসভার লক্ষ্য ও কর্মসূচীকে মেনে চলতে স্বীকৃত হবে জাতীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে তারা মন্ত্রণাসভার কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী ও গণসংগঠন থেকে ৫৮৪ জন স্থায়ী সদস্য এবং ৭৭ জন অস্থায়ী সদস্য নিয়ে মন্ত্রণাসভা গঠন করা হয়। চীনের নতুন সংবিধান রচনার আগে পর্যন্ত ঐ মন্ত্রণাসভাই ছিল চীনের সর্বোচ্চ সংস্থা। সাধারণ কর্মসূচীতে বলা হয়েছিল যে, যতদিন পর্যন্ত নির্বাচিত জাতীয় গণকংগ্রেস (National People's Congress) গঠিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত মন্ত্রণাসভাই চীনের শাসন পরিচালনার সর্বোচ্চ দায়িত্বে থাকবে এবং প্রস্তাবিত জাতীয় গণ-কংগ্রেসের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

তিনটি সংস্থা এবং এদের পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব

জনগণের রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভা কর্তৃক দুটি সংস্থা গঠন করার কথা বলা হয়। এরা হল : ১. ৫৬ জন সদস্য বিশিষ্ট **কেন্দ্রীয় গণ সরকারী কাউন্সিল** (Central People's Government Council) এবং ২ ১৮০ জন সদস্য নিয়ে একটি **জাতীয় কমিটি** (National Committee)। এ ছাড়াও ৩ ২০ জন সদস্য নিয়ে একটি **স্থায়ী কমিটি** (Standing Committee) গঠন করা হয়। জনগণের রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভার দুটি অধিবেশনের অন্তবর্তীকালীন সময়ে কাজ পরিচালনা এবং ক্ষমতা প্রয়োগের দায়িত্ব

জাতীয় কমিটির উপর অর্পণ করা হয়। আবার জাতীয় কমিটির দুটি সভার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে এর কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব স্থায়ী কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় জনগণের সরকারী কাউন্সিল এবং জাতীয় কমিটি উভয়েই তাদের নিজ নিজ কার্যাবলীর জন্য জনগণের রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভার কাছে দায়ী থাকবে। অন্যদিকে স্থায়ী কমিটি তার কাজের জন্য জাতীয় কমিটির কাছে দায়িত্ববদ্ধ থাকবে।

সাধারণ কর্মসূচী ও সাংগঠনিক নিয়মাবলী সংক্রান্ত তিনটি দলিল

জনগণের রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভায় সাধারণ কর্মসূচী ও সাংগঠনিক নিয়মাবলী সংক্রান্ত দলিল গৃহীত হয়। এগুলি হলঃ ১. একটি সাধারণ কর্মসূচী (A Common Programme), ২. সভার সাংগঠনিক নিয়মাবলী (An Organic Law) এবং ৩. কেন্দ্রীয় গণসরকারী কাউন্সিলের নিয়মাবলী (An Organic Law of the Central People's Government Council)।

১, সাধারণ কর্মসূচী

১. সাধারণ কর্মসূচীতে বলা হয়েছে যে, জনগণের রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভার কাজ হ'ল সমস্ত গণতান্ত্রিক ও আধা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নয়া-গণতন্ত্রের কর্মসূচীকে রূপদান করা, চিয়াং কাইশেকের কোয়োমিনটাং সহ সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ধ্বংস করা এবং সাম্রাজ্যবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বিরোধিতা করা। ঐ সকল কার্যাবলীর মাধ্যমে চীনের অর্থব্যবস্থার বনিয়াদ গঠন করে গণ-সাধারণতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা। সাধারণ কর্মসূচীতে চীন থেকে সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়াও বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অবসান, ব্যাপক ভূমি-সংস্কার, শিল্পের বিকাশ সাধন, নাগরিকদের সমানাধিকার প্রভৃতির কথা কর্মসূচীতে বলা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের কথা কর্মসূচীতে ঘোষণা করা হয়

সংগঠনিক নিয়মাবলী

২. মন্ত্রণাসভার সাংগঠনিক নিয়মাবলীতে বলা হয় যে, বর্তমান অবস্থায় চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রেখে জনগণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা হবে। চীনের দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী ঐ সরকার পরিচালিত হবে। এ সরকারের লক্ষ্য হবে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, আমলাতন্ত্র, বুর্জোয়া, কোয়েমিনটাং বাহিনী এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ধ্বংস করে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করা।

৩. কেন্দ্রীয় গণসরকারী কাউন্সিলের সাংগঠনিক নিয়মাবলী গ্রহণ করা হয়।

কেন্দ্রীয় গণ-সরকারী কাউন্সিল

কাউন্সিলের গঠন এবং সহকারী সংস্থা-সমূহ

কেন্দ্রীয় গণ-সরকারী কাউন্সিলের অধিবেশনে কেন্দ্রীয় গণ-সরকারী কাউন্সিল এবং জাতীয় কমিটি গঠিত এবং উপরোক্ত তিনটি দলিল গৃহীত হবার পরে মন্ত্রণাসভার আর বিশেষ কোন কাজে থাকে না। সরকার পরিচালনার মূল দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গণ-সরকারী কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা হয়। একজন সভাপতি, ছয়জন সহ-সভাপতি সহ ৫৬ জন সদস্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের গণ-সরকারী কাউন্সিল গঠিত হয় এবং আগেই বলা হয়েছে যে, এদের মন্ত্রণাসভা নিযুক্ত করে। মাও সে-তুংকে কেন্দ্রীয় গণ-সরকারী

কাউন্সিলের সভাপতি পদে নিয়োগ করা হয়। সরকারী কাউন্সিলের কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সংস্থা গঠন করা হয়। এগুলি হল: ১. প্রশাসনিক পর্ষদ (Govt. Administrative Council), ২. সুপ্রীম কোর্ট (Supreme Court), ৩. জনগণের প্রকিউরেসি (People's Procuracy), ৪. বিপ্লবী সামরিক পর্ষদ (Revolutionary Military Council)।

কেন্দ্রীয় গণ-সরকারী কাউন্সিলের অধীনস্থ এ সব সংস্থার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রশাসনিক পর্ষদ্। প্রশাসনিক পর্ষদ্ একজন প্রধানমন্ত্রী, পাঁচজন উপ-প্রধানমন্ত্রী, একজন কর্মসচিব এবং ষোলজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। প্রশাসনিক পর্ষদের প্রধানমন্ত্রীকেই গণ-সাধারণতান্ত্রিক চীনের প্রধানমন্ত্রী বলে অভিহিত করা হয়। পর্ষদের অধীনে চারটি কমিটি আছে। এগুলি হল: অর্থসংক্রান্ত কমিটি, রাজনৈতিক ও আইন সংক্রান্ত কমিটি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কমিটি এবং জনগণের তদারকি কমিটি। মন্ত্রীরা পর্ষদের অধীনস্থ এ কমিটিগুলির কাছে দায়িত্বশীল থাকেন। চৌ এন-লাইকে প্রশাসনিক পর্ষদের প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা হয়।

প্রশাসনিক পর্ষদ্

চীনের মত একটা বিশাল দেশের শাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা একটি কঠিন ব্যাপার, বিশেষ করে বিপ্লবের ঠিক পরেই। তখন পর্যন্ত একটা কাম্য শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। যা হোক, সুষ্ঠু শাসনের জন্য চীনকে ছটি শাসনতান্ত্রিক অঞ্চলের অধীনে কয়েকটি প্রদেশ রাখা হয়। মঙ্গোলিয়াকেও একটি স্বাধীন শাসনতান্ত্রিক অঞ্চল বলে স্বীকার করা হয়।

২.১. জাতীয় গণ কংগ্রেস গঠন
Formation of the National People's Congress

চীনের কেন্দ্রীয় জনগণের রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভাকে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে গঠন করা হয়। ঘোষণা করা হয়েছিল যে, প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় গণ-কংগ্রেস (National People's Congress) গঠন করা হবে এবং গণকংগ্রেস গণসাধারণতন্ত্রী চীনের সংবিধান প্রণয়ন করবে। ঐ অনুযায়ী ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় গণসরকারী কাউন্সিল নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করে তা ঘোষণা করে।

ঐ নিয়মাবলীতে জাতি, বংশ, ধর্ম, পেশা, শিক্ষা, সম্পত্তিগত যোগ্যতা এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৮ বছরের বেশি প্রতিটি নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। একমাত্র জমিদার, প্রতিবিপ্লবী এবং বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি ছাড়া জনগণের সকলের জন্য ভোটাধিকার প্রসারিত করা হয়। জনগণ বলতে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী, পাতি বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়াদের ধরা হয়। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে স্থির করা হয় যে, নির্বাচকমণ্ডলী স্থানীয় গণ কংগ্রেসের সদস্যদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন করবে। কিন্তু উচ্চ কমিটির সদস্যরা নিম্ন কমিটির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবে—নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নয়। নির্বাচন পরিচালনা ও তদারকির জন্য একটি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি (Central

নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী

Election Committee) এবং নিম্নস্তরে স্থানীয় নির্বাচন কমিটি গঠন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আনুমানিক বার শো সদস্যবিশিষ্ট চীনের জাতীয় গণ কংগ্রেসের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ মাসের ১৫ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত গণ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অধিবেশনে গণ কংগ্রেসের নতুন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ১,১৪১ জন সদস্য যোগদান করেন।

গণ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন

সংবিধান প্রণয়নের প্রস্তুতি

গণ কংগ্রেস গঠনের আগে থেকেই চীন গণসাধারণতন্ত্রের সংবিধান রচনার প্রয়াস শুরু হয়েছিল। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সংবিধানের একটি খসড়া সংবিধান রচনা করে। কেন্দ্রীয় গণ-সরকারী কাউন্সিল ১৯৫৩ সালে মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে খসড়া সংবিধান রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। ঐ কমিটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি রচিত খসড়া সংবিধানকে বিচার-বিবেচনা করে জাতীয় স্তরে আলোচনা সংগঠিত করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রায় আট হাজার ব্যক্তি খসড়া সংবিধান নিয়ে আলোচনা করে। ঐ আলোচনার ভিত্তিতে খসড়া সংবিধানকে সংশোধন করা হয় এবং ১৯৫৪ সালের ১৪ই জুন খসড়া সংবিধানকে সর্বস্তরে জনসাধারণের আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হয়। ছ' মাস ধরে ব্যাপক সংখ্যক জনগণের আলোচনার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় গণ সরকারী কাউন্সিল একটি খসড়া সংবিধান রচনা করে এবং তা জাতীয় গণ কংগ্রেসে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করা হয়। ১৯৫৪ সালে ২০শে সেপ্টেম্বর জাতীয় গণ পরিষদে চীন গণ-সাধারণতন্ত্রের সংবিধান সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

খসড়া সংবিধান রচনা ও অনুমোদন

২-৪. চীন গণ-সাধারণতন্ত্রের প্রথম সংবিধান (১৯৫৪)

First Constitution of PRC (1954)

চীন গণ-সাধারণতন্ত্রের প্রথম তথা ১৯৫৪ সালের সংবিধানে প্রস্তাবনা ছাড়া চারিটি অধ্যায় আছে। ঐ চারটি অধ্যায়ের মধ্যে আছে ১০৬টি ধারা ও কয়েকটি উপাধারা। প্রথম অধ্যায়ে সংবিধানের মূল নীতিগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধারায় সরকারী কাঠামো আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক ও রাজধানীর কথা বলা হয়েছে।

সংবিধানের প্রস্তাবনা

সাধারণ একটি দেশের সংবিধানের মধ্য দিয়ে ঐ রাষ্ট্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং আদর্শকে তুলে ধরা হয়। এককথায় সংবিধানের দর্শন প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়। ১৯৫৪ সালের সংবিধানেও চীন সাধারণতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, গণ-সাধারণতন্ত্রী চীনের নয়া গণতন্ত্র শোষণ এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্তি এনে একটি সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন নিশ্চিত করছে। ক্রমে

ক্রমে সমাজতন্ত্রে উত্তরণই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। একই সংগ্রামী ভূমিকা পালনের জন্য এবং শত্রুকে বিরোধিতা করার জন্য জনগণের গণতান্ত্রিক আঁতাতের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখা হবে। চীনের সব স্বাধীন ও সমজাতিগুলি একই পরিবারের অধীন। মহান্ সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাথে চীন দৃঢ় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ঐ বন্ধুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

সংবিধানে সাধারণ নীতিসমূহ

সংবিধানে প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং আদর্শসমূহ ব্যক্ত করা ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে প্রথম অধ্যায়ে কতকগুলি সাধারণ নীতির কথা বলা হয়েছে। ঐ নীতিগুলিকে প্রস্তাবনায় বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপূরক মনে করা যেতে পারে। নীচে আমরা গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি আলোচনা করছি :

১. চীনে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কথা লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণী এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের অস্তিত্ব থাকার জন্য তখনই সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। ঐ লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায় হিসেবে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর সহযোগিতায় এবং শ্রমিবশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা হবে।

২. জনগণের অধিকার সম্পর্কে ঘোষণা করা হয় যে, সাম্রাজ্যবাদীদের চর ও সমর্থক, জমিদার এবং আমলাতান্ত্রিক ধনিকশ্রেণী ব্যতীত জনগণের সকল অংশই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিবে।

৩. উৎপাদনব্যবস্থায় চার ধরনের মালিকানাকে স্বীকার করা হয়। এগুলি হল : ক. সরকারী মালিকানা, খ. শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী জনগণের সমবায় ও যৌথ মালিকানা, গ. শ্রমিক ও কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ঘ. ধনিকশ্রেণীর মালিকানা। সরকারের লক্ষ্য হল শান্তিপূর্ণ উপায়ে উৎপাদন পদ্ধতির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা।

৪. সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য হল জনগণের সার্বভৌমিকতার প্রতিষ্ঠা। জাতীয় গণকংগ্রেস এবং বিভিন্ন স্তরের আঞ্চলিক ও স্থানীয় গণকংগ্রেসের মাধ্যমে যাতে জনগণের ইচ্ছা ও কর্তৃত্ব ব্যক্ত হয়ে জনগণের সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় সেভাবে সরকারী কাঠামো গড়ে তোলা হবে। ঐ উদ্দেশ্য সরকার পরিচালনার সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার (democratic centralism) নীতি অনুসরণ করা হবে।

৫. চীনের জনসংখ্যার ছ' শতাংশ হল উপজাতি। সরকারের নীতি হল প্রতিটি জাতি ও উপজাতির ক্ষেত্রে সমানাধিকারের নীতি বলবৎ করা। প্রতিটি জাতি ও উপজাতিকে নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতিক বিকাশের জন্য স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দানকে নীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

৬. চীনের গণবিপ্লবে সামরিক বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা স্মরণ করা হয় এবং সামরিক বাহিনীকে চীনের জনগণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

সংবিধানের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

উপরোক্ত সাধারণ নীতিসমূহের মধ্য দিয়ে চীন গণসাধারণতন্ত্রের ১৯৫৪-তে

সংবিধানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১. গণসাধারণতন্ত্রী চীনের সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। আকৃতিতে এই সংবিধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বড় কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া থেকে ছোট। প্রস্তাবনা ছাড়া চারটি অধ্যায়ে ১০৬টি ধারা ও কিছু উপধারা নিয়ে এটি রচিত।

২. চীন একটি এককেন্দ্রিক (Unitary) শাসনব্যবস্থা, তবে এখানে বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

৩. চীনের সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের মত চীনকে একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছে।

৪. চীনের সংবিধানকে রাষ্ট্রপতি পরিচালিত বা মন্ত্রিসভা পরিচালিত কোন শ্রেণীতেই বিভক্ত করা যায় না। এখানে একটি মন্ত্রিসভা আছে এবং মন্ত্রিসভার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী আছেন। আবার এখানে রাষ্ট্রপতি বা চেয়ারম্যান পদটি রাখা হয়েছে। বরং বলা যায় যে চীনের শাসনবিভাগ এবং সরকারের রূপের সাথে সোভিয়েত সংবিধানের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

৫. চীনের সাংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে মান্য করা হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের মত এখানে শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন নয়।

৬. সংবিধান চীনে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সৃষ্টি করেছে। এ ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের সাথে চীনের সংবিধানের পার্থক্য রয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন সংস্থা

১৯৫৪ সালের সংবিধানে সরকারের যে সব গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার কথা বলা হয়েছে সেগুলি নীচে আলোচনা করা হল :

১. জাতীয় গণকংগ্রেস

গণসাধারণতন্ত্রী চীনের সর্বোচ্চ সংস্থা হল জাতীয় গণকংগ্রেস। সংবিধানে জনগণকে সার্বভৌম বলা হয়েছে এবং জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা জাতীয় গণকংগ্রেসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যগণ (ডেপুটি) চার বছরের জন্য প্রদেশসমূহ, আঞ্চলিক স্বয়ত্তশাসিত এলাকাসমূহ, কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত পৌরসভাসমূহ, সামরিক বাহিনী এবং বিদেশে বসবাসকারী নাগরিকের দ্বারা নির্বাচিত হয়। আনুমানিক তিন হাজার সদস্য নিয়ে জাতীয় গণকংগেস গঠিত হয়। সাধারণত বছরে একবার জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। গণকংগ্রেসের অধিবেশন আহবান করে স্থায়ী কমিটি।

গটন

জাতীয় কংগ্রেস প্রধানত একটি আইন প্রণয়ন সংস্থা, তবে সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নির্বাচন করা এবং নীতি নির্ধারণ করাও এর কাজ। জাতীয় কংগ্রেসের কাজ পরিচালনার জন্য এটি একটি সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচন করে। জাতীয় কংগ্রেস চীন গণসাধারণতন্ত্রের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ, স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ, সর্বোচ্চ গণবিচারালয়ের সভাপতি ও সর্বোচ্চ গণপ্রকিউরেটরকে নির্বাচিত করে। এ ছাড়াও

কার্যাবলী
১, নির্বাচনসংক্রান্ত

চীন গণসাধারণতন্ত্রের চেয়ারম্যানের অনুমোদন সাপেক্ষ জাতীয় কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচিত করে এবং প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষ মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের নির্বাচন করে। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে জাতীয় কংগ্রেস এঁদের অপসারণও করতে পারে।

২. আইনসংক্রান্ত

আইন প্রণয়ন সংস্থা হিসেবে জাতীয় গণকংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সাধারণ আইন সংক্রান্ত বিল অনুমোদন করে। সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল পাশের জন্য দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতির প্রয়োজন।

৩. অন্যান্য ক্ষমতা

এছাড়া জাতীয় গণকংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট অনুমোদন করে এবং জাতীয় আর্থনীতিক পরিকল্পনাকে অনুমোদন করে। যুদ্ধ, শান্তি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই সংস্থা। অপরাধীদের ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকারও এর হাতে ন্যস্ত।

মূল্যায়ন

জাতীয় গণকংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী থেকে সহজেই প্রতীয়মান যে এ সংস্থা আইন ও নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু সমালোচকেরা মনে যে, আপাতদৃষ্টিতে জাতীয় গণকংগ্রেসকে যতটা ক্ষমতাশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় বাস্তবে এ ততটা নয়। বছরে একবার স্বল্পকালীন অধিবেশনে এর পক্ষে সকল কাজ করা সম্ভব হয় না। তাই অনেকে বলেন যে, জাতীয় গণকংগ্রেসকে একটি রাবার স্ট্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং বাস্তবে স্থায়ী কমিটি এবং সর্বোপরি কমিউনিস্ট পার্টিই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

২. স্থায়ী কমিটি

গঠন

একজন চেয়ারম্যান, কয়েকজন ভাইস্ চেয়ারম্যান, একজন সেক্রেটারী জেনারেল এবং কয়েকজন সদস্য নিয়ে স্থায়ী কমিটি গঠিত। আগেই বলা হয়েছে যে, স্থায়ী কমিটির সদস্যদের জাতীয় গণকংগ্রেস নির্বাচিত করে। স্বভাবতই স্থায়ী কমিটি এর কার্যাবলীর জন্য জাতীয় গণকংগ্রেসের কাছে দায়িত্বশীল থাকে। সাধারণত প্রতিমাসে দুইবার করে স্থায়ী কমিটি মিলিত হয়।

কার্যাবলী

স্থায়ী কমিটি জাতীয় গণকংগ্রেসের সদস্যদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করে এবং আগেই বলা হয়েছে যে, স্থায়ী কমিটি জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করে। এ ছাড়া আইনের ব্যাখ্যা করা, ডিক্রি জারী করা এবং মন্ত্রিসভার কোন সিদ্ধান্ত সংবিধান বিরোধী বলে বিবেচিত হলে তা বাতিল করার দায়িত্ব স্থায়ী কমিটি পালন করে।

এ ছাড়াও স্থায়ী কমিটি কিছু কিছু শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এদের মধ্যে আছেঃ মন্ত্রিসভা, সর্বোচ্চ গণ-আদালত এবং সর্বোচ্চ গণ-প্রকিউরেটরের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা; প্রদেশ, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় পৌরসভার সিদ্ধান্ত সংশোধন বা বাতিল করা; বিচারবিভাগীয় বিভিন্ন সদস্যদের নিয়োগ করা; বিদেশে রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিদের নিয়োগ ও অপসারণ করা; আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তিকে অনুমোদন বা বাতিল করা; সামরিক, কূটনৈতিক ইত্যাদি সংক্রান্ত উপাধি সৃষ্টি ও পুরস্কার বণ্টন করা।

জাতীয় গণকংগ্রেসের দুটি অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে জাতীয় কংগ্রেস উপপ্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার সদস্যদের এবং বিভিন্ন কমিশনের প্রধানদের নিয়োগ সম্পর্কে মতামত দান করতে পারে এবং এঁদের অপসারণ করতে পারে। জাতীয় গণকংগ্রেসের যখন অধিবেশন চলে না তখন এর কার্যাবলী সম্পন্ন করে স্থায়ী কমিটি। তাছাড়া গণকংগ্রেস কর্তৃক ন্যস্ত যাবতীয় কাজ স্থায়ী কমিটি সম্পাদন করে।

জাতীয় গণকংগ্রেসের মত স্থায়ী কমিটিও সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব পালন করে মাত্র। কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নীতিকে সাংবিধানিক ছাপ দেবার দায়িত্ব স্থায়ী কমিটি পালন করে বলে সমালোচকেরা অভিমত প্রকাশ করেছেন (In effect, the N. P. C. and its standing committee only gave constitutional legitimacy to decisions and policies already determined by the top party leadership)।

মূল্যায়ন

৩. **চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান**

১৯৫৪ সালের সংবিধানে চীন গণ-সাধারণতন্ত্রের জন্য একজন চেয়ারম্যান ও কয়েকজন ভাইস্ চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়। জাতীয় গণকংগ্রেস চার বছরের জন্য চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে নির্বাচিত করে। ৩৫ বৎসর বয়স্ক যে কোন চীনা নাগরিক ঐ পদ দুটিতে প্রার্থী হতে পারেন। ১৯৫৪ সালে মাও সে তুং চীন গণসাধারণতন্ত্রের প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এর পরে লিউ সাও-চি বহুদিন ঐ পদে আসীন ছিলেন। ১৯৭৫ সালের সংবিধানে চেয়ারম্যানের পদটির অবলুপ্তি ঘটে। ১৯৮২ সালের নতুন সংবিধানে আবার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের পদ দুটি স্বীকৃতি পেয়েছে।

চীন গণসাধারণতন্ত্রের চেয়ারম্যান শাসনতান্ত্রিক প্রধান। চীনে সামরিক বাহিনী ও জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিলেরও তিনি প্রধান হিসাবে বিবেচিত হন। প্রধান রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের (supreme state conference) তিনি সভা আহ্বান করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে ভাইস্ চেয়ারম্যান তাঁর কাজ সম্পাদন করেন।

৪. **রাষ্ট্রীয় পরিষদ**

১৯৫৪ সালের সংবিধানে অন্যান্য দেশের মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেটের অনুকরণে একটি রাষ্ট্রীয় পরিষদ (State Council) গঠন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রিগণ এবং আরও প্রায় ত্রিশ জন মন্ত্রিসভার সদস্য, সেক্রেটারী জেনারেল এবং বিভিন্ন কমিশনের প্রধানদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত হয়। দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য এদের মধ্য থেকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১২ জন সদস্য নিয়ে একটি ক্যাবিনেট গঠন করা হয়। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৫৪ সাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত চৌ এন-লাই প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদ নিজের কাজকর্মের জন্য জাতীয় গণকংগ্রেসের কাছে এবং এর অধিবেশন যখন চলে না তখন স্থায়ী কমিটির কাছে দায়ী থাকে।

গঠন

শাসন বিভাগীয় সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে রাষ্ট্রীয় পরিষদের দায়িত্ব হল যাবতীয় আইন, নির্দেশ ও নীতিসমূহকে প্রয়োগ ও কার্যকর করা। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, কমিশন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতা স্থাপনের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় পরিষদ পালন করে। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, নাগরিকদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করা, বিভিন্ন মন্ত্রকের কাজে নির্দেশ দান করা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে রাষ্ট্রীয় পরিষদ। বাজেট রচনা, আর্থনীতিক পরিকল্পনাকে রূপায়ণ করা এবং বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করাও এ সংস্থার কাজের অন্তর্গত। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় পরিষদ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

কার্যাবলী

৫. অন্যান্য সংস্থা

উপরোক্ত সংস্থাগুলি ছাড়াও ১৯৫৪ সালের সংবিধানে আরও কতকগুলি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। এগুলো হল **সর্বোচ্চ গণবিচারালয়** (Supreme People's Court), **সর্বোচ্চ গণ প্রকিউরেসি** (Supreme People's Procuracy) এবং **জাতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থা** (Council of National Defence)। ১৯৫৪ সালের সংবিধানে ২১টি প্রদেশ ও ৫টি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠন করার কথা বলা হয়েছে এবং ঐগুলিকে আবার কাউন্টি ও শহরে বিভক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরেই আঞ্চলিক সরকার ও গণকংগ্রেস গঠন করার কথা বলা হয়েছে।

চীন সাধারণতন্ত্রের ১৯৭৫ সালের সংবিধানের পটভূমিকা

১৯৫৪ সালে প্রবর্তিত চীন গণসাধারণতন্ত্রের সংবিধান বিশ বছরের বেশি সময় ধরে চীনের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিচালিত করে। কিন্তু ষাটের দশকে চীনে মহান্ সাংস্কৃতিক বিপ্লব নামে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং চীনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আর্থনীতিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন সূচিত হয়। ঐ নতুন পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার মত ব্যবস্থা ১৯৫৪ সালের সংবিধানে ছিল না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে যে সম্ভাবনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি নতুন সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। তাই ১৯৭৫ সালে চীনে গণসাধারণতন্ত্রের দ্বিতীয় সংবিধান গৃহীত হয়।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা নতুন সংবিধানের পটভূমিকা হিসাবে মহান্ সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে আলোচনা করবো এবং তার পরে ১৯৭৫ সালের সংবিধান পর্যালোচনা করবো।

৩ | মহান্ সর্বহারা-সাংস্কৃতিক বিপ্লব
The Great Proletarian Cultural Revolution

১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মকালে চীনে এক দীর্ঘায়িত মহান্ সর্বহারা-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে। শুরুতে শিক্ষা-জগতে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এর আত্মপ্রকাশ ঘটলেও ধীরে ধীরে এটি একটি ব্যাপক আদর্শগত বিপ্লবে পরিণত হয় এবং এ বিপ্লবের ফলে চীনের উপরতলার বহু নেতার পতন ঘটে। প্রকৃতি ও চরিত্রগত দিক থেকেই কেবলমাত্র সর্বহারা-সাংস্কৃতিক বিপ্লব তাৎপর্যপূর্ণ নয়, চীনের জনজীবনের সর্বস্তরেই এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়।

৩.১. সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পটভূমিকা
Background of the Cultural Revolution

সাংস্কৃতিক বিপ্লব কাকে বলে এবং এর প্রয়োজনীয়তাই বা কী ছিল এ বিষয়ে স্পষ্ট ধ্যান-ধারণার অভাব লক্ষ্য করা যায়। চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথিকৃৎ মাও সে-তুং। কিন্তু চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটিত হবার বহু আগেই লেনিন বলেছিলেন যে, সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়ের জন্য শ্রমিক-কৃষক-জনসাধারণের প্রত্যক্ষভাবে সরকারী কার্যে অংশ গ্রহণ অপরিহার্য। ঐ লক্ষ্য পূরণের জন্য শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ জনগণের সাংস্কৃতিক মান এমন একটা স্তরে উন্নীত করা প্রয়োজন যাতে তারা নিজেদের সর্বহারা আদর্শকে পুরোনো বুর্জোয়া ভাব-ধারার ওপরে স্থাপন করতে পারে এবং আমলাতান্ত্রিক বাধাকে অপসারিত করতে পারে। শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক-বিরোধী শক্তিকে উৎপাটিত করাই নয়, সবস্তরে সর্বহারা জনগণের নেতৃত্ব কায়েম করা এর মূল লক্ষ্য। মাও সে-তুংও মনে করেন, মহান্ সাংস্কৃতিক বিপ্লব হল শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরে বুর্জোয়া ও ও অন্যান্য শোষণকারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণীর এক ধরনের রাজনৈতিক বিপ্লব। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমেই বুর্জোয়া ও আমলাতান্ত্রিক ধ্যানধারণার ধ্বংস হয়, শহর ও গ্রামের পার্থক্য বিলুপ্ত হয়, ব্যাপক জনগণের সাংস্কৃতিক মান উন্নত হয়, দৈনন্দিন শিক্ষায় জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পৃক্ত হয়, তত্ত্বের সঙ্গে শ্রমের সংযুক্তি ঘটে এবং ক্ষুধা, লোভ, অজ্ঞানতা ও ধনতান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্ত আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিবেদিত একটি নতুন প্রজন্মের জন্ম হয়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব কাকে বলে

সাংস্কৃতিক বিপ্লব একটা কঠিন এবং দীর্ঘ পদ্ধতি। মাওয়ের ভাষায় বলা যায়ঃ যখন খাদ্য খাওয়া হয় তখন মানুষ এক এক গ্রাস করেই খায় এবং আর একটি গ্রাস মুখে তোলার আগেই প্রতিটি গ্রাসের স্বাদ আস্বাদনের জন্য তার সময় প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবকেও স্তরে স্তরে পথ অতিক্রম করতে হবে, একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়েছে—ভবিষ্যতে আরও অনেক সাংস্কৃতিক বিপ্লব হবে।

এবার আমরা চীনের মহান্ সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পটভূমিকা তুলে ধরছি।

ক. আদর্শগত বিরোধ : পরস্পর বিরোধী দুটি লাইনের মধ্যে সংগ্রাম

লেনিন বলেছেন যে, কোন দেশে সর্বহারা বিপ্লবের দ্বারা শোষণ বন্ধ হলেও শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয় না। এমনকি ধনতন্ত্রের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনাও নিঃশেষ হয় না। ঐ সময়ে এক নয়া-বুর্জোয়া শ্রেণী গোপনে সংগঠিত হয় এবং আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট হয়। স্তালিনের মতে, আমলাতান্ত্রিক উপাদান শুধুমাত্র সরকারের মধ্যেই থাকে না, তা পার্টি, সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন্, সমবায় এবং অন্যান্য সংস্থায়ও দেখা দিতে পারে।[১] লেনিন মনে করতেন যে, শুধুমাত্র বক্তৃতা দিয়ে আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটানো যায় না—আমলাতন্ত্রের অপসারণের জন্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম প্রয়োজন। আর্থনীতিক ভিত এবং আদর্শগত উপরি-কাঠামো উভয় ক্ষেত্রেই ঐ সংগ্রামকে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। অর্থাৎ জনগণের সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন ঘটিয়ে সরকারী কাজকর্মের সবস্তরে জনগণের অংশ গ্রহণকে নিশ্চিত করাই আমলাতান্ত্রিক জটাজাল থেকে মুক্তি লাভের উপায় এবং এ জন্যই প্রয়োজন সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব যা বুর্জোয়া সংস্কৃতি থেকে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে রক্ষণ ও প্রসারিত করবে। উপরোক্ত কারণে চীনেও সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল।

আমলাতান্ত্রিক উপাদান

কিন্তু লিউ সাও-চি ও তাঁর সমর্থকেরা নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা মনে করতেন যে, চীনে ধনতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা নেই, এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে চীনে অপরিহার্য মনে করেননি। বলা বাহুল্য সর্বত্র আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের অনুপ্রবেশকেও তাঁরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে মাও-এর সাথে লিও সাও-চি এবং তাঁর অনুগামীদের একটি মৌল আদর্শগত মতবিরোধ প্রবল হয়ে দেখা দেয়।

আমলাতন্ত্র সম্পর্কে মত পার্থক্য

মাও-এর "সামনের দিকে বৃহৎ পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়া" (Great Leap Forward) আন্দোলন ব্যর্থ হয় এবং ১৯৫৯-৬১ সালে চীনে এক আর্থনীতিক সংকট দেখা দেয়। ঐ সময় থেকে লিউ সাও-চি এবং তাঁর অনুগামীরা কার্যত মাও-এর চিন্তাধারার প্রচ্ছন্ন বিরোধিতা শুরু করেন। তাঁরা আর্থনীতিকে মানুষের উপরে স্থান দিতেন এবং মনে করতেন যে 'বৈষয়িক উত্তেজক' (material incentives) দিয়ে মানুষের উদ্যোগকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। সমাজতন্ত্রকে জয়ী করার জন্য মানুষের মনে আন্তরিক প্রেরণা সৃষ্টির কোন প্রয়োজনীয়তা বা এর কোন ভূমিকা আছে কিনা সে বিষয়ে তাঁদের সংশয় ছিল। অর্থাৎ নৈতিক প্রেরণা দিয়ে যেখানে মাও দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন, সেখানে তাঁরা আর্থনীতিক প্রেরণাকে সবচেয়ে ওপরে স্থান দিতে চান। তাই রাজনীতি অপেক্ষা অর্থনীতি

নৈতিক বনাম অর্থনৈতিক প্রেরণা

রাজনীতি বনাম অর্থনীতি

---

১. From Marx to Mao Tse Tung—George Thomson.

তাঁদের কাছে অগ্রাধিকার পায়। কিন্তু মাও সর্বদাই অর্থনীতির উপরে রাজনীতিকে স্থান দিয়েছিলেন।

মাও সরকারী কাজে পেশাগত বা বৃত্তিগত গোষ্ঠী গঠন এবং বিশেষীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। এমনকি তিনি সৈন্যবাহিনীতেও কোন স্তর (Rank) গঠনের বিরোধী ছিলেন। মাও মনে করতেন যে, এর ফলে এক সুবিধাভোগী শ্রেণী গড়ে ওঠে এবং আমলাতান্ত্রিক শ্রেণীর জন্ম হয়। কিন্তু লিউ সাও-চি ও তাঁর অনুগামীরা পেশাগত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গঠন করতে চান—যার ফলশ্রুতি হল এক নতুন আমলা শ্রেণীর জন্ম।

পেশাগত-গোষ্ঠী সংক্রান্ত মতবিরোধ

মাও চীনে আরও বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন জনগণকে উদ্যোগ গ্রহণে ও নব নব আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করা, শহরের লোকদের গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে শেখার জন্য গ্রামে পাঠানো এবং শ্রমিকদের কাছ থেকে শেখার জন্য কৃষকদের শহরে আনা; জনসংখ্যার সত্তর থেকে আশী শতাংশ কৃষকদের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দেয়া, শ্রম দিয়ে মূলধন সৃষ্টি করা এবং কৃষকেরা নিজেরাই যাতে তা সমষ্টিগতভাবে বিনিয়োগ করতে পারে সে অবস্থা সৃষ্টি করা। কিন্তু লিউ সাও-চি ও তাঁর সমর্থকেরা বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়াই উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলতেন, বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করে প্রযুক্তির উন্নতির কথা বলতেন, প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য রাজনীতিকে অর্থনীতির শাসনে রাখতে চাইতেন। তাঁরা গ্রামাঞ্চলের বদলে শহরকেই আনুকূল্য দেখাবার চেষ্টা করতেন।

বিকেন্দ্রীকরণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও শহর-গ্রাম প্রশ্ন মতবিরোধ

মাও মনে করতেন যে, সোভিয়েত পার্টি সংশোধনবাদের পথে, ধনতন্ত্রের পথে অগ্রসর হচ্ছে। সেখানে আমলতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী অংশটি একটি নতুন শ্রেণী সৃষ্টি করছে এবং শ্রম ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরকারী কর্মচারীসুলভ আমলাবাহিনী সৃষ্টি করছে। সুতরাং সোভিয়েত পার্টির সাথে সমঝোতার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মাও মনে করতেন না। কিন্তু লিউ সাও-চি, পেং চেন ইত্যাদি চেয়েছিলেন চীন-সোভিয়েত বিরোধিতার সমঝোতা।

সোভিয়েতের সাথে সমঝোতার ব্যাপারে মতবিরোধ

এডগার স্নো বলেছেন যে, আরও অসংখ্য ছোট ছোট বিষয় ও নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে মাও এবং লিউ-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল।[১] তাঁর মতে, প্রথম থেকে (১৯২১ সাল) এরা দুজনে 'দুটি লাইনের' প্রতিনিধিত্ব করতেন। চীনের সর্বহারা-সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে তিনি মাও এবং লিউ-এর পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে পার্টির মধ্যে অবৈরিতামূলক দ্বন্দ্বগুলির ক্রমান্বয়ে বৈরিতামূলক দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হওয়ার ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে মাও-লিউ সংগ্রাম ছিল প্রধানত ব্যক্তি পূজার ভূমিকাসহ বহুব্যাপ্ত চীন বিপ্লবের ভাগ্যের সঙ্গে বিজড়িত পন্থা ও লক্ষ্য নিয়ে আপস মীমাংসার অসাধ্য মতপার্থক্যগুলি।

১. China's Long Revolution—Edgar Snow.

খ. সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তাৎক্ষণিক পটভূমিকা

চীনের মহান্ সর্বহারা-সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য ঐ বিপ্লবের তাৎক্ষণিক পটভূমিকা বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

পিকিং-এর অন্যতম ডেপুটি মেয়র ছিলেন উ-হান। তিনি মিঙ্ রাজবংশের আমলের 'হাই জুই' নামক এক আমলা সম্পর্কে দুটি নাটক লেখেন। উ-হানের মতে হাই জুই ছিলেন দৃঢ়চেতা এবং তিনি সম্রাটকে পর্যন্ত সমালোচনা করতেন এবং এজন্য তাকে পদচ্যুত করা হয়। উ-হান-এর লেখা নাটক দুটির নাম "হাই জুই সরকারকে তিরস্কার করেন" এবং "হাই জুই দপ্তর থেকে বরখাস্ত হলেন"। ১৯৬১ সালে নাটক দুটি প্রকাশিত হয়। প্রচার বিভাগের অধিকর্তা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ইত্যাদি কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সমর্থন ও সহযোগিতায় উ-হান কয়েকটি প্রবন্ধও প্রকাশ করেন। নির্দোষ কাহিনীর মাধ্যমে উ-হান সচেতনভাবে মাও-এর চিন্তা ও নীতির বিরোধিতা ঐ সকল নাটক ও লেখার মধ্য দিয়া চালাতে থাকেন। ১৯৫৯ সালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পেং তে-হুয়াইকে অপসারণ করে লিন পিয়াওকে ঐ পদে আনা হয়। ঐ ঘটনাকে বিদ্রূপ করে মাও-এর বিরোধিতা করা হয় দ্বিতীয় নাটকটির মধ্য দিয়ে। উ-হান-এর এ ধরনের কাজকর্মের পেছনে পিকিং-এর মেয়র পেং চেন-এর সক্রিয় সমর্থন ছিল। ১৯৬৫ সালে মাও-এর অনুপস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গোপনে পেং চেনের অধীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। ঐ সময়ে পার্টির অনেক স্তরেই মাও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এমনকি এ সময়ে মাও-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলসহ লেখাগুলিও প্রচার দপ্তর থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়। বরং পেং চেন একটি টেলিগ্রাফ মারফত উ-হানের দোষকে 'তত্ত্বগত ভুল' মাত্র বলে দেখবার জন্য পার্টি শাখাগুলিকে নির্দেশ দেন। পার্টির চেয়ারম্যান মাও-এর অজ্ঞাতে মাও-বিরোধী শক্তি দ্রুতগতিতে মাও-এর বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালাতে থাকে। ঐ সময়ে মাও উত্তর চীনে একজন বুদ্ধিজীবীকেও খুঁজে পাননি যিনি উহানের বিরোধিতায় এগিয়ে আসতে প্রস্তুত।

অবশেষে ইয়াও ওয়েন-উয়ান নামক একজন লেখক উ-হান-এর মতাদর্শগত মারাত্মক ত্রুটির সমালোচনা করে একটি লেখা প্রস্তুত করেন। পিকিং-এর পার্টির প্রচার দপ্তর ঐ লেখা ছাপতে অস্বীকার করে, তাই লেখাটি সাংহাই-তে প্রকাশ করা হয়। মাও-বিরোধী প্রচার অভিযানের পেছনে লিউ সাও-চি-এর নীরব সমর্থন আছে বলে মনে করা হয়। ১৯৬১ সালের শরৎকাল থেকে মাও জনগণের দৃষ্টির অগোচরে চলে যান। বাস্তবে ঐ সময় তিনি দক্ষিণ চীনে ব্যাপকভাবে ঘুরে আসন্ন মতাদর্শগত সংগ্রামে সঠিক জনমত গঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৬৬ সালের ১৬ই মে মাও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বিশেষ সভা আহ্বান করে। ঐ সভায় পিকিং-এর মেয়র পেং চেন-কে 'সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ও সরকারে অনুপ্রবেশকারী বুর্জোয়া প্রতিনিধি' বলে ঘোষণা করা হয়। ঐ সময়ে মাও একটি বড় হরফের পোস্টার লেখেন ঃ "সদর দপ্তরে কামান দাগো"। সকলেই বুঝতে পারে যে সদর দপ্তর বলতে লিউ সাউ-চি'কে বোঝান হয়েছে। জুন মাসে পার্টির সরকারী মুখপাত্র 'পিপলস্ ডেইলি' এবং পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা 'হুং-চি'র দায়িত্ব সেনাবাহিনীর

হাতে অর্পণ করা হয়। ৫ই আগস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ১৬ দফা কর্মসূচী গৃহীত হয় এবং লিউ সাও-চি-কে পার্টির দ্বিতীয় স্থান থেকে অষ্টম স্থানে নামানো হয়। পেং-চেনকে অপসারণ করে লিং সুয়ে-ফেং-এর নেতৃত্বে পিকিং পার্টিকে পুনর্গঠিত করা হয়। পেং চেনকে পার্টির সকল পদ থেকে অপসারণ করা হয়। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের লু পিং ও পেং পেই-ওয়ানকে বরখাস্ত করা হয়। 'পার্টি বিরোধী কালো লাইন' নিশ্চিহ্ন করার জন্য 'সুতীব্র শ্রেণী সংগ্রাম' ঘোষিত হয় এবং শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, রঙ্গমঞ্চ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সর্বহারার মতাদর্শ প্রচারের জন্য মহান্ সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা ঘটে।

৫-২. সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কারণ
Causes of the Cultural Revolution

আগের আলোচনার ভিত্তিতে এবার আমরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কারণগুলিকে নির্দেশ করতে পারি।

১. চীনে কমিউনিস্ট পার্টি, সরকারী বিভাগ, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় এবং এমনকি সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠে। বুর্জোয়া ভাবধারায় পুষ্ট ব্যক্তিরা আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দ্বারা চীনের চারিদিকে নিজেদের আদর্শ ও চিন্তাকে ছড়িয়ে দিতে থাকে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মার্কসীয় নীতিকে বিসর্জন দিয়ে কেন্দ্রিকতার নীতি প্রাধান্য লাভ করে। এ অবস্থার মোকাবিলার জন্য জনগণের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের দ্বারা সবস্তরে তাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন ছিল।

২. চীনে আর্থনীতিকে রাজনীতির ওপরে স্থান দেবার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। জনগণের উদ্যোগ সৃষ্টির জন্য সমাজতন্ত্রকে জয়ী করার আন্তরিকতা সৃষ্টির বদলে তাদের বৈষয়িক পুরস্কারের দ্বারা উৎসাহিত করার বুর্জোয়া প্রচেষ্টা শুরু হয়। অর্থনীতি মানুষের উপরে স্থান পায় এবং নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেরণার বদলে আর্থনীতিক প্রেরণাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৩. সরকারী কাজে পেশাগত গোষ্ঠী, বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী ইত্যাদি গঠনের প্রবণতা দেখা দেয়। এরা একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয়। জনগণকে বাদ দিয়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রযুক্তির উন্নতির চেষ্টা চলে। চীনের সব জায়গাতেই আমলাতান্ত্রিক ও সুবিধাভোগী মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

৪. সৈন্যবাহিনীর মধ্যে র‍্যাঙ্ক প্রথা চালু হবার জন্য সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয় এবং উপরতলায় আমলাতান্ত্রিক মনোভাব আত্মপ্রকাশ করে। এর ফলে সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ব্যবধান ও দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে দেখা দেয় এবং সৈন্যবাহিনী জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

৫. পিকিং সহ চীনের উত্তরাঞ্চলে পার্টির মধ্যে বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের অনুপ্রবেশ ঘটে। এমনকি সরকারের প্রচার দপ্তরও এদের কর্তৃত্বে চলে যায়। ফলে এরা পার্টি ও প্রচার দপ্তরকে সংশোধনবাদী ও বুর্জোয়া রাজনীতি প্রচারের জন্য ব্যবহার করে এবং পার্টির চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারা ও শিক্ষার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা শুরু করে।

৬. শিক্ষাক্ষেত্রে চরম প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা কায়েম করা হয়। পশ্চিমী ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জীবনের যোগকে

বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং কায়িক শ্রমকে সাথে শিক্ষার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা হয়। পুরোনো আমলের চিন্তা-ভাবনা ও রীতি-নীতি শিক্ষা ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে। ফলে ঐ কেতাবী শিক্ষাব্যবস্থা জনগণের মধ্যে নতুন সমাজ গড়ার প্রেরণা সৃষ্টির বদলে একটা বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এককথায় সর্বহারার রাজনীতি, শ্রম, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিক্ষাব্যবস্থা বুর্জোয়া ভাবধারায় বাহক হয়ে ওঠে। শুধু শিক্ষা নয়, শিল্প, সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বুর্জোয়া ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটে।

৭. চীনের বর্তমান প্রজন্ম প্রলেতরীয় উত্তরাধিকার থেকে দূরে সরতে থাকে—চীনের বিপ্লব ও তার জন্য দুঃখ, কষ্ট ও আত্মত্যাগের ঘটনা তাঁরা বিস্মৃত হতে থাকে। কায়িক পরিশ্রমের প্রতি অনীহা, শহরের প্রতি আকর্ষণ, ভোগ-বিলাসের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একটাই পথ খোলা ছিল—নিছক বক্তৃতা নয়, হুকুম বা নির্দেশ নয়, মহান্ সর্বহারা-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে সর্বহারা সংস্কৃতি দ্বারা দীক্ষিত করা।

৩-৩. সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচী
Programme of Cultural Revolution

১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে মহান্ সর্বহারা-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ১৬ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

১. একটি রাজনৈতিক শক্তিকে উৎপাটিত করতে হলে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন জনমত সৃষ্টি করা। বুর্জোয়ারা যদিও উৎসাদিত হয়েছে, কিন্তু তারা পুরানো ভাবধারা, সংস্কৃতি ও অভ্যাসের দ্বারা জনগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সর্বহারা শ্রেণীকে বুর্জোয়া ও অন্যান্য শোষক শ্রেণীর আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং নতুন ভাবধারা ও সংস্কৃতি দ্বারা সমাজের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে।

খ. সাংস্কৃতিক বিপ্লব যেহেতু একটা বিপ্লব, তাই তা নিশ্চিতভাবে প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বহুব্যাপ্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লব অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে।

৩. সাংস্কৃতিক বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনায় চার শ্রেণীর লোক আছে: ১. ধৈর্যশীল নির্ভিক লড়িয়ে কমিউনিস্ট, ২. অযোগ্য ও দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি, ৩. অতীতে ভুলচুক করেছে এমন কিছু ব্যক্তি, ৪. ধনতান্ত্রিক পথ ধরেছে এমন সব ব্যক্তি। পার্টি প্রত্যাশা করে প্রথম স্তরের কাছে সঠিক নেতৃত্ব, দ্বিতীয় স্তরের কাছে নির্ভুল ও যোগ্য নেতৃত্ব, তৃতীয় স্তরের কাছে ভুল শুধরানো এবং চতুর্থ স্তরকে নেতৃত্বের আসন থেকে বিতাড়ন করা।

৪. জনগণকে বিশ্বাস করো, তাদের উপর আস্থা রাখো এবং তাদের উদ্যোগ গ্রহণকে শ্রদ্ধা করো।

৫. কে আমাদের শত্রু এবং কে আমাদের বন্ধু তা ঠিক করা, তাদের চিহ্নিত করা এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য করা।

৬. জনগণের মধ্যকার দ্বন্দ্বগুলি এবং শত্রুর মধ্যকার দ্বন্দ্বগুলিকে পার্থক্য করতে হবে এবং বিতর্কের মধ্য দিয়ে জনগণকে সঠিক মতে পেঁছিতে হবে।

৭. পার্টি-বিরোধী ও সমাজতন্ত্র বিরোধী লোকদের সম্পর্কে সাবধান হতে হবে এবং তাদের চাতুরী প্রকাশ্যে তুলে ধরতে হবে। জনগণের নিজেদের মধ্যে বা ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক লড়াই লাগাবার প্রচেষ্টা দূর করতে হবে।

৮. পার্টির কর্মীদের চারভাগে সাজিয়ে (১. ভাল, ২. মোটামুটি ভাল, ৩. ভুল করেছে কিন্তু পার্টি-বিরোধী নয়, ৪. পার্টি-বিরোধী ও সমাজতন্ত্র বিরোধী) পার্টি ও সমাজতন্ত্র বিরোধীদের ওপর আঘাত হানতে হবে।

৯. সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে সব বিপ্লবী গ্রুপ, কমিটি, কংগ্রেস গড়ে উঠেছে সেগুলি হল বিপ্লবের ক্ষমতা পরিচালনা সংস্থা এবং এগুলি হল জনগণের স্থায়ী জীবন্ত সংগঠন।

১০. সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকর্ম হল শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন। শিক্ষাব্যবস্থার পুরোনো নীতিকে পরিবর্তন করা, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের আধিপত্য থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করা এবং শিক্ষাকে উৎপাদন-শ্রমের সাথে যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ করা।

১১. সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গণ-সংগ্রামে বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার তীব্র সমালোচনা করার সাথে সাথে প্রলেতারীয় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে-তুং-চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিতে হবে।

১২. দেশব্রতী বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্‌ ও শ্রম-কর্মীদের ক্ষেত্রে "ঐক্য-সমালোচনা-ঐক্য"—এই নীতি প্রয়োগ করতে হবে।

১৩. শহর ও গ্রামাঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আন্দোলনকে ঘনিষ্ঠতর করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১৪. বহুব্যাপ্ত সর্বহারা-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য হল জনগণের চিন্তা ও চেতনাকে বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনায় পরিণত করা ও জনগণকে উদ্দীপ্ত করে তোলা।

১৫. সামরিক বাহিনীর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও সামাজিক শিক্ষা আন্দোলন পরিচালিত হবে কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ সামরিক কমিশন ও গণমুক্তি ফৌজের সাধারণ রাজনৈতিক বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী।

১৬. সাংস্কৃতিক বিপ্লবে মাও সে-তুং-এর মহান্‌ লাল পতাকা তুলে ধরতে হবে এবং সকলশ্রেণীর জনগণের মধ্যে মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিতে হবে।

৩-৪. সর্বহারা-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা এবং এর বিভিন্ন স্তর
Beginning of Cultural Revolution and its Different Stages

১৯৩৫ সাল থেকে মাও সে-তুং কার্যত চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন, যদিও ১৯৪৩ সালে তিনি পার্টির প্রধান হিসাবে মনোনীত হন। ১৯৫৯ সালে পেঙ্‌তে হুনাই'র স্থানে লিন পিয়াওকে সামরিক দপ্তরের দায়িত্ব দিবার পর থেকেই মাও-এর বিরোধী শক্তি দানা বেধে ওঠে। ঐ সময়ে বৃহৎ পদক্ষেপে অগ্রসর হবার নীতি (Great Leap Forward) ব্যর্থ হওয়ায় এবং প্রাকৃতিক কারণে কৃষিজাত উৎপাদন হ্রাস

পাওয়ায় সব ব্যর্থতার বোঝা মাও-এর উপর চাপিয়ে তার বিরোধী শক্তি মাও-বিরোধী প্রচার অভিযানকে শক্তিশালী করে। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন অধ্যাপক সহ শিক্ষাব্যবস্থার সাথে জড়িত কিছু বুদ্ধিজীবী মাওয়ের চিন্তাধারার বিরোধিতা শুরু করেন। এককথায় দেশে সংশোধনবাদী তৎপরতা শুরু হয়।

ঐ পটভূমিকায় মাও চীনে সর্বহারা-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালে মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলনের (Socialist Education Movement) প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং ঐ আন্দোলনকে প্রসারিত করা হয়। কৃষকদের জীবনের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় স্থাপন ও তাদের সাথে সহধর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য এ সময়ে মাও এর নির্দেশে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে গ্রামে পাঠানো হয় এবং মাও-এর রচনাবলীর ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু করা হয়। বস্তুত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রথম পর্বের শুরু হয় ঐ সময়ে। ডি. জে. ওয়ালার (D. J. Waller) যথার্থই বলেছেন যে, সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলনই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্বসূরী এবং তৎকালীন "অস্বাস্থ্যকর প্রবণতা" থেকে মুক্তির জন্য এর সূত্রপাত ঘটেছিল।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্বসূরী

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাবে পল্লী অঞ্চলে সুফল পাওয়া গেলেও শহর অঞ্চলে সমাজতন্ত্র বিরোধী সংশোধনবাদী শক্তি নিজেদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখে। ১৯৬৪ সালে মাও এক ব্যাপক সংশোধন আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু শহরের বুদ্ধিজীবী, প্রচার দপ্তরের নেতৃবৃন্দ, সাংস্কৃতিক জগতের কিছু ব্যক্তি, পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, পরিচালক এবং সর্বোপরি গণমুক্তি ফৌজের একটা অংশের সংশোধনবাদী রাজনীতির জন্য ঐ সব আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

শহরাঞ্চলে সংশোধনবাদী তৎপরতা

পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য ১৯৬৫ সালের শেষদিকে কেন্দ্রীয় কমিটির এক গোপন অধিবেশনে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবী গোষ্ঠী (Cultural Revolutionary Group) গঠন করা হয়। পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট ঐ গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেয়া হয় পিকিং-এর মেয়র পেং-চেন'কে। চীনের বুদ্ধিজীবি সমাজ, দলের প্রচারযন্ত্র এবং সংশোধনবাদী অংশের বিরুদ্ধে এ বিপ্লব পরিচালিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবী গোষ্ঠী

কিন্তু ঐ বছরেই মাওয়ের বিরুদ্ধে সংশোধনবাদী আক্রমণ তীব্র হয়ে ওঠে। দুটি নাটক ও কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে উ হান মাওয়ের চিন্তাধারা ও কাজকর্মকে তীব্র আক্রমণ করেন। পার্টির প্রচার দপ্তর মাও বিরোধী প্রচারে অংশগ্রহণ করে এবং এমনকি মাওয়ের লেখা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দলিল ছাপাতে অস্বীকার করে। পেং-চেন ঐ সকল সংশোধনবাদী কার্যকলাপকে এবং উ হান-এর অপরাধকে নিছক তত্ত্বগত ভুল বলে দেখাবার চেষ্টা করেন। এ অবস্থায় মাও উপলব্ধি করেন যে, পার্টির উপরতলা সংশোধনবাদী ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে।

মাও-বিরোধী শক্তি সক্রিয়

১৯৬২ সালে মাও বলেন যে, একটি রাজনৈতিক ক্ষমতা উচ্ছেদ করতে হলে সবসময়ে এবং সবচেয়ে আগে প্রয়োজন হয় জনমত গঠন করার। এ উদ্দেশ্যে ঐ বৎসরের শরৎকাল থেকে মাও প্রকাশ্য দৃষ্টির অগোচরে চলে গিয়ে জনমত গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ে মাও সাংহাইতে নবীন এবং ভবিষ্যতের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অগ্রগামী বিদ্রোহী পার্টি সদস্যদের সাথে কথাবার্তা বলেন। এ সময়ে তিনি দক্ষিণ চীন ভ্রমণ করেন এবং নির্দেশ প্রচার করেন। ইতিমধ্যে পেং-চেনকে অপসারিত করে মাও একটি সাংস্কৃতিক পার্টি গোষ্ঠী গঠন করেন। ১৯৬৬ সালের ১৬ই মে কেন্দ্রীয় কমিটিতে পেং-তেকে প্রতি বিপ্লবী বলে ঘোষণা করা হয় এবং এডগার স্নো-এর ভাষায় বলা যায় ঐ সময় থেকেই চীনে বন্দুক ছাড়া গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

মাও কর্তৃক জনমত সৃষ্টি

বন্দুকহীন গৃহযুদ্ধ শুরু

ঝড় যখন খুবই উচ্চগ্রামে তখন মাও সে-তুং ১৬ই জুন নাটকীয়ভাবে সাঁতার দিয়ে ইয়াংসি নদী পার হলেন এবং তার পরে বিজয়ীর মতো পিকিং-এ ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে মাও এর বিপ্লবী গোষ্ঠীর সদস্যরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজে নেমে পড়েন। তাঁরা পার্টি সংগঠনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, সমস্ত ক্লাস বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়, নেতৃত্বের বিরুদ্ধে খোলাখুলি আক্রমণ শুরু করে এবং কর্তৃত্বকে আক্রমণ করে প্রচার পত্র টাঙ্গায়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রথম একটি স্তর

লালরক্ষীদের (Red Guards) উদ্ভব ও আক্রমণের কেন্দ্র ছিল পিকিং বিশ্ব-বিদ্যালয়। হয়তো লালরক্ষীদের আক্রমণটা খুব একটা পরিকল্পিত নয়, কিন্তু মাও এদের সুপ্ত ক্ষমতাটাকে বুঝতে পেরেছিলেন এবং মাও-এর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে লালরক্ষীরা চীনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এর পর মাও জুন মাসে প্রকাশ্যে লালরক্ষীদের প্রশংসা করেন এবং এর পরেই শুরু হয় সারা দেশ জুড়ে লালরক্ষীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিস্ফোরণ। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে মহান্ সর্বহারা বিপ্লবের কর্মধারা গৃহীত হয়। ঐ দিন মাও নিজের হাতে বড় পোস্টার লেখেন: "সদর দপ্তরে কামান দাগো।"

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিস্ফোরণ

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঐ মাসগুলিতে বিপ্লব ক্রমশ এক স্তর থেকে অন্যস্তরে এগিয়ে যায় এবং তার সাথে সংগতি রেখে ছাত্র, যুব সম্প্রদায় পুরাতন কাঠামো চূর্ণবিচূর্ণ করে অগ্রসর হতে থাকে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষ্য সাধনের জন্য মাও পার্টিকেই ভেঙ্গে দেয়ার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। শুরুতে সামান্য কয়েকজনকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের ইচ্ছা থাকলেও পরে অনেক প্রবীণ নেতা এবং এমনকি মাও-র ঘনিষ্ঠ সহচরদের দিকে হাত বাড়ান হয়। ১৯৫৯ সাল থেকে মাও-র উত্তরাধিকারী এবং চীন গণসাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান লিউ সাও-চিকে দ্বিতীয় স্থান থেকে অষ্টম স্থানে নামিয়ে দেয়া হয়। ঘটনা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। পার্টি কমিটিগুলি এবং পার্টির যুব ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে ভেঙ্গে দেয়া হয়, স্কুলগুলি বন্ধ করা হয়, লালরক্ষী বাহিনী গড়ার জন্য লক্ষ লক্ষ অ-পার্টি যুবককে পার্টির সদস্য ও নেতাদের উৎখাতে নিয়োগ করা হয়। ক্রমে মতাদর্শগত বিরোধ এক ব্যাপক গৃহযুদ্ধের রূপ গ্রহণ করে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মাও যে চিন্তাধারা 'রোপণ' করতে চেয়েছিলেন তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। মাও-এর চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু অংশকে সংকলিত করে ঐ সময়ে একটি 'লালবই' (Red Book)-এর পকেট সংস্করণ বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করে। "লাল বই-"এর ঐ পকেট সংস্করণটি প্রতিটি বিপ্লবী ও প্রতিটি সৈনিকের সাথে থাকতো এবং এর উদ্ধৃতিগুলি তাঁরা মুখস্থ করত। ছাত্র, যুবক, সৈন্য, কৃষক সকলের কাছে ঐ বইটি বেদ হিসেবে পরিচিত ছিল এবং অবশেষে গোটা চীনে 'লাল বই'-এর বন্যা শুরু হয়। চীনে কোটি কোটি 'লাল বই' প্রচারিত হয় এবং পৃথিবীর সকল উল্লেখযোগ্য ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এ বইয়ে "জনগণের সেবা কর," 'নর্মান বেথুন-এর স্মরণে' এবং "বোকা বুড়ো যে পাহাড় সরিয়েছিল" তিনটি প্রবন্ধে অত্যন্ত সহজ ভাষায় মাওয়ের শিক্ষা পাঠকের মনে গেঁথে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

লালবই

যাহোক, ছোটখাটো সংঘর্ষ, কোথাও বাড়াবাড়ি, কোথাও পুরোনো কাঠামোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সাংস্কৃতিক বিপ্লব উত্তাল গতিতে অগ্রসর হয়। মাও মনে করেছিলেন যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লব শেষ হতে এক বছর লাগবে, কিন্তু তা তিন বছরের কিছু বেশী সময় চলেছিল। যে পার্টি একদা মাও নিজে গড়ে তুলেছিলেন তার বিরুদ্ধে মাও-এরই নেতৃত্বে যে গণবিদ্রোহ ঘটল—সে বিদ্রোহের বিশাল আক্রমণের বিরুদ্ধে পার্টি যন্ত্রের প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এক বিস্ময়কর ঘটনা বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৬৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিতাড়ন পর্ব চলে। ঐ বিতাড়ন পর্বের মধ্যেও যাঁরা টিকে থাকলেন সে সকল জীবনরস ধারকদের (Surviving Protoplasm) নিয়ে এবং এদের সাথে নতুন রক্ত সংযুক্ত করে নবমপার্টি কংগ্রেসে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হওয়া পর্যন্ত মহান্ সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব পর্ব চলে।

৩-৫. সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রভাব ও মূল্যায়ন
Impact and Evaluation of Cultural Revolution

মহান্ সর্বহারা-সাংস্কৃতিক বিপ্লব একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। চীনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এ বিপ্লবের প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমকালীন প্রজন্মের কাছে চীনের বিপ্লব ও এর জন্য আত্মত্যাগের ঘটনা একটা অতীত কাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। ফলে সমাজের সর্বস্তরে একটা বিশৃংখলা ও সুবিধাভোগী মনোবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লব এক অভূতপূর্ব গণজাগরণের মধ্য দিয়ে দুর্নীতি, সুবিধাভোগ ইত্যাদির শিকড় ধরে টান মেরে একে সমূলে উৎসাদিত করে।

চীনে বুর্জোয়া শ্রেণী পরাজিত হলেও সেখানে এক নতুন বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে আমলাতন্ত্রের মধ্য দিয়ে ঐ বুর্জোয়া ভাবধারার ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। পার্টি, সমবায়, সরকার, সৈন্যবাহিনী সবস্তরেই আমলাতান্ত্রিক প্রবণতার দ্রুত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের

দ্বারা বুর্জোয়া ভাবধারা ও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতাকে সাময়িকভাবে হলেও ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছিল।

সংশোধনবাদী চিন্তা ও রাজনীতি পার্টিযন্ত্রকে দখল করে মাওবাদী চিন্তা ও ভাবধারার বিরোধিতা করে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব এক মতাদর্শগত আন্দোলন পরিচালনার দ্বারা সংশোধনবাদের মুখোশ খুলে দেয়, সংশোধনবাদীদের সমাজতন্ত্র-বিরোধী ভূমিকা তুলে ধরে এবং জনজীবনে মাও-এর চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দেয়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে মাও'র একটা লক্ষ্য ছিল শাসন পরিচালনার কাঠামোটিকে সহজ করে তোলা এবং একই কাজ বারবার না করা। এডনার স্নো-র কাছে চৌ এন-লাই জানান যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরে কেন্দ্রীয় সরকারের নব্বুইটি বিভাগের পরিবর্তে ছাব্বিশটি বিভাগ করা হয় এবং ঐ সবগুলিরই পরিচালক হল বিপ্লবী কমিটি। উপপ্রধান মন্ত্রীর সংখ্যা সাত থেকে দুজন করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সংখ্যা ষাট হাজার থেকে দশ হাজার করা হয়। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় কাজকে স্থানীয় ব্যবস্থাপনার অধীনে এনে ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ নীতি চালু করা হয়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক ও প্রাপ্তবয়স্করা শহর ছেড়ে কমিউনে চাকরি নিয়ে চলে যায়। এক সাংহাই থেকে ১০ লক্ষ লোক গ্রামে চলে যায়। লক্ষ লক্ষ লালরক্ষী গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। শুধুমাত্র অধিকাঠামোর সংস্কার নয়. সাংস্কৃতিক বিপ্লব মাওয়ের চিন্তাধারাকে সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় যার ফলে সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া ঐতিহ্যের আধিপত্য থেকে মুক্ত এক নতুন সর্বহারা সংস্কৃতি গড়ে উঠে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রভাবে ১৯৭০ সাল নাগাদ মাও'র চিন্তাধারা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামাঞ্চল ও শহরের মধ্যে পার্থক্য মুছে ফেলার কাজ ত্বরান্বিত করা হয়। সর্বশ্রেণীর মানুষের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন এবং সুযোগ-সুবিধার সমতা সৃষ্টির কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়, শিক্ষার সাথে জীবনের অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করা হয়, বুদ্ধিজীবী ও আমলাদের বুর্জোয়া চিন্তাধারাকে ধ্বংস করা হয়, ছাত্র ও শ্রমিকদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে তত্ত্বের সাথে হাতে-কলমে শ্রম সংযুক্ত হয়ে শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় ভিত্তির উপর স্থাপন করা হয়, ছাত্র ও যুব সমাজকে সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এভাবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে চীনে একটি নতুন প্রজন্ম জন্মলাভ করে এবং সেখানকার রাজনৈতিক কাঠামো থেকে শুরু করে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি পর্যন্ত সবস্তরে মহান্ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের চিন্তাধারা পরিব্যাপ্ত হতে থাকে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল্যায়ন

মাও সে-তুং'র নেতৃত্বে পরিচালিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবির থেকে বিভিন্ন কারণে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ধনতান্ত্রিক শিবির থেকে

নেতৃত্ব রক্ষার সংগ্রাম

সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে পার্টি'র মধ্যে মাও সে-তুং'র নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার মরণপণ সংগ্রাম বলে অভিহিত করা হয়। তাদের মতে মাও-বিরোধীর সাথে মাও-এর ক্ষমতার দ্বন্দ্বই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল কথা।

এ বিরোধে জয়ী হবার জন্য মাও কমিউনিস্ট পার্টিকে পর্যন্ত ভাঙতে দ্বিধা করেননি। সাংস্কৃতিক বিপ্লব চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দুর্বলতাকেই স্পষ্ট করে তোলে।

২. সোভিয়েত নীতির সমর্থকেরা মনে করেন যে, পার্টির বিরুদ্ধে লালফৌজকে (Hung-Wei-Ping) লেলিয়ে দিয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে চীনে প্রকৃতপক্ষে প্রতিবিপ্লবী ক্ষমতা দখলের লড়াই অনুষ্ঠিত হয়। সাচ্চা কমিউনিস্টদের বিতাড়িত করে সৌখিন বিপ্লবীদের পুনর্বাসন দেয়াই এবং ব্যক্তিপূজার মনোভাব সৃষ্টি করাই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য।

প্রতিবিপ্লবী ক্ষমতা দখলের লড়াই

৩. চীনের বর্তমান নেতৃত্বের কার্যকলাপের প্রতি অসন্তুষ্ট কেউ কেউ মনে করেন যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লব সঠিক পদক্ষেপেই অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু পরে এর দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি ঘটে এবং ফলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দ্বারা অর্জিত সাফল্য ব্যর্থ হয়ে যায়।

দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি

উপরোক্ত সমালোচনাগুলির উত্তরে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমর্থকেরা বলেন যে, ঐ সময়ে চীনের পার্টি ও সরকারে বুর্জোয়া ও সংশোধনবাদী অনুপ্রবেশ এমন একটা স্তরে পৌঁছেছিল যে মাও সে-তুং-র নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক বিপ্লব একান্ত সময়োপযোগী এবং অপরিহার্য ছিল। ১৯৬০-৬১ সাল থেকেই ঐ অনুপ্রবেশের ফলে চীন সমাজতন্ত্রের পথ থেকে পশ্চাপদসরণ করতে আরম্ভ করে। ভারী শিল্পের স্থানে 'কৃষিকে সেবা করাকে' অগ্রাধিকার দেয়া হয়। খামার ও জমির মালিকানা পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হয়, শিল্পে বোনাস প্রথা ও বৈষয়িক উদ্দীপনার প্রবর্তন করা হয়, নতুন ধনী কৃষক বা কুলাক শ্রেণী গড়ে ওঠে, প্রয়োগবাদের মাধ্যমে সুবিধাবাদকে কায়েম করা হয়। অন্যদিকে পার্টির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে পার্টি সংগঠনকে ব্যবহার করা হয়। ঐ অবস্থা মোকাবিলায় মহান্ সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবই ছিল সঠিক পদক্ষেপ।

উপরোক্ত সমালোচনার উত্তরে মাওপন্থীরা

৪. সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কয়েকটি ব্যাপার সম্পর্কেও মাও সে-তুং'র নিজেরই অভিযোগ ছিল। এডগার স্নোকে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কয়েকটি বিষয় তাঁর খারাপ লেগেছে। একটি হল মিথ্যাচার, দ্বিতীয়টি হল: যা ছিল বিরোধ, পরে তা পরিণত হল উপদলীয় যুদ্ধে। মাও আরও বলেছেন, বিদেশীরা যখন রিপোর্ট করেন যে চীনে ভীষণ বিশৃঙ্খলা, তারা কিন্তু মিথ্যা বলেননি—সত্যই লড়াই চলেছিল। মাও'র তৃতীয় সমালোচনা হল বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার সম্পর্কে।

মাও'র সমালোচনা

৫. সুতরাং সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে বাড়াবাড়ি অভিযোগ খুব একটা ভিত্তিহীন নয়। অনেক লেখক, শিল্পী, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবীই ঐ বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছিলেন, যদিও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সকলেরই শাস্তি প্রাপ্য ছিল না। মাও-পন্থীরা অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলেন যে, বিপ্লব কোন ছন্দোবদ্ধ কবিতা নয়—বিপ্লবের পথ আঁকাবাঁকা—সহজ সরলভাবে স্রেফ পাল তুলে ভেসে চলা নয়। সুতরাং এ ধরনের একটা বিরাট কর্মযজ্ঞে ভুল-ত্রুটি হতেই পারে।

৬. সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে যে সমালোচনাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল পার্টি সংগঠনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ও পার্টি সংগঠনকে ভাঙ্গার জন্য পার্টি-বহির্ভূত এবং পার্টি নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত জনতাকে আহ্বান জানান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মত নয়। পার্টিতে মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার জন্য পার্টির মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম (Inner Party Struggle) চালাবার কথাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলে। অথচ পার্টির মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম চালাবার পরিবর্তে মাও পার্টি-বহির্ভূত যুবক এবং এককথায় লাল ফৌজকে পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল করেছিলেন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে। ফলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে এ পার্টি-বহির্ভূত ঐ শক্তি সরকারকে না হলেও সাময়িকভাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে ভেঙ্গে ফেলেছিল।

পার্টি বহির্ভূত শক্তি দ্বারা পার্টি ভাঙ্গা

এই সমালোচনার সম্পর্কে মাওপন্থীরা বলেন যে, পার্টিতে যখন বুর্জোয়া ও সংশোধনবাদী ভাবধারার ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সংশোধনের কোন উপায় থাকে না তখন সমস্যা সমাধানের জন্য জনগণের কাছে যাওয়াই (to the masses) সঠিক পন্থা এবং জনগণই ঐসকল অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করে পার্টিকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পথে পরিচালিত করতে পারে।

জনগণের কাছে যাওয়াই সঠিক পন্থা

এ সব সমালোচনা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, মহান্ সর্বহারা বিপ্লব ছিল একটি বহু ব্যাপ্ত, যুগান্তকারী এবং চীনের সমাজতান্ত্রিক বিকাশধারার একটি অপরিহার্য স্তর

উপসংহারের পরিবর্তে

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বর্তমান পর্যায়ের সফল পরিসমাপ্তির পরে চীনে আবার শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় লিউ-সাও-চিকে সরকারী পদ থেকে বিতাড়িত করা হয় এবং আনুষ্ঠানিক-ভাবে লালফৌজকে ভেঙ্গে দেয়া হয়। ১৯৬৯ সালে পার্টির নবম কংগ্রেসে পার্টির নতুন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং লিন পিয়াও একমাত্র ভাইস চেয়ারম্যান ও মাও সে-তুং-এর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষিত হন।

নবম কংগ্রেস

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় থেকেই পার্টি এবং সেনাবাহিনীতে লিন পিয়াও'র প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি পার্টি এবং সরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকেন। কিন্তু ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষণা করা হয় যে, মাও সে-তুংকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টার পরে লিন পিয়াও সোভিয়েত ইউনিয়নে পালিয়ে যাবার সময়ে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। সরকারীভাবে পরে জানান হয় যে, লিন পিয়াও মাও-র লাইনের বিরোধিতা করেন, পাল্টা পার্টি সংগঠন গড়ার জন্য সচেষ্ট হন এবং নাশকতামূলক কার্যকলাপ ও প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তে লিপ্ত হন। তিনি জনগণ অপেক্ষা সৈন্যবাহিনীকে এবং রাজনীতি অপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্রকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে মাও'র নীতির বিরোধিতা করেন।

লিন পিয়াও'র পতন ও মৃত্যু

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মত একটি পরিণত পার্টি এবং মাও'র মত একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা কি করে লিন পিয়াও-এর

মত একজন প্রতিবিপ্লবী এবং মাও-বিরোধী চক্রীকে ১৯৬৯ সালে ক্ষমতার শীর্ষে স্থাপন করেন এবং মাও'র উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন, যিনি অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের মাধ্যমে মাও'কে হত্যার পরিকল্পনা করেন ? এ সম্পর্কে সরকারী ভাষ্য হল যে, মাও'র সঙ্গে লিন পিয়াও-র রাজনৈতিক লাইনের বিরোধ নবম কংগ্রেসের আগে থেকেই চলছিল। কিন্তু লিন পিয়াও যাতে নিজের ভুলগুলি সংশোধন করতে পারে তার জন্য তাঁকে পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ দেয়া হয়েছিল।

এ সম্পর্কে সংশয়

যাহোক, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সফল পরিসমাপ্তির প্রায় সাথে সাথেই ঐ বিপ্লবের অন্যতম রূপকার লিন পিয়াও'র পতন এবং মৃত্যু ঘটে। কিছুদিন পরে ১৯৭৬ সালের প্রথমদিকে প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই এবং বিশেষ করে ঐ বছরের শেষের দিকে (৯ই সেপ্টেম্বর) মাও সে-তুং'র মৃত্যুর ফলে চীনে নতুন করে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। হুয়া কুয়ো ফেং যদিও কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান এবং প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন, কিন্তু মাও'র স্নেহধন্য পলিটব্যুরোর চারজন শীর্ষ নেতা এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিশিষ্ট রূপকার ওয়া-হু-ওয়েন, চাং চুং চিয়াও, ইয়াও ওয়েন-ইউয়ান এবং মাও পত্নী চিয়াং চিং—হুয়া কুয়ো-ফেং-এর নেতৃত্বাধীন সরকার ও পার্টির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। হুয়া এদের প্রতিবিপ্লবী গুপ্ত 'চার চক্রী' বলে অভিহিত করেন এবং অভিযোগ করেন যে ঐ 'চার চক্রী' চীনে এক প্রতিবিপ্লবী, সংশোধনবাদী দক্ষিণপন্থী লাইন অনুসরণে লিপ্ত এবং মাও'র নীতির বিরোধিতা করে তারা সংশোধন চক্রান্তের পথ অনুসরণ করছে। এও বলা হয় যে, মাও জীবিতকালেই ঐ 'চার চক্রী' সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ১২ই অক্টোবর ঐ 'চার চক্রী'কে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এদের বিচার চলে।

'চার-চক্রী' সংক্রান্ত ঘটনা

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সাফল্যের পরেই লিন পিয়াও থেকে শুরু করে মাও পত্নী চিয়াং চিং পর্যন্ত এ বিপ্লবের রূপকার ও উগ্র সমর্থকদের অনেকেই পার্টি ও সরকারের রোষের শিকার হন। এ সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে, চীনের বর্তমান নেতৃত্ব মাও সে-তুঙ্ বিঘোষিত নীতি থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবলব্ধ ফলকে ত্যাগ করছেন, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে বিতাড়িত জাতীয় বুর্জোয়াদের নতুন করে পুনর্বাসন দিচ্ছেন এবং ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার সংশোধনবাদী নীতি গ্রহণ করছেন।[১] পুনর্বাসনপ্রাপ্ত এই সকল জাতীয় বুর্জোয়ারা নিজেদের সম্পদ ও অর্থ দ্বারা ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে "চায়না ইনটারন্যাশনাল ট্রাস্ট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট" খুলে বিদেশী মূলধনের আমন্ত্রণ জানান।[২] মাও'র নীতির তীব্র বিরোধী পিকিঙের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র পেঙ চেন সম্প্রতি রাজনৈতিক পুনর্বাসন পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি চীনের আইন কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি ১৯৭৯ সালের ২৬শে জুন সংবিধান সংশোধনের একটি প্রস্তাব জাতীয় গণ-কংগ্রেসে

সাংস্কৃতিক বিপ্লবোত্তর চীনের পরিবর্তন

১. পিকিঙ রিভিউ, ৭নং সংখ্যা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯, পলিটব্যুরো সদস্য উলানহুর বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

২. পিকিঙ রিভিউ, ১৭নং সংখ্যা, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৮০।

উত্থাপন করেন। ঐ প্রস্তাবে তিনি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে গড়ে তোল সংস্থা ও পদকে 'সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের প্রয়োজনে, পরিবর্তনের সুপারিশ করছেন।[৩] সংবিধানের আরও মৌল সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। "মন খুলে কথা বলো, দ্বিধাহীনভাবে মতামত জানাও, বিতর্ক চালাও, প্রাচীরপত্র লিখো"—সংবিধানে স্বীকৃত ঐ সকল অধিকার 'অসৎ লোকেরা' 'অসৎ ব্যবহার' করার জন্য এদের রদ করবার সুপারিশ করা হয়েছে।[৪] ঐ বছরের (১৯৮০) আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে শীর্ষস্থানীয় সরকারী পদের যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে তাও সাংস্কৃতিক বিপ্লবলব্ধ ফলকে বানচাল করার প্রচেষ্টা বলে অনেকে মত ব্যক্ত করেছেন।

সমালোচকদের ঐ সকল অভিযোগ ও আশঙ্কা কতটা পরিমাণে সঠিক অথবা একেবারেই অমূলক কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, একটি মাত্র সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে চীনের সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির পথের সব বাধা অপসারিত হবে মনে করলে ভুল করা হবে। সুতরাং ষাটের দশকে চীনে সংঘটিত বহুব্যাপ্ত, অনন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে উপসংহার টানার সময় এখনও আসেনি।

---

৩. পিকিং রিভিউ, ২৮নং সংখ্যা, ১০ই জুলাই, ১৯৭৯।

৪. পিকিং রিভিউ, ১৭নং সংখ্যা, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৮০।

৪ | গণসাধারণতন্ত্রী চীনের ১৯৭৫ ও ১৯৭৮ সালের সংবিধান
CONSTITUTIONS OF 1975 AND 1978 OF THE PRC

৪-১. ১৯৭৫ সালের সংবিধানের পটভূমি
Background of the Constitution of 1975

বিপ্লবোত্তর চীন যাতে সমাজতন্ত্রে পদক্ষেপের উপযোগী কর্মসূচী রূপায়িত করতে পারে সে পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৪ সালের সংবিধান রচনা করা হয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থায় ১৯৫৪ সালের সংবিধানকে পরিবর্তন করা অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। সরকারী ভাষ্যে বলা হয় যে, নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন নতুন বিজয়কে সংহত ও ফলপ্রসূ করে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতিকে নিশ্চিত করার জন্য পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পটভূমিকায় ১৯৫৪ সালের সংবিধান পরিবর্তন করে নতুন সংবিধান রচনা করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে উৎপাদনব্যবস্থা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হয় তাকে রক্ষা ও উন্নত করা এবং জনগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে।

পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা

ষাটের দশকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বহুব্যাপ্ত জোয়ার চীনের গণজীবন, পার্টি এবং রাষ্ট্রকাঠামোকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। এর ফলে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়, সরকারী কাজে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়, আমলাতন্ত্রের ওপর চরম আঘাত হানা হয়, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন এক জাগরণ ঘটে, উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত বহু নেতৃবৃন্দ সহ পার্টির বহু সদস্য বিতাড়িত হয়। এরূপ পরিবর্তিত পটভূমিকার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলা ১৯৫৪ সালের সংবিধানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক কথায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে নতুন সংবিধান রচনা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়, কারণ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে পুরোনো রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙে পড়ে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রভাব

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে মাও চেয়েছিলেন দুটি লক্ষ্য সাধন : 'শাসন পরিচালনা কাঠামোকে সরল করা' এবং 'একই কাজ বার বার না করা'। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরে ১৯৭১ সালে ঐ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ৯০টি বিভাগকে কমিয়ে ২৬টি করা হয় এবং প্রতিটির পরিচালনায় থাকে বিপ্লবী কমিটি, উপ-প্রধানমন্ত্রীর সংখ্যা ৭ থেকে ২ করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী সংখ্যা ৬০,০০০ থেকে ১০,০০০ করা হয়। ছাটাই কর্মচারীদের পাঠানো হয় গ্রামের কেন্দ্রগুলিতে যার নাম '৭ই মে স্কুল'। এ ছাড়াও শুরু হয় ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ। সংবিধান পরিবর্তনের আগেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসেবে ঐ পরিবর্তন কার্যকর করা হয়। সুতরাং উপকাঠামোর ঐ পরিবর্তন সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেবার জন্য নতুন সংবিধান রচনা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প থাকে না। তা ছাড়া সামন্ততান্ত্রিক,

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলশ্রুতিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দান

বুর্জোয়া ও আমলাতান্ত্রিক আধিপত্যের হাত থেকে প্রলেতারিয়তদের নিজ হাতে ক্ষমতা গ্রহণের প্রক্রিয়া রচনার জন্য রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এ পটভূমিকায় ১৯৭০ সালে চীন সাধারণতন্ত্রের নতুন সংবিধানের একটি খসড়া রচনা করা হয় এবং আলোচনা ও মতামতের জন্য তা জনগণের কাছে প্রচার করা হয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে আলাপ-আলোচনা চলে। ঐ সব আলাপ-আলোচনা ও মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহ ১৯৭৫ সালের ১৭ই জানুয়ারী জাতীয় গণকংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে তা গৃহীত হয়।

১৯৭৫-এর সংবিধান রচনা

৮-২. ১৯৫৪ এবং ১৯৭৫ সালের সংবিধানের তুলনামূলক আলোচনা

A Comparative Study of the Constitutions of 1954 and 1975

চীন সাধারণতন্ত্রের শাসনব্যবস্থা আলোচনার সময়ে মনে রাখা প্রয়োজন যে, যদিও অন্যান্য অনেক দেশের শাসনব্যবস্থায় পাশ্চাত্য সাংবিধানিক ধ্যান-ধারণার প্রভাব খুব বেশি, কিন্তু চীনের শাসন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সাংবিধানিক ও আইনগত ধ্যান-ধারণার বিশেষ কোন স্থান নেই।[১] ১৯৫৪ সালের শাসনব্যবস্থার তুলনায় ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ কথা আরও বেশি করে প্রযোজ্য। নীচে আমরা চীন সাধারণতন্ত্রের ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থার সাথে ১৯৫৪ সালের শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা উপস্থিত করছি।

১. চীন সাধারণতন্ত্রের ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারা। সংবিধানের দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে যে, চীন সাধারণতন্ত্রের পথ নির্দেশক হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৪ সালে চীনের সংবিধান রচনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের কাঠামো ও রূপরেখা বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের সংবিধানে মাও-র চিন্তাধারা প্রাধান্য লাভ করেছে।

মাও-সে-তুং-এর চিন্তাধারার প্রাধান্য

২. ১৯৫৪ সালের সংবিধানে ছিল চীনে একটি নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস। বিগত ২০ বছর ধরে মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে সুতীব্র শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে চীন শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তাই ১৯৭৫ সালের শাসনতন্ত্রের প্রথম ধারায় চীনকে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব এবং শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং ১৯৭৫ সালের সংবিধানে নয়া গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটেছে।

শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব ও সমাজতন্ত্র

১. "A student of Chinese legal and political institutions can only proceed safely by discarding at the outset those fundamentals of Western system which are axiomatic for many nations. The basis of the Chinese system is essentially different from that of Western nations". —H. G. Darley.

৩. মাও-সে-তুং-এর লক্ষ্য ছিল 'শাসন কাঠামোকে সরল করা এবং একই কাজ বার বার না করা'। এ উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করার জন্য ১৯৫৪ সাল অপেক্ষা ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থাকে অনেক সহজ ও সরল করা হয়। এর ফলে আমলাতান্ত্রিক বন্ধন শিথিল হয় এবং সরকারী কাজে জনগণের অংশ গ্রহণের পথ প্রশস্ত হয়। আগের সংবিধানের ১০৬টি ধারাকে কমিয়ে ১৯৭৫ সালের সংবিধানে মাত্র ৩০টি ধারা সংযোজিত হয়।

শাসনব্যবস্থার সরলীকরণ

৪. আগের শাসনব্যবস্থার চেয়ে ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি'র ভূমিকা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। আগের সংবিধানে কমিউনিস্ট পার্টি'র ভূমিকার উল্লেখ মাত্র ছিল। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি'র যে গৌরবজনক ভূমিকা গড়ে ওঠে, ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থায় তার প্রতিফলন ঘটে। ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থায় পরিষ্কারভাবে বলা হয় যে, চীনের গোটা জনগণের নেতৃত্বের প্রধান কেন্দ্র হল শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবর্তী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টি'। এ সংবিধানে গণকংগ্রেস ও সৈন্যবাহিনী পরিচালনায় কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতৃত্ব স্বীকার করা হয় এবং সরকারের শীর্ষপদসমূহে নিয়োগের ব্যাপারে পার্টি'র প্রধান ভূমিকার কথা বলা হয়।

কমিউনিস্ট পার্টি'র ভূমিকার প্রাধান্য

৫. চীনের কমিউনিস্ট পার্টি'র এই গৌরবজনক ভূমিকার ফলশ্রুতি হিসেবে সেখানে ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সংগঠনের চেয়ারম্যানের পদটি বিলোপ করা হয়। মাও-সে-তুং-এর মতে যেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রধান নিয়ন্ত্রক কমিউনিস্ট পার্টি' সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি'র চেয়ারম্যানের সমান্তরাল রাষ্ট্রীয় প্রধানের কোন পদ থাকতে পারে না। এজন্য লিন পিয়াও যখন মাওকে পার্টি চেয়ারম্যান সহ রাষ্ট্রীয় প্রধানের পদ গ্রহণে অনুরোধ জানান তখন মাও তাতে স্বীকৃত হননি এবং এ ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। যাহোক ১৯৭৫ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের চেয়ারম্যানের পদ বিলোপ করে তার নীতি নির্ধারণ ও সামরিক ক্ষমতা পার্টি'র চেয়ারম্যানের হাতে ন্যস্ত করা হয় এবং আনুষ্ঠানিক কাজকর্মে'র ক্ষমতা গণকংগেসের স্থায়ী কমিটির হাতে ন্যস্ত থাকে।

রাষ্ট্রীয় চেয়ারম্যানের পদ বিলোপ

৬. সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে প্যারী কমিউনের অনুকরণে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিপ্লবী গ্রুপ, কমিটি ও কংগ্রেস গঠন করা হয়েছিল। ঐ সকল বিপ্লবী সংগঠন জনগণকে শিক্ষিত করে তোলে এবং জনগণের সাথে পার্টি'র ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে। ১৯৭৫ সালের সংবিধানে ঐ সকল বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে শাসনব্যবস্থার অঙ্গীভূত করা হয়। ১৯৫৪ সালের শাসনব্যবস্থায় সংবিধান-স্বীকৃত ঐরূপ কোন বিপ্লবী কমিটির অস্তিত্ব ছিল না।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবী সংস্থা

৭. সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার অনুকরণে চীনে ১৯৫৪ সালের সংবিধানে প্রকিউরেটর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থায় প্রকিউরেটর ব্যবস্থার পরিবর্তন করে প্রকিউরেটরদের কাজকর্ম অর্থাৎ আইন তদারকির দায়িত্ব জননিরাপত্তা বাহিনী'র হাতে অর্পণ করা হয়।

প্রকিউরেটর ব্যবস্থা

৮. জাতীয় গণ-পরিষদের কার্যকাল চার বছর (১৯৫৪ সালের শাসনব্যবস্থা) থেকে ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থায় পাঁচ বছর করা হয়। আগের সংবিধান অনুযায়ী

জাতীয় গণ-কংগ্রেসের কার্যকাল ও প্রতিনিধিত্ব

বিদেশে বসবাসকারী চীনারা গণপরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারত। কিন্তু ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থায় ঐ ব্যবস্থা রদ করে এর পরিবর্তে কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক ব্যক্তিকে জাতীয় গণ-কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে আমন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা হয়।

৯. ১৯৫৪ সালের শাসনব্যবস্থায় চীনে চার ধরনের সম্পত্তি স্বীকৃত ছিল। এগুলি হল: ১ রাষ্ট্রীয় মালিকানা, ২. সমবায় ও যৌথ মালিকানা, ৩. শ্রমিক ও কৃষকের

সম্পত্তির মালিকানা

ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ৪. ধনিক শ্রেণীর মালিকানা। পরবর্তী সময়ে কমিউন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা গ্রামাঞ্চলে জমি ও উৎপাদনের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটে এবং শহরাঞ্চলের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটান হয়। ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থায় এ বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়ে কেবলমাত্র ক. সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা এবং খ. শ্রমজীবী জনসাধারণের যৌথ মালিকানার ব্যবস্থা রাখা হয়।

১০. ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থায় জনগণের অধিকারের সম্প্রসারণ ঘটে। ঐ শাসনব্যবস্থায় শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার স্বীকৃতি পায়। মন খুলে কথা বল,

অধিকারের সম্প্রসারণ

দ্বিধাহীনভাবে মতামত জানাও, প্রাচীরপত্রে লিখে মতামত প্রকাশ কর—ঐ সব অধিকার সংবিধানে স্বীকার করা হয়।

১১ বৈদেশিক নাগরিকদের রাজনৈতিক আশ্রয় দানের অধিকারকেও প্রসারিত করা হয়। আগের শাসনব্যবস্থায় একমাত্র শান্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী বিদেশীদের

রাজনৈতিক আশ্রয় দান

ক্ষেত্রেই ঐ অধিকার প্রযোজ্য হত। কিন্তু ১৯৭৫ সালের শাসন-ব্যবস্থায় বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে ঐ অধিকারকে সম্প্রসারিত করা হয়।

১২. আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রেও ১৯৭৫ সালের সংবিধানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আগের সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মৈত্রী

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং সোভিয়েত প্রসঙ্গ

সম্পর্কের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ ছিল। ১৯৭৫ সালের সংবিধানে এ সম্পর্কের কথা আর উল্লেখ করা হয়নি। বরং আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ও যুদ্ধনীতির বিরোধিতা করা হবে। এ ছাড়াও বলা হয় যে, চীন পঞ্চশীলের পাঁচটি নীতির প্রতি অবিচল থাকবে, সমাজতান্ত্রিক অন্যান্য দেশের সাথে ঐক্যকে দৃঢ় করা হবে এবং চীন কখনই বিশ্বে শীর্ষ শক্তির (Super Power) সমকক্ষ হবার চেষ্টা করবে না।

মূল্যায়ন

পাশ্চাত্যের কোন কোন সমালোচক চীন সাধারণতন্ত্রের ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থার

নতুন বিষয়বস্তু বিন্যাসকে আদৌ কোন গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁদের মতে শাসনব্যবস্থার ঐ সব অতিকথনের (constitutional myth) সাথে বাস্তব রাজনীতির পার্থক্য খুব বেশি। এমনকি তাঁরা ঐ শাসনব্যবস্থাকে ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব এবং দলীয় শোষণকে কায়েম করার একটি আবরণ বলে অভিহিত করতে পর্যন্ত দ্বিধা করেননি।

পাশ্চাত্য সমালোচনা

সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থাকে সমালোচনা করা হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার সরকারী মুখপত্র 'প্রাভদা' ঐ শাসনব্যবস্থাকে ১৯৫৪ সালের শাসনব্যবস্থা থেকে আলাদা বলে মত প্রকাশ করেছে। প্রাভদা মনে করে যে, বিশ্বশান্তি ও মানবজাতির প্রগতির জন্য একান্ত অপরিহার্য সোভিয়েত ও চীনের মৈত্রীকে ১৯৭৫ সালের সংবিধান অস্বীকার করায় এ সংবিধানে একটি মৌল নীতিগত পার্থক্য ধ্বনিত হয়েছে। সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থা তুলে দেবার জন্য প্রাভদা মন্তব্য করেছেন যে, জনগণকে মাওবাদীরা ভয় পায়। রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটিকে তুলে দেয়া এবং সামরিক ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যানকে সর্বময় ক্ষমতা দেয়ায় প্রাভদা সমালোচনা করেছে। "সোভিয়েত রিভিউ" ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থাকে মাও'র জন-বিরোধী ও সমাজতন্ত্রবিরোধী নীতির প্রকাশ বলে মনে করে।

সোভিয়েত সমালোচনা

অধ্যাপক চান তু-শিয়ে (Chun Tu hsieh) তাঁর (*The New Constitution*) প্রবন্ধে ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থার মূল্যায়ন করে যথার্থই বলেছেন যে, ১৯৫৪ সালের সংবিধানের প্রবর্তনের পরে বিগত বিশ বছর ধরে চীনের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থায়। রাজনৈতিক অধিকাঠামো আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে তার প্রতিচ্ছবি হল এ শাসনব্যবস্থা। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়েছে এবং নতুন নতুন সংস্থা গড়ে উঠেছে তাদের যথাক্রমে প্রয়োগ ও স্বীকৃতি ঘটেছে ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থায়।

১-৫. ১৯৭৮ সালের সংবিধানের পটভূমি

Background of the Constitution of 1978

মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরে পরিবর্তিত অবস্থা এবং বিগত বিশ বছরের লব্ধ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করে ১৯৭৫ সালে শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু তিন বছরের মধ্যে তা পরিবর্তন করে নতুন শাসনব্যবস্থা রচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে ১৯৭৮ সালের ৫ই মার্চ চীন গণসাধারণতন্ত্রের জন্য নতুন সংবিধান কার্যকর করা হয়। বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে চীনে এমন সব ঘটনাপ্রবাহ দেখা দিয়েছিল যার ফলশ্রুতি হিসেবে আগের সংবিধানকে পরিবর্তন করে তিন বছরের মধ্যে নতুন সংবিধান গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়।

তিন বছরের মধ্যে আবার সংবিধান পরিবর্তন

১৯৭৫ সালের শাসনতন্ত্র গৃহীত হবার কিছুদিনের মধ্যে চীনের রাজনৈতিক আকাশের চন্দ্র এবং সূর্য বিদায় গ্রহণ করে। ১৯৭৬ সালের ৮ই জানুয়ারী চীনের পার্টির অন্যতম নায়ক ও প্রধানমন্ত্রী চীন গণসাধারণতন্ত্রের অন্যতম রূপকার এবং বিতর্কের ঊর্ধ্বে সর্বজনপ্রিয় কর্মযোগী চৌ এন লাই পরলোকগমন করেন। ঐ বছরই ৯ই সেপ্টেম্বর চীন গণসাধারণতন্ত্রের স্রষ্টা এবং চীনের সব জনগণের প্রেরণার উৎস মাও সে-তুঙের প্রয়াণ ঘটে। এ ছাড়া ঐ সময়ের মধ্যে চীনের রাজনৈতিক আকাশ থেকে আরও কয়েকটি নক্ষত্রের বিচ্যুতি ঘটে। এঁরা হলেন চীনের রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সভাপতি তুং পিউ. ...পরিষদের সভাপতি চু তে এবং তাত্ত্বিক খাঁ শেন। ঐ সকল প্রখ্যাত নেতা ও ...তিকের এবং বিশেষ করে মাও সে-তুং এবং চৌ এন-লাই'র মৃত্যুতে চীনের রাজনীতিতে ভারসাম্যের একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এবং নেতৃত্বের সংকট দেখা দেয়।

চৌ ও মাও'র মৃত্যুতে ভারসাম্য পরিবর্তন

এরই পাশাপাশি বেশ কিছুদিন ধরে চীনে যে আদর্শগত বা রাজনৈতিক লাইনের সংঘাত চলছিল তাও তীব্র আকার ধারণ করে। মাও'র জীবিতকালেই সৈন্যবাহিনী ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লালরক্ষীদের মধ্যে লিন পিয়াও'র নীতি সমর্থকগণ শক্তি সঞ্চয় করে। অভিযোগ করা হয় যে, ঐ সব উগ্রপন্থীরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে বাড়াবাড়ি শুরু করে। একদিকে ১৯৬৮ সালে গণমুক্তি ফৌজের সহায়তায় লিন পিয়াও পন্থী লালরক্ষীদের দমন করা হয় এবং লালফৌজ ভেঙে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হয়। অন্যদিকে ১৯৬৯ সালে পার্টির নবম কংগ্রেসে লিন পিয়াওকে মাও'র উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৩ সালের পার্টির দশম কংগ্রেসে চৌ এন লাই'র রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, লিন বহু আগে থেকেই মাও-র রাজনৈতিক লাইনের বিরোধী ছিলেন। যা হোক, লিন পিয়াও'র বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু (১৯৭১) এবং তিনি মাও'র জীবননাশে সচেষ্ট হয়েছিলেন এরূপ সরকারী ভাষ্য সত্ত্বেও চীনের রাজনীতিতে লিন পিয়াও'র সমর্থক ...স পায়নি।

লিন পিয়াও ঘটনা

মাও'র মৃত্যুর প্রায় সাথে সাথে পলিটব্যুরোর চারজন শীর্ষস্থানীয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ চারজন শুধুমাত্র পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্যই ছিলেন না—ওয়াং হুং-ওয়েন ছিলেন পার্টির দ্বিতীয় ভাইস চেয়ারম্যান, চাং-চুং-চিয়াও-প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী, ইয়াও ওয়েন ইউয়ান একজন অন্যতম তাত্ত্বিক নেতা এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম রূপকার মাও'র স্ত্রী চিয়াং চাং। ঐ চারজনের প্রথম অক্ষরযুক্ত করে ওয়াং চাং-চিয়াং-ইয়াও'কে চার চক্রী (Gang of four) নামে অভিহিত করা হয়।

চার-চক্রী ঘটনা

সরকারীভাবে বলা হয় যে, এই চার চক্রী পার্টি নেতৃত্ব দখলের চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু পার্টির সময়োচিত প্রয়াসে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পার্টির একাদশ কংগ্রেসে হুয়া কুয়ো-ফেং তাঁর রিপোর্টে বলেন যে, ঐ চার চক্রী লিন পিয়াও'র পার্টি বিরোধী চক্রের সাথে যুক্ত, এরা মাও-বিরোধী প্রতিবিপ্লবী সংশোধনবাদী লাইনের প্রবক্তা এবং মাও'র লাইনের বিরোধী। বলা হয় যে, মাও জীবিতকালেই নাকি এদের

বিরুদ্ধে পার্টিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি এদের সাথে মাও'র বিরোধের একটি রূপরেখাও উপস্থিত করেন।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি'র একাদশ সম্মেলনের দলিল থেকে জানা যায় যে, মাদাম চিয়াং চিং চেয়েছিলেন ওয়াং হুং-ওয়েনকে গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করতে এবং নিজে পার্টি'র চেয়ারম্যান হতে। ঐ চক্র যাতে ক্ষমতায় আসতে না পারে তার জন্য মাও সে-তুং আগেই কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল পার্টি'র ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করে হুয়া কুয়োং-কেংকে ভাইস চেয়ারম্যান করা এবং চৌ'র মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রীর শূন্য পদে তাঁকে নিযুক্ত করা।

কেউ কেউ মনে করেন যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরে চীনের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে একটা স্থিতিশীল সুস্থ অবস্থা সৃষ্টি হয়। কিন্তু 'চার চক্রী' সহ উগ্রপন্থীরা মনে করতেন যে, স্থিতিশীলতার ফলে পার্টিতে আবার প্রাক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ের বিচ্যুতি ফিরে আসতে পারে। তাই তাঁরা সমাজ দ্বন্দ্ব ও গতিশীলতা বজায় রাখার জন্য একটা বিরামহীন বিপ্লব অবস্থা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন।

বিরামহীন বিপ্লব-অবস্থা বজায় রাখা

যা হোক, চৌ এন লাই এবং বিশেষ করে মাও সে-তুঙের মৃত্যুর পরে চীনের রাজনৈতিক জীবনে চাঞ্চল্য, অস্থিরতা এবং নেতৃত্বের একটা অংশের রাজনৈতিক তৎপরতা ও জেহাদ ঘোষণাকে এবং অবশেষে তাদের গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের সংবিধানের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

কোন কোন সমালোচক অবশ্য মনে করেন যে, যাদের 'চার চক্রী' বলে অভিহিত করা হয়, তাঁরা চক্রান্তকারী বা মাও-বিরোধী নয়। বরং মাও'র মৃত্যুর পরে হুয়া কুয়ো ফেং তড়িঘড়ি বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করেন এবং এর পেছনে পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মতি ছিল না। সমালোচকেরা আরও মনে করেন হুয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত পার্টি'ই মাও'র চিন্তাধারার বিরোধিতা করে শোধনবাদী ও বুর্জোয়া চিন্তাধারা আমদানি করে।

অন্য মত

ঐ মহল থেকে অবশ্য 'পিকিং রিভিউ'এর সংবাদ উদ্ধৃত করে দেখাবার চেষ্টা করেন যে, চৌ এবং মাও'র মৃত্যুর পরে হুয়া পরিচালিত পার্টি সরকার আধুনিকীকরণের নামে সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ ও মূলধন গ্রহণ করে চীনে বহুজাতিক শিল্প সংস্থা গড়ে তুলবার প্রয়াস চালায়, জাতীয় বুর্জোয়াদের পুনর্বাসন দিয়ে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া হয় (পিকিং রিভিউ ৭নং সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯)। জাতীয় বুর্জোয়া পরিবারের বিদেশে প্রবাসী রঙ্ জিরেনের নেতৃত্বে চীনের বর্তমান সরকার চীনেতে বিদেশী মূলধন, প্রযুক্তিবিদ্যা ও যৌথ কারবার খোলার আমন্ত্রণ জানান। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে বিতাড়িত ব্যক্তিদের বর্তমান সরকার ও পার্টি নেতৃত্ব নতুন করে পুনর্বাসন দিচ্ছেন এবং ঐ সময় গঠিত বিপ্লবী কমিটিগুলি আর সমাজতান্ত্রিক প্রয়োজন মেটাতে পারে না—এ যুক্তিতে এদের বাতিল করা হচ্ছে (পিকিং রিভিউ, ২৮নং সংখ্যা ১৩ই জুলাই, ১৯৭৯)।

পিকিং রিভিউতে প্রকাশিত সংবাদ

সমালোচকদের মতে, এ সব পরিবর্তনকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দানের জন্য ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়।

১৯৭৮ সালের সংবিধান রচনা

এ সব ঘটনা ও পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থা সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা করে নতুন সংবিধানের একটি খসড়া প্রণয়নের জন্য চেয়ারম্যান হুয়ার নেতৃত্বে পার্টির পলিটব্যুরোর একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি কর্তৃক রচিত এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত শাসনব্যবস্থা পার্টির একাদশ কংগ্রেসে উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। একাদশ পার্টি কংগ্রেসে নতুন সংবিধান রচনার কারণ হিসেবে পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান ইয়ে চিয়েন্যায়ং বলেন যে, "চার চক্রীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করা এবং তাদের দুষ্ট প্রভাব থেকে পার্টিকে মুক্ত করে মহান্ সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সাফল্যগুলিকে সুসংহত করা এবং আগে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।" চীন গণসাধারণতন্ত্রের পঞ্চম জাতীয় গণকংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ১৯৭৮ সালের ৫ই মার্চ চীনের নতুন শাসনব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হয়।

বিষয়সূচী

এই শাসনতন্ত্রে একটি প্রস্তাবনা ও চারটি অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে লিপিবদ্ধ করা হয়:

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায় : **সাধারণ মূল নীতিসমূহ** (১ হইতে ১৯ ধারা)

দ্বিতীয় অধ্যায় : রাষ্ট্রীয় কাঠামো (২০ হইতে ৪৩ ধারা

পরিচ্ছেদ ১ : জাতীয় গণকংগ্রেস

পরিচ্ছেদ ২ : রাষ্ট্রীয় পরিষদ

পরিচ্ছেদ ৩ : বিভিন্ন স্তরের গণকংগ্রেস ও আঞ্চলিক বিপ্লবী কমিটিসমূহ

পরিচ্ছেদ ৪ : জাতীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলসমূহের স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহ

পরিচ্ছেদ ৫ : গণআদালত এবং গণ-প্রোকিউরেটরের দপ্তরসমূহ

তৃতীয় অধ্যায় : নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ (৪৪ হইতে ৫৯ ধারা)

চতুর্থ অধ্যায় : জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক ও রাজধানী (৬০ নম্বর ধারা)

৪-৪. ১৯৭৫ ও ১৯৭৮ সালের সংবিধান : তুলনামূলক আলোচনা

Constitutions of 1975 and 1978 : A Comparative Study

চীন গণসাধারণতন্ত্রের জাতীয় গণকংগ্রেসে ১৯৭৮ সালের সংবিধান সম্পর্কে বক্তৃতায় ইয়ে চিয়েন-য়িং বলেন যে, বর্তমান শাসনব্যবস্থায় ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামো বা মূল নীতির কোন পরিবর্তন করা হয়নি। তিনি এই সংবিধানকে ১৯৫৪ সালের সংবিধানের ধারাবাহিক ও বিকশিত রূপ বলে বর্ণনা করেন।

১৯৭৫ সালের সংবিধানের সাথে তুলনা করলে ১৯৭৮ সালের শাসনব্যবস্থায় যে সব মৌল পার্থক্য এবং নতুনত্ব পরিলক্ষিত হয় সেগুলি আলোচনা করা হল ঃ

১. মাও সে তুঙ্ সর্বদাই শাসনব্যবস্থাকে সরল ও জনগণের বোধগম্য করার উপর জোর দিতেন। এ জন্যই ১৯৫৪ সালের ১০৬টি ধারাবিশিষ্ট শাসনব্যবস্থাকে ১৯৭৫ সালে অনেক সরল করা হয় এবং মাত্র ৩০টি ধারায় শাসনব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয়। ১৯৭৮ সালের সংবিধানে একটি দীর্ঘ প্রস্তাবনা ছাড়াও ৬০টি ধারায় শাসনব্যবস্থাকে বিন্যস্ত করা হয়।

আকৃতির পরিবর্তন

২. ১৯৭৮ সালের সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারায় রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ পরিচালনায় জনসাধারণের ব্যাপক অংশ গ্রহণকে সুনিশ্চিত করে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নীতি অনুসরণের কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও সরকারী কর্মচারীদের উপর জনগণের তত্ত্বাবধানের অধিকার প্রদান করা হয়। পূর্বতন শাসনব্যবস্থায় গণউদ্যোগকে এতটা গুরুত্ব দানের জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয়া হয়নি।

জনসাধারণের সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ

৩. সংবিধান প্রণেতাগণ মনে করেন যে, প্রচলিত আইনের শিথিলতার জন্যই 'চার চক্রীর' উত্থান সম্ভব হয়েছিল এবং এজন্য ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থা থেকে ১৯৭৮ সালের শাসন ব্যবস্থায় আইনানুগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হয়। সাংবিধানিক নির্দেশ ও আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব জাতীয় গণকংগ্রেস এবং অন্যান্য স্তরের গণকংগ্রেস-গুলির উপর ন্যস্ত করা হয় ; সার্বিক উন্নতির জন্য শৃংখলার উপর গুরুত্ব দেয়া হয় এবং স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের সাংবিধানিক ব্যবস্থা রদ্ করা হয়।

আইনানুগ ব্যবস্থা শক্তিশালী

৪. ১৯৭৮ সালের সংবিধানে আইনানুগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রকিউরেটর ব্যবস্থাকে পুনঃ প্রবর্তন করা হয় এবং গণআদালতের সংগঠন ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করে এর ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। ১৯৭৫ সালে বস্তুত প্রকিউরেটর ব্যবস্থার বিলোপ ঘটেছিল।

প্রকিউরেটর ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন

৫. ১৯৫৪ সালের শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থার কার্যাবলীর বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থায় এ সম্পর্কে আশ্চর্যজনক নীরবতা দেখান হয়। কিন্তু ১৯৭৮ সালের সংবিধানে আবার জাতীয় গণকংগ্রেস, স্থায়ী কমিটি, রাষ্ট্রীয় পরিষদ, গণআদালত ইত্যাদির ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির কার্যাবলী আলোচিত

৬. ১৯৭৫ সালের সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা না করে ঐগুলিকে মৌল নীতির মধ্যে আলোচনা করা হয়েছিল। ১৯৭৮ সালের সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং কয়েকটি নতুন মৌল অধিকার সংযুক্ত ও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। জনগণ যাতে তাদের অধিকারগুলি সুনিশ্চিতভাবে ভোগ করতে পারে সেজন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জনগণের অধিকারের সম্প্রসারণ

নতুন কর্তব্য সংযোজন

৭. ১৯৭৫ সালের সংবিধান অনুযায়ী ১৯৭৮ সালের সংবিধানে জনগণের পালনীয় কর্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে এ ব্যাপারে লক্ষণীয় পার্থক্য হল এই যে ১৯৭৮ সালের শাসনব্যবস্থায় শৃঙ্খলা, ঐক্য ও নিয়মানুবর্তিতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি রক্ষা ও সংরক্ষণ শ্রম-শৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা নাগরিকের কর্তব্যের মধ্যে সংযোজিত হয়েছে।

আধুনিকীকরণ

৮. আগের সংবিধান থেকে ১৯৭৮ সালের সংবিধানের এক উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হল আধুনিকীকরণের নীতি ঘোষণা। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, প্রতিরক্ষা, শিল্প ও কৃষিতে আধুনিকীকরণের দ্বারা এই শতকের মধ্যে চীনকে একটি মহান্ ও শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করা হবে। ১৯৭৫ সালের সংবিধানে আধুনিকীকরণের নীতি ঘোষণা করা হয়নি।

সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ

৯. শুধুমাত্র প্রযুক্তি, শিল্প বা কৃষিতেই নয়, সামরিক বাহিনীকে আধুনিকীকরণ ও বিপ্লবীকরণ করা হবে বলে ১৯৭৮ সালের সংবিধানে বলা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের সংবিধানে সৈন্যবাহিনীর আধুনিকীকরণের কোন কথা ছিল না।

পেশাদারী ব্যবস্থার প্রবর্তন

১০. আগে চীনে পেশাদারী ব্যবস্থাকে কখনই সমর্থন করা হয়নি, বরং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় পেশাদারী ব্যবস্থাকে আঘাত হানা হয়। বলা হয় যে, এর ফলশ্রুতি হিসেবে চীনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রযুক্তি জ্ঞানের অগ্রগতি ও আর্থনীতিক উন্নতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। তাই ১৯৭৮ সালের শাসনতন্ত্রে পেশাদারী ব্যবস্থাকে স্বীকার করা হয় এবং দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য পেশাদারদের সাথে জনগণের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

আন্তর্জাতিক নীতি ও সম্পর্ক

১১. ১৯৭৫ সালের সংবিধানে আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে চীন সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ও যুদ্ধনীতির বিরোধিতা করবে এবং পঞ্চশীলের নীতির প্রতি অবিচল থাকবে। ১৯৭৮ সালের শাসনতন্ত্রে পঞ্চশীল নীতির সমর্থন জানান হয়, এবং মাও'র তিন বিশ্বতত্ত্ব অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিসহ (সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য শোধনবাদী দেশ বাদে) তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ঐক্য ও মৈত্রীকে দৃঢ় করার কথা প্রস্তাবনায় বলা হয়। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্য প্রয়াস চালাবার কথা বলা হয়।

৫-১. চীনের নতুন সংবিধান (১৯৮২)
New Constitution of China (1982)

১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে গণসাধারণতন্ত্রী চীনের সংবিধানকে আবার পরিবর্তন করা হয়। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে গণসাধারণতন্ত্রী চীনের আত্মপ্রকাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত চীনে চারটি সংবিধান গৃহীত হয়েছে। এগুলি হল :

১. ১৯৫৪ সালের প্রথম সংবিধান
২. সাংস্কৃতিক বিপ্লবোত্তর ১৯৭৫ সালের সংবিধান
৩. পরিবর্তিত পটভূমিকায় ১৯৭৮ সালের সংবিধান
৪. ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে গৃহীত বর্তমান সংবিধান

১৯৮২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর চীনের জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশনে চীনের চতুর্থ বা বর্তমান সংবিধান (১৯৮২) গৃহীত হয়। নতুন সংবিধানের স্বপক্ষে কংগ্রেসের ৩,০৩৭ জন সদস্য ভোট দেয় এবং তিন জন সদস্য ভোটদানে বিরত থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, নতুন সংবিধানের বিরুদ্ধে কোন ভোট পড়ে না।

নতুন সংবিধানের খসড়া নিয়ে বিগত ২৬ মাস ধরে বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে আলাপ আলোচনা চলে এবং তার ভিত্তিতে সংশোধিত খসড়া নিয়ে গত চার মাস ধরে গোটা চীনে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং অবশেষে জাতীয় গণ-কংগ্রেস অধিবেশনে ১৯৮২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর নতুন সংবিধান চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

৫-২. নতুন ১৯৮২ সালের সংবিধানের পটভূমি

১৯৫৪ সালে রচিত চীন গণসাধারণতন্ত্রের সংবিধানকে প্রথম পরিবর্তিত করা হয় ১৯৭৫ সালে। ষাটের দশকে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বহুব্যাপ্ত জোয়ার চীনের গণজীবন, পার্টি এবং রাষ্ট্র কাঠামোকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। তার সাথে সাজুয্য বজায় রেখে সংবিধানের পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। তাই ১৯৭৫ সালে নতুন সংবিধান রচিত হয় এবং ঐ বৎসর ১৫ই জানুয়ারী জাতীয় গণকংগ্রেসে সংবিধান চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

১৯৭৫ সালের সংবিধান কেন ?

১৯৭৫ সালের সংবিধান গৃহীত হবার কিছুদিন পরে প্রথমে চৌ-এন লাই এবং পরে মাও-সে-তুঙের প্রয়াণ ঘটে। এর ফলে চীনের রাজনীতিতে ভারসাম্যের একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এবং নেতৃত্বের সংকট দেখা দেয়। ঐ সময়ে মাওয়ের পত্নীসহ চীনের পলিটব্যুরোর চারজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। চীনের রাজনীতিতে এরা 'চার চক্রী' নামে অভিহিত। যাহোক চীনের রাজনৈতিক জীবনে চাঞ্চল্য, অস্থিরতা এবং নেতৃত্বের একটা অংশের রাজনৈতিক তৎপরতা ও জেহাদ ঘোষণা এবং অবশেষে তাদের গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের সংবিধান পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তাই ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে চীনের জন্য

১৯৭৮ সালের সংবিধান কেন ?

নতুন সংবিধান অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ১৯৭৮ সালের সংবিধান রচনার কারণ হিসেবে বলা হয় যে, চার চক্রীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করা এবং ওদের দুষ্ট প্রভাব থেকে পার্টিকে মুক্ত করে মহান্ সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সাফল্যকে সুসংহত করা ও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ১৯৭৮ সালের নতুন সংবিধান অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

১৯৮২ সালে কেন আবার নতুন সংবিধান ?

বস্তুত চৌ এন লাই ও মাও সে-তুং-এর মৃত্যুর পর থেকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয় তাকে কিছুটা ১৯৭৫ সালের সংবিধান প্রতিফলিত করে, কিন্তু অনেকটাই তখনও থাকে অপ্রকাশিত। সমালোচকেরা মনে করেন যে, চীনের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব চৌ এবং মাও-এর মৃত্যুর পর থেকেই মাও-এর চিন্তাধারা থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন, তাঁরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সব কিছুকে সঠিক বলে মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু একবারে সংবিধানের ব্যাপক পরিবর্তনকে মাও-এর প্রতি সশ্রদ্ধ ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ জনসাধারণ গ্রহণ করতে স্বীকৃত নাও হতে পারে, তাই সংবিধানকে নিজেদের মত করে দু কিস্তিতে (১৯৭৮ এবং ১৯৮২) পরিবর্তন করা হয়। তাই ১৯৭৮ সালের সংবিধান গ্রহণ করার চার বছরের মধ্যে আবার সংবিধানকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

একটি মত

ঐ সমালোচক মহল থেকে 'পিকিং রিভিউ'-এর সংবাদ উদ্ধৃত করে দেখাবার চেষ্টা করা হয় যে, চৌ এবং মাও'র মৃত্যুর পরে চীনের পার্টি ও সরকার আধুনিকীকরণের নামে সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ ও মূলধন গ্রহণ করে চীনে বহুজাতিক শিল্প সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস চালায়, জাতীয় বুর্জোয়াদের পুনর্বাসন দিয়ে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া হয় (পিকিং রিভিউ ৭নং সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯)। জাতীয় বুর্জোয়া পরিবারের বিদেশে প্রবাসী রঙ্ জিরেনের নেতৃত্বে চীনের বর্তমান সরকার চীনেতে বিদেশী মূলধন, প্রযুক্তিবিদ্যা ও যৌথ কারবার খোলার আমন্ত্রণ জানায়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে বিতাড়িত ব্যক্তিদের বর্তমান সরকার ও পার্টি নেতৃত্ব নতুন করে পুনর্বাসন দিচ্ছেন এবং ঐ সময়ে গঠিত বিপ্লবী কমিটিগুলি আর সমাজতান্ত্রিক প্রয়োজন মিটাতে পারে না—এ যুক্তিতে এদের বাতিল করা হচ্ছে। (পিংকিং রিভিউ, ২৮নং সংখ্যা ১৩ই জুলাই, ১৯৭৯)। সমালোচকদের মতে, ঐ সকল পরিবর্তনকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দানের জন্য ১৯৭৮ সালের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়।

পিকিং রিভিউতে প্রকাশিত সংবাদ

সমালোচকেরা আরও বলেন যে চীনা নাগরিকদের স্বাধীন মত ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের কয়েকটি পদ্ধতি সংবিধানে স্বীকৃত। এগুলি হল "স্বাধীনভাবে কথা বলার, সম্পূর্ণরূপে মতামত প্রকাশের, বড় বড় বিতর্কসভা আয়োজনের এবং বড় বড় পোস্টার লেখার"। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'মাও সে-তুং'-এর বড় পোস্টার "সদর দপ্তরে কামান দাগো, ধ্বংস করো" (তা জু-পাও) সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে গতি দান করে। পোস্টার লেখাসহ মতামত প্রকাশের ঐ পদ্ধতিগুলি বহুদিন থেকেই চালু ছিল, কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর থেকে ঐগুলি সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়।

পিকিঙ রিভিউ-এর (২৮শে এপ্রিল ১৯৮০) খবরে জানা যায় যে উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতাগুলির সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে। সংবাদে বলা হয়েছে, "মন খুলে কথা বলো, দ্বিধাহীনভাবে মতামত জানাও, বিতর্ক চালাও, প্রাচীর পত্র লিখো"—এ সব স্বীকৃত অধিকার রদ করার সুপারিশ এসেছে জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির ১৯৮০-এর ৯—১৬ই এপ্রিলের অনুষ্ঠিত ২৪ নং অধিবেশন থেকে। কারণ 'অসৎ লোকেরা" এ সব অধিকারকে "অসৎ ব্যবহার" করেছে এবং করছে। এ প্রসঙ্গে 'চার চক্র' এবং ওয়েই জিঙ্-শেঙ্-এর নাম করা হয়েছে। ঐ সব অধিকার "পার্টি ও রাষ্ট্রের অতি গোপন বিষয় প্রকাশ করে দিচ্ছে, উৎপাদন ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের কর্মযজ্ঞে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং জনগণের সত্যিকারের গণতন্ত্রের ক্ষতি সাধন করছে।" আরও বলা হচ্ছে যে, প্রাচীরপত্রের লিখন 'কখনই জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সত্যিকারের ভূমিকা পালন করেনি।"

সমালোচকেরা বলেছেন যে, উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছিল যে ১৯৭৮ সালের সংবিধানের অনেক কিছুরই রদ আসন্ন এবং ১৯৮২ সালের সংবিধান ঐ প্রত্যাশিত পরিবর্তনকে বিধিবদ্ধ করেছে।

১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্তমান সংবিধান গৃহীত হবার তিন মাস আগে (১লা থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২) চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। নতুন সংবিধান গ্রহণের ঠিক আগে পার্টি কংগ্রেসের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত যে নতুন সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ঐ পার্টি কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয় যে ;

১. জনগণের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামকে সম্প্রসারিত করার ফলে দুঃখজনক পরিণতি ঘটেছে। বলা বাহুল্য এখানে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বাড়াবাড়ির কথা বলা হচ্ছে। যাহোক কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয় যে ঐ নির্বোধ ব্যাপারের (foolish thing) পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেয়া হবে না।

দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত

২. দ্বিতীয়ত, দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হল সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য চীনের পথ হিসেবে একটা পদ্ধতি অনুসরণ করা—যা সোভিয়েত বা অন্য কোন মডেলকে অনুসরণ করবে না।

৩. সামাজিক বিকাশের ধারার গতি অপেক্ষা দ্রুত সমষ্টিকরণের কাজকে দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেস নিন্দা করে এবং জনগণের কমিউন ব্যবস্থার তত্ত্বগত ভিত্তিকে নাকচ করে দেয়।

৪. দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেস দলও সরকারের নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক কিন্তু অধিকতর বিপ্লবী, শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞদের আসীন করার কথা বলেছেন।

৫. পার্টি কংগ্রেসে ব্যক্তিপূজার পরিবর্তে সর্বত্র গণতন্ত্রীকরণ-এর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসের ঐসব সিদ্ধান্তকে শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে রূপ দেবার জন্য ১৯৮২ সালে নতুন সংবিধান রচনা করা যে অপরিহার্য হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বর্তমান সংবিধান মাও-সে-তুং-এর চিন্তাধারা ও শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছে এবং নেতৃত্বের আপসী মনোভাবের পরিচয় এই নতুন সংবিধান অনেকাংশে বহন করছে।

৫-৩. ১৯৭৮ ও ১৯৮২ সালের সংবিধানের তুলনামূলক আলোচনা
Constitutions of 1978 and 1982 : A Comparative Study

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা মনে করেন যে, ১৯৮২ সালের চীনের বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মৌল স্বার্থের প্রতিফলন ঘটেছে ১৯৮২ সালের নতুন সংবিধানের মধ্য দিয়ে। তাঁরা এই সংবিধানকে ১৯৭৮ সালের সংবিধানের ধারাবাহিক ও পরিণত রূপ বলে মনে করেন। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, ১৯৭৮ সালের সংবিধানের সাথে আদর্শ ও দর্শন, বিষয়বস্তু এবং অন্যান্য কয়েকটি ব্যাপারে ১৯৮২ সালের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ মৌল পার্থক্য রয়েছে। আমরা ঐগুলি নীচে আলোচনা করছি ঃ

১৯৫৪ সালের সংবিধানের সাথে সাদৃশ্য

ক. বর্তমান সংবিধানে (১৯৮২) এমন কতকগুলি সাংবিধানিক কাঠামো ও আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে যেগুলি ১৯৭৫ ও ১৯৭৮ সালের সংবিধানে বাতিল করা হয়েছিল, তাই অনেকে ১৯৮২ সালের সংবিধানকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগের অবস্থায় ফিরে আসার প্রয়াস বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ বর্তমান সংবিধানের সাথে ১৯৫৪ সালের সংবিধানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায় ঃ

আকৃতি

প্রথমত, ১৯৫৪ সালের সংবিধানে ১০৬ টি ধারা ছিল। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরে সংবিধানকে সরল ও জনগণের বোধগম্য করে তোলার জন্য মাত্র ৩০টি ধারায় উপস্থিত করা হয়। ১৯৭৮ সালে আবার তা বাড়িয়ে ৬০টি করা হয়। বর্তমান সংবিধানে ১৩৮টি ধারা যুক্ত হয়েছে। সুতরাং ১৯৫৪ সালের মত বর্তমান সংবিধান দীর্ঘায়িত ও বিস্তৃত।

রাষ্ট্রপতি পদসৃষ্টি

দ্বিতীয়ত, ১৯৫৪ সালের শাসনব্যবস্থায় গণসাধারণতন্ত্রী চীনের জন্য চেয়ারম্যানের পদ স্বীকৃত ছিল। কিন্তু ১৯৭৫ ও ১৯৭৮ সালের সংবিধানে ঐ পদ লোপ করা হয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে লালরক্ষী বাহিনী দ্বারা তৎকালীন চেয়ারম্যান লিউ সা চী অপসারিত হবার [illegible] থেকে গত এক দশকের বেশি সময় চীনে কোন চেয়ারম্যান পদ ছিল না। কিন্তু ১৯৫৪ সালের সংবিধানের মত বর্তমান সংবিধানে চীন গণসাধারণতন্ত্রের জন্য রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির পদ আবার সৃষ্টি করা হয়েছে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে

তৃতীয়ত, শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি পদকেই আবার সৃষ্টি করা হয়নি, ১৯৫৪ সালের সংবিধানকে অনুকরণ করে সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির ক্ষমতা ও [illegible]য়িত্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কমিউন ব্যবস্থা নাকচ

চতুর্থত, ১৯৫৪ সালের সংবিধানে জনগণের কমিউন গঠনের কোন কথা ছিল না। ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে চীনে কমিউন আন্দোলন শুরু হয় এবং ঐ বছর নভেম্বর মাসে গণ কমিউনগুলি গঠিত হয়। ১৯৭৫ ও ১৯৭৮ সালের সংবিধানে কমিউন ব্যবস্থাকে সমর্থন ও উৎসাহিত করা হয় কিন্তু ইতিমধ্যে চীনের গণকমিউন ব্যবস্থা নিয়ে এক তত্ত্বগত বিরোধ উপস্থিত হয়। বর্তমান সংবিধানে কমিউন সম্পর্কে একটি কথাও নেই। বস্তুত ১৯৮২ সালের

সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে কমিউনের তত্ত্বগত ভিত্তিকে নাকচ করে দেয়া হয়।

মাও-এর চিন্তাধারা উপেক্ষিত

খ. ১৯৫৪ ও ১৯৭৫ সালের সংবিধানে পুরোপুরিভাবে এবং ১৯৭৮ সালের সংবিধানে আংশিকভাবে মাও-সে-তুং-এর চিন্তাধারা প্রাধান্য পেয়েছিল। ঐ সংবিধান-গুলিতে মাও-এর নেতৃত্ব ও চিন্তাধারার সশ্রদ্ধ উল্লেখ ছিল। কিন্তু বর্তমান সংবিধানে মাও-এর চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক লাইন পুরোপুরি গ্রহণ করা হয়নি, বরং অনেক ক্ষেত্রেই অস্বীকার করা হয়েছে।

আইনানুগ ব্যবস্থা শক্তিশালী

গ. চীনের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব মনে করেন যে, প্রচলিত আইনের শিথিলতার জন্যই 'চার চক্রীর' উত্থান সম্ভব হয়েছিল এবং এজন্য ১৯৭৮ সালের শাসনব্যবস্থা থেকে বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় আইনানুগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হয়। সাংবিধানিক নির্দেশ ও আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তাহা দেখার দায়িত্ব জাতীয় গণকংগ্রেস এবং অন্যান্য স্তরের গণ-কংগ্রেসগুলির উপর ন্যস্ত করা হয়; সার্বিক উন্নতির জন্য শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব দেয়া হয় এবং স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের সাংবিধানিক ব্যবস্থা রদ করা হয়।

রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির কার্যাবলী আলোচিত

ঘ. ১৯৫৪ সালের শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থার কার্যাবলীর বিশদ সংখ্যা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের শাসনব্যবস্থায় এ সম্পর্কে আশ্চর্যজনক নীরবতা দেখান হয়। ১৯৭৮ সালের সংবিধানে সংক্ষেপে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হয়, কিন্তু বর্তমান সংবিধানে আবার জাতীয় গণকংগ্রেস, স্থায়ী কমিটি, রাষ্ট্রীয় পরিষদ, গণআদালত ইত্যাদির ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নীতি ও সম্পর্ক

ঙ. ১৯৭৮ সালের সংবিধানে আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, চীন সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ও যুদ্ধনীতির বিরোধিতা করবে এবং পঞ্চশীলের নীতির প্রতি অবিচল থাকবে এবং মাও'র তিন বিশ্বতত্ত্ব অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিসহ তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সাথে ঐক্য ও মৈত্রীকে দৃঢ় করিবার কথা প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সংবিধান এ ব্যাপারে নীরব।

সোভিয়েত বিরোধীতা নেই

চ. ১৯৭৮ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংশোধনবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে মোকাবিলার কথা বলা হয়েছিল এবং ঐ সাথে সোভিয়েত বিরোধী একটা ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সংবিধানে ঐ ধরনের বক্তব্য ও ইঙ্গিত অনুপস্থিত।

৫-৪. চীনের সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

Salient Features of the Constitution of PRC

চীন গণসাধারণতন্ত্রের ১৯৮২ সালে গৃহীত নতুন সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা প্রয়োজন: ক. সাধারণ ধর্ম সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য এবং খ. শাসনতন্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত সাধারণ নীতি সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য।

সাধারণ ধর্ম সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য

১. আগেকার শাসনতন্ত্রগুলির মত চীনের বর্তমান শাসনতন্ত্রও লিখিত। প্রস্তাবনা এবং চারটি অধ্যায়ে মোট ১৩৮টি ধারার মধ্যে চীনের সংবিধান লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। চীনের সংবিধান আয়তনে ছোট হলেও তা মার্কিন শাসনব্যবস্থা থেকে বড়, কিন্তু সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা থেকে ছোট।

লিখিত ও আয়তনে ছোট

২ চীনের সংবিধান খুবই সরল এবং এর সংশোধন পদ্ধতিও নমনীয়। সংবিধান সংশোধনের দায়িত্ব জাতীয় গণকংগ্রেসের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের জন্য এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় না। বর্তমান সংবিধানের ৬২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি বা জাতীয় গণকংগ্রেসের এক-পঞ্চমাংশের বেশী ডেপুটি দ্বারা সংশোধন প্রস্তাব গণকংগ্রেসে উত্থাপিত হবে এবং গণকংগ্রেসের কম করে দু-তৃতীয়াংশ ভোটে তা অনুমোদিত হতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে. চীনের সংবিধান সংশোধনের জন্যও সোভিয়েত ইউনিয়নের মত দু-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয়। সুতরাং বলা যায় যে, চীনের সংবিধান মোটামুটিভাবে সহজ পরিবর্তনশীল বা নমনীয়।

নমনীয়

৩. চীন গণসাধারণতন্ত্র একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়নের মত এখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়নি। এখন প্রশ্ন হল, এত বিশাল একটি রাষ্ট্র কি করে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় চলতে পারে? গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি এবং ক্ষমতা ও কাজের ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ করে এই ব্যবস্থা চালু রাখা হয়। চীনে গণকমিউনগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা হিসাবে কাজ করে এবং আইন-শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কমিউনগুলি কাউন্টির, কাউন্টিগুলি প্রাদেশিক সংগঠনের ... প্রাদেশিক সংগঠনগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতামূলক নেতৃত্বে পরিচালিত ... । বর্তমান সংবিধানে কমিউন সম্পর্কে কিছু বলা না হওয়ায় কমিউনগুলির ভবিষ্যৎ কি সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র কিন্তু ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

৪. চীনের শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসিত নয়, এমনকি ইহা আইনসভা পরিচালিতও নয়—যদিও কাঠামোগত দিক থেকে অনেকটা সে রকম। জাতীয় গণকংগ্রেস ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মত সার্বভৌম নয় এবং সকল ক্ষমতার উৎস নয়। চীনের শাসন ব্যবস্থাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগোত্রীয় বলা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতি শাসিত বা আইনসভা পরিচালিত নয়

৫. চীনে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ ঘটেনি, বরং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ লক্ষ্য করা যায়। ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতির বুর্জোয়া ভাষ্যকে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে একটি ধোঁকা বলে মনে করা হয়। কারণ, সেখানে শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগ একই শ্রেণীস্বার্থ ও শোষণব্যবস্থা কায়েম রাখার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণকে অবশ্য পালনীয় কোন মৌল নীতি হিসাবে মনে করে

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নেই

না। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের মত চীনেও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির কোন অস্তিত্ব নেই। বরং সেখানে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ লক্ষ্য করা যায়—জাতীয় গণকংগ্রেস আইনসভা হিসাবে কাজ করেও শাসন ও বিচার বিভাগের কাজের তত্ত্বাবধান করে।

এক-কক্ষ আইনসভা

৬. চীন গণসাধারণতন্ত্রের আইনসভা জাতীয় গণকংগ্রেস এক-কক্ষবিশিষ্ট। এ ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে এর পার্থক্য দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েত দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট।

শাসনব্যবস্থার ভিত্তি

৭. সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থার তত্ত্বগত ভিত্তি হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। এর সাথে মাও-সে-তুঙের চিন্তাধারা যুক্ত হওয়ায় চীনের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও-সে-তুঙের চিন্তাধারা। উপরোক্ত নীতি ও মতাদর্শকে ভিত্তি করে সমাজতন্ত্র বিকাশের জন্য রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ। তবে আগের সংবিধান থেকে বর্তমান সংবিধানে মাও-এর চিন্তাধারার উপর গুরুত্ব কম দেয়া হয়েছে।

নির্বাচন ব্যবস্থা

৮. চীনের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উচ্চতর কমিটিগুলির সদস্যগণ জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত হয় না। তাঁরা প্রদেশ, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, মুক্তিফৌজ, পৌরসভা ইত্যাদি সংস্থার প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত হন। সুতরাং বলা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মত চীনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের মত চীনে প্রতিনিধি প্রত্যাহার পদ্ধতি থাকার জন্য ঐ সব সংস্থা (নির্বাচক মণ্ডলী) ইচ্ছা করলে প্রতিনিধিদের অপসারিত করতে পারে।

নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য

৯. চীনের শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে (৩২ থেকে ৫৩ নম্বর ধারা) নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। চীনে নাগরিকদের স্বীকৃত অধিকারগুলি হল : বাক্, পত্রালাপ, সমাবেশ, সংগঠন, ধর্মঘট ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ভোটাধিকার, ধর্মে বিশ্বাস করা বা বিশ্বাস না করার স্বাধীনতা, দৈহিক ও বাসস্থানের স্বাধীনতা, কাজের অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, অক্ষম ও অসুস্থ অবস্থায় আর্থিক সাহায্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার। অন্যদিকে সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকদের কয়েকটি কর্তব্য পালন করা বাধ্যতামূলক। এগুলি হল : চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে সমর্থন করা, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করা, সরকারী সম্পত্তির যত্ন লওয়া, শ্রম-শৃঙ্খলা ও সামাজিক শৃঙ্খলা মান্য করা, রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা করা, মাতৃভূমিকে রক্ষা করা ও আক্রমণ প্রতিরোধ করা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থায় জনগণের আর্থনীতিক অধিকারকে স্বীকার করা হয় না—রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের বাগাড়ম্বরই সেখানে প্রাধান্য লাভ করে। আর্থনীতিক স্বাধীনতা সহ চীনের নাগরিকদের এই ব্যাপক অধিকার ও সমাজতান্ত্রিক কর্তব্যকে একমাত্র সোভিয়েত জনগণের অধিকার ও কর্তব্যের সাথেই তুলনা করা যায়।

১০. ন্যায়সঙ্গত কাজকে সমর্থন করার জন্য, বৈপ্লবিক আন্দোলন বা ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হবার জন্য নির্যাতিত যে কোন বিদেশীকে চীনে রাজনৈতিক আশ্রয় দান করা হবে বলে সংবিধানে অঙ্গীকার করা হয়েছে। সোভিয়েত সংবিধানেও উপরোক্ত কারণে বিদেশীদের সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে।

রাজনৈতিক আশ্রয় দান

খ. শাসনতন্ত্রে ঘোষিত সাধারণ নীতি (General Principles) সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য

১১. সংবিধানের ১ নম্বর ধারায় চীন সাধারণতন্ত্রকে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মৈত্রীর ভিত্তিতে গঠিত জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের ভিত্তি হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান (ব্রেজনেভ) শাসনতন্ত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়েছে।

জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব

১২. শাসনতন্ত্রের তৃতীয় ধারায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসরণ করবার কথা বলা হয়েছে। চীনের জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। সরকারী কাজকর্মের ক্ষেত্রে জনগণের উদ্যোগকে প্রসারিত করা হবে। নিম্নস্তরে গৃহীত সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে উচ্চস্তর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এভাবে সর্বোচ্চ স্তরে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সর্বোচ্চ স্তরে গৃহীত সিদ্ধান্ত মানা করা সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক। সোভিয়েত ইউনিয়নেও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ঐ নীতি প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা

১৩. শাসনতন্ত্রে চীনকে একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয় (৪নং ধারা)। প্রতিটি জাতি যাতে নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা প্রণালী সংরক্ষণ করতে পারে তার জন্য জাতিগুলিকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেয়া হয়েছে এবং জাতিগুলির মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রী পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নেও বহু জাতি আছে। সেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার দান করে বহুজাতিক রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছে। চীনে বহুজাতিক সমস্যাকে একটু স্বতন্ত্রভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক রাষ্ট্র

১৪. শাসনতন্ত্রের প্রথম ধারায় চীনকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবিধানের ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী দু ধরনের মালিকানা স্বীকৃত: ১. রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা এবং ২. গ্রামীণ কমিউনের ক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনসাধারণের যৌথ মালিকানা। সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী সেখানে যে কাজ করবে না, সে খেতেও পাবে না এবং প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী দেবে এবং কাজ অনুযায়ী পাবে। সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য রাষ্ট্র সবরকম প্রয়াস ও নীতির প্রতি অনুগত থাকবে। রাষ্ট্র সবরকম রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও প্রতিবিপ্লবী কাজকর্ম দমন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের নিশ্চয়তা দান করেছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ঐ সকল নীতির

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

সাথে সোভিয়েত ব্যবস্থার বহু সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, অন্যদিকে বুর্জোয়া ব্যবস্থার সাথে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

বিজ্ঞানের প্রসার ও পেশাদারী ব্যবস্থা

১৫. বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তি বিদ্যা প্রসারে এবং শিল্প-বিপ্লবে রাষ্ট্র বিশেষভাবে প্রয়াসী থাকবে। পেশাদারী ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে এবং পেশাদারী ব্যক্তিদের সাথে জনগণের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। শিক্ষার মানের উন্নতি এবং শ্রমের সাথে শিক্ষাকে যুক্ত করা হবে।

১৬. চীনে সামরিক বাহিনীকে রাজনীতির অঙ্গীভূত করা হয়েছে এবং এদের জনগণের একটা অংশ এবং জনগণের নিজস্ব সশস্ত্রবাহিনী বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

সশস্ত্রবাহিনী ও এর ভূমিকা

সামরিক বাহিনীকে বৈপ্লবিকীকরণে ও আধুনিকীকরণে রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকবে। চীনে সামরিক বাহিনীর কর্তব্য হল দেশের সার্বভৌমিকতা, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্যকে রক্ষা করা (২৮ নম্বর ধারা)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বুর্জোয়া দেশগুলিতে সামরিক বাহিনীকে রাজনীতি, দেশ গঠন এবং সমাজের জীবন ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে শোষকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার যন্ত্রে পরিণত করা হয়। চীনসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এ ব্যাপারে মৌল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

৫-৫. ১৯৮২ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনা

Preamble of the Constitution of 1982

চীনের ১৯৮২ সালের (বর্তমান) সংবিধানের প্রস্তাবনার প্রথমেই চীন গণসাধারণতন্ত্রের আত্মপ্রকাশের ঐতিহাসিক পটভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। ১৯১১ সালের বিপ্লবে সান ইয়াত সেনের নেতৃত্বে সামন্ত রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে কিছু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রচেষ্টায় ঐ বিপ্লবের সাফল্য নষ্ট হয়ে যায়। এর পরে ১৯৪৯ সাল থেকে মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত চীনের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া ব্যবস্থা বিরোধী দীর্ঘ ও কষ্টকর সংগ্রামের গৌরবজনক বিজয়ের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে গণসাধারণতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়।

বর্তমান সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয় যে, গণসাধারণতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠার পর থেকে চীনের সমাজের ক্রমাগত নয়া-গণতন্ত্র থেকে উত্তরণ ঘটেছে সমাজতন্ত্রে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হয়েছে। শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্বে জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনগণের সহায়তায় চীনের গণমুক্তি ফৌজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার সহযোগীদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে চীনের জাতীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করেছে। শক্তিশালী আর্থনীতিক বনিয়াদ, স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থা এবং জাতীয় আর্থনীতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত প্রয়াসের উন্নতি ঘটেছে এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয়েছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-এর চিন্তাধারার ভিত্তিতে মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারায় পরিচালিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের জনগণকে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য নানা বাধা বিঘ্ন ও কষ্ট অতিক্রম করতে প্রেরণা দিয়েছে এবং ভুল শুধরিয়ে সঠিক পথে চালিত করেছে। ঐ চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ হয়ে চীনের জনগণ সমাজতন্ত্রের পথ ও জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কতাকে তুলে ধরবে, সর্বস্তরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাবে এবং ধীরে ধীরে চীনকে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করবে। চীনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী দেশের ভেতর ও বাইরের শক্তিগুলির সাথে জনগণ সংগ্রাম করবে এবং তাদের পরাজিত করবে। তাইওয়ান চীনের পবিত্র ভূখণ্ডের অংশ, তাই চীনের জনগণের দায়িত্ব হল তাইওয়ানকে পবিত্র মাতৃভূমির সাথে যুক্ত করা।

বিপ্লব এবং দেশ গঠনের দীর্ঘ দিনগুলিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ব্যাপক ভিত্তিতে যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছে তাকে আরও বিকশিত ও শক্তিশালী করা হবে। যুক্তফ্রন্টের সাংগঠনিক রূপ হল চীনের জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শমূলক কনফারেন্স। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এবং সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ ও জাতীয় ঐক্য সংহতিকে রক্ষার জন্য বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর ক্ষেত্রে ঐ সংস্থা আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

চীন হ'ল বিভিন্ন জনসমাজকে নিয়ে গঠিত একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এই জনসমাজগুলির মধ্যে সমতার সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক, ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে উঠেছে এবং তা আরও দ্রুত শক্তিশালী হবে। বিভিন্ন সংখ্যালঘু জনসমাজের আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটিয়ে এদের সমৃদ্ধ করার জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকবে।

গোটা বিশ্বের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সাথে চীনের ভবিষ্যৎ যুক্ত। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীন পঞ্চশীলের পাঁচটি নীতিতে বিশ্বাসী। চীন সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা এবং নেতৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠারও বিরোধী, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে মৈত্রীতে বিশ্বাসী। অনুন্নত ও শোষিত জাতিগুলির স্বাধীনতা ও জাতীয় অর্থনীতির ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে চীন সমর্থন করে এবং সে বিশ্বশান্তি রক্ষায় উৎসাহী এবং মানবজাতির প্রগতির প্রচেষ্টায় প্রয়াসী।

এই সংবিধান চীনের জনগণের সংগ্রামের সাফল্যকে লিপিবদ্ধ করছে এবং রাষ্ট্রের মৌল ব্যবস্থা ও কার্যসূচীকে তুলে ধরছে। এই সংবিধান হ'ল দেশের মৌল আইন এবং চূড়ান্ত আইনগত কর্তৃত্ব। চীনের জনগণ, প্রতিটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা, গণফৌজ, রাজনৈতিক দল এবং গণসংস্থাগুলির আচরণ সংবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তারা সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা করবে এবং এর প্রয়োগ সুনিশ্চিত করবে।

১৯৭৮ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনার সাথে বর্তমান প্রস্তাবনার পার্থক্য

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, চীনের বর্তমান সংবিধানের প্রস্তাবনার সাথে ১৯৭৮ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনার কয়েকটি মৌল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ১৯৭৮ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরুতেই মাও সে তুংকে চীনের জনসাধারণের মহান্ নেতা ও শিক্ষক বলে অভিহিত করা হয়েছিল। ঐ প্রস্তাবনায় তাঁকে চীন গণসাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, মাও সে তুং-এর পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার

কথা বলা হয়েছিল এবং তাঁর নেতৃত্ব ও চিন্তাধারার বার বার সপ্রশংস উল্লেখ ছিল। কিন্তু বর্তমান সংবিধানের প্রস্তাবনায় একবার মাও সে তুং-এর নাম এবং দুবার তাঁর চিন্তাধারার উল্লেখ করা হলেও ১৯৭৮ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনার মত তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অনেকে মনে করেন।

দ্বিতীয়ত, ১৯৭৮ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংশোধনবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতির কথা বলার ফলে সোভিয়েত বিরোধী একটা সুর ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঐসব কথা বাদ দেয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত, ১৯৭৮ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিল যে, চীন কখনও বৃহৎশক্তি (super power) হবার চেষ্টা করবে না। কিন্তু বর্তমান সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঐ অঙ্গীকারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না।

চতুর্থত, ১৯৭৮ সালের সংবিধানে মাও-এর তিন বিশ্বের তত্ত্ব তুলে ধরে বলা হয়েছিল যে, পৃথিবীর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এবং পৃথিবীর সর্বহারা শ্রেণী ও সকল নির্যাতিত জাতিগুলির সাথে চীনের ঐক্যকে দৃঢ়তর করা হবে। কিন্তু বর্তমান সংবিধানে এ ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি।

সমালোচনা ও মূল্যায়ন

চীনের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে যে সকল আদর্শ, দর্শন ও নীতির কথা ব্যক্ত হয়েছে তা সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবকে সংরক্ষণ ও প্রসারিত করা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিকাশের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন বুর্জোয়া সোস্যাল ডেমোক্রাট পন্থী সংবিধানের সাথে চীন গণ-সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের মৌলিক আদর্শ ও নীতিগত মৌল পার্থক্য প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন মহল থেকে চীনের বর্তমান সংবিধানের প্রস্তাবনাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়েছে এবং ঐ সমালোচনা এসেছে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় দিক থেকেই।

পাশ্চাত্য সমালোচকগণ মনে করেন, চীনা নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আড়াল করার জন্যই দীর্ঘ প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে ব্যাপক বাক্যজাল বোনা হয়েছে। তাঁদের মতে প্রস্তাবনা নিছক বাগাড়ম্বর মাত্র—বাস্তব অবস্থার প্রকাশ নয়। প্রস্তাবনায় পঞ্চশীলের প্রতি আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে চীন পঞ্চশীলের নীতি প্রয়োগ থেকে বিরত থাকছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সমালোচনা

কোন কোন মহল থেকে বলা হয়েছে যে, তৃতীয় বিশ্ব ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে প্রস্তাবনায় মৈত্রী দৃঢ় করার কথা বলা হলেও চীন ক্রমশ তৃতীয় বিশ্বের এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। প্রস্তাবনায় পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত হানবার কথা বলা হলেও চীন ক্রমশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা করছে।

অন্য সমালোচনা

মাওপন্থী একদল সমালোচক মনে করেন যে; প্রস্তাবনায় মাওয়ের নাম উল্লেখ করে জনসমর্থন নিজেদের দিকে বজায় রেখে চীনের বর্তমান নেতৃবৃন্দ বস্তুত মাওয়ের চিন্তাধারার বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হচ্ছে এবং সংস্কৃতি বিপ্লবের দ্বারা অর্জিত সাফল্যকে নষ্ট করে সংশোধনবাদী পথে চলছে। চীনের বর্তমান নেতারা প্রস্তাবনায় মাও-এর নাম ও চিন্তাধারার উল্লেখ করলেও সহজেই বোঝা যায় যে মাও-এর ভূমিকা ও গুরুত্বকে তারা উপেক্ষা এবং অস্বীকারের পথ গ্রহণ করেছেন। প্রস্তাবনায় ব্যক্ত আদর্শের সাথে চীনের বর্তমান নেতৃত্বের কার্যাবলীর কোন যোগ নেই বললেই চলে। তাদের মতে সাংস্কৃতিক বিপ্লবোত্তর অবস্থাকে পাশ কাটিয়ে চীনের বর্তমান নেতৃত্ব যে 'নয়া গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী তা প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে।

মাওপন্থীদের সমালোচনা

১৯৫৪ সালের সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে যে সপ্রশংস উল্লেখ ছিল পরবর্তী দুটি সংবিধানে তা ছিল অনুপস্থিত। তবে ১৯৭৮ সালের সংবিধানে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও শোধনবাদের যে উল্লেখ ছিল বর্তমান সংবিধানে তা নেই। তাই অনেকে মনে করেন যে, বর্তমান সংবিধানের প্রস্তাবনায় সোভিয়েত বিরোধী জেহাদ অনেকাংশে অনুপস্থিত। অনেকের মতে এর কারণ হ'ল এই যে চীনের বর্তমান নেতৃত্ব মাও-এর চিন্তধারা ও রাজনৈতিক লাইন ত্যাগ করে ধীরে ধীরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে চলেছে এবং ১৯৮২ সালে সংবিধান পরিবর্তন সেই প্রক্রিয়ারই একটি অংশ।

৬ রাষ্ট্রীয় কাঠামো
The Structure of the State

৬-১. চীন গণসাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রকাঠামো
Structure of the State

গণসাধারণতন্ত্র একটি বিকেন্দ্রিক এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং কয়েকটি আঞ্চলিক সরকার নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়, চীনে সে অর্থে আঞ্চলিক সরকার নেই। শাসনের সুবিধার জন্যে চীন গণসাধারণতন্ত্রকে বিভিন্ন প্রদেশ, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন পৌরসংস্থায় বিভক্ত করা হয়েছে। চীনের বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামোর সাথে একদা চীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী সরকারগুলির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

চীনের রাষ্ট্র কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, চীনে কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হল **জাতীয় গণকংগ্রেস** (The National People's Congress)। জাতীয় গণকংগ্রেসকে আইন প্রণয়নকারী ও সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে। **স্থায়ী কমিটি** (Standing Committee) নামে জাতীয় গণকংগ্রেসের একটি স্থায়ী সংস্থা আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে **রাষ্ট্রীয় পরিষদ** (State Council) বলা হয়। এ সংস্থাকে শাসন-বিভাগ বলা যায়। এ ছাড়া সর্বোচ্চ **গণ আদালত এবং সর্বোচ্চ গণ প্রকিউরেটরেট** (The People's Court and the People's Procuratorate) বিচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করে। চীনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি অনুসৃত হয় না বলে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলী কোন অলংঘনীয় সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ নয়, বরং পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার উপর নির্ভরশীল। বস্তুত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সকল বিভাগ বা সংস্থা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

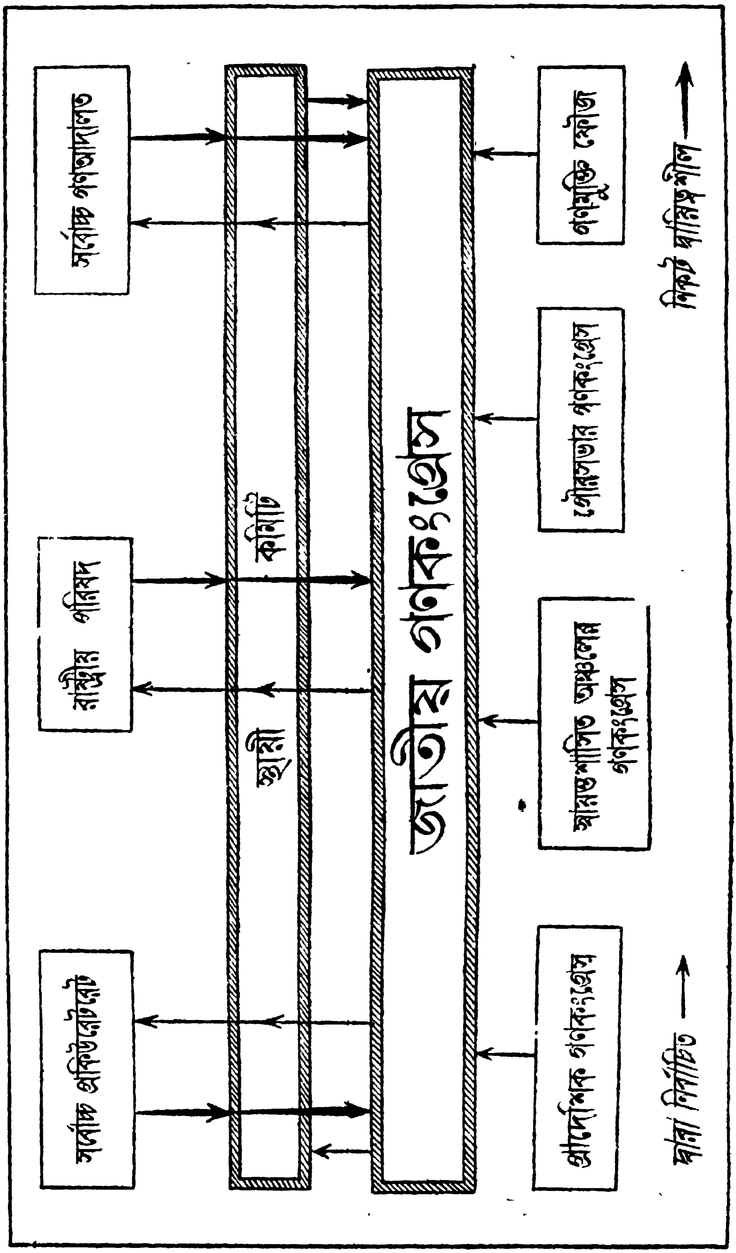
কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন

কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্ব সত্ত্বেও চীনে জাতীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলসমূহের স্ব-শাসিত সংস্থা আছে। শাসনতন্ত্রের ৫৪—১৩৭ ধারায় এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের স্ব-শাসিত সংস্থা হল গণকংগ্রেস এবং বিপ্লবী কমিটিসমূহ। কেন্দ্রীয় সরকারের সাংগঠনিক অঙ্গগুলির মধ্যে গণকংগ্রেস হল সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা, আঞ্চলিক বিপ্লবী সংস্থা হল কার্যকরী সংস্থা এবং আঞ্চলিক গণ আদালত ও গণ প্রকিউরেটরেট হল বিচার বিভাগীয় সংস্থা।

আঞ্চলিক ব্যবস্থা

৬-২. জাতীয় গণকংগ্রেস
The National People's Congress

চীন সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের ৫৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, জাতীয় গণকংগ্রেস হল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা (The National People's Congress is the



কেন্দ্রীয় শাসনকাঠামো

highest organ of state power)। সংবিধানের ২ নম্বর ধারা অনুযায়ী চীন সাধারণতন্ত্রের সর্বময় ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত এবং জাতীয় গণকংগ্রেস ও অন্যান্য স্তরের গণকংগ্রেসের মাধ্যমে জনগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে। জাতীয় গণকংগ্রেস সোভিয়েত রাশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েতের মত আইন প্রণয়নকারী ও সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা। তবে সুপ্রীম সোভিয়েতের মত এটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট নয়—জাতীয় গণকংগ্রেস এক-কক্ষবিশিষ্ট সংস্থা। সাধারণভাবে জাতীয় গণকংগ্রেস আইন বিভাগীয় সংস্থা হলেও ইহা শাসন, আইন ও বিচার বিভাগীয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। বুর্জোয়া দেশে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির কথা বলা হয়। কিন্তু মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর নির্ভর করে না—তা রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রের উপর নির্ভর করে। তাই চীনে জাতীয় গণকংগ্রেসকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মত একটি নিছক আইন বিভাগীয় বিতর্ক-সভায় পরিণত করা হয়নি—একে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থায় রূপদান করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা

চীন গণসাধারণতন্ত্রের জাতীয় গণকংগ্রেস সংবিধানের ৫৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশ, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন পৌরসভার গণকংগ্রেস এবং গণমুক্তি ফৌজ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের (deputies) নিয়ে পাঁচ বছরের জন্য গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনার পর গোপন ব্যালটে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জনগণের দ্বারা জাতীয় গণকংগ্রেসের সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন না। জাতীয় গণকংগ্রেসের কার্যকাল পাঁচ বছর। তবে বিশেষ অবস্থায় এর কার্যকাল বৃদ্ধি করা যেতে পারে, বা এর কার্যকাল সমাপ্ত হবার আগেই পরবর্তী জাতীয় গণকংগ্রেস গঠন করা যেতে পারে। জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করে। জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন বসে বছরে একবার। প্রয়োজনবোধে এর অধিবেশন নির্দিষ্ট সময়ের আগেও বসতে পারে আবার অধিবেশন বাতিলও করা যেতে পারে। জাতীয় গণকংগ্রেস কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে সে সম্পর্কে শাসনতন্ত্রে কিছু বলা হয়নি। চতুর্থ গণকংগ্রেস ২,৮৮৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল। পঞ্চম গণ-কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ছিল ৩,৪৯৭ জন।

গঠন

জাতিগুলির প্রতিনিধিত্বের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকরণে চীনে জাতীয় গণপরিষদকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট করা হয়নি। এক-কক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় গণকংগ্রেসেই বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করা হয়।

জাতীয় গণকংগ্রেসের সদস্যদের বলা হয় ডেপুটি। ১৮ বৎসর বয়স্ক যে কোন নির্বাচক বা ভোটার ডেপুটিপদে নির্বাচন প্রার্থী হতে পারে। জাতীয় গণ-কংগ্রেসের ডেপুটিরা রাষ্ট্রীয় পরিষদ, সর্বোচ্চ গণআদালত, সর্বোচ্চ প্রকিউরেটরেট এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের মন্ত্রী ও কমিশনের কাছে যে কোন বিষয় জানতে চাইতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলে ঐ বিষয়ে উত্তর দিতে বাধ্য। তবে ডেপুটিদের নিজ নিজ নির্বাচক সংস্থার তত্ত্বাবধানে চলতে হয়। নির্বাচন সংস্থা-

ডেপুটি

গুলি তাদের দ্বারা নির্বাচিত ডেপুটিদের পরিবর্তন করতে পারে। জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী সভা ডেপুটিদের নির্বাচন পরিচালনা করে।

জাতীয় গণকংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

জাতীয় গণকংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী শাসনতন্ত্রের ৬০ নম্বর ধারায় আলোচনা করা হইয়াছে। জাতীয় গণকংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে: ১. আইন সংক্রান্ত, ২. শাসন সংক্রান্ত ৩. অর্থ সংক্রান্ত ৪. পররাষ্ট্র সংক্রান্ত এবং ৫. অন্যান্য।

জাতীয় গণকংগ্রেসে আইন প্রণয়নের চরম কর্তৃত্ব ভোগ করে এবং ইহা সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা হিসাবে কাজ করে। দেশের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে এই সংস্থা। জাতীয় গণকংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে আইন প্রণয়ন করা হয়। অন্যান্য দেশের আইন প্রণয়ন সংস্থার মত জাতীয় গণকংগ্রেস শাসনতন্ত্র সংশোধনের দায়িত্ব পালন করে। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে জাতীয় গণকংগ্রেস শাসনতন্ত্র সংশোধন করতে পারে। আইন ও সংবিধানের ধারাসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয় কিনা তা দেখার দায়িত্ব জাতীয় গণকংগ্রেসের।

আইন প্রণয়ন ও সংবিধান সংশোধন

জাতীয় গণকংগ্রেস কিছু কিছু শাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে। এই দায়িত্বের মধ্যে নিয়োগ, অপসারণ এবং নিয়ন্ত্রণই প্রধান। ক. জাতীয় গণকংগ্রেস চীন গণ-সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করে। খ. জাতীয় গণকংগ্রেস রাষ্ট্রপতির সুপারিশ অনুযায়ী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের ওপর রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গ. প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী উপপ্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় কমিশনারস, মন্ত্রী, মুখ্য হিসাবরক্ষক, মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঘ. জাতীয় গণকংগ্রেস সর্বোচ্চ গণআদালতের সভাপতি এবং সর্বোচ্চ প্রকিউরেটরেটের প্রধান প্রকিউরেটরেটকে নির্বাচন করে। গণআদালত এবং প্রকিউরেটরেটের কার্যাবলীর তদারক করে জাতীয় গণকংগ্রেস এবং যখন এর অধিবেশন চলে না তখন ঐ দায়িত্ব পালন করে এর স্থায়ী কমিটি। সর্বোচ্চ গণআদালতের সভাপতি ও সর্বোচ্চ প্রকিউরেটরেটকে অপসারণ করার ক্ষমতা ভোগ করে জাতীয় পরিষদ। ঙ. জাতীয় গণকংগ্রেস এর স্থায়ী কমিটির সদস্যদের পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত করে।

নিয়োগ

জাতীয় গণকংগ্রেস চীন গণসাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, মিলিটারী কমিশনের সভাপতি, সর্বোচ্চ প্রকিউরেটরেটের সভাপতি, প্রধান প্রকিউরেটর, সর্বোচ্চ গণ-আদালতের সভাপতিকে অপসারণ এবং প্রত্যাহার করতে পারে।

রাষ্ট্রীয় পরিষদ তার কার্যাবলীর জন্য জাতীয় গণকংগ্রেসের কাছে দায়ী থাকে এবং যখন এর অধিবেশন চলে না তখন জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির কাছে দায়িত্বশীল থাকে। গণকংগ্রেসের ডেপুটিরা পরিষদের রাষ্ট্রীয় সদস্যদের যে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে এবং পরিষদের সদস্যরা জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর দিতে বাধ্য থাকেন।

শাসনতন্ত্রের ৬০ (৮) এবং ৬০ (৯) নম্বর ধারা অনুযায়ী জাতীয় গণকংগ্রেস রাষ্ট্রীয় বাজেট এবং জাতীয় আর্থিক পরিকল্পনা অনুমোদন করে। রাষ্ট্রের চূড়ান্ত হিসাবপত্র পরীক্ষা করে দেখার দায়িত্বও ইহা ভোগ করে। এক কথায় অর্থসংক্রান্ত নীতি ও বাজেট নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা জাতীয় গণকংগ্রেস ভোগ করে।

বাজেট ও পরিকল্পনা

জাতীয় গণকংগ্রেস পররাষ্ট্র সংক্রান্ত চরম ক্ষমতা ভোগ করে। যুদ্ধ ও শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে এই সংস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত চুক্তি প্রয়োগ ও বাতিল করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পররাষ্ট্র বিষয়

প্রদেশ, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন পৌরসংস্থা সমূহকে শাসনতান্ত্রিক বিভাগের অনুমোদন দান করে জাতীয় গণকংগ্রেস। এছাড়াও জাতীয় গণকংগ্রেস প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করতে এবং এ সম্পর্কে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

অন্যান্য বিষয়

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন যখন চলে না তখন এর দায়িত্ব স্থায়ী কমিটি পালন করে।

জাতীয় গণকংগ্রেসের কার্যাবলীর মূল্যায়ন

জাতীয় গণকংগ্রেসের ভূমিকা সম্পর্কে মত-পার্থক্যের অবকাশ আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, জাতীয় গণকংগ্রেসের কার্যাবলী এবং ক্ষমতা একান্তভাবেই আনুষ্ঠানিক, বাস্তবে এদের কোন গুরুত্ব বা মূল্য নেই। সমালোচকদের মতে একদিকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রভাব এবং অন্যদিকে স্থায়ী কমিটির স্থায়িত্ব-জনিত প্রাধান্যের চাপে জাতীয় গণকংগ্রেস একান্তভাবেই ক্ষমতাহীন সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

সমালোচকদের মতে, যে কোন কমিউনিস্ট দেশে রাষ্ট্রের কাঠামোগত সংস্থাগুলির ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, সেখানকার কমিউনিস্ট দলই সব ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং চীন গণসাধারণতন্ত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। এই মত অনুযায়ী, চীনের কমিউনিস্ট দলই সব নীতি নির্ধারণ করে, কোন্ আইন প্রণয়ন করা হবে তা স্থির করে এবং শীর্ষপদে কাকে নিয়োগ করা হবে তার নির্দেশ দান করে। এ বক্তব্যের সমর্থনে সমালোচকেরা বলেন যে, সংবিধানে বলা হয়েছে যে, কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্রের উপর তার নেতৃত্ব কার্যকর করে। এর অর্থ তত্ত্বগতভাবে যাই হোক না কেন বাস্তবে কমিউনিস্ট পার্টির সুপারিশ অনুযায়ী সব নিয়োগ ও অপসারণ ঘটে এবং জাতীয় গণকংগ্রেস নিয়োগের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ভোগ করে মাত্র। সুতরাং সমালোচকদের মতে উপরোক্ত সাংবিধানিক ধারাগুলি এবং বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশে জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত হয়।

১. কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ও প্রাধান্য

চীন গণসাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিচালনায় শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবর্তী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব দানের ঘটনা সংবিধানে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হয়েছে—এ ব্যাপারে কোন গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়নি। প্রীতিটি রাষ্ট্রেই শাসনক্ষমতাসীন দল

রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি নির্ধারণ করে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদি উচ্চপদে কাদের নিয়োগ করা হবে তা স্থির করে এবং রাষ্ট্রশক্তি কোন্ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করবে তাও ঠিক করে দেয়। কিন্তু সেখানে রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রকে আড়াল করে সব ব্যাপারটাই ঘটে যবনিকার অন্তরালে। কিন্তু চীনের সংবিধান প্রকাশ্যভাবে রাষ্ট্রের লক্ষ্য, শ্রেণী চরিত্র এবং কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে সংবিধানে ঘোষণা করেছে। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতাও সেখানে স্বীকৃত। এখন প্রশ্ন হল, এ অবস্থায় জাতীয় কংগ্রেসের নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও সংবিধান স্বীকৃত ক্ষমতা কতটা পরিমাণে রক্ষিত হয়? উত্তরে বলা যায়, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনসভাগুলি কী স্বাধীনভাবে কাজ করে? তারা কি ক্ষমতাসীন দলের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার আনুষ্ঠানিক ও সাংবিধানিক যন্ত্র নয়? সেখানে কী সাংবিধানিক কলাকৌশলের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের বিরোধিতা করার জন্য আইনসভাকে ব্যবহার করা হয় না? চীন সম্পর্কে বরং বলা যায় যে, সেখানে জাতীয় গণপরিষদে বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের প্রতিফলন ঘটে না। সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি এবং জাতীয় গণকংগ্রেসে শ্রমিক-কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থই প্রতিফলিত হয়। সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি এবং জাতীয় গণপরিষদের স্বার্থ অভিন্ন, তাই কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বিস্তারের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

এ সমালোচনার উত্তর

সমালোচকদের দ্বিতীয় অভিযোগ হল, জাতীয় গণকংগ্রেসের ডেপুটিদের সংখ্যা এত বেশি এবং এর অধিবেশন কাল এত সংক্ষিপ্ত যে এ সংস্থার পক্ষে কোন গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। তাই জাতীয় গণপরিষদের স্থায়ী কমিটিই বাস্তবে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী—জাতীয় গণকংগ্রেস সম্মতিদানের একটি আনুষ্ঠানিক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। সমালোচকেরা তাই মনে করেন যে, সংবিধানে স্থায়ী কমিটির যে সব কার্য ও ক্ষমতা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিয়োগ, পরিচালনা, তত্ত্বাবধান হতে শুরু করে আইন ও সংবিধানের ব্যাখ্যা দান, বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যাপারে স্থায়ী কমিটিই প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করে—জাতীয় গণকংগ্রেস নয়। সমালোচকদের মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের মত জাতীয় গণপরিষদের স্থায়ী কমিটির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, স্রষ্টা অপেক্ষা তার সৃষ্টি অধিকতর ক্ষমতা ও প্রভাবের অধিকারী হয়ে উঠেছে।

২. স্থায়ী কমিটির প্রাধান্য

এ সম্পর্কে বলা যায়, অন্যান্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রে আইনসভার অধিবেশন যখন চলে না (এমনকি যখন চলে) তখন আইনসভার এক্তিয়ারভুক্ত মৌল নীতি একজন বা দুজন (রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী) নির্ধারণ করেন এবং শাসনবিভাগীয় ঘোষণা দ্বারা আইন রচনা ও তাকে কার্যকর করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ সকল রাষ্ট্রে আইনসভার তথাকথিত পবিত্রতা, অলঙ্ঘনীয়তা প্রভৃতি বজায় থাকে। কিন্তু চীনে একক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন কর্তৃত্ব নেই, মার্কসবাদী নীতি অনুযায়ী সেখানে যৌথ নেতৃত্বের নীতি মান্য করা হয়। জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন সব সময় চলতে পারে না, তাই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং যৌথ নেতৃত্বের-

এ সমালোচনার উত্তর

নীতিকে মান্য করে একটি স্থায়ী কমিটির উপর জাতীয় গণকংগ্রেসের পক্ষে কিছু কিছু দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং গণকংগ্রেসের অধিবেশন যখন চলে না তখন তার কাজ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে—এখানে প্রভাব বা প্রাধান্যের কোন ব্যাপার নেই—সাংবিধানিক প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য ইহা অপরিহার্য। তা ছাড়া সংবিধানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, স্থায়ী কমিটি হল জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী সংস্থা এবং স্থায়ী কমিটি নিজের কাজের জন্য গণ-কংগ্রেসের কাছে দায়ী এবং জবাবদিহি করতে বাধ্য।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, চীনের রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ সংস্থা জাতীয় গণকংগ্রেসের রাজনৈতিক তাৎপর্য স্থায়ী কমিটি বা কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয়নি—বরং এরা পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজ সহ চীনের জনগণের ব্যাপকতম প্রতিনিধিত্বমূলক এ সংস্থা চীনের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্য ও গুরুত্বের অধিকারী। সেজন্যই জাতীয় গণকংগ্রেসের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করার সময় জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার দৈনন্দিন বিষয়ে এর করণীয় বিশেষ কিছু নেই এবং অন্যান্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আইনসভার মত ইহা বিতর্ক ও বাক্যজাল রচনায় (talking shop) পটু নয়। কিন্তু দেশের সংকটে এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণে জাতীয় গণকংগ্রেস বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তবে একথা ঠিক যে; ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মত জাতীয় গণ-কংগ্রেস সার্বভৌম আইনসভা নয়; কারণ চীনের সংবিধান অনুযায়ী "জনগণের হাতে চীন গণসাধারণতন্ত্রের সকল ক্ষমতা ন্যস্ত।"

সুপ্রীম সোভিয়েতের সাথে জাতীয় গণকংগ্রেসের তুলনা

সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েতের সাথে চীন গণ-সাধারণতন্ত্রের আইনসভা জাতীয় গণকংগ্রেসের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যদিও এদের মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু কিছু বৈসাদৃশ্যও দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ-ভাবে বলা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের অনুকরণে চীনের জাতীয় গণকংগ্রেসকে গঠন করা হয়েছে।

প্রথমে আমরা সুপ্রীম সোভিয়েত ও জাতীয় গণকংগ্রেস এই দুটি আইনসভার মধ্যকার সাদৃশ্যগুলি আলোচনা করছি।

১. সুপ্রীম সোভিয়েত ও জাতীয় গণকংগ্রেস উভয়ই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা।

২. উভয় সংস্থাই সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী ও মৌল নীতি নির্ধারক সংস্থা।

৩. যুদ্ধ ও শান্তিসহ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা উভয় সংস্থার হস্তে ন্যস্ত করা হয়েছে।

উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য

৪. সুপ্রীম সোভিয়েত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডিয়াম, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক, প্রকিউরেটর জেনারেলকে মনোনয়ন করে এবং এরা প্রত্যেকে সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে দায়িত্বশীল থাকে। জাতীয় গণকংগ্রেসও তেমনি রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিপরিষদ ও স্থায়ী কমিটির

সদস্যদের এবং সর্বোচ্চ গণআদালতের সভাপতি ও সর্বোচ্চ গণ প্রকিউরেটরেটের প্রধান প্রকিউরেটরকে নির্বাচিত করে এবং এরা জাতীয় গণকংগ্রেসের কাছে দায়িত্বশীল থাকে।

৫. সুপ্রীম সোভিয়েতের মত জাতীয় গণকংগ্রেস সংবিধান গ্রহণ (adoptation) ও সংশোধনের ক্ষমতা ভোগ করে।

৬. উভয় সংস্থার অধিবেশন আহ্বান পদ্ধতি এক—সুপ্রীম সোভিয়েত এবং জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন যথাক্রমে প্রেসিডিয়াম ও স্থায়ী কমিটি আহ্বান করে।

সুপ্রীম সোভিয়েতের সাথে জাতীয় গণকংগ্রেসের কয়েকটি মৌল পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথমত, সুপ্রীম সোভিয়েত একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। কিন্তু জাতীয় গণকংগ্রেস একটি এক-কক্ষ বিশিষ্ট সংস্থা। চীনে বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের প্রতিনিধিত্বের জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ গঠন করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় গণকংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা সুপ্রীম সোভিয়েত থেকে অনেক বেশি এমনকি সুপ্রীম সোভিয়েতের দু কক্ষের সদস্য সংখ্যা থেকে জাতীয় গণকংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি।

তৃতীয়ত, সুপ্রীম সোভিয়েতের ডেপুটিরা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত, কিন্তু জাতীয় গণকংগ্রেসের ডেপুটিরা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত নয়—এরা বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা নির্বাচিত হয়।

চতুর্থত, সুপ্রীম সোভিয়েতের কার্যকাল চার বছর, কিন্তু জাতীয় গণকংগ্রেসের কার্যকাল পাঁচ বছর।

পঞ্চমত, জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন সাধারণত বছরে একবার এবং সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন সাধারণত বছরে দুবার অনুষ্ঠিত হয়।

উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য

ষষ্ঠত, সুপ্রীম সোভিয়েতকে নতুন স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র (Autonomous Regions) ও অঞ্চল (Regions) গঠন এবং নতুন প্রজাতন্ত্রকে সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রহণ, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাবার অনুমতি দানের অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু জাতীয় গণকংগ্রেসকে এরূপ আঞ্চলিক বিন্যাসের কোন ক্ষমতা দেয়া হয়নি।

এ সকল বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, চীনে ১৯৫৪ সালে স্তালিন সংবিধানের সুপ্রীম সোভিয়েতের মডেল অনুসরণে মূলত জাতীয় গণকংগ্রেসকে রূপ দান করা হয়েছিল। পরে চীনে ১৯৭৫ ও ১৯৭৮ সালের সংবিধানে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। বর্তমান সংবিধানে অনেকাংশে পুরানো মডেলকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যেমন আগের সংবিধানে চীনে রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে জাতীয় গণকংগ্রেস সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সুপারিশের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক কোন নিয়োগের ব্যাপারে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা বলা হয়নি। চীনের বর্তমান সংবিধানেও কমিউনিষ্ট পার্টির ঐ ভূমিকার কথা আর স্থান পায়নি।

৬-৩. জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি

The Standing Committee of the National People's Congress

চীনের শাসনতন্ত্রের ৫৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী সংস্থা হল স্থায়ী কমিটি। জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন বছরে একবার কয়েকদিনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় গণকংগ্রেসের পক্ষে দৈনন্দিন দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডিয়ামের অনুকরণে চীনেও জাতীয় গণকংগ্রেসের একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এর দ্বারা লেনিনবাদী যৌথ নেতৃত্বের নীতি স্বীকৃত হয়েছে।

জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করে জাতীয় গণকংগ্রেস। সংবিধানের ৬৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী একজন চেয়ারম্যান, কয়েকজন ভাইস-চেয়ারম্যান, একজন সেক্রেটারী জেনারেল এবং অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। তবে স্থায়ী কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান কজন থাকবে এবং স্থায়ী কমিটি কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে এ সম্পর্কে সংবিধানে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। পঞ্চম জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটিতে ২২ জন ভাইস-চেয়ারম্যান ছিল এবং স্থায়ী কমিটি মোট ১৯৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল। স্থায়ী কমিটির কার্যকাল সম্পর্কে সংবিধানে বলা হয়েছে যে জাতীয় গণকংগ্রেসের মত এর স্থায়ী কমিটির কার্যকালও পাঁচ বছর। স্থায়ী কমিটির সদস্যদের জাতীয় গণকংগ্রেস অপসারিত করতে পারে। স্থায়ী কমিটি তার কার্যাবলীর জন্য জাতীয় গণকংগ্রেসের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।

গঠন

সংবিধানের ৬৫ নম্বর ধারায় জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে। স্থায়ী কমিটিকে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম সম্পাদন করতে হয়—এ সকল কাজকে গতানুগতিকভাবে আইন সংক্রান্ত. শাসন সংক্রান্ত বা বিচার সংক্রান্ত কাজ বলে চিহ্নিত করা যায় না। স্থায়ী কমিটি যে সকল কাজ সম্পাদন করে নীচে সেগুলি আলোচনা করা হল ঃ

কার্যাবলী

১. স্থায়ী কমিটি জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যদের, ডেপুটিগণের নির্বাচন পরিচালনা করে (সাধারণত অন্যান্য রাষ্ট্রে নির্বাচন কমিশন এই দায়িত্ব পালন করে)।

২. স্থায়ী কমিটি জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন আহবান করে (অনেক দেশে রাষ্ট্রপ্রধান এ দায়িত্ব পালন করেন)।

৩. আইন ও সংবিধানের ব্যাখ্যা দান করে স্থায়ী কমিটি (বুর্জোয়া রাষ্ট্রে এই দায়িত্ব বিচারালয় সম্পন্ন করে)।

৪. স্থায়ী কমিটি ডিক্রি জারী করে।

৫. রাষ্ট্রীয় পরিষদ, সর্বোচ্চ গণআদালত ও সর্বোচ্চ গণপ্রকিউরেটরের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করে স্থায়ী কমিটি।

৬. স্থায়ী কমিটি প্রাদেশিক, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনাধীনে পৌরসভাসমূহের রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক গৃহীত অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্তসমূহ বাতিল এবং পরিবর্তন সাধন করে।

৭. সংবিধান যথার্থভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা তত্ত্বাবধান করে স্থায়ী কমিটি।

৮. জাতীয় গণকংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইন ছাড়া বাকী বিষয়ের ওপরে স্থায়ী কমিটি আইন প্রণয়ন করে এবং আইনকে সংশোধিত করে।

৯, জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন যখন স্থগিত থাকে তখন স্থায়ী কমিটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রীয় বাজেটকে প্রয়োজনে পরিবর্তন করার প্রস্তাব বিবেচনা করে এবং তাকে অনুমোদন করে।

১০. রাষ্ট্রীয় পরিষদের সংবিধান বা আইনবিরোধী প্রশাসনিক আইন, হুকুমনামা ইত্যাদিকে বাতিল করে।

১১. জাতীয় গণ কংগ্রেসের যখন অধিবেশন স্থগিত থাকবে তখন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবিত রাষ্ট্রীয় পরিষদের মন্ত্রী, প্রধান হিসাবরক্ষক, প্রধান সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্থায়ী পরিষদ।

১২. সর্বোচ্চ গণআদালতের বিচারকদের, উপসভাপতিদের, আইন কমিটির সদস্যদের এবং সামরিক বিচারালয়ের সভাপতিদের নিয়োগ ও অপসারণ সম্পর্কে সর্বোচ্চ গণআদালতের সভাপতির প্রস্তাবের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্থায়ী কমিটি।

১৩. গণ প্রকিউরেটর এবং অন্যান্য প্রকিউরেটরদের নিয়োগ এবং অপসারণ সম্পর্কে সর্বোচ্চ গণ প্রকিউরেটর এবং প্রধান প্রকিউরেটরের প্রস্তাবের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্থায়ী কমিটি।

১৪. বিদেশে কুটনৈতিক প্রতিনিধিদের নিয়োগ এবং প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্থায়ী কমিটি।

১৫. বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি এবং গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি কার্যকর বা প্রত্যাখ্যান করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্থায়ী কমিটি।

১৬. সামরিক ও কুটনৈতিক পদের উপাধি ও পদমর্যাদা ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উপাধি ও পদমর্যাদার সৃষ্টি করে স্থায়ী কমিটি।

১৭. বিশেষ ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্থায়ী কমিটি।

১৮. জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত থাকা কালে চীনের ভূখণ্ড বহিঃশক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হলে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে স্থায়ী কমিটি।

১৯. আংশিক বা সামগ্রিক যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যাপারে সিদ্ধাত গ্রহণ করে স্থায়ী কমিটি।

২০. জাতীয় গণকংগ্রেস কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করা এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করার দায়িত্ব স্থায়ী কমিটির।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, চীন গণসাধারণতন্ত্রের স্থায়ী কমিটির হাতে আইন সংক্রান্ত, বিচার বিষয়ক, শাসন সংক্রান্ত, অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। বস্তুত, চীন গণসাধারণতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্থায়ী কমিটির গুরুত্ব সবচেয়ে

বেশী। গণ কংগ্রেসের অধিবেশন যখন স্থগিত থাকে তখন গণকংগ্রেসের অনেক কাজ স্থায়ী কমিটি সম্পন্ন করে। আবার, রাষ্ট্রীয় পরিষদের কাজের তত্ত্বাবধানও করে স্থায়ী কমিটি। অন্যদিকে সংবিধানকে ব্যাখ্যাদান করার ক্ষমতা স্থায়ী কমিটির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি চীন গণসাধারণতন্ত্রে মান্য করা হয় না। তাই স্থায়ী কমিটিকে বিভিন্ন বিভাগীয় ক্ষমতায় সজ্জিত করা সম্ভব হয়েছে।

মূল্যায়ন

স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান

বর্তমান সংবিধানের (১৯৮২) ৬৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, স্থায়ী কমিটির একজন চেয়ারম্যান, কয়েকজন ভাইস চেয়ারম্যান থাকবে, এঁরা প্রত্যেকে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। তবে তাঁরা কেউ দুবারের বেশী নিজ পদে আসীন হতে পারবেন না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭৫ এবং ১৯৭৭ সালের সংবিধানে গণ সাধারণতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির পদ বাতিল করাতে অনেকে মনে করেছিলেন যে স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানরা যথাক্রমে চীনের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। কারণ ১৯৭৫ সালের সংবিধানের ২৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল যে, স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান স্থায়ী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন, বৈদেশিক কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের গ্রহণ করেন, জাতীয় গণ কংগ্রেসের বা স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনের ডিগ্রী জারী করেন, রাষ্ট্রদূতের মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিদেশে নিয়োগ করেন এবং দেশের নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করেন। উপরোক্ত দায়িত্বগুলো রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব, তাই সঙ্গতভাবেই মনে করা হয়েছিল যে ১৯৭৫ ও ১৯৭৭ সালের সংবিধানে স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে যথাক্রমে চীন গণসাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।

১৯৮২ সালের সংবিধানে আবার চীনের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হওয়ায় বর্তমানে স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান আর চীনের রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন না! তবে কোন কারণে রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে এবং পরবর্তী নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকারীরা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান যথাক্রমে চীন গণসাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডিয়ামের সঙ্গে স্থায়ী কমিটির তুলনা

সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের সঙ্গে চীন গণসাধারণ-তন্ত্রের জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। সমালোচক বিশেষজ্ঞরা এই দুটি সংস্থাকে সমতুল্য সংস্থা বল মনে করেন। বস্তুত সুপ্রীম

সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের অনুকরণেই চীনে জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটিকে গঠন করা হয়েছে।

প্রেসিডিয়ামের সঙ্গে স্থায়ী কমিটির তুলনা করলে দেখা যাবে :

১. সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েতের একটি স্থায়ী সংস্থা হল প্রেসিডিয়াম। তেমনি গণসাধারণতন্ত্রী চীনের কেন্দ্রীয় আইনসভা জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী সংস্থা হল স্থায়ী কমিটি। অর্থাৎ উভয়ই সংস্থা কেন্দ্রীয় আইনসভার স্থায়ী সংস্থা।

২. সুপ্রীম সোভিয়েত এবং জাতীয় গণকংগ্রেসের যখন অধিবেশন চলে না, তখন এদের দায়িত্ব পালন করে যথাক্রমে সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রসিডিয়াম এবং চীনের জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি।

৩. এ ছাড়াও উভয় সংস্থাই রাষ্ট্র পরিচালন সংক্রান্ত দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পন্ন এবং রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করে।

৪. উভয় সংস্থার গঠন প্রণালী একই প্রকার—উভয়ই আইনসভা দ্বারা মনোনীত ও গঠিত হয়। তবে প্রেসিডিয়াম অপেক্ষা চীনের স্থায়ী কমিটির সদস্যসংখ্যা অনেক বেশি। প্রেসিডিয়াম মাত্র ৩৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত, কিন্তু স্থায়ী কমিটি বহু সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত হয়।

৫. উভয় সংস্থাই আইন ও সংবিধানের ব্যাখ্যা দান করে সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে কাজ করে।

৬. সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডিয়াম এবং গণ সাধারণতন্ত্রী চীনের স্থায়ী কমিটি ডিক্রি এবং প্রশাসনিক আদেশ জারী করে।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডিয়ামের সভাপতি সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে স্বীকৃত হলেও বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী চীন গণসাধারণতন্ত্রের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে স্বীকৃত নন।

৫.৪. গণসাধারণতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি

(President and Vice-President of P R. C.)

১৯৫৪ সালের গণসাধারণতন্ত্রী চীনের প্রথম সংবিধানে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। লিউ-সাও-চি দীর্ঘকাল ধরে চীন গণসাধারণতন্ত্রের চেয়ারম্যানের পদে আসীন ছিলেন। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে লিউ-সাও-চি-কে ঐ পদ থেকে অপসারিত করা হয় এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবোত্তর ১৯৭৫ এবং ১৯৭৮ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রের চেয়ারম্যানের পদটিকে বিলুপ্ত করা হয়। মনে করা হয় যে, ঐ সময়ে স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান গণসাধারণতন্ত্রী চীনের যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। বিশেষ করে চীনের প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা মার্শাল ইয়ে চিয়েন ইং স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যানের পদে নির্বাচিত হওয়ায় ঐ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হল, স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারাম্যানদের কি চীন গণ সাধারণতন্ত্রের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের সমতুল্য মনে করা হ'ত? আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৭৫ এবং ১৯৭৮ সালের সংবিধানে স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। সুতরাং স্থায়ী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করা ছাড়া চেয়ারম্যানকে রাষ্ট্রীয় প্রধানের দায়িত্বসহ অন্য কোন বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হোত কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা ছিল না। সংবাদে প্রকাশ যে, লিউ সাও-চি-কে রাষ্ট্রীয় চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণের পরে লিন পিয়াও পার্টির চেয়ারম্যান সহ রাষ্ট্রীয় চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণের জন্য মাও সে-তুং-কে অনুরোধ জানান। কিন্তু মাও এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং রাষ্ট্রীয় চেয়ারম্যানের পদের বিরোধিতা করে বলেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব যেখানে কার্যকর সেখানে পার্টির চেয়ারাম্যানই প্রধানের ভূমিকা পালন করেন এবং পার্টির চেয়ারম্যানের সমান্তরাল কোন পদ থাকতে পারে না।

কিন্তু প্রশ্ন হল, রাষ্ট্রীয় চেয়ারম্যানদের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব সেখানে কে পালন করেন? এই সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, বুর্জোয়া সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী আইনসভা প্রণীত বিলে স্বাক্ষর দান, বিদেশী রাষ্ট্রদূতকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক সাংবিধানিক কাজকর্ম রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার রীতি চীনে স্বীকৃত নয়। তাই চীনে স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান বা তাঁর অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যান কর্তৃক রাষ্ট্র প্রধানের আনুষ্ঠানিক কার্যাবলী পালনের প্রশ্ন দেখা দেয় কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ ছিল। অন্যান্য দেশে রাষ্ট্রপ্রধান যে দায়িত্ব পালন করেন তা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে যথাক্রমে প্রেসিডিয়াম ও স্থায়ী কমিটি সম্পন্ন করে।

যাহোক সব সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে ১৯৮২ সালের সংবিধানে আবার চীন গণসাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি পদ দুটিকে স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধান বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

সংবিধানের ৭৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, গণসাধারণতন্ত্রী চীনের গণকংগ্রেস একজন রাষ্ট্রপতি এবং একজন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করবেন। এঁরা প্রত্যেকে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন এবং কেউ দুবারের বেশী ঐ পদে আসীন হতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে চীনের নাগরিক হতে হবে এবং অন্তত ৪৫ বছর বয়স্ক হতে হবে।

রাষ্ট্রপতি চীন গণসাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে আইন বিষয়ক, শাসন সংক্রান্ত, এবং জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ করেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় রাষ্ট্রপতির কাজে সহায়তা করা এবং রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করার জন্য একজন উপরাষ্ট্রপতি থাকবেন। তিনিও রাষ্ট্রপতির

মত পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। উপরাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থীকেও রাষ্ট্রপতির মত চীনের নাগরিক এবং অন্তত ৪৫ বছর বয়স্ক হতে হবে।

৫.৫ রাষ্ট্রীয় পরিষদ
(The State Council)

সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের মত চীন গণসাধারণতন্ত্রের একটি রাষ্ট্রীয় পরিষদ আছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে (৮৫ নং—৯২ নং ধারা) রাষ্ট্রীয় পরিষদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সংবিধানের ৮০ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় পরিষদ হল কেন্দ্রীয় গণসরকার এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উচ্চতম সংস্থার কার্যকর সংস্থা—ইহা সর্বোচ্চ শাসনবিভাগীয় সংস্থা। সংবিধান অনুযায়ী শাসন পরিষদ তার কার্যাবলীর জন্য জাতীয় গণকংগ্রেসের কাছে এবং জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত থাকাকালীন অবস্থায় স্থায়ী কমিটির কাছে দায়ী থাকে এবং তার কাছে জবাবদিহি করে।

সংবিধানের ৮৬ নম্বর ধারায় রাষ্ট্রীয় পরিষদের গঠন প্রণালী বিধিবন্ধ করা হয়েছে। একজন প্রধানমন্ত্রী (The Premier), কয়েকজন সহকারী প্রধানমন্ত্রী (Vice Premier), একজন সাধারণ সম্পাদক (Secretary-General) এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও কমিশনের নেতৃত্বধারী মন্ত্রিবর্গ, প্রধান হিসাবরক্ষক এবং কয়েকজন সদস্য নিয়ে রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত হয়। কত জন সদস্য নিয়ে রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত হবে সে সম্পর্কে সংবিধানে কিছু বলা হয়নি। তবে সাধারণত ৪৫ থেকে ৫০ জন সদস্য নিয়ে রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত হয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে ঐ সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। মাও'র ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন পরিচালনার কাঠামোকে সরলীকরণের জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরে এই সংখ্যাকে বিশেষভাবে হ্রাস করা হয়েছিল[১]। রাষ্ট্রীয় পরিষদ যাতে আরও কার্যকরভাবে দৈনন্দিন দায়িত্ব পালন করতে পারে তার জন্য প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রিগণ এবং সাধারণ সম্পাদক এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের অন্যান্য কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে একটি 'কার্যনির্বাহক সমিতি' গঠন করা হয় (৮৮ নং ধারা)।

গঠন

সংবিধানের ৮৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় পরিষদের কার্যকাল জাতীয় গণকংগ্রেসের সমান। অর্থাৎ জাতীয় গণকংগ্রেসের মত রাষ্ট্রীয় পরিষদ পাঁচ বছরের জন্য গঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রধানমন্ত্রী, উপ প্রধানমন্ত্রী বা সদস্যদের মধ্যে কেউ দু'বারের বেশী একই পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না।

রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন পদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চীনের

১. ১৯৭১ সালে এডগার স্নো-কে চৌ এন-লাই জানান যে তাঁকে সাহায্য করার জন্য মাত্র দু'জন উপ প্রধানমন্ত্রী আছেন, আগে ছিল সাতজন। তিনি আরও বলেন, "আগে কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল নব্বইটি বিভাগ। এখন করা হয়েছে ২৬টি।"

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় গণকংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করে এবং প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করে।

নিয়োগ

অনেকে এই পদ্ধতিকে একান্তভাবেই আনুষ্ঠানিক বলে মনে করেন। কারণ, তাঁদের মতে, রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যদের নিয়োগের ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টিই চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করে, বিশেষ করে সংবিধানে এ ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা স্বীকৃত হওয়ায় এই ধারণা আরও জোরদার হয়েছে। জাতীয় গণকংগ্রেস কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যদের নিয়োগই করে না, প্রয়োজনবোধে কার্যকাল শেষ হবার আগেই রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যদের অপসারণের ক্ষমতাও ভোগ করে (২৩ নং ধারা)।

রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রধানমন্ত্রী

রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে সংবিধানে বলা হয়েছে যে, তিনি রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভায় এবং এর কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় পরিষদের কাজের নির্দেশ দেন, অন্যান্য উপ-প্রধানমন্ত্রিরা প্রধানমন্ত্রীর কাজে সহায়তা করেন। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে সংবিধানে আর কিছু বলা না হলেও চীনের রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সকলে জানেন যে, সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী পদের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায় যখন আমরা দেখি চৌ-এন-লাই'র মত ব্যক্তিত্বকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং তিনিই গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ঐ পদে আসীন ছিলেন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে চৌ এন-লাই'র স্থান ছিল দ্বিতীয়—মাও'র পরেই। চৌ-এন-লাইয়ের মৃত্যুর পরে ১৯৭৮ সালে হুয়া কুয়ো ফেং প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে, চীনের পার্টির চেয়ারম্যানের পরেই প্রধানমন্ত্রীর স্থান।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী

চীন গণসাধারণতন্ত্রের সংবিধানের ৮৯ নম্বর ধারায় রাষ্ট্রীয় পরিষদের ওপর নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও কার্য প্রয়োগের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে ঃ

১ সংবিধান, আইন ও ডিক্রী অনুসারে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রণয়ন, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত জারী এবং ঐগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা তত্ত্বাবধান করা ;

২. জাতীয় গণকংগ্রেস বা তার স্থায়ী কমিটির নিকট আইন ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ ;

৩. রাষ্ট্রীয় পরিষদের বিভিন্ন মন্ত্রক, কমিশন এবং তার অধীনস্থ অন্যান্য সংস্থার কার্যে ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব দান ;

৪. সমগ্র দেশে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত আঞ্চলিক সংস্থাগুলির কার্যে ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব প্রদান ;

৫. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা এবং রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়ন এবং এদের যথাযথভাবে কার্যকর করা ;

৬. রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বজায় রাখা এবং দেশের শৃঙ্খলা ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করা ;

৭. বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, জেলা, নগর প্রভৃতি আঞ্চলিক সংস্থাগুলিকে শাসনবিভাগীয় নির্দেশ দান ও তা পরিচালনা করা ;

৮. আইনের বিধান অনুযায়ী শাসনকর্তাদের নিয়োগ ও অপসারণ করা ;

৯. জাতীয় গণ-কংগ্রেস বা স্থায়ী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ও কার্যকে রূপ দান করা ;

১০. শহর ও পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নের ব্যাপারে নির্দেশ দান ও তা বাস্তবায়িত করা ;

১১. শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, গণস্বাস্থ্য শরীর চর্চা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে নির্দেশ দান ও তাকে কার্যকর করা।

১২. জননিরাপত্তা, বিচারব্যবস্থা, আবাসন ও অন্যান্য বিষয়ে নির্দেশ দান ও তা পরিচালনা করা ,

১৩. বৈদেশিক বিষয়সমূহ পরিচালনা করা এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন করা ;

১৪. জাতীয় প্রতিরক্ষা গঠনে নির্দেশ দান ও তা কার্যকর করা ;

১৫. সংখ্যালঘু জাতীয় জনসমাজ এবং জাতীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের স্বায়ত্তাধিকার সম্পর্কে নির্দেশ দান এবং তা কার্যকর করা ;

১৬. বিদেশে বসবাসকারী এবং বিদেশ থেকে প্রত্যাগত চীনাবাসীর আইনসম্মত অধিকার ও স্বার্থরক্ষা করা ;

১৭. মন্ত্রী, কমিশন বা আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় সংস্থার অসঙ্গত সিদ্ধান্ত এবং হুকুমনামা পরিবর্তন বা বাতিল করা ;

আগেই বলা হয়েছে যে, গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রীয় পরিষদের মন্ত্রিদপ্তর এবং বিভিন্ন কমিশনের মন্ত্রীরা তাঁদের নিজ নিজ দপ্তরের কাজের জন্য দায়ী থাকেন। তাঁরা নিজ নিজ দপ্তরের সভা আহ্বান করেন এবং ঐ সভাতে সভাপতিত্ব করেন।

কার্যপদ্ধতি

ঐ সভাগুলোকে দপ্তরের কাজ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সামগ্রিক দায়িত্বে থাকেন প্রধানমন্ত্রী।

রাষ্ট্রীয় পরিষদ প্রধান হিসাবরক্ষকের নেতৃত্বে একটি হিসাবরক্ষণ সংস্থা গঠন করে। হিসাব রক্ষণ সংস্থার কাজ হ'ল রাষ্ট্রীয় দপ্তরের বিভিন্ন স্তরে আঞ্চলিক সরকারের, রাষ্ট্রীয় আর্থিক সংস্থাগুলোর এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও কারখানার আয়-ব্যয় ও হিসাব পরীক্ষা করা।

মূল্যায়ন

চীনের রাষ্ট্রপরিষদ হল মন্ত্রিসভা। চীনসহ কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি মান্য করা হয় না। তাই রাষ্ট্রীয় পরিষদ শাসনবিভাগীয় সংস্থা হলেও একে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা পর্যন্ত বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে হয়। রাষ্ট্রীয় পরিষদ তত্ত্বগতভাবে জাতীয় গণকংগ্রেস এবং তার অধিবেশন যখন থাকে না তখন স্থায়ী কমিটির কাছে দায়িত্বশীল থাকে। কিন্তু এই দায়িত্ব অনেকটা আনুষ্ঠানিক। চীনের সকল রাষ্ট্রীয় সংস্থা পরিচালনায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের শীর্ষস্থানীয় পদগুলিতে পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতারা আসীন থাকেন বলে পার্টির নীতি ও নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় পরিষদ পরিচালিত হয়। এইজন্যই রাষ্ট্রীয় পরিষদের ব্যাপক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ব্রিটেনের মত চীনে "মন্ত্রিসভার নায়কত্ব" প্রতিষ্ঠা হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মত চীনেও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব কমিউনিস্ট পার্টির ওপর, সাংবিধানিক অনুমোদন সংক্রান্ত কাজ জাতীয় গণকংগ্রেসের ওপর এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় পরিষদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

৫.৬ চীনের বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য

(The Aims and Features of the Judicial System in China)

বুর্জোয়া ব্যবস্থায় বিচারবিভাগকে ন্যায় নীতি ও নিরপেক্ষতার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বলা হয়, সেখানে বিচারবিভাগ সকল প্রকার পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থনিরপেক্ষ সংস্থা। কিন্তু মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, বিচারবিভাগে এবং বিচারকেরা বাস্তবে একটা শ্রেণীস্বার্থের রক্ষক হিসাবে কাজ করে। বিচার বিভাগের পক্ষে রাজনৈতিক নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়; কারণ কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা শাসকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ বিরোধী কাঠামোর অস্তিত্ব সহ্য করতে পারে না। সুতরাং বিচারবিভাগ ও বিচারকদের তথাকথিত নিরপেক্ষতা একটা অলীক কল্পনা মাত্র, শ্রেণী স্বার্থ রক্ষায় বিচারবিভাগের ভূমিকাকে আড়াল করার অপচেষ্টা মাত্র।

বিচারবিভাগ নিরপেক্ষ হতে পারে না

মার্কসবাদীরা তাই বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে না এবং ইহা সম্ভব বলে মনে করে না। বরং বিচারবিভাগকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অঙ্গ বলে মনে করা হয়। তাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র গঠন ও বিকাশের জন্য বিচারব্যবস্থাকে অপরিহার্য সংস্থা বলে মনে করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের মত চীনেও বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য হল শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত এবং শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মৈত্রীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশকে সুনিশ্চিত করা। এই

চীনের বিচার ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্যে বিচারবিভাগ সমাজতান্ত্রিক সংবিধান ও আইনকে প্রয়োগ ও সংরক্ষণ করে, জন-শৃঙ্খলা ও সমাজতান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সযত্ন প্রয়াসে নতুন নতুন সাফল্যের পথে নিয়ে যায়, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিকে সংরক্ষণ করে, সংবিধান স্বীকৃত নাগরিক অধিকার রক্ষা করে এবং সমাজতন্ত্রবিরোধী প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে পরাস্ত করার মহান্ দায়িত্ব পালন করে।

চীনে বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

চীন গণসাধারণতন্ত্রের বিচারব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। নীচে বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হ'ল ঃ

১. কোন বিশেষশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে না

মাও সে-তুং বলেছেন যে, একটি শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীকে দমন করার জন্য বিচারবিভাগ হ'ল রাষ্ট্রের একটি হাতিয়ার। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে শ্রেণীগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব খুব তীব্র বলে বিচারবিভাগকে শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসাবে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক চীনে পরস্পরবিরোধী শ্রেণী স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত না থাকার জন্য সেখানকার বিচারবিভাগ সমগ্র জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়াসে ব্রতী—সেখানে বিচারবিভাগকে কোন সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার প্রয়াসে নিজেকে নিয়োজিত করতে হয় না।

২. ন্যায় বিচারের ধারণার উৎস

ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধ্যান ধারণাই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের তথাকথিত ন্যায়বিচারের ধারণার উৎস। কিন্তু চীনের সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানার ধারণার ওপর ন্যায়বিচারের ধারণা প্রতিষ্ঠিত।

৩. সংবিধানের অভিভাবক নয়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারবিভাগকে সংবিধান ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ও বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা (the power of judicial review) প্রদান করে সংবিধানের অভিভাবকত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের মত চীনেও বিচারালয়কে সংবিধান ব্যাখ্যা এবং বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। সেখানে তাই বিচারবিভাগকে সংবিধানের অভিভাবক মনে করা হয় না এবং বিচারবিভাগকে একটি অলঙ্ঘনীয় রাষ্ট্রীয় সংস্থা বলে মনে করা হয় না।

৪. গণতান্ত্রিক

চীনে ন্যায়বিচারের দুটি নীতি হল কার্যকর গণতন্ত্র ও বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা। চীনে বিচারকগণ রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা মনোনীত নয়, তাঁরা সংশ্লিষ্ট গণকংগ্রেস দ্বারা নির্বাচিত। নির্বাচিত বিচারক ও বিচারকার্যে জনগণের প্রতিনিধি এ্যাসেসরের সাহায্য গ্রহণ করার জন্য চীনের বিচারব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে।

চীনে বিচারবিভাগের দায়িত্বশীলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বিচারবিভাগের কোন দায়িত্বশীলতা থাকে না। কিন্তু চীনে সর্বোচ্চ গণ আদালত জাতীয় গণকংগ্রেসের নিকট এবং অন্যান্য গণ আদালত সংশ্লিষ্ট গণকংগ্রেসের নিকট দায়িত্বশীল থাকে।

৫. দায়িত্বশীলতা

চীনের বিচারব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল বিচারব্যবস্থার সঙ্গে জনগণকে যুক্ত করা। সেখানে জনগণের প্রতিনিধিরা এ্যাসেসর হিসাবে যোগদান করতে পারেন। বড় ধরনের প্রতিবিপ্লবী বা বড় ধরনের ফৌজদারী মামলায় জনসমাবেশ ঘটান হয় এবং বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া গণ আদালতের যাবতীয় মামলা জনসমক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

৬. জনগণকে যুক্ত করা

সোভিয়েত ইউনিয়নের মত চীনেও প্রকিউরেটরেট ব্যবস্থা আছে এবং এই ব্যবস্থা বিচারবিভাগকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

৬. প্রকিউরেটরেট ব্যবস্থা

৫.৭. বিচারবিভাগের সংগঠন
(The Organization of the Judiciary)

চীনে গণসাধারণতন্ত্রের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম পরিচ্ছেদে (১২৩ থেকে ১৩৫ নম্বর ধারা) বিচারব্যবস্থার আলোচনা করা হয়েছে। চীনের সংবিধানে চার শ্রেণীর আদালত উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ চার শ্রেণীর আদালত হল ঃ

১. সর্বোচ্চ গণ আদালত (The Supreme People's Court)

২. আঞ্চলিক গণআদালত (Local People's Courts)

আঞ্চলিক গণআদালতগুলি আবার বিভিন্ন স্তরের হয়। উচ্চস্তরের গণ আদালত (People's courts at higher level) থেকে শুরু করে নিম্নস্তর পর্যন্ত (People's courts at lower level) বহু গণআদালত আছে। চীনে বিভিন্ন ধরনের বহু আঞ্চলিক সংস্থা আছে বলে আদালতের বিন্যাসও সেভাবে করা হয়েছে।

৩. সামরিক আদালত (Military Courts)

৪. বিশেষ গণআদালত (Special People's Courts)

উপরোক্ত আদালতগুলি ছাড়াও চীনে বিচারব্যবস্থার সঙ্গে প্রকিউরেটরেট ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

ক. সর্বোচ্চ গণ-আদালত

সংবিধানের ১২৭ নম্বর ধারা অনুসারে সর্বোচ্চ গণআদালত হল বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ সংস্থা। কিন্তু সংবিধানে গণআদালতের গঠন সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা হয় নি। শুধুমাত্র বলা হয়েছে যে, আইনের বিধান অনুযায়ী ইহা গঠিত হয়। একজন সভাপতি, কয়েকজন সহ-সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্য নিয়ে সর্বোচ্চ গণ আদালত গঠিত হয়। সংবিধানে আরও বলা হয়েছে যে, জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে বিচারকার্যে এ্যাসেসরা (Assessors) যোগদান করে

গঠন

এবং প্রতিবিপ্লব সংক্রান্ত ও ফৌজদারী মামলায় আলোচনা ও সুপারিশের জন্য জনগণের সমাবেশ ঘটানো হয়।

জাতীয় গণকংগ্রেস সর্বোচ্চ গণআদালতের সভাপতিকে নির্বাচন করে এবং জাতীয় গণকংগ্রেস সর্বোচ্চ গণআদালতের সভাপতিকে অপসারণ করতে পারে। সর্বোচ্চ গণআদালতের সহ-সভাপতিদের নির্বাচন ও অপসারণের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির হাতে। সর্বোচ্চ গণআদালতের অন্যান্য সদস্যারা কার দ্বারা নির্বাচিত ও অপসারিত হন সে সম্পর্কে সংবিধানে কিছু বলা হয়নি। সর্বোচ্চ গণকংগ্রেসের কার্যকাল পাঁচ বছর। সর্বোচ্চ গণআদালত জাতীয় গণকংগ্রেস এবং ইহার স্থায়ী কমিটির কাছে দায়ী থাকে এবং এদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।

নিয়োগ, অপসারণ, কার্যকাল ও দায়িত্ব

সর্বোচ্চ গণ আদালতে বিচারের সময় এ্যাসেসরদের সাহায্য নেওয়া হয় এবং বড় ধরনের প্রতিবিপ্লবী ও ফৌজদারী মামলায় জনগণের পরামর্শ ও সুপারিশের জন্য বিচারকার্যে জনসমাবেশ ঘটানো হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়।

কার্যপদ্ধতি

সংবিধানে বলা হয়েছে যে, সর্বোচ্চ গণআদালত বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং ইহা বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ সংস্থা। সংবিধান, আইন ও ডিক্রী অনুযায়ী ইহা বিচারকার্য সম্পন্ন করে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে বিবিধ প্রকার এবং বহু বিরোধ আদালতকে মেটাতে হয়। কিন্তু চীনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্পত্তি ও মালিকানা নিয়ে বিরোধের কোন অবকাশ না থাকায় আদালতের কর্মক্ষেত্র সীমিত। তাছাড়া সাংবিধানিক আইন নিয়েও সেখানে কোন বিরোধের সুযোগ নেই। বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে সর্বোচ্চ গণআদালত বিভিন্ন স্তরের আঞ্চলিক গণআদালত ও বিশেষ গণ-আদালতগুলোর বিচারকার্যের তত্ত্বাবধান করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের মত চীনের সর্বোচ্চ গণআদালত সংবিধানের ব্যাখ্যা দান করে না এবং ইহার কোন বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা নেই। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ইহার কোন আপীল এলাকা আছে কিনা সে বিষয়ে সংবিধানে কিছু বলা হয়নি।

কার্যাবলী

খ. আঞ্চলিক আদালত

সর্বোচ্চ গণআদালত ছাড়াও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য আছে বিভিন্ন স্তরের আঞ্চলিক আদালতসমূহ। প্রতিটি স্তরের গণআদালতের বিচারপতিদের সংশ্লিষ্ট স্তরের গণকংগ্রেস নির্বাচিত করে এবং সেই গণকংগ্রেসের কাছে বিচারপতিরা দায়িত্বশীল থাকেন এবং জবাবদিহি করেন। উচ্চস্তরের গণআদালত নিম্নস্তরের গণ-

আদালতের বিচারকার্যের তত্ত্বাবধান করে। তবে সকল স্তরের সকল গণআদালতের ওপর সর্বোচ্চ গণআদালতের তত্ত্বাবধান কার্যকর থাকে।

আঞ্চলিক গণআদালতগুলিতে এ্যাসেসররা অংশ গ্রহণ করেন, কোন কোন বিচারে জনসমাবেশ ঘটানো হয়, জনসমক্ষে বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হয় এবং অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। আঞ্চলিক গণআদালতের সঙ্গেও আঞ্চলিক প্রকিউরেটরেট ব্যবস্থা যুক্ত থাকে।

সমালোচনা ও মূল্যায়ন

পাশ্চাত্য উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচারবিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং বিচারবিভাগ যে গুরুত্বের অধিকারী তা চীন সাধারণতন্ত্রে অনেকাংশে অনুপস্থিত। তাই সমালোচকেরা মনে করেন যে, চীনে বিচারালয়ের করণীয় বিশেষ কিছু থাকে না এবং ইহা কোন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রসংস্থা নয়।

১. বিচারবিভাগের গুরুত্ব কম

সমালোচকদের এই বক্তব্য সম্পর্কে বলা যায় যে, যে সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বীকৃতি যত ব্যাপক, সেই সমাজব্যবস্থায় স্বার্থের সংঘাত এবং দ্বন্দ্বও তত বেশি। চীনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানা নেই, তাই এই বিষয়ে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নেই। কিন্তু এই সুস্থ অবস্থা কী কাম্য নয়? বিচারবিভাগের কার্যভার তথা গুরুত্ব বাড়াবার জন্য কি স্বার্থের সংঘাত ও দ্বন্দ্বকে টিকিয়ে রাখতে হবে?

অনেকের মতে চীনের বিচারব্যবস্থা সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। ডি জে. ওয়ালার মনে করেন যে, পার্টি নেতৃত্ব আদালতের সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ না করলেও পার্টি প্রণীত নীতির আলোতে সেখানে বিচার করা হয়।[১] এই সম্পর্কে দৃষ্টান্ত দিয়ে আরও বলা হয় যে, ১৯৫৯ সালে সরকারের বিচার মন্ত্রণালয়কে (Ministry of Justice) তুলে দিয়ে বিচারব্যবস্থাকে পার্টির রাজনৈতিক আইনবিভাগের অধীনে আনা হয় এবং এইভাবে রাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থাকে কমিউনিস্ট পার্টির কুক্ষিগত করা হয়েছিল।

২. বিচারব্যবস্থায় পার্টির প্রভাব

এই সমালোচনার উত্তরে বলা যায় যে, মার্কসবাদীরা মনে করে না যে, কোন বিচারালয় শ্রেণীস্বার্থ নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করে। মাও সে তুং বলেছেন যে, আদালতসহ সকল রাষ্ট্র-সংস্থাই একটা শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীকে শোষণ করার হাতিয়ার।[২] তাই

১. "The Party largely contented itself with making general policy, in the light of which court cases were to be resolved······".

—*The Government and Politics of Communist China.*

২. The state apparatus, including the army, the police and the courts, is the instrument by which one class oppresses another. It is an instrument for the oppression of antagonistic classes ; it is violence and not "benevolence".

—*Selected Readings from the Works of Mao Tse-tung*

মার্কসবাদীরা বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে না। বরং মনে করে যে, চীনের সংবিধানে যে সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কথা বলা হয়েছে সেই শ্রেণী স্বার্থের প্রতিনিধি কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির চলাই যুক্তিযুক্ত।

৩. স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক নয়

চীনে বিচারপতিরা আইনসভা বা তার স্থায়ী কমিটির দ্বারা নির্বাচিত হন বলে এবং তাদের কাছে দায়িত্বশীল থাকেন বলে অনেকে মনে করেন যে, চীনের বিচারব্যবস্থা স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক নয়।

এই সমালোচনার উত্তরে বলা হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের মত রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে বিচারপতি নিয়োগ অপেক্ষা চীনে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থা কর্তৃক বিচারপতি নির্বাচন বিচারব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক করেছে। আর স্বাধীনতা তো এখানে আপেক্ষিক। মার্কিন বিচারকরা বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার কাজে স্বাধীন, চীনের বিচারকেরা শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার কাজে স্বাধীন।

৪. সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষমতা নেই

অনেকের মতে সংবিধান ব্যাখ্যা করা এবং বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা (Power of Judicial Review) না থাকায় চীনের বিচারবিভাগের দুর্বলতা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে বাতিল এবং ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা বিচারালয়কে অর্পণ করাকে কোনভাবেই গণতান্ত্রিক বলা যায় না।

৫.৮ প্রকিউরেটরেট ব্যবস্থা
(The Procuracy)

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারব্যবস্থার অনুকরণে চীনের প্রকিউরেটরেট ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯৮২ সালের সংবিধানেও প্রকিউরেটরেট ব্যবস্থাকে সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধানের ১৩০ থেকে ১৩৫ নম্বর ধারায় প্রকিউরেটরেট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শাসনবিভাগের (রাষ্ট্রীয় পরিষদ) অধীনস্থ সকল দপ্তর, বিভিন্ন স্তরের আঞ্চলিক সরকারী সংস্থাসমূহ, সরকারী কর্মচারীবৃন্দ এবং নাগরিকগণ যাতে সংবিধান ও আইন মান্য করে চলে তা সুনিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ স্তরে সর্বোচ্চ গণপ্রকিউরেটর এবং আঞ্চলিক স্তরে আঞ্চলিক গণপ্রকিউরেটর তা তদারক করে। চীনের ১৯৭৫ সালের সংবিধানে প্রকিউরেটর ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৮ সালের সংবিধানে প্রকিউরেটরেট ব্যবস্থাও পুনরায় প্রবর্তিত হয়। বিচারব্যবস্থার মত চীনে প্রকিউরেটরেট ব্যবস্থাও চারটি স্তরে বিন্যস্ত: ক. সর্বোচ্চ গণ প্রকিউরেটরেট, খ. আঞ্চলিক গণ প্রকিউরেটরেট, গ. সামরিক গণপ্রকিউরেটরেট এবং ঘ. বিশেষ গণ প্রকিউরেটরেট।

চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকিউরেটরেট ব্যবস্থা বিচারব্যবস্থাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। অন্য কোন সমজেব্যবস্থায় প্রকিউরেটরেট ব্যবস্থা প্রচলিত নেই এবং ইহার

সমগোত্রীয় কোন সংস্থা নেই। অনেকে অবশ্য ব্রিটেন বা ভারতের অ্যার্টনী জেনারেলকে প্রকিউরেটরের সঙ্গে তুলনা করেন। কিন্তু এই তুলনা সঙ্গত নয়— এদের মধ্যে কার্যগত পার্থক্য ছাড়াও বলা যায় অ্যাটর্নী জেনারেল সরকারের একটি অঙ্গ এবং প্রকিউরেটর সরকারী মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে। কিন্তু চীনের গণপ্রকিউরেটর সরকারের অঙ্গ নয় এবং সরকার-নিরপেক্ষ হিসাবে কাজ করে। বরং বলা যায়, সরকারের অধীন ব্যক্তি ও সংস্থা আইন মান্য করে চলেন কিনা তা তত্ত্বাবধান করাই প্রকিউরেটরের দায়িত্ব। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রাষ্ট্র ক্ষমতার আধার জাতীয় গণকংগ্রেস ও আঞ্চলিক গণকংগ্রেসের ওপর প্রকিউরেটরের তত্ত্বাবধান ক্ষমতা প্রযোজ্য নয়।

বৈশিষ্ট্য

সর্বোচ্চ গণ-প্রকিউরেটরেট

সর্বোচ্চ গণ-প্রকিউরেটর একজন প্রধান প্রকিউরেটর, উপ-প্রধান প্রকিউরেটর ও কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। সর্বোচ্চ গণপ্রকিউরেটরের প্রধান প্রকিউরেটর জাতীয় গণকংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত হয় এবং ঐ সংস্থার দ্বারা অপসারিত হতে পারে। উপ-প্রধান প্রকিউরেটর জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং ঐ কমিটির দ্বারা অপসারিত হতে পারে। জাতীয় গণকংগ্রেসের মত প্রকিউরেটরের কার্যকালও পাঁচ বছর। সর্বোচ্চ গণ-প্রকিউরেটরেট জাতীয় গণকংগ্রেস ও ইহার স্থায়ী কমিটির নিকট দায়ী থাকে এবং জবাবদিহি করে। প্রধান প্রকিউরেটর তাঁর ঐ পদে দুবারের বেশী আসীন হতে পারেন না।

গঠন

সরকারী কর্মচারী, সংস্থা এবং নাগরিকেরা যাতে সংবিধান এবং আইন মান্য করে চলে তা সুনিশ্চিত করা ও তদারক করার দায়িত্ব সর্বোচ্চ গণপ্রকিউরেটরেটের ওপর ন্যস্ত। দ্বিতীয়ত, সর্বোচ্চ গণপ্রকিউরেটরেট বিভিন্ন স্তরের আঞ্চলিক গণপ্রকিউরেটরেট ও বিশেষ গণপ্রকিউরেটরেট সমূহের কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান করে। তৃতীয়ত, সরকারী কর্মচারী ও সংস্থাগুলি যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না করতে পারে তা লক্ষ্য করাও তাঁর দায়িত্ব। সরকারী কর্মচারী ও নাগরিকদের বে-আইনী কার্যাবলীর অভিযোগ প্রকিউরেটরেট তদন্ত করে এবং প্রয়োজনবোধে হুলিয়া জারী করে।

কার্যকাল

আঞ্চলিক গণপ্রকিউরেটরেট

সর্বোচ্চ গণপ্রকিউরেটরেটের মত আঞ্চলিক স্তরেও আঞ্চলিক গণপ্রকিউরেটরেটের ব্যবস্থা আছে। আঞ্চলিক গণপ্রকিউরেটরেটগুলির প্রতিটি একজন প্রধান ও কয়েকজন উপ-প্রধান প্রকিউরেটর এবং কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক স্তরের প্রকিউরেটররা সংশ্লিস্ট গণকংগ্রেস দ্বারা নির্বাচিত হয়, তার দ্বারা অপসারিত হতে পারে এবং এদের কাছে দায়িত্বশীল থাকে। সর্বোচ্চ গণপ্রকিউরেটরেট আঞ্চলিক গণপ্রকিউরেটরেটগুলোর

কার্যাবলীর তদারক করে। উচ্চ স্তরের গণপ্রকিউরেটরেট নিম্নস্তরের গণপ্রকিউরেটরেট গুলোর কাজের তত্ত্বাবধান করে।

আঞ্চলিক প্রকিউরেটরেটের কার্যধারা সর্বোচ্চ প্রকিউরেটরেটের মত—তবে এই সংস্থার কাজ নিজ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আইন ও অঞ্চলের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে আঞ্চলিক গণপ্রকিউরেটর বিভিন্ন সংস্থা, কর্মচারী ও নাগরিকদের আইন ও সংবিধান মান্য করাকে সুনিশ্চিত করে এবং বে-আইনী কাজের অভিযোগের অনুসন্ধান করে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

সংবিধানে সামরিক প্রকিউরেটরেট এবং বিশেষ গণপ্রকিউরেটরেট গঠনের কথাও বলা হয়েছে।

৫.৯. আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা (Local Government)

চীন গণসাধারণতন্ত্র একটি বিশাল রাষ্ট্র, অথচ এখানে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা এই বিশাল দেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই চীনে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সমগ্র দেশের জন্য আছে কেন্দ্রীয় সরকার--কিন্তু সুষ্ঠু শাসনের জন্য বিকেন্দ্রীয় নীতি প্রয়োগ করে সমগ্র দেশে বহু আঞ্চলিক সংস্থা তৈরী করা হয়েছে।

আঞ্চলিক সংস্থা কেন ?

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে তিন প্রকারের আঞ্চলিক সংস্থার কথা বলা হয়েছে। ঐ তিন প্রকারের আঞ্চলিক সংস্থাগুলি হল ; ১. প্রদেশ, ২. **স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ৩. কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন পৌরসংস্থা।**

আঞ্চলিক শাসনসংস্থা

১. প্রদেশ	২. স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল	৩. কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন পৌরসভা

১. প্রদেশ

বর্তমানে চীনে ২২টি প্রদেশ আছে। এই প্রদেশগুলি আবার ক. স্বায়ত্তশাসিত অধ্যক্ষপ্রধান অঞ্চল, খ. কাউন্টি, গ. স্বায়ত্তশাসিত কাউন্টি এবং ঘ. নগরে বিভক্ত। স্বায়ত্তশাসিত অধ্যক্ষপ্রধান অঞ্চলসমূহ বিভিন্ন কাউন্টি, স্বায়ত্তশাসিত কাউন্টি ও নগরে বিভক্ত। কাউন্টি ও স্বায়ত্তশাসিত কাউন্টিগুলি আবার গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে (নগরে) বিভক্ত।

২. স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল

বর্তমানে চীনে পাঁচটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল আছে। **স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলির বিন্যাসও ঠিক প্রদেশগুলির মত।** স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলিও ক. স্বায়ত্তশাসিত

অধ্যক্ষপ্রধান অঞ্চল, খ. কাউন্টি, গ. স্বায়ত্তশাসিত কাউন্টি এবং ঘ. নগরে বিভক্ত। স্বায়ত্তশাসিত অধ্যক্ষপ্রধান অঞ্চলগুলি আবার বিভিন্ন কাউন্টি, স্বায়ত্তশাসিত কাউন্টি ও নগরে বিভক্ত। কাউন্টি ও স্বায়ত্তশাসিত কাউন্টিগুলি অনুরূপভাবে গ্রাম ও নগরে বিভক্ত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রদেশ ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলির বিন্যাস একই প্রকারের। নিম্নে প্রদেশ ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের বিন্যাস ছকের সাহায্যে দেখান হল ঃ

প্রদেশএবং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল

- স্বায়ত্তশাসিত অধ্যক্ষ প্রধান অঞ্চল
  - কাউন্টি
  - স্বায়ত্তশাসিত কাউন্টি
  - নগর
- কাউন্টি
- স্বায়ত্তশাসিত কাউন্টি
- নগর

চীনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন ৩টি পৌরসংস্থা আছে। ঐ পৌর-সংস্থাগুলি এবং অন্যান্য বৃহৎ নগরগুলি আবার ডিস্ট্রিকট ও কাউন্টিতে বিভক্ত। নিম্নে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন পৌরসংস্থা ও বৃহৎ নগরগুলি ছকে দেখান হল।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রিত পৌরসংস্থা ॥ বৃহৎ নগর

- ডিস্ট্রিকট
- কাউন্টি

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে একথা সহজেই প্রতীয়মান যে চীনে প্রাদেশিক স্তর থেকে শুরু করে নগর পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা আছে। সেখানে আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারী কাঠামোর অনুরূপ। অর্থাৎ প্রতিটি স্তরের গণকংগ্রেস হল নীতি নির্ধারক সংস্থা এবং গণপ্রকিউরেটরেট হল তদারকী সংস্থা। অতীতে আঞ্চলিক স্তরে বিপ্লবী কমিটিকে সংশ্লিষ্ট গণ কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির দায়িত্ব পালন করতে হত। তবে ১৯৮২ সালের সংবিধানে বিপ্লবী কমিটিকে বাতিল করা হয়েছে।

ক. আঞ্চলিক গণকংগ্রেস

আঞ্চলিক স্তরের গণকংগ্রেসগুলিকে সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আঞ্চলিক সংস্থা বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরের গণকংগ্রেসের ডেপুটিগণ নিম্নতর গণকংগ্রেসগুলির দ্বারা গণতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনার পরে গঠন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। ছোট নগর ও শহরের গণকংগ্রেসের ডেপুটিগণ সাধারণ নির্বাচকের দ্বারা গণতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গোপন ব্যালটে নির্বাচিত হয়।

প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন পৌরসংস্থাসমূহের গণকংগ্রেস পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। কিন্তু কাউণ্টি, নগর, ডিস্ট্রিক্ট এবং বাইরের গণকংগ্রেস-গুলো তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। প্রতিটি আঞ্চলিক স্তরের গণকংগ্রেসের বছরে অন্তত একবার অধিবেশন হওয়া বাধ্যতামূলক। যে সকল নিম্নতর সংস্থা বা নির্বাচকমণ্ডলী বিভিন্ন স্তরের গণ-কংগ্রেসের ডেপুটিদের নির্বাচন করে, তারাই সংশ্লিষ্ট গণকংগ্রেসের কাজের তত্ত্বাবধান করে এবং আইনের বিধান অনুসারে যে কোন সময়ে ডেপুটিকে অপসারণ করে অন্য ডেপুটি নির্বাচন করতে পারে।

নির্বাচন, অধিবেশন ও দায়িত্বশীলতা

বিভিন্ন স্তরের আঞ্চলিক গণকংগ্রেসসমূহ তাদের নিজ নিজ শাসনাধীন এলাকায় আইন ও ডিক্রীর বিধানসমূহ যাতে কার্যকর হয় এবং সকলে তা মান্য করে তা সুনিশ্চিত করে, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কার্যকর করে, অঞ্চলের সার্বিক উন্নতির জন্য পরিকল্পনা রচনা করে, আঞ্চলিক পরিকল্পনা, বাজেট এবং হিসাব পরীক্ষা ও অনু-মোদন করে, জনগণের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখে, সংখ্যালঘু জাতীয় জনসমাজের সমানাধিকার সুনিশ্চিত করে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজ-তান্ত্রিক গঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করে। আঞ্চলিক গণকংগ্রেস নিজ নিজ স্তরে বিপ্লবী কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত ও অপসারিত করিবার ক্ষমতা ভোগ করে। কাউণ্টি এবং ইহার উচ্চস্তরের গণকংগ্রেসগুলো নিজ নিজ স্তরের গণ-আদালতের সভাপতি এবং প্রধান প্রকিউরেটরকে নির্বাচিত এবং প্রয়োজন বোধে পদচ্যুত করতে পারে। গণকংগ্রেসের ডেপুটিরা সংশ্লিষ্ট স্তরের গণআদালত, গণপ্রকিউরেটর ও অন্যান্য সংস্থাকে তাদের কার্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে এবং এই সকল জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর দিতে সংশ্লিষ্ট সকলে বাধ্য থাকেন।

কার্যাবলী

খ. আঞ্চলিক বিপ্লবী কমিটি বাতিল

১৯৮২ সালের সংবিধানে গণকমিউনকে বাতিল করতে গিয়ে বিপ্লবী কমিটিকেও বাতিল করা হয়েছে। পূর্বে আঞ্চলিক গণবিপ্লবী কমিটিগুলি নিজ নিজ স্তরের শাসনবিভাগ হিসাবে কার্য করতো। প্রতিটি আঞ্চলিক বিপ্লবী কমিটি একজন চেয়ারম্যান, কয়েকজন উপ-চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে গঠিত হোত। আঞ্চলিক বিপ্লবী কমিটির সদস্যরা নিজ নিজ স্তরের বিপ্লবী কমিটির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হোত এবং তাদের দ্বারা অপসারিত হতে পারতো।

আঞ্চলিক বিপ্লবী কমিটিগুলি ছিল শাসনবিভাগীয় সংস্থা। ইহারা নিজ নিজ স্তরের গণকংগ্রেস এবং অন্যান্য উচ্চতর রাষ্ট্রীয় সংস্থার নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত মান্য ও কার্যকর করতো, নিজ নিজ এলাকার প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করতো, নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে আইনানুযায়ী নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত কার্যকর করতো। কাউণ্টি ও ইহার উর্ধ্বতন স্তরের বিপ্লবী কমিটিসমূহ রাষ্ট্রীয় সংস্থায় নিয়োগ ও অপসারণের অধিকার ভোগ করতো।

আঞ্চলিক বিপ্লবী কমিটিসমূহ রাষ্ট্রীয় পরিষদের ঐক্যবন্ধ নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রতিটি আঞ্চলিক বিপ্লবী কমিটি নিজ নিজ স্তরের গণকংগ্রেসের কাছে এবং উচ্চতর শাসনবিভাগীয় সংস্থার কাছে দায়িত্বশীল থাকে এবং কার্যাবলীর জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।

উল্লেখযোগ্য যে 'পিকিঙ রিভিউ'-এর (১৩ই জুলাই, ১৯৭৯) খবরে প্রকাশ যে, পিকিঙের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র পেঙচেন যিনি মাও এবং চৌ'র মৃত্যুর পরে রাজনৈতিক পুনর্বাসন পেয়ে 'আইনী ব্যবস্থাদি কমিশন'-এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন, তিনি ১৯৭৯ সালের ২৬শে জুন জাতীয় গণকংগ্রেসে সংবিধান সংশোধনের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন: "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে বিপ্লবী কমিটি নামে যে সকল অস্থায়ী সংস্থা গড়ে উঠেছিল সেগুলি আর নতুন যুগের সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের প্রয়োজন মিটাতে পারে না। বিপ্লবী কমিটি থেকে এইগুলিকে জনগণের গভর্নমেণ্টে পরিবর্তন করলে গণতন্ত্র ও আইনী ব্যবস্থা শুধুমাত্র যে শক্তিশালী হবে তা নয়, এই পরিবর্তনের দ্বারা গভর্নমেণ্ট ও জনগণের সম্পর্কের মধ্যেও এক বৈশিষ্ট্যমূলক ঘনিষ্ঠতার প্রকাশ ঘটবে।" উপরোক্ত প্রস্তাব থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে, বিপ্লবী কমিটির রদ আসন্ন। বাস্তবে তাই ঘটেছে। ১৯৮২ সালের সংবিধানে একে বাতিল করা হয়েছে।

গ. স্থানীয় গণআদালত ও গণপ্রকিউরেটরেট

আঞ্চলিক স্তরে বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য আঞ্চলিক গণআদালত এবং বিচার-বিভাগীয় অনুসন্ধান ও তত্ত্বাবধানের জন্য আঞ্চলিক প্রকিউরেটরেট রয়েছে। আঞ্চলিক গণপ্রকিউরেটরেট আইনানুসারে তাদের তদারকী ক্ষমতা প্রয়োগ করে। আঞ্চলিক স্তরের গণআদালতের সভাপতি এবং প্রধান প্রকিউরেটর সংশ্লিষ্ট গণকংগ্রেস দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং প্রয়োজন বোধে পদচ্যুত হয়। প্রতিটি স্তরের গণআদালত এবং গণপ্রকিউরেটর তাদের কার্যাবলীর জন্য সংশ্লিষ্ট গণকংগ্রেসের কাছে দায়ী থাকে। আঞ্চলিক গণপ্রকিউরেটরেটসমূহ সর্বোচ্চ গণপ্রকিউরেটরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

৫'১০. জাতীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলসমূহের স্বয়ংশাসিত ব্যবস্থা

(The System of Self Government of National Autonomous Areas)

চীন গণসাধারণতন্ত্রে সংবিধানের মৌল নীতিতে চীনকে একটি বহুজাতিসম্পন্ন রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুত চীনে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ৫৪টি জাতীয় জনসমাজ (Nationalities) আছে। একটি জাতি কর্তৃক অন্য জাতিকে শোষণের অবসান এবং সকল জাতীয় জনসমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য চীনে জাতীয় জনসমাজগুলির সর্বাঙ্গীণ আত্মবিকাশ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সংবিধানে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে জাতীয় জীবনপ্রবাহের সঙ্গে তাদের একীভূত করার প্রয়াস চালান হয়েছে।

সংবিধানে চীনের জাতীয় জনসমাজগুলিকে তিনটি আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থায় বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল :

১. **স্বায়ত্তশাসিত এলাকা**

পাঁচটি বৃহৎ জাতি সম্বলিত পাঁচটি এলাকাকে স্বায়ত্তশাসিত এলাকারূপে ঘোষণা করা হয়েছে।

২. **স্বায়ত্তশাসিত অধ্যক্ষপ্রধান অঞ্চল**

অপেক্ষাকৃত কম সদস্যবিশিষ্ট ২৯টি জাতীয় জনসমাজ স্বায়ত্তশাসিত অধ্যক্ষপ্রধান অঞ্চল আছে।

৩. **স্বায়ত্তশাসিত কাউণ্টি**

চীনে বর্তমানে ৬৯টি স্বায়ত্তশাসিত কাউণ্টি আছে।

উপরোক্ত প্রতিটি স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় প্রত্যেকের নিজ নিজ গণপরিষদ ও শাসন কমিটি আছে। আঞ্চলিক সংস্থার গণপরিষদ ও কমিটি যে ভাবে গঠিত হয় এবং যে সকল কার্যাবলী সম্পন্ন হয় অনুরূপ গঠনপ্রণালী ও কার্যাবলী এদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোন একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে একাধিক জাতীয় জনসমাজ থাকলে প্রতিটি জাতীয় জনসমাজ স্বতন্ত্র প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার ভোগ করে। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির কার্য সম্পন্ন হয় সেই জাতীয় জনসমাজের ব্যবহৃত ভাষায়।

৫.১১. গণকমিউন

(People's Communes)

চীনের কমিউন ব্যবস্থা ছিল সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এক অনন্য সংযোজন এবং তীব্র তত্ত্বগত বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৮২ **সালে গৃহীত চীনের বর্তমান সংবিধানে কমিউন ব্যবস্থাকে বাতিল করা হয়েছে।** কিন্তু চীনের গণকমিউন সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই গণকমিউন সম্পর্কে একটা সাধারণ আলোচনা উপস্থিত করা প্রয়োজন মনে করে নীচে গণকমিউন সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

চীনের আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলের সর্বনিম্ন সংস্থা হল কমিউন। সর্বনিম্ন সংস্থা হলেও চীনের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ইহার প্রভাব ও ভূমিকা বিস্ময়কর। চীনের গ্রামীণ, সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হল গণকমিউন এবং আশা করা হয়েছিল যে, চীনের আগামী দিনের সাম্যবাদী সমাজে গণকমিউন হবে মৌল একক। সুতরাং গণকমিউনের আলোচনা ছাড়া চীনের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

চীন গণসাধারণতন্ত্রের জন্মের প্রথম থেকেই গণকমিউন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত কৃষকদের যৌথ উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করতে শুরু করে এবং এর ফলশ্রুতি হিসাবে পারস্পরিক 'সাহায্যকারী গোষ্ঠী' (Mutual-aid Teams) গঠিত হয়। যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাবে ১৯৫৩

সালে 'কৃষি উৎপাদন সমবায় সমিতি' (Agricultural Producers' Cooperatives) গড়ে উঠে। কিছু দিনের মধ্যে ঐ সকল সমবায় সংস্থাগুলিকে "উচ্চতর কৃষি উৎপাদন সমবায় সমিতি''তে (Advanced Agricultural Producers' Cooperatives) পরিণত করা হয়। এই সমবায়গুলির সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা বেশি ছিল—কারণ কৃষকেরা মজুরি পেত, কিন্তু লাভ বা ডিভিডেণ্ড পেত না।

গঠন

১৯৫৮ সালে Great Leap Forward আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির কৌশল (strategy) হিসাবে গণকমিউন প্রবর্তন করা হয়, যদিও কমিউন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপারে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। পার্টির একটা অংশ কৃষি উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির জন্য কৃষিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকরণে আর্থিক প্রেরণা (material incentives) প্রদান এবং আধুনিকীকরণের পক্ষপাতি ছিলেন। অন্যদিকে মাও সে-তুং'র নেতৃত্বে অন্য অংশ কৃষি উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য কমিউন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে ছিলেন। যাই হোক, মাও সে-তুং'র নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গণকমিউন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করে। কমিউনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই কৃষিজীবী জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণকমিউন গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং পার্টি তা অনুসরণ করে (The Peasant masses started them. The Party followed)[১]। ১৯৫৮ সালের আগষ্ট মাসে 'কমিউন আন্দোলন' শুরু হয় এবং ঐ বছর নভেম্বর মাসের মধ্যে ২৬,৫০০ গণকমিউন গঠিত হয়। গ্রামীণ জনগণের শতকরা ৯৯ জন কমিউনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

কমিউন কি ও কেন ?

চীনে গণকমিউন ব্যবস্থার প্রবর্তন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। প্রশ্ন হল, গণকমিউন কি ? পূর্বেই বলা হয়েছে যে, গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন সংস্থাকে গণকমিউন বলে। ১৮ বছর ও তদোর্ধ্ব বয়স্ক নাগরিকদের ভোটে দু' বছরের জন্য গঠিত হয় গণকমিউনের গণকংগ্রেস এবং গণকংগ্রেস নির্বাচিত করে গণকমিউনের শাসনবিভাগীয় সংস্থা বিপ্লবী কমিটি।

কমিউনের দর্শন

'কৃষি হল, ভিত্তি, আর শিল্প হল মুখ্য উপাদান' এবং 'শিল্প কৃষিকে সেবা করুক'—চীনের কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের এই দুটি উপলব্ধির বাস্তব রূপ হল গণকমিউন। আর গণকমিউনের বিকাশের মধ্য দিয়ে শহর ও গ্রামের ব্যবধান দূরীভূত হয়ে উভয়ের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কমিউন-জীবন চীনে কৃষকের যে সকল সুখ-সুবিধা এনে দিয়েছে তা তাদের ভরা পেট, শারীরিক উষ্ণতা, ভাল বাসস্থান, ভাল বিছানা বা নগদ আয় দিয়ে পরিমাপ করলে চলবে না। কমিউনের অর্থ এর চাইতে অনেক বেশি। এডগার স্নো-র ভাষায় বলা যায়, কমিউনের দ্বারা সমষ্টিগত শ্রম দ্বারা প্রাচীন চীনের মুখাবয়বের পরিবর্তন

১. China's Long Revolution—Edgar Snow.

হয়েছে সকলের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য—ব্যক্তির ব্যক্তিগত কোন লাভের জন্য নয়। তিনি মনে করেন, এই সমষ্টিগত শ্রম ও সমষ্টিগত ধারণা হল এমন একটা ধারণা ও অভ্যাস যার ফলে একটা নতুন দর্শন, একটি বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি না করে পারে না।[১]

সুতরাং গণকমিউনকে গ্রামাঞ্চলের শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন সংস্থা বলে অভিহিত করলে এর সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। গণকমিউন এমন একটি সামাজিক সংস্থা যা চীনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন সম্ভাবনার উজ্জ্বল উৎস এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি।

গ্রামীণ গণকমিউনের অর্থনীতি হল শ্রমজীবী জনসাধারণের মালিকানাধীন যৌথ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। এতে তিন প্রকারের মালিকানা আছে: কমিউনের মালিকানা, উৎপাদন ব্রিগেডের মালিকানা এবং উৎপাদন টিমের মালিকানা। এদের মধ্যে উৎপাদন টিম হল হিসাব রক্ষণের মূল ইউনিট। গণকমিউনের যৌথ অর্থনীতির আধিপত্য সুনিশ্চিত করে এর সদস্যগণ নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ছোটখাটো ভূমিখণ্ডে চাষ আবাদ করতে পারে, পরিবারগত সহায়ক উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকতে পারে এবং নিজেদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য অল্পস্বল্প পশু প্রতিপালন করতে পারে।

কমিউনের অর্থনীতি

কমিউন শুধুমাত্র কৃষি উৎপাদন সংস্থা নয়। কৃষি যদিও মূল ভিত্তি, কিন্তু কৃষির সঙ্গে জড়িত আছে শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং এমনকি পশুপালন, মৎস চাষ, জলসেচ, বনবিভাগ, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি কার্যাবলী—এক কথায় এক সর্বাত্মক কর্মযজ্ঞে গণকমিউন ব্যবস্থা উৎসর্গীকৃত।

কার্যাবলী

চীনে ৭০ হাজারের বেশি কমিউন ছিল, ঐগুলি আবার ৭ লক্ষ ৫০ হাজার উৎপাদন টিমে বিভক্ত ছিল। একটি ব্রিগেডে কয়েকটি উৎপাদন টিম থাকে। চীনের সকল কমিউনের আর্থিক অবস্থা এক নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় পাও আন (বর্তমান নাম জে-দান) একটি দরিদ্র কমিউন ব্রিগেড। ১৯৭০ সালে এর পরিবার প্রতি বছরে গড় আয় ছিল ৮০ ডলার। অন্যদিকে 'হুস ব্রিজ' একটি ধনী কমিউন, ১৯৭০ সালে যার পরিবার প্রতি বছরে গড় আয় ছিল ৭২০ ডলার।

আর্থিক অবস্থা

কমিউনগুলির আয়ের মূল উৎস হল উৎপাদিত ফসলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ। ইহা ছাড়াও শিল্প, বনজ সম্পদ, মৎস্য ও গরু-ভেড়া-মোষ থেকে কিছু আয় হয়। কমিউনের আয়ের অর্ধেক ব্যয় হয় বেতন ও মজুরির জন্য, ৩ থেকে ৫ শতাংশ রাষ্ট্রকে কর দিতে হয়, একটা মোটা অংশ ব্যয় হয় যন্ত্রপাতি, সার, বীজ ইত্যাদির জন্য, ১০ থেকে ২০ ভাগ সঞ্চয় ভাণ্ডারে জমা রাখা হয়। এ ছাড়া শিল্প, স্বাস্থ্য, অক্ষমদের ভাতা প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে কিছু ব্যয় করতে

আয়-ব্যয়

১. পূর্বে উদ্ধৃত

হয়। কমিউনের উৎপাদিত ফসলের ১৫ হইতে ১৬ শতাংশ খাদ্যশস্য রাষ্ট্রকে নির্ধারিত মূল্যে দিতে হয়।

কমিউন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

চীনের গণকমিউন ব্যবস্থা একটি অনন্য সংযোজন। কমিউনগুলি শাসনব্যবস্থার মৌল একক (unit) হলেও ইহা চীনের অর্থনীতি ও রাজনীতির চালিকা-শক্তির ভূমিকা পালন করে। অর্থনীতি, রাজনীতি ও স্বায়ত্তশাসনের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে কমিউনের মধ্য দিয়ে। গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতি ও সার্বিক উন্নতির দ্বারা দেশের সমাজতান্ত্রিক বিকাশকে সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে ইহা এক অভিনব প্রয়াস।

চীনের গণকমিউনগুলি বহুমুখী কর্মধারা ও লক্ষ্য সাধনের হাতিয়ার। ইহা শুধুমাত্র কৃষি খামার নয়, বা ইহা শুধুমাত্র কুটিরশিল্প কেন্দ্র নয়, বা নিছক রাজনৈতিক সেল (cell) নয়, বা একান্তভাবেই একটি স্বায়ত্তশাসন সংস্থা নয়—ইহা একের মধ্যে বহু। স্বায়ত্তশাসন থেকে শুরু করে শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস্য চাষ, পশুপালন, বনজ সম্পদ, জলসেচ, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে কমিউনগুলি জড়িত।

কমিউনগুলি শুধুমাত্র বহুমুখী লক্ষ্যই সাধন করে না—এইগুলি আত্মনির্ভর এবং নিজেতে নিজে পূর্ণ। নিজেদের উৎপাদন লব্ধ অর্থ দ্বারা এরা চালিত হয়—অন্য কোন আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে না। স্বাবলম্বী এই সকল কমিউনগুলি বরং আয়ের ৩ থেকে ৫ শতাংশ রাষ্ট্রকে কর দিয়ে সাহায্য করে এবং নির্ধারিত মূল্যে রাষ্ট্রকে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ দেয়।

কমিউনগুলি, রাজনৈতিক শিক্ষা ও মানসিকতা গঠনের বুনিয়াদ রচনা করে। মার্কসবাদ-লেলিনবাদ ও মাও সে তুং-র চিন্তাধারার ভিত্তিতে বিশাল দেশের ব্যাপক জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্যাপারে কমিউনগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। চীনের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে—"যে মানুষেরা কমিউনিস্টদের ক্ষমতায় এনেছে।" এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে রাজনৈতিক মানসিকতায় উজ্জীবিত করা এবং সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে কমিউন এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। স্ত্রী-পুরুষের সমস্ত শ্রমশক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে একে জাতীয় কর্মযজ্ঞে নিয়োগ করা হয়। কমিউনে জনগণকে এমনভাবে সর্বাত্মক শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে একই ব্যক্তি কৃষি, শিল্প ও যুদ্ধে সমানভাবে পারদর্শী হতে পারে। মাও'র ভাষায় বলা যায়, জনগণ একই সঙ্গে ক্ষেত-খামারে কৃষক, কারখানায় শ্রমিক এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক হয়ে ওঠে।

কমিউনে "প্রত্যেকের কাছ থেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী" (from each according to his ability and to each according to his needs)—এই মার্কসীয় নীতি রূপায়ণের প্রয়াস চলেছে। তাই সেখানে সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত মালিকানার সনাতন জট ধরে টান মেরে জনগণের মধ্যে 'একই সমাজতান্ত্রিক পরিবারের' মানসিকতা সৃষ্টি করেছে। কমিউনকে কমিউনিজমের

দিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়। পিপলস্ ডেইলীর (People's Daily) সম্পাদকীয়তে কমিউনগুলি চীনের আগামী দিনের সাম্যবাদী সমাজের মৌল এককে পরিণত হবে বলে আশা ব্যক্ত করা হয়েছিল (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮)। বস্তুত চীনা নেতৃবৃন্দ একসময় কমিউনকে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের পাথেয় বলে মনে করতেন।

কমিউন নিয়ে তত্ত্বগত বিরোধ

চীনের কমিউন নিয়ে এমন একটা বিতর্কের ঝড় দেখা দেয় যা চীনের সীমানা অতিক্রম করে চীন সোভিয়েত সম্পর্ককে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। বস্তুত চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের অবনতির ব্যাপারে কমিউন সম্পর্কে মতপার্থক্য একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে। চীনের কমিউন ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর আস্থাশীল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের একাংশ দাবী করে যে কমিউন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও এর সাফল্যের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক আগেই চীনের সাম্যবাদে উত্তরণ সম্ভব হবে, কারণ কমিউন দ্বারা চীন ইতিমধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে।

অন্যদিকে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত পার্টি চীনে কমিউন ব্যবস্থার সাফল্য সম্পর্কে গভীর সংশয় প্রকাশ করেন এবং কমিউন ব্যবস্থাকে অপরিণামদর্শিতা বলে অভিহিত করেন। কমিউন এবং অন্যান্য নীতিগত প্রশ্নে চীন-সোভিয়েত মতবিরোধ এমন তীব্র পর্যায়ে উপনীত হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৬০ সালে বৃহদায়তন শিল্প ও গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত তিন শতের বেশি চুক্তি বাতিল করে চীন থেকে তাদের সব উপদেষ্টাদের তুলে আনে। অনেকে এই ঘটনাকে "নোঙর কেটে চীনকে সমুদ্রের জলে ঠেলে ফেলা' বলে উল্লেখ করেছেন।

যাহোক, ১৮৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত চীনকে ব্যাপক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও খারাপ আবহাওয়ার জন্য চীনে উৎপাদন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর সঙ্গে "কমিউন এবং 'দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চলো' (Great Leap Forward) নীতি রূপায়ণে পার্টি সদস্যদের অত্যুৎসাহ, অভিজ্ঞতার অভাব ও মাত্রাজ্ঞানহীনতার জন্য সংকট আরও ঘনীভূত হয়।" শোনা যায়, এই সময়ে চীনে নাকি দুই থেকে আড়াই কোটি লোক অনাহারে মারা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমস্ত ব্যাপারটির জন্য কমিউন ব্যবস্থার ব্যর্থতাকে দায়ী করে।

অন্যদিকে অনেকে মত প্রকাশ করেন যে, কমিউন না থাকলে ঐ অভূতপূর্ব দুর্যোগের জন্য আরও অসংখ্য লোক অনাহারে মারা যেত। কমিউন ব্যবস্থার বিকাশের সংগে সংগে খাদ্যশস্যে চীন আত্মনির্ভর হয়ে রপ্তানী শুরু করে, শিল্পায়নের উন্নতি ঘটে এবং গ্রামাঞ্চলে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার নূতন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করে। কমিউন ব্যবস্থা মাও'র পারিপার্শ্বিক বদলে মানুষকে বদলাবার এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। এডগার স্নো মনে করেন, কমিউন ব্যবস্থা নাটকীয়ভাবে আধুনিকীকরণ ঘটাবে গ্রামাঞ্চলে—যে গ্রামাঞ্চল চীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বাসভূমি।

৬ | নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ
(The Fundamental Rights and Duties of Citizens)

৬·১. বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক অধিকারের তুলনা
(A comparison between Bourgeois and Socialist rights)

সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত নাগরিকের স্বত্ব বা দাবীকে 'অধিকার' বলা হয়। হ্যারল্ড লাস্কির ভাষায় বলা যায়, অধিকার হল সমাজজীবনের এমন কতকগুলি শর্ত, যা ছাড়া মানুষ নিজের সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে না। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত না হলে অধিকারের কোন মূল্য থাকে না। নাগরিক বহু প্রকার অধিকারের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এইগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক 'অধিকার' হিসাবে স্বীকৃত না হচ্ছে, ততক্ষণ ঐ সকল অধিকারের কোন মূল্য থাকে না। এই দিক থেকে বিচার করে অধিকারকে একটি রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা বলা যেতে পারে।

মার্কসবাদীরা অধিকারকে সমাজব্যবস্থার চরিত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত মনে করেন। সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে অধিকারেরও চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে। এই মতবাদ অনুযায়ী, কোন সমাজে অধিকার সেই সমাজের আর্থিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির তুলনায় বেশি হতে পারে না। অর্থাৎ প্রত্যেক সমাজে অধিকারের ধারণা সেই সময়ের আর্থিক বিন্যাস এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে গড়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং তার অধিকার আর্থিক কাঠামোতে তার অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল।

বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় অধিকার কোন অবস্থাতেই শ্রেণীনিরপেক্ষ হতে পারে না।

নাগরিকতার সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবেই 'অধিকার'-এর ধারণা জড়িত। আঠারো শতক থেকেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে 'জনগণের অধিকার' মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। শতেরোর শতকের শেষ দিকে ১৬৮৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে *Declaration of Rights* গৃহীত হয়। ১৭৯১ সালে মার্কিন সংবিধানের প্রথম দশটি সংশোধনীর মাধ্যমে কয়েকটি অধিকারকে গ্রহণ করা হয় এবং এই সংশোধনীর পর থেকেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংবিধানে 'অধিকারকে' সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। বুর্জোয়া এবং কুলাক শ্রেণীর অবলুপ্তির পর ১৯৩৬ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে জনগণের অধিকারকে বিস্তৃতভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়। চীন গণসাধারণতন্ত্রের সংবিধানেও জনগণকে ব্যাপক অধিকার দেওয়া হয়েছে।

বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের জন্য স্বীকৃত অধিকারগুলি তুলনা করলেই অধিকার সম্পর্কে উভয় সমাজব্যবস্থার ধ্যান-ধারণার পার্থক্য সহজেই অনুধাবন

করা যায়। বস্তুত একটি রাষ্ট্র জনগণের জন্য যে সকল অধিকার সংরক্ষণ করে তার দ্বারাই সেই রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে।

১ অধিকার ও সমাজ

বুর্জোয়া রাষ্ট্রে অধিকারকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সমাজ-নিরপেক্ষ বলে মনে করা হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিকারকে সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট, গৃহীত ও সংরক্ষিত বলে মনে করা হয়। এই অধিকার যাতে বাস্তবে ভোগ করা যায় তার জন্যও সমাজ যোগ্য পরিবেশ রচনা করে।

২. অধিকার ও সুযোগ

বুর্জোয়া অধিকার ঘোষণাই যথেষ্ট, কিন্তু ইহা বাস্তবায়িত করবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ এবং শর্ত রচনার দায়িত্ব থাকে না। যেমন, অর্থব্যয় করে ন্যায়বিচার পাবার অধিকার দেওয়া হতে পারে, কিন্তু অর্থব্যয় করে ন্যায় বিচার ক্রয় করার সামর্থ্য আছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব রাষ্ট্র অস্বীকার করে। স্তালিন যথার্থই বলেছেন: বুর্জোয়া সংবিধানে অধিকারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে, কিন্তু ঐ সকল অধিকার প্রয়োগের শর্ত, সুযোগ ও সামর্থ্য আছে কিনা সেই সম্পর্কে মাথা ঘামায় না।[১] কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ অধিকার বাস্তবে ভোগ করার পরিবেশ, শর্ত, সুযোগ ও সামর্থ্য সৃষ্টির দায়িত্বও গ্রহণ করে।

৩. ঘোষিত অধিকার ও প্রকৃত অধিকার

বুর্জোয়া সংবিধানের অধিকাংশ অধিকারই অসম সমাজব্যবস্থায় অর্থহীন বাগাড়ম্বর, বাস্তবে এদের বিশেষ কোন মূল্য নেই। যেমন, তারা জোর গলায় 'সাম্য'-এর অধিকারের কথা বলেন, কিন্তু তারা জানেন না যে শ্রমিক ও মালিক বা কৃষক ও জমিদারের মধ্যে প্রকৃত সাম্য থাকতে পারে না। একটা নিঃস্ব শ্রেণী এবং একটা সম্পদশালী ও রাষ্ট্রীয় শক্তির সমর্থনপুষ্ট শ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত সাম্য থাকতে পারে না। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা হয়। কিন্তু যার হাতে খবরের কাগজ, রেডিও বা মত প্রকাশের অন্য কোন বাহন নেই তার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার মূল্য কী? কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে শোষণ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব নেই, ইহা সমস্বার্থসম্পন্ন সমাজ বলে স্বীকৃত অধিকারগুলি প্রকৃত অধিকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

৪. অধিকার ইতিবাচক ও নেতিবাচক

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অধিকার ভোগের পরিবেশ ও সুযোগ থাকে বলে অধিকার-ইতিবাচক হয়। কিন্তু বুর্জোয়া ব্যবস্থায় অধিকার সংখ্যালঘু জনগণ যাদের সুযোগ ও সামর্থ্য আছে তাদের কাছে ইতিবাচক হয়ে দেখা দিলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে 'নেতিবাচক' থেকে যায়।

১. "Bourgeoisie constitutions usually confine themselves to stating the formal rights of citizens without bothering about the conditions for the exercise of these rights, about the opportunity of exercising them, about the means by which they can be exercised.' —Stalin.

বুর্জোয়া অর্থনৈতিক অধিকারের ধারণা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অধিকারের ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক অধিকার বলতে সম্পত্তির অধিকার, মালিকানার অধিকার, সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকার প্রভৃতিকে বোঝায়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক অধিকারের মূল ভিত্তি হল কর্মের অধিকার।

৫. অধিকারের ধারণা আলাদা

বুর্জোয়া সংবিধানে রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার স্বীকৃত হলেও কোন প্রকৃত অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয় না। অথচ অর্থনৈতিক অধিকার না থাকলে অন্যান্য অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক সংবিধানে প্রকৃত অর্থনৈতিক অধিকার জনগণের জন্য নিশ্চিত করা হয়।

৬. অর্থনৈতিক অধিকারের উপস্থিতি

৬.২. চীনে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্য (Features of the Fundamental Rights of the Chinese Citizens)

বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক অধিকারের তুলনার পরিপ্রেক্ষিতে এবার আমরা চীন গণসাধারণতন্ত্রের মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করতে পারি।

চীনে নাগরিকদের জন্য ব্যাপক মৌলিক অধিকারই কেবলমাত্র ঘোষণা করা হয় নি, সোভিয়েত ইউনিয়নের মত ঐ অধিকারগুলি ভোগ করার শর্ত, সুযোগ ও সামর্থ্যকেও সুনিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে মৌলিক অধিকারগুলি বাগাড়ম্বর না হয়ে জনগণের প্রকৃত অধিকারে পরিণত হয়েছে।

১. অধিকার ভোগ সুনিশ্চিত

বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মত চীনে রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের বাক্যজাল বুনে প্রকৃত অর্থনৈতিক অধিকারকে মৌলিক অধিকারের আঙ্গিনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় না। চীনের সংবিধানে কাজ করার অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, অসুস্থ ও অক্ষম ব্যক্তির আর্থিক সাহায্যের অধিকার প্রভৃতি প্রকৃত অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে স্বীকার করা হয়েছে।

২. অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত

সোভিয়েত ইউনিয়নের মত চীনের শাসনব্যবস্থায়ও জনগণের মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি জনগণের মৌলিক কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করা হয় না. ইহারা পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে আবদ্ধ।

৩. অধিকার ও কর্তব্য

চীনে আদালতের ওপর জনগণের অধিকার সুনিশ্চিত করার এবং অধিকার ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবিধানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। বিভিন্ন শ্রেণীগত স্বার্থের সংঘাত থাকে বলে বুর্জোয়া রাষ্ট্রে তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' আদালতের ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু চীনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি।

৪. অধিকার রক্ষায় আদালতের ভূমিকা নেই

চীনের জনগণের মৌলিক অধিকার কোনরূপ বাধা-নিষেধের দ্বারা আবদ্ধ বা ব্যতিক্রমের দ্বারা ভারাক্রান্ত নয়। এর কারণ হল, সেখানে নাগরিক অধিকার ও রাষ্ট্র-স্বার্থের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই এবং সেখানে নাগরিক অধিকারের পরিপন্থী কোন কায়েমী স্বার্থের অস্তিত্ব নেই বলে নাগরিক অধিকার বাধা-নিষেধের বন্ধন থেকে মুক্ত।

৫. অধিকার বাধানিষেধ মুক্ত

৬'৩. জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ

(Fundamental Rights of the Citizens)

চীন গণসাধারণতন্ত্রের সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (সংবিধানের ৩৩ থেকে ৫৬ নম্বর ধারায়) নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এই অধিকারগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে।

১. **রাজনৈতিক অধিকার** (Political Rights)

ক. ভোটাধিকার: আইনানুসারে যে সকল ব্যক্তিকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তারা ছাড়া আঠারো বছর এবং তার বেশী বয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার থাকবে এবং নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে (৩৪ নং ধারা)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে চীনে ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং নির্বাচন প্রার্থী হবার জন্য স্বতন্ত্র বয়স সীমা নির্ধারিত করা হয়নি।

খ. স্বাধীনতার অধিকার: চীনা নাগরিকদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, পত্রালাপের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, রাস্তায় মিছিলের স্বাধীনতা, বিক্ষোভ প্রদর্শনের স্বাধীনতা এবং ধর্মঘটের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে চীনা নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছেন যে, সর্বস্তরের আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার হল ধর্মঘট। তাই সাংস্কৃতিক বিপ্লবোত্তর দুইটি সংবিধানেই (১৯৭৫ ও ১৯৭৮) নাগরিকদের ধর্মঘটের অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সংবিধানে এই অধিকার স্বীকৃত হয়নি।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবলব্ধ উপলব্ধি থেকে চীনা নাগরিকদের স্বাধীন মত ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের কয়েকটি পদ্ধতি সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছিল। এগুলি হল "স্বাধীনভাবে কথা বলার, সম্পূর্ণরূপে মতামত প্রকাশের, বড় বড় বিতর্কসভা আয়োজনের এবং বড় বড় পোষ্টার লেখার"। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'মাও সে-তুং'-এর বড় পোষ্টার "সদর দপ্তরে কামান দাগো, ধ্বংস করো" (তা জু-পাও) সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে গতি দান করে। পোষ্টার লেখাসহ মতামত প্রকাশের এই পদ্ধতিগুলি বহুদিন থেকেই চালু ছিল, কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর এইগুলি সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়।

পিকিঙ রিভিউ-এর (২৮শে এপ্রিল ১৯৮০) খবরে জানা যায় যে, **উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতাগুলির সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে।** সংবাদে বলা হয়েছে, "মন খুলে কথা বলো, দ্বিধাহীনভাবে মতামত জানাও, বিতর্ক চালাও, প্রাচীর পত্র লিখো"—এই সকল স্বীকৃত অধিকার রদ করার সুপারিশ এসেছে জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির ১৯৮০-এর ৯—১৬ ই এপ্রিলের অনুষ্ঠিত ২৪ নং অধিবেশন থেকে। কারণ "অসৎ লোকেরা" ঐ সকল অধিকারকে "অসৎ ব্যবহার" করছে। এই প্রসঙ্গে 'চার-চক্রী' এবং ওয়েই জিঙ্-শেঙ্-এর নাম করা হয়েছে। এই অধিকার "পার্টি ও রাষ্ট্রের অতি গোপন বিষয় প্রকাশ করে দিচ্ছে, উৎপাদন ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের কর্মযজ্ঞে বিশৃংখলা সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং জনগণের সত্যিকারের গণতন্ত্রের ক্ষতি সাধন করছে।" আরও বলা হয়েছে যে, প্রাচীরপত্রের লিখন "কখনই জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সত্যিকারের ভূমিকা পালন করেনি।" উপরোক্ত যুক্তিতে বর্তমান সংবিধানে উপরোক্ত অধিকারগুলো বাতিল করা হয়েছে।

২. **ব্যক্তিগত অধিকার** (Civil Rights)

ক. ধর্মের অধিকার : চীনের নাগরিকদের ধর্মের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে নাগরিকেরা ধর্মে বিশ্বাস করার এবং ধর্মে বিশ্বাস না করার স্বাধীনতা ভোগ করে। সুতরাং চীনের নাগরিকেরা ধর্মে বিশ্বাসী হবার এবং নাস্তিক হবার উভয় স্বাধীনতাই ভোগ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মত চীনেও ধর্মীয় আচার-আচরণের বিরুদ্ধে এবং নিরীশ্বরবাদ প্রচারের স্বাধীনতা সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কমিউনিজম্ ধর্মীয় আচার-বিরোধী। কিন্তু সাংবিধানিক ঘোষণার দ্বারা ধর্মীয় আচার-আচরণ অপসারিত করা যায় না। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে ধর্মীয় গোঁড়ামী স্বাভাবিকভাবে অপসারিত না হয় ততদিন সংবিধানে ধর্মীয় অধিকার বজায় রাখাই বাস্তবসম্মত।

খ. দৈহিক ও বাসস্থানের স্বাধীনতা : নাগরিকদের দৈহিক ও বাসস্থানের স্বাধীনতা অলঙ্ঘনীয়, গণ আদালতের সিদ্ধান্ত অথবা গণ প্রকিউরেটরের অনুমোদন ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না। একমাত্র জন নিরাপত্তার জন্য নাগরিকদের গ্রেপ্তার করা যেতে পারে।

গ. বিবাহ ও পরিবারের অধিকার : চীনের নারী ও পুরুষদের নিজের ইচ্ছানুযায়ী বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হবার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। বিবাহ, পরিবার এবং মাতা ও শিশুর রক্ষণের ভার রাষ্ট্র বহন করে। সংবিধানে আরও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র পরিবার পরিকল্পনাকে সমর্থন ও উৎসাহিত করে।

৩. **অর্থনৈতিক অধিকার** (Economic Rights)

ক. কর্মের অধিকার : সোভিয়েত ইউনিয়নের মত চীনের নাগরিকদের কর্মের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে, নাগরিকেরা যাতে

বিশ্রামসহ কর্মের অধিকার ভোগ করতে পারে সেজন্য রাষ্ট্র কাজের সময় এবং ছুটির সময় নির্দিষ্ট করে দেয়। রাষ্ট্র ধীরে ধীরে শ্রমজীবী জনসাধারণের বিশ্রাম লাভের ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের বিভিন্ন বৈষয়িক সুযোগ সুবিধার প্রসার ঘটায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের মত চীন গণসাধারণতন্ত্রেও কর্মের অধিকার একটি মৌল অর্থনৈতিক অধিকার বলে মনে করা হয়। কিন্তু অ-সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ থাকে বলে সেখানে জনগণের স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেক বাগাড়ম্বর করা হলেও কর্মের অধিকারকে কখনই স্বীকার করা হয় না। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে গোটা উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে কর্মের অধিকারকে স্বীকার করা হয়।

খ. বিশ্রামের অধিকার : সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের মত চীনের সংবিধানেও বিশ্রাম ও অবসর যাপনের অধিকারকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, শ্রমজীবী জনসাধারণ যাতে সুনিশ্চিতভাবে বিশ্রামের অধিকার ভোগ করতে পারে সেজন্য রাষ্ট্র কাজের সময় ও ছুটির সময় নির্দিষ্ট করে দেয়। রাষ্ট্র ধীরে ধীরে শ্রমজীবী জনসাধারণের বিশ্রাম লাভের ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের বিভিন্ন বৈষয়িক সুযোগ সুবিধার প্রসার ঘটায়। পুঁজিবাদী কোন রাষ্ট্রে এই অধিকার স্বীকৃত হয় না—কারণ সেখানে সাধারণ মানুষের শ্রম শোষণ করে বিত্তবান মানুষের বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ. বৃদ্ধ, অসুস্থ বা অক্ষমের সাহায্যের অধিকার : বৃদ্ধ বয়সে, অক্ষম অবস্থায় বা অসুস্থ হয়ে পড়লে শ্রমজীবী জনসাধারণ বৈষয়িক সাহায্য লাভের অধিকার ভোগ করে। এ অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ধীরে ধীরে সামাজিক বীমা, সামাজিক সাহায্য, জনস্বাস্থ্য, সমবায় চিকিৎসা এবং অন্যান্য ব্যবস্থাকে প্রসারিত করা হয়। এ ছাড়াও রাষ্ট্র বিপ্লবী শহীদগণের পরিবারের এবং অক্ষম বিপ্লবী সৈনিকদের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদের জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদান করে। সোভিয়েত ইউনিয়নেও বৃদ্ধ, পীড়িত ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ বৈষয়িক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কোন পুঁজিবাদী দেশে জনগণের এরূপ ব্যাপক অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়নি।

৩. **সামাজিক অধিকার** (Social Rights)

ক. শিক্ষার অধিকার : চীনে জনগণকে শিক্ষার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই অধিকারকে সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসারের ব্যবস্থা করে এবং শিক্ষার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকে। চীন শিক্ষার অধিকারকে মুষ্টিমেয় বিত্তবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনে শিক্ষার অধিকারের সম্প্রসারণ অপরিহার্য। চীনে শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এবং এই অধিকারকে ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে চীনের শিক্ষা ব্যবস্থায় পশ্চিমী ঝোঁক দেখা দেয়, শিক্ষার সঙ্গে কায়িক শ্রমের কোন সম্পর্ক থাকে না এবং শিক্ষার অধিকার পূর্বতন জমিদার ও ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াই ছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম কারণ।

খ. সাংস্কৃতিক অধিকার : নাগরিকদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত হওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সাংবাদিকতা, পুস্তক প্রকাশন, জনস্বাস্থ্য, খেলাধূলা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যে লিপ্ত নাগরিকদের সৃজনধর্মী প্রয়াস রাষ্ট্র উৎসাহিত ও সহায়তা করে। চীনের সাংস্কৃতিক অধিকার মানে অপসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা নয়—ইহা সর্বহারার গণসংস্কৃতি ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

গ. নারী ও পুরুষের সমানাধিকার : চীনে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমানাধিকার ভোগ করে (৫৩ নম্বর ধারা)। নারী ও পুরুষ একই কাজের জন্য একই বেতন পাবার অধিকার ভোগ করে। সমাজতান্ত্রিক দেশে নারী-পুরুষের সমানাধিকার শুধুমাত্র তত্ত্বগত স্বীকৃতিতে সীমাবদ্ধ থাকে না—ইহা প্রকৃত সমানাধিকারে পরিণত হয়েছে।

ঘ. বিকাশের অধিকার : সমাজতান্ত্রিক বিকাশের অন্যতম শর্ত হিসাবে চীনে যুব সম্প্রদায় ও শিশুদের বিকাশের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ দৃষ্টি দেয়।

৪. **বিবিধ অধিকার** (Miscellaneous Rights)

ক. বিদেশে বসবাসকারী চীনাদের অধিকার : বিদেশে বসবাসকারী চীনাদের এবং তাঁদের আত্মীয়দের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বার্থ রাষ্ট্র রক্ষা করে।

খ. নালিশ জানাবার অধিকার : কর্তব্যে অবহেলা বা আইন লঙ্ঘনের জন্য যে কোন কর্মরত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নাগরিকের নালিশ জানাবার অধিকার আছে। এরূপ নালিশ জানালে তার জন্য চাপ দেওয়া হবে না বা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা চলবে না।

গ. বিদেশী নাগরিকের চীনে বসবাসের অধিকার : ন্যায়সঙ্গত কাজের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য, বৈপ্লবিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য অথবা বৈজ্ঞানিক কার্যের জন্য নির্যাতিত যে কোন বিদেশী নাগরিক চীনে বসবাস করার অধিকার লাভ করে। এই মানবিক অধিকারটি সর্বহারা শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

চীনে নাগরিকদের অধিকারের সমালোচনা ও মূল্যায়ন

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের অধিকারকে যে ভাষায় সমালোচনা করেন, ঠিক সেই ভাষাতেই চীনের নাগরিকদের অধিকারকে সমালোচনা করেন। এই সমালোচনাগুলি নিম্নে উপস্থিত করা হল :

১. চীন গণসাধারণতন্ত্রের সমষ্টিবাদী ব্যবস্থায় (Totalitarian system)

জীবনের সকল কিছু রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রের এই সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নাগরিক স্বাধীনতা বলতে কিছু থাকতে পারে না।

২. চীনে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই। সুতরাং সেখানে নাগরিকদের বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রহসন মাত্র। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত মত প্রকাশের মাধ্যমগুলির সাহায্যে সেখানে যান্ত্রিক উপায়ে জনগণের মতামত সৃষ্টি করা হয়।

৩ চীনে ধর্মীয় অধিকার প্রকৃত নয়। কারণ ধর্ম-বিরোধী প্রচারের চাপে সেখানে ধর্মীয় অধিকার নিষ্পেষিত হয়।

৪. চীনের একদলীয় ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে নাগরিক অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে যারা কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ ও নীতিতে বিশ্বাস করে না, তাদের অধিকার সেখানে পদদলিত হয়।

৫. অধিকারগুলি রক্ষায় আদালতের কোন ভূমিকা না থাকায় অধিকারগুলির যাথার্থ্য সম্পর্কে অনেক সমালোচক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

উপরোক্ত সমালোচনাগুলি মূলত কমিউনিস্ট বিরোধিতা থেকে উৎসারিত। আমরা চীনের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্য আলোচনার সময় দেখেছি যে, চীনে নাগরিকদের অধিকারগুলিকে শুধুমাত্র ঘোষণা করা হয়নি—ঐগুলি ভোগ করার শর্ত, সুযোগ ও সামর্থ্যকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে, যা কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে দেখা যায় না। বরং বলা যায়, সেখানে সমস্ত অধিকারের ভিত্তি হল অর্থনৈতিক অধিকার। চীনে ব্যাপক অর্থনৈতিক অধিকারকে স্বীকার করে অন্যান্য সকল অধিকার ভোগের ভিত্তিকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। চীনের নাগরিকদের অধিকার বিচারবিভাগীয় বা প্রশাসনিক বাধা নিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত অধিকারে পরিণত হয়েছে। চীনের নাগরিকদের জন্য সংরক্ষিত অধিকার রাষ্ট্র-স্বার্থ বিরোধী নয়। বরং রাষ্ট্র-স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে এই অধিকার নিছক রাজনৈতিক অধিকারের বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে জনগণের সর্বাত্মক বিকাশের অন্যতম শর্তে পরিণত হয়েছে।

৬.৪. চীনের নাগরিকদের কর্তব্য

(Duties of the Citizens)

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় কর্তব্যবিহীন অধিকার বা অধিকারবিহীন কর্তব্য থাকতে পারে না। অধিকার ও কর্তব্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকে বলে মনে করা হয়। যিনি সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করেন না, তিনি অধিকারও ভোগ করবার অধিকারী নন। এই সকল যুক্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মত চীনের সংবিধানেও কিছু কিছু কর্তব্য সংযোজিত হয়েছে (৫১—৫৬ নম্বর ধারা)। এই কর্তব্যগুলি হল :

১. প্রতিটি সক্ষম নাগরিকের গৌরবময় কর্তব্য কাজ করা ;

২. পরিবার পরিকল্পনার নীতি মান্য করা ;

৩. মাতৃভূমি ও সকল জাতিসত্তাসমূহের ঐক্যকে সুরক্ষিত করা ;

৪. সংবিধান ও আইন মান্য করা ;

৫. সরকারী সম্পত্তির যত্ন লওয়া এবং তাকে রক্ষা করা ;

৬. শ্রম-শৃঙ্খলা ও সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা মান্য করা ও সামাজিক মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করা ;

৭. সামাজিক ন্যায়বোধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ;

৮. রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা-রক্ষা করা ;

৯. মাতৃভূমির নিরাপত্তা, সম্মান ও স্বার্থ রক্ষা করা ;

১০. আইনানুযায়ী সামরিক দায়দায়িত্ব পালন করা ;

১১. আধা সামরিক বাহিনীতে যোগদান করা ;

১২. আইন অনুসারে ট্যাক্স প্রদান করা ;

১৩. যাতে অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতার বিঘ্ন না ঘটে নাগরিকদের কর্তব্য সেইভাবে স্বাধীনতা ও অধিকারকে প্রয়োগ করা।

১৪. পিতামাতার কর্তব্য শিশুকে লালন পালন ও শিক্ষা দান করা এবং বড় হয়ে সন্তানের দায়িত্ব হল পিতামাতার সহায়তা করা।

আগের সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে সমর্থন করা কর্তব্যের মধ্যে বিধিবদ্ধ ছিল। কিন্তু দল ও সরকারকে স্বতন্ত্র রাখার নীতি গ্রহণের জন্য এই কর্তব্য বাদ দেওয়া হয়েছে।

৬'৫. চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের তুলনা
(A Comparison between the Rights of the Citizens of China and that of the U.S.S.R.)

বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য

চীন গণসাধারণতন্ত্রের জনগণের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের অধিকারের খুব তাৎপর্যপূর্ণ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের অনুকরণেই চীনের সংবিধানের জনগণের মৌলিক অধিকারকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল।

বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকেও উভয় রাষ্ট্রের অধিকারের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় সংবিধানেই অর্থনৈতিক অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। উভয় ব্যবস্থাতেই অধিকার ভোগের সুযোগ ও সামর্থ্যকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই অধিকারগুলি সমাজব্যবস্থার চরিত্র অনুযায়ী গড়ে উঠেছে এবং এইগুলি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। উভয়ক্ষেত্রেই নাগরিক অধিকার রক্ষায় বিচারবিভাগের কোন ভূমিকা নেই এবং সর্বোপরি উভয় রাষ্ট্রেই অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে বর্ণিত অধিকারগুলির মধ্যেও প্রভূত সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় সংবিধানেই কর্মের অধিকার, বিশ্রাম ও অবসর যাপনের

অধিকার, বৃদ্ধ-পীড়িত-অক্ষমের আর্থিক নিরাপত্তার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার, বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার, সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, ধর্মবিরোধী মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, পরিবার গঠনের স্বাধীনতা, নালিশ জানাবার স্বাধীনতা, বিদেশী নাগরিকদের আশ্রয় লাভের অধিকার স্বীকৃত। এক কথায় উভয় সংবিধানেই ব্যাপক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত অধিকার সংযোজিত হয়েছে।

বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের কয়েকটি নতুন অধিকার বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যা চীনের সংবিধানে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়নি। এদের মধ্যে স্বাস্থ্য সংরক্ষণের অধিকার, আবাসনের অধিকার, বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও শিল্পকর্মের স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার, আদালত কর্তৃক সংরক্ষিত হবার অধিকার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অনুরূপভাবে এক সময় চীনের সংবিধানে ধর্মঘটের অধিকার, মতামত প্রকাশের পদ্ধতি হিসাবে বড় বড় পোস্টার লেখার অধিকার স্বীকৃতি ছিল, কিন্তু বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের মত চীনেও এদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেখা যায় না। ১৯৭৭ সালের নতুন সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নে অধিকারের কিছু কিছু সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা যায়। ঠিক তেমনি চীনেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবোত্তর নতুন পরিস্থিতিতে রচিত সংবিধানেও নাগরিকদের অধিকারের নতুন বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বর্তমান সংবিধানে সেগুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

পার্থক্য

নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং কর্তব্যবিহীন কোন অধিকার থাকতে পারে না—এই যুক্তিতে উভয় সংবিধানেই নাগরিকদের কর্তব্যসমূহ বিধিবদ্ধ হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সংবিধানে সংবিধান ও আইন মান্য করা, শ্রম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সরকারি সম্পত্তি সংরক্ষণ করা, মাতৃভূমি রক্ষা করা, সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান করা, মাতৃভূমি ও সকল জাতীয়সত্তার ঐক্য সংরক্ষণ করা প্রভৃতি যুক্ত হয়েছে।

কর্তব্যের তুলনা

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অনুগত্যের বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টি ও এর সকল সংগঠনকে সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে হয়। গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের সংবিধানে বর্ণিত অন্যান্য কর্তব্যগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সোভিয়েত নাগরিকের কর্তব্যের ব্যাপকতা বেশী। আন্তর্জাতিক কর্তব্য, প্রকৃতি সংরক্ষণ, ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ইত্যাদি কর্তব্যগুলি চীনের সংবিধানে স্থান পায়নি। উভয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক বিকাশের হারের তারতম্যের জন্যই হয়তো এই তারতম্য দেখা দিয়েছে।

৭ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি
The Communist Party of China

৭.১. চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠন ও লক্ষ্য
(Organization and Aims of the CPC)

প্রতিটি দেশেই কমিউনিষ্ট পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করার সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার হিসাবে দেখা হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি হল শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবর্তী বাহিনী। চীনে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পরে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট পার্টি সর্বাত্মক ভূমিক পালন করে। "চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি সমগ্র চীনা জনগণের নেতৃত্বের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ।"

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নবম সম্মেলনে (১৪ই এপ্রিল, ১৯৬৯) কমিউনিষ্ট পাটির সংগঠন, লক্ষ্য এবং আদর্শ বিস্তারিত ভাবে গঠনতন্ত্রে আলোচিত হয়েছে। পার্টির একাদশ জাতীয় কংগ্রেসে (১৮ই আগষ্ট, ১৯৭৭) পার্টির গঠনতন্ত্র কিছুটা পরিবর্তন সহ গৃহীত হয়। ১৯৮২ সালে চীন গণসাধারণতন্ত্রের কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে পার্টির গণতন্ত্র ও কর্মনীতি আরও পরিবর্তন করা হয়।

ক. পার্টির সাধারণ কর্মসূচী, লক্ষ্য ও তত্ত্বগত ভিত্তি

চীন গণসাধারণতন্ত্রের কমিউনিষ্ট পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি। এর মূল কর্মসূচী হল বুর্জোয়া ও অন্যান্য শোষক শ্রেণীগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করা, বুর্জোয়া একনায়কত্বের পরিবর্তে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং ধনতন্ত্রের ধ্বংসের ওপরে সমাজতন্ত্রের বিজয় ঘটানো। পার্টির লক্ষ্য হল কমিউনিজমকে বাস্তবে রূপায়িত করা। শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবর্তী অংশকে নিয়ে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠিত হয়েছে—এই অগ্রবর্তী বাহিনী শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী জনগণকে পরিচালিত করে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং মাও সে তুঙের চিন্তাধারাকে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির চিন্তাধারায় তত্ত্বগত ভিত্তি ও পথপ্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে পরিচালিত চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি একটি মহান্, গৌরবান্বিত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পার্টি এবং চীনের জনগণের নেতৃত্বের প্রাণকেন্দ্র।

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদকে তুলে ধরে, বিশ্বের প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণী ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ায়।

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যগণ কমিউনিজমের সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছে। এই উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতেও তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আত্মত্যাগী হবে এবং বিজয় অর্জনের জন্য সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ।

খ. কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির গঠনতন্ত্রের ১ ধারা অনুযায়ী যে কোন শ্রমিক, গরীব কৃষক, সৈনিক, বুদ্ধিজীবী বা বিপ্লবী নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করলে পার্টির সদস্যপদ লাভ করতে পারে।

যোগ্যতা

১. ১৮ বছর বা তার বেশী বয়স,
২. পার্টির গঠনতন্ত্র মান্য করার প্রতিশ্রুতি দান,
৩. যে কোন একটি পার্টি সংগঠনে সক্রিয়ভাবে কাজ করা,
৪. পার্টির সিদ্ধান্তসমূহ পালন করা,
৫. পার্টি সদস্য কর্তৃক দেয় চাঁদা প্রদান,

পার্টি সদস্যদের কর্তব্য

পার্টি সদস্যের অবশ্য করণীয় হল :

১. মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে-তুঙের চিন্তাধারায় অধ্যয়ন,
২. পার্টির ঐক্যকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা,
৩. পার্টির প্রতি বিশ্বস্ত থাকা. পার্টির শৃঙ্খলা মান্য করা,
৪. পার্টি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করা,
৫. সমস্যা দেখা দিলে জনসাধারণের সঙ্গে পরামর্শ করা ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা,
৬. সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার ব্যাপারে সাহসী হওয়া,
৭. মাতৃভূমি রক্ষার্থে এগিয়ে আসা,
৮. পার্টি ও জনসাধারণের স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দান করা।

গ. কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠনের নীতি

পার্টির গঠনতন্ত্রে সাংগঠনিক নীতি আলোচিত হয়েছে। পার্টির সাংগঠনিক নীতি হল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা (Democratic Centralism)। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতি অনুযায়ী পার্টির মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ এবং নেতা নির্বাচন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে। এই পদ্ধতি প্রয়োগের সময়ে মনে রাখতে হবে, সংগঠনের কাছে ব্যক্তি অপ্রধান, সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে সংখ্যালঘিষ্ঠ অপ্রধান, উচ্চস্তরের অধীন নীচের স্তর এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অধীন সমগ্র পার্টি। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিকেও পার্টির নেতৃত্ব মেনে চলতে হবে।

পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব হল পার্টি কংগ্রেস। পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন যখন চলবে না তখন কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। পার্টির সকল স্তরের পার্টি কংগ্রেস আহবান করবে সেই সেই স্তরের পার্টি কমিটি। সকল স্তরের পার্টি কমিটিগুলি ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব, জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং পার্টির সহজ ও উপযোগী কাঠামোর নীতি মেনে চলবে।

ঘ. কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠনসমূহ

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থা হল **জাতীয় কংগ্রেস**। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ইহার অধিবেশন (Conference) আহবান করা হয়, তবে প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে অধিবেশন আহবান করা যেতে পারে।

পার্টির জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত ও নীতির ভিত্তিতে পার্টির কার্য-পরিচালনা করে **কেন্দ্রীয় কমিটি**। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো বা **পলিটব্যুরো** (Politbureau), পলিটব্যুরোর স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থাৎ পার্টির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

যখন কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন চলে না, তখন কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো এবং পলিটব্যুরোর অনুপস্থিতিতে ইহার স্থায়ী কমিটি।

কমিউনিষ্ট পার্টি, সরকার এবং সৈন্যবাহিনীর দৈনন্দিন কাজকর্ম কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং পলিটব্যুরোর স্থায়ী কমিটির নেতৃত্বাধীনে কতকগুলি সংঘবদ্ধ ও কার্যোপযোগী প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়।

ঙ. এলাকার এবং সেনাবাহিনীর ইউনিটের কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠন

প্রতি তিন বছর অন্তর কাউণ্টি স্তর ও এর ওপরের স্তরের স্থানীয় পার্টি কংগ্রেস এবং গণমুক্তি ফৌজের রেজিমেণ্ট স্তর ও এর ওপরের স্তরের পার্টি কংগ্রেস আহবান করা হয়। বিশেষ অবস্থায় ঐসব কংগ্রেস নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে আহবান করা যেতে পারে।

এলাকা ও সেনাবাহিনীর ইউনিটের সকল স্তরের পার্টি কমিটিগুলির নিজেদের স্থায়ী কমিটিসমূহ এবং সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক নির্বাচিত করে।

চ কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাথমিক সংগঠন

কারখানা, খনি, অফিস, বিদ্যায়তন, দোকান, মহল্লা, ফৌজের কোম্পানীগুলি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে পার্টির প্রাথমিক ইউনিট গঠিত হয়। যেখানে সদস্যসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি বা বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন সেখানে প্রাথমিক ইউনিটের পরিবর্তে সাধারণ পার্টি শাখা বা প্রাথমিক পার্টি কমিটি গঠিত হতে পারে।

প্রাথমিক পার্টি সংগঠনগুলিকে অবশ্যই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং মাও সে-তুঙের চিন্তাধারায় মহান্ লাল পতাকাকে উঁচুতে তুলে ধরতে হবে, শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতিকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে, জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা করার নীতিকে বিকশিত করতে হবে। তা ছাড়াও তাদের কর্তব্য হবে ঃ

১. মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে তুঙের চিন্তাধারা অধ্যয়ন ও প্রয়োগ ;

২. পার্টি সদস্য ও জনগণকে শ্রেণীসংগ্রামে শিক্ষিত করা ;

৩. পার্টির নীতি প্রচার ও পালন করা এবং পার্টির সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা ;

৪. জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা এবং তাহাদের মতামত ও দাবিগুলি শোনা ;

৫. পার্টিতে নতুন সদস্য আনা, পার্টি শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং পার্টি সংগঠনগুলিকে সংহত করা।

ছ কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন

পার্টির গঠনতন্ত্রে পার্টির গণসংগঠনের উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংগঠনগুলি হল ঃ কিশোর অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট যুব লীগ, মহিলা ফেডারেশন ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র সংগঠন, কৃষক সংগঠন ইত্যাদি।

৭.২. চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা

(Role of the Communist Party of CPC)

প্রতিটি রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই শাসক দলের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ইহার রূপকার কমিউনিষ্ট দলের ভূমিকার সঙ্গে অন্য কোন দলের তুলনা চলে না সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা অনন্য। বিশেষ করে গণসাধারণতন্ত্রী চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির চরিত্র, গুরুত্ব ও ভূমিকা স্বতন্ত্র।

চীনের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির একমাত্র লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক, আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্তবাদী চীনা সমাজকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সমাজে পরিণত করা। স্বভাবতই ঐ সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টির সামরিক চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করেছিল। এই জন্যই মাও সে-তুং বলেছিলেন, 'জনগণের সেনাবাহিনী ছাড়া জনগণের কিছুই নেই এবং পার্টিও নেই'। পার্টি ও সেনাবাহিনী একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছে এবং ঠোঁট ও দাঁতের সম্পর্কের মতই পার্টি ও সেনাবাহিনী পরস্পর-নির্ভরশীল।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবে পার্টির ভূমিকা

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সফল পরিসমাপ্তিতে চীনে 'নয়া গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহার পরের স্তরে এই বিপ্লবকে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-

গঠনের কর্মধারায় পার্টি আত্মনিয়োগ করে। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি তার অসামরিক চরিত্র নিয়ে অতি দ্রুত ও বিপুলভাবে গড়ে ওঠে। ১৯৫৬ সালে পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল ১ কোটি (এদের মধ্যে ৮০ শতাংশই বিপ্লবের পরে পার্টিতে যোগ দেয়)। ১৯৬০ সালে পার্টির সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ (এর মধ্যে ৭০ শতাংশ কোরিয়ার যুদ্ধের পরে পার্টিতে যোগদান করে)। ১৯৬৬ সালে পার্টির সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ। পার্টির দ্রুত প্রসারের ফলে পার্টির পুরানো সদস্যরা ক্রমশই সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পড়ে।

বিপ্লবোত্তর অবস্থা

পার্টির ভূমিকা

গণসাধারণতন্ত্রী চীনের আত্মপ্রকাশের পরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই বিশাল দেশের প্রশাসনিক দায়িত্বে আসীন হয়। কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে অতীতের সংবিধানে বলা হয় যে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি হল সমগ্র চীনা জনগণের নেতৃত্বের প্রাণকেন্দ্র এবং শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রের ওপর নিজেদের নেতৃত্বকে কার্যকর করে। বস্তুত চীনের সমাজব্যবস্থার চালিকা শক্তি হল কমিউনিস্ট পার্টি, রাষ্ট্রীয় সংগঠন সহ সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থার এটা হল প্রাণকেন্দ্র। কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্রেও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয় যে, বুর্জোয়া ও অন্যান্য শোষক শ্রেণীর উচ্ছেদ করে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজতন্ত্রের বিজয় ঘটানো এই দলের লক্ষ্য।

প্রথমত, এই দায়িত্ব পালনের জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে বিপ্লবের সাফল্যকে সংরক্ষণ ও প্রসারণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। এজন্য পার্টিকে বিপুল সংখ্যক জনগণকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে-তুঙের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করে বিপ্লবী রাজনীতিতে শিক্ষিত করে তুলতে হয়। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বকে শক্তিশালী ও সুসংহত করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্র গঠন ও বিকাশের জন্য রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় পার্টিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। বস্তুত, চীনের কমিউনিস্ট পার্টিই হল রাষ্ট্রীয় ও সরকারী সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক। পার্টির সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, রাষ্ট্র ও সরকারের শীর্ষস্থানীয় পদগুলিতে পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নেও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই রাষ্ট্র ও সরকারের উচ্চপদে আসীন হন, তবে সেখানে সংবিধানে বলা হয়নি যে, মন্ত্রী পরিষদের চেয়ারম্যান পার্টির সুপারিশক্রমে নিযুক্ত হবেন। চীনে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাও সে-তুং মৃত্যুকাল পর্যন্ত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যানের পদে আসীন ছিলেন। সংবিধানে মাও সে-তুং ও তাঁর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার

সপ্রশংস উল্লেখ বহুবার করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, চেয়ারম্যান মাও ও কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে এবং পররাষ্ট্র বিষয়ে মাওয়ের সর্বহারা শ্রেণীর বৈপ্লবিক নীতি এগিয়ে নিয়ে চলেছে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক গঠন কার্যে মহান্ বিজয় লাভে সমর্থ হয়েছে।

মাওয়ের নেতৃত্বে পার্টির ভূমিকা

সংবিধান অনুযায়ী চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পার্টির মূল নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জনসাধারণের কর্তব্য হল সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বে বিপ্লব অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়াসী হওয়া। শ্রেণী সংগ্রাম, উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা—এই তিন প্রধান বৈপ্লবিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, জাতীয় প্রতিরক্ষা, শিল্প ও কৃষির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে এই শতকের শেষার্ধের মধ্যে চীনকে একটি মহান্ ও শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করা।

পার্টির নেতৃত্বে জনগণের ভূমিকা

চীনে সমাজতন্ত্র গঠনের ব্যাপারে পার্টি নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এতদিন চীনে সেনাবাহিনীর প্রধান হতেন কমিউনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান। সংবিধানে বলা হত, চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান চীন গণসাধারণতন্ত্রের সামরিক বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেন। চীনের গণমুক্তি ফৌজ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী। সামরিক বাহিনীর প্রধান কর্তব্য হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের সাফল্যগুলিকে রক্ষা করা। অন্য কোন রাষ্ট্রে সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পার্টির এরূপ প্রকাশ্য ভূমিকার উল্লেখ দেখা যায় না। মাও বলেন "বন্দুকের নল থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব হয়" এবং সেনাবাহিনী হল শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের নেতৃত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ সম্পর্কে মাও আরও বলেছেন: "পার্টিই বন্দুককে নিয়ন্ত্রণ করে, বন্দুককে কখনই পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেওয়া হবে না"। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে, বন্দুকই (লালফৌজ) সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে পার্টি ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। যা হোক, চীনে পার্টির জন্য এবং পার্টির নেতৃত্বে সেনাবাহিনী শুধুমাত্র দেশের অখণ্ডতাই রক্ষা করে না, গণজীবনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে এবং সাংগঠনিক, প্রচারগত, উৎপাদনিক ও সেবামূলক রাষ্ট্রীয় সকল কার্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। মাওয়ের ভাষায় বলা যায়, সেনাবাহিনীর প্রধান কর্তব্য হল জনগণের সেবা করা।

সেনাবাহিনীর ব্যাপারে ভূমিকা

শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদকে তুলে ধরার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিকে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ করতে হয়। পঞ্চশীলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন,

পৃথিবীর সর্বহারা ও নির্যাতিত মানুষ ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী অতিবৃহৎ শক্তিগুলির দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত জাতিগুলিকে নিয়ে ব্যাপক যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলা এবং মনুষ্যজাতির প্রগতি ও মুক্তির জন্য প্রয়াস চালাবার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নীতি নিরূপণে চীনের কমিউনিষ্ট দল বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা

চীনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক, আন্তর্জাতিক এবং নৈতিক সকল ব্যাপারেই কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা সম্প্রসারিত। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির এই বহুমুখী ও সর্বাত্মক কর্মযজ্ঞে সর্বনিম্ন বা প্রাথমিক ইউনিট থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত সকলেই যুক্ত। এই দায়িত্ব যাতে প্রতিটি সভ্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে তার জন্য তাদের মতাদর্শগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতি প্রয়োগ করে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসন পরিচালনায় সর্বস্তরের পার্টি সংগঠনের ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়েছে।

১৯৮২ সালের সংবিধানে পার্টি ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য করা হয় এবং সংবিধানের কোথাও পার্টির উল্লেখ করা হয় না।

সমালোচনা

১. চীন গণসাধারণতন্ত্রের সংবিধানে কমিউনিষ্ট পার্টির এবং পার্টির চেয়ারম্যানের ভূমিকা সাংবিধানিক স্বীকৃতি দানকে একদা সমালোচকেরা তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে যেখানে পার্টির সুপারিশ অনুযায়ী মন্ত্রিসভার প্রধান নিযুক্ত হন এবং পার্টির চেয়ারম্যান সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে স্বীকৃত হন সেখানে অন্য কোন মত ও পথ স্বাধীনভাবে গড়ে উঠিতে পারে না এবং এই ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না।

কিন্তু ১৯৮২ সালের বর্তমান সংবিধানে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং তার ভূমিকাকে স্বীকৃতি জানান হয়নি। সমালোচকেরা অবশ্য বলেন যে, পার্টির ভূমিকাকে সংবিধানে স্বীকার করা হোক বা না হোক বাস্তবে চীনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত পার্টির নির্দেশে পরিচালিত হয়।

২. সুতরাং সমালোচকেরা মনে করেন যে, চীনে কমিউনিষ্ট দলের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নামে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র হলেও এটা কমিউনিষ্ট পার্টির একনায়কতন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। সেখানে সরকার ও কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে কোন পার্থক্যের সীমারেখা নেই—উভয় এক হয়ে গিয়েছে।

৩. সমালোচকেরা মহান্ সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ক্ষমতা রক্ষার লড়াই বলে মনে করেন। তাঁদের মতে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি যে ঐক্যবদ্ধ নয় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোন ভূমিকা পালনে অক্ষম তার প্রমাণ হল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে পার্টির নেতৃত্বের একাংশকে আক্রমণ ও

বহিষ্কার, লিন পিয়াও-এর উত্থান ও পতন এবং সাম্প্রতিক 'চার চক্রী' সংক্রান্ত ঘটনাবলী।

৪. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি তাদের ঘোষিত নীতিকে সর্বক্ষেত্রে সযত্নে রক্ষা ও প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থনের অভাব দেখা গিয়েছে। সমালোচকেরা আরও মনে করেন যে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি যতটা সোচ্চার, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ততটা নয়।

উপরোক্ত সমালোচনা সম্পর্কে বলা যায় যে, গণতন্ত্র সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিচার করা যায় না। চীনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যে সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত, সেই সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থ কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বারা প্রতিফলিত হয়। তাই চীনের সংবিধানে কোন প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন না করে বলিষ্ঠভাবে কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়েছিল। সুতরাং চীনে কমিউনিষ্ট পার্টির যে একনায়কত্বের কথা বলা হয় তা সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব ছাড়া কিছু নয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে কেন্দ্র করে ঐ সময় যে সকল বাড়াবাড়ি হয়েছিল তা কাম্য নয়—মাও সহ অনেকেই তা স্বীকার করেছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক গৃহীত কোন কোন নীতি বা সিদ্ধান্ত চীনের প্রতি সহানুভূতিশীল মহলেও যে সংশয় সৃষ্টি করেছে তা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু বর্তমান সংবিধানে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকার কোন উল্লেখ নেই। বুর্জোয়া সংবিধানেও রাষ্ট্র পরিচালনায় দলের ভূমিকার উল্লেখ থাকে না। কিন্তু যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই ক্ষমতাসীন দল রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করে কোথাও প্রকাশ্যে কোথাও অপ্রকাশ্যে।

চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে তুলনা

সোভিয়েত ইউনিয়নের বলশেভিক (কমিউনিষ্ট) পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়াতে পৃথিবীর সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জয়যাত্রা শুরু হয় এবং এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দান করেন রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা ও শিক্ষক লেনিন। চীনেও কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবের পরিসমাপ্তিতে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জয়যাত্রা শুরু হয় এবং এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দান করেন চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা ও শিক্ষক মাও সে-তুং। এই সাদৃশ্যের পথ ধরে এই দুটি রাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট পার্টির গঠন, কর্মসূচী ও মতাদর্শগত এবং শাসনতান্ত্রিক সাদৃশ্যের এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। কিন্তু পরে মতাদর্শগত পার্থক্যকে কেন্দ্র করে এই দুটি পার্টির মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য ফুটে ওঠে। নিচে উভয় দলের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলিকে তুলে ধরা হল।

সাদৃশ্য

১. চীনের কমিউনিস্ট পার্টির গঠন ও সাংগঠনিক বিন্যাস সাধারণভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মত পার্টি কংগ্রেস থেকে শুরু করে প্রাথমিক ইউনিট পর্যন্ত একই ছাঁচে গঠন করা হয়েছে।

২. উভয় কমিউনিস্ট পার্টিই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আদর্শগত ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এর সঙ্গে মাও সে-তুঙের চিন্তাধারাকে সংযোজন করেছে।

৩. উভয় কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য হল নিজ নিজ দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সমাজতন্ত্রের বিকাশের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদে উত্তরণ।

৪. উভয় কমিউনিস্ট পার্টি মতাদর্শের ক্ষেত্রে সামন্তবাদ, উপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সকল পরাধীন দেশের স্বাধীনতার আন্দোলন বা মুক্তি আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক।

৫. উভয় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে একসময়ে নিজ নিজ দেশের সংবিধানে সপ্রশংস উল্লেখ করা হয়েছিল।

৬. উভয় কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে এবং সরকার পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭. চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে সমগ্র জনগণের প্রাণকেন্দ্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিকে সমগ্র জনগণের পার্টি বলে মনে করা হয়।

৮. উভয় কমিউনিস্ট পার্টিকে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী মনে করা হয়।

বৈসাদৃশ্য

উপরোক্ত সাদৃশ্যগুলিই সব নয়, উভয় পার্টির মধ্যে ক্রমবর্ধমান পার্থক্যগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

১. সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র জনগণের পার্টি বলে নিজেকে ঘোষণা করে। কিন্তু চীনের পার্টি নিজেকে সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি বলে মনে করে। তাঁদের মতে, সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠনের আগে পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণী স্বার্থের অস্তিত্ব থাকায় পার্টি সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।

২. চীনের সংবিধানে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা এতদিন খুবই প্রত্যক্ষ ছিল: ক. চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান বাস্তবে রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। খ. চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন। গ. চীনের রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রধানমন্ত্রী কমিউনিস্ট পার্টির সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় গণকংগ্রেস কর্তৃক নিয়োজিত হন। সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্র ক্ষমতায় কমিউনিস্ট পার্টির এরূপ প্রকাশ্য ভূমিকা স্বীকৃত নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে সোভিয়েতগুলির দ্বারা কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

কিন্তু ১৯৮২ সালের সংবিধানে অবস্থার পরিবর্তন করা হয়েছে এবং রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রত্যক্ষ ভূমিকাকে রদ করা হয়েছে। বর্তমানে পার্টি ও সরকারের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য করা হয়েছে। তাই বর্তমানে এ ব্যাপারে চীন ও সোভিয়েত ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

৩. চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বন্ধনে যে ভাবে আবদ্ধ সেরূপ ঘনিষ্ঠতা সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশ্যে স্বীকৃত নয়। চীনের সংবিধানে বলা হয়েছিল, গণমুক্তি ফৌজ ও মিলিশিয়া কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত শ্রমিক ও কৃষকের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী এবং কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান সেনাবাহিনীরও প্রধান। কিন্তু বর্তমান সংবিধানে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সামরিক বাহিনীর ওপরে পার্টির প্রভাব রদ করা হয়েছে।

৪. মতাদর্শগত পার্থক্যের জন্য বর্তমানে উভয় কমিউনিষ্ট পার্টির বাস্তব অবস্থার মূল্যায়নেও পার্থক্য দেখা দিয়েছে। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন শোধনবাদী পার্টির নেতৃত্বে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে এবং সামাজিক সাম্রাজ্যবাদই প্রধান শত্রু। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি মনে করে সাম্রাজ্যবাদই বর্তমান বিশ্বের প্রধান শত্রু।

এই সকল সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের আলোচনার শেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন উভয় কমিউনিষ্ট পার্টিই যথাক্রমে লেনিন ও মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে সংগঠিত, বহু সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট ও পরিণত পার্টি। উভয়ই সমাজতান্ত্রিক গঠন ও বিকাশের আলোকবর্তিকা। পৃথিবীর সকল দেশের সকল কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিই এই দুটি বৃহৎ পার্টির দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত। ইহারা উভয়েই বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু।

৮'১. চীনের গণমুক্তি ফৌজ
(People's Liberation Army)

সমগ্র চীন হল মাও সে-তুঙের বিশাল বিদ্যালয় আর সেনাবাহিনী হল এর প্রধান শিক্ষক। চৌ এন-লাই'র ভাষায় বলা যায়, 'আমরা সকলেই সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত, সেনাবাহিনী আমাদের সকলকে যোগাযোগ করায়।' ১৯৪৯ সালে বিজয়ের পরে মাও বলেছেন, "সেনাবাহিনী হ'ল একটি বিদ্যালয়। আমাদের ২১ লক্ষের স্থলবাহিনী কয়েক হাজার বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমান। আমাদের ক্যাডার সরবরাহের জন্য প্রধানত আমাদের নির্ভর করতে হয় সেনাবাহিনীর ওপর।" এই বিপ্লবী বিদ্যালয় তৈরী করতে বাইশ বছরের বিরামহীন সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল। চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি'র পরেই গণমুক্তি ফৌজের গুরুত্ব।

গণমুক্তি ফৌজ কি

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের শাসনব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে সুস্পষ্টভাবে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। চীনের সামরিক বাহিনী গণমুক্তি ফৌজ (People's Liberation Army) নামে পরিচিত। ১৯২৭ সালের আগস্ট মাসে চিয়াং কাইশেকের কুয়োমিনটাং বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার জন্য মাও সে-তুং লাল ফৌজ গঠন করেন। কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতৃত্বে বৈপ্লবিক সংগ্রামের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা একটি অন্যতম প্রধান শর্তরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। মাও ছিলেন এই সামরিক বাহিনীর জনক এবং সর্বপ্রধান স্তম্ভ। তাঁর চিন্তাধারায় ও নেতৃত্বে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট লাল ফৌজ ছিল চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রণী বাহিনী। লাল ফৌজ প্রতিষ্ঠা মাও সে তুং-এর গণযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত চিন্তাধারা ও কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মার্কসীয় ও লেনিনীয় চিন্তা ও অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সামরিক বাহিনী ছাড়া গণযুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। লাল ফৌজ ছিল কমিউনিস্ট পার্টি'র সংগ্রামী শক্তির মেরুদণ্ডস্বরূপ। এই লাল ফৌজকেই পরবর্তীকালে গৃহযুদ্ধের সময়ে (১৯৪৫-৪৯) গণমুক্তি ফৌজ নামে অভিহিত করা আরম্ভ হয়।

গণমুক্তি ফৌজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

গণমুক্তি ফৌজের ইতিহাস চীনে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯২৭ সালের ১লা আগস্ট

ন্যানচাং বিদ্রোহের মাধ্যমে চিয়াং কাইশেকের কুয়োমিনটাং বাহিনীর বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টি'র নেতৃত্বে যে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল তাকেই চীনের প্রথম গণসংগ্রামের মর্যাদা দেওয়া হয়। এই বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে নিজস্ব সংগঠিত সামরিক-বাহিনী ছাড়া গণসংগ্রাম পরিচালনা করা এবং তাকে সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব নয়। এখানেই মাও অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত লাল ফৌজের নেতৃত্বে ও কৃতিত্বে প্রায় একশত বিদ্রোহ পরিচালিত হয়। ১৯৩০ সালের প্রারম্ভে লাল ফৌজের অনেক বিপ্লবী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ইউনিটের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মাও এর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম ফ্রন্ট চিয়াং কাইশেকের বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। ১৯৩৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি'র পরিচালনায় আরম্ভ হয় ইতিহাসবিশ্রুত লং মার্চ। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে লাল ফৌজ দীর্ঘ পদযাত্রা আরম্ভ করে। যে ত্যাগ, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, বলিষ্ঠতা ও সংগ্রামী চেতনার স্বাক্ষর এই সময়ে লালফৌজে মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। এই ঐতিহাসিক পদযাত্রার শেষে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে লাল ফৌজ শেনসি-তে উপস্থিত হয়। এই লং মার্চ বা সুদীর্ঘ পদযাত্রার মাধ্যমে মাও প্রমাণ করেন যে, সামরিক বাহিনী ছাড়া বৈপ্লবিক সংগ্রাম জয়যুক্ত হতে পারে না। এই পদযাত্রা একদিকে কমিউনিষ্ট পার্টি'র বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং অন্যদিকে সংগ্রামী জনগণের ঐক্য, ত্যাগ ও সংগ্রামের যে স্মারক প্রতিষ্ঠা করেছে তা আজও অম্লান।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লালফৌজ

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত লালফৌজ জাপানের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ আপোসহীন সংগ্রামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। বিদেশী শোষক ও শাসকদের পরাভূত করার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি'র নেতৃবৃন্দ আশু প্রয়োজন ও কৌশলের বিষয় বিবেচনা করে চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সম্মিলিত প্রয়াসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কারণ, ঐ সময়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে ধ্বংস করা। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লাল ফৌজের কৃতিত্ব যে গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল, পরবর্তীকালে তা দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চিয়াং কাইশেকের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকে পর্যুদস্ত করতে শক্তি, সাহস এবং অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল।

জাপানের পরাজয়ের পর ১৯৪৫-৪৯ সাল পর্যন্ত মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে লাল ফৌজ অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে চিয়াং কাইশেকের প্রতিবিপ্লবী বাহিনীকে পরাজিত করে চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিষ্ট পার্টি'র নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বিভিন্ন মুক্তাঞ্চলে অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রয়াসে কমিউনিষ্ট পার্টি'র প্রধান সহায়ক শক্তি ছিল লাল ফৌজ। চিয়াং কাইশেকের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম

দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ

দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ নামে খ্যাত। এই যুদ্ধের সময়ে লাল ফৌজের নামকরণ করা হয় গণমুক্তি ফৌজ।

চীনের রাজনীতি ও গণমুক্তি ফৌজ

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থায়, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে এবং মাতৃভূমির প্রতিরক্ষায় গণমুক্তি ফৌজের ভূমিকা কমিউনিস্ট পার্টির পরেই। এই ফৌজ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অতন্দ্র প্রহরী রূপে কাজ করে। সুতরাং দেখা যায় যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মত গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে সামরিক বাহিনীকে কেবলমাত্র প্রতিরক্ষামূলক কাজকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একে সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠন ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করা হয়েছে। এখানেই গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সামরিক বাহিনীর বিশেষ ভূমিকার স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

গণমুক্তি ফৌজের বৈশিষ্ট্য

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সামরিক বাহিনীর বা গণমুক্তি ফৌজের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করার জন্য ব্যাপক দৃষ্টিভংগি অনুসরণ করা প্রয়োজন। কেবল প্রতিরক্ষা-মূলক কাজকর্মের মধ্যে এই বাহিনীর দায়িত্ব সীমাবদ্ধ না থাকায় এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক বিশিষ্ট রূপকার হিসাবে এর ভূমিকা নির্দিষ্ট থাকার জন্য গতানুগতিক মনোভাবের মাধ্যমে এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা সম্ভব নয়।

ভূমিকার ব্যাপকতা

গণমুক্তি ফৌজ একমাত্র প্রতিরক্ষার কাজের সঙ্গেই যুক্ত নয়—মুক্তি ফৌজ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্যেরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই গণমুক্তি ফৌজ একদিকে যেমন মাতৃভূমির ঐক্য, সংহতি এবং প্রতিরক্ষার অতন্দ্র প্রহরী, অন্যদিকে তেমনি কৃষক শ্রমিকের উৎপাদন কার্যের অংশীদার। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সৈন্যবাহিনী রাজনীতি চর্চা করবে, সামরিক বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবে এবং দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িত থাকবে—এটাই মাও সে-তুঙ্-এর শিক্ষা। সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ জনসাধারণের মধ্যে কাজ করে, কারণ, সামরিকবাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগহীনতার প্রাচীর ধ্বংস করে তাদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করাই চীনের শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য।

সামরিক ও অসামরিক কার্য

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সামরিক বাহিনী রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং এই বাহিনী দেশের রাজনীতির ধারার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং মাও সে-তুঙ্-এর চিন্তাধারার প্রচার এবং প্রসার, সমাজতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত থাকাও এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। গণমুক্তি ফৌজের সদস্যগণ সমাজতন্ত্রের সৈনিক। কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। মাও সে-তুঙ্-এর চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ সর্বহারার মহান্ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সঙ্গেও এই বাহিনী জড়িত ছিল।

রাজনৈতিক চরিত্র

গণমুক্তি ফৌজের সাংগঠনিক ব্যবস্থার মধ্যে আক্রমণাত্মক (offensive) সংগঠনের পরিবর্তে রক্ষণাত্মক সংগঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই বাহিনী মাও সে-তুঙ্ নির্দিষ্ট বৈপ্লবিক গণযুদ্ধের নীতি, কৌশল এবং শৃঙ্খলা অনুসরণ করে।

রক্ষণাত্মক ভূমিকা

এই বাহিনী গণযুদ্ধের মৌলিক নীতি অনুযায়ী গতিশীল বা চলমান যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রস্তুত থাকে। যুদ্ধের পদ্ধতি ও কৌশলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল জনসাধারণের সঙ্গে ব্যাপক সংযোগ সাধনের মাধ্যমে গণচেতনার উদ্বোধন ও প্রসারে সাহায্য করা। এই জন্যই চীনে সামরিক বাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সংযোগ লক্ষ্য করা যায়।

একসময়ে গণমুক্তি ফৌজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর মত এই বাহিনী পদমর্যাদার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অন্যান্য

পদভিত্তিক মর্যাদা

দেশে যেমন জেনারেল, মেজর জেনারেল, মেজর, কর্নেল, ক্যাপ্টেন প্রভৃতি পদ আছে, গণমুক্তি ফৌজে সেগুলির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কারণ মনে করা হয় যে, পদভিত্তিক মর্যাদা সামরিক বাহিনীর মধ্যে অনৈক্য ও বৈষম্যের সৃষ্টি করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং মাও সে-তুঙ্-এর চিন্তাধারায় বিশ্বাসী যে কোন ব্যক্তি এই বাহিনীতে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু বর্তমান সংবিধানে সামরিক বাহিনীতে মর্যাদার ভিত্তিতে স্তর বিভাগ করা স্বীকৃত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সামরিক বাহিনী "আত্মনির্ভরশীলতার" নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। মাও সে-তুঙ্ গণ-শক্তির ওপর গভীরভাবে আস্থাশীল ছিলেন বলেই

আত্মনির্ভশীলতা

সামরিক বাহিনীকে অস্ত্রশক্তিকে সুসজ্জিত করে তোলার নীতিকে প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করতেন না। দেশের অভ্যন্তরীণ শক্তির ওপর নির্ভর করে সামরিক বাহিনীর অস্ত্রসজ্জা ও শক্তিবৃদ্ধির নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। শাসনতন্ত্রে গণমুক্তি ফৌজের আধুনিকীকরণ এবং বিপ্লবীকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নিজের শক্তির ওপর ভিত্তি করে চীন আণবিক অস্ত্রেরও অধিকারী হয়েছে।

গণমুক্তি ফৌজের মধ্যে আচরণবিধি, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার ওপর বিশেষ

শৃঙ্খলা

গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই বাহিনীর তিনটি শৃঙ্খলার নীতি হল : সকল কাজে নির্দেশ মান্য করা, জনগণের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ না করা এবং দখলীকৃত সম্পত্তি সমর্পণ করা।

গণমুক্তি ফৌজের ওপর কমিউনিষ্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। একসময়ে কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি চীনের সশস্ত্র

কমিউনিষ্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ

বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। কিন্তু বর্তমান সংবিধানে গণমুক্তি ফৌজ ও পার্টির মধ্যে পার্থক্যের সীমাকে প্রসারিত করা হয়েছে। গণমুক্তি ফৌজকে রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য গঠিত সশস্ত্র বাহিনী নামে অভিহিত করা যায়। গণমুক্তি ফৌজ সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের

একটা স্তম্ভ বিশেষ। গণমুক্তি ফৌজ কমিউনিস্ট পার্টির পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। কমিউনিস্ট পার্টির শাসনতন্ত্রে গণমুক্তি ফৌজের বিভিন্ন কোম্পানীতে পার্টির শাখা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে।

গণমুক্তি ফৌজের সংগঠন

চীনের গণমুক্তি ফৌজের সাংগঠনিক ব্যবস্থাকে একটা পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সংগঠনের শীর্ষে অবস্থিত সমর বিষয়ক কমিটি (Military Affairs Committee)। এই কমিটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বিভাগ হিসাবে কাজ করে। নিজস্ব কার্যাবলীর জন্য কমিটি কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর কাছে দায়িত্বশীল থাকে। চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের (Ministry of National Defence) কাজকর্ম সমর বিষয়ক কমিটির নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। জাতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের হাতে গণমুক্তি ফৌজের সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। চীনে যে নীতি অনুসরণ করা হয় তা হল কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর কোন একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সদস্যকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়।

সমর বিষয়ক কমিটি

গণমুক্তি ফৌজের সদর দপ্তরের অধীনে তিনটি দপ্তর আছে। ১. সাধারণ কর্মী বিভাগ (General Staff Department); ২. সাধারণ রাজনৈতিক বিভাগ (General Political Department) এবং ৩. সাধারণ সংযোগ রক্ষাকারী বিভাগ (General Rear Services (Logistics) Department)।

সদর দপ্তরের বিভাগসমূহ

গণমুক্তি ফৌজের সদর দপ্তরের অধীনে সৈনাবাহিনীকে পরিচালনা করার জন্য কয়েকটি বিভাগ আছে। ঐ বিভাগগুলি হল: গোলন্দাজ বাহিনী (Artillery Force), সাঁজোয়া বাহিনী (Armoured Force), নৌ বাহিনী (Navy), বিমান বাহিনী (Air Force), জননিরাপত্তা বাহিনী (Public Security Force), বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী (Air Defence Command), সংকেতদান বাহিনী (Signal Corps), রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বাহিনী (Railway Engineering Corps), ইঞ্জিনিয়ারিং বাহিনী (Engineering Corps)।

সদর দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগ

গণমুক্তি ফৌজের কার্যাবলীকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সদর দপ্তরের অধীনে ১১টি আঞ্চলিক কম্যান্ড (Regional Military Command) আছে। দুটি বা তার বেশী প্রদেশ নিয়ে একটি আঞ্চলিক কম্যান্ড গঠিত হয়। তবে একমাত্র সানটুং এবং সিংকিয়াং প্রদেশের জন্য একটি আঞ্চলিক কম্যান্ডের ব্যবস্থা আছে। সাংগঠনিক কাজকর্মের যথাযথ পরিচালনার জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক কম্যান্ডের অধীনে এক বা একাধিক জেলা কম্যান্ড আছে। কিন্তু সিংকিয়াং আঞ্চলিক কম্যান্ডের অধীনে কোন

জেলা কম্যাণ্ড নেই। জেলা কম্যাণ্ডের অধীনে গ্যারিসন কম্যাণ্ড গঠিত হয়। বড় বড় শহরে এই গ্যারিসন কম্যাণ্ড গঠিত হয়। গণমুক্তি ফৌজের সংগঠনের সর্বনিম্নে অবস্থিত কোম্পানী। একজন কমিশার প্রত্যেক কোম্পানী পরিচালনা করেন। কম্যাণ্ডের তুলনায় কমিশারের ক্ষমতা বাস্তবে অনেক বেশী। কমিশার প্রচারকার্য পরিচালনা করেন, সামরিক বাহিনী ও নাগরিকের মধ্যে সংযোগ সাধনের ব্যবস্থা পরিচালনা করেন এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব বহন করেন।

আঞ্চলিক জেলা ও কম্যাণ্ড

চীনের সামরিক বাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে মিলিশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনীর আলোচনা প্রয়োজন। একসময়ে মিলিশিয়া গণমুক্তি ফৌজের সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করে। কিন্তু বর্তমানে মিলিশিয়াকে বাতিল করা হয়েছে।

গণমুক্তি ফৌজের কার্যাবলী ও ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতিতে গণমুক্তি ফৌজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং করছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই বাহিনী একদিকে সামন্ততন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতার ধ্বংসসাধন এবং অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপায়ণে অসামান্য অবদানের সাক্ষ্য রেখেছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হবার পরবর্তী অধ্যায়ে গণমুক্তি ফৌজ কেবল মাতৃভূমির জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গুরুদায়িত্বই পালন করেনি, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্যের ক্ষেত্রেও এই বাহিনী এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়যাত্রা এবং বিপুল অগ্রগতির ক্ষেত্রে গণমুক্তি ফৌজের অবদান নানা কারণে ঐতিহাসিক এবং উল্লেখযোগ্য। ১৯২৯ সালে মাও সে-তুঙ তৎকালীন লাল ফৌজকে বিপ্লবের রাজনৈতিক কর্তব্য পালনের একটি সশস্ত্র দল হিসাবে গণ্য করেছিলেন। সুতরাং গণমুক্তি ফৌজের কার্যকলাপ নিছক প্রতিরক্ষার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। এর কার্যকলাপ জাতীয় জীবনের রাজনীতি, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রত্যেকটি স্তরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। গণমুক্তি ফৌজকে কৃষক ও শ্রমিকের সশস্ত্র বাহিনী নামে অভিহিত করা হয়। উহা সর্বহারা শ্রেণীর একাধিপত্যের স্তম্ভ।

কর্তব্য

সংবিধানে গণমুক্তি ফৌজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয় সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এর মৌলিক কর্তব্য হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকে রক্ষা করা, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ও নিরাপত্তাকে রক্ষা করা এবং সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ইহার লেজুড়দের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ এবং আক্রমণকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা।

সংবিধান অনুযায়ী চীনের গণমুক্তি ফৌজের অন্যতম প্রধান মৌলিক কর্তব্য হল

দেশের সার্বভৌমিকতা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং নিরাপত্তাকে রক্ষা করা। এই লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সামরিক সংগঠন এবং প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখায় জন্য চীনের বিভিন্ন সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে, বিমানঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে এবং আণবিক অস্ত্রের প্রসারের জন্য আত্মনির্ভর-শীলতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

সার্বভৌমিকতা রক্ষা করা

জাতীয় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রেও গণমুক্তি ফৌজকে ক্রমবর্ধমান হারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হচ্ছে। চীনে ষাটের দশকে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হবার আগে পর্যন্ত গণমুক্তি ফৌজ জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ-ভাবে হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবে রেডগার্ডদের কার্যকলাপে বাধ্য হয়ে গণমুক্তি ফৌজকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। সত্তরের দশকে চার চক্রের বিরুদ্ধে সামরিকবাহিনী বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করেছে।

জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করা

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসাধন, বিপ্লবকে রক্ষা করা এবং বৈপ্লবিক নির্মাণকার্যে অংশ গ্রহণ করা গণমুক্তি ফৌজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং কর্তব্য। এই কারণে এটা দেশের কলকারখানা, উৎপাদন ব্যবস্থা ও সরকারী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করার কাজে ব্যাপকভাবে আত্মনিয়োগ করে। গণমুক্তি ফৌজ প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের বাহিনী। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শিক্ষার প্রসার, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং টেলিফোন লাইন স্থাপন, সরকারী খামার পরিচালনা, জলসেচ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গণমুক্তি ফৌজ বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্যে অংশ গ্রহণ

গণমুক্তি ফৌজ সাম্রাজ্যবাদ এবং সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একনিষ্ঠভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান নীতি হিসাবে সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং শোষণ এবং সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম ঘোষিত হয়েছে। এই আদর্শ বাস্তবায়িত করা গণমুক্তি ফৌজের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম

গণমুক্তি ফৌজ রাজনৈতিক প্রচারকার্যে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রচার এবং মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারার প্রসার ঘটানো এর এক মৌলিক দায়িত্ব। সংশোধনবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের বিরুদ্ধে গণমুক্তি ফৌজ সব সময়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশুদ্ধতা এবং মাও সে-তুঙ-এর মৌল রাজনৈতিক চিন্তাধারার স্বপক্ষে ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় গণমুক্তি ফৌজ রাজনৈতিক প্রচারকার্যে অংশ গ্রহণ করেছে।

রাজনৈতিক প্রচার

প্রশাসনিক কাজে গণমুক্তি ফৌজের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯৫৪ সালের

সংবিধান চালু হবার আগে এই বাহিনী কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন মুক্তাঞ্চলে অসামরিক সরকার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। ১৯৬৭ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় এই সামরিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

প্রশাসনিক কাজ

মূল্যায়ন

চীনের রাজনীতি এবং শাসন ব্যবস্থায় গণমুক্তি ফৌজের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এই বাহিনী জাতীয় জীবনের বিকাশের ও অগ্রগতির প্রত্যেকটি দিকের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মাও বলেছেন, "জনগণের সেনাবাহিনী ছাড়া জনগণের কিছুই নেই।" পার্টি ও সেনাবাহিনী একই সঙ্গে বেড়ে ওঠে। চীনারা বলে ঠোঁট ও দাঁতের সম্পর্কের মত পার্টি ও সেনাবাহিনী পরস্পর নির্ভরশীল। কিন্তু এই বাহিনীকে সর্বতোভাবে কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দেশ অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করতে হয়। মাওয়ের ভাষায় বলা যায়, "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব হয় ; কিন্তু "পার্টিই বন্দুককে নিয়ন্ত্রণ করে, বন্দুককে কখনই পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেওয়া হবে না।" ১৯৬৯ সালে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নবম জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত পার্টি শাসনতন্ত্রের ৫নং ধারায় গণমুক্তি ফৌজের ওপর পার্টির নেতৃত্বের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭৭ সালে গৃহীত পার্টি শাসনতন্ত্রের ১৪নং ধারায় এবং ১৯৭৮ সালে গৃহীত চীনের শাসনতন্ত্রের ১৯নং ধারায় গণমুক্তি ফৌজের ওপর কমিউনিষ্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করা হয়। এক সময়ে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান চীনের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ছিলেন। গণমুক্তি ফৌজের ওপর দলীয় নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল।

গণমুক্তি ফৌজের নিম্নতম সংস্থা কোম্পানীগুলিতে কমিশারি মূলত দলীয় নীতি অনুযায়ী প্রচার কার্য পরিচালনা করেন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গণমুক্তি ফৌজের মধ্যে পার্টির শাখা প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় গণমুক্তি ফৌজ যে তৎপরতা প্রদর্শন করেছে তার পরবর্তীকালে পার্টির ওপর মুক্তিফৌজের প্রভাব এবং কৃতিত্ব বৃদ্ধি পায়। পার্টি এবং সামরিক বাহিনীর পারস্পরিক কর্তৃত্বের ব্যাপারে মাও সে-তুঙ্ এবং লিন পিয়াও-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। লিন পিয়াও-এর মৃত্যুর পরে সামরিক বাহিনীর ওপর পুনরায় কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমান সংবিধানে পরিবর্তন

কিন্তু ১৯৮২ সালে গৃহীত গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের নতুন সংবিধানে কয়েকটি মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, পেশাদারী সৈন্যবাহিনী গঠন করা হয়েছে

এবং ঐ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য করা হয় বা মর্যাদাগত স্তর (rank) সৃষ্টি করা হয়, যা আগে কখনও ছিল না।

কিন্তু এর চেয়েও যে মৌল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা হ'ল মুক্তি ফৌজের সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রত্যক্ষ সম্পর্ককে সংবিধানে স্বীকৃতি না দেওয়া। আগে কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব মুক্তি ফৌজকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতেন। কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান চীনের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান পদে আসীন থাকতেন। কিন্তু বর্তমানে ঐ দায়িত্ব সামরিক কমিশনের চেয়ারম্যানের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং সশস্ত্র বাহিনী পরিচালনায় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রত্যক্ষ ভূমিকাকে রদ্ করা হয়েছে।

৮·২. মিলিশিয়া

The Militia

চীন গণসাধারণতন্ত্রের ইতিহাসে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে মিলিশিয়া (Militia) একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসাবে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু ১৯৮২ সালের সংবিধানে মিলিশিয়া সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি, সম্ভবত মিলিশিয়াকে রদ্ করা হয়েছে। কিন্তু চীনের অতীত রাজনৈতিক জীবনে মিলিশিয়ার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য মিলিশিয়া নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

মিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী চীনের সামরিক বাহিনীর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হত। এই বাহিনীকে গণমুক্তি ফৌজের প্রধান সহায়ক শক্তি বলা হত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত ও অন্তর্ঘাতমূলক এবং আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার জন্য সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করা এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করা প্রয়োজন। এই কারণেই আধা-সামরিকবাহিনী গঠনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক চক্রান্তকে ধ্বংস করার জন্য সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগণের বাহিনী গড়ে তোলার ওপর মাও সে-তুঙ্ যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, তার প্রত্যক্ষ ফল এই মিলিশিয়া।

মিলিশিয়ার বৈশিষ্ট্য

প্রথমত, গণমুক্তি ফৌজের সদস্যদের মত মিলিশিয়ার সদস্যদের কোন বাধ্যতামূলক সামরিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকতে হয় না।

দ্বিতীয়ত, মিলিশিয়ার সদস্যদের জন্য কোন প্রকার পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা নেই।

তৃতীয়ত, মিলিশিয়ার সদস্যদের সাধারণ সামরিক শিক্ষার মত উচ্চস্তরের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না।

চতুর্থত, গণমুক্তি ফৌজের সদস্যগণ যেভাবে যুদ্ধকে একটা পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন, মিলিশিয়ার সদস্যগণ তা করেন না। তারা সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করলেও বিভিন্ন উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্মে নিযুক্ত থাকেন।

পঞ্চমত, মিলিশিয়ার সদস্যগণ সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না। পশ্চাৎ থেকে নানাভাবে শত্রুকে পর্যুদস্ত করা এবং বিপন্ন করে তোলাই এর লক্ষ্য।

মিলিশিয়াকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ সশস্ত্র মিলিশিয়া এবং সাধারণ মিলিশিয়া। পঁচিশ বছর পর্যন্ত যুবক-যুবতীগণ সশস্ত্র বা মূল মিলিশিয়ায় যোগ দিতে পারেন। পঁচিশ বছরের উর্ধ্বে যুবক-যুবতীগণ সাধারণ মিলিশিয়ায় যোগ-দেন। প্রশিক্ষণের সময়ে সদস্যগণকে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল এবং হালকা অস্ত্র ব্যবহার করা শেখানো হয়।

কার্যাবলী

মিলিশিয়ার কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, এটা গণমুক্তিবাহিনীর প্রধান সাহায্যকারী সংগঠন। মুক্তি ফৌজকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা এর মৌল কর্তব্য। গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুকে বিপন্ন করে তোলা এর আর একটি লক্ষ্য। জন নিরাপত্তা বাহিনীকে সাহায্য করা, দেশে শান্তিশৃংখলা রক্ষা করা, স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে স্বেচ্ছাসেবক রূপে কাজ করা এর অন্যান্য দায়িত্ব।

একদা মিলিশিয়া চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি ও কর্মসূচী রূপায়ণে অন্যতম প্রধান হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়েছিল। কোরীয় যুদ্ধের সময়ে ইহা এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। চীনের একাদশ জাতীয় কংগ্রেসে পার্টির চেয়ারম্যান হুয়া কুয়ো-ফেং মিলিশিয়ার সাংগঠনিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে মাও-বিরোধীরা মিলিশিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার পক্ষপাতী ছিলেন। লিউ-শাও-চি, পেং-তে হুয়ে এই মতের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু পেং-তে-হুয়ে ও লিউ শাও-চি-র অপসারণের ফলে তাঁদের মতবাদের অপমৃত্যু ঘটে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মিলিশিয়াকে বাতিল করায় দেখা যাচ্ছে তাঁদেরই মতবাদই জয়ী হয়েছে।

জনযুদ্ধের তত্ত্বে বিশ্বাসী মাও অস্ত্র অপেক্ষা জনশক্তিকে বড় মনে করতেন। তাঁর মত অস্ত্র যতই শক্তিশালী হোক না কেন, জনসাধারণের শক্তি অপরাজেয়। তাই তিনি চেয়েছিলেন ছাত্র, যুবক, শ্রমিক প্রতিটি নাগরিককে সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলতে। সেজন্যই মুক্তিফৌজের পাশাপাশি মাওয়ের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল মিলিশিয়া। মিলিশিরার মূল কর্তব্য ছিল "জনগণকে সেবা করা।" মিলিশিয়ার দ্বারা দেশ গঠন, সমাজ বিপ্লবের প্রচার, জনগণের সেবা এবং সামরিক দায়-দায়িত্ব পালনকে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ করা হয়েছিল তা যেমনই আকর্ষণীয় তেমনি অতুলনীয়।

নমুনা প্রশ্ন

প্রথম অধ্যায়

১। ১৯৪৯ সালের পূর্বে চীনের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি রূপরেখা দাও। পৃঃ ৫

২। চীন গণসাধারণতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ব্যাখ্যা কর। পৃঃ ১৬

৩। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা আলোচনা কর। পৃঃ ১৬

৪। চীনের বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য আলোচনা কর। পৃঃ ২১

৫। সোবিয়েত অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্গে চীনের বিপ্লবের তুলনামূলক আলোচনা কর। পৃঃ ২৩

৬। টীকা লিখ ঃ

তাইপিং বিদ্রোহ, কোয়োমিণ্টাং, ৪ঠা মে'র আন্দোলন, চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম, বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ, লং মার্চ, গণসাধারণতন্ত্রী চীনের জন্ম, চীনের বিপ্লব বিশ্ব-বিপ্লবের অংশ। পৃঃ ৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। ১৯৪৯ হইতে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত চীন গণসাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্র কাঠামো ও কর্মসূচী আলোচনা কর। পৃঃ ২৬

২। চীনের ১৯৫৪ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। পৃঃ ২৮

৩। চীনের ১৯৫৪ সালের সংবিধানের সাধারণকাঠামো আলোচনা কর। পৃঃ ৩০

তৃতীয় অধ্যায়

১। সাংস্কৃতিক বিপ্লব কাহাকে বলে? চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পটভূমিকা আলোচনা কর। পৃঃ ৩৫

২। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা কর। পৃঃ ৩৯

৩। চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচী আলোচনা কর। পৃঃ ৪০

৪। চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা ও বিভিন্ন স্তর আলোচনা কর। পৃঃ ৪১

৫। চীনের সমাজে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রভাব আলোচনা কর। পৃঃ ৪৪

৬। চীনের মহান্ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল্যায়ন কর। পৃঃ ৪৪

৭। মহান্ সাংস্কৃতিক বিপ্লবোত্তর চীনের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আলোচনা কর। পৃঃ ৪৭

৮। টীকা লিখ ঃ

ক. গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড,

খ. দুই লাইনের মধ্যে সংগ্রাম,

গ. লালরক্ষী বাহিনী,

ঘ. লাল বই। পৃঃ ৩৫

চতুর্থ অধ্যায়

১। ১৯৭৫ সালে নতুন সংবিধান রচনার পটভূমিকা আলোচনা কর। পৃঃ ৫০

২। ১৯৭৫ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ও প্রস্তাবনা আলোচনা কর। পৃঃ ৫১

৩। চীনের ১৯৫৪ এবং ১৯৭৫ সালের সংবিধানের তুলনামূলক আলোচনা কর। পৃঃ ৫১

৪। চীন গণসাধারণতন্ত্রের ১৯৭৫ এবং ১৯৭৮ সালের সংবিধানের তুলনামূলক আলোচনা কর। পৃঃ ৫৭

পঞ্চম অধ্যায়

১। চীন গণসাধারণতন্ত্রের ১৯৮২ সালের সংবিধানের পটভূমি আলোচনা কর। পৃঃ ৬০

২। ১৯৭৮ সালের সংবিধানের পটভূমিকা আলোচনা কর। পৃঃ ৫৪

৩। চীন গণসাধারণতন্ত্রের ১৯৮২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। পৃঃ ৬৪

৪। চীন গণসাধারণতন্ত্রের সংবিধানের প্রস্তাবনা আলোচনা কর। পৃঃ ৬৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। চীন গণসাধারণতন্ত্রের জাতীয় গণকংগ্রেসের গঠন, কার্যাবলী ও অবস্থান আলোচনা কর। স্থায়ী কমিটির সঙ্গে ইহার সম্পর্ক আলোচনা কর। পৃঃ ৭২

২। চীন গণসাধারণতন্ত্রের সংবিধানে বিধিবদ্ধ সাধারণ নীতিসমূহ আলোচনা কর। পৃঃ ৬৭

৩। চীন গণসাধারণতন্ত্রের জাতীয় গণকংগ্রেসের সঙ্গে সুপ্রীম সোভিয়েতের তুলনা কর। পৃঃ ৭৮

৪। চীন গণসাধারণতন্ত্রের জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। ইহার সঙ্গে সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের তুলনা কর। পৃঃ ৮০

৫। চীনের জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস্ চেয়ারম্যান সম্পর্কে টীকা লিখ। পৃঃ ৮২

৬। চীন গণসাধারণতন্ত্রে কি কোন রাষ্ট্রপ্রধান আছেন? পৃঃ ৮৩

৭। মন্ত্রিপরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। ইহার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের তুলনা কর। পৃঃ ৮৫

৮। চীন গণসাধারণতন্ত্রের বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। পৃঃ ৮৮

৯। চীনে বিচার বিভাগের সংগঠন আলোচনা কর। পৃঃ ৯০

১০। চীনে সর্বোচ্চ গণআদালতের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। পৃঃ ৯০

১১। চীনে গণ প্রকিউরেটরেট ব্যবস্থা সম্পর্কে টীকা লিখ। পৃঃ ৯৩

১২। চীনের আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা আলোচনা কর। পৃঃ ৯৫

১৩। জাতীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা আলোচনা কর। পৃঃ ৯৮

১৪। জনগণের কমিউন কাকে বলে ? ইহার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। পৃঃ ৯৯

১৫। জাতীয় স্বায়ত্তশাসিত এলাকার স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর। পৃঃ ৯৮

১৬। জনগণের কমিউন সম্পর্কে টীকা লিখ। পৃঃ ৯৯

১৭। চীনের নাগরিদের মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। পৃঃ ১০৬

১৮। চীনের নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যগুলি আলোচনা কর। পৃঃ ১০৭

১৯। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের তুলনামূলক আলোচনা কর। পৃঃ ১১২

সপ্তম অধ্যায়

১। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মসূচী ও আদর্শগত ভিত্তি আলোচনা কর। পৃঃ ১১৩

২। চীনের কনিউনিষ্ট পার্টির সংগঠন আলোচনা কর। পৃঃ ১১৩

৩। চীনের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকার আলোচনা কর। পৃঃ ১১৭

৪। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির তুলনা কর। পৃঃ ১২১

৫। টীকা লিখঃ

ক. চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান,
খ. পার্টি ও সেনাবাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক,
গ. পার্টির সদস্যপদ,
ঘ. পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠন। পৃঃ ১১২

অষ্টম অধ্যায়

১। চীনের গণমুক্তি ফৌজের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। পৃঃ ১২২

২। গণমুক্তি ফৌজের সংগঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। পৃঃ ১২২

৩। মিলিশিয়া কাহাকে বলে ? চীনের রাজনীতিতে ইহার ভূমিকা আলোচনা কর। পৃঃ ১৩২

৪। টীকা লিখঃ

ক. গণমুক্তি ফৌজের ভূমিকা ১২৯
খ. মিলিশিয়া। পৃঃ ১৩২

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

১

ঐতিহাসিক পটভূমিকা
Historical Background

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও হানাহানির পরিবর্তে শান্তি ও সহযোগিতার পরিবেশকে নিশ্চিত করার জন্যে একটা বিকল্প পন্থার কথা প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের চিন্তাজগতে আলোড়িত হচ্ছে। বহুদিন আগে থেকেই পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলে এসেছিলেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করলেও এবং বিভিন্ন ভৌগোলিক রাষ্ট্রীয় সীমানার দ্বারা আবন্ধ থাকলেও প্রতিটি মানুষই গোটা মানবজাতির অংশ। আমাদের কবি বলেছেন, 'পৃথিবীর মধ্যে আছে এক জাতি, সে জাতির নাম মানুষ জাতি।' সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় বেড়াজাল, জাতীয়তাবাদের কৃত্রিম প্রাচীর ও ভৌগোলিক বন্ধনকে ছিন্ন করে গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য একটি সরকার গঠনের স্বপ্ন অনেক চিন্তাবিদ্ বহু দিন থেকে পোষণ করে এসেছেন। মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষা এবং মানব সভ্যতার বিকাশের এটাই একমাত্র উপায় বলে তাঁরা মনে করেন। তাই সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি বিশ্ব-রাষ্ট্র (World Government) গঠনের চিন্তা মানুষের কল্পনা রাজ্যে বহুদিন থেকেই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার বছর আগে চীনা দার্শনিকেরা প্রথম বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার এরূপ এক আদর্শ কল্পনা করেছিলেন। এমিরি ক্রোচে (Emere Cruce) তাঁর *New Society* বই-এ বিশ্বব্যাপী একটি সংস্থা গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ষোড়শ শতকে ফরাসীরাজ চতুর্থ হেনরী ইউরোপের দেশগুলিকে একটি কমনওয়েলথের কর্তৃত্বের অধীনে আনার কথা বলেছিলেন। ১৭১২ সালে সেণ্ট পিয়ের (St. Pierre) নিখিল ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট (E. Kant) তাঁর *Perpetual Peace* গ্রন্থে বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র গঠনের আশা ব্যক্ত করেছিলেন। এ ছাড়াও উইলিয়াম পেন (William Penn), সাইমন বলিভার (Simon Bolivar), সেণ্ট সাইমন (St. Simon) এবং আরও অনেক চিন্তানায়ক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থায়ী শান্তি ও সহযোগিতা স্থাপনের জন্য বিশ্বসংস্থা স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ইংরেজ কবি টেনিসনকে অনুসরণ করে বলা যায়, এমন একদিন কবে আসবে, যেদিন মানবজাতির আইনসভা এবং পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্র (Parliament of Men and Federation of the World) গঠিত হবে ?

আন্তর্জাতিকতার এরূপ কল্পনা এখন আর চিন্তাবিদ্, দার্শনিক বা কবির কল্পনাতে সীমাবন্ধ নেই—বর্তমান শতকে এর সাংগঠনিক ভিত্তি রচিত হয়েছে। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া এখনই সম্ভব না হলেও ১৯২০ সালে জাতিসংঘ (League of Nations) গঠনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র ও

মানবজাতির আইনসভা গঠনের দিকে নিশ্চিত পদক্ষেপ ঘটেছে। বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রথম সর্বাত্মক সাংগঠনিক পদক্ষেপ হল জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা।

১-১. জাতিসংঘ

The League of Nations

পৃথিবীতে শান্তি সুনিশ্চিত করার নামে বহু জোট, সম্মেলন ও সমিতি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার আগে শান্তির জন্য কোন স্থায়ী সংস্থা গঠন সম্ভব হয়নি। অনেকের মতে কনসার্ট অব ইউরোপকে (Concert of Europe) গণতান্ত্রিক সজ্জায় সজ্জিত করে স্থায়ী সাংগঠনিক রূপ দান করা হয়েছে জাতিসংঘের মধ্য দিয়ে।[1] যা হোক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই এবং বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য একটি স্থায়ী সংস্থার দাবিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্দোলন শুরু হয়। একথা বললে অযৌক্তিক হবে না যে, ঐ সব শান্তি আন্দোলনের ফলে আন্তর্জাতিক স্থায়ী সংগঠন গঠন করার জন্য যে জনমত গড়ে উঠেছিল তার ফলেই জাতিসংঘ জন্ম লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্যারিসে ১৯১৯ সালে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার ভিত্তি হ'ল মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের চৌদ্দদফা শর্ত। এর মধ্যে একটি শর্ত ছিল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভূখণ্ডের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি বিশ্বসংস্থা গঠন করা। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী ১৯টি দেশের প্রতিনিধিরা বিশ্বসংস্থা (League of Nations) গঠনের জন্য এক চুক্তিপত্র বা সংবিধান (Covenant of the League) রচনা করেন এবং তাতে স্বাক্ষর দান করেন। এভাবে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রথম স্থায়ী সংগঠন হিসেবে জাতিসংঘের আবির্ভাব ঘটে।

উৎপত্তি

ভার্সাই সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী সকল রাষ্ট্রকে জাতিসংঘের সদস্য বলে পরিগণিত করা হয়। এ ছাড়াও স্থির হয় যে, কোন রাষ্ট্র বা ডোমিনিয়ন বা উপনিবেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করতে পারবে। জাতিসংঘের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩৪ সালে তা দাঁড়ায় ৬০।

সদস্য পদ

জাতিসংঘের চুক্তিপত্রের মুখবন্ধে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান করাকে ঐ সংস্থার উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্যদের উপর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। চুক্তিপত্রে শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া চুক্তিপত্রে অনগ্রসর দেশগুলির জন্য 'ম্যান্ডেট প্রথা' প্রবর্তন, সামাজিক অবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং শিশু ও নারীর মঙ্গল সাধনের জন্য জাতিসংঘের সামাজিক ও মানবিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য ও নীতি

১. "This is the Concert of Europe with democratic additions and with permanently organised basis." —Hartmann.

জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে এর পাঁচটি প্রধান সংস্থার কথা বলা হয়। এগুলি হল: ১. সাধারণ সভা, ২. পরিষদ, ৩. স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়, ৪. সম্পাদকীয় দপ্তর এবং ৫. আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা। ঐগুলি ছাড়াও সহায়ক সংস্থা হিসাবে 'অছিসংস্থা' সহ কয়েকটি সংস্থা গঠন করা হয়।

কাঠামো

জাতিসংঘ বেশিদিন নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার সাথে সাথে জাতিসংঘ পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। জাতিসংঘের সংক্ষিপ্ত জীবন সাফল্য ও ব্যর্থতায় ভরা। ঐ সময় জাতিসংঘ ৪৩টি বিরোধের মীমাংসা করে। ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসায় জাতিসংঘ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু এর পরবর্তীকালে জাতিসংঘের ইতিহাস আদৌ গৌরবজনক নয়। ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে, ১৯৩৬ সালে ইতালী আবিসিনিয়া দখল করে, ১৯৩৯ সালে ফ্যাসী প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে স্পেনের গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটে। ঐ সকল আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে জাতিসংঘ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে বিশ্বশান্তি রক্ষায় উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। যদিও ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে প্রস্তাব গ্রহণ করে জাতিসংঘের অবলুপ্তি ঘোষণা করা হয়, কিন্তু কার্যত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার সময়েই এর অপমৃত্যু ঘটে।

সাফল্য ও ব্যর্থতা

জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণ

জাতিসংঘ কেন ব্যর্থ হল তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই সংস্থার ব্যর্থতার জন্য এর সাংগঠনিক দুর্বলতা অনেকাংশে দায়ী। জাতিসংঘের চুক্তিপত্র ত্রুটিহীন ছিল না। এই ত্রুটির সুযোগ গ্রহণ করে যে-কোন রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আইনসঙ্গত সুযোগ ছিল। জাতিসংঘের সনদে জাতিসংঘের সুপারিশ গ্রহণ করতে কোন রাষ্ট্রকে বাধ্য করা সম্ভব ছিল না এবং কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। এই সাংগঠনিক দুর্বলতা জাতিসংঘের ব্যর্থতার জন্য অনেকটা দায়ী।

সাংগঠনিক দুর্বলতা

বিশ্বশান্তি রক্ষার ব্যাপারে জাতিসংঘ নিজের সদস্য রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হয়। জার্মানী প্রথম থেকে জাতিসংঘকে প্রথম মহাযুদ্ধের বিজয়ীদের স্বার্থরক্ষার ঘাঁটি বলে মনে করত। সোভিয়েত ইউনিয়ন একে প্রথমে সন্দেহের চোখে দেখত, পরে পশ্চিমী শক্তিবর্গ জাতিসংঘ থেকে সোভিয়েত সদস্যপদ খারিজ করে। ব্রিটেন জাতিসংঘের নীতি রূপায়ণের চেয়ে নিজের সাম্রাজ্যরক্ষায় বেশী সচেস্ট ছিল। ফ্রান্স আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপেক্ষা নিজ স্বার্থে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া কাম্য মনে করে। ইতালী জাতিসংঘকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আবিসিনিয়াকে গ্রাস করে এবং এর প্রতিবাদ না করে ইংলন্ড ও ফ্রান্স ইত্যালীকে তোষণ করতে মনোনিবেশ করে। জাপানও মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থায়

বৃহৎশক্তিগুলির অসহযোগিতা

আঘাত হানে। সর্বোপরি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আত্মকেন্দ্রিক নীতির স্বার্থে নিজে জাতিপুঞ্জের বাইরে থাকে। এক কথায় বলা যায় যে, সদস্য রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিগুলি জাতিসংঘের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেনি।

ঔপনিবেশিক শোষণ চালাবার ক্ষমতার জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জাতিসংঘের ব্যর্থতার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। একদিকে ইতালীতে ফ্যাসীবাদ, জার্মানীতে নাৎসীবাদ এবং জাপানে জংগীবাদের অভ্যুত্থান, অন্যদিকে বুর্জোয়া ও ঐ সকল ফ্যাসীবাদী শক্তিগুলির সোভিয়েত বিরোধিতা সমস্যাকে জটিল করে তোলে। যে কোন উপায়ে হোক সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করতে হবে—এ নীতির ফলশ্রুতি হিসাবে জাপান, জার্মানী ও ইতালীর আগ্রাসী নীতির বিরোধিতা থেকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স বিরত থাকে। যুদ্ধ অনিবার্য বুঝে পরে ব্রিটেন ও ফ্রান্স নীতি পরিবর্তনে বাধ্য হয়। যা হোক, ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে জার্মানী চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করে নেয় এবং ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানী পোলান্ড আক্রমণ করলে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমাধি ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং জাতিসংঘের মৃত্যুঘণ্টা নেপথ্যে বেজে ওঠে। ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্ত করার যে শপথ জাতিসংঘ একদিন গ্রহণ করেছিল তাকে বিদ্রুপ করার জন্যই যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ফ্যাসীবাদ তোষণ

১-২. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্ম

Birth of the United Nations

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত কার্যত জাতিসংঘের অবলুপ্তি ঘোষণা করে, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের মৃত্যু ঘোষিত হয় আরও অনেক পরে ১৯৪৬ সালে। এর কারণ হিসাবে নিকোলাসকে (H. G. Nicholas) অনুসরণ করে বলা যায়: নবজাত সংস্থাকে (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ) নিয়ে উত্তেজনার আতিশয্যে অবলুপ্ত সংস্থাটির (জাতিসংঘ) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা পর্যন্ত সকলে বিস্মৃত হয়েছিল। যা হোক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একথা স্পষ্টতই বোঝা গিয়েছিল যে জাতিসংঘকে আর কার্যকর করা সম্ভব নয়। তাই যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পুনর্গঠন ও শান্তি রক্ষার উপায় উদ্ভবনের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা শুরু হয়। অর্থাৎ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্ম ১৯৪৫ সালে হলেও এরূপ একটি সংস্থার প্রয়োজনীয়তা যুদ্ধকালীন সময় থেকেই অনুভূত হতে থাকে।

১৯৪১ সালে নতুন একটি বিশ্বসংস্থা গঠনের প্রচেষ্টা বাস্তবরূপ নিতে শুরু করে। ঐ বছর মে মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল 'আতলান্তিক সনদ' (Atlantic Charter) নামে একটা যুক্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। তাঁরা ঐ ঘোষণাপত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী ও বিজিত সকল জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সীমানা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেন। ঐ সনদে ভীতি হতে মুক্তি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি হতে অস্ত্র প্রয়োগ নিষিদ্ধকরণ এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আক্রমণকারীদের নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব ছিল। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে

ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়া ঐ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে। পরে আরও ২২টি রাষ্ট্র ঐ ঘোষণার অংশীদার হয়। ঐ ঘোষণাপত্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা (Declaration of the United Nations) নামে পরিচিতি লাভ করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) নামটি দেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট।

বেশির ভাগ রাষ্ট্রই মনে করেছিল যে, জাতিসংঘকে পুনরুজ্জীবিত করার চেয়ে একটা নতুন সংগঠন (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ) গঠন করাই সঙ্গত হবে। এরূপ চিন্তার পিছনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্বার্থ কাজ করেছিল। যা হোক ১৯৪৩ সালে মস্কোতে মিলিত হয়ে ব্রিটেন, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সাম্যের নীতির ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ঐক্যমত ঘোষণা করে (Declaration of Moscow)।

মস্কো ঘোষণা

১৯৪৪ সালে ডাম্বারটন ওকস্-এ (Dumbarton Oaks) সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও চীনের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সংগঠনের রূপরেখা বা কাঠামো সম্পর্কে একমত হন। ঐ বৈঠকে যে সব প্রশ্নের মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি সেগুলোকে ইয়াল্টা সম্মেলনে (Yalta Conference) উপস্থিত করা হয়।

ডাম্বারটন ওকস্ সম্মেলন

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়াল্টা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে স্থির হয় যে, অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে ১৯৪৫ সালের ১লা মার্চের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণাকারী প্রত্যেকটি রাষ্ট্র প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সংগঠনের (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ) সদস্য হতে পারবে। আরও স্থির হয় যে, ঐ সংস্থার উদ্যোক্তা হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেন ছাড়াও ফ্রান্স ও চীন থাকবে। ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল আমেরিকার সানফ্রানসিস্কো শহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের ব্যাপারে ইয়াল্টা সম্মেলনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়।

ইয়াল্টা সম্মেলন

আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্মের আগে ঐ সংগঠনের কিছু কিছু সহকারী সংস্থার (Subsidiary Organs) জন্ম হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'খাদ্য ও কৃষি সংস্থা' এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 'ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর।' ১৯৪৪ সালে গঠিত হয় 'আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক', 'আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার' এবং 'আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা'।

আগেই কয়েকটি সহকারী সংস্থার জন্ম

যা হোক, পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিসকো শহরে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব স্টেটিনিয়াস-এর (Stettinius) সভাপতিত্বে "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক সংগঠন সংক্রান্ত সম্মেলন" (U. N. Conference on International Organisation) শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তখনও পরিসমাপ্তি ঘটেনি—এশিয়া খণ্ডে তখনও যুদ্ধ চলছিল।

তাই ঐ সম্মেলনে শীর্ষস্থানীয় কোন নেতা যোগদান করতে পারেননি। অনেক আলাপ আলোচনার পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংবিধানকে (Charter of U. N.) চূড়ান্তরূপ দেয়া হয়। চার্টার সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হয়। সানফ্রানসিসকো শহরই দ্বিতীয় বিশ্বসংস্থার জন্মস্থান। যোগদানকারী পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা দলিলে স্বাক্ষর করেন। চার্টারের ১১০ ধারা অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদনের ভিত্তিতে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর দ্বিতীয় বিশ্বসভা 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের' জন্ম ঘোষিত হয় এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মহান্ প্রয়াসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যাত্রা শুরু হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চার্টারের মুখবন্ধের শেষে বলা হয়, সানফ্রানসিসকো শহরে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ এই চার্টারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে এবং এতদ্দ্বারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করছে।

সানফ্রানসিসকো সম্মেলন এবং জাতিপুঞ্জের জন্ম

১-৩. জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যে তুলনা

Comparison between the League and the U. N

অনেক লেখক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে জাতিসংঘেরই একটি নবতররূপ বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ হল, ঐ দুটি সংস্থার মধ্যে উদ্দেশ্যগত, কাঠামোগত এবং কার্যপ্রণালীগত সাদৃশ্য। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাই উভয় সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য এবং আর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নয়ন উভয়েরই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। কাঠামোগত দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, জাতিসংঘের প্রধান চারটি সংস্থা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ঐ সংস্থাগুলি হল সাধারণ সদস্যদের দ্বারা গঠিত সাধারণ সভা, বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিনিধিত্বমূলক নিরাপত্তা পরিষদ, মহাসচিবের অধীনে স্থায়ী সচিবালয় এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয়। জাতিসংঘ ও জাতিপুঞ্জের কার্যপ্রণালী সাধারণভাবে সাদৃশ্যমূলক। তবে উভয় সংস্থার সাধারণসভা ও নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও ভোট ব্যবস্থায় কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সাদৃশ্য

জাতিসংঘ ও জাতিপুঞ্জের মধো সাদৃশ্য হিসাবে আরও বলা যায়, উভয় সংস্থাই বিশ্বাস করে যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা কেবল সুসংবদ্ধ যৌথ উদ্যমের দ্বারাই অর্জন করা যেতে পারে। উভয় সংস্থাই কতকগুলি সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের সম্মিলিত সংঘ, যদিও কার্যকারিতার দিক থেকে জাতিসংঘ ছিল সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা ও আন্তর্জাতিক বিচারালয় জাতিসংঘের সাধারণসভা ও স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের প্রায় অবিকৃত রূপ। জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ বস্তুত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের আদর্শেই গঠিত হয়। উভয় সংস্থাতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার আকৃতি ও প্রকৃতি একই। এ সব কারণে অনেকে মনে করেন যে, শুধুমাত্র নিরস্ত্রীকরণ ও সংখ্যালঘু নিরাপত্তার বিষয়গুলি বাদে জাতিসংঘের প্রতিটি কর্তব্য-কর্মই কোন-না-কোন আকারে জাতিপুঞ্জের মধ্যে পুনঃ প্রবর্তিত হয়েছে।

জাতিসংঘ এবং জাতিপুঞ্জের মধ্যে উপরোক্ত সাদৃশ্যগুলি পরিলক্ষিত হলেও এদের মধ্যকার পার্থক্য উপেক্ষণীয় নয়। জাতিসংঘের চেয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অধিকতর উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন না হলে এর প্রয়োজনীয়তা আদৌ অনুভূত হত না। জাতি-সংঘে তৎকালীন পৃথিবীর সকল প্রধান দেশগুলি কখনই একত্রে সদস্যপদভুক্ত হয়নি। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বর্তমান পৃথিবীর সকল বৃহত্তম শক্তিই উপস্থিত। অধ্যাপক ইগ্‌ল্‌টন বলেন যে, যদিও দুটি সংগঠনের মধ্যে আকৃতিগত ও গঠন-সংক্রান্ত সাদৃশ্য দেখা যায়, তা সত্ত্বেও এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে।

বৈসাদৃশ্য

বৃহৎ শক্তিগুলির ক্ষমতা ও অধিকারগত বিষয়ে জাতিসংঘের চেয়ে জাতিপুঞ্জ ভিন্ন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎশক্তিগুলির অবস্থা জাতিসংঘ অপেক্ষা সুবিধাজনক। পৃথিবীতে বৃহৎ যুদ্ধ সাধারণত বৃহৎ শক্তিগুলির সংঘাতের ফলেই ঘটে থাকে। ঐ বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে মতৈক্য ঘটলে তবেই নিরাপত্তা পরিষদের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সম্ভব হবে এবং সম্ভবত যুদ্ধ পরিহার করা যাবে—এ চিন্তা থেকেই যথাযোগ্য ব্যবস্থার কথা জাতিপুঞ্জের সনদের মধ্যে বিধৃত হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর্থনীতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের জন্য সৃষ্ট উপসংস্থাগুলির কার্যপ্রণালী জাতিসংঘের অধীনস্থ সংস্থাগুলির থেকে ব্যাপকতর ও অধিকতর স্পষ্ট। জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন জাতিসংঘের দু পরিষদের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের চেয়ে অনেক বেশি যথাযথ। জাতিসংঘের সনদে (covenant) 'শান্তি' প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ ছিল, তবে 'শান্তি' বলতে সেখানে যুদ্ধ পরিহার করাকেই বোঝান হয়েছে এবং ঐ সাথে প্রকাশ্য কূটনীতি, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জাতিপুঞ্জের সনদ ঐ সকল বিষয়গুলি ছাড়াও বিভিন্ন জাতির মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করে নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছে। পরন্তু মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার জন্য আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার কথাও জাতিপুঞ্জের সনদে ঘোষণা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আর্থনীতিক ও সামাজিক সংস্থাটিকে একটি মুখ্য সংস্থার মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

জাতিসংঘের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণে রেখে জাতিপুঞ্জের উদ্যোক্তারা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য একটি নতুন সংস্থা গঠনে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। ঐ সকল দিক থেকে বিচার করলে জাতিপুঞ্জকে জাতিসংঘের নিছক নব সংস্করণ বলা হয়তো ঠিক নয়।

২ প্রস্তাবনা, উদ্দেশ্য, নীতি এবং কাঠামো
Preamble, Purposes, Principles and Structure

২-১. জাতিপুঞ্জের চার্টারের প্রস্তাবনা
The Preamble of the U. N. Charter.

কয়েকটি নির্বাচিত সুন্দর শব্দ বিন্যাসের মধ্য দিয়ে একটা মহৎ ও গুরুগম্ভীর বক্তব্যের কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে জাতিপুঞ্জের চার্টারের প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে। ভাব, ভাষা ও অপূর্ব শব্দ চয়নের সংমিশ্রণ ঘটেছে প্রস্তাবনাতে। প্রস্তাবনাটি পড়ে মনে হয় যেন গভীর অর্থ যুক্ত একটি ছন্দোবদ্ধ কবিতা।

প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, যুদ্ধের যে অভিশাপ আমাদের জীবনকালে দুবার মানবজাতির অবর্ণনীয় দুর্দশার কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে, ঐ যুদ্ধজনিত ভয়াবহতার হাত থেকে আমাদের বংশধরগণকে বাঁচাবার জন্য আমরা জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত জাতিগুলি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং মানুষের মৌলিক অধিকার, মানুষের মর্যাদা ও যোগ্যতা, নারী-পুরুষ সকল মানুষের ও ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জাতির সমান অধিকারে আস্থাশীল। ন্যায় বিচার এবং চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের দায়-দায়িত্বের প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সামাজিক প্রগতি ও উন্নত জীবন মানের জন্য সচেষ্ট থাকতে এবং সহনশীলতা সহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে আমাদের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং নিয়মসিদ্ধ উপায়ে যৌথ স্বার্থের প্রয়োজন বাদে সামরিক শক্তি ব্যবহার না করতে আমরা কৃতসঙ্কল্প। সকল জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আর্থনীতিক উন্নতিকল্পে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণে আমরা সংকল্পবদ্ধ। ঐ সকল লক্ষ্যকে বাস্তবায়িক করতে প্রচেষ্টা চালাবার জন্য আমরা কৃতসিদ্ধান্ত।

প্রস্তাবনার বিষয়বস্তু

প্রস্তাবনায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের ঐতিহাসিক পটভূমিকার (বিগত দুইটি বিশ্বযুদ্ধের নির্মম অভিজ্ঞতা) কথা বলা হয়েছে এবং ঐ পটভূমিকায় ভবিষ্যৎ বংশধরদের ধ্বংসের সর্বগ্রাসী দাবানল থেকে বাঁচাবার জন্য পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে জাতিপুঞ্জ গঠনের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। জাতিসংঘের দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসাবে কয়েকটি মহৎ আদর্শ রূপায়ণের কথা প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রস্তাবনার সাথে সঙ্গতি রেখে চার্টারের প্রথম ধারায় জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যগুলিকে বিবৃত করা হয়েছে।

প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে অনেকগুলি মহৎ আদর্শ, নীতি ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। জাতিপুঞ্জের জন্মের কারণ হিসাবে বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবনার মানবিক আবেদন হৃদয়স্পর্শী এবং বিষয়বস্তু সর্বজনস্বীকৃত—এ নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। তবে প্রস্তাবনার দু-একটি শব্দ নিয়ে বিভ্রান্তির অবকাশ আছে।

সুম্যান (Schuman), গুডরিচ্, (Goodrich), কেলজেন (Kelsen) প্রমুখ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পণ্ডিতরা মনে করেন যে 'আমরা জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত জাতিগুলি' (We, the Peoples of the United Nations) পদটি বিভ্রান্তিমূলক। তাঁদের মতে জাতিপুঞ্জের চার্টার প্রণয়ন করেছিল বিভিন্ন সরকারের যোগদানকারী প্রতিনিধিরা—কোন জনগোষ্ঠী বা জনগণ নয়। সুতরাং 'আমরা' শব্দটি অযৌক্তিক-ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গুডরিচ আরও বলেছেন যে, এটা স্পষ্ট যে জাতিপুঞ্জ কয়েকটি রাষ্ট্রের দ্বারা সৃষ্ট, জনগণ দ্বারা নয়। 'আমরা' শব্দটিকে জনগণ বা জনগোষ্ঠী মনে না করে 'জাতি' অর্থে ব্যবহার করলে হয়তো আপত্তির আর কোন কারণ থাকে না, কারণ রাষ্ট্রের সমার্থক শব্দ হিসাবে 'জাতি' শব্দটিকে অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, আইনের দিক থেকে 'আমরা' শব্দটির ব্যবহার হয়তো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে ; কিন্তু বাস্তবে যুদ্ধক্লান্ত, রক্তস্নাত প্রতিটি মানুষের মনের কথা প্রস্তাবনায় ধ্বনিত হয়েছে—তাই সে দিক থেকে 'আমরা' শব্দটির ব্যবহার অযৌক্তিক হয়নি।

আমরা বলিতে কী বুঝায় ?

সমালোচকেরা মনে করেন যে, জাতিসংঘের সনদের মুখবন্ধ থেকে জাতিপুঞ্জের চার্টারের মুখবন্ধ অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ। জাতিপুঞ্জ গঠনের কারণ হিসেবে যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে এখানে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবনায় 'মানবিক অধিকার'-কে আন্তর্জাতিক সংগঠনের আবশ্যিক বিষয় বলে মনে করা হয়েছে এবং ঐ বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষের মৌলিক অধিকার, মানুষের মর্যাদা ও যোগ্যতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল জাতির সম-অধিকার রক্ষায় জাতিপুঞ্জের সদস্যরা কৃতসঙ্কল্প। চার্টারের প্রস্তাবনায় আর্থনীতিক ও সামাজিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে লিপিবদ্ধ করায় একথা সহজে প্রতীয়মান যে জাতিপুঞ্জে আর্থনীতিক ও সামাজিক বিষয়কে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই অনেকে মনে করেন যে, জাতিপুঞ্জের সনদ বা চার্টারে 'কল্যাণমূলক আন্তর্জাতিকতা' প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়েছে। কেউ কেউ অবশ্য প্রস্তাবনার সমালোচনা করে বলেছেন যে, সামাজিক উন্নতি এবং উন্নততর জীবনের কথা বলা হলেও প্রস্তাবনার কোথাও জাতিপুঞ্জের 'ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামের' কথা বলা হয়নি।

মূল্যায়ন

১-২. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি
The Aims and Principles of the U. N.

জাতিপুঞ্জের চার্টারের প্রথম ও দ্বিতীয় ধারায় যথাক্রমে জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতিকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবনার মধ্য দিয়াও এর উদ্দেশ্য ও নীতির সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। নীচে জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হ'ল ঃ

ক. জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য

জাতিপুঞ্জের চার্টারের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, বিগত দুটি বিধ্বংসী যুদ্ধের ফলে গোটা মানবজাতি অপরিসীম দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছে। যুদ্ধের বিপদ

থেকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের রক্ষা করতে এবং মানবাধিকারগুলিকে সযত্নে রক্ষা করতে জাতিসংঘ কৃতসঙ্কল্প। চার্টারের প্রথম ধারায় জাতিপুঞ্জের ঐ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বিশদভাবে ঘোষিত হয়েছে ঃ

১. জাতিপুঞ্জের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং এর জন্য কার্যকরভাবে যৌথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে শান্তির বিরুদ্ধে হুমকী বন্ধ করা এবং এর সম্ভাবনা দূর করা, আগ্রাসী কার্যকলাপ দমন করা, অন্য যে কোন ভাবে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা দূর করা। ন্যায়বিচারের নীতি ও আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে শান্তিভঙ্গ ঘটাতে পারে এমন আন্তর্জাতিক বিরোধ অথবা পরিস্থিতিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটমাট ও নিষ্পত্তি করা। আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি ও তা মিটমাটের পদ্ধতি জাতিপুঞ্জের সনদের ১৪ নম্বর ধারায় বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২. সকল জাতির সমান অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সার্বজনীন শান্তিকে শক্তিশালী করার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

৩. কেবলমাত্র শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান নয়, আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা মানবিক চরিত্রের আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা এবং বর্ণ, ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের অধিকার রক্ষা করা এবং সকল মানুষের জন্য মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনকে উৎসাহদান ও উন্নতি বিধান করা।

৪. উপরোক্ত সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য জাতিপুঞ্জকে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে সংক্ষেপে বলা যায়, জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য হ'ল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, আর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ করা এবং সকল জাতির সমান অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে স্বীকৃতিদান করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সহাবস্থান ও সহযোগিতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা। এক কথায় বলা যায়, জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য হ'ল 'জনকল্যাণমূলক আন্তর্জাতিকতাবাদ' প্রতিষ্ঠা। তবে নিকোলাস মনে করেন, চার্টারে রাজনৈতিক বিষয়কে যত নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সে তুলনায় কল্যাণমূলক আন্তর্জাতিকতার উপস্থাপনা ততটা স্বচ্ছ নয়।

মূল্যায়ন

খ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতি

জাতিপুঞ্জের চার্টারের দ্বিতীয় ধারায় কতকগুলি নীতির কথা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, চার্টারের প্রথম ধারায় যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে ওগুলি কার্যকর করার জন্য জাতিপুঞ্জ এবং এর সদস্যরা নীচে উল্লেখিত নীতিগুলি মান্য করে চলবে ঃ

১. জাতিপুঞ্জের ভিত্তি হল সকল সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমগত সাম্য।

২. জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যের সদস্যপদজনিত অধিকার ও সুবিধা যাতে নিশ্চিত করা যায় সেজন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলি চার্টার বর্ণিত দায়িত্ব বিশ্বস্তভাবে পালন করবে।

৩. আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার যাতে বিপন্ন না হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখে সদস্য রাষ্ট্রগুলি তাদের আন্তর্জাতিক বিবাদগুলিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করবে।

৪. সকল সদস্য রাষ্ট্র এরূপ সকল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ বা বল প্রয়োগের হুমকী দেয়া থেকে বিরত থাকবে—যা অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডগত সংহতি বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিপন্থী অথবা অন্যভাবে জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিহীন।

৫. সকল সদস্যরাষ্ট্র চার্টার অনুযায়ী গৃহীত সকল ব্যবস্থার ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে এবং যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জ প্রতিবিধানমূলক বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ঐ রাষ্ট্রকে সব সদস্য রাষ্ট্র সাহায্য দান করা থেকে বিরত থাকবে।

৬. যে সকল রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় সে সকল রাষ্ট্র যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জাতিপুঞ্জের নীতি অনুযায়ী কাজ করে জাতিপুঞ্জ তা নিশ্চিত করবে।

৭. চার্টারের অন্তর্গত কোন বিষয়ের সাহায্য নিয়ে জাতিপুঞ্জ কোন দেশের অভ্যন্তরীণ এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না বা কোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়কে চার্টার অনুসারে মীমাংসার জন্য উপস্থিত করার বাধ্য-বাধকতা সদস্য-রাষ্ট্রের থাকবে না।

মূল্যায়ন

'সার্বভৌমগত সাম্যের নীতি' অনুযায়ী জাতিপুঞ্জের সাধারণসভায় প্রতিটি রাষ্ট্রকে সম-প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সমালোচকরা মনে করেন যে, নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎ শক্তিবর্গের স্থায়ী সদস্যপদ লাভ এবং 'ভিটো' প্রয়োগের অধিকারের স্বীকৃতি সার্বভৌমগত সাম্যনীতি বিরোধী।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আর্থিক অবস্থার পার্থক্য এত বেশি যে দরিদ্র রাষ্ট্রকে অনেক সময় আর্থনীতিক সাহায্যের জন্য আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। ফলে আর্থিক সাম্যের অভাবে সার্বভৌমগত সাম্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। জাতিপুঞ্জের সনদে নীতি হিসাবে ব্যক্ত হয়েছে যে, কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ হস্তক্ষেপ করবে না। অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলতে কি কি বোঝায় তা বলা হয়নি, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল নিজ নিজ স্বার্থ অনুযায়ী এর ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে কোন রাষ্ট্রের ব্যাপারে যাকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলা হয়েছে, অন্য ক্ষেত্রে তাকে জাতিপুঞ্জের বিচার্য বিষয় বলে মনে করা হয়েছে।

এ সকল কিছু কিছু অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, জাতিপুঞ্জের নীতিগুলির মধ্য দিয়ে মহৎ আদর্শ ও বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য অপরিহার্য কয়েকটি মহান্ আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে।

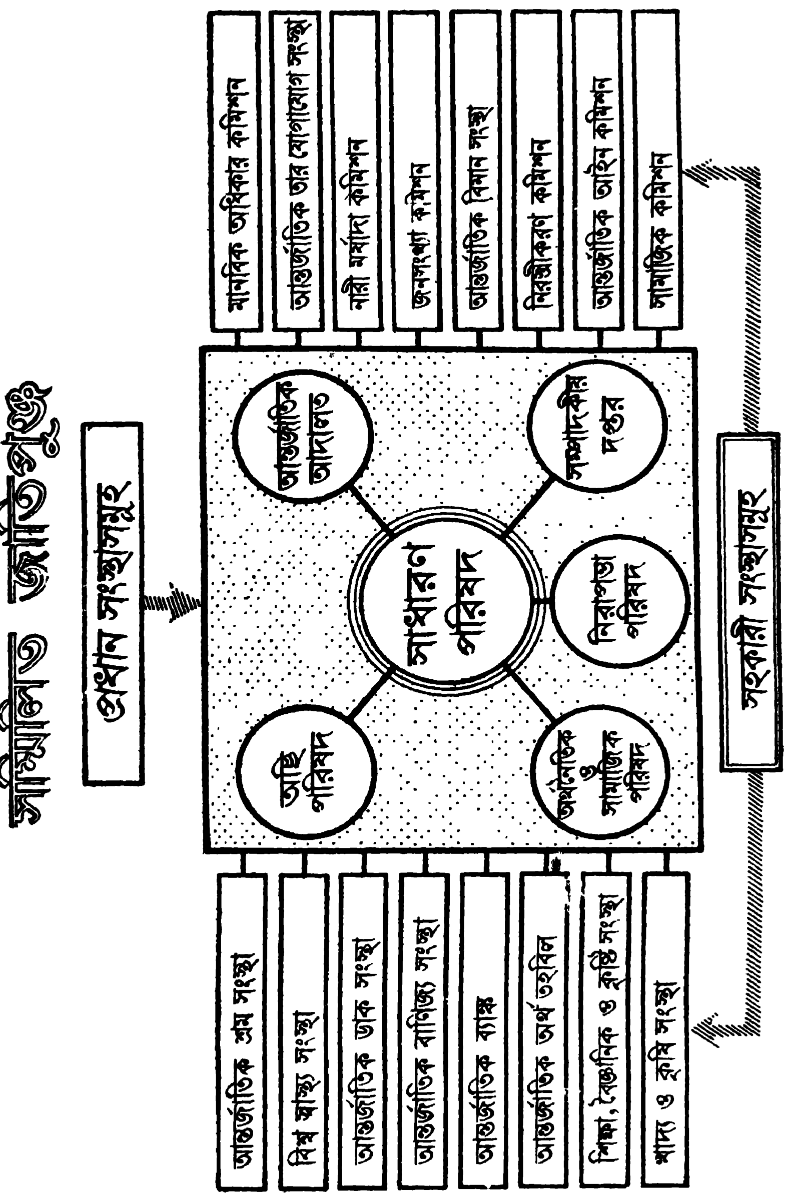
২-৩. জাতিপুঞ্জের গঠন কাঠামো
Structure of the U.N.

জাতিপুঞ্জের গঠন ও কাঠামো সনদ বা চার্টারে আলোচনা করা হয়েছে। প্রস্তাবনা সহ মোট ১১১ ধারা নিয়ে জাতিপুঞ্জের সনদ রচিত হয়েছে। সনদের ৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে জাতিপুঞ্জ **৬টি প্রধান সংস্থা** (Principal Organs.) স্থাপন করছে। ঐগুলো হল :

১. **একটি সাধারণ সভা বা সাধারণ পরিষদ** (The General Assembly)
২. **একটি নিরাপত্তা পরিষদ** (The Security Council)
৩. **একটি আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ** (The Economic and Social Council)
৪. **একটি অছি পরিষদ** (The Trusteeship Council)
৫. **একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয়** (The International Court of Justice)
৬. **একটি সচিবালয়** (The Secretariat)

সনদের ৭ নম্বর ধারায় আরও বলা হয়েছে যে, প্রয়োজনবোধে জাতিপুঞ্জের কয়েকটি **সহকারী সংস্থা** (Subsidiary Organ) প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ ছাড়াও ২২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, সাধারণ সভা নিজের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য নিজের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহকারী সংস্থা গঠন করতে পারবে। জাতিপুঞ্জের অনেকগুলি সহকারী সংস্থা আছে। নীচে আমরা গুরুত্বপূর্ণ **সহকারী সংস্থাগুলির** উল্লেখ করছি :

১. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা
২. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
৩. আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক
৪. আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল
৫. খাদ্য ও কৃষি সংস্থা
৬. শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা
৭. শিশু সাহায্য ভাণ্ডার
৮. আন্তর্জাতিক ডাক সংস্থা
৯. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা
১০. মানবিক অধিকার কমিশন
১১. আন্তর্জাতিক ও তার যোগাযোগ সংস্থা
১২. নারী মর্যাদা কমিশন
১৩. জনসংখ্যা কমিশন
১৪. আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা
১৫. নিরস্ত্রীকরণ কমিশন
১৬ আন্তর্জাতিক আইন কমিশন
১৭. সামাজিক কমিশন


সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ
প্রধান সংস্থাসমূহ
সাধারণ পরিষদ
আন্তর্জাতিক আদালত
সম্পাদকীয় দপ্তর
নিরাপত্তা পরিষদ
অছি পরিষদ
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
সহকারী সংস্থাসমূহ
মানবিক অধিকার কমিশন
আন্তর্জাতিক তার যোগাযোগ সংস্থা
নারী মর্যাদা কমিশন
জনসংখ্যা কমিশন
আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা
নিরস্ত্রীকরণ কমিশন
আন্তর্জাতিক আইন কমিশন
সামাজিক কমিশন
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
আন্তর্জাতিক ডাক সংস্থা
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল
শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও কৃষ্টি সংস্থা
খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

৩

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অঙ্গসমূহ

Organs of the United Nations

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাঠামো বিশ্লেষণ করে আমরা এর প্রধান ও সহকারী অঙ্গ-সমূহের উল্লেখ করেছি। এবার জাতিপুঞ্জের প্রধান ছটি অঙ্গ এবং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সহকারী অঙ্গের আলোচনা করা হল।

৩-১. সাধারণ সভা
The General Assembly

পৃথিবীর গোটা মানবসমাজের জন্য একটি মাত্র আইনসভা (Parliament of Men) গঠনের যে কল্পনা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি তার একটা প্রস্তাবিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে জাতিপুঞ্জের সাধারণসভার মধ্য দিয়ে। ছোট-বড় প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা গঠিত। প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র অনধিক পাঁচজন করে প্রতিনিধি সাধারণ সভায় পাঠাতে পারে। তবে ছোট বা বড় প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের ভোট সংখ্যা একটি। অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব ও ভোটসংখ্যার ব্যাপারে সাধারণ সভা প্রতিটি রাষ্ট্রের সম-অধিকারের নীতি মান্য করে। সাধারণ সভা প্রতি বছর এর অধিবেশন শুরু হবার আগে একজন সভাপতি, সতেরজন সহ-সভাপতি[১] এবং বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সভাপতিদের নির্বাচন করে।

সাধারণ সভার গঠন

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণ সভার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সাহায্য করার জন্য সাতটি কমিটি আছে। ঐ কমিটিগুলি হল: রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি, আর্থনীতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি, সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক কমিটি, অছি সংক্রান্ত কমিটি, প্রশাসন ও বাজেট বিষয়ক কমিটি, আইন সংক্রান্ত কমিটি এবং বিশেষ রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটি। প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রই প্রতিটি কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে।

কমিটি

সাধারণসভা বছরে একবার বাৎসরিক অধিবেশনে মিলিত হয়। ঐ অধিবেশন সাধারণত প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয় এবং তিনমাস কাল ধরে চলে। যে কোন সদস্য রাষ্ট্র কোন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমস্যা আলোচনার জন্য সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ জানাতে পারে। ঐ প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন থাকলে সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়।

অধিবেশন

ভোট পদ্ধতি

আমরা আগেই বলেছি যে, ছোট বড় প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্র সাধারণ সভায় একটি ভোটের অধিকারী। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণ সভায় অধিবেশনে উপস্থিত ও ভোটে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

---

১. সহ-সভাপতির সংখ্যা ১৯৬৩ সালে বৃদ্ধি করে সতের করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে আছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে সুপারিশ করা, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন করা, আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন করা, অছি পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন করা, সদস্যপদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বাতিল করা, কোন সদস্যকে বহিষ্কার করা এবং অছি ব্যবস্থার প্রয়োগ ও বাজেট সংক্রান্ত আলোচনা। উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া অন্য সব বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটে সাধারণ পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সাধারণ সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী

জাতিপুঞ্জের সনদের ১০ নম্বর ধারা থেকে ১৭ নম্বর ধারায় সাধারণ সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে নিকোলাস পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন: ১. নীতি নির্ধারণের কাজ, ২. আইন প্রণয়ন জাতীয় কাজ, ৩. নতুন নতুন আইন ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলার সাহায্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্থিতাবস্থা পরিবর্তনে সাহায্য করা, ৪. পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজ, ৫. বিভিন্ন অঙ্গের (Organs) সদস্য নির্বাচন করা।

সাধারণ সভার অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়সূচী আগেই মহাসচিব স্থির করেন। সাধারণ সভার উপরোক্ত পাঁচ রকমের কাজকর্ম ছাড়াও আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাধারণ সভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন 'সাধারণ বিতর্ক' (General Debate) দিয়ে শুরু হয়। আমাদের দেশে রাষ্ট্রপতির অভিভাষণকে কেন্দ্র করে যে ধরনের বিতর্ক সংসদে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ সভার সাধারণ বিতর্ককে তার সাথে তুলনা করা যায়। মহাসচিব বা সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনকে উপলক্ষ্য করে সদস্যরাষ্ট্রগুলি প্রতিবেদনে উল্লেখিত বা অনুল্লেখিত যে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টির আলোচনা ঐ বিতর্কে গুরুত্ব লাভ করে। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে সহযোগিতার প্রশ্ন, নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র সীমিত করার প্রশ্ন নিয়েও সাধারণ বিতর্কে আলোচনা হয়। তবে সাধারণ বিতর্ক কোন নির্দিষ্ট বিষয়সূচীকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় না বলে ঐ বিতর্ক খুব এলোমেলো ধারার প্রবাহিত হয়।

সাধারণ বিতর্ক

এবার আমরা সাধারণ সভার উপরোক্ত পাঁচটি ক্ষমতা ও কার্যকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করব। সাধারণ সভার প্রথম কাজ হল নীতি নির্ধারণের কাজ। সনদের ১১(১) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সহ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও নীতি নিয়েও আলোচনা ও বিবেচনা করতে পারবে এবং এ সম্পর্কে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির কাছে এবং নিরাপত্তা পরিষদের কাছে সুপারিশ করতে পারবে। আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার সমস্যা ও নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে সাধারণ সভায় বারবার বিতর্ক হয়েছে। তবে ১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা চলছে এমন কোন বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের বিনা অনুরোধে সাধারণ সভা আলোচনা এবং কোন সুপারিশ করতে পারবে না।

১. নীতি নির্ধারণ

সাধারণ সভার দ্বিতীয় কাজ হল আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ। জাতিপুঞ্জের সনদের ১৩(১) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক আইনের উন্নতি, সংকলন ও প্রসারে উৎসাহ দান করা সাধারণ সভার আবশ্যিক কাজ। এ ব্যাপারে সাধারণ সভার অনুমোদন যদিও আইনের মর্যাদা লাভ করে না, তা সত্ত্বেও এর কার্যধারাকে অনেকাংশে জাতীয় আইনসভার কার্য-প্রণালীর অনুরূপ বলা চলে। এ জন্যই সাধারণ সভাকে 'আধা-আইনসভা' (Quasi-Legislature) বলা হয়। উপরোক্ত ধারাতে জাতি, ধর্ম, ভাষা ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধীনতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সাধারণ সভার ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে।

২. আইন প্রণয়ন জাতীয় কাজ

যদিও সাধারণ সভা প্রণীত 'আইন' প্রকৃত আইনের মর্যাদা পায় না, কিন্তু এ ব্যাপারে সাধারণ সভা উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পাদন করেছে। এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক আইন কমিশন গঠন, ন্যুরেমবার্গ বিচারের আইন রচনা, রীতি ও ঘোষণা (Declaration), জাতি বিলোপ নিবারণ রীতি (Genocide Convention) ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, সাধারণ সভা নতুন ও উন্নত আইনগত পরিবেশ ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা রচনার দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিবর্তনে সাহায্য করে। সাধারণ সভার এ কার্যক্রমটি বিশেষভাবে গঠনমূলক। ঐ প্রক্রিয়া দ্বারাই প্যালেস্টাইন বিভক্ত হয় এবং স্বাধীন ইস্রায়েল রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু উপনিবেশ সংক্রান্ত প্রশ্নে সাধারণ সভা ঐ কার্যক্রমকে খুব বেশি প্রসারিত করতে পারেনি। নাম্বিয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে ১৯৬৮ সালে নাম্বিয়াকে স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সাধারণ সভা ব্যর্থ হয়। শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাম্য পরিবর্তনে সাহায্য করার ব্যাপারে সাধারণসভা দৃঢ় এবং অনমনীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি—ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকমের পন্থা গ্রহণ করেছে

৩. শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিবর্তনে সাহায্য করা

পর্যবেক্ষণমূলক কাজকর্মকে সাধারণ সভার চতুর্থ কাজ হিসাবে অভিহিত করা যায়। সচিবালয় সহ জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন অঙ্গের ওপর নিয়ন্ত্রণসহ সামগ্রিক ভাবে গোটা সংগঠনের প্রশাসন পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব সাধারণ সভার উপর ন্যস্ত। নিরাপত্তা পরিষদ, আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদকে সাধারণ সভার কাছে প্রতিবেদন পেশ করতে হয়। প্রতিবেদন পেশ করা একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, কারণ সভায় প্রতিবেদন নিয়ে প্রায়শই কোন বিতর্ক হয় না। তবে অছি পরিষদ এবং আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের ব্যাপারে সাধারণ সভার তত্ত্বাবধায়ক ক্ষমতা অনেক বেশি কার্যকর।

৪. পর্যবেক্ষণমূলক কাজ

জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন অঙ্গের সদস্য নির্বাচন করা সাধারণ সভার অন্যতম কাজ। সাধারণ সভার সভাপতি নির্বাচন, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন, আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন, অনুষ্ঠানিকভাবে অছি পরিষদের সদস্য নির্বাচন এবং বিভিন্ন অস্থায়ী কমিশন গঠনের দায়িত্ব সাধারণ সভার। এ ছাড়াও মহাসচিব নির্বাচন, আন্তর্জাতিক আদালতের

৫. সদস্য নির্বাচন

বিচারক নির্বাচন এবং জাতিপুঞ্জে নতুন সদস্য গ্রহণের ক্ষমতা সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদ যৌথভাবে ভোগ করে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ সভা এদের নির্বাচন করে।

নিকোলাস বর্ণিত উপরোক্ত পাঁচটি ক্ষমতা ও কাজ ছাড়াও সাধারণ পরিষদ আরও দুটি কাজ সম্পাদন করে। এগুলি হল: ৬. আর্থিক কাজকর্ম এবং ৭. রাজনৈতিক কাজকর্ম।

৬ আর্থিক বিষয়ে ক্ষমতা

সাধারণ সভা জাতিপুঞ্জের আর্থনীতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ঐ উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা একটি প্রসাসনিক ও বাজেট সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে। ব্রিটেনে অর্থমন্ত্রক, ব্যয়-কমিটি এবং সরকারী হিসাব কমিটি যে দায়িত্ব পালন করে সাধারণ সভার এই কমিটিও সে দায়িত্ব পালন করে। মহাসচিব আগামী বছরের জন্য ব্যয়ের যে খসড়া প্রস্তুত করে এই কমিটি তাকে পরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনীয় সংকোচন ও পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করে। এছাড়া সাধারণ সভা 'অর্থপ্রদান সংক্রান্ত কমিটি' গঠন করে। প্রতিটি রাষ্ট্রের জাতীয় আয়ের দিকে লক্ষ রেখে ঐ কমিটি প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্র কর্তৃক জাতিপুঞ্জকে দেয় অর্থের পরিমাণ স্থির করে। কোন রাষ্ট্র যদি জাতিপুঞ্জকে দেয় টাকা না দেয় তবে সাধারণ সভা ঐ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৭ রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কাজ

সাধারণ সভার রাজনৈতিক কার্যাবলী ক্রমশ বেশি গুরুত্ব অর্জন করছে এবং ঐ ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে সফলও হচ্ছে। জাতিপুঞ্জের সনদ প্রণেতাগণ নিরাপত্তা পরিষদ থেকে সাধারণ সভাকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় পরিণত করতে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গের মতানৈক্যের ফলে নিরাপত্তা পরিষদ প্রায়শই রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবিলায় অক্ষমতার পরিচয় দেয়ায় এবং বিশেষ করে 'ভেটো' প্রয়োগের ফলে প্রায়শই অচলাবস্থার সৃষ্টি হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা ও বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে সাধারণ পরিষদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের সাধারণ মানুষের কাছেও সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক ভূমিকাটিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যদিও সনদের ১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের, কিন্তু সনদের ৩৫ নম্বর ধারার সুযোগ গ্রহণ করে ঐ রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকটা সাধারণ সভার হাতে চলে এসেছে।

'শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি প্রস্তাব' (Uniting for Peace Resolution)

১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধ প্রসঙ্গে 'শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ 'হচ্ছি' প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথে সাধারণ সভার কর্মধারা একটি নতুন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে এবং এ সংস্থার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে মতবিরোধ এবং 'ভেটো' ব্যবস্থা নিরাপত্তা পরিষদকে অকর্মণ্য করে তুলেছিল। ঐ অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫০ সালের ৩রা নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলে যে, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ঐকমত্যের অভাবের ফলে কোথাও শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিলে বা শান্তি ভঙ্গ

হলে বা কোন আগ্রাসী ঘটনা ঘটলে এবং নিরাপত্তা পরিষদ যদি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তা হলে সাধারণ সভা ঐ বিষয়ে বিবেচনা করবে এবং শান্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগ সহ যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদস্য রাষ্ট্রদের কাছে সুপারিশ করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐ প্রস্তাবকে **'শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি'** প্রস্তাব নামে অভিহিত করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উত্থাপিত ঐ প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদকে দুর্বল করবে এবং ঐ প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদের ঐক্যমত নীতির বিরোধী—এ যুক্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। কঙ্গো সংকটের সময় পোলাণ্ড এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাবকে চ্যালেঞ্জ জানায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন মিশরে ইস্রায়েল, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করে এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের 'ভেটো' প্রয়োগের ফলে নিরাপত্তা পরিষদ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন ঐ হস্তক্ষেপের বিষয় আলোচনার জন্য 'শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি' এ প্রস্তাবের সাহায্যে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়।

জাতিপুঞ্জের সনদের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা এবং আগ্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার নিরাপত্তা পরিষদের এক্তিয়ারে রাখা হয়। কিন্তু 'শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি' প্রস্তাব-এর ফলে উপরোক্ত বিষয়ে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করার এক্তিয়ার সাধারণ সভার হাতে সম্প্রসারিত হয়। এ প্রস্তাব একদিকে সাধারণ সভার কার্যধারাকে সম্প্রসারিত করে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং অন্যদিকে নিরাপত্তা পরিষদের অক্ষমতাকে যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

সাধারণ সভার উত্থান (Rise of the General Assembly)

জাতিপুঞ্জের সনদের প্রণেতাগণ আশা করেছিলেন যে, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য বৃহৎ পাঁচটি শক্তি পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হবে এবং নিরাপত্তা পরিষদ কার্যকর সংস্থা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। তাই তাঁরা সাধারণ সভার চেয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল বৃহৎ পাঁচটি শক্তির সম্মতি বাদে জাতিপুঞ্জকে যাতে ব্যবহার করা না যায় সে ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করা।

কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গের মতপার্থক্য এবং এ জন্য বারংবার 'ভেটো' প্রয়োগের ফলে নিরাপত্তা পরিষদ নিজের কার্যকারিতা হারায় এবং প্রায়শই এমন অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় যে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় ঐ সংস্থার ভূমিকা সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়। ফলে এই শূন্যতার সুযোগ নিয়ে সাধারণ সভা নিজের শক্তি বাড়াবার জন্য অগ্রসর হয়। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতার ফলেই সাধারণ সভা "শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি" প্রস্তাব পাশ করে নিজের ক্ষমতার এক্তিয়ারকে সম্প্রসারণ করে। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে মতপার্থক্যের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ নিজের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগের যৌথ ব্যবস্থার সুপারিশ করার ব্যাপারে ঐ প্রস্তাবের দ্বারা সাধারণ সভার অগ্রসর হবার পথ

সুগম হয়। যদিও এ প্রস্তাবের আইনগত যাথার্থ সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ আছে, কিন্তু এ প্রস্তাব সাধারণ সভার কার্যধারাকে যে নতুন খাতে প্রবাহিত করে সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। নিরাপত্তা পরিষদের বন্ধ্যা অবস্থার জন্য অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে বৃহৎ শক্তিগুলিই সাধারণ সভার দ্বারস্থ হয়েছে।

সনদের ১২ নম্বর ধারায় নিরাপত্তা পরিষদকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে (স্বভাবতই সাধারণ সভাকে ঐ সব ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে) তার কার্যকারিতা হ্রাস পায়। সনদে বলা হয়েছে, যে বিষয় নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা হয় পরিষদের অনুরোধ বাদে তা সাধারণ সভা বিবেচনা করতে পারবে না। কিন্তু বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদের আলোচ্য বিষয় নিয়ে সাধারণ সভাও আলোচনা করে এবং যুক্তি বা অজুহাত হিসাবে বলা হয় যে, সাধারণ সভা ঐ বিষয়ের অন্যদিক নিয়ে আলোচনা করছে যা আইন বিরোধী নয়। অর্থাৎ আইনের ফাঁক দিয়েই সাধারণ সভা নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে নিয়েছে। এ সব ঘটনার ফলশ্রুতি হিসেবে একদিকে যেমন সাধারণ সভার উত্থান ঘটেছে, অন্যদিকে সে অনুপাতে নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

সাধারণ সভার ভারসাম্যের পরিবর্তন

বর্তমানে সাধারণ সভার ভারসাম্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে এবং ফলে এর কার্যকারিতাও কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। সাধারণ সভায় প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য দু-তৃতীয়াংশ ভোট প্রয়োজন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সাধারণ সভায় মার্কিন সরকারের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী দু-তৃতীয়াংশ সদস্যরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ছিল। তাই ঐ সময় পর্যন্ত দু-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন লাভ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন অতীতে সাধারণ সভাকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করতে এবং বিশেষ করে সোভিয়েত গোষ্ঠীর বিরোধিতা করার সুযোগ পেয়েছিল।[১] কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু রাষ্ট্র স্বাধীন হয়ে সদস্যপদ লাভ করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দু-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট হয়ে যায় এবং সাধারণ সভার ভারসাম্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। সদ্যস্বাধীন ঐ রাষ্ট্রগুলির সামান্য সংখ্যক রাষ্ট্র মার্কিন গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছে এবং কিছু সোভিয়েত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বেশির ভাগ রাষ্ট্রই কোন গোষ্ঠীতে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে একটি গোষ্ঠী গঠন করেছে। এই রাষ্ট্রগুলিই বর্তমানে 'তৃতীয় বিশ্ব" (Third World) নামে পরিচিত।

এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত দেশগুলি সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক নয়, কিন্তু এদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকার জন্য এরা কার্যত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মার্কিন নীতির বিরোধী। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রশ্নে সাধারণ সভায় এদের অবস্থান সোভিয়েত শিবিরের কাছাকাছি। সদ্যস্বাধীনতা প্রাপ্ত ঐ রাষ্ট্রগুলি জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করায় সাধারণ সভায় মার্কিন সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাস পেয়েছে এবং ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটেছে। জাতিপুঞ্জের একজন প্রাক্তন মার্কিন

---

১. "In its purpose it could well be called a grand alliance directed against the Soviet 'lock"—Politics Among Nations, Morganthau, p 489.

প্রতিনিধি এই নতুন ভারসাম্যকে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচার' (tyranny of majority) বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একদা সাধারণ সভায় মার্কিন শিবির 'সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচার' চালিয়েছে, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে তথাকথিত 'সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বেচ্ছাচার' চালাবার অধিকার থেকে আজ সে বঞ্চিত বলে ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে।

মূল্যায়ন

জাতিপুঞ্জের সনদের রূপকারগণ সাধারণ সভাকে শক্তিশালী ও কার্যকর সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁরা একে নিছক একটি প্রচারধর্মী ও আড়ম্বরপূর্ণ বিতর্ক সভায় আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। সাধারণ সভার আলোচনার বিষয়বস্তুর উপর বাধা আরোপ করা হয়েছিল এবং তারা একে নিছক একটি সুপারিশ মূলক সংস্থায় আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন এবং একে সুপারিশের ঊর্ধ্বে কোন কার্যকর ভূমিকা পালনের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। অথচ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ঐ সভারই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার দ্বারা সজ্জিত হওয়া উচিত ছিল, কারণ সাধারণ সভা পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা— ঐ সংস্থার মধ্য দিয়েই বিশ্ববিবেক তথা বিশ্বজনমত প্রতিফলিত হয়। সুতরাং সাধারণ সভার প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র এবং এখানে বিশ্ব জনমতের প্রতিফলন ঘটে বলে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

আগের আলোচনা-ধারা থেকে একথা পরিষ্কার যে সনদ রচয়িতাদের ইচ্ছাকে সম্মান প্রদর্শন না করে সাধারণ সভার উত্থান ঘটেছে এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্ট্রেকের (Strake) মতে একথা স্মরণীয় যে অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। সাধারণ সভার ক্ষমতারই শুধু সম্প্রসারণ ঘটেনি, সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর মর্যাদা ও ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটেছে। সাধারণ সভার চলার পথে আইনগত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এর বহু ব্যর্থতা থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর সাধারণ মানুষ সাধারণ সভার ওপরেই আস্থাশীল। যে কোন আন্তর্জাতিক বিরোধের পেছনে কোন-না কোন বৃহৎ শক্তির অদৃশ্য হাত থাকে, ঐ বৃহৎ শক্তিগুলির ঐক্যমতের ওপর বিশ্বশান্তি নির্ভরশীল হলে শান্তি-স্থাপন ও বিরোধ মীমাংসার আশা সুদূর-পরাহত হতে বাধ্য। তাই সাধারণ মানুষের কাছে সাধারণ সভাই আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু।

২-২. নিরাপত্তা পরিষদ
The Security Council

জাতিপুঞ্জের সনদ্ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের হাতে ন্যস্ত করেছে এবং এ উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদকে প্রভূত ক্ষমতায় সজ্জিত করতে কোন ত্রুটি রাখেনি। এ দিক থেকে বিচার করলে নিরাপত্তা পরিষদ একটি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। বস্তুত আজ পর্যন্ত কোন আন্তর্জাতিক সংগঠন নিরাপত্তা পরিষদের মত এতটা ক্ষমতার অধিকার পায়নি। সনদ প্রণেতাগণের আশা নিরাপত্তা পরিষদ কতটা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে সে আলোচনা আমরা যথাস্থানে করবো।

জাতিপুঞ্জের সনদের ২৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল যে, নিরাপত্তা পরিষদ পাঁচজন স্থায়ী এবং ছয় জন অস্থায়ী, মোট এগার জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। ১৯৬৩ সালে ২৩ নম্বর ধারাকে সংশোধন করে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে পনের করা হয়েছে—এর মধ্যে স্থায়ী সদস্য পাঁচজন এবং বাকী দশজন অস্থায়ী সদস্য।

গঠন

বর্তমানে স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণ প্রজাতান্ত্রিক চীন (কমিউনিস্ট চীন), ফ্রান্স এবং ব্রিটেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে অস্বীকার করে 'ভিটো'-এর জোরে কুয়োমিনটাং চীনকে জাতিপুঞ্জের সদস্য এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করে রেখেছিল। নিরাপত্তা পরিষদের দশ জন অস্থায়ী সদস্য সাধারণ পরিষদ দ্বারা দু বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। ঐ দশটি আসনের মধ্যে পাঁচটি আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলির জন্য, দুটি পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির জন্য, দুটি লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির জন্য এবং একটি পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির জন্য নির্দিষ্ট এবং সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

নিরাপত্তা পরিষদে পনেরটি সদস্য রাষ্ট্রের একজন করে প্রতিনিধি থাকে। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে প্রতি মাসে ইংরাজী ভাষায় নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পনের জন সদস্যের মধ্য থেকে একজন সভাপতিত্ব করেন। নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে সদস্য নয় এরূপ রাষ্ট্র যোগদান করতে পারে, কিন্তু এদের ভোটাধিকার থাকে না।

সনদের ২৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষক নিজের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন করতে পারবে। নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গঠিত কমিটিগুলির মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ কমিশন ও সামরিক কমিটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাতিপুঞ্জের সনদের ২৭ নম্বর ধারায় নিরাপত্তা পরিষদের ভোট পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ২৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিটি সদস্যের একটি করে ভোট আছে। পদ্ধতি বা প্রণালী সংক্রান্ত প্রশ্নে পরিষদের ন'টি সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতিসূচক ভোটে সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদিত হবে (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আগে ঐ সংখ্যা সাত ছিল)। এ ছাড়া অন্য সকল ব্যাপারে স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র-

ভোট পদ্ধতি

গুলির সম্মতিসূচক ভোট সহ ন'টি সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতিসূচক ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। বিবদমান সদস্য রাষ্ট্র ভোট দান থেকে বিরত থাকবে (৫২ নম্বর ধারা)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্য যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি সূচক ভোট প্রস্তাবের স্বপক্ষে লাভ করতেই হবে। অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদে যদি কোন স্থায়ী সদস্য কোন প্রস্তাবে অসম্মতি জানায় তবে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যাবে এবং একে 'ভেটো' প্রয়োগ বলে।

সুতরাং বলা যায়, নিরাপত্তা পরিষদে কোন প্রস্তাবে কোন স্থায়ী সদস্যের অসম্মতিকে 'ভেটো' বলে। ভেটো হল এক বিশেষ ধরনের অধিকার যা পরিষদের

স্থায়ী বৃহৎ ঐ পাঁচটি শক্তি ভোগ করে। ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যেরা যে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা থেকে পরিষদকে বিরত রাখতে পারে। বাস্তবে বৃহৎ শক্তিবর্গ এবং বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরষ্ট্র বহুবার নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রয়োগ করেছে। নিরাপত্তা পরিষদের অচলাবস্থা সৃষ্টি ও মর্যাদা হ্রাসের জন্য ভেটো ব্যবস্থা অনেকাংশ দায়ী।

ভেটো

সনদে যে ভাবে ভেটো প্রয়োগের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে তার ফলে দেখা যায় যে একই প্রস্তাব বা বিষয়ে কোন স্থায়ী সদস্য দুবার ভেটো প্রয়োগ করতে পারে। যেমন, কোন প্রস্তাব যাতে পদ্ধতি সংক্রান্ত বলে বিবেচিত না হতে পারে তার জন্য একবার ভেটো প্রয়োগ করে প্রস্তাবটিকে পদ্ধতিগত প্রস্তাব হিসাবে গ্রহণে বাধা দান করা এবং পরে প্রস্তাবটির বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে আর একবার ভেটো প্রয়োগ করা। ফলে একই প্রস্তাবে কোন রাষ্ট্র দুবার ভেটো প্রয়োগের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

দুবার ভেটো

নিরাপত্তা পরিষদের কার্যাবলী

সনদ প্রণেতাগণ নিরাপত্তা পরিষদকে জাতিপুঞ্জের প্রধান কার্যকর সংস্থার রূপ দিতে চেয়েছিলেন। এ জন্যই সনদের ২৪ নম্বর ধারায় জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের দায়িত্ব অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। সনদে আরও বলা হয়েছে যে, ঐ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পরিষদ যে সকল কর্তব্য সম্পন্ন করবে তা সদস্যদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে বলে ধরা হবে। তবে নিরাপত্তা পরিষদকে জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যে ও নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে কর্তব্য পালনে অগ্রসর হতে হবে।

নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও কাজ সম্বন্ধে উপরোক্ত নির্দেশক ধারার (guide line) পটভূমিকায় এবার পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করা যেতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার অভিভাবক। কারণ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কোন বিবাদ বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ঐ বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য পরিষদ বিবদমান রাষ্ট্রগুলিকে আহ্বান জানাতে পারবে। ঐ পদ্ধতিগুলির মধ্যে আছে ক. আলাপ-আলোচনা, খ. অনুসন্ধান, গ. মধ্যস্থতা, ঘ. সমন্বয় সাধন (conciliation), ঙ. সালিশী, চ. বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকরণ, ছ. আঞ্চলিক সংস্থা বা ব্যবস্থাপনার মাধ্যম গ্রহণ বা অন্য যে কোন উপায় গ্রহণ (৩৩ নম্বর ধারা)। পরিষদের প্রাথমিক চেষ্টা হবে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির মধ্যে গ্রহণযোগ্য যে কোন পদ্ধতির সাহায্যে যে কোন বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করানো। সনদে ঐ পদ্ধতিগুলিকে 'আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা' (Pacific Settlement of Disputes) পদ্ধতি বলে।

১. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা

ক. শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে মীমাংসার চেষ্টা

উপরে আলোচিত শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে কোন আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসায় যদি উপনীত হওয়া না যায় এবং পরিষদ যদি শান্তিভঙ্গের হুমকী, শান্তিভঙ্গ বা আগ্রাসী কার্যকলাপের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয় তবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা অথবা তা পুনরুদ্ধারের জন্য যে সকল ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা যায় তা নীচে আলোচনা করা হ'ল।

খ. নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

সামরিক শক্তি প্রয়োগ না করে পরিষদ বিবদমান রাষ্ট্রের সাথে আর্থনীতিক সম্পর্ক এবং রেলপথ, সমুদ্রপথ, বিমানপথ, ডাক, তারবার্তা, বেতার ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার আংশিক বা সম্পূর্ণ বিলোপের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে। পরিষদ কুটনৈতিক সম্পর্ক ছেদের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে নির্দেশ দান করতে পারে (৪১ নম্বর ধারা)।

গ. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি যথেষ্ট নয় বলে বিবেচিত হলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা অথবা তা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনে পরিষদ বিমানবাহিনী, নৌ-বাহিনী, কিম্বা স্থলবাহিনী দ্বারা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে (৪২ নম্বর ধারা)। ঐ উদ্দেশ্যে সদস্যরাষ্ট্রগুলি পরিষদকে প্রয়োজনীয় সৈন্য-বাহিনী দ্বারা সাহায্য ও সৈন্য চলাচলের অধিকার ও সুবিধা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সামরিক উপদেষ্টা মণ্ডলীর (Military Staff Committee) সহায়তায় শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের পরিকল্পনাদি প্রস্তুত করা হয়। ঐ সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলী সামরিক ব্যবস্থা, সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োগ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত সকল প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদকে পরামর্শদান ও সাহায্য করবে।

২. নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা

নিরাপত্তা পরিষদ নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষমতা ভোগ করে। মহাসচিবকে নিয়োগের ক্ষেত্রে নাম সুপারিশ করার অধিকার পরিষদের। পরিষদ স্থায়ী সদস্যসহ নটি রাষ্ট্রের সম্মতিসূচক ভোটে মহাসচিব পদে নিয়োগের জন্য নাম সুপারিশ করতে পারে। আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকদের নাম এবং জাতিপুঞ্জের নতুন সদস্য গ্রহণের সুপারিশ করার অধিকার পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। ঐ সকল ক্ষেত্রেও সুপারিশের জন্য পাঁচজন স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতিসহ নয়টি রাষ্ট্রের সম্মতিসূচক ভোট প্রয়োজন।

৩. নিরস্ত্রীকরণ ও আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ

পৃথিবীর মানবিক ও আর্থনীতিক সম্পদ যাতে অস্ত্রাদির জন্য বেশি পরিমাণে ব্যয়িত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের এবং ঐ উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর সাহায্যে অস্ত্রাদি নিয়ন্ত্রণে এবং নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে (২৬ নম্বর ধারা)। আণবিক শক্তি কমিশনের সহযোগিতায় পরিষদ আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণেও সচেষ্ট থাকবে।

৪ সনদ সংশোধন

জাতিপুঞ্জের সনদ সংশোধনের ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। কারণ সনদের সংশোধন সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হলেই চলবে না, একে কার্যকর ও বলবৎ করার জন্য পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলির সম্মতির প্রয়োজন (১০৮ নম্বর ধারা)।

সনদের ৮৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী অছিসংক্রান্ত চুক্তির শর্তাবলীর অনুমোদন এবং সেগুলি পরিবর্তন ও সংশোধনের দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদ পালন করবে। সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অছি ব্যবস্থার অন্তর্গত এলাকায় জাতিপুঞ্জের করণীয় সব কাজ নিরাপত্তা পরিষদ সম্পন্ন করবে। ঐ সকল এলাকায় রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থনীতিক এবং শিক্ষা বিষয়ক সকল দায়িত্ব পালন করবে নিরাপত্তা পরিষদ।

৫. অছিসংক্রান্ত কার্য

শান্তিভঙ্গকারী ও আগ্রাসী কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জ যদি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে তবে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে জাতিপুঞ্জ থেকে বহিষ্কার বা সাময়িকভাবে এর সদস্যপদ বাতিলের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভার কাছে সুপারিশ করতে পারে। এ ছাড়াও কোন সদস্য রাষ্ট্র সনদের আদর্শ ও নীতিকে ক্রমাগত অমান্য করলে পরিষদ সনদের ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী ঐ সদস্য রাষ্ট্রকে জাতিপুঞ্জ থেকে বহিষ্কারের জন্য সাধারণ সভার কাছে সুপারিশ করতে পারে।

৬. বহিষ্কার ও সদস্যপদ বাতিল

সমালোচনা এবং মূল্যায়ন

নিকোলাস তাঁর *The United Nations as a Political Institution* গ্রন্থে বলিয়াছেন, কথার সাথে কাজের ব্যবধানের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে নিরাপত্তা পরিষদ জাতিপুঞ্জের অন্য সকল সংস্থা বা অঙ্গকে অতিক্রম করেছে। সনদের প্রণেতাদের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে প্রত্যাশা ছিল গগনচুম্বী, কিন্তু তা পূরণ করার বাস্তব অবস্থা ও সম্ভাবনার ছিল ঘাটতি। পরিষদের কার্যকারিতা নির্ভর করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে বৃহৎ শক্তিবর্গ অর্থাৎ ভেটো ক্ষমতার অধিকারী পাঁচটি শক্তি কতটা পরিমাণে ঐক্যমত বজায় রাখতে সমর্থ হবে তার ওপরে। কারণ সনদ অনুযায়ী যে কোন প্রস্তাব গ্রহণের জন্য পরিষদের উপরোক্ত পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন বাধ্যতামূলক। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে যে, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিবর্গ বিভক্ত এবং নিজ নিজ স্বার্থরক্ষা বা গোষ্ঠী ও আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার জন্য এরা ভেটো প্রয়োগ করে পরিষদের প্রস্তাবকে বানচাল করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছে—আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার অভিভাবকেরা প্রয়োজনের সময়ে ঐক্যমত হয়ে কোন কার্যকর প্রস্তাব গ্রহণ এবং ভূমিকা পালনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সক্ষম হয়নি। কোরিয়া, কাঙ্গো, সিরিয়া, লেবানন ও ভিয়েতনামের ঘটনাবলী ও আরব রাষ্ট্রে ইস্রায়েল আক্রমণ এর প্রমাণ।

গগনচুম্বী প্রত্যাশা পূরণের অন্তরায় ভেটো ব্যবস্থা

সনদ প্রণেতাগণ মনে করেছিলেন যে, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক-শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। কিন্তু দু বা তিন শিবিরে বিভক্ত বিশ্বে কোন সমস্যার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চীনের ঐক্যমত হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। এদের মধ্যে নীতি, আদর্শ ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য খুব বেশি বলে ভেটোর প্রয়োগও খুব বেশি। বস্তুত আন্তর্জাতিক যে কোন বিবাদের সাথে

বৃহৎ শক্তির ঐক্যমতের ভ্রান্ত ধারণা

কোন-না কোন বৃহৎ শক্তি জড়িত থাকে। স্বভাবতই প্রতিটি আন্তর্জাতিক সমস্যা ও বিবাদে বৃহৎ শক্তিবর্গ ঐক্যমত হবে এরূপ আশা অবাস্তব উচ্চাশা মাত্র।

একথা স্বীকার করতে হবে যে, বিশ্বের অধিকাংশ শান্তিভঙ্গ এবং আগ্রাসী কাজের পেছনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ও কাজকর্ম দায়ী। যেমন কাশ্মীরে পাকিস্থানী হামলার পেছনে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন সম্মতি ও সহানুভূতি। স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী সাহায্যপুষ্ট হামলা প্রতিরোধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে ভেটো প্রয়োগ ছাড়া কোন বিকল্প নেই। এ অবস্থায় ভেটো ব্যবস্থাকে বজায় রেখে পরিষদকে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় কার্যকরী করে তোলা সম্ভব নয়। এ ব্যবস্থার কোন প্রতিকার না করে মার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ সাধারণ সভার সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য "শান্তির জন্য ঐক্যবন্ধ হচ্ছি" প্রস্তাবের দ্বারা নিরাপত্তা পরিষদকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে সাধারণ সভাকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার অভিভাবকে পরিণত করার চেষ্টা করে। গুডউইনের (Goodwin) ভাষায় বলা যায়, সাধারণ সভার সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কাজে লাগিয়ে জাতিপুঞ্জকে কামউনিস্ট বিরোধী শিবিরে পরিণত করার জন্য মার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিমী শক্তিবর্গ সাধারণ সভার দিকে ঝুঁকেছিল।[১] ফলে সাধারণ সভার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে। (Rise of the Assembly and Decline of the Security Council)। কিন্তু সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলি বেশি সংখ্যায় জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করায় কিছুদিনের মধ্যে সাধারণ সভায় মার্কিন সংখ্যাধিক্য লোপ পায় এবং মার্কিন ইচ্ছায় সাধারণ সভা পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

নিরাপত্তা পরিষদের মর্যাদার অবনতি

নিরাপত্তা পরিষদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসা (Pacific Settlement of Disputes) পদ্ধতি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি মত ও পথের পার্থক্যগত কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনই ঐক্যমত হতে পারেনি। ফলে নিরাপত্তা পরিষদ কখনই একটা ঐক্যবদ্ধ টীম হিসাবে শান্তিপূর্ণ উপায় বলবৎ করার মত চাপ ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। ছোট ও মাঝারি শক্তির বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও বড় বড় শক্তিগুলির ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ অসহায় একই কারণে পরিষদ বিবর্তনমূলক ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণেও সাফল্যলাভ করতে পারেনি। জাতিপুঞ্জের নিজস্ব সৈন্য-বাহিনী না থাকার অন্য রাষ্ট্রের মর্জির উপর জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী পাঠানো নির্ভর করে। জাতিপুঞ্জের দ্বারা নিয়োজিত সৈন্যবাহিনীর নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সংশয় দানা বেধে ওঠে যখন দেখা যায় যে, জাতিপুঞ্জের সৈন্য-বাহিনীর উপস্থিতিতে কঙ্গোর জনপ্রিয় দেশপ্রেমিক প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বাকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হত্যা করে।

শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ব্যর্থ

---

১. "Then the Western Powers led by the United States went to the General Assembly with a view to exploit their voting majority in the Assembly to turn the U.N. into an anti-Communist front."

নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতার জন্যই নিকোলাস মন্তব্য করেছেন যে, নিবিড় ও অন্তরঙ্গ পরিবেশে বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও পরিষদ কখনও একটি সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে ওঠেনি এবং যৌথ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি—পরিষদকে সর্বদাই পনের জন আলাদা আলাদা ব্যক্তির সমাবেশ বলে মনে হয়েছে।

বর্তমান শতকের ষাটের দশকে পরিষদের ভূমিকার অবনতি কিছুটা পরিমাণে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। ঐ সময়ে কঙ্গো ও সাইপ্রাসের ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদকে কার্যকর করা হয়। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত বিরোধ, কিউবা ও স্যাণ্টোডোমিঙ্গে বিরোধ নিরাপত্তা পরিষদ মোকাবিলা করে। তবে রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে পরিষদ এখনও কোন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। পরিষদের ক্ষমতা ও মর্যাদার অবনতি রোধ করার জন্য পরিষদ ১৯৭০ সালে সিদ্ধান্ত করে যে, এই সংস্থার বৈঠক নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হবে এবং অধিবেশনে সদস্য রাষ্ট্রগুলি মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি পাঠাবে এবং ঐ বৈঠকগুলি হবে গোপন বৈঠক।

পরিষদের ক্ষমতা হ্রাস প্রতিরোধের চেষ্টা

সাধারণ সভার ভারসাম্য পরিবর্তনের জন্য পশ্চিমী গোষ্ঠী আর তাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারছে না। ফলে নিরাপত্তা পরিষদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে একে কার্যকরী করার জন্য নতুন প্রয়াস শুরু হয়েছে।

১-৩. আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ

The Economic and Social Council

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ রচয়িতারা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির সামাজিক ও আর্থনীতিক প্রগতির উপর বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বহুলাংশে নির্ভর করে। পৃথিবীর জনসংখ্যার বেশির ভাগকে সামাজিক ও আর্থনীতিক দিক থেকে দুর্বল রেখে আন্তর্জাতিক শান্তির স্বপ্নসৌধ রচনা স্থায়ী হতে পারে না। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও জীবন ধারণের মান উন্নতি কল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ নামে একটি সংস্থাকে জাতিপুঞ্জের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

জাতিপুঞ্জের সনদের ৫৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন জাতির সম অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতির প্রতি সম্মানের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্যই স্থিতিশীলতা এবং কল্যাণময় অবস্থা সৃষ্টির জন্য জাতিপুঞ্জ সচেষ্ট থাকবে। ঐ উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জ ঃ

১. উন্নততর জীবনমান, পূর্ণ-কর্মসংস্থান এবং আর্থনীতিক ও সামাজিক প্রগতির পরিবেশ রচনায় সচেষ্ট থাকবে ;

২. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থনীতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানে এবং আন্তর্জাতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত সহযোগিতা বৃদ্ধির চেষ্টা করবে ;

৩. জাতি, ধর্ম, ভাষা ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বজনীন সম্মান প্রদর্শন ও তা পালন করার জন্য সচেষ্ট থাকবে।

মূল সনদে আঠার জন সদস্য নিয়ে সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছিল এবং পরে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে আঠাশ জন করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে সদস্যসংখ্যা আবার বৃদ্ধি করে ৫৪ জন করা হয়।[১] সনদের

গঠন

৬১ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রতি বছর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য তিন বছরের জন্য সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হয়। ফলে প্রতিবছর ১৮ জন সদস্য অবসর গ্রহণ করে। অবসরপ্রাপ্ত সদস্য পুনর্নির্বাচিত হতে পারে। আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের একজন করে প্রতিনিধি থাকে এবং প্রত্যেকের একটি করে ভোট থাকে। যাতে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরা সব সময়েই নির্বাচিত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়।

কার্যাবলী ও ক্ষমতা

এবার আমরা আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যাবলী আলোচনা করব। যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ রূপায়ণের জন্য আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা সনদের ৬২ হইতে ৬৬ ধারায় ঐ সংস্থার কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। এগুলি হ'ল :

১. আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ যে কোন আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বা ঐ সকল বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যাপারে

সুপারিশমূলক কার্য

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারবে এবং ঐ সম্পর্কে সাধারণ সভা বা কোন সদস্য রাষ্ট্র বা জাতিপুঞ্জের যে কোন বিশেষজ্ঞ সংস্থার (Specialised Agency) কাছে সুপারিশ পেশ করতে পারবে। এ ছাড়া সকলের জন্য প্রযোজ্য মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং ঐগুলি পালনের উদ্দেশ্যে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ সুপারিশ করতে পারবে।

২. নিরাপত্তা পরিষদ নিজের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে প্র[illegible]াদি রচনা করে সাধারণ সভায় পেশ করতে পারবে। এ ছাড়াও নিজের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে পরিষদ আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করতে পারবে।

৩. আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যধারা খুবই জটিল। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থা এবং সাধারণ পরিষদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যম

প্রস্তাব পেশ ও সম্মেলন আহ্বান

হিসাবে এ সংস্থাকে কাজ করতে হয়। আর্থনীতিক পরিষদের কার্যাবলী প্রধানত বিভিন্ন কমিশন ও বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ঐ কমিটিগুলির কয়েকটির কার্যাবলীর সাথে পরিষদ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, এ ছাড়া কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে যাদের কাজের অংশ-বিশেষের সাথে কমিশন জড়িত। যা হোক বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ,

১. ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে সাধারণ সভার ২৮৪৭ নম্বর প্রস্তাবে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৫৪ করা হয়।

আলোচনা এবং সুপারিশের মাধ্যমে পরিষদ বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির কাজের সমন্বয় সাধন করে।

৪. বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের কাছ থেকে তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে পরিষদ প্রতিবেদন আদায় করতে পারে এবং ঐ প্রতিবেদনগুলিতে নিজের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে তা সাধারণ সভায় পাঠাতে পারে।

৫. আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে এবং নিরাপত্তা পরিষদ অনুরোধ করলে তাকে সাহায্য করে।

৬. সাধারণ সভার সুপারিশ সহ আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজ এ সংস্থা সম্পন্ন করে। সনদের অন্যত্র লিপিবদ্ধ বা সাধারণ সভা কর্তৃক অর্পিত কার্যাবলী পরিষদ সম্পন্ন করে।

সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিষদের প্রধান দায়িত্ব পালন করে সাতটি কমিশন। এগুলি হল : পরিসংখ্যান কমিশন, জনসংখ্যা কমিশন, সামাজিক কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, সংখ্যালঘু রক্ষা কমিশন, নারীর মর্যাদা রক্ষা কমিশন, উত্তেজক মাদক-দ্রব্য কমিশন। এ ছাড়াও চারটি আঞ্চলিক আর্থিক কমিশন আছে। ঐগুলি হল ইউরোপীয় আর্থিক কমিশন (ECE), এশিয়া ও দূর প্রাচ্য আর্থিক কমিশন (ECAFE), লাতিন আমেরিকা আর্থিক কমিশন (ECLA) এবং আফ্রিকা আর্থিক কমিশন (ECA) ইত্যাদি। আঞ্চলিক কমিশনগুলি নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশের সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের ব্যাপারে জাতিপুঞ্জের অনেক বিশেষজ্ঞ সংস্থার কাজকর্ম আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের সাথে যুক্ত। এজন্য তেরটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা আছে। জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক (UNESCO), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), শিশু সাহায্য ভাণ্ডার (UNICEF), আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (IMF) ইত্যাদি সংস্থার নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

সমালোচনা ও মূল্যায়ন

১. আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদকে কোন প্রশাসনিক বা আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা দেয়া হয়নি। এ সংস্থার ক্ষমতা মূলত সুপারিশমূলক। সুতরাং ইচ্ছা থাকলেও ঐ সীমাবদ্ধতার জন্য পরিষদের পক্ষে উদ্যোগী হয়ে কোন কাজ রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। এ সংস্থাকে জাতিপুঞ্জের একটি প্রধান সংস্থা বলে চিহ্নিত করা হলেও বাস্তবে একে সাধারণ সভার অধীনে থেকে কাজ করতে হয়। তাই পরিষদকে সাধারণ সভার কাছে অত্যধিক নির্ভরশীল থাকতে হয়।

২. আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ কি কাজ করবে এবং কিভাবে করবে সে সম্পর্কে সনদে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। নিকোলাস যথার্থই বলেছেন যে, আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ সম্পর্কে ধ্যান ধারণা গোড়া থেকেই অস্পষ্ট থেকে গিয়েছে। সনদ পাঠ করে মনে হয় আর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এর প্রধান কাজ নয়। ডঃ লাভডে-কে অনুসরণ করে বলা যায়, আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ যেন আর্থিক ও সামাজিক বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের যন্ত্র এবং নিজেই যেন সমন্বয় সাধনের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিকোলাস আরও মনে করেন যে, একই

সাথে এক দিকে পরিষদ নিজেই বিশেষজ্ঞ সংস্থা হিসাবে পরিগণিত হওয়ায় এবং অন্যদিকে বিভিন্ন বিশেষ সংস্থার তদারকির দায়িত্ব লাভ করায় পরিষদের সাথে সাধারণ সভার প্রকৃতি নির্ধারণ সন্তোষজনক হয়নি।

৩. আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের সাথে সংশ্লিষ্ট অপ্রধান অঙ্গের সংখ্যা খুব বেশি এবং ঐ সকল সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জটিল দায়িত্ব পালনে পরিষদ খুব বেশি সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি ভেঙ্গে দিলে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত সমন্বয় সাধন সহজতর হবে এবং জাতিপুঞ্জের ব্যয়ও অনেক হ্রাস পাবে।

৪. বিশ্বে আর্থনীতিক ও সামাজিক কাজে আত্মনিয়োগের সুযোগ পরিষদের খুবই কম, তাই অনেক ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ এবং সেগুলির বিন্যাসের মধ্যেই পরিষদের কাজ সীমাবদ্ধ।

৫. জাতিপুঞ্জের 'মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা' (Declaration of Human Rights) বাস্তবায়িত হতে পারেনি। সাধারণ সভা ও মানবিক অধিকার কমিশনের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার দায়িত্ব পরিষদের উপর অর্পিত বলে ঐ ব্যর্থতার দায়িত্ব পরিষদকেই বহন করতে হয়।

তবে সমস্ত ব্যর্থতার জন্য আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদকে দায়ী করা ঠিক হবে না। জাতিপুঞ্জের জটিল কর্মধারা, বৃহৎ শক্তিবর্গের সদিচ্ছার অভাব, বিভিন্ন রাষ্ট্রের দর কষাকষির মনোভাব পরিষদের ব্যর্থতার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

মূল্যায়ন

পরিষদের ঐ সকল ব্যর্থতা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে জাতিপুঞ্জের আশার প্রদীপটিকে এখনও পরিষদই জ্বালিয়ে রেখেছে। আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ ক্রমশ অনেক বেশি বাস্তবধর্মী হয়ে উঠছে। ফলে, কাঠামো ও কর্মধারা সংক্রান্ত অসুবিধা ও এর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে পরিষদ ক্রমশ সাফল্য অর্জন করছে। নিকোলাস মনে করেন যে, সামাজিক বিষয় অপেক্ষা আর্থিক ব্যাপারে, পৃথিবী-ব্যাপী কর্মসূচী অপেক্ষা আঞ্চলিক পর্যায়ে কাজকর্মে এবং সার্বজনীন প্রয়োজন মেটাবার ব্যাপারে পরিষদ বেশি সাফল্য অর্জন করেছে।

১-৪ অছি পরিষদ

The Trusteeship Council

জাতিপুঞ্জের অন্যতম প্রধান সংস্থা অছি পরিষদ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে অছি ব্যবস্থা কাকে বলে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ৮০০ মিলিয়ন মানুষ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে বাস করত। যুদ্ধের পরে ৬০০ মিলিয়ন মানুষ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হলেও তখনও ব্যাপক সংখ্যক জনগণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ঐ ব্যাপক সংখ্যক জনগণের অবস্থার এবং চেতনার মানের উন্নতি করে

অছি ব্যবস্থা

স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত করে তোলা শুধু মাত্র আন্তর্জাতিক মানবিক দায়িত্ব নয়, তা পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যও অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে এবং জাতিপঞ্জের অছি

ব্যবস্থাকে ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার উন্নত ও সম্প্রসারিতরূপ হিসাবে অভিহিত করা যায়। জাতিপুঞ্জের সনদের ৭৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী যে সকল অঞ্চলের উপর অছি ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে তা হ'ল ঃ

ক. জাতিসংঘের আমলে ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহ,

খ. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে শত্রুরাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা অঞ্চল-সমূহ এবং

গ. যে সকল অঞ্চলকে ঐগুলির প্রশাসনের দায়িত্ববদ্ধ রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় অছি ব্যবস্থার অধীনে উপস্থাপিত করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যে সকল অঞ্চল জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করেছে তাদের ক্ষেত্রে অছি ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না।

জাতিপুঞ্জের সনদের ৮৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী অছি পরিষদ জাতিপুঞ্জের নিম্নলিখিত সদস্যদ্বারা গঠিত হবে ঃ

১. অছিভুক্ত অঞ্চলসমূহের শাসনের দায়িত্ব আছে এমন রাষ্ট্রসমূহ,

২. অছিভুক্ত অঞ্চলের শাসক নয়—নিরাপত্তা পরিষদের এরূপ স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রসমূহ,

৩. সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বছরের জন্য এমন সংখ্যক সদস্য রাষ্ট্র নির্বাচিত হবেন যাতে অছি পরিষদের অছিভুক্ত এলাকার শাসনকারী এবং অছিভুক্ত এলাকার শাসনকারী নয় এরূপ রাষ্ট্রের সংখ্যা সমান হয়। অছি অঞ্চল হ্রাস পাবার সাথে সাথে অছি পরিষদের সদস্যসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। অছি পরিষদকে সভাপতি নির্বাচন পদ্ধতিসহ নিজস্ব আইন-কানুন রচনার অধিকার দেয়া হয়েছে।

অছি পরিষদের প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র এই সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন যোগ্য প্রতিনিধি পাঠাবে। অছি পরিষদ সাধারণভাবে সাধারণ সভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। তবে সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের (strategic areas) জন্য নিরাপত্তা পরিষদের কাছে এই সংস্থা দায়িত্বশীল থাকে।

অছি পরিষদ যখন গঠিত হয়েছিল তখন অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইটালী, ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীনে ১১টি অছিভুক্ত এলাকা ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ঐ হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকা নিজের ম্যাণ্ডেটভুক্ত এলাকাকে অছিভুক্ত করতে অস্বীকার করে। যা হোক একে একে অছিভুক্ত অঞ্চলগুলি স্বাধীনতা লাভ করায় বর্তমানে অছিভুক্ত এলাকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র তিনটি। এদের মধ্যে দুটির স্বাধীনতাও আসন্ন।

অছিভুক্ত অঞ্চল

অছি পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট আছে এবং উপস্থিত ও ভোটে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের দু-তৃতীয়াংশ ভোটে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (৮৯ নম্বর ধারা)।

ভোট ব্যবস্থা

জাতিসংঘের ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থা থেকে অছি পরিষদ বিস্তৃত ক্ষমতার অধিকারী, অধিক শক্তিশালী এবং অধিকতর উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতিপুঞ্জের সনদের ৭৬ নম্বর ধারায় অছি ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে ঃ ১. আন্তর্জাতিক

শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান; ২. অছি ব্যবস্থার অধীনস্থ অঞ্চলকে সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার উন্নয়নের দ্বারা স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার উপযোগী করা; ৩. জাতি, ধর্ম, ভাষা ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে উৎসাহিত করা এবং ৪. জাতিপুঞ্জের সব সদস্য রাষ্ট্রকে সামাজিক, আর্থনীতিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে সমান সুযোগ দান।

উদ্দেশ্য

অছি পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সাধারণ সভার অধীনে অছি পরিষদ নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পন্ন করবে:

কার্যাবলী ও ক্ষমতা

১. অছিভুক্ত অঞ্চলের প্রশাসকদের প্রতিবেদন বিবেচনা করা;

২ অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে ঐ অভিযোগগুলি পরীক্ষা করা;

৩. সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে সময়সূচী আলোচনা করে মাঝে মাঝে অছিভুক্ত এলাকা পরিদর্শন করা;

৪. অছি চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫. সনদের ৮৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী অছিভুক্ত অঞ্চলের জনগণের রাজনৈতিক, আর্থনীতিক. সামাজিক এবং শিক্ষাসংক্রান্ত অগ্রগতি সম্পর্কে একটি প্রশ্নমালা অছি পরিষদ প্রস্তুত করবে এবং সাধারণ সভার দায়িত্বাধীন প্রতিটি অছিভুক্ত অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঐ প্রশ্নমালার ভিত্তিতে সাধারণ সভার কাছে বাৎসরিক প্রতিবেদন উপস্থিত করবে।

সমালোচনা ও মূল্যায়ন

জাতিপুঞ্জের সব প্রধান সংস্থাগুলির মধ্যে অছি পরিষদই সবচেয়ে সাফল্য অর্জন করেছে। অছি পরিষদে অছি অঞ্চলের প্রশাসক রাষ্ট্রের সংখ্যা মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেক বলে অছি পরিষদে অনেক সময় প্রশাসক রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত লওয়া সম্ভব হয়নি। গঠনগত এই ত্রুটি না থাকলে অছি পরিষদ আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারত।

অছি পরিষদ যখন গঠিত হয় তখন অছিভুক্ত এলাকা ছিল এগারটি: অস্ট্রেলিয়ার অছিভুক্ত বা প্রশাসনের অধীনে নিউগিনি ও নাওরু; বেলজিয়ামের অছিভুক্ত রুয়ান্ডা-উরুন্ডি; ফ্রান্সের অছিভুক্ত ফরাসী ক্যামেরুন্স ও টোগোল্যান্ড; ইটালীর অছিভুক্ত সোমালিল্যান্ড; নিউজিল্যান্ডের অছিভুক্ত পশ্চিম সামোয়া; ব্রিটেনের অছিভুক্ত দক্ষিণ ক্যামেরুন্স, টোগোল্যান্ড ও টাঙ্গানিকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অছিভুক্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ আফ্রিকার অছিভুক্ত দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে ঐ হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকা নিজের ম্যান্ডেটভুক্ত অঞ্চলকে অছিভুক্ত করতে অস্বীকার করে।

যা হোক, উপরোক্ত ১১টি অছিভুক্ত অঞ্চলের মধ্যে ১৯৬০ সাল থেকে একে একে ৮টি অঞ্চল স্বাধীনতা লাভ করেছে। বর্তমানে অছিভুক্ত এলাকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে

মাত্র তিনটি। এগুলি হল রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি, দক্ষিণ ক্যামেরুন্স্ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ। এদের মধ্যে প্রথম দুটি অঞ্চলের স্বাধীনতাও আসন্নপ্রায়। সুতরাং অছি পরিষদ যে নিজের ক্ষমতা ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অছিভুক্ত অঞ্চলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় অছি পরিষদের সদস্যসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং কাজের পরিমাণও কমেছে। তাই বছরে দুবারের বদলে এখন অছি পরিষদের অধিবেশন বসে বছরে একবার। বর্তমানে এই সংস্থাকে আর টিঁকিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

৩-৫. আন্তর্জাতিক বিচারালয়

International Court of Justice

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের আইনসঙ্গত সুষ্ঠু মীমাংসা করে ন্যায় ও শান্তিকে নিশ্চিত করতে না পারলে যে কোন সময়ে ঐ সকল বিরোধকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা থেকে যায়। তাই রাষ্ট্রসংঘের সময় থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ বিচার করার জন্য স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপন করা হয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জও তার অন্যতম প্রধান সংস্থা হিসেবে একটি আন্তর্জাতিক আদালত স্থাপন করেছে।

আন্তর্জাতিক আদালতের কার্য পদ্ধতি ও গঠন ঐ বিচারালয় প্রণীত 'বিধি' (Statute) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হয়। পনের জন বিচারপতি নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত। প্রতি তিন বছর অন্তর পাঁচ জন করে বিচারপতি অবসর গ্রহণ করেন এবং পদগুলি নির্বাচনের দ্বারা পূরণ করা হয়। অর্থাৎ বিচারপতিরা ন'বছরের জন্য নির্বাচিত হন। বিচারপতিদের পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে। জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সংস্থার মত এখানে রাষ্ট্র প্রতিনিধিত্ব করে-না, বিচারপতিরা ব্যক্তিগত যোগ্যতায় নির্বাচিত হন। বিচারালয়ের বিধি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক আইনে যোগ্যতাসম্পন্ন সে সকল আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক পদে নিয়োগ করা হয় যাঁরা প্রশংসনীয় নৈতিক চরিত্রের অধিকারী এবং যাঁরা নিজেদের দেশের সর্বোচ্চ আদালতে নিয়োগের যোগ্য। সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদ স্বতন্ত্রভাবে গোপন ব্যালটে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিচারকদের নির্বাচিত করে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারকেরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতিকে তিন বছরের জন্য নিয়োগ করে। এ ছাড়াও বিচারালয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সদর দপ্তর হেগ শহরে অবস্থিত।

গঠন

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ১৫ জন বিচারক নির্বাচনে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। চীন ছাড়া অন্য চারটি বৃহৎ শক্তি থেকে একজন করে, পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে একজন, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি থেকে দুজন, এশিয়া থেকে তিনজন, আফ্রিকা থেকে তিনজন এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলি থেকে দুজন বিচারক নির্বাচন করা হয়।

জাতিপুঞ্জের সব সদস্যরাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আদালতের শরিক। জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রও নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে ঐ আদালতের শরিক হতে পারবে। বিরোধের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রগুলি এবং নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে সদস্য নয় এমন যে কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিরোধ ঐ আদালতে উপস্থিত করতে পারে। অনেক রাষ্ট্রই নির্দিষ্ট কয়েকটি বিরোধ ঐ বিচারালয়ে উপস্থিত করবে বলে "স্বীকৃতিমূলক শর্তে" স্বাক্ষর করেছে। জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলি কোন বিবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলে আদালতের সিদ্ধান্ত মান্য করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। কোন পক্ষ আদালতের নির্দেশ মান্য না করলে অপর পক্ষ নিরাপত্তা পরিষদের কাছে প্রতিবিধানের জন্য আবেদন করতে পারে।

আদালতের এক্তিয়ার ও কার্যাবলী

আন্তর্জাতিক আদালতের এক্তিয়ার ও কার্যাবলীকে তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

১. স্বেচ্ছামূলক এলাকা ঃ সনদের ৩৬(৩) ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন বিবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিধি অনুযায়ী বিরোধকে মীমাংসার জন্য ঐ বিচারালয়ে উপস্থিত করতে পারবে। অর্থাৎ স্বেচ্ছামূলক ভাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষ যে সব বিরোধকে ঐ বিচারালয়ে উপস্থিত করবে আদালত তা বিচার করবে।

২. আবশ্যিকতামূলক এলাকা ঃ প্রচলিত যে সকল আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তিপত্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের এক্তিয়ারের কথা বলা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে বিচারালয়ের বিচার-বিবেচনার এক্তিয়ার থাকবে। দ্বিতীয়ত, কোন চুক্তি বাদেই আন্তর্জাতিক আদালতের বিধি অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যাপারে আদালতের এক্তিয়ারকে মানতে সদস্যরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারে এবং আদালত ঐগুলি বিচারবিবেচনা করতে পারে। এগুলি হল ঃ ক. কোন চুক্তি বা সন্ধির ব্যাখ্যা, খ. আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন, গ. প্রমাণ সাপেক্ষ আন্তর্জাতিক বাধ্য-বাধকতা ভঙ্গের ব্যাপার, ঘ. আন্তর্জাতিক বাধ্য-বাধকতা ভঙ্গের ব্যাপারে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ণয়। এ বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক আদালতে উপস্থিত করা সদস্য রাষ্ট্রগুলির পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু একবার উপস্থিত করলে তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়।

৩. পরিদর্শনমূলক এলাকা ঃ সাধারণ সভা বা নিরাপত্তা পরিষদ বা জাতিপুঞ্জের অন্য কোন সংস্থা বা অঙ্গ অনুরোধ করলে আন্তর্জাতিক আদালত আইনের ব্যাখ্যা বা আইনসংক্রান্ত প্রশ্নে উপদেশমূলক বা পরামর্শমূলক অভিমত জ্ঞাপন করতে পারে।

বিরোধ মীমাংসার নীতিসমূহ

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে বিচারালয় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রয়োগ করবে ঃ ক. সাধারণ বা বিশেষ আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা জাত এবং বিবদমান রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক স্বীকৃত নিয়মাবলী, খ. আইন হিসাবে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক প্রথাসমূহ, গ. সদস্য রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক স্বীকৃত আইনের সাধারণ নীতিসমূহ এবং ঘ. বিশিষ্ট আইন-বিশারদদের বিচার-বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা।

সমালোচনা ও মূল্যায়ন

১. আন্তর্জাতিক আদালতের গঠন ও ক্ষমতার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকার জন্য এই আদালতকে চরম বা চূড়ান্ত আন্তর্জাতিক আদালত বলা যায় না। মরগেনথু (Morgenthau) যথার্থই বলেছেন যে, কোনো অর্থেই আন্তর্জাতিক আদালত বিশ্বের সুপ্রীম কোর্ট নয়। কারণ এর চরম কর্তৃত্ব নেই এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে এখানে আপীল করা যায় না।

২. আন্তর্জাতিক আদালতের রায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা আছে বলে অনেকে মনে করেন। বিচারকদের যে নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত ও পক্ষপাতহীন মানসিকতা থাকা প্রয়োজন তা এ আদালতের বিচারকদের পক্ষে রক্ষা করা কঠিন। কিছুদিন আগে আন্তর্জাতিক আদালত দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার ওপর দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ায় নিকোলাস মন্তব্য করেছেন যে, এ আদালত যদি অতিরিক্ত মাত্রায় রাজনৈতিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ে তাহলে আদালত হিসাবে এর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য।

৩. আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকেরা উচ্চমানের পরিচয় দিয়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সক্ষম হলেও সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে এ বিচারালয়ের কাছ থেকে যতটা প্রত্যাশা করা গিয়েছিল তা পূর্ণ হয়নি। বরং আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের অপেক্ষা জাতিসংঘের স্থায়ী বিচারালয় অধিকতর সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

৪. আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাছে কেবলমাত্র রাষ্ট্রসমূহই বিরোধ পেশ করতে পারে। কিন্তু জাতিপুঞ্জসহ কোন আন্তর্জাতিক সংগঠন কোন বিরোধ সংক্রান্ত মামলা নিয়ে এ আদালতের নিকট বিচার প্রার্থনা করতে পারে না।

৫. এই আদালতের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ত্রুটি হল যে, এই বিচারালয়ের এক্তিয়ার ও রায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। 'ঐচ্ছিক ধারা'-র সংযোজন-এর ফলে আদালতের এক্তিয়ার এড়াবার পথ সুগম হয়েছে।

এ সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক আদালতের সাফল্য অস্বীকার করা যায় না। আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আদালত বহু বিরোধের মীমাংসা করেছে। এদের মধ্যে ইংরাজ সরকারের অ্যাংলো-ইরাণীয় তৈল কোম্পানীর জাতীয়করণ সংক্রান্ত বিরোধ, মরোক্কোয় মার্কিন নাগরিকদের স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে বিরোধ, ভারত ও পর্তুগালের মধ্যে নগর ও দাদার হাভেলী নামক দুটি স্থানে যাতায়াতের অধিকার সম্পর্কে বিরোধ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ আদালত যে সকল ক্ষেত্রে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি সে সকল ব্যাপারে জাতিপুঞ্জের দায়িত্ব কম নয়। জাতিপুঞ্জ কখনও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেনি। জাতিপুঞ্জ অনেক ক্ষেত্রেই আইন ও বিচারের প্রক্রিয়া উপেক্ষা করে রাজনৈতিক উপায়ে সমস্যাকে মোকাবিলার পথ বেছে নিয়েছে। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কার্যকর ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়নি।

মূল্যায়ন

৩-৬. সচিবালয়
The Secretariat

জাতিপুঞ্জের সনদের ৯৭তম ধারা অনুযায়ী একজন মহাসচিব ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়ে সচিবালয় গঠিত হবে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ সভা মহাসচিবকে নিযুক্ত করে। মহাসচিব জাতিপুঞ্জের মুখ্য কর্মসচিব-এর দায়িত্ব পালন করেন। সচিবালয়ের কর্মীদের পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু সচিবালয়ের বাইরের কোন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তারা নির্দেশ গ্রহণ করতে পারবে না। সনদে জাতিপুঞ্জের কর্মীদের আন্তর্জাতিক দায়িত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সচিবালয়ের কর্মীদের নিয়োগ করেন মহাসচিব।

গঠন

সচিবালয় দপ্তরকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। জাতিপুঞ্জ ও এর প্রতিনিধিদের ব্যবহারের জন্য তথ্য পরিবেশনা, জাতিপুঞ্জের আলোচনা ও প্রস্তাবগুলি জাতিপুঞ্জের পত্রিকার প্রকাশনা, জনতথ্য দফতরের মারফত পত্র-পত্রিকা ও সংবাদ বিতরণ, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য গবেষণা পরিচালনা করা সম্পাদকীয় দপ্তরের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। জাতিপুঞ্জের আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব মহাসচিবের মাধ্যমে সাধারণ সভায় উপস্থিত করার দায়িত্ব সচিবালয় দপ্তরের উপর ন্যস্ত। দপ্তরের কাজকর্মের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য কয়েকটি বিভাগ আছে। প্রধান প্রধান বিভাগগুলি হল: রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা পরিষদ সংক্রান্ত বিভাগ, আর্থনীতিক বিভাগ, সামাজিক বিভাগ, অছি পরিষদ সংক্রান্ত বিভাগ, শাসন ব্যবস্থা ও অর্থ সংক্রান্ত বিভাগ, আইন বিভাগ এবং প্রচার বিভাগ। সচিবালয় দপ্তরের কাজকর্ম, কর্মীসংখ্যা ও গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে দপ্তর পরিচালনার ব্যয়ও বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৬ সালে দপ্তর পরিচালনার ব্যয় ছিল ১৯.৩ মিলিয়ন ডলার। ১৯৬৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৪০.৪ মিলিয়ন ডলার।

কার্যাবলী

ঐ সব কাজকর্ম ছাড়াও সচিবালয়ের কর্মচারীদের কিছু কিছু রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ভূমিকা পালন করতে হয়। জাতিপুঞ্জের কর্মচারীদের এমন এক অবস্থায় কাজ করতে হয় যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘিষ্ঠরা গ্রহণ করতে নাও পারে বা একজনের অসম্মতিতে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যেতে পারে। স্বভাবতই এ অবস্থায় রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক তৎপরতা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়।

মহাসচিব (The Secretary General)

সচিবালয়ের প্রধান বা মুখ্য প্রশাসক হলেন মহাসচিব। আগেই বলা হয়েছে যে মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ ক্রমে সাধারণ সভা দ্বারা নির্বাচিত হন (৯৭তম ধারা)। মহাসচিব নিয়োগের ব্যাপারে এমন একটি নাম খুঁজে বের করতে হয় যাঁর নাম নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরা সুপারিস করতে প্রস্তুত। নরওয়ের ট্রিগভি লাই (Trygve Lie) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম মহাসচিব। ইহার পর মহাসচিব হন দাগ হ্যামারশিল্ড (Hammarskjold)। পরবর্তী সময়ে মহাসচিব হন যথাক্রমে য়ু থ্যাণ্ট (U Thunt) এবং কুর্ট ওয়াল্ডহাইম (Kurt Waldheim)। বর্তমানে মহাসচিব মহাসচিব পদে আছেন পেরুর পেরেজ দা কুয়েলার (Peres de Cuellar)।

কার্যাবলী

১. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রশাসন ও কার্য পরিচালনায় মহাসচিব-এর পদ এবং তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জাতিপুঞ্জের সাধারণ প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বও মহাসচিবের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সচিবালয়ের প্রধান হিসাবে সচিবালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর। সচিবালয়ের কর্মচারিদের মহাসচিব সাধারণ সভা কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী অনুযায়ী নিযুক্ত করেন। আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ এবং জাতিপুঞ্জের অন্যান্য অঙ্গসমূহে যে সব কর্মচারী নিযুক্ত হন তাঁরাও সচিবালয় এবং মহাসচিবের অধীনস্থ। কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরীর শর্তাবলী নির্ধারণ-এর ব্যাপারে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকা ও অঞ্চল থেকে যাতে কর্মীরা নিযুক্ত হন সেদিকে তাঁকে দৃষ্টি রাখতে হয়।

নিয়োগ ও প্রশাসনিক কার্য

২. জাতিপুঞ্জের মুখ্য প্রশাসক হিসাবে মহাসচিব সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যকলাপের তদারক করেন। জাতিপুঞ্জের ঐ সকল প্রধান সংস্থা এবং অপ্রধান অঙ্গসমূহ কর্তৃক অর্পিত দায়-দায়িত্ব তিনি পালন করেন। জাতিপুঞ্জের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি সাধারণ সভার কাছে প্রতিবেদন পেশ করেন।

জাতিপুঞ্জের সংস্থাগুলির দায়-দায়িত্ব পালন

৩. মহাসচিব আন্তর্জাতিক যে কোন ঘটনার প্রতি বা যে সকল ঘটনা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে বলে তিনি মনে করেন, সে সকল ঘটনার প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন (৯৯ নম্বর ধারা)।

রাজনৈতিক ক্ষমতা : শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা

মহাসচিবের কর্তব্যপালন করার সময় তিনি জাতিপুঞ্জের বাইরের কোন সংগঠনের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করবেন না বা প্রভাবিত হবেন না। তিনি এবং তাঁর সচিবালয়ের কর্মচারীরা এমন কিছু করবেন না যার দ্বারা তাঁদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়।

নিরপেক্ষতা

মূল্যায়ন

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়-দায়িত্ব পালনে মহাসচিবের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হিংসা ও উত্তেজনা পরিহার করে যাতে সনদে আকাঙ্ক্ষিত শান্তি পৃথিবীতে সুনিশ্চিত করা যায় তার জন্য মহাসচিবকে নিরলসভাবে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে হয়। বস্তুত তিনি কতটা নিরপেক্ষ ও সার্থকভাবে ঐ দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারেন তার ওপরে মহাসচিবের পদের ন্যায্যতা অনেকাংশে নির্ভর করে। কিন্তু মহাসচিবের দায়িত্ব পালনে অসুবিধাও অনেক। নিরাপত্তা পরিষদের পরস্পর-বিরোধী আদর্শ ও স্বার্থের সংঘাতে লিপ্ত বৃহৎ রাষ্ট্র গোষ্ঠীর মনোরঞ্জন করে তাঁকে চলতে হয়, অন্যদিকে ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের নিষ্পত্তি যাতে ঘটে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়। স্বভাবতই মাঝে মাঝেই তাঁকে উভয় সংকটে পড়তে হয়।

ঐ সকল অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেখা গিয়াছে যে কোরিয়া যুদ্ধে, কঙ্গো সংকটে, আরব-ইজরায়েল বিরোধে এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধে তৎকালীন মহাসচিবেরা অনেক

সময় ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করে সর্বনাশা অবস্থা হতে মুক্তির জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছেন। কোথাও তাঁরা সার্থক হয়েছেন আবার কোথাও সফল হতে পারেননি। আবার অনেকে মনে করেন, কোথাও কোথাও তাঁরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে চরম অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, কঙ্গো সংকটে এবং বিশেষ করে জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতে কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বাকে হত্যা করার ব্যাপারটি মহাসচিব দাগ হ্যামারশিল্ডের (Hammarskjold) ভূমিকাকে নিন্দনীয় করে তুলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকাশ্যেই তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং অন্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর কাছে নতি স্বীকারের জন্য অভিযুক্ত করে।

এসব ঘটনা মহাসচিবের পদের মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করেছে। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে রাশিয়া শুধুমাত্র হ্যামারশিল্ডের পদত্যাগই দাবি করেনি, উপরন্তু মহাসচিবের পদ তুলে দিয়ে তিন ব্যক্তি বিশিষ্ট পরিচালন দপ্তর (Troika Proposal) গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করে। বলা হয়, একজন 'পক্ষপাতি' মহাসচিবের চেয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর তিন প্রতিনিধিত্বমূলক সদস্য নিয়ে পরিচালন দপ্তর গঠন করা যুক্তিসঙ্গত।

কঙ্গোতে জাতিপুঞ্জের ভূমিকা মহাসচিবের পদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর সংশয়ের সৃষ্টি করে এবং জাতিপুঞ্জ এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। হ্যামারশিল্ডের আকস্মিক মৃত্যুতেও ঐ পদের ভূমিকা নিয়ে বিরোধের মীমাংসা হয়নি। য়ু থাণ্টকে মহাসচিব পদে নিয়োগে সোভিয়েত রাশিয়া আপত্তি করেনি, কিন্তু রাশিয়া পূর্বতন প্রস্তাবকে সংশোধন করে নতুনভাবে প্রস্তাব করে যে, মহাসচিব ছাড়াও প্রতিটি গোষ্ঠী থেকে একজন করে সহ-সচিব থাকবে। ঐ প্রস্তাব গ্রহণের জন্য শেষ পর্যন্ত রাশিয়া আর পীড়াপীড়ি করেনি।

কঙ্গোতে জাতিপুঞ্জের ভূমিকা এবং পরবর্তীকালে ভিয়েতনামে মার্কিন বর্বরতা জাতিপুঞ্জের ভাবমূর্তিকে শুধু ম্লান করেনি, মহাসচিবের পদের মর্যাদা ও ভাবমূর্তিকেও নষ্ট করেছে। মহাসচিবের পদটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পুনরায় অভিষিক্ত করতে হলে আগামী দিনে মহাসচিব পদাধিকারীদের ন্যায়-নীতি ও নিরপেক্ষতার আদর্শকে তুলে ধরতে হবে।

৪ জাতিপুঞ্জের ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ

Role and Future of the United Nations

আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জ যাত্রা শুরু করেছিল। কালের নিরিখে পঁয়ত্রিশ বছর খুব বেশি সময় নয়। কিন্তু একটা প্রজন্মের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যৎ বিচারের ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশ বছর খুব একটা কম সময়ও নয়। সুতরাং জাতিপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতার কষ্টিপাথরে এর মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

৪-১ জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতা ও সাফল্য

Achievements and Failures of the U. N.

জাতিপুঞ্জ গঠনের প্রধান কারণ হল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা। যাঁরা জাতিপুঞ্জ গঠনে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ এবং ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁরা জাতিপুঞ্জকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার অভিভাবক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। পৃথিবীতে যুদ্ধ ও রক্তপাত বন্ধ করে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনে ব্যর্থতার নজীর হিসেবে জাতিপুঞ্জের ভূমিকা খুব গৌরবজনক নয়। নীচে জাতিপুঞ্জের ঐ ব্যর্থতার নজীর হিসেবে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হল ঃ

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থতা

১. ১৯৪৬ সালে ইউক্রেন জাতিপুঞ্জে অভিযোগ করে যে, ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় আন্দোলন দমনে ব্রিটিশ ও জাপ সৈন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন সন্তোষজনক মীমাংসা না করে জাতিপুঞ্জ অভিযোগটিকে ধামাচাপা দেয়।

সিরিয়া ও লেবাননের অভিযোগ

২. ঐ বছরই সিরিয়া ও লেবাননে ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যের উপস্থিতির প্রতি ঐ দুটি দেশ জাতিপুঞ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সৈন্য অপসারণের ইচ্ছা আছে এটুকু জানিয়েই এবং কোন সক্রিয় কার্যক্রম গ্রহণ না করে জাতিপুঞ্জ নিজের দায়িত্ব শেষ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ

৩. ঐ সময়ে ভারত অভিযোগ করে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার স্থানীয় ভারতীয়দের প্রতি অন্যায় আচরণ করছে। বিষয়টি দক্ষিণ আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার ঐ অজুহাতে জাতিপুঞ্জ এর আলোচনা বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীকালে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্য নীতির পৃষ্ঠপোষকতা এবং শ্বেতাঙ্গদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের বহু অভিযোগ জাতিপুঞ্জে তোলা হয়। জাতিপুঞ্জ দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে বটে, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে দিয়ে তা কার্যকর করাতে পারেনি।

৪. কাশ্মীরে পাকিস্থানী হানাদারী এবং পাকিস্থান কর্তৃক বল-পূর্বক কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ অধিকৃত রাখার বিষয়টি বারংবার জাতিপুঞ্জে উত্থাপন করা সত্ত্বেও জাতিপুঞ্জ দখলীকৃত এলাকা থেকে আজ পর্যন্ত পাকসৈন্য অপসারিত করতে পারেনি। উপরন্তু মার্কিন প্ররোচনা ও সহযোগিতায় জাতিপুঞ্জ ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে কাশ্মীরে গণভোটের ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট ছিল। সৌভাগ্যের কথা সোভিয়েত রাশিয়া বারবার 'ভেটো' প্রয়োগ করে ঐ অপপ্রচেষ্টা বানচাল করে দেয়।

কাশ্মীর সমস্যা

৫. উত্তর কোরিয়া কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়া আক্রান্ত হয়েছে এ অজুহাতে জাতিপুঞ্জ কোরিয়াতে মার্কিন সৈন্য পাঠায় এবং জাতিপুঞ্জের ব-কলমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়াতে একটি সর্বগ্রাসী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আশ্চর্যের কথা এই যে, জাতিপুঞ্জ কোরিয়াতে মার্কিন হস্তক্ষেপ বন্ধের চেষ্টা না করে সেখানে মার্কিন সৈন্য পাঠানোকে সমর্থন করে। জাতিপুঞ্জের ঐ কাজ পৃথিবীতে একটি দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংগঠনে সাহায্য করেছিল।

কোরিয়া সমস্যা

৬. ১৯৬০ সালে কঙ্গো স্বাধীন হয়। কিন্তু বেলজিয়াম সরকার কঙ্গোতে সৈন্য পাঠালে কঙ্গো জাতিপুঞ্জের সাহায্য প্রার্থনা করে। কঙ্গোতে জাতিপুঞ্জের বাহিনী পাঠানো হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কঙ্গোয় অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা চলতে থাকে এবং এমনকি জাতিপুঞ্জের সৈন্য বাহিনীর উপস্থিতিতেই কঙ্গোর দেশপ্রেমিক প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিক লুমুম্বাকে হত্যা করা হয়। কঙ্গোর ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ মার্কিন সরকারের ক্রীড়নক হিসেবে চলেছে বলে সোভিয়েত রাশিয়া অভিযোগ করে।

কঙ্গো সমস্যা

৭ একটি জাতিকে নির্মূল করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে যে দীর্ঘ ও সর্বধ্বংসী যুদ্ধ শুরু করে তার প্রতিকারে জাতিপুঞ্জ চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ভিয়েতনামের যুদ্ধে জাতিপুঞ্জের নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ ইদানীং কালের সবচেয়ে হতাশাজনক আন্তর্জাতিক ঘটনা।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ

জাতিপুঞ্জের সাফল্য

উপরোক্ত ঘটনাবলীতে প্রমাণ করে যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার অভিভাবক হিসাবে সব সময় যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এর পাশাপাশি কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের দ্বারা জাতিপুঞ্জ নিজের অস্তিত্বের যাথার্থ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।

১. ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশিয়ায় এবং ঐ বছরই প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় এবং জাতিপুঞ্জ তা রোধ করিতে সমর্থ হয়। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সংক্রান্ত বিরোধে জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ কার্যকর হয় এবং একটা আসন্ন বড় রকমের যুদ্ধের হাত থেকে জাতিপুঞ্জ পৃথিবীকে বাঁচায়। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত প্রচেষ্টার সাথে সহযোগিতা করে এবং এ যুদ্ধ বন্ধ করে। সুতরাং কয়েকটি ক্ষেত্রে বিরোধ যাতে দীর্ঘায়িত না হয় জাতিপুঞ্জ তা নিশ্চিত করে।

বিরোধে ফলপ্রসূ হস্তক্ষেপ

২. অছিভুক্ত অঞ্চলগুলিতে স্বাধীনতা দানের ব্যাপারে জাতিপুঞ্জের ভূমিকা প্রশংসার যোগ্য। এ ছাড়া ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে উপনিবেশগুলিকে স্বাধীন করার ব্যাপারে জাতিপুঞ্জের উদ্যোগ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। ১৯৬০ সালে সমস্ত উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেবার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব সাধারণ সভা গ্রহণ করে এবং এর ফলে পৃথিবীতে স্বাধীনতার বিভিন্ন আন্দোলন একটা নৈতিক সমর্থন পেয়ে তীব্র হয়।

অছিভুক্ত অঞ্চল ও উপনিবেশের স্বাধীনতা লাভ

৩. সার্বজনীন মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিপুঞ্জ কর্তৃক মানব অধিকারের ঘোষণা (Declaration of Human Rights) জাতিপুঞ্জের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ১৯৪৮ সালে সাধারণ সভায় 'মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা' অনুমোদিত হয়। অনেক সমালোচক অবশ্য ঐ ঘোষণাকে অবাস্তব ও অন্তঃসারশূন্য বলে উল্লেখ করেছেন।

মানবিক অধিকার ঘোষণা

৪. আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। এ ব্যাপারে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সংস্থার কার্যাবলী গঠনমূলক খাতে প্রবাহিত হয়। বিশ্বব্যাঙ্ক, অর্থভাণ্ডার, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং ইউনেস্কোর ভূমিকা ও অবদান এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আর্থনীতিক ও সামাজিক অবদান

জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার কারণ

জাতিপুঞ্জের বিরুদ্ধে যে সব সমালোচনা উপস্থিত করা হয় সেগুলোকে এর ব্যর্থতার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

প্রথমত, নিরাপত্তা পরিষদে 'ভেটো' ব্যবস্থা থাকার জন্য কোন বৃহৎ শক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ কোন কার্যকর প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে না। 'ভেটো' ব্যবস্থার ফলে কোন প্রস্তাব গ্রহণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ঐকামত অপরিহার্য। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি এখানে প্রযোজ্য নয়, বৃহৎ শক্তিবর্গের সম্মতিই বিবেচ্য। অথচ বিভিন্ন স্বার্থ ও রাজনৈতিক কারণে এরা পরস্পর-বিরোধী মেরুতে অবস্থান করে। ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছে, নিরাপত্তা পরিষদে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব যার হাতে ন্যস্ত সে সংস্থা আত্মকলহে অচল হলে জাতিপুঞ্জ কি ভাবে সফল হবে ?

ভেটো ব্যবস্থা

দ্বিতীয়ত, জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। রাজনৈতিক দিক থেকে সাধারণ সভা তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত—ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমী গোষ্ঠী, খ. সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী, গ. কোন গোষ্ঠীভুক্ত নয় এমন নিরপেক্ষ দেশগুলি—যাহারা বর্তমানে 'তৃতীয় বিশ্ব' (Third World) নামে পরিচিত। এ ছাড়াও কমিউনিস্ট চীন ও তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। উপরোক্ত রাজনৈতিক গোষ্ঠী ছাড়াও সাধারণ সভায় সদস্যরাষ্ট্রগুলো কয়েকটি সামরিক

বিভিন্ন শিবির ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত

জোট এবং আঞ্চলিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। বিভিন্ন আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী বন্ধনে আবদ্ধ থাকার জন্য সাধারণ সভার পক্ষেও ঐক্যবদ্ধভাবে কোন ব্যাপক কার্যক্রম, বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, নেতৃত্ব এবং পক্ষপাতহীন মনোভাব গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, বৃহৎ শক্তিবর্গ ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিরোধকে কেন্দ্র করে এদের মধ্যে যে ঠাণ্ডা লড়াই (Cold War) চলছে তার প্রভাব জাতিপুঞ্জের কার্যকলাপে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। ফলে কাশ্মীর সমস্যা বা কঙ্গো সমস্যা বা জাতিপুঞ্জে জনগণতান্ত্রিক চীনের সদস্যপদের প্রশ্ন বা যে কোন বিষয়কে গোষ্ঠীস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়। ঠাণ্ডা লড়াই এবং গোষ্ঠীবাদের অবলুপ্তি না হলে এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়।

চতুর্থত, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি মনে করে যে, জাতিপুঞ্জকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী শক্তিগুলির স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। জাতিপুঞ্জের একজন প্রাক্তন মহসচিব দাগ হ্যামারশিল্ডের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া প্রকাশ্যে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছিল। ন্যায়-নীতি ও নিরপেক্ষতা রক্ষার অক্ষমতা জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার জন্য অনেকাংশে দায়ী এবং এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে কঙ্গোর ঘটনাবলীর উল্লেখ করা যেতে পারে।

নিরপেক্ষতার অভাব

পঞ্চমত, জাতিপুঞ্জের কোন নিজস্ব ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী না থাকায় এর অবস্থা হইয়াছে অনেকটা নিধিরাম সর্দারের মত। সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিপুঞ্জকে সব সময় সদস্যরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। তাহা ছাড়া সদস্যরাষ্ট্রগুলির সৈন্যবাহিনী জাতিপুঞ্জের আদর্শ ও নীতি রূপায়ণের চেয়ে নিজের দেশের স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাপারে বেশী উৎসাহী থাকে।

সনদে বলা হয়েছে যে, জাতিপুঞ্জ কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলতে কী বুঝায় এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। ঐ অস্পষ্টতার সুযোগ গ্রহণ করে কোন সদস্যরাষ্ট্র এমন অনেক কাজ করে যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর, অথচ এ ব্যাপারে জাতিপুঞ্জের কিছু করণীয় থাকে না। যেমন, কিছুদিন আগে পূর্ব-বাংলায় (তখনও বাংলাদেশ গঠিত হয়নি) ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে পাকিস্থান সরকার ব্যাপক গণহত্যা সংগঠিত করে একটি জাতিকে নির্মূল করার কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু ঐ ব্যাপার পাকিস্থানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এ যুক্তিতে জাতিপুঞ্জও নির্বাক দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রতিকার কী ? সনদের পরিবর্তন ?

১. অনেকে মনে করেন যে, নিরাপত্তা পরিষদকে বর্তমান অচলাবস্থা থেকে মুক্ত করে জাতিপুঞ্জকে শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হলে জাতিপুঞ্জের সনদের পরিবর্তন করা (Revision of Charter) প্রয়োজন। ভেটো ব্যবস্থার বিলুপ্তি করার পরামর্শ অনেকে দিয়ে থাকেন। কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গ 'ভেটো' বাতিলের প্রস্তাবে সম্মত হবে না। বিশেষ করে সাধারণ সভায় মার্কিন সংখ্যাধিক্য লোপ পাওয়ায় ঐ দেশ 'ভেটো' বিলুপ্তির প্রস্তাবে সম্মত হবে না। সোভিয়েত রাশিয়ার সম্মতি লাভও এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। সুতরাং বিকল্প প্রস্তাব হল ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতাকে সীমিত

করা। বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরা ইচ্ছামক 'ভেটো' প্রয়োগ করতে পারে—এ ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধের দ্বারা তারা আবদ্ধ নয়।

২. আমরা আগেই বলেছি যে, কোন সদস্যরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ হস্তক্ষেপ করবে না এ মর্মে সনদের বক্তব্য অস্পষ্ট। সনদ সংশোধন করে "অভ্যন্তরীণ ব্যাপার" বলতে কী বোঝায় তা দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন।

৩. জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভের জন্য যে পদ্ধতির কথা সনদে বলা হয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ। কারণ বৃহৎ শক্তিবর্গের ইচ্ছার উপরে কোন দেশের সদস্যপদ লাভ করা বা না-করা নির্ভর করে। কমিউনিস্ট ভীতি ও বিরোধীতার জন্য গণসাধারণতন্ত্রী চীন, পূর্ব জার্মানী, উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ কোরিয়াকে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাধা দিয়েছিল। যে কোন রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের নীতি ও উদ্দেশ্য মান্য করবে এবং সদস্যপদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিলেই তাকে সদস্যপদ দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য সনদের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা প্রয়োজন।

৪. আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ যাতে মানব কল্যাণে আরও বেশি পরিমাণে নিয়োজিত হতে পারে তার জন্য ঐ গঠনমূলক সংস্থাটির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৫. আন্তর্জাতিক আদালতের এক্তিয়ারকে নির্দিষ্ট ও বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন এবং ঐ আদালতের সিদ্ধান্ত যাতে বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা যায় সনদ সংশোধন করে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সদস্যরাষ্ট্রগুলি যাতে নিজ স্বার্থ অনুযায়ী সনদকে ব্যাখ্যা করতে না পারে সেজন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয় বা অন্য কোন যোগ্য সংস্থার হাতে সনদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পিত হওয়া প্রয়োজন।

সনদের ঐ সকল পরিবর্তন করে জাতিপুঞ্জকে সচল, কার্যকর ও সফল করার প্রচেষ্টা চালান প্রয়োজন যাতে আগামী দিনে জাতিপুঞ্জ সত্যিকারের 'বিশ্ব-সরকার'-এ পরিণত হতে পারে।

৪-২. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ
Future of the U.N.

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ইতিহাস কেবলমাত্র সাফল্যের ইতিহাস নয়—কিছু কিছু সাফল্য এবং পর্বত প্রমাণ ব্যর্থতার ঘটনার দ্বারা এর ইতিহাস রচিত হয়েছে। জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠার সময়ে এর প্রতি মানুষের সমর্থন, সহানুভূতি ও প্রত্যাশার শেষ ছিল না। ঐ প্রত্যাশা জাতিপুঞ্জ নিশ্চয়ই পূরণ করতে পারেনি। ফলে পদে পদে মানুষের আশাভঙ্গ ঘটেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমকালীন পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থা ও শক্তি-বিন্যাসের কথা মনে রেখে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যাবলীর মূল্যায়ন করলে এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব বেশি আশাহত হতে হয় না।

মনে রাখতে হবে যে ১৯৪৫ সাল এবং ১৯৮৩ সাল এক নয়। এতদিন জাতিপুঞ্জেও মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমী শিবিরের সংখ্যাধিক্য থাকার জন্য জাতিপুঞ্জ এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায় এবং ফলে অনেক আন্তর্জাতিক বিবাদের সন্তোষজনক মীমাংসা হতে পারেনি, অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। কিন্তু

সাম্প্রতিককালে অনেক সদ্য স্বাধীন দেশ জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করেছে। এদের মধ্যে ব্যাপক সংখ্যক রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করেছে। এরা সাধারণভাবে কোন গোষ্ঠীভুক্ত নয়, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। ঐ সকল গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশগুলি 'তৃতীয় বিশ্ব' দেশ বলে পরিচিত। এরা জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করায় সাধারণ সভার ভারসাম্যে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ৫০টি রাষ্ট্র নিয়ে একদা জাতিপুঞ্জের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল বর্তমানে সে সংস্থার সদস্যসংখ্যা ১৫৬। সুতরাং জাতিপুঞ্জ সর্বজনীনতা লাভ করেছে এবং পশ্চিমী সংখ্যাধিক্যের জগদ্দল পাথরকে অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে, এ কথা বলা যায়। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমী শিবিরের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়ায় তারা আর আগের মত সংহত নয়। বিশেষ করে ব্রিটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশগুলির আন্তর্জাতিক ব্যাপারে মার্কিন নীতির সমর্থনে এগিয়ে আসতে অনেক ক্ষেত্রেই উৎসাহের অভাব দেখা যাচ্ছে। এ সব কারণে বর্তমানে জাতিপুঞ্জের পক্ষে কোন একটি রাষ্ট্রের কথা মত চলা আর সম্ভব নয়। জাতিপুঞ্জের অবস্থা ও ভারসাম্যের এই পরিবর্তনের জন্য প্রাক্তন মহাসচিব উ থাণ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁসিয়ারী দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলতে পেরেছিলেন যে, মহাসচিব ও সচিবালয়ের কর্মচারীবৃন্দ মার্কিন সরকারের হাতের ক্রীড়নক নয়।[১]

একদিকে আজ জাতিপুঞ্জে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির সমর্থনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবির অনেক বেশি শক্তিশালী; অন্যদিকে পৃথিবীর শান্তির শক্তিগুলি অনেক বেশি সুসংগঠিত। সেজন্য জাতিপুঞ্জের অনেক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এরূপ আশা করা অন্যায় হবে না যে, জাতিপুঞ্জ জাতিসংঘের মত ব্যর্থ হতে পারে না।

জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন কল্যাণধর্মী ও প্রগতিমূলক কার্যাবলী এর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। জাতিপুঞ্জের জন্য মোট বরাদ্দ অর্থের শতকরা ৮৫ ভাগ সমাজ-কল্যাণমূলক কার্যে ব্যয় করা হয়। এ ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ বিশ্বব্যাপী সমাজ উন্নয়নের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা প্রভূত পরিমাণে সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে। এই সমস্ত কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে গঠিত সহায়ক সংস্থাগুলির আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান জাতিপুঞ্জের সার্থকতার প্রমাণ। জাতিপুঞ্জের বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির কার্যাবলী কার্যভিত্তিক আন্তর্জাতিকতার (functional internationa-lism) প্রতিফলন।

বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির একটি সার্বজনীন সংস্থায় পরিণত হওয়াও জাতিপুঞ্জের সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের ইংগিত বহন করে। কয়েকটি শক্তির নিজস্ব সংস্থা থেকে জাতিপুঞ্জ আজ বিশ্বের সব জাতির সংস্থায় পরিণত হয়েছে। প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট বলেছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সদস্যতার দিক দিয়ে সার্বজনীন এবং জাতি সংঘ অপেক্ষা কার্যকর ও শক্তিশালী। চীন গণসাধারণতন্ত্র (কমিউনিস্ট চীন) জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় জাতিপুঞ্জের সার্বজনীনতা সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংগঠন হিসেবে জাতিপুঞ্জ শুধু যে টিকেই রয়েছে তা নয়, ওয়াল্টার লিপম্যান (W. Lipman) যথার্থই বলেছেন যে,

---

১. এইস. জি. নিকোলাস

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ "একটি অপরিহার্য সংস্থা"। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝেছি, যে-ধরনের আদর্শস্থানীয় আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থাপিত হলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি বিরাজ করবে অথবা শান্তি বিঘ্নিত হবার আশংকা থাকবে না, সেরূপ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার মত রাজনৈতিক পরিবেশ ও মানসিক উৎকর্ষ পৃথিবীতে এখনও দেখা দেয়নি। তাই জাতিপুঞ্জের অধিকাংশ ব্যর্থতার জন্য দায়ী বর্তমান পৃথিবীর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। 'ভেটো' ব্যবস্থা জাতিপুঞ্জের একটি ত্রুটি, কিন্তু 'ভেটো' ব্যবস্থা না থাকলে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিতই হতে পারত না। কারণ আমরা জানি যে, সানফ্রানসিসকো সম্মেলনে বৃহৎ শক্তিগুলি অন্যদেশগুলির প্রবল বিরোধিতার মধ্যেও তাদের জাতিপুঞ্জে যোগদানের প্রায় একটি শর্ত হিসাবেই 'ভেটো' দানের অধিকারটি দাবি করেছিল।

জাতিপুঞ্জ যে একটি অপরিহার্য সংস্থা এর প্রমাণ হল এই যে, এ সংস্থার উপর মার্কিন প্রভাব হ্রাস পাওয়াতে যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হতাশ ও ক্ষুব্ধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে জাতিপুঞ্জের সাথে সংস্রব ত্যাগ করেনি। জাতিপুঞ্জেও মার্কিনী সংখ্যাগরিষ্ঠতার সামনে সোভিয়েত রাশিয়া বার বার কোণঠাসা হলেও সোভিয়েত রাশিয়া ও তার অনুগামীরা জাতিপুঞ্জ ত্যাগ করে চলে আসেনি। জাতিপুঞ্জের সংস্রব ত্যাগ করে একলা চলার নীতি বর্তমান বিশ্বে ফলপ্রসূ নয়—এ কথা ছোট-মাঝারি-বড় সব শক্তিই উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছে। বরং সম্প্রতি গণপ্রজাতান্ত্রিক চীন এবং ব্যাপক সংখ্যক আফ্রো-এশিয় দেশ জাতিপুঞ্জের সদস্য হওয়ায় জাতিপুঞ্জের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

এ কথা সত্য যে, বড় বড় দেশগুলি যে-ভাবে মারাত্মক রকমের পারমাণবিক অস্ত্র ও আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকারী হয়ে উঠছে তাতে যে কোন আঞ্চলিক যুদ্ধ পরিণামে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হতে পারে। এ অবস্থায় মানুষের নিকট দুটি পথ খোলা আছে : যুদ্ধহীন পৃথিবীতে শান্তিতে বেঁচে থাকা অথবা সর্বনাশা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মানবজাতির আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করা। হয় সর্বাত্মক ধ্বংস, নয় আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধের সম্প্রসারণ।[১] এ কথা আজ ছোট বড় রাষ্ট্রসহ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করছে যে, জাতিপুঞ্জের অবলুপ্তি মানব সমাজের আত্মহত্যায় সমান। তাই জাতিপুঞ্জের সমালোচনা করা হবে, একে সংস্কার করার প্রস্তাব আসবে, এমনকি ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীস্বার্থে একে ব্যবহারের চেষ্টা হবে—কিন্তু কেউই এ সংস্থার ধ্বংস কামনা করবে না। এ কথা আজকে ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছে যে, জাতিপুঞ্জকে ব্যর্থ হতে দিতে পারা যায় না, কারণ জাতিপুঞ্জ ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হ'ল মানব জাতির সব আশা ও পরিকল্পনার অপমৃত্যু। সুতরাং মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জনাই জাতিপুঞ্জের অস্তিত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা চালান অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

১. It is the survival or suicide of man······the choice is either extinction or human brotherhood. Dr Radhakrishnan.

নমুনা প্রশ্ন

প্রথম অধ্যায়

1. জাতিসংঘের সাথে জাতিপুঞ্জের তুলনা কর। (১৩ দেখ)
   [Compare the U. N. with the League of Nations.]
2. জাতিপুঞ্জের আবির্ভাব কি ভাবে ঘটে আলোচনা কর। (১'২ দেখ)
   [Write a note on the Birth of the U. N.]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

1. জাতিপুঞ্জ কবে গঠিত হয় ? (পৃঃ ৮)
   [When was the United Nations born] ?
2. আতলান্তিক চার্টার সম্পর্কে দু'চার কথা লিখ। (পৃঃ ৬)
   [Write a few words on the Atlantic Charter.]
3. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা সম্পর্কে টীকা লিখ। (পৃঃ ৭)
   [Write a note on the Declaration of the U. N.]

দ্বিতীয় অধ্যায়

1. জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে জাতিপুঞ্জের যে দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা কর। (২'১ দেখ)
   [Discuss the Philosophy of the U. N. as reflected through the Preamble of its Charter.]
2. জাতিপুঞ্জের লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্য আলোচনা কর। (২'২ দেখ)
   [Discuss the Aims, Objects and Purposes of the United Nations]
3. জাতিপুঞ্জের কাঠামের একটা রূপরেখা দাও। (২'৩ দেখ)
   [Give an outline of the structure of the U. N.]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

1. জাতিপুঞ্জের প্রধান সংস্থা কয়টি এবং কি কি। (পৃঃ ১৫)
   [What are the major orgains of U. N. ?]
2. জাতিপুঞ্জের পাঁচটি অপ্রধান বা সহায়ক অঙ্গের নাম লিখ। (পৃঃ ১৫)
   [Write the names of five subsidiary organs of the U. N.]
3. জাতিপুঞ্জের মূল উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা কর।
   [Discuss the basic objects of the U.N.] [B. U. '80] (পৃঃ ১৩)

তৃতীয় অধ্যায়

1. জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার গঠন, ভোট ব্যবস্থা ও কার্যাবলী আলোচনা কর। (৩'১ দেখ)
   [Discuss the composition, voting procedure and functions of the General Assembly.]
2. সাধারণ সভার উত্থান তুমি কি ভাবে ব্যাখ্যা করবে ? (৩'১ দেখ)
   [How will you account for the rise of the General Assembly ?]

3. সাধারণ সভার ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর।
[Discuss the powers and position of the U. N. general Assembly.] [B. U. '81] (৩·১ দেখ)
4. সাধারণ সভার আলোচনা ও মূল্যায়ন কর। (৩·১ দেখ)
[Make a critical estimate of the General Assembly.]
5. নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর।
[B. U. '80 '82] (৩·২ দেখ)
[Discuss the composition and functions of the Security Council.]
6. 'ভেটো' কাকে বলে ? নিরাপত্তা পরিষদের ভোট ব্যবস্থা আলোচনা কর।
(৩·২ দেখ)
[What is 'Veto'? Explain the voting procedure of the Security Council.]
7. 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে' নিরাপত্তা পরিষদ কতটা সফল হয়েছে ? (৩·২ দেখ)
[How far has the Security Council been successful in discharging the 'primary responsibility for the maintenance of international peace and security'?]
8. নিরাপত্তা পরিষদের অবনয়ন সম্পর্কে টীকা লিখ। (৩·২ দেখ)
[Write a note on the decline of the Security Council.]
9. আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। ঐ সংস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে টীকা লিখ। (৩·৩ দেখ)
[Discuss the composition and functions of the Economic and Social Council. Write a note on its importance.]
10. অছি পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর। বর্তমানে ঐ সংস্থার অস্তিত্বের আর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি ? (৩·৪ দেখ)
[Discuss the composition and functions of the Trusteeship Council. Does this organization any more justify its survival?]
11. আন্তর্জাতিক আদালতের গঠন ও এক্তিয়ার আলোচনা কর। (৩·৫ দেখ)
[Discuss the composition, functions and jurisdiction of the International Court of Justice]
12. সচিবালয় কাকে বলে ? এর প্রধান কে ? তাঁর কার্যাবলী আলোচনা কর।
(৩·৬ দেখ)
[What is Secretariat? Who is the head of this office? Discuss his functions.]
13. মহাসচিবের কার্যাবলী ও সাফল্যের মূল্যায়ন কর। (৩·৬ দেখ)
[Critically evaluate the functions and achievements of the Secretary General.]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

1. সাধারণ সভার গঠন আলোচনা কর। (পৃঃ ১৬)
[Discuss the composition of the General Assembly.]

2. সাধারণ সভার উত্থানের দুটি কারণ আলোচনা কর। (পৃঃ ২০)
[Give two reasons for the rise o' the General Assembly.]

3. শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি প্রস্তাব ব্যাখ্যা কর। (পৃঃ ১৯)
[Explain the Uniting for Peace Resolution.]

4. শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসা সম্পর্কে টীকা লিখ। (পৃঃ ২৭)
[Write a note on Pacific Settlement of Disputes.]

5. নিরাপত্তা পরিষদের 'ভেটো' ব্যবস্থা সম্পর্কে টীকা লিখ। (পৃঃ ২৩)
[Write a note on the 'Veto' system in the Security Council.]

6. নিরাপত্তা পরিষদ কিভাবে গঠিত হয়? এর স্থায়ী সদস্য কারা? (পৃঃ—২৩)
[How is the Security Council composed? Who are its permanent members?]

7. নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতাহ্রাস বলতে কি বুঝ? (পৃঃ ২৭)
[What do you mean by the decline of the Security Council ?]

৪. আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের সাথে সংশ্লিষ্ট চারটি সহকারী অঙ্গের নাম লিখ। (পৃঃ ৩০)
[Name four subsidiary organs attached with the Econonic and Social Council.]

9. আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকেরা কিভাবে মনোনীত হয়? (পৃঃ ৩৪)
[How are Judges of the International Court Selected ?]

10. আন্তর্জাতিক আদালতের এক্তিয়ার আলোচনা কর। (পৃঃ ৩৫)
[Discuss the jurisdiction of the International Court of Justice.]

11. মহাসচিবের কার্যাবলী কি কি? [B. U. '82] (পৃঃ ৩৮)
[What are the functions of the Secretary General ?]

12. আন্তর্জাতিক বিচারালয় কিভাবে গঠিত হয়?
[What is the composition of the International court of Justice ?] [B. U. '81] (পৃঃ ৩৪)

তৃতীয় অধ্যায়

1. জাতিপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা কর। (৪.১ দেখ)
[Discuss the achievements and failures of the U.N.]

2. জাতিপুঞ্জ ব্যর্থ হবার কারণগুলি কি ? (৪·১ দেখ)
[What are the reasons for the failure of the U.N. ?]

3. জাতিপুঞ্জের সনদের পরিবর্তন সম্পর্কে টীকা লিখ। (৪·১ দেখ)
[Write a note on the Revision of the U. N. Charter.]

4. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে টীকা লিখ। (৪·২ দেখ)
[Write a note on the Future of the United Nations.]

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

1. জাতিপুঞ্জের সাফল্য সম্পর্কে টীকা লিখ। (পৃঃ ৪১—৪২)
[Write short note on the achievements of the U.N.]

2. মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা সম্পর্কে টীকা লিখ। (পৃঃ ৪২)
[Write a note on the Declaration of Human Rights.]

3. তুমি কি 'ভেটো' ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য জাতিপুঞ্জের সনদের পরিবর্তন চাও ? (পৃঃ ৪৩)
[Are you in favour of the Revision of the Charter to change the Veto system of the Security Council ?]

4. জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমার মত কী ? (পৃঃ ৪৪—৪৫)
[What is your opinion about the future of the U.N. ?]

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র

POLITICAL SCIENCE (Pass)

(Naw Syllabus)

Second Paper

১। ব্রিটেনে রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকিবার কারণগুলি লিখ।

২। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৩। সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

৪। সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৫। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের ক্যাবিনেটের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৬। নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

৭। নিম্নলিখিত যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও (প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দশটি বাক্যের মধ্যে লিখিতে হইবে।) ঃ

(ক) ব্রিটিশ সংবিধানকে অলিখিত সংবিধান বলা হয় কেন ?

(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কি ?

(গ) সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি কি কি ?

(ঘ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল উদ্দেশ্যগুলি কি ?

(ঙ) কমন্সসভার স্পীকারের প্রধান কার্যগুলি কি ?

(চ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতির ভূমিকা কি ?

৭নং প্রশ্ন এবং অন্য যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দ[illegible]।

১। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর। ২০

২। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর। ২০

৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর এবং ঐ দেশের শাসন-ব্যবস্থায় তার গুরুত্বের মূল্যায়ন কর। ২০

৪। আমেরিকার সেনেটসভাকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ বলা হয় কেন ব্যাখ্যা কর। ২০

৫। সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের গঠন, কার্যাবলী ও পদমর্যাদা আলোচনা কর। ২০

অথবা

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি সমালোচনামূলক টীকা লেখ। ২০

৬। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার ক্ষমতা ও পদমর্যাদার মূল্যায়ন কর। ২০

৭। নীচের যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও। (প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের দৈর্ঘ্য যেন দশটি বাক্যের বেশি না হয়।)

(ক) গ্রেট ব্রিটেনে আইন এবং শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য কি ? ১০

(খ) রানী ও রাজশক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ১০

(গ) কংগ্রেসের উভয় কক্ষ থেকে পাশ হওয়ার পর কোন বিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হলে রাষ্ট্রপতি কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন ?

(ঘ) সোভিয়েত ইউনিয়নের নূতন সংবিধানের যে কোন দুটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর। ১০

(ঙ) সুপ্রীম সোভিয়েতের জাতিসমূহের সোভিয়েত কিভাবে গঠিত হয় ? ১০

(চ) আন্তর্জাতিক বিচারালয় কিভাবে গঠিত হয় ? ১০

৭নং প্রশ্ন এবং অন্য যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র টিকে থাকার কারণ কি ? ২০

২। ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলির প্রকৃতি আলোচনা কর। এগুলিকে মান্য করা হয় কেন ? ৬+১৪

৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। ২০

৪। সোভিয়েত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ২০

৫। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডিয়ামের গঠন, কার্যাবলী এবং শাসনতান্ত্রিক গুরুত্ব সম্বন্ধে যা জান লেখ। ৫+১০+৫

৬। নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। ৫+১৫

৭। নীচের যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও। [প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের দৈর্ঘ্য যেন দশটি বাক্যের বেশী না হয়।]

(ক) ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস আলোচনা কর। ১০

(খ) কমন্সসভায় স্পীকারের প্রধান কার্যাবলী কি ? ১০

(গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিসভা [ক্যাবিনেট] সম্পর্কে একটি টীকা লিখ। ১০

(ঘ) সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকিউরেটর জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ১০

(ঙ) সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি কি ? ১০

(চ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান কর্মসচিব কি কি কাজ সম্পাদন করেন ? ১০